প্রকাশ : মার্চ ১৯৬০

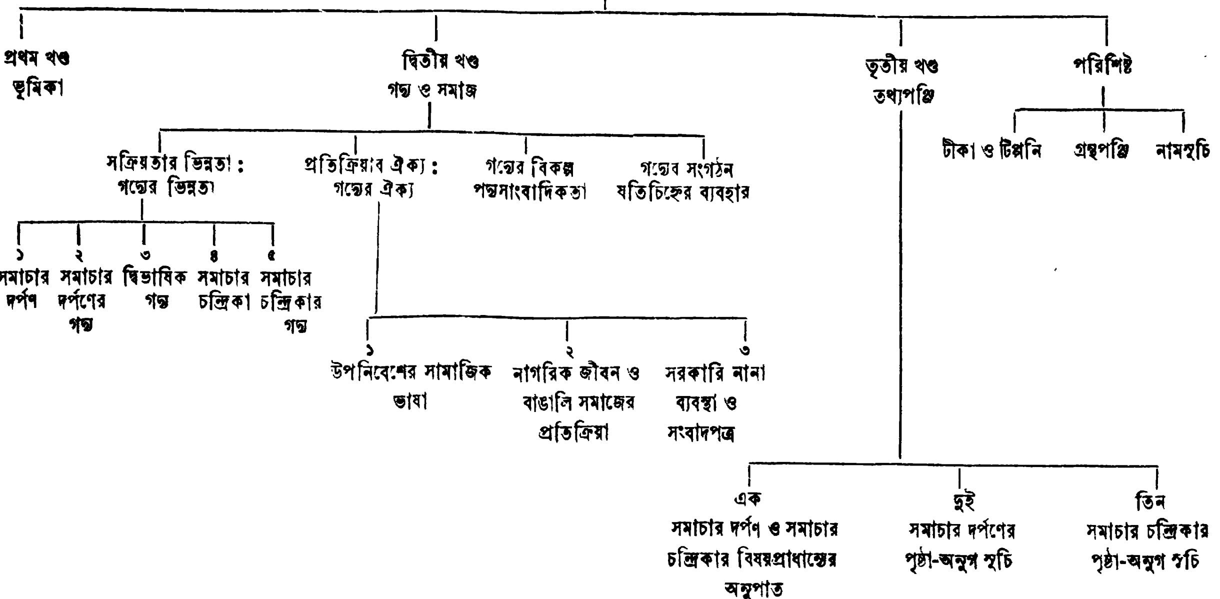
প্রুফ সংশোধক : জগন্নাথ ভট্টাচার্য

অরিজিৎ কুমার, প্যাপিরাস, ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলিকাতা ৪ প্রকাশিত
বিজয়কৃষ্ণ সামন্ত, বাণীশ্রী, ১৫/১ ঈশ্বর মিল লেন, কলিকাতা ৬ মুদ্রিত
ও দীনেশ বিশ্বাস, ১৯/১ই পাটোয়ারবাগান লেন, কলিকাতা ৯ গ্রন্থিত।

অরুণ সেন

এই রোদে জলে নিয়তবন্ধুকে

পরিকল্পনার ছক



উপনিবেশের সমাজ ও বাংলা সাংবাদিক গদ্য
প্রথম খণ্ড
ভূমিকা
দ্বিতীয় খণ্ড
গদ্য ও সমাজ
তৃতীয় খণ্ড
তথ্যপঞ্জি
পরিশিষ্ট
সক্রিয়তার ভিন্নতা :
গদ্যের ভিন্নতা
প্রতিক্রিয়ার ঐক্য :
গদ্যের ঐক্য
গদ্যের বিকল্প
পদ্যসাংবাদিকতা
গদ্যের সংগঠন
যতিচিহ্নের ব্যবহার
টীকা ও টিপ্পনি
গ্রন্থপঞ্জি
নামসূচি
১
সমাচার দর্পণ
২
সমাচার দর্পণের গদ্য
৩
দ্বিভাষিক গদ্য
৪
সমাচার চন্দ্রিকা
৫
সমাচার চন্দ্রিকার গদ্য
১
উপনিবেশের সামাজিক ভাষা
২
নাগরিক জীবন ও বাঙালি সমাজের প্রতিক্রিয়া
৩
সরকারি নানা ব্যবস্থা ও সংবাদপত্র
এক
সমাচার দর্পণ ও সমাচার চন্দ্রিকার বিষয়প্রাধান্যের অনুপাত
দুই
সমাচার দর্পণের পৃষ্ঠা-অনুগ সূচি
তিন
সমাচার চন্দ্রিকার পৃষ্ঠা-অনুগ সূচি

সূচি

সংকেত

সংবাদপত্রে সেকালের কথা প্রথম খণ্ড ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
=স. সে. ক. ১

সংবাদপত্রে সেকালের কথা দ্বিতীয় খণ্ড ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
=স. সে. ক. ২

বাংলা সাময়িকপত্র প্রথম খণ্ড ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়=বা. সা. প.

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র প্রথম খণ্ড বিনয় ঘোষ সম্পাদিত=সা. বা. স. ১

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র দ্বিতীয় খণ্ড বিনয় ঘোষ সম্পাদিত=সা. বা. স. ২

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র তৃতীয় খণ্ড বিনয় ঘোষ সম্পাদিত=সা. বা. স. ৩

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র চতুর্থ খণ্ড বিনয় ঘোষ সম্পাদিত=সা. বা স. ৪

অন্যান্য উৎসগ্রন্থ পুরো নামেই উল্লেখিত হয়েছে।

সংশোধন

৪৫৮ পৃষ্ঠার শিরোনামে **'১৬৪টি সংখ্যার'** পড়তে হবে।

সূচনা

অর্থনীতি-ইতিহাস-রাষ্ট্রসমাজতত্ত্বের নানা প্রশ্নের গড়াভাঙায় সমাজবিজ্ঞানের প্রকরণ এখন প্রায় প্রতিদিনই বদলাচ্ছে। দুনিয়ার জ্ঞানচর্চায় ভাষাতত্ত্ব ক্রমশই এমন সব প্রকরণের নির্ভরস্থল হয়ে উঠছে। সমাজবিজ্ঞানের বড় বেশি বিজ্ঞানমগ্নতায় অনেক সময়ই সামাজিক অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ অনুভব যেমন হারিয়ে যাওয়ার ভয় দেখা যাচ্ছে, তেমনি আবার ভাষাতত্ত্বের মতো দর্পণ তাকমত ধরে অনেক সামাজিক বিষয়ের আসল চেহারা ধরে ফেলা যাচ্ছে—সে-সব বিষয় এতদিন অদৃশ্য অশরীরী নানা চিন্তার আবছায়ায় ঢাকা থাকত। সমাজবিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্ব খুব দ্রুত পরিপূরক হয়ে উঠছে। এ বইয়ে বাংলা সাংবাদিক গদ্যের বিকাশ ও গড়ন বোঝার জন্যে উপ-নিবেশের সমাজকেও তার প্রয়োজনীয় উপাদান হিশেবে ভাবা হয়েছে, আবার, উপনিবেশের সমাজকে বুঝতে বাংলা সাংবাদিক গদ্যকেও উপাদান হিশেবে ভাবা হয়েছে।

কিন্তু পুরো বইটা লেখা ও ছাপা হওয়ার পর এই শেষ কয়েকটি পৃষ্ঠা, 'সূচনা' হলেও আসলে যা অনুশোচনারই নামান্তর, লিখতে-লিখতে কৃত্তিবাসের হনুমানের কথা মনে পড়ছে। সাগরপাড়ির পর তার প্রধান সমস্যা হল—'কেমনে চিনিব আমি সীতা চন্দ্রমুখী?' স্বর্ণলঙ্কার প্রাসাদে ঘরে-ঘরে উঁকি দিয়ে সীতাখোঁজার পর বিষণ্ণ পবননন্দন প্রাচীরের ওপর বসে-বসে ভাবছিলেন, 'সীতা না দেখিলু, দেখিলাম পরের শৃঙ্গার'। এ বই না হল সমাজবিজ্ঞান, না হল ভাষাতত্ত্ব বা সাহিত্যের ইতিহাস।

কিন্তু সেটাও জ্ঞাতকর্মেরই ফল। তেমন যাতে না হয়ে ওঠে সে-বিষয়েই ছিল আমার চেষ্টা ও মনোযোগ। উনিশ শতকের সমাজের নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আর বাংলা গদ্যের বিকাশকে কোঠায়-কোঠায় ভাগ না করেও তো আমরা নতুন-নতুন প্রশ্ন তৈরি করতে পারি। কার্যকারণের যে-কাল্পনিকতায় উপনিবেশের বিস্তার, বাঙালি সমাজের বিকাশ, সাংবাদিকতার চর্চা ও গদ্যের উদ্ভবকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে ফেলা হয়, বা নানা ভাগে বিন্যস্ত করা হয়—সেই কাল্পনিকতা থেকে যদি আমরা মুক্ত করে নিতে পারি আমাদের চিন্তাকে, স্তরবিন্যাসের অভ্যস্ত সুবিধে থেকে সরিয়ে নিতে পারি আমাদের প্রয়োজনকে, তা হলে, উপনিবেশের প্রতিষ্ঠা, নাগরিক বাঙালির বিকাশ,

সাংবাদিকতা ও বাংলা গদ্যের জন্মের ভিতর প্রায় দেড়শ বছরের গ্রন্থন ছিন্ন হয়ে যেতে পারে বটে, প্রায় দেড়শ বছরের নির্মিত স্তরভাগ ধসে যেতে পারে বটে, কিন্তু সেই বিচ্ছিন্নতা ও বিধ্বস্ততার ভিতর থেকেই এই ইতিহাসের আর-এক পাঠ উদ্ধার করা যেতে পারে। সমাজবিজ্ঞান তো ইতিমধ্যে আমাদের শিখিয়েছে ইতিহাস অনিবার্য ধারাবাহিক নয়, তার রূপের ছিন্নবিচ্ছিন্নতা আছে, তার নীরবতার পর্ব আছে। ইতিহাসের মানচিত্রে শুধু দিকচিহ্নই আঁকা হয় না, দিকচিহ্নলোপ করে দিয়ে সে-মানচিত্র মুছেও ফেলতে হয়।

তাই, এ-বইয়ের প্রধান উপাদান রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরচনা নয়, যদিও তাঁরা প্রত্যেকেই সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রধান লেখক ছিলেন। কিন্তু তাঁদের কাছে সংবাদ-সাময়িকপত্র ছিল মাধ্যমমাত্র। তাঁদের গদ্যরচনা স্বতন্ত্র গদ্য-গ্রন্থের মর্যাদাও পেয়েছে। এ-বইয়ের প্রধান উপাদান সংবাদ-সাময়িকপত্রের সেই নামহীন নিয়মিত রচনাগুলি, যা কখনো সংবাদ, কখনো মন্তব্য, কখনো এখনকার ভাষায় রিপোর্টাজ, কখনো সভাসমিতির বিবরণ, কখনো সাংবাদিক বিতর্ক, সম্পাদকের কাছে লেখা চিঠিপত্র, এমন-কি শোকলেখনও। এই সব রচনা কোনো নেতানির্ভর নয়, অথচ এই সব রচনাই গত্যন্তরহীন ভাবে সেই সময়ের প্রতিদিনের জীবননির্ভর। এই সব রচনা এমন-কি কোনো লেখকনির্ভরও নয়, অথচ এই সব রচনাতেই বাংলা গদ্যে নির্মিত হচ্ছিল পদবিন্যাসের রীতি, বাক্যগঠনের পদ্ধতি, বিশেষণের স্থান, সর্বনামের প্রতিনিধিত্ব, বিশেষ্যর পদবী ও সম্ভাষণ। এই সব রচনা সব সময় এমন-কি ঘটনানির্ভরও নয়, অথচ এই সব রচনাতেই বাংলা গদ্য সেই ভাষা তৈরি করতে চাইছিল যা বাঙালির তখনকার দৈনন্দিনের বিনিময়ের ভাষা হয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু এই সাংবাদিক সামাজিক গদ্য নির্মিত হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ারই ওতপ্রোত হয়ে উঠেছিল এই সন্দেহ—নাগরিক বাঙালি এই কলকাতা শহরের কতটা নাগরিক? আর, তার কি এমন কোনো নিজস্ব দৈনন্দিন আছে যা সাম্রাজ্যের আয়ত্তের বাইরে পড়ে? যে-বিনিময় বা বিতর্কের ভাষা হিশেবে, যে-সামাজিকতা বা রাজনীতির ভাষা হিশেবে সাংবাদিকতার গদ্য নির্মিত হয়ে উঠতে চাইছিল, সেই বিনিময় ও বিতর্কের, সামাজিকতা ও রাজনীতির সমগ্র অস্তিত্বটাই ছিল অনেকটা কাল্পনিক, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রয়োজন ও অনুমোদন-অনুযায়ী কাল্পনিক। অথচ ভাষা চায় ভাষারই নিয়মে এক স্বাবলম্বন। সেই প্রবণতা আর বাস্তবতার মাঝখানে গভীরতর হতে থাকে সাম্রাজ্যের সর্বগ্রাসী বিস্তার যার ওপর সেতুবন্ধন সম্ভব নয়।

তাই সাংবাদিক গদ্য নির্মিত হতে-হতেও বারবার ভেঙে যায়। কখনো ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাকে রেখে দ্বিভাষিক সংস্করণের মোড়কে গদ্যকে এক আকার দেয়া হয়। কখনো গদ্যের বিকল্পসন্ধানে পদ্যে রচিত সাংবাদিকতার চর্চা শুরু হয়, তা জনপ্রিয়ও হয়ে ওঠে। কখনো গদ্যকে সংগঠিত করে ফেলতে যতিচিহ্ন দেয়া হয়, তোলা হয়, বদলানো হয়, আবার দেয়া হয়। গদ্যের সংগঠনও হয়ে দাঁড়ায় বিসংগঠন।

কারণ, বাংলা সাংবাদিক গদ্যেও ঘটেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ক্ষমতার নিশ্ছিদ্র প্রয়োগ। উপনিবেশের জীবনের কোনো কিছুকেই সাম্রাজ্য তার ক্ষমতা প্রয়োগের লক্ষের পরিধির বাইরে যেতে দেয় না—সে একটি গ্রামের নামই হোক, আর একটি সভার বিবরণই হোক। উপনিবেশের ভাষা তার প্রভুর ভাষা নয়, তবু তার প্রভু উপনিবেশের ভাষাকে স্বাতন্ত্র্য দিতে পারে না : যেখানে সে বাঙালি পায়, সেখানে তাকে ইংরেজি শিখিয়ে মনে-মননে-রুচিতে আধা সাহেব বানিয়ে রাখে। যেখানে বাংলা পায়, সেখানে সাহেব বাংলাকে তার মতো করে বদলে নেয়। যেখানে আফ্রিকার মুসলমানদের মতো কোনো জনগোষ্ঠী ইয়োরোপের সাম্রাজ্যবিস্তারে অব্যাহত বাধা দেয় সেখানে সেই জনগোষ্ঠীকে ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখে। স্বাধীনতা আন্দোলনেও ইংরেজি জানা নেতার নেতৃত্বই হয় নিশ্চিত। যেখানে এক দেশের সঙ্গে আর-এক দেশের কোনোই মিল নেই সেখানে ব্রিটিশ ও ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ডের মতো দুই দেশকে আফ্রিকায় এক করে দিয়ে বিপর্যয় ঘটিয়ে দেয়া হয় তার লিপিতে, তার ভাষায়, উচ্চারণে। মোজাম্বিক-এর এক কবির ভাষায়, 'সাম্রাজ্যবাদের ৪০০ বছরের ইতিহাস জুড়ে ইংরেজি ভাষা হয়ে উঠেছে এক পরাক্রান্ত শক্তি, অত্যাচার আর নগ্ন শোষণের এক প্রতিষ্ঠান। যে-কালো লোকটি এই ভাষায় কথা বলে, এই ভাষা তাকে বর্ণদ্বেষী নানা শব্দার্থ দিয়ে, আর সাম্রাজ্যবাদী নানা বাণী দিয়ে, আক্রমণ করে। একজন শ্রমিক যখন হাড়ভাঙা খাটুনি খাটছে তখন ইংরেজি ভাষার শব্দ তার যন্ত্রণার, আর দুনিয়ার সবগুলো মহাদেশে জাতির পর জাতির পরাজয়ের, পরিসীমা ছকে দিচ্ছে। যে-ভাষার বদলে এই ভাষা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সেই ভাষাকে ইংরেজি ঘৃণা করেছে। এই ভাষা উপনিবেশের মানুষকে বুঝিয়েছে—সব ভাষার মধ্যে একমাত্র ইংরেজির অনুকরণই তাদের সামাজিক উন্নতি ও তাদের পরাধীন অস্তিত্বের রক্ষাকবচ। যখন আমরা 'স্ট্যাণ্ডার্ড' ভাষার যোগ্যতা বা 'মাস্টার'র কথা বলি তখন এই শব্দটিতে নিহিত তীব্র ঠাট্টা সম্পর্কে যেন সচেতন থাকি—ইংরেজি ভাষা 'মাস্টারের

ভাষা', প্রভুত্বের ভাষা, প্রভুর বর্বরতা ও হিংস্রতার বাহন'

বাংলা সাংবাদিক গদ্য কী ভাবে নিজেকে সংগঠিত করতে চাইছিল উপনিবেশের তখনো নতুন সংগঠনের মধ্যে, সে-সংগঠনকেও উপনিবেশের মালিক কোন নিয়মে বেঁধে দিচ্ছিল, উপনিবেশের মালিকের আঘাতে কোথায় ভেঙে পড়ছিল এমন-কি বাংলা বাক্যের গঠন, বা সেই মালিকের রুচিমাফিক বা সাহেব সমাজের রীতিমাফিক কোথায় পুনর্গঠিত হচ্ছিল সে-বাক্য, প্রতিদিনের বাংলা সেই গদ্যকে একদিকে সংস্কৃত মডেল আর-একদিকে ইংরেজির ছকে কেমন বেঁধে ফেলা হচ্ছিল আর গদ্য তার প্রতিদিনের ব্যবহারের ক্ষমতার জোরে সে বাঁধন সত্ত্বেও কোথায় স্বাবলম্বিতা চাইছিল—এ-বইয়ে সেই ভাঙচুরকে দেখতে চেয়েছি। এ-বই ব্রিটিশ উপনিবেশ যে-বাংলা তার সাংস্কৃতিক পার্শ্ব-ইতিহাসও নয়, এমন-কি উপনিবেশের সমাজের অভ্যন্তর থেকে কোনো উদ্‌ঘাটনও এতে ঘটে নি। সংবাদ-সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় নাগরিক হিন্দু বাঙালি নিজের জন্যে কর্মের এক কল্পনা লালন করছিল, সেই কর্মের পক্ষে প্রয়োজনীয় মননশক্তির জন্যেও নিজেকে প্রস্তুত ভাবছিল—এ-বইয়ে সাংবাদিকতার সে-ইতিহাস লেখা হয় নি। মাত্র পঞ্চাশ-ষাট বছরের মধ্যে বাংলা গদ্য, সাংবাদিক গদ্য যার অংশমাত্র, পৌঁছে গিয়েছিল সৃষ্টিশীল আত্মবিশ্বাসে—যদিও সেই সৃষ্টিশীলতা ও আত্মবিশ্বাসেও লেগেছিল উপনিবেশের গ্রহণ—গদ্যের সেই কাহিনীও এই বইয়ের লক্ষ নয়।

সাম্রাজ্যবাদের যে-শাসন আর শোষণের ভিতর সাংবাদিক গদ্যের সংগঠন-বিসংগঠন ঘটছিল তাতে ভাষাতত্ত্বের নিয়ম-অনুমান আবিষ্কারের প্রয়োগও তত স্বচ্ছন্দ থাকতে পারে না। আধুনিক ভাষাতত্ত্বের নিয়মাদি তৈরি হয়েছে মেট্রপলিটান দেশগুলির ভাষাকে ভিত্তি করে। ধাতু আর শব্দের যে-অপরিবর্তনীয় ব্যুৎপত্তির নিয়ম মেনে নিয়ে ধ্রুপদী সংস্কৃত শব্দশাস্ত্র গড়ে ওঠে—বাংলা শব্দের বেলায় তা খাটে না। আবার, গ্রামশ্চি যে 'উচ্চতর মর্যাদার ভাষাসমাজ থেকে নিম্নতর মর্যাদার ভাষাসমাজের অভিমুখে বিকিরণ'-এর তত্ত্ব দিয়ে ইতালির ভাষাগঠন বুঝতে চেয়েছিলেন, বাংলা গদ্যের বেলায় তাও খাটে না, কারণ এখানে 'উচ্চতর মর্যাদা'র সঙ্গে জড়িত ছিল সাম্রাজ্যের অপ্রতিহত ক্ষমতা আর 'নিম্নমর্যাদা'র সঙ্গে জড়িত ছিল কলোনির প্রজার বাধ্যতামূলক অধীনতা—ইতালির টাসকান-ইতালিয়ান সংঘাত থেকে তার চরিত্রই আলাদা। সস্যুর যে-অন্বয়বাদের আদি প্রবক্তা বা হোফ যে-সমাজভাষাবিজ্ঞানের কথা বলেন, তারও প্রাথমিক উপাদান ইয়োরোপীয় ভাষা।

সে-সব ভাষার উদ্ভবের ও বিকাশের ইতিহাসে সাম্রাজ্যবাদের পরাক্রান্ত প্রক্ষেপ ঘটে নি। চোমস্কির বাক্যনির্মাণতত্ত্বে বাক্যের অবয়বের গভীর আর আপাত স্তর কল্পনায় সমষ্টি-মনস্তত্ত্বের যে-সক্রিয়তা অনুমান করা হয়, হয়তো তাকে সম্প্রসারিত করে কলোনির প্রভু ও প্রজা একই বাক্যনির্মাণে কী ভাবে সক্রিয় হয়ে উঠছে বা প্রতিক্রিয়া ঘটাচ্ছে তার প্রক্রিয়া অনুমান করা সম্ভব। কিন্তু সেই তত্ত্ব নিয়ে এখনো তেমন প্রয়োগ পরীক্ষা শুরুই হয় নি। কলোনির ভাষা হিশেবে বাংলা সাংবাদিক গদ্যের পরবশতা ভাষাবিজ্ঞানের সংস্কৃত বা ইয়োরোপীয় নিদর্শন দিয়ে সর্বত্র, সূত্রবদ্ধ করা যায় না। 'তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব' ও 'ঐতিহাসিক শব্দতত্ত্ব'—এর সূত্র, কলোনির ভাষা ও সাম্রাজের ভাষাকে একই ইন্দো-ভারতীয় বা ইয়োরোপীয়, গোষ্ঠীর অন্তর্গত করে দেখেছিল। তাতে ভাষার আদি ঐক্যের রূপ জানা গিয়েছিল। কিন্তু ঐক্যের সেই রূপ সাম্রাজ্যের ভাষার চাপে কলোনির ভাষার রূপতত্ত্বের, মরফোলজির, বিকার বা ব্যাহতি ব্যাখ্যা করে না। বাংলা সাংবাদিক গদ্যের মতো বিশেষ একটি ঘটনা বা বিঘটনকে বুঝতে এই বইয়ে তাই বাধ্যতই এই সব তত্ত্বের নির্বাচিত প্রয়োগ ঘটাতে হয়েছে বা কোথাও-কোথাও একটি তত্ত্ব অনুমান করে নিতে হয়েছে।

বিষয় সম্পর্কে চিন্তা ও প্রয়োগকৌশল নিয়ে এত কিছুর পরও অবিশ্যি আমার কাছে কৃত্তিবাসের হনুমানের বিষণ্ণতাই সত্য—'সীতা না দেখিলু, দেখিলাম পরের শৃঙ্গার'। সান্ত্বনা এইটুকুমাত্র বানানো যেতে পারে, কারো-কারো কপালে পরের শৃঙ্গারদর্শন পর্যন্তই জোটে; সীতাদর্শন আর ঘটে না।

দেবেশ রায়

স্বীকৃতি

কলকাতায় নতুন তৈরি 'সেনটার ফর স্টাডিজ ইন সোস্যাল সায়েন্সেস'-এ শিল্পসাহিত্যের সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণায় আহূত হয়ে বাংলা সাংবাদিক গদ্যকেই আমার বিষয় হিশেবে বেছে নিয়েছিলাম। মনে আছে, আচার্য নীহাররঞ্জন রায় ও অধ্যাপক অশোক সেন-এর সমর্থনের জোর। মনে আছে, সেনটারের নির্মীয়মাণ সেই সময়টিতে, নতুন-নতুন জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজতে বিভিন্ন বিষয়ের প্রচলিত গণ্ডি ভেঙে ফেলে, বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ের প্রথাহীন সম্মিলন ঘটানোয় সেনটারের গবেষণা-কর্মীদের দুঃসাহস ও কঠিন উদ্যোগ। সেই প্রশ্রয়শীল চিন্তাসমবায়ের জোরেই এই বই তৈরি হয়ে উঠেছে—নিজের ক্ষমতার নেহাৎ সংকীর্ণতা সত্ত্বেও। ভারতবর্ষের অন্য কোনো সমতুল্য গবেষণাকেন্দ্রে শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে পঠনের সঙ্গে সমাজ-বিকাশের পঠনের বিনিময়ের এমন ব্যবস্থা নেই। সেই বিরল সুযোগের জন্যে সেনটারের কাছে কৃতজ্ঞ ও সেনটারের জন্যে গৌরব বোধ করি।

সেনটারের প্রথম ডিরেক্টর ঐতিহাসিক বরুণ দে শুরু থেকেই এই কাজটুকুকে তাঁর উৎসাহের তোড়ে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তাঁর আগ্রহের জোরে ও বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর বিদ্বান সাহায্যে সমস্যার জটিলতরতায় ঢোকার আত্মবিশ্বাস বাড়তেই থেকেছে। নানা গ্রন্থাগারের পুরনো কাগজপত্র দেখার অধিকার, কিছু মাইক্রোফিল্ম করা, এমন-কি ছাপার ব্যাপারেও, কখনো-কখনো যে-সব বিরক্তিকর বাধা এসে দুরতিক্রম্য দাঁড়ায় তা টেরই পেতে হয় নি রেজিস্ট্রার সুশান্ত ঘোষ-এর দক্ষতায়। সেটা হয়তো তাঁর কর্মকুশলতারই অংশ, কিন্তু তা যে সব সময়ই একান্ত ব্যক্তিগত ঠেকে এ বোধহয় তাঁর ব্যক্তিত্বের গুণ।

অধ্যাপক অশোক সেন সেই প্রথম ছক থেকে একেবারে শেষ খশড়া পর্যন্ত, এমন-কি, ছাপার সময়ও, ছিলেন নিয়তসঙ্গী। তাঁর সঙ্গে নানা আলাপে অনেক প্রশ্নের জবাব জানতে পেরেছি, কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা—আমার আলোচ্য বিষয়টির চৌহদ্দি বারবার মাপতে পেরেছি।

এই বইয়ের কোনো-কোনো অংশ নিয়ে নানা সময়ের নানা সেমিনারে সেনটারে অধ্যাপক সুনীলকুমার মুন্সী, অধ্যাপক অমলেন্দু গুহ, অধ্যাপক নৃপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক অমিয় বাগচী, অধ্যাপক পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও অধ্যাপক নির্মলা ব্যানার্জি

মতামত দিয়ে পুনর্বিচারে বাধ্য করেছেন। প্রয়াত দুই সহকর্মী ইন্দ্রাণী রায় ও হিতেশরঞ্জন সান্যালের কথা মনে পড়ছে।

কোনো-কোনো খশড়া পড়ে প্রয়াত আচার্য নীহাররঞ্জন রায় ও দেবীপদ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক সুকুমার সেন, কবি শঙ্খ ঘোষ, অধ্যাপক শিশিরকুমার দাশ, অধ্যাপক পবিত্র সরকার, অধ্যাপক সুরজিৎ সিংহ ও অধ্যাপক অশোক সেন নির্দিষ্ট নানা পরামর্শ দিয়েছেন ও প্রশ্ন তুলেছেন। এই সব পরামর্শ ও প্রশ্নের ফলে বইটির অনেক অংশ নিয়ে বারবার ভাবতে পেরেছি ও বইটির পুরো চেহারাটাও স্থির করতে পেরেছি।

ন্যাশন্যাল লাইব্রেরির কর্মীরা, বিশেষত পুরনো পত্রিকা বিভাগের সহ-গ্রন্থাগারিক সুভাষ সমাজদার, আর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারকর্মীরা নিজেদের উৎসাহে নানা কাগজপত্র খুঁজে ও জুগিয়ে না দিলে সেগুলোর কোনো খবর জানতেই পারতাম না। সেনটারের গ্রন্থাগারিক অরুণ ঘোষ ও অন্যান্য কর্মীরা তৎপর সাহায্য করেছেন নিরলস। 'প্যাপিরাস'-এর অরিজিৎ কুমার বাংলা ছাপার কাজে যত্নলব্ধ সৌন্দর্য রক্ষা করে চলেছেন। সুবিমল লাহিড়ীর বিশেষজ্ঞতা সত্ত্বেও ছাপায় যে কিছু অসংগতি থেকে গেল, সে আমারই দোষে। কোনো কোনো অসংগতি পাঠকের সুবিধের জন্যে ইচ্ছে করেই ঘটানো হয়েছে। সূচিতে প্রধান বিষয়গুলি আলাদা করে উল্লেখিত হল যদিও বইয়ের ভিতরে সব অংশ সব সময় ঐ-রকম শিরোনামচিহ্নিত নয়।

প্রথমে নির্মল চক্রবর্তী ও পরে দেবদুলাল বণিক পাণ্ডুলিপি থেকে একাধিকবার টাইপ করে দিয়েছেন।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-গ্রন্থাগারিক, আমার ছোট ভাই, ড. ল্যাডলি রায় তাঁর পুস্তকসংগ্রহ যেমন-ইচ্ছে ব্যবহার করতে দিয়েছেন ও নামসূচি তৈরি করেছেন। প্রবাসী ছোটভাই সিদ্ধার্থ রায়-এর সযত্ননির্মিত গ্রামশ্চিসংগ্রহ বহু পরিশ্রম বাঁচিয়েছে। কল্যাণীয়া তীর্ণা সূচি তৈরিতে অনেক সাহায্য করেছে।

আমার সব রকম লেখালেখি, বা ভাবনাচিন্তাতেও, এই পনেরো বছর সমালোচক বন্ধু অরুণ সেন যে-সঙ্গ দিয়েছেন তা ব্যক্তিগতে আটকে থাকে নি, সমষ্টিতে হারিয়ে যায় নি। এই বইয়ের উৎসর্গপত্র সেই অপরিশোধনীয়তার কাছে আত্মসমর্পণ মাত্র।

দে. রা.

Their (Modern Bengali) forms of letters, their modes of spelling and their choice of words are all equally erroneous and absurd. They can neither decline a word nor construct a sentence.

Halhead, *A grammar of the Bengali language* 1778

To be the source of blessings to the immense population in India is an ambition worthy of our country. In proportion as we have found intellect sterile here, the obligation is stronger on us to cultivate it. The field is noble ; may we till it worthily.

Minute of the Governor General in Council, October 11, 1815

আমাদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে যে-সময়ে ইংরেজ মহাপুরুষেরা বাঙালিদিগকে বাংলা শিখাইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন, সেই সময়ে যে-সকল পণ্ডিতদের সহিত তাঁহাদের আলাপ ছিল, তাঁহারা সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। তখন সংস্কৃত কলেজ বাংলায় একঘরে। তাঁহারা যে সকল গ্রন্থাদি পড়িতেন তাহা এ দেশমধ্যে চলিত ছিল না। এমন কি দেশীয় ভদ্রসমাজে তাঁহাদের কিছুমাত্র আদর ছিল না। সুতরাং তাঁহারা দেশে কোন ভাষা চলিত, কোন ভাষা অচলিত তাহার কিছুই বুঝিতেন না। পণ্ডিতদিগের উপর পুস্তক লিখিবার ভার পড়িলে তাঁহারা প্রায়ই অনুবাদ করেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

...I feel, the 'behavioral sciences' are mimicking the surface features of the natural sciences ; much of their scientific character has been achieved by a restriction of subject matter and a concentration on a rather peripheral issues. Such narrowing of focus can be justified if it leads to achievements of real intellectual significance, but in this case, I think it would be very difficult to show that the narrowing of scope has led to deep and significant results.

Noam Chomsky

...and like stone-masons
stone by stone
raising high buildings
word by word
We built the thinking
and in the words there was cement
and in the words we found the way....

উপনিবেশের সমাজ

ও

বাংলা সংবাদিক গদ্য

প্রথম খণ্ড

ভূমিকা

বাংলা গদ্যভাষার বিকাশের ইতিহাস সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠেছি হয়তো, অনেক দিন ধরে গল্প-উপন্যাস লেখার চেষ্টা করতে-করতেই। গদ্যকর্মীর সঙ্গে ইতিহাসের যোগ অনেক বেশি প্রত্যক্ষ, অনেক সময় ইতিহাসের সেই প্রত্যক্ষ থেকেই তাকে রশদ সংগ্রহ করতে হয়, উপকরণের রশদ।

যে-কোনো ভাষারই প্রধান শক্তি নিহিত থাকে তার সৃষ্টিশীলতায়। শব্দের পর শব্দ খুঁজে-খুঁজে নিজেই বোধ-বোধির গহনের সত্যকে জানা ও মূর্ত হতে দেখার কঠিন বৃত্তিতে, সফলতা-বিফলতার কথা না ভেবেই সব শব্দকর্মীকে ব্যস্ত থাকতে হয়। এই প্রক্রিয়াতে তার কাছে শব্দের গোপন অর্থ ঝলসে ওঠে, শরীর থেকে সমস্ত অব্যবহিত সরিয়ে দিয়ে শব্দ দীপ্যমান হয়ে ওঠে। আদি প্রত্যয়ে শব্দের সহসা পুনরুদ্ধার ঘটে, যেন তার ওপর থেকে পরবর্তী ইতিহাস ঝরে গেছে। আবার, এর বিপরীতে, শব্দের উৎসকে তুচ্ছ করে ইতিহাসের অনিবার্যতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, দৈনন্দিন কর্মময় ব্যবহারের স্পর্শে শব্দের শরীরে ভাস্কর্য ফোটে, শব্দের সমস্ত গোপনতা খসে যায়।

কিন্তু গদ্যকর্মীকে এই ভাষার ইতিহাস বহন করতে হয় তার প্রতিটি বাক্যে। বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে, কোনো নির্দিষ্ট বাস্তবতার ভাষারূপে, কোনো বিমূর্তনের চেষ্টায়, এমন-কি, কোনো নিছক বিবরণেও আজকের গদ্য তার শতাব্দী-শতাব্দী ধরে আসা ইতিহাসকে অগ্রাহ্য করতে পারে না।

ইতিহাসের কাছে এই অনিবার্য বন্ধনেও বাংলা ভাষার কোনো গদ্যকর্মী অস্থির হয়ে উঠতে পারেন ক্রিয়াপদের স্বল্পতায়, বিশেষণের স্থানগত অপরিবর্তনীয়তায়, ইংরেজি ব্যাকরণে যাকে বলে নাউন ক্লজ, অ্যাডজেকটিভ ক্লজ, সেই সব ক্লজের অসঙ্গতিতে, এমন-কি, একটু বেশি বিশেষ্য-ব্যবহৃত বাক্যে সর্বনামের অনিশ্চিত প্রয়োগেও।[১]

অথচ আমাদের সংস্কৃতির ইতিহাসে গত প্রায় দুশো বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদের একটি হল এই বাংলা গদ্য। সাহিত্যিক বাংলা গদ্যের জন্ম তো বঙ্কিমচন্দ্রে, মাত্র সোয়াশো বছর আগে। আজ সে-গদ্যের ধারণক্ষমতা, নমনীয়তা, রূপবৈচিত্র্য এমন যে মনন ও কল্পনার, অনুভব-উপলব্ধির ভুবনের কোনো কিছুই তার প্রকাশক্ষমতার অতীত নয়।

কিন্তু শব্দের অর্থের নির্দিষ্টতা, বাক্যের গঠনের নির্দিষ্টতা, এমন-কি যতিচিহ্নের ব্যবহারবিধির নির্দিষ্টতার অভাবে বাংলা ভাষায় মননের জটিলতা, বস্তুর প্রত্যক্ষতা সমতুল্য ভাবে প্রকাশিত হতে চায় না।[২] এ অভাব পরিভাষার অভাব নয়। কর্মের বৈচিত্র্যে ব্যবহৃত হলে ভাষায় যে-বৈচিত্র্যের ধারা আসে, যাঁরা সে-ভাষায় কথা বলেন তাঁদের সকলের আত্মসম্মানের সঙ্গে জড়িত হলে ভাষার যে-নিশ্চয়তাবোধ আসে, সকলের পক্ষে বিকল্পহীন হলে ভাষায় যে-বহুলতা আসে—বাংলা গদ্যভাষা তার সব-কিছু থেকেই বঞ্চিত।

গদ্যের প্রকাশক্ষমতা বার বার তার শক্তি সংগ্রহ করে কর্মে ব্যবহারের অভিজ্ঞতা থেকে, যে-কৃষকদের মধ্যে ভাষার বাচন সংরক্ষিত হয়ে থাকে তাঁদের নিয়ত সহযোগে, ও একই কারণে, মেয়েদের বাগভঙ্গির অনুকরণে। জন্মক্ষণ থেকে বাংলা গদ্য এই তিনটি উৎস থেকেই বঞ্চিত। পরাধীন একটি দেশে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অধীনে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরই প্রাথমিক প্রয়োজনে, এক হঠাৎ তৈরি রাজধানী মহানগরে বাঙালিকে তার গদ্যভাষা আবিষ্কার করতে হয়েছিল। আর, তার পর সেই ভাষাকে আশ্রয় করে অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে এক পরিণত গদ্যসাহিত্য সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলছিল।

আমার জিজ্ঞাসা ছিল, বাংলা গদ্যের সেই আদিপর্ব নিয়ে। বাংলা গদ্যের বহুলতম ব্যবহার ঘটেছে যে-সাময়িক পত্রে, সংবাদপত্রে, সেই আদিযুগে বাংলা গদ্যভাষা কোন আকারে গড়ে উঠছিল, সেই প্রক্রিয়াটি বুঝতে চাইছিলাম সমাজের বিকাশের প্রক্রিয়ার সঙ্গে মিলিয়ে। সাংবাদিকতা এক অর্থে সমাজের কণ্ঠস্বর। অথচ বাংলা সাংবাদিকতা যখন সবে শুরু, ইংরেজ আগমনের পরবর্তী বাঙালি সমাজও তখন নতুন বিন্যস্ত হতে সবে শুরু করেছে। যে-সমাজের কণ্ঠস্বর তখনো তৈরি হয় নি, সে-সমাজে কী ভাবে সাংবাদিকতার ভাষা তৈরি হচ্ছিল? তখন পর্যন্ত অগঠিত সেই সমাজের নানা অংশের কাছেই কি সংবাদ বা মতামত পৌঁছে দিচ্ছিল এই বিভিন্ন সংবাদ-সাময়িকপত্র? যেমন, ইংরেজ ও খ্রীস্টান ধর্মের প্রতি অনুরাগীদের জন্যে 'সমাচার দর্পণ', বাঙালি ও হিন্দুধর্মের প্রতি সহানুভূতিশীলদের জন্যে 'সমাচার চন্দ্রিকা', সরকারি চাকরি ও স্বাধীন ব্যাবসা সম্পর্কে আগ্রহীদের জন্যে 'বেঙ্গল স্পেকটটর' বা 'জ্ঞানান্বেষণ', ভারতীয়তা ও ইয়োরোপীয়তার ভেতর এক আপসপন্থীদের জন্যে 'তত্ত্ববোধিনী'? বা আরেকটু জটিল করে ভাবা যায়—হিন্দুত্ব বা খ্রীষ্টানত্ব নিরপেক্ষ ভাবেই নতুন এক নাগরিক সমাজের জন্যে 'সম্বাদ ভাস্কর' বা 'সংবাদ প্রভাকর' ও আরো পরের 'সোমপ্রকাশ'। কিন্তু এ-ধরনের

সুনির্দিষ্ট অংশে সমাজ ভাগ হতে পারে বিকাশের একটি বিশেষ স্তর পেরিয়ে। যে-সমাজের নিজের যুগের ভাষা বা লেখার ভাষাই তখনো তৈরি হয়ে ওঠে নি—সে সমাজের পক্ষে কি এ-রকম টুকরো-টুকরো হয়েও সামাজিক ঐক্যের আভাস দেয়া সম্ভব? অথবা—এই সমস্ত খণ্ডতা ছিল বাঙালি সমাজের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার—যখন তাঁরা নিজেদের ভিতর কোনো সমস্যার সমাধান নিয়ে তর্কে ব্যস্ত তখন তাঁরা নিজেদের খণ্ডভূমির ওপর দাঁড়িয়ে কথা বলছেন কিন্তু ইংরেজ সরকার বা কোম্পানির কাছে কোনো সুযোগ-সুবিধে আদায় করার বেলায় বা কোনো সরকারি ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়ায় তাঁরা নিজেদের খণ্ড-পার্থক্য ছেড়ে মিলিত হচ্ছেন প্রতিক্রিয়ার এক ঐক্যে? তা হলে বাংলা সাংবাদিকতার সেই আদিভাষার কি ছিল দুটি রূপ—একটি নিজেদের ভেতর কথা বলার ভাষা, আর-একটি ইংরেজের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভাষা? যে-গদ্য ভাষা তৈরিই হয়ে ওঠে নি সে ভাষা কী করে বহন করত এই দুই টান? এই গদ্যের প্রয়োজনীয় শব্দ সংগৃহীত হত কোন সঞ্চয় থেকে? সেই সঞ্চয়ই-বা গড়ে উঠছিল কেমন করে? জনসংযোগের প্রধান যে দায় এ গদ্যকে বইতে হত, তা মেটানো হত কী উপায়ে? গদ্যহীন এর পূর্ব সাহিত্যের কাছে এ গদ্য কতটা সাহায্য পেয়েছিল বা কতটা পেছুটান এর বিকাশকে ব্যাহত করেছিল?

এই সব নানা প্রশ্নের জবাব খোঁজার গত প্রায় বারো-তেরো বছরের চেষ্টার পর নিজের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েও বড় জোর বলা চলে—এখানে এই প্রশ্নগুলিই মাত্র উত্থাপন করা গেল, উত্তরের ধারেকাছেও পৌঁছনো যায় নি।

পরিকল্পনা ও বিষয়বিন্যাস

এই ধরনের আলোচনায় প্রধান সমস্যা পদ্ধতি নিয়ে। সময়ের একটি সংকীর্ণ চৌহদ্দিতে বিষয়কে অতিনির্দিষ্ট করে নিলে খানিকটা নিরাপদ বোধ করা যায়। কিন্তু এত দীর্ঘ একটি পর্ব নিয়ে আলোচনায় তথ্যসূত্র ক্রমেই বাড়তে থাকে এবং লেখকের প্রধান দায়িত্ব হয়ে ওঠে সেই তথ্যগুলিকে এমনভাবে বিন্যস্ত করা যাতে সেই বিন্যাস থেকেই তথ্যের অন্তর্নিহিত অর্থের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

বেশ কয়েকটি খশড়ার পর যে-ভাবে বিষয়টিকে বিন্যস্ত করা গেল—তার স্বসম্পূর্ণতা বা অনিবার্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ নই। প্রসঙ্গান্তর, পুনরুক্তি এই সব দোষ ছড়িয়ে আছে।

কলকাতা নগরের প্রতিষ্ঠা তার বিভিন্ন অঞ্চলের বিকাশ, জনবিন্যাস, বাঙালি

এলাকার বিস্তার, নাগরিক সংস্কৃতির পরিবর্তমান আকাঙ্ক্ষা—এই সব নিয়ে একটি বড় অংশ বাদ দিতে হয়েছে সুষমতার প্রয়োজনে, যদিও বাংলা সাংবাদিকতা ও গদ্যের বিকাশের সঙ্গে কলকাতা নগরের গড়ে-ওঠার ইতিহাস ওতপ্রোত।

এখন, পুরো রচনাটিকে তিনখণ্ডে সাজানো হল।

প্রথম খণ্ড এই 'ভূমিকা', যেখানে সাংবাদিকতা, গদ্যচর্চা ও সমাজের পরিবেশের পরিচয় দেয়ার চেষ্টা হয়েছে। সমাজ, সংবাদ ও ভাষার স্থানাঙ্ক ও দ্রাঘিমা হিশেবে বাংলা গদ্যচর্চায় ক্ষুণ্ণ ধারাবাহিকতা, সাহেবদের ভারতীয় সাংবাদিকতা, সরকারের সঙ্গে সংবাদপত্রের সম্পর্ক, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আর সাহেব ও বাঙালি সাংবাদিক, সংবাদপত্রের বৈষয়িক কাঠামো, সাংবাদিকতার পেশা, বাংলা ভাষা ও পারসিক ভাষার মধ্যে বিতর্ক, বাংলা ভাষার অবস্থা, রোমান হরফ—এই প্রসঙ্গগুলি এসেছে।

দ্বিতীয় খণ্ড 'গদ্য ও সমাজ'।

এই খণ্ডের ভিতরে চারটি ভাগ আছে—'সক্রিয়তার ভিন্নতা ও গদ্যের ভিন্নতা', 'প্রতিক্রিয়ার ঐক্য ও গদ্যের ঐক্য', 'গদ্যের বিকল্প', ও 'গদ্যের সংগঠন'।—এই রকম নামকরণের কৃত্রিমতা মেনে নিয়েছি এই লোভে যে আমার বক্তব্য এতে একটা নকশা পাবে। প্রতিটি ভাগের মধ্যে আবার উপভাগ আছে।

কিন্তু এই ভাগের ফলে আমার বিশ্লেষণের পদ্ধতি নিয়ে কিছু যুক্তিসংগত সংশয়ও দেখা দিতে পারে। আমি কি তাহলে এমন কৃত্রিম কোনো সূত্র কল্পনা করে নিতে চাই যে বাইরের কোনো ঘটনায় একই ধরনের সক্রিয়তা গদ্যকে একই-ভাবে গড়ে তোলে? বা, একই ধরনের প্রতিক্রিয়া একই ধরনের গদ্যে প্রকাশিত হতে বাধ্য? গদ্যও একটি শব্দসংগঠন। সেই শব্দসংগঠনের নীতি কি এমন যান্ত্রিক-ভাবে সামাজিক সক্রিয়তা বা প্রতিক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল? তেমন ভাবলে কি ভাষার বিকাশের স্বাতন্ত্র্যকে সামাজিক বিকাশের পদ্ধতির অধীনস্থ করে ফেলা হয় না? সমাজের বিকাশ ও ভাষার বিকাশের মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক নিশ্চয়ই থাকে কিন্তু তা তো শতাব্দী সহস্রাব্দী ব্যাপৃত একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। তাকে কি সময়ের এমন সংকীর্ণ ব্যাপ্তিতে বোঝার চেষ্টা করা সংগত?

এই সবগুলি সংশয়ই ভাষার একটি বিশেষ রূপের, যেমন গদ্যের, নির্বিশেষ আলোচনায় প্রাসঙ্গিক। কিন্তু বাংলা গদ্যের বিশিষ্ট বিচারে এই সংশয় সত্ত্বেও ভাষাবিচারের সর্বজনীন সূত্র ও সন্দেহগুলির পুনর্বিচার দরকার। কারণ, পৃথিবীর অন্য সব গদ্যভাষার যে-বিকাশপ্রক্রিয়া থেকে গদ্য বিচারের সর্বজনীন পদ্ধতিগুলি তৈরি হয়ে উঠেছে, বাংলা গদ্যের বিকাশপ্রক্রিয়া তা থেকে প্রায় সম্পূর্ণ ভিন্ন।

পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষায় প্রায় হাজার বছরের সাহিত্য ইতিহাস সত্ত্বেও গদ্য তৈরি হয়ে ওঠে নি একটি সাম্রাজ্যশক্তির অভিঘাতের ফলে। ভারতেরও অন্য ভাষায় তা ঘটে নি। কিন্তু কলকাতাই যেহেতু হয়ে উঠেছিল সাম্রাজ্যবিস্তারের আরম্ভস্থান, বাংলা ভাষাকে তাই হয়ে উঠতে হয়েছিল ইংরেজদের সাম্রাজ্যবিস্তারের পরিপূরক বাহন। সেখানে সাম্রাজ্যবিস্তারের এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া ভাষাবিকাশের পদ্ধতির স্বাতন্ত্র্যকে ব্যাহত করেছে। আবার, সাম্রাজ্যশক্তির সঙ্গে বোঝাপড়ার সামাজিক প্রক্রিয়াও ভাষানির্মাণের পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। সক্রিয়তার এই ভিন্নতার জন্যেই কেরি সংগ্রহ করেন বাংলা কথোপকথনের নির্দিষ্টতা ও বাংলা শব্দ আর ভবানীচরণ সংগ্রহ করেন কলকাতায় প্রচলিত নতুন শব্দ। সক্রিয়তার এই ভিন্নতা দর্পণ ও চন্দ্রিকার গদ্যের পদবিন্যাসকেও ভিন্ন করে দেয়—বিশেষণ ও সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহার স্বতন্ত্র হয়ে যায়। ঠিক তেমনি প্রতিক্রিয়া যখন মিলে যায়—গদ্যের বাক্যগঠন ও পদবিন্যাসেও তখন মিল দেখা যাচ্ছিল। ১৮৫০-এর পর থেকে সামাজিক প্রক্রিয়া ও ভাষাবিকাশের পদ্ধতির পারস্পরিক নির্ভরতা আর বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রেও এমন পরস্পরনির্ভর থাকে না। গদ্য তখন স্বাতন্ত্র্য পেয়ে গেছে। কিন্তু ১৮৪০ পর্যন্ত সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া গদ্যের গড়নকে অতিনির্দিষ্টভাবে নিয়ন্ত্রণ করছিল। বাংলা গদ্যের প্রাথমিক পর্বের ইতিহাসে তাই সমাজ ও গদ্য অনেক বেশি সন্নিহিত থাকতে বাধ্য হয়েছিল।

এই নিবন্ধগুলির মধ্যে কার্যকারণের পরম্পরা সব সময় মানা হয় নি, অর্থাৎ পূর্ববর্তী নিবন্ধের সিদ্ধান্ত থেকেই পরবর্তী নিবন্ধ সব সময় শুরু হয় না। সেদিক থেকে নিবন্ধগুলি কখনো-কখনো স্বসম্পূর্ণ। কোনো-কোনো নিবন্ধে ইংরেজ সরকার ও কোম্পানির বিভিন্ন ব্যবস্থায় বাংলা সংবাদপত্রগুলি তাদের মতবাদগত আপাত-বিরোধ ভুলে কেমন করে একই প্রতিক্রিয়ায় একত্রিত হয়ে গেছে তার ওপরই প্রাধান্য—ভাষার কোনো বিশ্লেষণই সেখানে করা হয় নি, বরং প্রতিক্রিয়ার ঐক্যই দেখানো হয়েছে মাত্র। 'নাগরিক জীবন ও বাঙালি সমাজের প্রতিক্রিয়া' ও 'সরকারি নানা ব্যবস্থা ও সংবাদপত্র'—নিবন্ধ দুটি এই পর্যায়ে পড়ে। এই দুটি নিবন্ধ পরপর একটা বিশেষ অর্থ পাঠকের কাছে এনে দিতে পারে। আবার, কোথাও ভাষার সমাজতত্ত্বই বেশি আলোচিত হয়েছে, সঙ্গে গদ্যের বিশ্লেষণ। 'সমাচার দর্পণ' ও 'সমাচার চন্দ্রিকা' নিয়ে লেখা নিবন্ধগুলিতে সেটা দেখা যাবে। 'সমাচার দর্পণ'-এর দ্বিভাষিক সংস্করণ নিয়ে লেখা 'দ্বিভাষিক গদ্য' ও 'পদ্য-সাংবাদিকতা' নিবন্ধদুটিকে একসঙ্গে দেখলে হয়তো পাওয়া যাবে তখনকার এমন দুটি

পরিস্থিতির বিবরণ যেখানে বাংলা গদ্যকে যথেষ্ট মনে না করে তাকে কখনো অনুবাদের ভাষা হিশেবে ব্যবহার করা হয়েছে অথবা গদ্য ছেড়ে দিয়ে একেবারে পদ্যের প্রাচীন অভ্যাসের কাছে আত্মসমর্পণ করা হয়েছে। 'সাংবাদিক গদ্যে যতি-চিহ্নের ব্যবহার' নিবন্ধটিতে গদ্যের একটি উপকরণ কীভাবে একটি ঐতিহাসিক কাল জুড়ে বিবর্তিত হয়েছে—তা আমরা পরীক্ষা করতে চেয়েছি উদাহরণ হিশেবে। এই পদ্ধতিতে বাংলা গদ্যের আরো নানা উপকরণের ব্যবহারের ইতিহাসও আলোচনা করা যেতে পারে।

যে-দ্বিতীয় খণ্ড বইটির মূল অংশ সেখানে কোনো ঐতিহাসিক পরম্পরা মানা হয় নি, যদিও প্রায় প্রতিটি নিবন্ধেই সেই নিবন্ধের বিষয়ের জন্যে প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক সময়টি নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। যাঁরা সাহিত্যকর্মের জন্যেই পরবর্তীকালে প্রধান স্বীকৃতি পেয়েছেন—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ—তাঁদের এই আলোচনায় সাংবাদিক হিশেবে গ্রহণ করা হয় নি, যদিও তাঁদের প্রধান রচনা তখনকার বাংলা সাংবাদিকতাকে পুষ্ট করেছে।

বিষয়ের পরিধিকে নির্দিষ্ট করতেই যদিও উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সময় চিহ্নিত করা হয়েছে, তবু এখানে এ কথা বলে রাখতে চাই যে এ বই কোনো ভাবেই এই সময়ের সাংবাদিকতা বা গদ্যের ইতিহাস নয়।

বইটির তৃতীয় খণ্ডে দর্পণ ও চন্দ্রিকা সম্পর্কে কিছু তথ্য সাজিয়ে দেয়া হয়েছে। এই বইয়ের প্রথম দুই খণ্ডের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে আমি খুবই সন্দিহান। কিন্তু এই তৃতীয় খণ্ডটি আগ্রহীদের কিছু কাজে কোনো সময় লাগতে পারে ভেবে সান্ত্বনা পাচ্ছি।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'—দুই খণ্ড ও বিনয় ঘোষ-এর 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র'—চার খণ্ড এই বইটিতে প্রাথমিক সূত্রে হিশেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

গদ্যের আলোচনায় এই বই দুটিকে সূত্র হিশেবে ব্যবহারের প্রধান অসুবিধা—কোনো বইই ইতিহাসের যুক্তিতে সংকলিত হয় নি। দুটি বইয়েই সংকলকগণ রচনাগুলি সাজিয়েছেন ব্যক্তিগত বিচারে স্থিরীকৃত বিষয়ভাগ অস্থায়ী। ফলে যে-কাগজ থেকে উদ্ধৃতি সংকলন করা হয়েছে, সেই কাগজের সামগ্রিক চেহারা, সম্পাদকীয় নীতি, বিজ্ঞাপন ও রচনার অনুপাত ইত্যাদি কোনো কিছুই জানা যায় না। বরং সে-বিষয়ে একটা ভুল ধারণাই প্রশ্রয় পায়। যেমন, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' দেখলে মনে হতে পারে যে সমাচার দর্পণে প্রধানত দেশীয়

সংবাদই ছাপা হত। কিন্তু মূল কাগজ দেখলে বোঝা যাবে--এটা তো ঠিক নয়ই, বরং এর বিপরীতটাই বেশি ঠিক।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিনয় ঘোষ-এর সংকলন দুটিকে আমরা ব্যবহার করলেও, তাদের বিষয়ভাগ থেকে উদ্ধৃতিগুলিকে আলাদা করে নিয়েছি। বরং সেখানে মূল কাগজের মধ্যে ঐ ধরনের লেখার জায়গা কোথায় ছিল—সেটাই বিবেচনা করা হয়েছে।

বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দ

এই আলোচনায় কিছু শব্দ কয়েকটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। 'সংবাদ-সাময়িকপত্র' বলতে যেমন একদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে তখন সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না, তেমনি আবার এই আভাসটুকুও রাখা হয়েছে যে তেমন পার্থক্য থাকারই কথা। বাংলা সাংবাদিকতা ক্রমশ এই নির্দিষ্ট পার্থক্যের দিকেই এগিয়েছে। ১৮৪৩ সালে তত্ত্ববোধিনীতে সাময়িকপত্রের চরিত্র সবচেয়ে স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে। তার পর থেকে চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশক জুড়ে এই পার্থক্য ক্রমেই স্পষ্ট হতে থাকে। সাময়িকপত্র হয়ে ওঠে মন্তব্যের কাগজ আর সংবাদপত্র হয়ে ওঠে সংবাদের কাগজ। এই পার্থক্যের প্রভাব গদ্যচর্চার ওপরও পড়ে। তবুও, সংবাদপত্র অনেক সময়ই সাময়িক পত্রের মতো লেখা বের করত।

নাগরিক জীবনে 'জনমত সংগঠন', 'জনসংযোগ' ও 'নাগরিক সম্মতি সৃষ্টি'—সংবাদ-সাময়িক পত্রের কাজ—এমন কথা বার বার বলা হয়েছে। আধুনিক কালে খবরের কাগজের প্রধান কাজ খবর জানানো। আমরা যে-সময় নিয়ে আলোচনা করেছি, সে-সময় বাংলা কাগজের পক্ষে অনেক সময়ই খবর জানানোর চাইতেও প্রধান হয়ে উঠেছে নাগরিক জনমতকে প্রভাবিত করার কাজ। সেই কারণে বাংলা সাংবাদিক গদ্যের মধ্যে এক ধরনের প্রচারলক্ষণ, বা আধুনিক রাজনীতির ভাষায় 'পাবলিক রিলেশনস'-এর লক্ষণ, সে-সময় দেখা গেছে। গদ্যের রচনাভঙ্গি শুধুমাত্র লেখকই নিয়ন্ত্রণ করতেন না, উদ্দিষ্ট পাঠকদের মত-বিনিময়ের একটা দায় লেখককেও প্রভাবিত করত।

সেই কারণেই এই প্রথম পর্বের অগঠিত গদ্যে লেখকের কণ্ঠস্বর গদ্যের গড়নে প্রধান হয়ে উঠতে পারে। এই আলোচনায় গদ্য বিচারের সময় বার বার এই কণ্ঠস্বরের কথা এসেছে।[৩] 'ব্যক্তি স্বরক্ষেপ', 'স্বরক্ষেপের সুযোগ', 'কণ্ঠের বহুস্বর', 'স্বরাঘাত', 'স্বরগ্রাম', 'স্বরবিস্তার', 'স্বরসংহতি'—এই সব শব্দে গদ্যের লিখিত রূপের

সঙ্গে কথ্য-ভঙ্গির মিল দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। গদ্যের ভেতর কণ্ঠস্বরের প্রক্ষেপ কোথায় ঘটেছে ও কোথায় ঘটে নি—সেই নিরিখে বাংলা গদ্যের আদি এই রচনাগুলির স্টাইলের বাঙালি মৌলিকতা অথবা সংস্কৃত-ইংরেজি-আশ্রয় নির্দেশ করার চেষ্টাও হয়েছে। মুখের গদ্য ও লেখার গদ্যের ভিতরকার এই অন্তর্সম্পর্ককে রীতিবিচারে কী ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে—তা এখানেই একটু বিস্তারিত বলে নেয়া ভালো।

লেখকের কণ্ঠক্ষেপে বাক্যের গড়ন এমন বাঁক নিতে পারে, যা ব্যাকরণ-সমর্থিত নয়। কিন্তু বাক্যের সেই ঈষৎ অবিন্যস্ততাতেই লেখক তাঁর ব্যক্তিত্ব সঞ্চারের অবকাশটুকু তৈরি করে নেন।

গদ্যের উদাহরণ দিয়ে লেখকের এই কণ্ঠপ্রক্ষেপ প্রমাণ করা যায় না। আপাতবিচারে মনেও হতে পারে যে কণ্ঠপ্রক্ষেপের এই বৈশিষ্ট্য অনেকটাই কল্পিত। কারণ কথা বলার সময় স্বরগ্রামের ওঠানামা বা স্বরক্ষেপের ভঙ্গিতে যে-অর্থ বোঝানো যায়, লেখার সময় সেই অর্থ বোঝাতে শব্দের সাহায্য নিতেই হয়। তার ফলে, লিখিত বাক্যের কথ্যভঙ্গি নির্দেশ প্রায় অসম্ভব।

সাধারণভাবে এ কথা সত্য হলেও, বাংলা গদ্যের বিশেষ পরিস্থিতির জন্য, বাংলা গদ্যের এই প্রাথমিক পর্যায়ে অনুবাদের ভাষা হিশেবে ইংরেজি বাক্যের ক্লজ বিন্যাসের (পদবিন্যাস নয়) মডেলে বাংলা গদ্য তৈরি হওয়ায় ও সংস্কৃত পণ্ডিতরাই বাংলার প্রধান লেখক হওয়ায়, গদ্যের একটা কৃত্রিম ঠাট তৈরি হয়েছিল। দর্পণের গদ্যের আলোচনায় সেই ঠাটের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা গেছে। এই ঠাটটি যখনই ভাঙে তখনই লক্ষ করা যায়, ভাঙার অন্যান্য কারণগুলির ভেতরে একটি কারণ হতে পারে এই 'স্বরক্ষেপ'।

আবার, আধুনিক রীতিতত্ত্ব অনুযায়ী লেখকের লিখিত ভাষারীতি তাঁর কথা বলার রীতির চাইতে গঠনের দিক থেকে আলাদা নয়।[৪] আধুনিক আত্মসচেতনতার কবি-সাহিত্যিক যদিও লেখা থেকে তাঁর নিজের কণ্ঠস্বরকে প্রত্যাহার করতেই চান, তবু, মন বা চৈতন্যের যে-স্তরে প্রকাশের জন্য ভাষা তৈরি হয় ও অব্যবহিতের সঙ্গে সংযোগের যে-তাড়না ভাষার শব্দগুলিকে কোনো এক ক্রমে উচ্চারণ করে—এই দুইয়ের অবস্থান পরস্পর নিরপেক্ষ নয়, হয়তো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রও নয়।

সহজ উদাহরণে লেখার ভাষায় স্বরভঙ্গি খোঁজার একটি পদ্ধতি আন্দাজ করা সম্ভব। আমরা মুখে সাধারণত এ-রকম বলি—

সমর চৌধুরী, বর্ধমানে ছিলেন, এসেছিলেন।

এই একই বাক্য তিনটি প্রধান অর্থ বোঝাবার কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। ১. সমর চৌধুরী এসেছিলেন। এই অর্থ বোঝালে 'বর্ধমানে ছিলেন' বিশেষণ। ২. সমর চৌধুরী বর্ধমানে ছিলেন। এই অর্থ বোঝালে 'এসেছিলেন' পদ এই তথ্য জানার উৎস। ৩. সমর চৌধুরী [এতদিন] বর্ধমানে[ই] ছিলেন। এই অর্থ বোঝালেও 'এসেছিলেন' পদ তথ্য জানার উৎস। প্রথম অর্থটি বোঝাতে 'বর্ধমানের সমর চৌধুরী এসেছিলেন'—এ-রকম ভাবেও বলা হয়ে থাকে। বা 'বর্ধমানের' শব্দটি, সমর চৌধুরীর পরেও বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এতগুলো বিকল্পের ভিতর কোনোটিই আমাদের লেখার সময় আসে না। সেখানে আমরা 'যিনি বর্ধমানে ছিলেন' লিখে একটি ক্লজকে আলাদা করতে চাই। আমরা মুখেও যখন এ-রকম ক্লজ বাংলায় ব্যবহার করি তখন লিখিত গদ্যের অনুকরণে কথা বলতে চাই। এই ধরনের ক্লজ দিয়ে বাক্যকে অতিনির্দিষ্ট করার চেষ্টা ভাষাকে কণ্ঠ থেকে দূরে সরায়। এর বিপরীত প্রক্রিয়া যেখানে ঘটে যায়, অর্থাৎ ক্লজের সুনির্দিষ্টতা ভেঙে যেতে চায় সেখানে লেখকের স্বরক্ষেপের অবকাশ থাকে।

এই পদ্ধতিতে কিছু ছোট বাক্যের গড়ন দেখা যেতে পারে। বা, বড় কোনো রচনার ছোট কোনো অংশের গড়নও এই পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা যায়। অনেক সময় একটি বড় রচনার ব্যাকরণশৃঙ্খলার মধ্যে কণ্ঠস্বরের এমন প্রক্ষেপ কোনো-কোনো জায়গায় ঘটে যায়। সেই সব বিশেষ জায়গাতেও এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা চলে।

কিন্তু এমন অনেক বড় রচনা দেখা যায় যেখানে লেখকের কণ্ঠস্বর মাত্র কোনো একটি বাক্যে বা বাক্যাংশের ভিতর আবদ্ধ নয়। যদিও আমাদের মুখের ভাষা ব্যবহৃত হয় সাধারণত ছোট ছোট বাক্য তৈরির কাছে তবু অনেক সময়, কোনো ঘটনার বড় বিবরণও দিতে হয়, যেখানে একজন বক্তার কণ্ঠেই বিষয়টি বর্ণিত হতে থাকে। আধুনিক শিক্ষিত নাগরিকের গলা তেমন বর্ণনায় কিছুটা হয়তো লেখার ভাষাকে অনুসরণ করবে, কিন্তু তার স্বরক্ষেপ, স্বরাঘাত, স্বরগ্রাম, স্বরবিস্তার ও স্বরসংহতির ফলে ধীরে-ধীরে সেই বর্ণনার ভাষা মুখের ভাষাই হয়ে উঠতে থাকে। গ্রামের অশিক্ষিত মেয়েদের গলায় এমন ধারাবিবরণে, শুধু মাত্র স্বরের বিভিন্ন ব্যবহারে, সংস্কৃত অলংকারে যাকে বলা হয় কাকু, তার প্রয়োগে, অসংখ্য ক্লজের নিষ্পত্তি ঘটে যায়। এমন-কি বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের রূপভেদও স্বরক্ষেপের ভঙ্গিতে ধরা পড়ে—অর্থাৎ কোন ভবিষ্যৎ অতীতের ভবিষ্যৎ বা কোন

অতীত ভবিষ্যতের অতীত। প্রাচীন কথকতায়, পাঁচালিতে, বা বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের গলায় এই ধরনের ধারাবিবরণ হয়তো শোনা যেত। বড় কোনো রচনায় কণ্ঠস্বরের অনুসরণ ঘটছে কি না তা দেখতে পুরো অংশটির স্বরক্ষেপ প্রণালী কোনো-কোনো সময় আন্দাজ করা চলে।

একটি বড় উদাহরণ দেয়া যাক।

২৬ ডিসেম্বর ১৮২৯

টৌনহালে সভা। শ্রী শ্রী যুক্ত কোম্পানি বাহাদুরের ইজারার কাল উত্তীর্ণ হইলে হিন্দুস্থান ও চীনদেশের মধ্যে বাণিজ্যকার্য্য সর্ব্বসাধারণ হয় আর ইউরোপীয় লোকেরা এদেশে আসিয়া তালুকদারী ও কৃষিব্যবসায় করিতে পারেন এতদভিপ্রায়ে কলিকাতাবাসি কতকগুলীন সওদাগর ইঙ্গরেজ ও বাঙালী বাবুরা ইংলণ্ডের মহাসভায় দরখাস্ত পাঠাইবার পরামর্শ স্থিরনিমিত্ত গত ১৫ ডিসেম্বর মঙ্গলবার টৌনহালে এক সভা করিয়াছিলেন…এতদ্দেশীয়েরদিগের মধ্যে ঐ সভায় আর কেহ না গিয়া থাকিবেন কিন্তু কেবল শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর দ্বিতীয় শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ননাথ ইংরেজী কাগজে লিখিয়াছে অনুমান হয় বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর হইবেন…

এতদ্বিষয়ে আমারদিগের অভিপ্রায় কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করিতে অভিলাষ হইল অতএব লিখি ইউরোপীয় লোকের এ অভিলাষ অর্থাৎ ইংরেজ তালুকদার ও কৃষক হইলে তাঁহারদিগের মঙ্গল আছে বিশেষতঃ নীলওয়ালা লোকের মহোপকার হইবেক যেহেতুক ইউরোপীয় লোক এক্ষণে এতদ্দেশীয় লোকের দ্বারা ভূমি ইজারা লইয়া নির্ব্বাহ করিতেছেন ইহার পর জমীদার বা তালুকদার হইয়া সংম্পূর্ণ স্বামিত্বরূপে এদেশের দীনদুনিয়ার মালিক হইবেন সে যাহা হউক বাঙ্গালী মহাশয়েরা যাঁহারা ঐ প্রার্থনা পত্র স্বাক্ষর করিয়াছেন বা করিবেন তাঁহারদিগের ইহাতে কি উপকার তাহা জানিতে বাঞ্ছা করি…

[স. সে. ক. ১ । ১৬০]

এই উদাহরণটির প্রথম বাক্যটির গড়ন আপাতত সুশৃঙ্খল। চকিতে একবার, 'তালুকদারী', বাঙালি জিভের বানানো এই শব্দের ফলে সেই শৃঙ্খলা কৃত্রিম হয়ে উঠতে পারে না। সেই কৃত্রিমতা ব্যাহত হয় আরো দুটি-একটি পদবিন্যাসে… 'কতকগুলীন সওদাগর ইংরেজ ও বাঙালীবাবুরা!' এই পদবিন্যাসেও লেখকের কথা বলার ধাঁচ আসে। দ্বিতীয় বাক্যটিতে 'আর কেহ না গিয়া থাকিবেন', ও 'শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ননাথ [,] ইংরেজী কাগজে লিখিয়াছে [,] অনুমান হয়

বাবু…' এই দুইটি অংশে ক্লজের যে-আপাতবিপর্যয় ও লেখকের অচেতনে যে-পেরেনথিসিসের ব্যবহার, তা ঘটে যেতে পারে লেখকের স্বরক্ষেপের ফলেই।

স্টাইলের দিক থেকে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটির গুরুত্ব বেশি। লেখক বলতে চান—এদেশে ইয়োরোপীয় কলোনাইজেশনের প্রস্তাবে ইয়োরোপীয়দের স্থান থাকতে পারে কিন্তু বাঙালিরা সে-প্রস্তাব সমর্থন করছেন কেন, তাঁদের স্বার্থ কী? তাঁর বক্তব্যের কোথাও শ্লেষ নিহিত আছে। তিনি কলোনাইজেশনের প্রস্তাব সমর্থন করেন না। বক্তব্যের যে-জটিলতা তিনি আয়ত্ত করেছেন, তার যোগ্য ভাষা তাঁর দখলে নেই। তাই, 'অতএব লিখি' বলে যা লিখতে শুরু করলেন, তাতে ইয়োরোপীয় লোকদের বক্তব্যের পেছনে যে-স্বার্থবুদ্ধি কাজ করছে তার প্রমাণ হিশেবে 'নীলওয়ালা লোকের' উদাহরণেই থামলেন না, তাকে আর-একটু বিস্তৃত করে বেনামি ইজারাদারি পর্যন্ত গেলেন। শেষে বাঙালিদের প্রসঙ্গে প্রশ্নটি উত্থাপন করলেন। 'সে যাহা হউক' বলে ইয়োরোপীয় প্রসঙ্গ ও বাঙালি প্রসঙ্গ আলাদা করা সত্ত্বেও—ইয়োরোপীয় অংশ তুলনায় এত দীর্ঘ যে বাঙালি প্রসঙ্গের শ্লেষটি আর বাচ্যার্থে সঞ্চারিত হতে পারে না। কিন্তু লেখক তো এই শ্লেষটি সঞ্চারিত করলেন মনে করেই বাক্যটিকে এ ভাবে শেষ করেছেন। তাঁর এই বিশ্বাসের কারণ, 'ইংরেজ তালুকদার ও কৃষক হইলে' এই অংশটি থেকে তিনি একটি স্বরক্ষেপকে শেষ পর্যন্ত টেনে আনছেন, মাঝখানে শেষ করে দিচ্ছেন না—কথা বলার সময় আমাদের স্বরক্ষেপ শুনে যেমন বোঝা যায় বলা শেষ হয় নি—সেই স্বরক্ষেপে 'সে যাহা হউক' বলে, তিনি পরের অংশটিকে যুক্ত করেন। 'দীন দুনিয়ার মালিক' 'সে যাহা হউক' এই ধরনের পদে তাঁর অপছন্দ হয়তো কিছু আভাসিতও হয়ে থাকবে। কিন্তু এখানে লিখিত বাক্যের অংশগুলির অসমতা উদ্দিষ্ট অর্থের যে-ক্ষতি করে, তা, একমাত্র কথা বলার ভঙ্গি দিয়েই দূর হচ্ছে। অনুচ্চারিত অর্থের ব্যঞ্জনার এই রীতি 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় অনেকবারই ব্যবহৃত হয়েছে।

গদ্যচর্চার ইতিহাসে অসংগতি

যে-কোনো ইতিহাসই প্রথমত ধারাবাহিক। এই ধারাবাহিকতাতেই নতুন নতুন ধারার সংযোজন ঘটে থাকে বা পুরনো কোনো ধারা নষ্ট হয়ে থাকে। ইতিহাসের ধারাবাহিকতার এই ছকেই আদি যুগের ইয়োরোপীয় বাংলা-লেখক (মানোএল দা আসসুমচাও, হ্যালহেড, ফর্স্টার), উইলিয়াম কেরি ও শ্রীরামপুর মিশনের অন্যান্য সাহেব-লেখক, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত ও মুনশিগণ,

প্রথমযুগের সংবাদ-সাময়িকপত্রের লেখকগণ, পরবর্তী ইয়োরোপীয় লেখকগণ (মার্শম্যান প্রমুখ), রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র—এই পর্যায়ক্রমের কাঠামোতে বাংলাগদ্যের ইতিহাসকে অনুসরণ করা হয়ে থাকে। এই ইতিহাসের অন্তর্গত কোনো বিশেষ পর্ব বা লেখক বা লেখকসমাজ নিয়ে গবেষণাতেও সামগ্রিক ইতিহাসের এই কাঠামোটি স্বীকার করে নেয়া হয়।

কিন্তু গদ্যের আভ্যন্তরীণ বিচারে দেখা যায়, যে-বিশিষ্ট উপাদানগুলির ব্যবহারে ও বিন্যাসে বাংলা গদ্যের বিশেষ ধ্বনটি গঠিত হয়েছে, এই কালানুক্রমিক ধারাবাহিক ইতিহাসে, সেই উপাদানগুলির বিকাশের কোনো ধারাবাহিকতা নেই। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গদ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার প্রায় এক যুগেরও বেশি পরে রামমোহনকে যতিচিহ্নের ব্যবহার বিশ্লেষণ করতে হয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গদ্যরীতি, রামমোহন ও তৎকালীন বাংলা সংবাদ-পত্রের গদ্যের ভিত্তি হিশেবে গৃহীত হয় নি। 'সংবাদ-প্রভাকর', 'সম্বাদ-ভাস্কর'-এর বাঙালির বাংলা গদ্যচর্চার সঙ্গে যতটা মিল রামমোহনের গদ্যের বা ফোর্ট উইলিয়ামের গদ্যের, তার চাইতে বেশি মিল, কখনো-কখনো, পুরনো কবিওয়ালাদের বা পাঁচালিকারদের বাক্-রীতির।

এ থেকে অনুমান হয় যে উনিশ শতকের প্রথম ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত, বাংলা গদ্যের আদি পর্বের ইতিহাস ধারাবাহিক প্রয়াসের ইতিহাস নয়, বার বার নতুন করে আরম্ভের ইতিহাস। প্রতিটি নতুন আরম্ভই তার আগের চেষ্টা থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই একটি চেষ্টার আহৃত উপাদান ও বিন্যাস পরবর্তী চেষ্টায় ব্যবহৃত হতে পারে নি। বা প্রায় একই সময় সক্রিয় দুটি স্বতন্ত্র ধারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে গেছে।

ছাপার ব্যবস্থা যতদিন পর্যন্ত ভালো হয় নি, ততদিন এই লেখাপত্র ছাপা ও প্রচার হত খুবই কম। ফলে, অভিজ্ঞতার বিনিময়ের সুযোগও ছিল কম। কিন্তু তা ছাড়াও, এই প্রতিটি চেষ্টার পেছনে আছে আলাদা আলাদা কারণ। এমন-কি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও শ্রীরামপুরের মিশনারিদের উদ্দেশ্যের ভিতরও পার্থক্য ছিল।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনার সঙ্গে কলকাতাবাসী বাঙালিদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। সেই পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য ছিল সিভিলিয়ানদের ভেতর অধীনস্থ দেশের ভাষা সম্পর্কে কিছুটা পরিচিতির পরিবেশ গড়ে তোলা। এই পরিচিতির প্রয়োজন ছিল, যেহেতু শাসন-ব্যবস্থার সম্প্রসারণে দেশের অনেক গভীর পর্যন্ত ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধি ও

সংগঠনকে তখন যেতে হচ্ছে। কিন্তু দেশের মানুষের মুখের ভাষা জানার বিকল্প হিশেবে লিখিত গদ্যভাষাই একমাত্র আশ্রয়। যে-গদ্যভাষা তখনো দেশের ভাষার বিকাশের নিজের নিয়মে তৈরি হয়ে ওঠে নি, সেই গদ্যভাষাকে পণ্ডিত ও মুনশিদের হাত দিয়ে একটা আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তৈরি করা হচ্ছিল—যাতে দেশের লোকের মুখের ভাষা সম্পর্কে বিদেশী অফিসারদের আন্দাজের বোধ আসে ও দেশীয় লোকদেয় সঙ্গে সংযোগের জন্য সে-ভাষা দরকারি হয়ে উঠতে পারে—সাহেবদের পক্ষে, দেশবাসীর পক্ষে নয়। ফলে, প্রধানত সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ থেকে শুরু করে অভিধান সংগ্রহ ও এই দেশে প্রচলিত নানা ধরনের উপভাষার সংগ্রহ পর্যন্ত—ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গদ্যচর্চার ফল।[৫]

কিন্তু এই চর্চা তো কোনোই কাজ আসে না, বা এই গদ্যই অবলম্বন হয়ে উঠতে পারে না—যখন রামমোহন শাস্ত্র আলোচনার সময় বাংলা গদ্যে তাঁর কিছু প্রতিপাদ্য লিখতে চান। তাই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন রচনায় যে-গড়নের আভাস পাওয়া যায় তা রামমোহনের গদ্যের ভিত্তি হতে পারে না, তাঁকে নতুন বাক্‌রীতি ব্যবহার করতে হয়, নতুন পদবিন্যাস প্রবর্তন করতে হয়।

আবার এই একই সময়, যখন বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রগুলি প্রকাশিত হতে শুরু করে তখন বাঙালি সমাজের ভিতর মতবিনিময়ের প্রয়োজনে, নাগরিক সমষ্টিমত সংগঠনের দায়ে আর-এক ধরনের নতুন বাক্‌রীতির চর্চা শুরু হয়। সেই গদ্য রামমোহনের গদ্যকে তার আদর্শ হিশেবে গ্রহণ করে না। তার বদলে নিজেদের অন্য ধরনের বাক্‌রীতি গড়ে তুলতে চেষ্টা করে।

প্রতিবারই নতুন-নতুন কারণ গদ্যচর্চার নতুন-নতুন ধরন এনেছে। একটি পরিণত গদ্যভাষায় গদ্যের এই বৈচিত্র্য আসে বিষয়ের বৈচিত্র্য থেকে ও এক-এক রচনায় এক-একজন লেখকের ব্যক্তিগত দক্ষতার ফলে। বাংলা গদ্যের আদিপর্বের ধরনের এই বৈচিত্র্য সে-রকম কোনো কারণে ঘটে নি—যদিও বিষয়ের ও ব্যক্তির বৈচিত্র্য যথেষ্টই ছিল। কিন্তু বাংলা গদ্যের আকার আগে কোনো পরিণতি ও স্বীকৃতি পায় নি। সৃষ্টিশীল সাহিত্যের আধার ব্যতীত গদ্যের সেই পরিণতি ও আকার স্থায়ী হয়ে ওঠে না। বঙ্কিমচন্দ্রের আগে পর্যন্ত বাংলা গদ্য আকারগত ভাবে অস্থির।

বাংলা গদ্যের ইতিহাসের আদিপর্বে তাই কোনো ধারাবাহিকতা নেই যদিও বিদ্যাসাগর থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত গদ্যের বিভিন্ন উপকরণের বিন্যাসের একটি ক্রমিকতা আমরা এখন আবিষ্কার করতে পারি।

বিদ্যাসাগর পর্যন্ত বাংলা গদ্যে সেই ধরনের কোনো ঐক্যবোধ ছিল না। ফোর্ট উইলিয়ামের পণ্ডিতগণ, রামমোহন, 'সমাচার দর্পণ'-এর পণ্ডিত-লেখকগণ, 'সংবাদ চন্দ্রিকা'র ভবানীচরণ, 'সম্বাদ ভাস্কর'-এর গৌরীশঙ্কর, 'সংবাদ প্রভাকর'-এর শ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রত্যেকেই আলাদা-আলাদা ভাবে গদ্যের এক-একটি রীতিতে লিখতেন।[৬] তাঁদের ব্যক্তিত্বের দ্বারা সেই রীতিগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে বটে, কিন্তু বাংলা গদ্যের কোনো স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত রীতির ভিতরে সেই ব্যক্তিত্ব সক্রিয় হয় নি, বরং, তেমন কোনো প্রতিষ্ঠিত রীতির অভাবেই ব্যক্তির এই বিশেষ সক্রিয়তা প্রয়োজন হয়েছে।

অথচ বাংলা গদ্যের ইতিহাসচর্চার এই আদিপর্বেও একটি ধারাবাহিকতা আরোপ করা হয়ে থাকে। এই আরোপের ফলে এই ইতিহাসচর্চায় এই প্রাথমিক পর্বটি হয়ে দাঁড়িয়েছে কয়েকজন ব্যক্তির গদ্যচর্চার ইতিহাস।[৭] বাংলা গদ্যের ইতিহাস চর্চায় সবচেয়ে বেশি উপেক্ষিত থাকে সংবাদ-সাময়িকপত্রের গদ্য। অথচ, সংবাদ-সাময়িকপত্রের গদ্যই তো প্রথম সামাজিক গদ্য, যেখানে বিনিময়ের ও সংগঠনের দায়িত্ব গদ্যকে মেনে নিতে হয়েছিল। সংবাদ-সাময়িকপত্রেই আমরা পরিমাণগতভাবে সেই বিপুল গদ্যরচনা পাই, যার সাক্ষ্যে বাংলা গদ্যের বিকাশের চিহ্নগুলো স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে পারে।

সামাজিক অন্বয়ের ফলে সংবাদ-সাময়িকপত্রে বাংলা গদ্যের একটি সম্মতরূপ নিয়ে নানা চেষ্টা চলছিল। এই সম্মতরূপের অন্বেষণের ফলেই চল্লিশের দশক থেকে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের হাতে বাংলা গদ্য বঙ্কিমচন্দ্রের জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠতে থাকে।

সংবাদ-সাময়িকপত্রের গদ্য ছিল ধারাবাহিকতাহীন ও পরম্পরাহীন অথচ তাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। তাদের ভিতর এই পারস্পরিক পার্থক্য চিহ্নিত করা গেলে হয়তো দেখা যাবে কালপর্যায়ে বিভক্ত 'সমাচার দর্পণ', 'সম্বাদ চন্দ্রিকা', 'সম্বাদ ভাস্কর', 'সংবাদ প্রভাকর' ইত্যাদির মধ্য দিয়ে, নানা গদ্যরীতি, 'তত্ত্ববোধিনী' থেকে 'সোমপ্রকাশ'-এ একটি পরিণত গদ্যরীতির প্রাণগত ঐক্যে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে।

কোম্পানির সরকার ও ইংরেজি সাংবাদিকতা

সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশ ও গদ্যরীতির চর্চা—এই দুটি ঘটনা স্বতন্ত্র ভাবে ও একসঙ্গে ইংরেজদের সঙ্গে ভারতবাসীর সম্পর্কের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। বাংলা

সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশিত হতে শুরু হয় ইংরেজদের ইংরেজি সংবাদপত্রের প্রভাবে ও কিছুটা নিয়ন্ত্রণে। সরকারের সঙ্গে সংবাদপত্রের সম্পর্কও প্রধানত নিয়ন্ত্রিত হয় ইংরেজি সংবাদপত্রের সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রেই। বাংলা গদ্যের বিশিষ্ট রূপও ইংরেজদের দ্বারা অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে—সেটা সব সময় সংবাদ-সাময়িকপত্রের সীমার মধ্যেই আটকে থাকে নি। বাংলা সংসাদ-সাময়িকপত্র এই ভাবে উপনিবেশের ইতিহাসেরই অংশ।

সাহেবরা ইংরেজি কাগজ বের করতে শুরু করেছিলেন ১৭৮০ সাল থেকে। এই কাগজগুলিতে ইংলণ্ডের ও বিভিন্ন ভারতীয় রাজ্যের, আর সরকারি চাকরির খবর যেমন থাকত, তেমনি থাকত সরকারি ইস্তাহার, সামাজিক ঘটনা, সম্পাদকের কাছে লেখা চিঠিপত্র, জন্ম-মৃত্যু বিবাহের বিবরণ ও নানারকম বিজ্ঞাপন। অর্থাৎ সংবাদ-সাময়িকপত্র বলতে যা বোঝায় এই কাগজগুলো আজকালকার অর্থেই ছিল, তা-ই। ইংলণ্ডে সাংবাদিকতার প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্য ও বিশিষ্টতার নিরিখ কলকাতার সাংবাদিক সাহেবদের সামনে ছিল—তার ব্যত্যয়-ব্যতিক্রমসহ।

সংবাদপত্র হিশেবে এই ইংরেজি কাগজগুলির কার্যকরিতার প্রমাণও মেলে। ১৭৯৯ সালের ১৩ মে ওয়েলেসলিকে প্রেস-সেন্সর ব্যবস্থার নিয়ম চালু করতে হয় ও সামরিক সংবাদ প্রকাশ নিষিদ্ধ করে দিতে হয়। নেপোলিয়ন মিশর পর্যন্ত এসে গেছেন, টিপু সুলতানের সঙ্গে তাঁর চিঠিপত্র চলছে, উত্তর-পশ্চিম থেকে আফগান-রাজ জামাল শাহ ভারতবর্ষ আক্রমণের হুমকি ছাড়ছেন, দেশীয় রাজাদের ভিতরও কেউ-কেউ ইংরেজদের বিরুদ্ধে তোড়জোড় লাগিয়েছেন, ফরাসি রাজপ্রতিনিধিরাও ভারতবর্ষে ইংরেজ-বিরোধিতার এই সম্ভাবনাকে মদত দেয়ার ফিকির করছেন। প্রধানত সামরিক সতর্কতার উদ্দেশ্যে প্রেস-সেন্সর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছিল। ভারতে ইংরেজি সাংবাদিকতা সেই রাজনীতি ও সমরনীতিতে কিছুটা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছিল। লর্ড ওয়েলেসলি ইয়োরোপের ইঙ্গ-ফরাসি সম্পর্কের জেরকে ভারত-বর্ষের ক্ষেত্রেও টেনে এনেছিলেন—যাতে ফরাসি বিপ্লবের অনুপ্রেরণায় কোনো চিন্তাভাবনা ভারতবর্ষে শিকড় না গাড়ে। সংবাদপত্রের ওপর কড়া নিয়ন্ত্রণ তাঁর সেই মনোভাবেরই বহিঃপ্রকাশ। ভারতে সাংবাদিকতা সম্পর্কে সরকারের প্রথম ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল ইংরেজদের দ্বারা প্রকাশিত ইংরেজি কাগজগুলির জন্যেই। ওয়েলেসলির উদ্দেশ্য ছিল পত্র-পত্রিকার সংখ্যা যাতে কমে আসে। সে-উদ্দেশ্য তাঁর সফল হয় নি। অপরদিকে, প্রেস-সেন্সর ব্যবস্থা নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে একটা

মনোভাব ধীরে-ধীরে সংগঠিত হয়ে উঠতে থাকে—তাও এই ইংরেজি কাগজগুলির মধ্যে দিয়েই।

এর ফলে, কলকাতায় বসবাসকারী ইংরেজসমাজেরই একটি অংশ সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশ-সম্পাদনা সম্পর্কে সরকারি ব্যবস্থা গ্রহণের হেতু ও সেই ব্যবস্থার ফলভাগী হয়ে পড়েছিল। ১৮১৮ সাল থেকে যখন বাংলা সংবাদ-সাময়িক-পত্র প্রকাশ শুরু হয়, তখন সেগুলিও এর আওতায় পড়ে। ভারতের ইংরেজ সমাজের এই আত্মবিরোধের মূল কারণ ছিল ভারতবর্ষ সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের কোন নীতি গ্রহণযোগ্য তা নিয়ে অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে ইংলণ্ডে সামাজিক-রাজনৈতিক বিতর্ক। ক্রমেই সে-বিতর্ক ইংলণ্ডে ও ভারতে তীব্র হয়ে ওঠে। সেই বিতর্কের ব্রিটিশ-ভারতীয় সংস্করণকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে উনিশ শতকের বিশের কোঠায় কোম্পানিও পরোক্ষে কাগজ বের করতে শুরু করে। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে কলকাতার ইংরেজ সমাজের একটি অংশ ও ভারতীয় বাঙালি সমাজের একটা অংশ একপক্ষ ছিল। ইংরেজি ও বাংলা কাগজ পরস্পরের সংবাদ ও রচনা ব্যবহার করত। অপরদিকে এই একপক্ষতা প্রেস-বিষয়ক নিয়ম ও আইন-প্রণয়নে সরকারকে ১৭৯৯ সালের প্রথম সেন্সর ব্যবস্থা থেকে ১৮৭৮ সালের ভার্নাকিউলার প্রেস এ্যাক্ট পর্যন্ত বার বার প্রভাবিত করেছে। সংবাদপত্র সম্পর্কে সরকারি নীতিসম্পর্কিত প্রতিক্রিয়াতেও এই দুই রকম কাগজের ভিতর মিল দেখা যায়। সিপাহি বিদ্রোহের এক বৎসর পরে লর্ড ক্যানিং-এর ১৫ নম্বর আইনে, ১৮৭৮-এ লর্ড লিটনের ভার্না-কিউলার প্রেস এ্যাক্টে, ব্রিটিশ-ভারতীয় সরকার সাহেবি ও দেশীয় সাংবাদিকতা আর ইংরেজি ও দেশীয় ভাষা সম্পর্কে প্রায় পরস্পর বিপরীত ব্যবস্থার আইন চালু করে এই একপক্ষতা ভেঙে দিতে পারে—তার বহু আগেই অবিশ্যি ভারতবর্ষ সম্পর্কে ইংলণ্ডের সমাজের আভ্যন্তরীণ বিতর্কের অবসানে শুরু হয়ে গেছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদের টয়েনবি-কথিত সুখসমৃদ্ধির শান্তিকাল। ১৮৫৮ সালে ভারতবর্ষ যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি অংশ হিশেবে ঘোষিত হয় ও ইংলণ্ডের রাজপ্রতিনিধির মর্যাদা গভর্নর জেনারেলের ওপর বর্তায়—তখন পর্যন্ত ভারতীয় সাংবাদিকতায় ইংরেজি ও বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র, সাংবাদিক হিশেবে সাহেবদের একাংশ ও বাঙালিরা, একপক্ষভুক্ত ছিল।[৮] তাই ১৮৫৮ সাল সংবাদ-সাময়িকপত্রের ইতিহাসের একটা সন্ধিকাল ও এই পর্যায়ের বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রের সমাজতত্ত্বে ইংরেজি সংবাদ-পত্র ও সংবাদপত্র-সম্পর্কিত সরকারিনীতি, দুটি প্রধান উপাদান হয়ে উঠেছে।

কিন্তু ১৭৮০ সাল থেকে ইংরেজি ভাষায় ভারতে সাংবাদিকতা শুরু হলেও

ভারতীয় সাংবাদিকতার আরম্ভ এই বছর থেকে ধরা হয় না। তার একটি কারণ —এই কাগজগুলি ছিল ইংরেজসমাজের ভিতরের নিজস্ব ব্যাপার, ইংরেজরাই এগুলো বের করতেন, ইংরেজরাই ছিলেন এর পাঠক। গ্রেট ব্রিটেন থেকে এতদূরে তাঁদের যে-সমাজ তৈরি হয়েছিল, সেই সমাজে গ্রেট-ব্রিটেনের সামাজিক রীতির ঐতিহ্যতেই সাংবাদিকতার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। যদিও শিল্প-বিপ্লবের পরবর্তী গ্রেট ব্রিটেনের স্বাধীন শিল্পোদ্যোগের সমাজের এই ঔপনিবেশিক সংস্করণেও ছিল কলোনির বিকার। প্রধানত ইংরেজ সমাজের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার হলেও সাহেবদের এই কাগজগুলোতে এদেশের বা এ-দেশীয় সমাজের খবরও থাকত। কাঁচা পুঁজি কাঁচা মালের আড়ত আর ব্রিটিশ পণ্যের বাজার যে-ভারত তার সন্ধানে ব্যস্ত কোম্পানি আর অবাধ-বণিক সাহেবদের সমান্তরালে প্রায় একই সময় ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার সন্ধান চলছিল, ভারতবর্ষের ভিতর দিয়ে প্রাচীন প্রাচ্যের নতুন জগতের সন্ধানও চলছিল।[৯] সেই অন্বেষণের ফলেই ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত এই কাগজগুলিতে প্রাচ্যবিদ্যার চর্চা শুরু হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ থেকেই। সংস্কৃত ও পারসিক ভাষা থেকে অনুবাদ, এশিয়াটিক সোসাইটিতে স্যার উইলিয়াম জোন্‌স্‌-এর বক্তৃতা—'ক্যালকাটা মান্থলি রেজিস্টার', 'এশিয়াটিক মিসেলানি' ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হত।

কিন্তু তা হলেও এ সবই ছিল ইংরেজ সমাজেরই নিজস্ব ব্যাপার। বাঙালিদের ভেতর ইংরেজি চর্চা তখন শুরুই হয় নি। সাহেব বাড়ির সরকার-মুৎসুদ্দিরা আর যে-সব দোকানদারকে ইংরেজ খদ্দেরের সঙ্গে বেচাকেনা করতে হয় তারা, সেই প্রয়োজনে, কতকগুলি শব্দ সংগ্রহ করেছে মাত্র। বাঙালি সমাজে, এই সব ইংরেজি পত্র-পত্রিকার পাঠক হতে পারে, এমন কোনো অংশ ছিল না।

১৮১৮ সালে হেস্টিংস ১৭৯৯ সালের সেন্সর ব্যবস্থা তুলে দেন। তিনি ব্যবস্থা করেন যে সংবাদপত্রগুলিকে কতকগুলি সরকারি নিয়ম মেনে চলতে হবে। কলকাতা ও মাদ্রাজেব ভারতীয়দের একাংশের দ্বারা ও ভারতে বসবাসকারী বেসরকারি সাহেবদের দ্বারা এই ব্যবস্থা সংবর্ধিত হলেও সরকারি ইংরেজ-মহলে তীব্র মত-পার্থক্য ছিল। হেস্টিংসের চিফ সেক্রেটারি জন অ্যাডাম মনে করতেন সংবাদপত্রকে যদি কঠিন নিয়ন্ত্রণে রাখা না যায় তা হলে ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে সমূহ ক্ষতি। কোর্ট অব ডাইরেকটর্স-এর মতও ছিল অনুরূপ। তাঁরা বোর্ড অব কন্ট্রোলের কাছে হেস্টিংসের অবলম্বিত ব্যবস্থা সম্পর্কে তীব্র আপত্তি প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু এই মতপার্থক্য তখন প্রচারিত হয় নি। তার কারণ ব্রিটিশ সরকার সংবাদ-

পত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা সমর্থন করছেন এ কথা প্রকাশ হয়ে পড়লে সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ব্রিটিশ জনসাধারণের ভেতর বিরূপতা দেখা দিতে পারত।[১০]

হেস্টিংসের এই ব্যবস্থার ফলে কলকাতায় ইংরেজি সাময়িকপত্র প্রকাশে নতুন উদ্যম আসে—ইতিপূর্বে কখনো সে-উদ্যম দেখা যায় নি—যদিও এই ব্যবস্থাগ্রহণের আগেই বাংলা পত্র-পত্রিকা প্রকাশ হতে শুরু করে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকারের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে ও ভারতে ইংরেজ সমাজের ভেতর তীব্র আপত্তি ছিল। খ্রীস্টান মিশনারিদের সঙ্গেও কোম্পানির সম্পর্ক খুব ভালো ছিল না। কলকাতায় সংবাদপত্রগুলি প্রকাশ করেছেন ব্রিটিশ নাগরিকগণ, তাঁরা ব্রিটেনের তৎকালীন রাজনীতিরই সম্প্রসারণ চাইছিলেন ভারতে। তাঁদের রাজ-নৈতিক-অর্থ নৈতিক উদ্দেশ্য ছিল ভারতে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার লোপ। এই উদ্দেশ্যের রাজনৈতিক সমর্থন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে বেশ জোরদারই ছিল। তাই ভারতের ইংরেজি সংবাদপত্রগুলির বেলায় ভারতের ইংরেজ সরকারকে ব্রিটেনের রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্বারা চালিত হতে হয়েছে অনেক-খানি। ফলে হেস্টিংসের রাজত্বকালে কলকাতার ইংরেজি সংবাদপত্রগুলি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। ইংলণ্ডে নেপোলিয়ান-যুদ্ধের পরবর্তী হুইগ দলের সংস্কার আলোচনা ও দার্শনিক প্রগতিবাদীদের মতবাদের প্রভাব কলকাতার ইংরেজি সংবাদপত্রের ওপর পড়ে। ১৮১৮ সাল থেকে বিখ্যাত 'ক্যালকাটা জার্নাল' প্রকাশিত হতে শুরু করে, ১৮১৯-এর জুনে 'ক্যালকাটা জার্নাল' ভারতের প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র হয়ে ওঠে। এর সম্পাদক বাকিংহাম হয়ে উঠেছিলেন ভারতের ব্রিটিশ সরকার বিরোধী জনমতের নেতা। তাঁর সঙ্গে রামমোহন রায়ের ঘনিষ্ঠতা ছিল ও তিনি বাঙালি সমাজ-সংস্কারকদের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন।

বাকিংহামের এই সরকার-বিরোধিতা ভারতের ব্রিটিশ সরকারকে এই সময়ে নানা ধরনের অস্বাস্তির ভিতর ফেলে। কিন্তু লর্ড হেস্টিংস তাঁকে ভারত থেকে বের করে দেয়ার চরম ব্যবস্থাটি নিতে কিছুতেই রাজি হন না। সরকারের চিফ সেক্রেটারি জন অ্যাডাম সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করতেন। তিনি তাঁর একটি মিনিট-এ জানিয়েছিলেন—ভারতে বসবাসকারী ইয়োরোপীয়রা ইংলণ্ডে যে-সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন,

> of sitting in judgement on the acts of Government and bringing public measures and conduct of public men, as well

> **as the concerns of private individuals before the bar of what they miscall public opinion.**

তা কখনোই ভারতে ভোগ করতে পারেন না।

ডবলু. বি. বেলি-ও তাঁর একটি মিনিটে (১০ অক্টোবর ১৮২২) এই সম্পর্কে তাঁর মত খুব পরিষ্কার করে জানান—

> **The liberty of the press however essential to the nature of a free state, is not in my judgement, consistent with character of an institution in the country or with the extraordinary nature of our dominion in India.**

ভারতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকা উচিত কি না এ-বিতর্ক শুধু সরকারি মহলেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ১৮২১ সালে 'ক্যালকাটা জার্নাল'-এর বিরুদ্ধে রক্ষণশীল টোরিমতের সমর্থক 'জন বুল অব দি ইস্ট' কাগজটি বের করা হয়। তাঁরা প্রকাশ্যেই সেন্সর ব্যবস্থার পক্ষে ওকালতি করতে থাকেন।

হেস্টিংসের রাজত্বকালের শেষে এই বিতর্ক এতটাই প্রাধান্য পায় যে ১৮২২ সালের ১৭ অক্টোবর বাংলা সরকার কোর্ট অব ডাইরেক্টর্স-এর কাছে 'a more efficient and decided control over press in India' সম্পর্কে পরামর্শ জানতে চান।

ইতিমধ্যে হেস্টিংসের রাজত্বকাল শেষ হয় ও চিফ সেক্রেটারি জন অ্যাডাম অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। তিনি ক্যালকাটা জার্নালের সম্পাদক বাকিংহামকে ভারত ত্যাগের সরকারি নির্দেশ দেন ও ১৮২৩ সালের ১৪ মার্চ সপারিষদ গভর্নর জেনারেল সংবাদপত্রের বাধ্যতামূলক লাইসেন্সের রেগুলেশন পাশ করেন ও সুপ্রিমকোর্টে পেশ করেন।

বাঙালি সাংবাদিকতা ও বাঙালি সমাজ

অ্যাডাম-রেগুলেশনের বিরোধিতাতেই ভারতীয় জনমতের প্রথম সাংগঠনিক প্রকাশ দেখা যায়। অবাধ বাণিজ্যনীতির সমর্থক ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুরের আর্থিক-বাণিজ্যিক সম্পর্কও ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সরকার-কর্তৃক প্রস্তাবিত ব্যবস্থা গৃহীত হলে স্বাধীন জনমতের বিকাশ ব্যাহত হবে—এই আশঙ্কায় তাঁরা প্রস্তাবিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেন। এই আপিলের শুনানিতে বিতর্কের প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

ইংলণ্ডের মতো ভারতবর্ষেও প্রযোজ্য হতে পারে কিনা। বিচারপতি আপিল খারিজ করে তাঁর রায়ে জানিয়ে দেন, ভারত স্বাধীন দেশ নয় সুতরাং একটি স্বাধীন দেশের আইন ও বিধি ভারতে প্রযোজ্য হতে পারে না। এই রায়ের ফলে ১৮২৩ সালের রেগুলেশন বিধিবদ্ধ হয় ও সংবাদপত্রের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয়। বাকিংহাম অবশ্য ইংলণ্ড প্রিভি কাউন্সিলের কাছে এই আইনের বিরুদ্ধে আপিল করেন। তাঁর প্রেরণায় রামমোহন রায় ও তাঁর বন্ধুরাও প্রিভি কাউন্সিলের কাছে একটি আপিল করেন। এই দুটি আপিলই প্রিভি কাউন্সিল অগ্রাহ্য করে।

১৮১৮ সাল থেকে সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে একটি বড় পরিবর্তন ঘটে। এই সাংবাদিকতার সঙ্গে বাঙালি সমাজ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল। কলকাতায় বসবাসকারী ইংরেজদের আভ্যন্তরীণ ঘটনা থেকে সাংবাদিকতা বদলে গিয়েছিল ব্রিটিশ-ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে। সরকার, কোম্পানি, কোম্পানি-বহির্ভূত সাহেবরা, বাঙালিরা—ব্রিটিশ-ভারতীয় শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর অন্তর্গত হয়ে গিয়েছিল। সাংবাদিকতাও ছিল তারই অংশ।

অবাধ বাণিজ্যনীতির সমর্থক বেসরকারি ইংরেজদের সঙ্গে, বিশেষত, 'ক্যালকাটা জার্নাল'-এর সম্পাদক বাকিংহামের সঙ্গে রামমোহন-দ্বারকানাথের ঘনিষ্ঠতার ফলে ভারতে পারসি ভাষার প্রথম সংবাদপত্র মীরাউৎ-উল-আখবর প্রকাশিত হয়। রামমোহন শুধু এর মালিকই ছিলেন না, এ-কাগজ তিনি ব্যক্তিগতভাবে সম্পাদনা করতেন ও অধিকাংশ রচনাই ছিল তাঁর লেখা। ইংরেজ জাতির অভ্যুদয় ও উন্নতি সম্পর্কে দ্বিতীয় সংখ্যাতেই তিনি যেমন প্রশংসামুখর তেমনি আয়ার্ল্যাণ্ডের ওপর ব্রিটেনের অত্যাচার সম্বন্ধেও সমালোচনায় ব্যস্ত। ২৪ এপ্রিল ১৮২২-এর 'ক্যালকাটা জার্নাল'-এ বাকিংহাম রামমোহনের ও 'মীরাউৎ-উল-আখবর'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসার শেষে নিজের সঙ্গে 'মীরাৎ-উল-আখবর'-এর সম্বন্ধ বিষয়ে লেখেন—

> The paper besides under the superintendence of a person whose great experience and extensive acquaintance with history, learning and manners of both Europe and Asia, cannot fail to be of great utility to the Editor, and to secure him from those errors to which his inexperience in this arduous undertaking would naturally expose him.

বাকিংহামের ওপর ভারতত্যাগের আদেশ-জারি ও অ্যাডাম-রেগুলেশনের দ্বারা

সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের প্রতিবাদে রামমোহন একটি অতিরিক্ত সংখ্যা প্রকাশ করে সম্পাদকীয়তে জানান যে সরকারের কাছে লাইসেন্স নেয়া বা আদালতে গিয়ে হলফনামা কবুল করে কাগজ প্রকাশ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, তাই কাগজ বন্ধ করে দিলেন।

অ্যাডাম-রেগুলেশন সম্পর্কে লর্ড আমহার্স্ট (১৮২৩-২৮) কোনো সংগতিশীল নীতি স্থির করতে পারেন নি। ১৮২৮ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ভারতের গভর্নর জেনারেল হন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পরিষদের প্রবীণ সদস্য স্যার চার্লস মেটকাফ ও পরে, ১৮৩৪-এ, যোগ দেন মেকলে। এঁরা প্রত্যেকেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জোরালো সমর্থক। বেটিঙ্ক সংবাদপত্রের ব্যাপারে কোনো নিয়ন্ত্রণ খাটাতে চান নি। ১৮৩৫ সালের ৫ জানুয়ারি কলকাতার টাউন হলে ইংরেজ ও ভারতীয়দের একটি মিলিত সভা হয়। কলকাতার শেরিফ ছিলেন সভাপতি। সরকারের কোনো ব্যবস্থার প্রতিবাদে এমন সভা এই প্রথম। দাবি ছিল, ১৮২৩-এর সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রত্যাহার। বক্তৃতায় দ্বারকানাথ ঠাকুর বলেন যে ১৮২৩-এর প্রেস রেগুলেশনের বিরুদ্ধে তিনি ও রামমোহন রায় যখন প্রিভি কাউন্সিলে আপিল করেছিলেন, তখন অনেকে ভয় দেখিয়েছিল তাঁরা "Would be hanged nextday" কিন্তু উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের রাজত্বকালে অবস্থা পাল্টেছে। এখনই আইন পরিবর্তনের যোগ্য সময়।

বেন্টিঙ্কের হঠাৎ ভারত ছেড়ে যাওয়ার পর ১৮৩৫-এর ১৫ সেপ্টেম্বর সপারিষদ গভর্নর জেনারেল মেটকাফ ১৮২৩-এর প্রেস আইন বাতিল করে সারা ভারতের জন্যে একটি মাত্র প্রেস আইন চালু করলেন। বেন্টিঙ্ক, মেটকাফ ও মেকলে এই বিষয়ে একমত ছিলেন ও তাঁদের যৌথ উদ্যোগেই এই আইন রচনা শুরু হয়।

এই আইন তৈরির সময়ও ভারতীয় সংবাদপত্রকে ইংরেজি সংবাদপত্রের সমান অধিকার দেয়া উচিত কিনা এই নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। তাতে মেটকাফ জানান,

> We ought to be very careful not to make insidious distinctions between European and native subjects···

মেটকাফের এই ব্যবস্থায় কোম্পানির কোর্ট অব ডিরেক্টরস তাঁর ওপর খুব খেপে যান এমন-কি ভারতে প্রকাশিত ইংরেজি সংবাদপত্রের মধ্যেও ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিকে এই স্বাধীনতা দেয়া উচিত কিনা এ নিয়ে সংশয় ছিল,

> We feel perfectly satisfied that an unrestrained press in the hands of designing talented and dissatisfied natives in the

interior might become a very mischievous instrument...
(*Englishman*, 3 January, 1835)

কিন্তু ১৮৩৫-এর এই আইনের সমর্থনেই ভারতে ইংরেজি-বাংলা-সংবাদপত্র ১৮৫৭ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে ও কলকাতার ইংরেজি ও বাংলা কাগজ ভারতীয় জনমতের প্রধান প্রকাশমাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভারতে বাণিজ্যের অবাধ অধিকার, কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার ও ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রকৃতি—এই বিষয়গুলি নিয়ে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে উনিশ শতকের প্রথম তিন দশকে উত্তেজিত বিতর্ক হয়েছে। সে-রাজনীতিতে ভারতীয়দের কোনো ভূমিকা ছিল না, থাকতেও পারে না। কিন্তু কোম্পানি-শাসনের পক্ষে ও বিপক্ষে ভারতীয় জনমতের প্রতিনিধিদের সমর্থন ও বিরোধিতার একটা ব্যবহারিক মূল্য দুই পক্ষের কাছেই প্রয়োজনীয় ছিল। রামমোহন-দ্বারকানাথের সঙ্গে অবাধ-বাণিজ্যের সমর্থকদের সম্বন্ধ যেমন ছিল ঘনিষ্ঠ ও তাঁদের সমর্থনকে যেমন তারা কাজে লাগিয়েছিল, তেমনি কোম্পানি-সরকার পক্ষও তাঁদের সমর্থন সংগ্রহ করেছিল রাধাকান্ত দেব প্রমুখ ব্যক্তিদের ও 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকার কাছ থেকে।

যদিও ভারতীয় এই দুই পক্ষই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রশংসায় ও সমর্থনে ছিল দ্বিধাহীন উচ্চকণ্ঠ। আলোচ্য বিষয় ছিল, ভারতীয়দের চাকরি, বিচারে জুরি ব্যবস্থা প্রবর্তন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, আইন প্রণয়নের ব্যাপারে ভারতীয় অভি-জাতদের ও ব্যবসায়ীদের পরামর্শ গ্রহণ ও ভারতে ইংরেজদের 'কলোনাইজেশন'। এই সবগুলি বিষয় নিয়েই যে বাঙালি সমাজ দ্বিধাবিভক্ত ছিল তাও নয়—অনেক-গুলি ব্যাপারে সে-সমাজ একমতও ছিল। কিন্তু ইংলণ্ডের রাজনীতির দুই পক্ষের প্রয়োজনে তাঁদের সমর্থন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে বলে, কোন্ বিষয়ে তাঁদের মতৈক্য আর কোন্ বিষয়ে তাঁদের পার্থক্য সেটা খুব জরুরি হয়ে ওঠে নি।

অন্য সব ব্যাপারে সাহেব ও বাঙালিদের জন্যে আলাদা-আলাদা ব্যবস্থা করা হলেও, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রশ্নে তার সুযোগ ছিল না। ফলে সংবাদপত্র সম্পর্কে সরকারের নীতি নির্ধারণের প্রশ্নে ইংরেজরা যে-সব সংবাদপত্র বের করে-ছেন, সেগুলিই ছিল প্রাথমিক বিচারের বিষয় কিন্তু নির্ধারিত নীতির ফলে ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার ওপর গৃহীত ব্যবস্থার প্রভাব কী হবে, সেটাই ছিল চরম বিবেচ্য।

১৮১৮ সালে হেস্টিংস-প্রবর্তিত প্রেস নিয়মের পক্ষে, ১৮২৩ সালের অ্যাডাম-

রেগুলেশনের বিপক্ষে বা ১৮৩৫ সালের ৫ জানুয়ারি কলকাতা টাউন হলের সভাতে অংশগ্রহণ থেকে ধারণা হতে পারে যে নতুন বাঙালি নাগরিক সচেতনতায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রশ্নটি হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত জরুরি প্রশ্ন। কিন্তু সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে এই সচেতনতা বাংলা ভাষার সাংবাদিকতাচর্চার অভিজ্ঞতার সঙ্গে ততটা যুক্ত নয়, যতটা কোম্পানি-বিরোধী সাহেবদের ইংরেজি সাংবাদিকতার প্রয়োজনের সঙ্গে। ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রকে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত কি না— এই বিতর্কটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল তাত্ত্বিক। বেলি সাহেবের মিনিটে (১৮২২) দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত কাগজে আপত্তিজনক বিষয়ের তালিকা ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর একটি রচনা, ('মডার্ন রিভিয়ু', নভেম্বর ১৯২৮) বিশ্লেষণ করলেও ধরা পড়ে যে বেলি সাহেবের আসল উদ্দেশ্য ছিল সংবাদপত্রের স্বাধীনতারই বিরোধিতা যাতে তাঁর স্বজাতীয়দেরই অপর অংশ ভারতীয় জনমতকে প্রভাবিত করতে না পারে— দেশীয় কাগজগুলি তার ছুতো মাত্র।

১৮৩৫-এর মেটকাফের প্রেস আইনের সময়ও মাত্র ২টি বাংলা সংবাদ-সাময়িক-পত্র— 'সমাচার দর্পণ' ও 'সমাচার চন্দ্রিকা'— ১০ বছরের বেশি, আর মাত্র ১টি— 'জ্ঞানান্বেষণ'— ৪ বছর হল, প্রকাশিত হচ্ছিল। ১৮২৩ সালে অ্যাডাম-রেগুলেশনের সময় দর্পণ মাত্র ৪-৫ বছরের আর চন্দ্রিকা ১ বছরের। রামমোহনের 'সম্বাদ কৌমুদী' বেরবার পর কোনোদিনই ভালো চলে নি— ১৮২১-এর ডিসেম্বরে প্রকাশিত হয়ে পরের বছর সেপ্টেম্বর নাগাদ বন্ধ হয়ে পরে অনিয়মিত প্রকাশিত হয়। এই বন্ধ হওয়ার কারণ কোনো সরকারি নিয়ম নয়। ১৮১৮ সালের আগস্টে হেস্টিংসের প্রেস নিয়ম চালু হওয়ার আগেই 'দিগ্‌দর্শন-সমাচারদর্পণ-বঙ্গাল গেজেটি ও ব্রাহ্মণ সেবধি' প্রকাশিত হয়েছে। আর তখন থেকে ১৮২৩ সালের এপ্রিলে অ্যাডাম-রেগুলেশন পর্যন্ত ৫-বছরে যে ৯টি বাংলা কাগজ বেরয় তার ভেতর মাত্র ৪টি কাগজ বাঙালিরা বের করেছিলেন। সে ৪টির ভেতর 'বঙ্গাল গেজেটি' মাত্র বছরখানেক চলে আর 'ব্রাহ্মণ সেবধির' মাত্র গুটি তিনেক সংখ্যা বেরয়। বাকি ৫টি কাগজই বের করেন মিশনারি সাহেবরা বা সাহেবদের সমর্থনে কোনো প্রতিষ্ঠান। তার ভিতর আবার ২টি— 'গস্‌পেল ম্যাগাজিন' ও 'খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি'— একেবারেই খ্রীস্টধর্মের প্রচার পত্রিকা।[১১] সুতরাং ১৮২৩ সালের অ্যাডাম-রেগুলেশনের সময় বাংলা সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতায় সেন্সরব্যবস্থা, প্রেস-সম্পর্কিত উদার নীতি বা সংকীর্ণ নীতি— এই বিষয়গুলি আদৌ প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে নি।

অ্যাডাম-রেগুলেশন যতদিন সক্রিয় ছিল (১৮২৩-এর এপ্রিল্ থেকে ১৮৩৫-এর

সেপ্টেম্বর) সেই ১২ বছরে ২১টি সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়েছে—সবগুলিই বাঙালি উদ্যোগে। এই সময়ে প্রকাশিত এই পত্র-পত্রিকাগুলির ভিতর একদিকে 'বঙ্গদূত', 'সংবাদ প্রভাকর', 'জ্ঞানান্বেষণ,' 'সংবাদ সভারাজেন্দ্র,' 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' প্রধানত সর্বসাধারণের পক্ষে গ্রহণযোগ্য এই পত্রপত্রিকাগুলির সঙ্গে 'বিজ্ঞান সেবধি', 'বিজ্ঞান সারসংগ্রহ'-এর মত বিশেষজ্ঞ পত্রপত্রিকাও ছিল।

রামমোহন-দ্বারকানাথ সংবাদপত্রের স্বাধীনতার যে-লড়াই লড়েছিলেন, তার গুরুত্ব ইতিহাসে যথেষ্ট হলেও বাংলা সাংবাদিকতার পক্ষে প্রাসঙ্গিক ছিল না। সেখানে অবাধ বাণিজ্যনীতির সমর্থক সাহেবদের পক্ষ হয়ে তাঁরা ভারতীয় জনমতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন মাত্র।

সংবাদসাময়িকপত্র প্রকাশের মতোই সভা বা গণআবেদনও নাগরিক সম্মতি সংগঠনের একটি উপায়। ব্রিটিশ জাতির অন্তর্দ্বন্দ্বে ভারতীয় জনমতের সমর্থন সংগঠন ছিল সেই দ্বন্দ্বের বিভিন্ন পক্ষের জন্যে দরকারি। সেই প্রয়োজনেই অ্যাডাম-রেগুলেশনের বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টে ও প্রিভি কাউন্সিলে গণআবেদন ও জনসভার অভিজ্ঞতা ভারতীয়দের জুটে যায়। বাঙালি সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজন থেকে যেমন এই নাগরিক সম্মতি সংগঠনের উপায় অবলম্বিত হয় নি, তেমনি জন্মলগ্নের এই অভিজ্ঞতাও বাংলা সাংবাদিকতায় কোনো নতুন তাৎপর্য আনতে পারে নি। 'সমাচার-দর্পণ'-এ এই রেগুলেশন সম্পর্কে কোনো বিপরীত মন্তব্য প্রকাশিত হয় নি। রামমোহন-দ্বারকানাথ যখন অ্যাডাম-রেগুলেশনের বিরুদ্ধে আবেদন করছেন তখন রামমোহনের 'সংবাদ কৌমুদী'র প্রকাশ বন্ধ। ১৮৩৫ সালে মেটকাফ অ্যাডাম-রেগুলেশনের বদলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সমর্থনে নতুন আইন তৈরি করলে, টাউন হলের সাহেব ও ভারতীয়দের সভা থেকে প্রেরিত অভিনন্দন পত্রের মেটকাফ-প্রদত্ত উত্তরটিতেই ('সমাচার দর্পণ', ২৭ জুন, ১৮৩৫-এ বাংলা-অনুবাদ প্রকাশিত) আরো স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কিত এই বিতর্ক বাংলা সাংবাদিকতার পক্ষে কত অপ্রাসঙ্গিক ছিল। সেই উত্তরটির শুরুতে সবচেয়ে বেশি জায়গা নিয়ে মেটকাফ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাবিরোধীদের যুক্তি খণ্ডন করেছেন—কিন্তু মেটকাফের সমস্ত যুক্তি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যরক্ষা ও সম্প্রসারণের নীতির ওপরই প্রতিষ্ঠিত। প্রসঙ্গত একবার মাত্র ভারতীয় সংবাদপত্রের কথা আসে—

> ···এইক্ষণে কেহ২ বিবেচনা করেন যে ইউরোপীয়েরদিগকে সে সকলই অনুমতি দিলে তাদৃশ ক্ষতি নাই বরং মঙ্গল সম্ভাবনা তথাপি তাঁহারা বোধ

> করেন যে এতদ্দেশীয়েরদিগকে তত্তুল্য অনুমতিতে অনিষ্ট সম্ভাবনা আছে কিন্তু আমি তাহাতে ভীত নহি বরং আমি ইহা নিশ্চয় বোধ করি যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের প্রতি অবিশ্বাসী হইয়া আইন করিলে অথবা স্বত্বাধিকার বিষয়ে এতদ্দেশীয় লোকেরদের পক্ষে এক আইন এবং ইউরোপীয় লোকেরদের পক্ষে প্রকারান্তর আইন করিলে অবিবেচনা ও অযথার্থ কর্ম্ম করা হয়।
>
> [স. সে. ক. ২।১৮৮]

বাংলা সাংবাদিকতাচর্চার সেই আদিপর্বে ব্রিটিশ ধনতন্ত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের একটি উপকরণ হিশেবে তাকে ব্যবহৃত হতে হয়েছে ও নতুন নাগরিক সম্মতি সংগঠনের স্বাধীন উপায় হয়েও, সেই উপায়ের প্রয়োগে পদ্ধতিতে তাকে মেনে নিতে হয়েছে ইংরেজদের নিজস্ব প্রয়োজনের চাপ।

সংবাদসাময়িকপত্রের বৈষয়িক সংগঠন

কিন্তু ইতিহাস তো শুধু কার্যকারণের যোগ বা বিয়োগ নয়—কার্যকারণের এক অনিশ্চিত সমন্বয় থেকে নতুনতর কার্যকারণের শৃঙ্খলা শুরু হয়ে যায় ও এই অচ্ছেদ্য ধারাবাহিকতা চলতেই থাকে। নির্ভেজাল বাণিজ্যের কোম্পানি ইতিহাসের অচেতন মাধ্যম হয়ে ওঠে। আর সেই বাণিজ্যের নির্ভেজাল দালালরা ইতিহাসের অচেতন বাহন হয়ে যায়। ইংরেজের সঙ্গে সম্পর্কের ভিতর দিয়ে বাঙালিদের ভিতর যে-আত্মসচেতনতার জন্ম, ইংরেজের মতো হয়ে ওঠার দায়েই তা নিঃশেষ হয়ে যেতে চায় না, তার সঞ্চয় অমোঘ হয়ে উঠতে থাকে দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের অনিশ্চিত নেপথ্যের কোনো মানসসরোবরে।

সংবাদসাময়িকপত্রের গদ্যে প্রধান দায় জনসংযোগের দায়। সিবিলিয়ানদের বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনা বা মিশনারিদের বাইবেল অনুবাদে বাংলা গদ্যের দায়দায়িত্ব সে-তুলনায় সীমাবদ্ধ ছিল। বাংলা সংবাদসাময়িকপত্র এমনি এক সময় প্রকাশিত হতে শুরু করে যখন শিক্ষা, রুচি ও আর্থিক ক্ষমতার নিরিখে কলকাতাবাসী বাঙালি জনসমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা যায় না অথচ সেই বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ হওয়ার প্রবণতা সেই জনসমাজে স্পষ্ট লক্ষ করা যায়। এইরকম একটি সমাজে সংবাদসাময়িকপত্রের গদ্যভাষা সমাজের কোন্ অংশের সঙ্গে সংযোগের আকাঙ্ক্ষা থেকে আকার নেবে?

অগঠিত নাগরিক সমাজে সম্ভাব্য পাঠকমণ্ডলীর শিক্ষা, রুচি, ভাষা ও ঐতিহ্যে গদ্যভাষার আদর্শ সন্ধানের সুযোগ থেকে বাংলা সংবাদসাময়িকপত্র যেমন

প্রথমাবধিই বঞ্চিত, অপরদিকে তেমনি, কোম্পানির ব্যাবসাবাণিজ্য ও সরকারি বিধিব্যবস্থার জন্য বাংলাভাষার ব্যবহারযোগ্য শব্দ ও বাগ্‌ভঙ্গিও সংবাদসাময়িক-পত্রগুলিতে আবিষ্কার করে যেতে হচ্ছিল।

এইভাবে দৈনন্দিন বাঙালি জীবনের অংশ হয়ে ওঠার চেষ্টাতেই সংবাদ-সাময়িকপত্রের পাতায়-পাতায় বাংলাগদ্য ভাষার জন্ম হয়ে যাচ্ছিল। কোনো নাটক-উপন্যাসের ভাষা থেকে বাংলা সাংবাদিকতার ভাষা তৈরির সুযোগ ছিল না। জনসমাজের ভিতর এই সাংবাদিকতা তৈরি হচ্ছিল, কোনো উৎপাদন-পদ্ধতির সঙ্গে নিয়ত সম্বন্ধ সেই সমাজের বুলিকে পুষ্ট করত না। কৃষি সম্বন্ধের সনাতনতা থেকে শব্দ-বা বচনসংগ্রহের কোনো উপায় ছিল না। শুধু ছিল বিদেশী ভাষাভাষী এক শাসকজাতির সঙ্গে সংযোগরক্ষার দায়। শুধু ছিল বিদেশী ভাষার শব্দ ও বাগ্‌ভঙ্গি অনুকরণের বাধ্যতা, শুধু ছিল একদিকে ইংরেজশাসকের অধীনে 'নেটিভ' ও সংস্কৃত পণ্ডিতের কাছে 'দেশী'—এই অপমর্যাদা। সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশের সমস্ত গ্লানি, অসম্মান ও ক্লিন্নতার ভিতর বাংলা সংবাদসাময়িকপত্রে বাংলা গদ্যচর্চা চলতেই থাকে। বাংলাগদ্যের পদপ্রয়োগের নির্দিষ্টতার অপুষ্টিতে, বাক্যবন্ধের শৈথিল্যে, ক্রিয়ার গাঠনিক দুর্বলতায়, বিশেষণের স্থানগত অনির্দিষ্টতায়, বচনের রক্তহীনতায় ও অতিকথনের শোথে বাংলাগদ্যের শরীরে জন্মের এই দোষ লেগে গেছে।[১১] আবার জন্মের এই দোষকে অতিক্রম করার নিয়তসংগ্রাম বাংলা গদ্যের প্রায় দুই শ বছরব্যাপী চর্চার ইতিহাসে এক মহত্ত্ব এনেছে।

১৮১৯ সালে প্রকাশিত ভারতবর্ষের প্রথম দৈনিক পত্রিকা 'ক্যালক্যাটা জার্নাল'-এর সঙ্গে সরকারের বিরোধিতা যেমন একদিকে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার প্রশ্নটিকে ব্রিটিশ-ভারতীয় সমাজজীবনে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছিল, তেমনি 'ক্যালকাটা জার্নাল'-এর ব্যবসায়িক সাফল্য কলকাতায় সাংবাদিকতাকে লাভজনক পেশায় পরিণত করে।

সংবাদপত্রের বৈষয়িক সংগঠন সম্পর্কে ইংরেজদের অভিজ্ঞতা ছিল। ইংলণ্ডে প্রচলিত সেই সংগঠনেরই আদর্শ তাঁরা কলকাতাতেও অনুসরণ করেছেন। নির্দিষ্ট টাকার মূল্যে শেয়ার বিক্রি করে, সেই বিক্রীত শেয়ারের দ্বারা সংগৃহীত অর্থের পুঁজি খাটিয়ে কাগজটির ব্যাবসা চালাবার জন্য কোম্পানি গঠিত হত। অনেকক্ষেত্রেই একটি কাগজের শেয়ার পরে হস্তান্তর হয়েছে, মালিকানাও বদলেছে। ইংরেজি সংবাদপত্র ব্যবসার দিক থেকে কতটা লাভজনক ছিল সে-বিষয়ে হিসেবনিকেশ করলে নিশ্চয়ই এ কথা বলা যাবে না যে সংবাদপত্র প্রকাশকে খুব ভালো ব্যাবসা

হিশেবে তখনকার ইংরেজরা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এ কথা নিশ্চয়ই বলা যাবে যে সংবাদপত্র প্রকাশকে প্রথম থেকেই তাঁরা ব্যবসায়িক সংগঠনের ওপর স্থাপন করেছিলেন।

ইংরেজ মিশনারিরাই প্রথম বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু বাংলা সংবাদপত্রের বৈষয়িক সংগঠন তাতে কোনো নির্দিষ্ট চেহারা পায় নি। তার একটি কারণ, শুরুতে রাজনৈতিক-ব্যবসায়িক কোনো উদ্দেশ্য বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশের প্রেরণা ছিল না। রাজনীতি ও ব্যাবসাবর্জিত বিশুদ্ধ সমাজসংস্কার, কখনো বা ধর্মসংস্কার, কখনো শিক্ষাসংস্কার, বাংলা সংবাদসাময়িকপত্রের ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল। সংস্কৃত শ্লোকে সেই সৎ-উদ্দেশ্য ঘোষিত হত সংবাদসাময়িকপত্রের শিরোভূষণ রূপে। ফলে সংবাদপত্রের কোনো পুঁজিসংগ্রহের স্বীকৃত ব্যবস্থা ছিল না। পরন্তু, শ্রীরামপুরের মিশনারিরা তাঁদের নিজেদের প্রেসে ছাপার ব্যবস্থা করেছিলেন। কাগজের লেখার জন্য তাঁরা দেশীয় পণ্ডিতদের ভেতর থেকে বাংলা-লেখকদের একটি শ্রেণী তৈরি করেছিলেন। এই পণ্ডিত লেখকদের ওপর তাঁদের নির্ভরতা এতটাই ছিল, কখনো ছুটির পর পণ্ডিতরা যদি না আসতেন তা হলে কাগজের প্রকাশ বন্ধ থাকত ('সমাচার দর্পণ', ২৬ অক্টোবর, ১৮৩৩)। এই পণ্ডিতদের ভূমিকা সম্পর্কে ১৮৩৫ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি *Friend of India* মন্তব্য করেছিলেন :

> "The Durpan upon which the natives are accustomed to look with complacency, owed whatever purity of style, or happiness of expression it may possess, to the revision of the pundit ; and the editor claims no merit beyond that of being able clearly to convey his own meaning and to appreciate the suggestion of his learned native associate."

'সমাচার দর্পণ'-এর সম্পাদকীয় কাজের সঙ্গে যুক্ত দুইজন সংস্কৃত পণ্ডিতের কথা 'সমাচার দর্পণ'-এই স্বীকৃত হয়েছে—২ জুলাই ১৮৩৬, ও ৫ জুলাই ১৮২৮ ('বাংলা সাময়িক পত্র', ১ম খণ্ড, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)।

রামমোহন রায় যখন 'সংবাদ-কৌমুদী' প্রকাশ করেন, তখনো তিনি সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশের এই ত্রিস্তর বৈষয়িকধারাটি—অনুগ্রাহক-পৃষ্ঠপোষক, সম্পাদক-প্রকাশক, লেখক-পণ্ডিত—অবলম্বন করেছিলেন। তারাচাঁদ দত্ত, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরিহর দত্ত, তাঁর পক্ষ থেকে কৌমুদী প্রকাশের দায়িত্ব নেন।

পরে প্রকাশক ও সম্পাদকের নানারকম পরিবর্তন হয়। শেষে রামমোহন বিলাত-যাত্রার পর তাঁর ছেলে রাধাপ্রসাদও কিছুদিন সম্পাদনা-প্রকাশনার দায়িত্ব নেন।

১৮২৯ সালে 'বেঙ্গল হেরাল্ড' পত্রের বাঙলা, 'বঙ্গদূত' প্রকাশিত হয়। 'বেঙ্গল হেরাল্ড' পত্রের স্বত্বাধিকারী ছিলেন আর. এম. মার্টিন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামমোহন রায়, নীলরতন হালদার ও রাজকৃষ্ণ সিংহ। নীলরতন হালদার 'বঙ্গদূত'-এর সম্পাদক ছিলেন।

পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের পৌত্র নন্দকুমার ঠাকুরের বড় ছেলে যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর ছিলেন 'সংবাদ প্রভাকর'-প্রকাশে ঈশ্বরচন্দ্রের সাহায্যকারী ('বাংলা সাময়িকপত্র' ১, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৩৩)। "তাঁহারই ব্যয়ে 'সংবাদপ্রভাকর' প্রথমে চোরাবাগানের একটি মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইত। কয়েকমাস পরে···ঠাকুরবাড়িতে 'সংবাদপ্রভাকর' মুদ্রণের জন্য একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়" (ঐ)। যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের মৃত্যুর পর কিছুদিন বন্ধ থেকে প্রভাকর আবার প্রকাশিত হতে থাকে কানাইলাল ঠাকুর ও গোপালচন্দ্র ঠাকুরের অর্থসাহায্যে। পরে ১৮৩৯-এ আঢ্য পরিবারের সমর্থনে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' ও আন্দুলের জমিদার শ্রীনাথ মল্লিকের সমর্থনে 'সম্বাদ ভাস্কর' প্রকাশিত হয়। ভাস্করের পেছনে সাতু-বাবুও (আশুতোষ দেব) ছিলেন।

পৃষ্ঠপোষক সংগ্রহ নিয়ে বাংলা কাগজগুলোর মধ্যে রেষারেষিও নেহাত কম ছিল না। তার একটি ভালো উদাহরণ পাওয়া যায়—'সংবাদ রত্নাবলী' নামে একটি স্বল্পস্থায়ী সাপ্তাহিক কাগজকে ঘিরে। কাগজটি বেরিয়েছিল ১৮৩২-এর ২৪ জুলাই। প্রায় বিশ বছর পরে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকর'-এ জানিয়েছিলেন 'মহেশচন্দ্র পাল এই পত্রের নামধারী সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার কিছুমাত্র রচনা শক্তি ছিল না।'

'প্রথমে ইহার লিপিকার্য আমরাই নিষ্পন্ন করিতাম।··· আমরা তৎকর্ম্মে বিরত হইলে···'ঈশ্বরচন্দ্র কেন রত্নাবলীর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন সে-কাহিনী ১৮৪৫-এর ২৫ নভেম্বর 'সম্বাদ ভাস্কর'-এ লেখা হয়। সেখানেই জানা যায়, 'রত্নাবলী'র পৃষ্ঠপোষক আন্দুলের জমিদার জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিকের সমর্থন নিয়ে চন্দ্রিকাসম্পাদক ভবানীচরণের ঈর্ষা। এর আগে যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সমর্থনে 'সংবাদ প্রভাকর' বেরিয়ে দেড় বৎসর চলে। যোগেন্দ্রমোহনের মৃত্যুতে কাগজটি বন্ধ করে দিতে হয়। আন্দুলের জমিদারের ইচ্ছে ছিল ঈশ্বরচন্দ্রের সাহায্যে 'রত্নাবলী দ্বারা ধর্ম্মসভাকে সদৃশ্যা করিয়া ধর্ম্মচক্রে বসাইয়া দিবেন, কিন্তু চন্দ্রিকা নির্ব্বাহক ধর্ম্মসভা সম্পাদক

বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু বিবেচনা করিলেন রত্নাবলী দেখিয়া ধর্ম্মসভা যদি রত্নাবলী সম্পাদককে মাল্যপ্রদান করেন তবে রাজাদিগের সহিত মাল্যবিনিময়ের ঘটকতা কার্য্যে যত যত্ন করিয়াছিলেন সকলি বিফল হইবে···অতএব ধর্ম্মসভাকে আপনি আগলিয়া রাখিয়া যেমন প্রভাকর সুধাকরকে সভার নিকট প্রবেশ করিতে দেন নাই রত্নাবলীকেও সেই রূপ করিলেন।' (বা. সা. প. । ৪৮)

'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র এই ত্রিস্তর সংগঠন খুব নির্দিষ্টভাবে সক্রিয় ছিল। 'জ্ঞানান্বেষণ' ছিল ইয়ং বেঙ্গলদের কাগজ। তার সম্পাদক-সমর্থকরা কেউই প্রায় ভালো বাংলা লিখতে পড়তে জানতেন না। 'জ্ঞানান্বেষণ'-এর প্রথম সম্পাদক দক্ষিণানন্দন মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে তখন একটি কাগজে মন্তব্য করা হয়েছিল, 'বাঙ্গালা লেখাপড়া কিছুই জানেন না এবং বাঙ্গালা কথা কহিতে ভাল পারেন না তাহাতে···নাই অথচ বাঙ্গালা সমাচার কাগজের সম্পাদক না হইলে নয়।' ('সম্বাদ তিমিরনাশক' থেকে 'সমাচার দর্পণ'-এ ২১ জানুয়ারি ১৮৩২-এ উদ্ধৃত। 'বাংলা সাময়িকপত্র' ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৪০) 'জ্ঞানান্বেষণ'-এর পণ্ডিত-লেখক ছিলেন গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, পরবর্তীকালে 'সম্বাদ ভাস্কর'-এর সম্পাদক হিশেবে তিনি বাংলা সাংবাদিকতার একজন প্রধান কর্মী। 'জ্ঞানান্বেষণ'-এ ত্রিস্তর সংগঠন বাধ্যতই অনেক বেশি নির্দিষ্ট ছিল। দক্ষিণারঞ্জনের পর রসিককৃষ্ণ মল্লিক, মাধবচন্দ্র মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ ইয়ংবেঙ্গলের এঁরাও কাগজটিতে সক্রিয় ছিলেন। কিন্তু এঁরাও কেউ বাংলা লিখতে-পড়তে জানতেন না। ১৮৩৩ থেকে ইংরেজি-বাংলা এই দুই ভাষাতে 'জ্ঞানান্বেষণ' ছাপা হতে থাকে। ত্রিস্তর সংগঠনের ভিতরকার বাধা দূর করতে এমন সমাধানের চেষ্টা আগে ও পরে বার-বারই হয়েছে। এই ধরনের সমাধান ত্রিস্তর সংগঠনের সমস্যাই আরো প্রমাণিত করে। কিন্তু মাতৃভাষা-অনভিজ্ঞ শিক্ষিত বাঙালির কাছে, বাংলা-না-জানা সাহেবদের মতোই এ-ছাড়া যেন কোনো উপায় ছিল না। তাই, 'জ্ঞানান্বেষণ'-এর পরও ১৮৪২-এ রামগোপাল ঘোষ 'বেঙ্গাল স্পেকটেটার' প্রকাশ করেন ইংরেজিতে ও বাংলায়। প্রায় দেড় বছরের ওপর মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক হিশেবে বেরিয়ে কাগজটি বন্ধ হয়ে যায়। শেষ সংখ্যায় কাগজটি কেন বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে তার কারণ ও প্রকাশের ইতিহাস থেকে তখনকার বাঙালি-প্রকাশিত এই ধরনের কাগজের সংগঠন সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

> ১৮৪২ সালের এপ্রিলে মাসাবধি বেঙ্গল স্পেকৃটেটার পত্র মাসিকপত্রিকা-রূপে প্রকাশ হয়, প্রোপ্রাইটরদিগের এতদ্দ্বারা লাভ করণের ইচ্ছা না থাকাতে

ঐ বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসাবধি পক্ষান্তে প্রকাশ হইতে লাগিল এবং যদিও গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হয় নাই এবং আয় দ্বারা ব্যয় নির্ব্বাহ হইত না তথাচ প্রোপ্রাইটরেরা এই পত্রিকা বিশেষরূপে দেশোপকারিণী করণাশয়ে ১৮৪৩ শালের মার্চ্চ মাসাবধি সাপ্তাহিক করিলেন তাঁহারা প্রায় ৮ মাস পর্য্যন্ত ইহা হইতে ব্যয় নির্ব্বাহ হয় কিনা পরীক্ষা করিতেছিলেন কিন্তু শেষে দেখিলেন ইহাতে সহস্র মুদ্রার অধিক ক্ষতি হইয়াছে। সাপ্তাহিক হওয়াতে যদিও গ্রাহকবৃদ্ধি হইয়াছিল তথাচ তদ্দ্বারা সমুদায় ব্যয় নির্ব্বাহ হইত না আর যে অভিপ্রায়ে এই পত্র সৃষ্টি হয় অর্থাৎ এতদ্দেশীয় সাধারণ লোকে পাঠ করিবে এবং সকলে নানা বিষয়ের উপর লিখিবে তাহা হইল না অতএব··· অদ্যাবধি এতৎপত্র প্রকাশ স্থগিত করা গেল···

[বা. সা. প. । ৭৮-৮০]

এ-রকম স্বেচ্ছাসেবাপ্রতিষ্ঠান হিশেবে সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশের বিপরীতেই উপস্থিত করা যায় 'বেঙ্গল হেরাল্ড'-এর নানাভাষী সংস্করণের অন্যতম বাংলা সংস্করণটিকে। সেখানে যৌথ মালিকানার ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সংবাদপত্র প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছিল। বেতনভুক সম্পাদক-লেখকদের দ্বারাই এই কাগজ তৈরি হত। 'বেঙ্গল হেরাল্ড'-এর অর্থসামর্থ্যের উল্লেখ তখন অন্য পত্র-পত্রিকাতেও দেখা যেত।

'তত্ত্বোধিনী পত্রিকা'য় 'বঙ্গদূত'-এর মতোই বেতনভুক সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন, আবার, ইয়ংবেঙ্গলদের মতো তত্ত্ববোধিনীরও ছিল অনেক নিজস্ব লেখক। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক হিশেবে ১৮৪৩ থেকে ১৮৫৫-র মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্ত মাসিক ৩০ টাকা থেকে ৬০ টাকা বেতনে উন্নীত হন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রধান হওয়া সত্ত্বেও প্রথম থেকেই তত্ত্ববোধিনীর পরিচালনায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণের চেষ্টা হত। পেপার কমিটির পাঁচজন সভ্য পত্রিকায় প্রকাশিতব্য বিষয় ও রচনা নির্ধারণ ও নির্বাচন করতেন। প্রথম পাঁচ বৎসর সম্পাদক এই কমিটিতে ছিলেন না, তার পর থেকে অক্ষয়কুমারকেও সভ্য হিশেবে গ্রহণ করা হয়।

দেশের বৈষয়িক-রাজনৈতিক জীবনের কোনো কর্মসূচি বাংলা সংবাদসাময়িকপত্রের ছিল না। থাকা সম্ভবও নয়। কারণ বাঙালি-ভারতীয় মধ্যবিত্ত যে-শ্রেণী তৈরি হচ্ছিল বৈষয়িক রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্র তার জন্য খোলা ছিল না, তেমন কর্মক্ষেত্র রচনাও তার উদ্দেশ্য ছিল না। স্মৃতির অপভ্রংশ শাসিত বিকৃত গ্রামীণ মধ্যবিত্ত যখন কলকাতা শহরে বসতিস্থাপন করে নাগরিক জীবনের অপরিহার্য উপকরণ

সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশের আবেগ-উৎসাহ পায় তখন তার প্রধান আলোচ্য হয়ে ওঠে নতুন নগরজীবনে অনুসরণীয় রীতি ও ব্যবহারবিধির সঙ্গে ঐতিহ্যগত রীতি ও ব্যবহারবিধির দ্বন্দ্ব-সংঘাত, নতুন বিদেশী সরকার ও সনাতন হিন্দু ধর্মের সমর্থন বা ঐতিহ্যসমর্থিত সমাজের নতুন সংস্কার ও সামগ্রিকভাবে বাঙালি মধ্যবিত্তের বৈষয়িক উন্নতি। এ-সবই আবার শাসক ইংরেজের অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু এই সীমাবদ্ধতার ভিতর সংবাদ-সাময়িকপত্র হয়ে উঠতে পারে বাঙলা গদ্যভাষা তৈরির প্রধান কর্মক্ষেত্র।

ফলে, বৈষয়িক সংগঠনের ক্ষেত্রেও বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রের অনুগ্রাহক-সম্পাদক-লেখক সম্পর্ক খুব নির্দিষ্ট হয়ে উঠতে পারে নি। অনুগ্রাহকের কাছে সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশ সবসময় মতপ্রচারের উপায়ই নয়, টাকা খাটাবার উপায় তো নয়ই—অনেক সময়ই একটু আধুনিক বড়লোকিয়ানার মেজাজি প্রকাশ, এমন-কি কখনো-কখনো পত্রিকাপ্রকাশে ইচ্ছুক ব্রাহ্মণকে ফেরাতে না পারার সংস্কারও।

সংবাদ-সাময়িকপত্রের এই বৈষয়িক ধাঁচটিতে কার্যকরী সম্পাদকের কোনো নিরাপত্তা বা তাঁর মর্যাদার কোনো সাংগঠনিক নিশ্চয়তা ছিল না।

'সংবাদকৌমুদী'র ১৩ সংখ্যা পর্যন্ত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পত্রিকাটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার পর তিনি 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। এই কাগজ প্রকাশের বিজ্ঞাপনে তিনি 'সংবাদকৌমুদী'-সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের উল্লেখ করেন। অনুমান করা যায় 'সংবাদকৌমুদী' পত্রিকাটির কয়েকটি সংখ্যার ভিতর যে-সুনাম প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সুনামের ন্যায়সংগত ভাগ নেয়াই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।

> কলিকাতার কলুটোলা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সকল বিজ্ঞ সদ্বিবেচক মহাশয়েরদিগকে বিজ্ঞাপন করিতেছেন যে তিনি সম্বাদকৌমুদী নামক সমাচারপত্র ১ প্রথমাবধি ১৩ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশ করিয়াছেন সম্প্রতি সমাচারচন্দ্রিকা নামক এক পত্র প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে নানা-দিগ্‌দেশীয় বিবিধ সমাচার অনায়াসে জানা যায় ('সমাচার দর্পণ', ২৩ মার্চ ১৮২২)।
>
> [বা সা. প. । ২১]

"এই বিজ্ঞাপনটি বাহির হইবার এক সপ্তাহ পূর্বে—১৫ মার্চ তারিখে 'ক্যালকাটা জার্নাল'-এও ভবানীচরণ একই মর্মে একটি ইংরাজী ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছিলেন" (বা. সা. প. । ২২), তার উত্তরে 'সম্বাদকৌমুদী'-র পক্ষ থেকে একটা পাল্টা বিজ্ঞাপনে জানানো হয়,

The Editor of the *Sambad Coumudy* observing an Advertise-

ment inserted in the *Calcutta Journal* of the 15th instant, by one Bhabanee Churn Bunnerjee, asserting that the first 13 Nos. of the *Coumudy* were edited by him, deems it indispensably necessary to state for publication, that this declaration is a wicked and malicious fabrication of falsehood advanced through sinister motives : for he was no more than real Editor's Assistant, and as such he was introduced to the notice of the gentleman, under whose immediate and sole patronage and support the paper has been established.

March 21, 1821 Hurree Hur Dutt

প্রায় এই ধরনের ঘটনা এর পরেও ঘটেছে। ১৮৪৬-এর ২০ জুন থেকে সীতানাথ ঘোষ-এর নামে 'পাষণ্ডপীড়ন' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হতে থাকে। ১২৫৯ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখের 'সংবাদপ্রভাকর'-এ ঈশ্বর গুপ্ত এই পত্রিকাটি কী করে উঠে যায় তার বিবরণ দেন,

…সীতানাথ ঘোষ নামক জনৈক কৃতঘ্ন ব্যক্তি যাহার নামে এই পত্র প্রচারিত হয়, সেই অধার্মিক ঘোষ বিপক্ষের সহিত যোগদান করত ঐ সালের ভাদ্রমাসে পাষণ্ডপীড়নের হেডচুরি করিয়া পলায়ন করিল, স্থতরাং আমাদের বন্ধুগণ তৎ-প্রকাশে বঞ্চিত হইলেন।

[বা· সা প. । ৮৯]

কোনো পৃষ্ঠপোষক যদি অর্থসাহায্য বন্ধ করতেন তা হলে সে পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। 'সংবাদ রসরাজ' পত্রিকাটি এ কারণেই উঠে যায়।

আমরা এত কাল 'আমরা ২' বলিতাম এইক্ষণে আর আমরা ২ বলিতে পারিতেছি না, যাঁহারদিগকে প্রাণাধিকবন্ধু জানিতাম এবং যাঁহারদিগকে আমরা জানিয়া 'আমরা ২' লিখিয়াছি, যাঁহারা সংকট সময়ে রক্ষা করিয়াছেন, দুঃখে দুঃখী হইয়াছেন, পীড়িত হইয়াছি ঔষধ পথ্য দিয়াছেন, যন্ত্রাগারে কি রাজদ্বারে যেখানে চাহিয়াছি সেইখানেই অর্থ দিয়া রক্ষা করিয়াছেন, সৎপরামর্শ দ্বারা সাহসে রাখিয়াছেন এইক্ষণে তাঁহারাই আমারদিগের বিপক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন, সর্ব্বপ্রকারে যাঁহারদিগের অনুগ্রহে আমরা, আমরা ছিলাম তাঁহারাই যদি পক্ষান্তর হইলেন তবে আর আমরা, আমরা কে ?…

দেশমান্য অগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর…এবং… মহাশয়গণ…২৮

অগ্রহায়ণ দিবসীয় রসরাজ পাঠে তাঁহারা সকলেই আমার প্রতি অপ্রসন্ন হইয়াছেন···বিশেষে আমার সর্ব্বাশ্রয় রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর যদি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন তবে আমি কি অবলম্বনে জীবন ধারণ করিব ? তবে শোক সম্বরণের এই মাত্র উপায় দেখিতেছি রসরাজ বিদায়, রসরাজ হইতে সকলের মনোদুঃখ হইতেছে অতএব রসরাজকেই বিদায় দিলাম, ইহাতেও কি নির্ম্মলকুল সাধু-স্বভাব মহোদয়েরা প্রসন্নতা প্রদানে কৃপণ হইবেন···('সম্বাদ রসরাজ', ২২ মাঘ ১২৬৩)।

[সা বা স. ৩। ৫২৫-২৬]

সংবাদ-সাময়িকপত্রের বৈষয়িক সংগঠনে এই ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা, পৃষ্ঠ-পোষকের প্রতি বাধ্যতা-আনুগত্য পায় যেন জমিদারি ব্যবস্থার চাকরান বন্দোবস্তের মতোই ছিল। এঁরা কেউ বাংলা কাগজে টাকা খাটিয়ে ব্যাবসা করতে চান নি যদিও ১৮৪০ সালের মধ্যেই ছাপাখানা ও বই বের করার ব্যাবসার সঙ্গে-সঙ্গে, সংবাদ সাময়িকপত্র প্রকাশও, কলকাতা শহরে ব্যাবসা হিশেবে সামাজিক স্বীকৃতি পেয়ে গেছে।

১৮১১ থেকে ১৮২১-এর মধ্যে কলকাতায় ১৫০০০ বাংলা বই বিক্রি হয়। ১৮৩২ সাল থেকে দ্বারকানাথ ঠাকুর *John Bull* দৈনিকপত্রে টাকা খাটান। *India Gazette*-এর মালিকানা দ্বারকানাথ ঠাকুরের হাতে আসে। ১৮৩৫-এ *Bengal Hurkaru*-র সঙ্গে *India Gazette* পত্রটি মিশে যায়। *Bengal Hurkaru* দৈনিক পত্রটি যদিও Samuel, Smith and Company প্রকাশ করত, তাতেও দ্বারকানাথ ঠাকুরের বেশ ভালো পরিমাণ শেয়ার ছিল। *Bengal Hurkaru* পত্রিকাটিতে ৭০ জন লোক কাজ করত, সম্পাদক ৮০০ টাকা মাস-মাইনে পেতেন, এদের লাইব্রেরি ও রিডিং রুমে গ্যাস লাইট ব্যবহৃত হত।

সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশ করে কিছু লাভ করা যায় সে-সচেতনতা বাঙালি সমাজেও খানিকটা ছিল। বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশ হত বেশ বেশি কিন্তু প্রায় কোনোটিই টিঁকত না। অনুমান হয়, প্রাথমিক পুঁজি ও ছাপাখানার ব্যবস্থাটুকু হয়ে গেলে বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রের একটা ব্যবসায়িক সম্ভাবনা দেখা দিত। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যাবসার ভিত্তিতেই কাগজ চালিয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যও তাই করেছেন। বাংলা সংবাদপত্রের এই আয় হত প্রধানত বিজ্ঞাপন ও গ্রাহক চাঁদা থেকে। তাই এ-বিষয়ে কিছুটা প্রতিযোগিতা ও সতর্কতাও ছিল। 'সম্বাদ ভাস্কর' থেকে তার কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যায় :

…পূর্ব্বে সমাচার পত্রের বিজ্ঞাপনের পঁক্তি মূল্য কখনও চুক্তি করা ছিল না, সমাচার দর্পণ, সম্বাদ কৌমুদী প্রভৃতি প্রাচীন সমাচার পত্রের বিজ্ঞাপনের প্রতি পুঁক্তির মূল্য চারি আনা সকলেই দিয়াছেন তৎপরে চন্দ্রিকাতেও এই নিয়মে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হইত, চন্দ্রিকার পূর্ব্ব সম্পাদক বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বরং মধ্যে মধ্যে বিজ্ঞাপন দিতেন চন্দ্রিকা পত্রে কেহ কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলে প্রতি পুঁক্তির মূল্য চারি আনা দিতে হইবেক, চন্দ্রিকার পূর্ব্ব সম্পাদক এই নিয়মেতেই প্রায় বিজ্ঞাপনের মূল্য গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব যথার্থ কথা বলিতে বাধা নাই পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্র হইয়া অবধি বাঙ্গালা সমাচার পত্রের উজ্জ্বল মুখে কজ্জল পড়িয়াছে, পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক বিবেচনা করিলেন অল্প মূল্যে বিজ্ঞাপন লইলেই তাঁহার অধিক লভ্য হইবে, অতএব চুক্তি করিয়া এক পয়সা পুঁক্তি মূল্যতেও আপনারা যাইয়া উপাসনা করিয়া বিজ্ঞাপন লইতে আরম্ভ করিলেন এবং সেই দৃষ্টান্তে চন্দ্রিকা সম্পাদক প্রভাকর সম্পাদকও অনুগামী হইলেন…কিন্তু পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক এই চতুরতাতেও গবর্ণমেণ্ট সম্পর্কীয় বিজ্ঞাপনে বঞ্চিত আছেন, যদি বলেন বাষ্পীয় জাহাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিজ্ঞাপন পূর্ণচন্দ্রোদয়ে প্রকাশ হয় তদুত্তর এই যে তাহা পূর্ণচন্দ্রোদয়ের গুণে নহে ষ্টিম অফিসের কর্ম্মচারি জনষ্টন সাহেব এতদ্দেশীয় ভাষার সমাচার পত্রের গুণাগুণ জানেন না এই কারণ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন দেন …('সম্বাদ ভাস্কর', ২১ এপ্রিল ১৮৪৯)।

[সা বা স. ৩ । ৪৫২]

বাঙ্গালী সম্পাদকদিগের যে ব্যবহার তাহা বলিতে লজ্জা হয়,…কেবল বিজ্ঞাপনের গন্ধে গন্ধে অন্ধের ন্যায় দ্বারে দ্বারে ভ্রমণপূর্ব্বক ভিক্ষাং দেহি বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, বিজ্ঞাপনদাতার পদধূলি গ্রহণ করিয়াও যদি এক পয়সা পৌক্তি মূল্য বিজ্ঞাপন প্রাপ্ত হয়েন তথাচ জ্ঞান করেন চরিতার্থ হইলেন… ('সম্বাদ ভাস্কর', ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৪৯)।

[সা. বা. স. ৩ । ৪৫৫]

হে পাঠক মহাশয়গণ, অদ্য বৈশাখ মাসের প্রথম দিন কি শুভদিন…হে নবীন বর্ষ ! তুমি আমারদিগের গ্রাহক সকলকে হর্ষপ্রদানে আমোদিত কর, আমরা কেবল গ্রাহকগণের অনুগ্রহে অষ্টাদশ বর্ষের অধিক সময় সম্পাদকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিলাম ('সম্বাদ ভাস্কর', ১২ এপ্রিল ১৮৫৬)।

[সা বা. স. ৩ । ৪৭৪-৭৫

হে বিদেশীয় পাঠক মহাশয়গণ, মহাশয়গণ স্মরণ করুন আমার [আমরা] প্রতি বৎসরান্তে মহাশয়গণকে যেরূপ স্মরণ করাইয়া থাকি অদ্য সেইরূপ স্মরণ করাইতেছি শ্রাবণ মাস গিয়াছে, ভাদ্র মাস পড়িয়াছে, মাস পড়িলেই গেল ; জ্ঞান করুন ভাদ্র মাস যায় যায় হইল আশ্বিন মাস আসিতেছে, এই বৎসর আশ্বিন মাসেই দশভুজার মহাপূজা হইবে, প্রতি বৎসর এই অপূর্ব্ব পর্ব্বের পূর্ব্বে আমরা যন্ত্রাগারের কর্ম্মচারি সকলের অবশিষ্ট সমুদায় বেতন পরিশোধ করিয়া দেই, সম্বৎসর মধ্যে মহাশয়দিগকে ভাস্কর মূল্য জন্য উত্তেজনা করি না, পূজার পূর্ব্বে টাকার অত্যন্ত প্রয়োজন হয় এই কারণ প্রতি বৎসর মহাশয়গণকে ভাস্করের মূল্য পরিশোধ জন্য স্মরণ করাইয়া থাকি, এবারেও বিনয় বচনে সেইরূপ নিবেদন করিতেছি…('সম্বাদ ভাস্কর', ২৩ আগস্ট ১৮৫৬)।

[সা. বা. স. ৩ । ৪৮৫-৮৬]

ভাস্কর পত্রে অনেকের সম্পত্তি ঘটিত নানা বিষয় প্রকাশ হয়, যাঁহারদিগের বিষয় প্রকাশ পায় তাঁহারা সকলে ভাস্কর পত্রের গ্রাহক নহেন অতএব যাঁহার বিষয় যখন প্রকাশ হয় তিনি ভাস্কর পত্র দেখিতে আইসেন আপনারদিগের অভিলষিত বিষয় পড়িয়া কর্ম্ম সিদ্ধি করেন কিন্তু সেই ভাস্কর বাহির করিয়া দিতে এবং পুনরায় নিয়মিত স্থলে রাখিতে আমারদিগের লোকেরদের সময় যায় এবং আমরা ঐ সকল বিষয় সংগ্রহ করিতে ও লিখিতে কেবল পরিশ্রম করি এমত নহে বহু ব্যয় সাধ্যে ভাস্কর পত্র প্রস্তুত হয় অতএব সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি যাঁহারা ভাস্কর পত্রের আপনারদিগের কোন বিষয় দর্শনার্থ যন্ত্রাগারে আসিবেন তাঁহারা অর্দ্ধমুদ্রা সঙ্গে আনিবেন ভাস্করের দর্শনী এই অর্দ্ধমুদ্রা লাগিবেক, পরে ভাস্কর দেখিয়া যদি ঐ ভাস্কর লইয়া যাইত চাহেন তবে একখানি ভাস্করের মূল্য ১ টাকা লাগিবেক…('সম্বাদ ভাস্কর', ২৭ নভেম্বর ১৮৫৬)।

[সা. বা. স. ৩ । ৫০৫]

১৮৩০ থেকে ১৮৫৮-র মধ্যে, বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রের জন্ম ও লালনের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সময়ে, আমরা বৈষয়িক সংগঠনের এই রকমফেরগুলো দেখতে পাই :

১. পৃষ্ঠপোষক, সম্পাদক ও লেখকপণ্ডিত—তিন স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

২. কখনো-কখনো এই স্বাতন্ত্র্য 'প্রোপ্রাইটার' ও কর্মচারী সম্পর্কের দ্বারাও নির্দিষ্ট।

৩. কখনো-বা এই ত্রিস্তরের শেষ দুই স্তর (সম্পাদক ও লেখকপণ্ডিত) একই ব্যক্তি বা একই ব্যক্তির প্রধান নিয়ন্ত্রণে।

৪. এই সংগঠনগুলো তৈরি হয়েছে সমাজের এক-একটি অংশের সামাজিক ভূমিকার সন্ধানে। ক্বচিৎ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যেও।

বাংলা সাংবাদিকতার পেশায় পাঁচজন

এই তৃতীয় ও চতুর্থ রকমের মিশ্রণেই আমরা বাংলা সাংবাদিকতার নতুনতম ধরনটি পাই যেখানে ত্রিস্তর সংগঠনের আভ্যন্তরীণ বাধা অতিক্রম করে সম্পাদক-লেখক-স্বত্বাধিকারীর একটি সমন্বয়িত ভূমিকা স্বীকৃতি পাচ্ছে। সেই স্বীকৃতি যদিও ত্রিস্তর সংগঠনের বাস্তবতাকে অস্বীকার করছে না কিন্তু সেই স্বীকৃতির মধ্যেই সম্পাদক-লেখকের এক স্বতন্ত্র স্বাধীন ভূমিকাও আবিষ্কার করতে পারছে। সে-আবিষ্কারের প্রথম কৃতিত্ব ছিল নিশ্চয়ই ভবানীচরণের। কিন্তু নতুন পরিস্থিতিতে ঈশ্বর গুপ্ত-গৌরীশঙ্করের ভিতরই সে-আবিষ্কার সামাজিক স্বীকৃতি পায়। বাঙালি সমাজে সাংবাদিকতাকে পেশা হিশেবে তাঁরাই প্রতিষ্ঠিত করেন।

সমাজ ও তৎকালীন রাজনীতির দিকে তাকাতে তাঁরা এমন এক দৃষ্টিক্ষেত্র তৈরি করতে পেরেছিলেন যা সমাজ-আন্দোলনের বা তৎকালীন রাজনীতির কোনো গোষ্ঠীর দ্বারা পূর্বনির্দিষ্ট নয়। তাঁরা দৃষ্টির এমন-এক ভঙ্গিও পেয়েছিলেন যা সমাজ-আন্দোলনের বা তৎকালীন রাজনীতির কোনো একটি গোষ্ঠীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। আর, এর ফলে সাংবাদিকতা এক স্বাধীন বৃত্তি হিশেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল।

সাংবাদিকতা স্বাধীনবৃত্তি হিশেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল বলেই দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ কলকাতা শহরের বাইরে, পৃষ্ঠপোষক ছাড়াই নিজের ছাপাখানা তৈরি করে কাগজ বের করতে পারলেন ১৮৫৮তে। তাঁর 'সোমপ্রকাশ'-এ বাংলা কাগজের সংগঠনের সঙ্কটের মীমাংসা ঘটল সাংবাদিক-সম্পাদকেরই অনুকূলে। সেই পরিস্থিতি সম্ভব হয়েছিল ভবানীচরণ, ঈশ্বরগুপ্ত, গৌরীশঙ্কর, অক্ষয় দত্ত-দ্বারকানাথের মতো সাংবাদিকদের বৃত্তিগত সাফল্যেই।

ভবানীচরণ বাংলা সাংবাদিকতায় যে-নতুন রীতি প্রবর্তন করতে পেরেছিলেন তার ভিত্তি ছিল তাঁর ব্যক্তিজীবনে। কলকাতা শহরের নতুন সমাজবিন্যাসে তিনি ছিলেন বহিরাগত। হিন্দু কলেজ ও ব্রাহ্ম আন্দোলনের বাইরেও বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে তাঁর সংযোগ থেকে তিনি সাংবাদিক-ভাষার সেই কণ্ঠস্বর খুঁজে পেয়েছিলেন যার ফলে তাঁর ভাষা নাগরিক শিক্ষিত পরিমণ্ডলের বাইরেও গৃহীত হয়েছিল।

এদিক দিয়ে তাঁর পরবর্তী গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত ও দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ এই চারজন 'পেশাদার' সাংবাদিক তাঁর সঙ্গে তুলনীয়।

উনিশ শতকের এই চল্লিশ বছরের সাংবাদিকতার নানা প্রয়াসে প্রধান কোনো বাঙালি সাংবাদিক-লেখক হিন্দু কলেজ, ব্রাহ্ম আন্দোলন বা কলকাতার প্রধান কোনো সামাজিক গোষ্ঠী থেকে আসেন নি—এসেছেন এই শহরের ও সমাজের এমন আগন্তুকদের ভিতর থেকে যাঁরা ইংরেজ-প্রবর্তিত নতুন শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষিত নন, ইংরেজিভাষায় কিছুটা অপারগই অথচ কলকাতার বাইরে দেশের বৃহত্তর অংশ যাঁদের জীবন ও অভিজ্ঞতার অংশ ছিল, বস্তুত তাঁরা ছিলেন সেই বৃহত্তর পরিধিরই প্রতিনিধি—কেন্দ্রের অংশ নন। এমনটি যে হয়েছিল তার একটি কারণ কি এই—ইংরেজ-সংস্কৃতির সঙ্গে অভিঘাতে তৈরি কলকাতার বাঙালি নাগরিক-সংস্কৃতি দেশের পরিধি থেকে অনেকাংশেই ছিল বিচ্ছিন্ন ও সেই বিচ্ছিন্নতায় সংবাদ-সাময়িকপত্রের মতো সামাজিক ও সমষ্টি-সম্ভাষণের যোগ্য ভাষা ছিল তার আয়ত্তের বাইরে ; আর, অন্যদিকে এই ইংরেজি-সংস্কৃতির প্রাথমিক অভিঘাতের এলাকার বাইরে থেকে আসা, ইংরেজিশিক্ষার সুযোগ-বঞ্চিত এই সাংবাদিকদের সহজ আয়ত্তেই ছিল সেই সমষ্টির সামাজিক ভাষা? তাঁদের এই সামাজিক-সংযোগের ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা তাঁদের গদ্যরীতিকেও করেছিল প্রভাবিত ও স্বতন্ত্র।

ভবানীচরণ, ঈশ্বরগুপ্ত, গৌরীশঙ্কর, অক্ষয়কুমার ও দ্বারকানাথ—এই প্রধান সাংবাদিক-লেখকগণ কেউই কলকাতার মূল বাসিন্দা ছিলেন না বা জন্মসূত্রে কলকাতার সমাজে তাঁদের কোনো বিশিষ্ট স্থান ছিল না। যদিও এঁদের মধ্যে ভবানীচরণের সঙ্গেই কলকাতার সম্পর্ক ছিল দীর্ঘদিনের। তাঁদের আদিবাস উখড়া পরগনার নারায়ণপুর গ্রামে কিন্তু তাঁর বাবা টাকশালে চাকরি করতেন বলে কলুটোলায় বাড়ি করেছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন কাঁচড়াপাড়ার অধিবাসী, তরুণ বয়স থেকেই তিনি কলকাতায় আছেন। কলকাতার তখনকার সমাজবিতর্কে তাঁর ভূমিকা ছিল অনেকটাই দর্শকের আর সেই সূত্রেই তিনি হয়তো পরিচিত হয়েছিলেন কলকাতার সমাজের বিশিষ্ট কিছু পরিবারের সঙ্গে। গৌরীশঙ্করও কলকাতার বাইরে থেকেই এসেছিলেন—শ্রীহট্ট জেলায় তাঁর পৈতৃক বাস ও জন্ম। নৈহাটিতে তিনি সংস্কৃত শিক্ষা করেন। তারপর কলকাতায় আসেন। কলকাতায় তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিভিন্ন ব্যক্তির পরিচয় হয়। অক্ষয়কুমারের পৈতৃক বাস ছিল নবদ্বীপের চুপী গ্রামে। তাঁর বাবা পীতাম্বর দত্ত খিদিরপুরে চাকরি করতেন। দশ

বৎসর বয়স থেকে অক্ষয়কুমার কলকাতার খিদিরপুরে বাবার কাছে থাকতেন। বাবার মৃত্যুর পর অক্ষয়কুমার জীবিকার খোঁজে কলকাতার সমাজের নানা অংশের সঙ্গে পরিচিত হন। দ্বারকানাথ কলকাতার বাইরেই থাকতেন। তাঁর শিক্ষা সংস্কৃতে, সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। এই চাকরির সূত্রেই কলকাতার সমাজের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে তাঁর পরিচয়।

তখনকার কলকাতার সমাজের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে এই চারজনের পরিচয়ও ঘটেছিল যেন প্রায় একই পদ্ধতিতে। কলকাতার বাঙালি হিন্দুসমাজ তথাকথিত যে-বিভিন্ন গোষ্ঠীতে তখন বিভক্ত তাতে ভবানীচরণের একটি অত্যন্ত নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা পক্ষ ছিল কিন্তু বাকি চারজনই যেন সে বিভাগকে খুব সহজেই অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। ইয়ংবেঙ্গল-ডিরোজিয়ান, আত্মীয়সভা-ব্রহ্মসভা, ধর্মসভা ইত্যাদি বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বাঙালি নাগরিকদের বিভাগকে অনেক সমাজ-ঐতিহাসিক রক্ষণ-শীল, লিবার‍্যাল, মডারেট, র‍্যাডিক্যাল ইত্যাদিতে ভাগ করে থাকেন। আমাদের কলোনিয়াল পরগাছা অস্তিত্বে এই ভাগ অবান্তরই শুধু নয়, এই ধরনের ভাগ থেকেই কলোনির মধ্যবিত্ত মনে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ভূমিকা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভুল ধারণা তৈরি হয়। যদি মনে করে নেয়া যায় যে কলকাতার নাগরিক বাঙালি হিন্দু সমাজ এই সমস্ত ভাগে খাড়াখাড়ি বিচ্ছিন্ন ছিল, তা হলে বলা যায়, ভবানীচরণ ব্যতীত বাকি চারজন আড়াআড়ি ভাবে প্রায় সেই সবগুলি গোষ্ঠীর ভিতরেই চলাফেরা করতেন—ফলে তাঁদের ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি ছিল ব্যাপক।

ভবানীচরণ নতুন নাগরিক বাঙালি হিন্দু সমাজেরই একজন ছিলেন। সতীদাহ প্রথা নিয়ে কিছুটা ও পরে বিধবাবিবাহ বিতর্কে অনেকখানি—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের যেমন সমাজাতিরিক্ত মর্যাদা দেয়া হয়েছিল, যেন হিন্দুসমাজ বিষয়ে তাঁদের মতামতই চরম, ভবানীচরণের কিন্তু তেমন কোনো বিশেষ অধিকার ছিল না। যেমন, ছিল না তাঁর দেওয়ানি-দালালির সূত্রে লব্ধ বৈভবের ভিত্তিতে অর্জিত সমাজশাসনের অধিকার, বা নতুন ইংরেজি শিক্ষার গৌরবের জোরে ব্যক্তিগত আচরণেই সমাজ বদলে দেবার অধিকার। অর্থাৎ যে তিনটি কারণে তখনকার বাঙালি সমাজে স্বাভাবিক নেতৃত্ব জুটত--ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য, কলকাতার প্রথম বড়লোকদের বংশ পরিচয় ও হিন্দু কলেজের শিক্ষা—তার কোনোটিই ভবানী-চরণের ছিল না। তিনি ছিলেন নাগরিক কলকাতারই অন্তর্গত—প্রথম থেকেই। তাই কলকাতা নগরে তাঁর নিজের কর্মক্ষেত্র তাঁকে খুঁজে নিতে হয়েছে, তৈরি করে নিতে হয়েছে। যদি কলকাতা শহরের পত্তন ঘটত আমাদের দেশ ও সমাজের

বিবর্তনেরই ফলে আর আমাদের সমাজের উৎপাদন ও বাণিজ্যের জন্য কলকাতা হয়ে উঠত অনিবার্য—তা হলে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়দের পরিচয় দিতে 'নাগরিক মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব' শব্দটির ব্যবহার করা যেত।

কিন্তু কলোনির সেই বিস্তারপর্বে বাঙালির কোনো ভূমিকাই তো যথার্থ ভূমিকা নয়। ভবানীচরণকেও তাই নানারকম চাকরি-বাকরি কাজকর্মের মধ্য দিয়েই কলকাতায় ঘুরে বেড়াতে হয়েছে।

ড. সুশীলকুমার দে তাঁর 'দি বেঙ্গলি লিটারেচার ইন দি নাইনটিন্‌থ সেনচুরি' গ্রন্থে জানিয়েছেন উখড়া পরগনার নারায়ণপুর গ্রামে ভবানীচরণের (১৭৮৭) পৈতৃক বাস সত্ত্বেও তাঁর বাবা কলকাতার টাকশালে চাকরির সূত্রে কলুটোলায় একটি বাড়ি করেছিলেন। কিন্তু ১৮৩৪-এর ১৫ মার্চ 'সমাচার দর্পণ'-এ একটি চিঠি বেরিয়েছিল—

> '...চন্দ্রিকাকারের [ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের] পূর্ব্ববসতি পল্লিগ্রাম সেখপুরা নামক স্থানে ছিল। অল্পকাল হইল চন্দ্রিকাকারের পিতা ৺রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ গ্রামনিবাসি জবনেরদিগের বলাৎকারে উত্ত্যক্ত হইয়া ৺বাবু নিমাইচরণ মল্লিক মহাশয়ের শ্রাদ্ধের পর কলুটোলায় পাকা ইষ্টকনির্ম্মিত বাসস্থান প্রস্তুত করিয়া বসতি করেন।'
>
> [স. সে. ক. ২। ৪২৩-২৪]

এই কলুটোলার বাড়িতে ভবানীচরণের বাল্যকালই শুধু কাটে নি—পরেও তিনি এখানেই থাকতেন ও চন্দ্রিকার কাজকর্মও প্রধানত এই জায়গা থেকেই করতেন। 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রকাশের বিজ্ঞাপনেও ভবানীচরণ 'কলুটোলা গ্রাম নিবাসী' বলে আত্মপরিচয় দিয়েছেন।

তাঁর ষোলো বছর বয়সে ভবানীচরণ জে. ডাকৃটে অ্যাণ্ড কোম্পানির সরকার হন। সাতাশ বছর বয়স পর্যন্ত এই চাকরিতেই ছিলেন। তারপর তিনি নানা রকম চাকরি-বাকরি করেন—হার্বার্ট কম্পটনের (পরে ইনি বোম্বাই-এর প্রধান বিচারপতি হন) বড়বাবু, হুগলির কালেকটরেটের একজন খাতাঞ্জি, কলকাতা কাস্টম্‌সের একজন দেওয়ান, হিকি বেইলার্ড কোম্পানির বেনিয়ান। বিশপস কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় তিনি সেই কলেজের কেরানির কাজও করেছেন। 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় তিনি কিছুদিন ম্যানেজারি করেছিলেন। সম্ভবত সেখানেই সাংবাদিকতার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়।

তখনকার চাকরিজীবী বাঙালি মধ্যবিত্তের পক্ষে সাধারণভাবে যে-যে চাকরি

খোলা ছিল ভবানীচরণ সেই সব চাকরিতেই ঘোরাফেরা করেছেন—কিছু-কিছু সরকারি কাজ ও কিছু-কিছু সাহেব কোম্পানির কাজ। শহর কলকাতার আর্থিক-ব্যবসায়িক জীবনযাত্রার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল প্রত্যক্ষ। আর সেই জীবনযাত্রায় তাঁর মতো একজন সাধারণ বাঙালি যুবকের অবস্থান নিয়ে তো জেনেছিলেন তাঁর নিজেরই অভিজ্ঞতায়। কাগজ হিশেবে চন্দ্রিকা বেশ ভালোই চলত, পাঁচশ মতো গ্রাহকও ছিল। তবু যেন মনে হয় চাকরির প্রয়োজন ভবানীচরণের কোনো সময়েই হয় নি। এমন-কি ১৮৩২-এও তিনি সদর আমিনের চাকরির জন্য প্রার্থী হন। শেষ এই নিয়ে 'এনকোয়ারার' পত্রে কিছু বিরূপ মন্তব্যও বেরিয়েছিল। সেই প্রসঙ্গে চন্দ্রিকায় একটি চিঠি বেরয়।

১৮ জানুয়ারি, ১৮৩২

শ্রীযুক্ত চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয়।—গত শুক্রবারের ইনকোয়েরর পত্রে লেখেন যে শ্রীযুত চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশয় সদর আমীনের পদপ্রাপ্ত্যাকাঙ্ক্ষী হইয়াছেন এবং লেখেন যে তাঁহার তৎপদপ্রাপ্তির বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। অপর শ্রীযুত চন্দ্রিকা প্রকাশক মহাশয়ের তৎকর্ম্মে যোগ্যতাবিষয়ে ঐ সম্পাদক যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে আমরা সম্মত নহি অনেককালাবধি শ্রীযুতবাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমারদের আলাপ পরিচয় আছে এবং যদ্যপিও তাঁহার আমারদিগের সঙ্গে কোন পক্ষে সৎপ্রতিপক্ষতাও থাকুক তথাপি সত্য কহিতে হইলে জ্ঞান বুদ্ধিতে তাঁহার তুল্য এতদ্দেশে অপর ব্যক্তি দুর্লভ।…

[স. সে. ক. ২। ৪২২]

ভবানীচরণের চাকরি ও ব্যাবসাপত্র নিয়ে অবশ্য এর পরেও খবরের কাগজে লেখালেখি হয়েছে। তার একটি কারণ মনে হয়, ভবানীচরণ সামান্য অবস্থা থেকে উঠে সমাজের প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তখনকার চাঁদার তালিকাতেও দেখা যায় তিনি চাঁদা ভালোই দিতেন—অন্তত কিছু অর্থশক্তি না-থাকলে তা দিতে পারতেন না। তাঁর এই সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রধানতর দুটি কারণ—'সমাচার চন্দ্রিকা' ও 'ধর্মসভা'। চন্দ্রিকার ভিতর দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার কাল যদি ১৮২৩ থেকে ৩০ ধরা যায়, ধর্মসভার সম্পাদক হিশেবে সামাজিক প্রতিষ্ঠার কাল তাহলে ১৮৩০-এর পর। ভবানীচরণের ব্যক্তিত্বের বিকাশকে যেমন এই ১৮৩০ দিয়ে চিহ্নিত করা যায়, তেমনি চন্দ্রিকার ভূমিকার একটি পরিবর্তনও ধর্মসভার পর থেকে লক্ষ করা যায়। এই সবেরই পরোক্ষপ্রভাব পড়েছিল তাঁর গদ্যরীতিতে। বা তাঁর সামাজিক ভূমিকার পরিবর্তন তাঁর সামাজিক গদ্যের ভূমিকারও পরিবর্তন

এনেছিল। সেই পরিবর্তনটি লক্ষণীয়। এই সময়ের পরই তাঁর চাকরি-বাকরি, ব্যাবসাপত্র নিয়ে সংবাদপত্রে মন্তব্য দেখা যায়।

তারাচাঁদ দত্তের সঙ্গে ভবানীচরণের ঘনিষ্ঠতা ছিল। সেইজন্যই 'সম্বাদ কৌমুদী'-র সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়েছিলেন। চন্দ্রিকা-প্রকাশের বিজ্ঞাপনের উত্তরে তারাচাঁদ দত্তের ছেলে হরিহর দত্ত কৌমুদীর পক্ষ থেকে তার প্রতিবাদ করেন। এই বিবাদ বোধহয় কাগজে মেটে নি। ১৮৩৪ সালেও দেখা যায় ভবানীচরণের সঙ্গে দত্তদের এই বিবাদ চলছে। তখন মূল প্রশ্ন দাঁড়িয়েছিল তারাচাঁদ দত্ত কোনো সময় ভবানীচরণকে কোনো চাকরি জোগাড় করে দিয়েছিলেন কি না।

১৮ জানুয়ারি ১৮৩৪

সমাচার দর্পণ। শ্রীযুত দর্পণ সম্পাদক মহাশয় বরাবরেষু। আপনকার গত শনিবারের দর্পণ দেখিয়া অবগত হইলাম যে যশোহরের নিমক এজেণ্টীর সিরিশ্‌-তাদার শ্রীযুত বাবু তারাচাঁদ দত্তের আনুকূল্যে সভ্রাতৃক…চন্দ্রিকাসম্পাদক কষ্টম হৌসে কখন কর্ম্ম প্রাপ্ত হন নাই লিখিয়াছেন ইহাতে চমৎকৃত হওয়া গেল।

কষ্টম হৌসের দেওয়ানী কর্ম্ম হইতে দেওয়ান অভয়চরণ ঘোষ অবসর হইলে কষ্টম বোর্ডের প্রধান মেম্বর শ্রীযুত লার্কিন সাহেবের অতি প্রবল সোপারিশক্রমে শ্রীযুত সর চার্লস ডাইলি সাহেব ঐ অতি প্রধান কর্ম্মে শ্রীযুত বাবু তারাচাঁদ দত্তকে নিযুক্ত করেন। তিনি তৎকর্ম্ম প্রাপ্তিতে রীতিমত যে দারোগা মুহুরি প্রভৃতির বিংশতি কর্ম্ম শূন্য ছিল তাহাতে তাঁহার খাতির্জমার ব্যক্তিরদিগকে নিযুক্ত করিতে শ্রীযুত সাহেব তাঁহার প্রতি আজ্ঞা করিলেন তাঁহারদের কর্ম্মের দায়ী তিনিই থাকিলেন। ইত্যবসরে চন্দ্রিকাসম্পাদকের পিতা আমার সাক্ষাতেই তাঁহার পুত্রেরদিগকে কর্ম্ম দিতে দেওয়ানজীকে অনেক বিনীতি করিলেন। এবং ঐ পরমহিতৈষি দেওয়ানজী মহাশয় শ্রীযুত সাহেবের হুকুম আনিয়া শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আহিরীটোলার চৌকীতে নিযুক্ত করিলেন।…

চন্দ্রিকাসম্পাদক লিখিয়াছেন প্রথম কর্ম্মে প্রবিষ্ট হওনসময়ে বাবু হরিহর দত্ত পে মাষ্টরি জেনরলি দপ্তরের মুহুরির কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন ইহাতে ঐ বাবুর কোন্‌ অমর্য্যাদা হয় না যেহেতুক প্রায় তাবদ্ধনি মান্যবংশীয় যুব ব্যক্তিরা কি ইঙ্গলণ্ডে কি এতদ্দেশে এতদ্রূপ প্রথমতঃ সরকারী ছোট কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।…
—কলিকাতার সদর চৌকীর আমীন শ্রীরামজীবন চট্টোপাধ্যায়।

[স. সে. ক. ২ । ৪২২-২৩]

এই চিঠির উত্তরে একমাস পরে চন্দ্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়

৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪

শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮১৭ সালের অক্তোবর মাসে সর উলিয়ম গ্রাণ্ট কর সাহেবের সুপারিস চিঠী সর চার্লস ডাইলি সাহেবকে দিয়া [কাষ্টম হাউসে] চাকর হন ইহাতে যদি কাহার সন্দেহ হয় তবে কষ্টম হৌসের বহি দেখিবেন।

[স. সে. ক. ২ । ৪২৩]

চাকরিজীবী, অথচ সমাজে কিছুটা স্বাধীন কাজকর্ম, কিছুটা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, ও সমাজের ধনী ব্যক্তিদের সমর্থন—এইসব মিলে কলকাতার বাঙালি সমাজের শ্রেণীভাগে যে নতুন মধ্যবিত্ত তৈরি হচ্ছিল—ভবানীচরণ যথার্থই ছিলেন তার একটি অংশের প্রতিনিধি। 'ধর্মসভা'র সম্পাদকত্ব ও সতীদাহ প্রথা নিষেধের বিরোধিতা করায় তিনি সেই অংশের নেতৃত্বও কিছু অর্জন করেন। 'ধর্মসভা'র পৃষ্ঠপোষক-অনুগ্রাহক হয়তো অনেকেই ছিলেন কিন্তু 'ধর্মসভা'র প্রকৃত নেতৃত্ব ছিল ভবানীচরণেরই হাতে। তারও প্রধান কারণ, তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি চন্দ্রিকার মধ্য দিয়ে জনমত নিয়ন্ত্রিত করতে পারতেন। 'ধর্মসভা'র ভিতরেও সেই স্বীকৃতি ছিল।

সাংবাদিকতার পেশায় ভবানীচরণই প্রথম সফল সাংবাদিক। কিন্তু তাঁর এই সাংবাদিকতার সঙ্গে পরবর্তীকালে 'ধর্মসভা'র সম্পাদকতাকে তিনি মিশিয়ে ফেলেন। তাতে তাঁর সাংবাদিকতার গৌরব সামাজিকতার দিক থেকে নিশ্চয়ই কিছুটা কমে যায়। কিন্তু বাংলা সাংবাদিকতার প্রতি বৃত্তিগত আসক্তি প্রথম তিনিই দেখান।[১৩]

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পাথুরেঘাটাব ঠাকুব পরিবারের সমর্থনে প্রভাকর শুরু করেন। আন্দুলের জমিদারও তাঁকে সাহায্য করেছেন। পরে, ব্রাহ্ম-আন্দোলনের ফলে মূল ঠাকুর পরিবারের মধ্যে নানা ভাগ দেখা যায়। সে সব সত্ত্বেও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তর ঘনিষ্ঠতা যথেষ্টই ছিল। বরং তিনি এই সভায় বেশ নিয়মিতই হাজিরা দিতেন। প্রভাকরে তিনি যে-সমর্থক ও লেখকদের তালিকা প্রকাশ করেছিলেন তাঁদের অনেকে 'তত্ত্ববোধিনী সভার' সদস্য ছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনী আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই সামাজিক অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন, যাকে আধুনিক ভাষায় বলা যায় জনসংযোগ। এই অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য ও বিস্তার তাঁর জীবন ও কর্মকেও প্রভাবিত করেছে।

ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্বপুরুষদিগের মধ্যে অনেকেই তৎকালে সাধারণে সমাদৃত পাঁচালি, কবি প্রভৃতিতে যোগদান এবং সংগীত রচনা করিতে পারিতেন।

[বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ, গোপাল হালদার -সম্পাদিত, ১ । ১১৪০]

বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত জমীদার এবং কলিকাতার প্রায় সমস্ত ধনবান এবং কৃতবিদ্য ব্যক্তি প্রভাকরের গ্রাহক ছিলেন।···উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি স্থানের প্রবাসী বাঙ্গালীগণও গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া নিয়ত স্থানীয় প্রয়োজনীয় সংবাদ পাঠাইতেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে সেই সকল সংবাদদাতা সংবাদ-প্রেরণে প্রভাকরের বিশেষ উপকার করেন।

[ঐ । ১১৪৮]

অল্প বয়স হইতেই ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতা এবং মফস্বলের অনেকগুলি সভায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভা, টাকীর নীতিতরঙ্গিনীসভা, দর্জ্জি-পাড়ার নীতিসভা, প্রভৃতির সভ্যপদে নিযুক্ত থাকিয়া মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা, প্রবন্ধ এবং কবিতা পাঠ করিতেন।···

এ কালের মত তিনি নানা সভার সভ্য, নানা স্কুল কমিটির মেম্বার ইত্যাদি ছিলেন—আবার ওদিকে কবির দলে, হাফ আখড়াইয়ের দলে গান বাঁধিতেন।

[ঐ । ১১৫১]

শারদীয়া পূজার পর জলপথে প্রায়ই ভ্রমণে বহির্গত হইতেন।···এই ভ্রমণসূত্রে স্বদেশের সকল প্রান্তের সম্ভ্রান্ত লোকের সহিতই তাহার আলাপ পরিচয় এবং মিত্রতা হইয়াছিল।

[ঐ । ১১৫১]

প্রভাকরের সাফল্যই ঈশ্বরগুপ্তকে প্রায় এক সংগঠনকর্তার মর্যাদা দেয়। ঈশ্বর গুপ্তই হয়ে ওঠেন তখনকার বাঙালির সৃষ্টিশীলতা ও চিন্তাভাবনা চর্চার এক কেন্দ্র, ১৮৩৬ থেকে নতুন প্রভাকর বেরবার মাত্র দশবছরের মধ্যেই সেখানে এসে মিলতে পারেন প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ ও রাধানাথ শিরোমণির মতো প্রাচীন সংস্কৃত পণ্ডিতগণ, নীলরত্ন হালদারের মতো প্রথিতযশা ইংরেজিজানা পণ্ডিত, আবার পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, শ্যামাচরণ বসু এঁদের মতো নবীন লেখকরাও। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র দেব, রমাপ্রসাদ রায়, কাশীপ্রসাদ ঘোষ—সামাজিকভাবে ও চিন্তাভাবনায় পরস্পর থেকে পৃথক এমনি বিচিত্র ব্যক্তিগণ।

প্রভাকর-এর এই বিশেষ ভূমিকা সম্পর্কে ঈশ্বর গুপ্ত যথেষ্ট সচেতন ছিলেন।

তাঁর সচেতন কর্মসূচির ফলেই প্রভাকর কলকাতার বাঙালি সমাজে এই বিশিষ্ট কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল—এ কথা হয়তো বলা যায় না, কারণ, সংবাদ-সাময়িকপত্রের সাফল্য নির্ভর করে সমষ্টির সঙ্গে তার মত দেয়া-নেয়া, গ্রহণ-বর্জনের এক জটিল প্রক্রিয়ায়—শুধুমাত্র ঘোষিত কর্মসূচির ওপর নয়। কিন্তু প্রভাকর একবার যখন সেই বিশিষ্টতা অর্জন করে ফেলে, প্রথম বাংলা দৈনিক হিশেবে সফল হয়, দৈনিক পত্রিকা পরিচালনার মতো সংগঠনও তৈরি হয়ে যায় ও সংবাদ দেওয়ার জন্য কিছুটা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সাংবাদিকও তৈরি হয়ে যান—তখন ঈশ্বর গুপ্তও প্রভাকর-এর সাফল্যকে আরো নানাভাবে ব্যবহার করেন। এই সমস্ত কার্যসূচিতেই তাঁর লক্ষ ছিল প্রভাকর যেন শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের সাহিত্যিক-সাংবাদিক আত্মপ্রকাশের প্রধান ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। দৈনিক প্রভাকরের রচনাবলিতে সাংবাদিকতার সীমা অতিক্রমের চেষ্টা তিনি লক্ষ করতে পেরেছিলেন হয়তো, আর, তাই প্রধানত সাহিত্য-গুণসম্পন্ন লেখাগুলিকে নিয়ে মাসিক প্রভাকর প্রকাশ শুরু করেন ও নিজেও কাল-ক্রমে মাসিক প্রভাকরের সম্পাদনাতেই বেশি সময় দেন, লেখেনও সেখানেই বেশি। আবার কলেজের তরুণতর লেখকদের জন্যও তিনি প্রভাকরকে ব্যবহার করেন। দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও আরো অনেকে তাঁদের ছাত্রাবস্থায় প্রভাকরেই প্রথম তাঁদের রচনা প্রকাশ করেন। পয়লা বৈশাখে বাঙালির সামাজিক অনুষ্ঠান প্রবর্তনের পেছনেও গুপ্ত কবির এই সামাজিকতার বোধই প্রধান ছিল।

গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ কলকাতায় এসে প্রথমে রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন ও তাঁর সমাজ সংস্কারের কর্মসূচিকে পূর্ণ সমর্থন জানান। তিনি নিজেই লিখেছেন,

> আমরা কলিকাতা নগরে উপস্থিত হইয়া রাজা রামমোহন রায়ের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করি এবং তৎকালেই ব্যক্ত করিয়াছিলাম স্বদেশের কুপ্রথা ও সহমরণ নিবারণ এবং বিধবাদিগের বিবাহ, স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাস ইত্যাদি বিষয় সম্পন্নার্থ প্রাণপণে চেষ্টিত আছি, তাহাতেই রাজা রামমোহন রায় আমারদিগকে নিকট রাখেন, এবং সহমরণ নিবারণ বিষয়ে যথাসাধ্য পরিশ্রমে উক্ত রাজার আনুকূল্য করি তাহাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছি···('সম্বাদ ভাস্কর', ২৬মে ১৮৪৯)।
>
> [বা. সা. প. ১ । ৬২]

লর্ড বেন্টিঙ্ক যখন সহমরণ সম্পর্কে মত জানার জন্যে পণ্ডিতদের আহ্বান করেন তখন অন্যান্য পণ্ডিত আত্মগোপন করেন কিন্তু গৌরীশঙ্কর একা উপস্থিত থেকে সহমরণের বিপক্ষে তাঁর মত ব্যাখ্যা করেন। তখনকার সামাজিক বিতর্কের প্রায়

প্রত্যেকটি বিষয়েই তিনি ছিলেন আধুনিকতার পক্ষে। কিন্তু এই মতের জন্য যেমন তিনি ইয়ং বেঙ্গলদের কাগজের ('জ্ঞানান্বেষণ') প্রধান লেখক ও বস্তুত কার্যকর সম্পাদক হতে পেরেছিলেন তেমনি আবার তাঁর এই সব মতামত সত্ত্বেও শোভা-বাজারের কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের অনুগ্রহ তিনি সবসময়ই ভোগ করতেন। সমাজ সংস্কারের কর্মসূচিতে তাঁর এই আধুনিকতার মূল্য হিশেবে তিনি হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেন নি, বা তাঁর সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞান এই আধুনিকতার পথে বাধা হয় নি। সমাজের প্রগতি ও স্বাদেশিকতা—এই দুই বোধ থেকে তিনি সতীদাহপ্রথার বিরোধিতায় আর স্ত্রী শিক্ষা ও বিধবাবিবাহের সমর্থনে লিখেছেন, তেমনি আবার পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি, যখন ত্রিশের দশকের সামাজিক দ্বন্দ্ব আর-অব্যবহিত নয়, ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনের প্রসারে বিপন্ন হিন্দুধর্মের পক্ষে পত্রিকা প্রকাশ করেন 'হিন্দু রত্নকমলাকর'। এতে তাঁকে তখন বিরূপ মন্তব্যও শুনতে হয়েছে, 'শঙ্কর ভট্টাচার্য্য এইক্ষণে হিন্দু হইলেন, না হইয়াই বা কি করেন'— [বা. সা. প.। ১৫০]। এই পত্রিকার ভূমিকায় লেখা হয়েছিল,

> …কাল বলে বিজাতীয় ধর্ম্মপাল ভূপালগণ হিন্দু রাজ্যে রাজ্যেশ্বর হইয়াছেন, তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের অনুকূল নহেন, প্রতিকূল হইয়া হিন্দুকুলকে ব্যাকুল করিতেছেন, হিন্দুধর্ম্মের বিনাশার্থ নাস্তিকতার স্বস্ত্যয়ন করেন, ইহাতে হিন্দুধর্ম্ম দুর্ব্বলভাবে পলায়নপর হইয়াছেন…এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মান্যবর হিন্দু মহাশয়দিগের উপদেশক্রমে আমরা 'হিন্দুরত্নকমলাকর' প্রকাশ করিলাম, এই পত্র হিন্দু ধর্ম্ম পক্ষের পক্ষ রক্ষার অস্ত্র স্বরূপ হইল।
>
> [বা. সা. প.। ১৫০]

যে-আত্মবিরোধিতা উনিশ শতকের সামাজিক নেতৃত্বের অনেকেরই ব্যক্তিত্বে ছিল, গৌরীশঙ্করের কিন্তু তা ছিল না। যখন তিনি কোনো পত্র-পত্রিকার দায়িত্ব পান নি, তখনো তিনি তাঁর চারপাশে যাঁরা সরকারি বা আধাসরকারি কর্তৃত্বের সঙ্গে যুক্ত তাঁদের কাজকর্মের সমালোচনা করেছেন। বর্ধমানের রানীর মোক্তার হিশেবে বর্ধমানে গিয়ে মফস্বল পুলিশের অত্যাচার সম্পর্কে তাঁর যে-প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়েছিল দর্পণে প্রকাশিত সেই চিঠি থেকে শুরু করে, বাংলা-পত্রপত্রিকার কোনো-কোনো সম্পাদক আত্মমর্যাদা নষ্ট করে বিজ্ঞাপনের রেট কমান—এই পর্যন্ত গৌরীশঙ্কর প্রায় নির্দ্বিধ প্রতিবাদই করে এসেছেন। আর, প্রতিবাদের এই সামাজিক দায়িত্ববোধ তাঁর সাংবাদিক চেতনারই অংশ হয়ে গিয়েছিল। তখনকার অন্যান্য কাগজপত্রে গৌরীশঙ্করকে যে-ভাবে চিত্রিত করা হয়েছিল তাতে যেন

তাঁকে কটূক্তি ও মিথ্যা কথার সাংবাদিক বলেই মনে হয়ে যেতে পারে। দু-দুবার তিনি কোর্ট কর্তৃক অভিযুক্ত হন ও শাস্তিভোগ করেন। কিন্তু তাঁর এই সবচেয়ে 'অপকীর্তি' 'সংবাদ রসরাজ' সম্পর্কিত নানা বিবরণ থেকে মনে হয় এই কাগজটিকে তৎকালীন বাঙালির দু-নৌকোয় পা রেখে চলার বিরুদ্ধে গৌরীশঙ্কর অংশত কাজে লাগিয়েছিলেন।

অক্ষয়কুমার উনিশ শতকের মনন-আন্দোলনে বৈজ্ঞানিক যুক্তি -ও শৃঙ্খলাপরায়ণ চিন্তাবিদ—তাঁকে এ-ধরনের প্রথম মননকর্মী বলা যায়। কিন্তু মননের সার্বভৌমত্ব তাঁকে প্রমাণ করে যেতে হয়েছে ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিতেই। হিন্দু-ভারতীয় জীবনাদর্শের নতুন ব্যাখ্যায় আর খ্রীস্টান ও ইসলাম ধর্মীয় জীবনাদর্শের সঙ্গে হিন্দু চিন্তার সমন্বয়ের চেষ্টায় তাঁর মনন সক্রিয় ছিল। কিন্তু গুপ্তকবি বা গুড়গুড়ে ভট্টাচার্যের মতো তিনিও তো তাঁর স্বক্ষেত্রে প্রায় অদ্বিতীয় হয়ে ওঠেন শুধুমাত্র নিজেরই গুণে—পৈতৃক বা পারিবেশিক কোনো সমর্থন ছাড়াই। ব্রাহ্মধর্ম সংগঠনের সেই প্রাথমিক স্তরে দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারের মতো এমন একজন সহকর্মীকে পেয়েছিলেন যিনি তাঁর চিন্তার উপাদান সংগ্রহ করেন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে অথচ যার সামাজিক মূল নিহিত আছে কলকাতায়-মফস্বলে ছড়ানো বাংলাদেশেরই সমাজে। যতদিন পর্যন্ত কেশবচন্দ্রের পাশ্চাত্য আদর্শ ও দেশীয় অবতারবাদের মিশ্রণে ব্রাহ্মধর্ম তার লৌকিক ভিত্তি সম্পূর্ণ হারায় নি, ততদিন পর্যন্ত বেদের পৌরুষেয়তা, দেবভাষায় মন্ত্রপাঠের অর্থহীনতা, ও মন্ত্রপাঠ ও হিন্দুসংস্কারকর্মের কালানৌচিত্য প্রমাণে অক্ষয়কুমারই নেতৃত্ব দিয়েছেন। সমাজে যে-অবস্থান থেকে তিনি এই নেতৃত্ব পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন—তার অভিজ্ঞতাতেই কি তিনি 'বিদ্যাদর্শন' আর 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র ভাষাকে করে তুলতে পারেন এক শিষ্টগদ্যের আদর্শস্থানীয়? পরে, দ্বারকানাথের 'সোমপ্রকাশ'-এ আমরা শিষ্ট ও নিরপেক্ষ বাংলা সাংবাদিক গদ্যের যে-নিদর্শন পাই তার সন্ধান শুরু হয়েছিল অক্ষয়কুমারের 'বিদ্যাদর্শন' ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'তে। অর্থাৎ বাংলা সাংবাদিক গদ্যের ঐ শিষ্টতা—কোনো বাংলা-অনভিজ্ঞ সাহেব বা সাহেবসদৃশ হিন্দু কলেজীয় ছাত্রের মাধ্যমে অর্জিত হল না। সেখানেও জনরুচির প্রায় এক অনির্দেশ্য নিরিখে মৃত্তিকাপ্রোথিত এই বুদ্ধিজীবীই প্রথম ও প্রধান লেখক হয়ে ওঠেন। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদনা ও ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে অক্ষয়কুমারের সঙ্গে ব্রাহ্মদের অন্তর্সংঘাত বাংলার সামাজিক ইতিহাসে আলোচিত হয় নি। তখনকার সামাজিক ইতিহাস হিন্দু রক্ষণশীল, প্রগতিশীল ইয়ংবেঙ্গল ও ব্রাহ্ম-মডারেট—এই ছাঁচেই পরিচিত বলে ইয়ংবেঙ্গলের

ভিতরের ও ব্রাহ্মসমাজের ভিতরের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের প্রতি ঐতিহাসিকরা খুব বেশি তাকান নি। ব্রাহ্মসমাজের সেই প্রাথমিক স্তরে অক্ষয়কুমার ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ব্রাহ্ম-আন্দোলনকে যুক্তিবাদী ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছে।[১৪]

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ-এর 'সোমপ্রকাশ' প্রকাশিত হয়েছিল সিপাহি বিদ্রোহের পর ও পরবর্তী প্রায় বিশ বছর 'সোমপ্রকাশ' অন্যতম প্রধান বাংলা কাগজ হিশেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। আমাদের আলোচ্যকালের মধ্যে 'সোমপ্রকাশ' সবে আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু এই আরম্ভেই তিরিশের-চল্লিশের দশকের বাঙালি সাংবাদিকতার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া 'সোমপ্রকাশ'কে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

'সোমপ্রকাশ' তার প্রথম প্রকাশকালেই বাংলায় বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর দায়িত্বশীল কিন্তু সম্প্রদায়নিরপেক্ষ অংশকে একত্রিত করতে পেরেছিল। তখন বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের চরমক্ষণ—বিদ্যাসাগরের সমর্থন ও বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দ্বারকানাথের সম্পর্ক 'সোমপ্রকাশ'কে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিল। কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা —'সোমপ্রকাশ'ই প্রথম বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র যা কোনো অনুগ্রাহকের ওপর নির্ভরশীল ছিল না। 'সোমপ্রকাশ' প্রকাশ ও সম্পাদনায় দ্বারকানাথ নতুন ধরনের বাঙালি সাংবাদিকতার প্রমাণ রাখলেন—শুধু তাই নয়, 'সোমপ্রকাশ'-এর সংগঠনে তিনি ব্যক্তিগত যে-নিষ্ঠা ও দায়িত্ব প্রমাণ করেছেন তাতে যেন হিন্দু, ব্রাহ্ম, ইয়ংবেঙ্গলের অনুগ্রহের ও পৃষ্ঠপোষকতার সামাজিক আস্ফালনের চাইতে ব্যক্তির ভূমিকাই প্রয়োজনীয় গুরুত্ব পেয়েছে। বাংলা সাংবাদিক গদ্য সমষ্টির ভাষা আয়ত্ত করে জ্ঞানান্বেষণ-প্রভাকর-ভাস্কর-তত্ত্ববোধিনীর মধ্য দিয়ে সামাজিক অন্বয়ের পথে ব্যক্তির গদ্যে পরিণত হচ্ছিল।

গৌরীশঙ্কর, ঈশ্বর গুপ্ত, অক্ষয়কুমার সমকালীন হয়েও তাঁদের গদ্যের বৈশিষ্ট্যে ছিলেন পৃথক। তাঁদের গদ্যই ব্যক্তির গদ্যের প্রথম চিহ্ন। সেই ব্যক্তিত্ব সঞ্চারিত হয়েছে তাঁদের অভিজ্ঞতা ও প্রবণতার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য থেকে। গুপ্তকবির গদ্যের মডেলে ভারতচন্দ্র থেকে কবিগান-পাঁচালি গান সহজেই চেনা যায়। গৌরীশঙ্করের মডেল আর-একটু জটিল—সেখানে গ্রামীণ প্রত্যক্ষতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এক নাগরিক ভঙ্গি। অক্ষয়কুমারের গদ্যের মডেল আকার নিচ্ছিল কলকাতার শিষ্ট সমাজের প্রস্তূয়মান বাচন থেকে—সে-বাচন অবশ্য অনেকটাই আবদ্ধ ছিল ব্রাহ্ম-সমাজের নেতাদের মধ্যেই। চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে বিদ্যাসাগরের

বিতর্কের গদ্য ও পাঠ্যপুস্তকের ভাষা বাংলা শিষ্ট গদ্যকে নিয়ন্ত্রণ করছিল। অক্ষয়-কুমারে হয়তো তারই প্রথম লক্ষণ, দ্বারকানাথে হয়তো তার পরিণতি।

বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রের জন্মমৃত্যু

১৮৫৮-র মধ্যে প্রকাশিত বাংলাভাষার সংবাদ-সাময়িকপত্রের তালিকা থেকে কতকগুলি বিষয় লক্ষ করা যায়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'বাংলা সাময়িক পত্র'-এ উদ্ধৃত নানা পত্র-পত্রিকার প্রকাশিত সংবাদ থেকে এই হিশেব তৈরি করা হয়েছে। ১৮৩১, ১৮৩৯, ১৮৪৭, ১৮৪৯, ১৮৫০, ১৮৫১, ১৮৫৩—এই বছরগুলিতে বিভিন্ন সংবাদ-সাময়িকপত্রে প্রকাশিত বাংলা ভাষার পত্র-পত্রিকার তালিকা অনুযায়ী ১৮১৮ থেকে ১৮৩১-এর জানুয়ারি পর্যন্ত মোট ১৫টি বাংলা কাগজ বেরিয়েছে, তার ভিতর ১৮৩১-এর শুরুতে ৬-টি কাগজ চালু ছিল। ১৮৩০-এ ২৬—তার ভিতর ১৬টির প্রকাশ বন্ধ, ১৮৪৯-এ মোট '২৫ খানি বাংলা সাময়িকপত্র এখন চলিতেছে', ১৮৫০-এ নতুন পুরোন মিলিয়ে ২১টি চালু কাগজ—তার আগের বছর বন্ধ হয়ে গেছে এমন কাগজের সংখ্যা ১১। এই তালিকায় 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়'-এ মন্তব্য করা হয়েছে '···সাধারণ বিবেচনায় সমাচারপত্রের অবস্থা গত ও তৎপূর্ব্ব বর্ষ তুল্য বোধহয়···' (বা. সা. প.। ১১০)। ১৮৫১-র তালিকায় ১৯টি চালু কাগজের নাম আছে। সঙ্গে আর-একটি তালিকায় দেখা যায় ১৮১৮তে বাংলায় সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশের শুরু থেকে ঐ তালিকা প্রকাশের সময় পর্যন্ত মোট ৫৫টি কাগজ বন্ধ হয়ে গেছে। ১৮৫৩ সালের একটি তালিকায় চালু কাগজের সংখ্যা ১৯। কিন্তু বন্ধ হয়ে যাওয়া কাগজের সংখ্যায় আরো ২৩টি (মোট ৭৮) যুক্ত হয়েছে।

চালু কাগজগুলির তালিকা থেকে কোনো সরাসরি সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়। কারণ এক বৎসরের তালিকায় যে-কাগজ চালু, পরের বছর সেটি 'মৃত' তালিকায় ঢুকে গেছে। ১৮৫৩-র চালু কাগজের তালিকার প্রাচীনতম ৪টি কাগজই বেরিয়েছে ত্রিশের দশকে—'সংবাদ প্রভাকর', 'সম্বাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়', 'সংবাদ ভাস্কর', 'সংবাদ রসরাজ'। এবং আর ৩টি কাগজ বেরিয়েছে চল্লিশের দশকে—'তত্ত্বোধিনী পত্রিকা', 'নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা', 'উপদেশক'। এর ভিতর 'সমাচার চন্দ্রিকা'—সব তালিকাতেই আছে, কিন্তু এই সময়ের ভিতর তার ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়েছিল।

এই তালিকা দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় যে ১৮৫৩ সালের তালিকা অনুযায়ী বাংলা ভাষায় দৈনিক-দিনান্তরিক-অর্ধসাপ্তাহিক ৪টি কাগজ প্রায় চোদ্দ-পনেরো

বছর ধরে চালু আছে, মাসিক কাগজের মধ্যেও তত্ত্ববোধিনীর বয়স ১০ বৎসর পেরিয়ে গেছে।

প্রাচীনতম এই ৪টি কাগজের ভিতর প্রভাকর ও ভাস্করই প্রধান। 'সংবাদ রসরাজ'-ও ছিল ভাস্করের সংগঠনেরই অন্তর্গত।

চল্লিশের দশক থেকেই সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্রের মধ্যে একটা পার্থক্যের আভাস পাওয়া যায়। পঞ্চাশের দশকের পর তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই পার্থক্যের প্রভাব এই দুই ধরনের কাগজের রচনারীতির উপরও পড়েছিল। সাময়িকপত্রের বৈশিষ্ট্য প্রথম লক্ষ করা যায় তত্ত্ববোধিনীতে। তত্ত্ববোধিনী-র প্রতিষ্ঠার জন্য বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠা অপরিহার্য ছিল না। যদিও তার সামাজিক লক্ষ ছিল যথেষ্ট উদার ও ব্যাপক, বাংলাদেশের কৃষক সম্বন্ধে তত্ত্ব-বোধিনীতেই তো সবচেয়ে দীর্ঘ ও তথ্যযুক্ত রচনা বেরিয়েছিল, তবু, তত্ত্ববোধিনীর প্রচার সীমাবদ্ধ ছিল ব্রাহ্মসমাজের সংগঠিত এক অংশের মধ্যে ও কিছু অসংগঠিত হিন্দুর মধ্যেও। তাই বাঙালির তৎকালীন সমাজবিন্যাসের সার্থক প্রতিনিধিত্ব ও তার সাংবাদিকতা ও গদ্যচর্চার গুরুত্ব সত্ত্বেও তত্ত্ববোধিনী বাংলা সংবাদ-সাময়িক-পত্রের পাঠকসমাজের গ্রহণবর্জনের কোনো নির্দেশক নয়। ব্রাহ্মসমাজ ও জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি ছিল তত্ত্ববোধিনীর অব্যবহিত পরিমণ্ডল।

১৮৩০ থেকে ১৮৫৮-র মধ্যে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাগুলি তাদের উদ্দেশ্যবিষয়ে অনেকটাই নির্দিষ্ট হয়ে আসছিল। দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হওয়ার ফলে সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের মধ্যে পার্থক্যও স্পষ্ট হচ্ছিল, যদিও বাংলা সংবাদপত্রে তখনো সাময়িকপত্রের ধরনে দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হত।

সংবাদ-সাময়িকপত্রের এই কিছুটা নির্দিষ্টতা অর্জনের প্রক্রিয়ার ভিতরে পাঠকের গ্রহণবর্জনের প্রক্রিয়াও সক্রিয় ছিল। একটু খতিয়ে দেখলেই গ্রহণবর্জনের একটা পদ্ধতিও লক্ষ করা যায়। ১৮৩৯ সালের তালিকার মৃত কাগজগুলির মধ্যে ৭টিই ছিল বিশেষ ধরনের সাময়িকপত্র—'সম্বাদ সার-সংগ্রহ' বাংলাভাষায় ডাইজেস্ট ধরনের কাগজ, 'অনুবাদিকা' প্রধানত অনুবাদের কাগজ, 'বিজ্ঞানসেবধি', 'জ্ঞানোদয়', 'পশ্বাবলী' বালক-বালিকাদের ভিতর শিক্ষাপ্রচারের কাগজ, 'সম্বাদ মৃত্যুঞ্জয়ী' পদ্যে লেখা কাগজ ও 'সমাচার সভারাজেন্দ্র' প্রকাশিত হত বাংলা-পারসিক দুই ভাষায়। এই ধরনের কাগজ যে-বিশেষ পাঠকসমাজে গৃহীত হতে পারে তা সব সমাজেই কিছুটা অনিশ্চিত, আগেকার কলকাতার সমাজে ছিল আরো অনিশ্চিত। এই কাগজগুলির কোনোটিই চলে নি। 'সম্বাদ রত্নাকর' উঠে

যাওয়ার পর দর্পণে মন্তব্য করা হয়েছিল—'কটুকাটব্য রচিত পত্র'। 'সংবাদ রত্নাবলী' প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রভাকর' প্রথম প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ঈশ্বর গুপ্তের কর্তৃত্বে। কিন্তু 'ধর্মসভা'র হিন্দু সমাজপতিদের অনুগ্রহ না পেয়ে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়, কিছুদিন পর আবার প্রকাশিত হয়। ১৮৩৯-এর 'মৃত' পত্রের তালিকার 'সম্বাদ কৌমুদী' ও 'সম্বাদ সুধাকর' অনিয়মিতভাবে যথাক্রমে ১০ ও ৪ বৎসর ও 'জ্ঞানান্বেষণ' ৯ বৎসর প্রকাশিত হয়—সুতরাং সেগুলিকে 'মৃত পত্র' হিশেবে ধরা উচিত নয়।

১৮১৮ থেকে ১৮৫৮ পর্যন্ত প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার আয়ুষ্কাল বা প্রচারসংখ্যার হিশেব বাদ দিয়ে প্রধান বিষয়ের আন্দাজ থেকে এইরকম তথ্য দেখা যায়:

১. শুধু শিক্ষাপ্রচারের জন্যে পত্র-পত্রিকা প্রথম দিকে বড় একটা বেরয় নি—১৮৩১-এর মধ্যে মাত্র ২টি, ৫০ সালে ৬টি, ৫১ সালে ২টি, ৫৬ ও ৫৭ সালে ১টি করে।

২. ধর্মপ্রচারের পত্র-পত্রিকাও তেমন একটা বেরয় নি—১৮৩১-এর মধ্যে মাত্র ৪টি, ৪৬ সালে ২টি, ৪৭ সালে ৩টি, ৪৯-এ ২টি, ৫৬ সালে ৪টি করে।

৩. সংবাদপ্রধান পত্র-পত্রিকাই বরাবর নিয়মিত বেরিয়েছে। তার ভিতরও ১৮১৮ থেকে ৩১-এর মধ্যে ৯টি, ৩১ সালে ৫টি, ৩৮, ৩৯ সালে ৩টি করে, ৪৭, ৪৮, ৪৯-এ যথাক্রমে ৮, ৭ ও ৪টি করে।

৪. কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য বা বিশেষ ধরনের কাগজের সংখ্যা ৫৩ থেকে ৫৮ এই ছ-বৎসরে বেড়েছে যথাক্রমে ৩, ৩, ৫, ৩, ৩ ও ৫ করে।

তথ্যের এই বিন্যাস থেকেও বোঝা যায় ১৮৩০ ও ১৮৫৮-র মধ্যে ক্রমেই সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র পরস্পর থেকে পৃথক হয়েছে। সেই কারণেই বিশেষ ধরনের কাগজ বের করার ঝোঁক ৫০ সালের পর থেকে বাড়ছে।

সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের মধ্যে এই পার্থক্য স্পষ্ট হওয়ার সময় জুড়ে বাংলা কাগজের বৈষয়িক সংগঠনেরও জটিলতা বেড়েছে এবং ব্যবস্থাপনায় নতুনত্ব দেখা গেছে। সংবাদ ও সাময়িকপত্রের ভিতরকার পার্থক্য জনরুচির পরিবর্তন ও সচেতনতার প্রমাণ। ধীরে-ধীরে এক-একজন লেখক তাঁদের রচনারীতির বিশিষ্টতায় পাঠকদের কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছেন। এক-একটি কাগজ যেমন বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে, তেমনি এক-একজন লেখকও স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছেন।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে প্রকাশিত এই কাগজগুলির মধ্যে ধীরে-ধীরে নানা রকমের ধারা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। খ্রীষ্টান মিশনারি ও অন্যান্য সাহেবরা

সংস্কৃত পণ্ডিতদের সাহায্যে এক ধরনের কাগজ বের করতেন। বাঙালি ধনী ও সমাজনেতারাও পণ্ডিত-লেখকদের সাহায্যে কাগজ বের করতেন। এই দুই ধরনের কাগজের মধ্যে গদ্য রীতির মিল ছিল।

আবার, সাংবাদিক-সম্পাদকরাই কোনো-কোনো ক্ষেত্রে স্বত্বাধিকারী ও প্রধান লেখক হিশেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিলেন। চন্দ্রিকা, ভাস্কর ও প্রভাকর—এই ধরনের প্রথম কাগজ। এই সব কাগজের এক ধরনের আত্মসচেতন মৌলিকতা দেখা যাচ্ছিল, তখনকার অসংগঠিত গদ্যেও তার প্রভাব পড়ছিল।

ভাষাবিতর্ক

এই সময়ের মধ্যে বাংলা ভাষার গঠন নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক শুরু হয়েছিল। সেই বিতর্কে বাংলা ভাষার চরিত্র ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তখনকার চিন্তাভাবনার পরিপ্রেক্ষিত বোঝা যায়।

বাংলা ভাষা কী ভাবে লেখা হবে—এই প্রশ্নের মীমাংসায় নানাধরনের মতামতই প্রকাশিত হয়েছে। বিশের দশকের শেষ থেকেই এ-বিষয়ে কাগজেপত্রে নানারকম লেখালেখি শুরু হয়। এই লেখাগুলির উপলক্ষও ছিল বিচিত্র। কিন্তু এক ধরনের লেখা বেরত চিঠিপত্র হিশেবে। সেই লেখাগুলিতে মতামত থাকত বেশ সোজাসুজি ও লেখকের মনোভাব বুঝতেও কোনো কষ্ট হত না। আর, কিছু লেখা বেরত কোনো রচনা বা বই বা ব্যবস্থার সমালোচনা হিশেবে। সেগুলো অবশ্য কাগজের লেখা বলেই প্রকাশিত হত।

প্রথম ধরনের লেখাগুলিতে, চিঠিপত্রে, পত্রলেখকের দ্বিধা ধরা পড়ে—বাংলাভাষার উন্নতিই তাঁর কাম্য কিন্তু তার জন্যে বেশ জোরের সঙ্গে সংস্কৃতের পক্ষ সমর্থন করছেন। বাংলা ভাষার চর্চাতেই যে বাংলার উন্নতি সম্ভব—এ-রকম কোনো স্থির ধারণার অভাবে, সংস্কৃতের ওপর অতিরিক্ত জোর যেন তাঁরা দ্বিধাটা দিয়ে কাটাতে চাইতেন। এই ধরনের ভুল জোর কাগজের নিজের লেখাতেও অনেক সময় থাকত।

এই ধরনের যে-কটি লেখা পাওয়া যায় তাতে মনে হয় পত্রলেখকই হোন আর সম্পাদকই হোন তাঁরা সংস্কৃত নির্ভরতাতেই বাংলা ভাষার পরিত্রাণ ভাবতেন। সাংস্কৃতিক আত্মরক্ষার প্রবণতাও এই সব ক্ষেত্রে কাজ করে থাকবে। সেই প্রবণতা থেকেই ইংরেজি ভাষার ধরনকে বর্জন করার দিকেই ঝোঁক আসে। যেন

সমাজের একটি অংশের ইংরেজিমনস্কতার ক্ষতি অন্য-একটি অংশের ইংরেজি-নিরপেক্ষতা দিয়ে পূরণ করা হবে।

কিন্তু অবস্থার জটিলতা ছিল এইখানে যে সমাজের ভাষাচর্চা যাঁরা নিয়ন্ত্রণ করতেন তাঁরা সরাসরি ইংরেজিনবিশ ও সংস্কৃতনবিশ এই দুই দলে যদিও বিভক্ত ছিলেন, বাংলাভাষার চর্চাতে তাঁরা কিন্তু নিজেদের ইংরেজিসর্বস্বতাকে প্রয়োগ করতে চাইতেন না। প্রকাশিত চিঠিপত্র ও মত-মন্তব্যে বাঙালি লেখকদের এমন কোনো লেখা পাওয়াই যায় না যেখানে বাংলা ভাষাকে ইংরেজি ভাষার মতো করে গড়ে তোলার পক্ষে মত দেয়া হয়েছে। বরং 'ইয়ংবেঙ্গল'-ই হোক আর সংস্কৃত পণ্ডিতই হোক, সবাই চেয়েছেন বাংলাভাষার সংস্কৃতনির্ভরতা রক্ষা করতে। তার ভিতর কারো-কারো ছিল হয়তো বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ স্বয়ংসম্পূর্ণতা সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা।

তার কারণ, আমাদের এই ভাষানির্বাচনের প্রশ্ন ওঠে নি আমাদেরই সমাজ-বিকাশের কোনো বিশেষ স্তরে, কোনো বিশেষ সংকট থেকে মুক্তির তাড়নায়। আমাদের ভাষা সামাজিক ব্যবহারের নানা ইতিহাসের মধ্য দিয়ে কোনো একটি পরিণতিতে পৌঁছয় নি, যেখানে ভাষানির্বাচনের প্রশ্ন জাতীয় আত্মবিকাশের ধারারই গভীরে নিহিত। আমাদের সমাজবিকাশের ধারা ও আমাদের ইতিহাসের ভিতরে সম্পূর্ণ অসংলগ্ন, যোগাযোগহীন, অবান্তর এক বিদেশী ইতিহাসের কার্য-কারণের প্রক্ষেপে আমাদের গদ্যভাষাকে গড়ে উঠতে হয় অত্যন্ত কম সময়ে। আর তার সামনে থাকে সাম্রাজ্যবিস্তারী ইংরেজি ভাষার আদর্শ। এই অসম পরিস্থিতিতে বাংলা ভাষাকে ইংরেজি ভাষার মতোই ব্যবহারযোগ্য করে তোলার ইচ্ছার সঙ্গে-সঙ্গেই একটা বিপরীত টানও কাজ করেছে আমাদের ভাষাগত স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার টান। যেমন, ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসায়িক বা চাকরিগত সম্পর্ক ও বিশেষ ধরনের সামাজিক মেলামেশা সত্ত্বেও নিজের পরিবারে হিন্দু-সামাজিক আদর্শটিকে বাঁচিয়ে রাখা হত, বিশেষত স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের ছাঁচটিকে—স্ত্রীর সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে ময়দানে বেড়াতে যাওয়া বা খোলা ফিটনে হাওয়া খাওয়ার নাটকীয়তা সত্ত্বেও—তেমনি ইংরেজিসর্বস্ব অস্তিত্বও বাংলা ভাষার এক নিজস্বতা রক্ষা করতে চাইত। এই নিজস্বতার ছক নিয়েও কিছু তর্ক ছিল।

সমাচার দর্পণ। ৫ জুলাই ১৮২৮

এই মহারাজধানী কলিকাতা নগরী মধ্যে বহুবিধ সমাচারপত্র প্রচারপ্রযুক্ত …অসভ্যতা ও অজ্ঞান লোপপূর্ব্বক সভ্যতা ও জ্ঞানোদয় হইতে পারে এবং

ইহাতে বাঙ্গলা লেখা পড়ার ধারা যাহা এতদ্দেশে পূর্ব্বে প্রায় ছিল না তাহাতেও সকলের মনঃপ্রবেশ হইবার বিষয়। এবং ভাষাতে শব্দ শ্লেষ ও বর্ণবিন্যাস ও বর্ণানুপ্রাস ও রূপকালঙ্কারাদি জ্ঞান জন্মিতে পারে এবং সতত বিষয় ব্যাপৃত লোকেরদের ক্ষণেক আলস্য ত্যাগেরও এই এক উত্তম পথ। ইত্যাদি নানা-প্রকার এই সমাচারপত্র দ্বারা লোকের মহোপকার হইবার সম্ভাবনা বটে। কিন্তু তত্তৎপত্রপ্রকাশকেরদের কিঞ্চিৎ মনোযোগের অভাবে বিপরীত ফল সম্পত্তি হইতেছে। তদ্বিবরণ বিজ্ঞ মহাশয়েরা যে ২ পত্র প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহাতে বর্ণ ভেদে কর্ণ ভেদ করে এবং পদাদি বিচ্ছেদ বিচ্ছেদ প্রাপ্ত এবং ছাপা দোষ ছাপা রহে না ও ষত্বণত্বের তত্ত্বও পাওয়া ভার অথচ সংস্কৃতানভিজ্ঞ বিষয়ি লোকেরা তত্তৎ পত্র অতিপবিত্র বোধ করিয়া নিজ ২ বালকেরদিগকে তদনু-সারে লেখা পড়া শিক্ষা করিতে শিক্ষা দেন এবং আপনারাও তদনুসারে অভ্যাস করেন।···

অতএব বিনয়পূর্ব্বক আমার এই নিবেদন যে সমাচারপত্রসম্পাদক মহাশয়েরা কিঞ্চিৎ ব্যয়পূর্ব্বক সংস্কৃতাভিজ্ঞ দিগ্‌দর্শি লোকদ্বারা নিজ ২ পত্র সংশোধিত করিয়া প্রকাশ করেন তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত তাবদুপকার সম্পাদন হইতে পারে···। কস্যচিৎ পত্রগ্রাহকস্য

[স. সে. ক. ১।৫২]

সমাচার দর্পণ। ১৮ জুলাই ১৮২৯

শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু···কস্যচিৎ বিদেশি পাঠকের লিখিত এক পত্র পাঠে তুষ্ট হইলাম যেহেতুক তিনি লেখেন যে বাঙ্গালা লেখার শেষাদি নির্ণায়ক চিহ্নাভাবে অনেক ব্যাঘাত হয়। এ কথা আমি স্বীকার করি কিন্তু চিহ্নভিন্ন পাঠে ভিন্নদেশীয়দিগের যে প্রকার ব্যাঘাত এতদ্দেশীয়দিগের তাদৃশ নহে যেহেতুক বালককালে অর্থাৎ পাঠদশায় যে সংস্কার জন্মে তাহার অন্যথা হয় না।···তিনি যেপ্রকার চিহ্ন দিতে পরামর্শ দেন তাহা চলিত হইলে ভাল হয় কিন্তু ব্যবহার হওয়া সুকঠিন যেহেতুক অস্মদ্দেশীয় ভাষা ও অক্ষর আধুনিক নহে ইহার মূল সংস্কৃত তাহার লিখন পঠনের যে ধারা ও ছেদ ও ভেদের যে চিহ্ন একদাঁড়ি আছে তাহাই তাবদ্দেশ অর্থাৎ সংস্কৃত শাস্ত্র ও তন্মূলক ভাষা ব্যবসায়িদিগের চলিত আছে এক্ষণে নূতন কোন বিষয় কি প্রকার চলিত হইতে পারে···। কস্যচিৎ হিন্দুপাঠকস্য।

[স. সে. ক. ১।৫২-৫৩]

সংস্কৃতের প্রতি এই ধরনের নির্ভরতা সত্ত্বেও বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্র্য বিষয়েও কিছু মত প্রকাশিত হয়েছে। এই মতের পক্ষে 'বেঙ্গল হেরাল্ড'-এর বাংলা সংস্করণ 'বঙ্গদূত'-এ একটি লেখা বেরিয়েছিল। 'বঙ্গদূত'-এর স্বত্বাধিকারীদের মধ্যে ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রামমোহন রায়। এই মন্তব্যে বাংলা ভাষার স্বাধীন বিকাশের সম্ভাবনা নিয়ে কিছুটা আশা প্রকাশিত হলেও—বাংলাভাষী জনসাধারণ সম্পর্কে কোনো বিশেষ সহানুভূতির প্রকাশ ঘটে নি। অর্থাৎ সংস্কৃতপণ্ডিতদের যে-অভিযোগ ছিল যে বাংলা ভাষা বস্তুত অপভাষা—সেই অভিযোগের কোনো প্রতিবাদ এই মন্তব্যে নিহিত নেই। যদিও বাংলা ভাষার চর্চা যেমন বাড়ছে তাতে অচিরে বাংলাভাষা উন্নত হয়ে উঠবে এমন প্রত্যাশা করা হয়েছে।

তখনকার ভাষাবিতর্কে, বাংলা ভাষা সত্যিই অপভাষা কি না এই প্রশ্নটি কোনো সময়েই উত্থাপিত হয় নি। সকল পক্ষই এই বিষয়ে একমত যে বাংলা ভাষা খুব উন্নত ভাষা নয়। এ-বিষয়েও মোটামুটি একমত যে বাংলা ভাষাকে যোগ্য করে তুলতে হবে। কিন্তু সে-যোগ্যতা কখনোই সংস্কৃত বা ইংরেজির সঙ্গে তুলনীয় নয়। সংস্কৃতের ঐতিহ্য আর ইংরেজির সমকালীন দাপটে—বাংলা ভাষার সমর্থকরাও তার হীনতা বিষয়ে সচেতন ছিলেন। বাংলা ভাষার এই হীনতার অন্যতম প্রধান উদাহরণ হিশেবে বারবার উত্থাপিত হয়েছে—বাংলা ভাষার একটি প্রামাণিক কথ্য রূপের অভাব ও কথ্য বাংলার রূপবৈচিত্র্য। এই অভিযোগ বিদেশী মিশনারিরা তুলেছিলেন। অথচ বাংলা ভাষার স্বদেশীয় সমর্থকরা এই যুক্তি তখন একবারও তোলেন নি—কোনো জীবন্ত ভাষার কথ্য রূপবৈচিত্র্য সে-ভাষার সম্পন্নতারই প্রমাণ।[১৫]

তা তোলা সম্ভবও ছিল না। এখনো সে-যুক্তি তোলা সম্ভব নয়। কারণ বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্র্যের কাল থেকেই বাংলা ভাষা রাষ্ট্রীয় সমর্থনহীনতায় অন্ত্যজ জনসাধারণের ভাষা হিশেবে চর্চিত হয়েছে। প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষা যখন স্বাধীন ভাষা হিশেবে মুক্ত হয়েছে, সেই চর্যাপদ থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সময়েই বাংলায় তুর্কিশাসন শুরু হয়ে গেছে। দীর্ঘ সুলতানি আমলে বাংলা রাষ্ট্রীয় ভাষা ছিল না। তখনই বাঙালি উচ্চবর্ণের মধ্যে পারসিক ভাষার চর্চা শুরু হয়। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা যখন পারসিক ভাষায় দক্ষতার গুণে দরবারে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেন ও কায়স্থ বর্ণের মধ্যে আমলাতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা জমতে থাকে—সেই সময় বাংলাভাষী অন্ত্যজ শ্রেণীর জনসাধারণ তার সাংস্কৃতিক প্রয়োজন মিটিয়েছে তাদের লৌকিক দেবদেবীর গীত-পাঁচালি-ব্রতকথায়, কিছু লুপ্ত লোকসংগীতে বা

লোকনাট্যে, আর, চৈতন্য-পরবর্তী বাংলায় ইয়োরোপীয় শক্তির আগমনের পূর্ববর্তী স্বল্পকালীন অবকাশে, পালাকীর্তনে। ইংরেজ-পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যের দশা নিয়ে যাঁরা আক্ষেপ করেন আর সেই আক্ষেপের সঙ্গতিতেই উনিশ শতকের বাংলা ভাষার বিষয়-বিস্ফারকে তুলনায় স্থাপন করেন তার পূর্ববর্তী প্রায় হাজার বছরের সঙ্গে—তারা এই নিদারুণ ঐতিহাসিক সত্যটি ভুলে থাকেন যে বাংলা ভাষার জন্ম থেকেই এই বর্ণহিন্দু-সমাজের নিম্নতম শ্রেণীগুলির জনস্তরই এই ভাষাকে রক্ষা করে এসেছে। পরবর্তীকালে সেই জনস্তরের অংশবিশেষের ইসলামে ধর্মান্তরণ ঘটেছে। সেই জনস্তরে প্রয়োজন হয় নি দলিলদস্তাবেজের, বা, ধর্মতত্ত্বের, বা, সামাজিক কোনো অভিজ্ঞতা-বিনিময়ের—তাই সে-স্তরের বাংলা ভাষা থেকে আকার নেয় নি বাংলা গদ্য, আইন-আদালতের ভাষা বা তত্ত্বচিন্তার ভাষা। সমাজের নিম্নতম শ্রেণী-গুলির সেই জনস্তরে ভাষা শ্রমের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। যখন সেই শ্রমের সঙ্গতিতে ভাষাকে আশ্রয় করে ঐ মানুষজন স্বস্তি চেয়েছে, অবকাশ চেয়েছে, শিল্পের বিশ্রাম চেয়েছে—তখনই তাদের সেই দৈনন্দিনের ভাষার ওপর অত্যন্ত সরল সুর আরোপিত হয়েছে। সেই সুর সে-ভাষাকে তার শ্রম-সংলগ্নতা থেকে বিমূর্ত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সে-সুরও তাদের দৈনন্দিন কথার সুরেরই সামান্য স্পন্দিত সম্প্রসারণ। আবার, ইংরেজ রাজত্বেও বাংলা রাষ্ট্রীয় ভাষা নয়—তখনো তার প্রধান চর্চা মধ্যবিত্তের অন্তঃপুরে, বাজারে, দোকানদারিতে, সমাজের নিম্নশ্রেণীর জনস্তরে।

তাই বাংলাগদ্যের এই আদিকালে যাঁরা বাংলা ভাষার স্বাধীন বিকাশের কথা বলেছেন তাঁরাও বাংলাকে অন্ত্যজ ভাষা হিশেবেই গণ্য করেছেন। হিন্দু কলেজের মাত্র কয়েক বৎসরের শিক্ষাতেই তো মুখের ভাষা বদলে গিয়েছে, বন্ধুদের সঙ্গে ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের নিভৃতিতেও বাংলা অচল, সভা-সমিতিতে তো কথাই নেই। যে-মাতৃভাষা আত্মমর্যাদা বাড়ায় না, সে-মাতৃভাষার বিকাশও ঘটে না সমাজের প্রকাশ্যে।

কিন্তু বোধহয় এই দীর্ঘ হাজার বৎসরব্যাপী অন্ত্যজ অস্তিত্বের অজ্ঞাতবাস বাংলাভাষার ভিতরে কোনো এমন দুর্মর শক্তি সঞ্চিত রেখেছিল ইংরেজ সংসর্গের আদিম অভিঘাতেই যা সৃষ্টির বিস্ফোরণে উড়িয়ে দিয়েছে তার বিকাশের অনৈতিহাসিক ব্যত্যয়কে। তাই বাংলা ভাষা সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবহারের ভাষা না হয়েও সৃষ্টির ভাষা হয়ে উঠতে পারে। তাই আজও শিক্ষিত বাঙালির মননের ভাষা ও কাজের ভাষা হিশেবে স্বীকৃত না হয়েও বাংলা তার বিচ্ছিন্ন মর্যাদার স্বাতন্ত্র্য ও একাকিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। বাংলা আর এখন অনুবাদের ভাষা

নয়। কিন্তু শিক্ষিত বাঙালিকে বাংলা ভাষার যোগ্য হতে তার মননের অনুবাদ-সর্বস্বতা ত্যাগ করতে হবে।

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যাঁরা বাংলা ভাষার স্বাধীন বিকাশের কথা ভেবেছিলেন, তাঁরাও সংস্কৃতনির্ভরতা ছাড়তে পারেন নি—বাঙালি সমাজের পৌরাণিক অভ্যাসে। সেই সুলতানি আমল থেকেই ভদ্রলোকদের যখন বাধ্য হয়ে বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে হয় তখন তাঁরা সংস্কৃত পদবিন্যাসের কিছু অনুকরণে তার শুদ্ধি ঘটাতেন। উনিশ শতকেও সেই ব্যবস্থাপত্রই কখনো-কখনো দেয়া হয়েছে, যদিও, এই ব্যবস্থাপত্রে বাংলা ভাষার বিকাশকে ভাষাবিকাশের ইতিহাসের যুক্তিতেই দেখার চেষ্টা আছে।

বঙ্গদূত। ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০

…ইদানী তদ্ভাষাভাষিত কোষাদি [বাংলা ভাষায়] নানা গ্রন্থ প্রচলিত হওয়াতে বিশেষতঃ তদ্ভাষোক্ত সমাচারপত্র দেশ দেশান্তরে ব্যাপ্ত হওয়াতে যে অনুশীলন হইতেছে ইহাতে সংশোধিত হওনের আশ্বাসে সম্পূর্ণ বিশ্বাস নির্যাস করা যাইতে পারে যেহেতুক কএক বৎসর পূর্ব্বে অনেকেই বর্ণশুদ্ধিক্রমে পত্র লিখিতে পারিতেন না এক্ষণে অনেকপত্রে সাধুভাষায় সবিন্যাস সানুপ্রাস বচন রচনা দৃষ্ট হইতেছে কিন্তু এখনো ব্যাকরণবোধাভাবে অনেকের বক্তব্যে বৈয়র্থ্য হওনে ব্যাঘাত নাই সুতরাং বাক্যের শুদ্ধির নিমিত্ত সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অলঙ্কার সাহিত্য দর্শন অবশ্যই কর্ত্তব্য কেননা সংস্কৃতানুযায়ি ভাষাকেই সাধুভাষা কহিয়াছেন এমতে তদ্ব্যাকরণে দৃষ্টি থাকিলেই বঙ্গভাষায় পারিপাট্য সহজেই হইতে পারে। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন সাধারণের দুঃসাধ্য অথচ এ বঙ্গভাষা সাধারণে সিদ্ধ অতএব কোন সাধারণ উপায়দ্বারা সাধারণ ভাষাবগতির সঙ্গতি হইলে সুলভেই দুর্লভ লব্ধ হইতে পারে সে উপায় অস্মদাদির বোধে এই অনুভব হয় যে যেপ্রকার সকল ভাষার ব্যাকরণ আছে সেই প্রকার এ ভাষারো সংস্কৃত বৈয়াকরণদ্বারা সৃষ্ট হইয়া সর্ব্বত্র চলিত হয় এবং এ ভাষারো অলঙ্কার শাস্ত্রবৎ নির্ম্মিত হয় যদ্যপি বিদেশজ বর্ণান্তরীয় মহাশয়েরদিগের শিক্ষোপযোগি বঙ্গভাষায় ব্যাকরণ বর্ণান্তরীয় ভাষায় সঙ্কলিত আছে কিন্তু তাহা স্বদেশীয় লোক শিক্ষার্থে উপকারি নহে এতদ্দেশীয় ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণের রীত্যনুসারে এক ব্যাকরণ এবং ঐরূপে এক অলঙ্কার শাস্ত্রও সংগ্রহ করা উচিত।

[স. সে. ক. ১। ৫৬]

এই ভাষাবিচার শুধু খবরের কাগজের ভাষা কেমন হওয়া উচিত—এই প্রশ্নটুকুর মধ্যেই আটকে ছিল না। তেমন থাকা তো সম্ভবও নয়। কাগজের ভাষা প্রতিদিন বা নিয়মিত স্বল্প ব্যবধানে নানা বিষয়ের সঙ্গে জড়িত হচ্ছে। ফলে ভাষার সচলতা ও সৃষ্টিক্ষমতার একটি পরীক্ষা কাগজের ভাষাতে হয়ে থাকে। কিন্তু ভাষার ভার-বহনক্ষমতা ও প্রসারণক্ষমতার পরীক্ষা হতে পারে কোনো বিশেষ বিষয় নিয়ে রচিত বইয়ে। তাই ভাষাবিচার থেকে বাংলা বই সম্পর্কেই নানারকম মতপ্রকাশের সুযোগ জোটে।

সংবাদ-সাময়িকপত্রে ভাষার এই নিয়ত পরীক্ষার অভিজ্ঞতা থেকেই বাংলা ভাষার প্রাচীন সাহিত্যের ও এমন-কি বাংলা ভাষায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক প্রকাশিত গদ্যগ্রন্থগুলি সম্পর্কে তখন নানারকম প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। এই প্রশ্নগুলি থেকে মনে হয় যে, ভাষা নিয়ে বিতর্কের গভীরে সচেতন নির্বাচনের প্রক্রিয়াও সক্রিয় ছিল। এ-বিষয়ে কাশীপ্রসাদ ঘোষের একটি রচনায় বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও আধুনিক রচনাগুলি নিয়ে নতুন মূল্য নিরূপণ করা হয়। কাশীপ্রসাদ ঘোষের রচনাটির পক্ষে ও বিপক্ষে নানা রচনা বেরয়। ফলে তখনকার অভিজ্ঞতার প্রতিফলন এই ধরনের মতামতের ভিতর ঘটে থাকে। প্রাচীন ও প্রচলিত সাহিত্যকে কোন দৃষ্টিতে বিচার করা হচ্ছে তারই ওপর সাহিত্যের ভাষা নির্বাচন ও সংস্কারের প্রশ্ন অনেকখানি নির্ভর করে। ইয়োরোপীয়-দের বাংলাচর্চা সম্পর্কে তৎকালীন বাঙালি সমাজের প্রতিক্রিয়ার খুব বেশি সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। আবার সংবাদ-সাময়িকপত্রের গদ্যচর্চা সেই ধারার সঙ্গে কোনো-ভাবেই যুক্ত ছিল না। ফলে বাংলা রচনার কালানুক্রম বিষয়ে কাশীপ্রসাদ ঘোষের রচনাটির সাক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ।

সমাচার দর্পণ। ৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০

বাঙ্গলা গ্রন্থ ও গ্রন্থকারক।…বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ ঐ প্রকরণের আরম্ভে কহেন যে পদ্যাপেক্ষা গদ্যরচনায় এতদ্দেশীয় লোকেরদের মনোযোগের অল্পতা ছিল এবং গত ত্রিশ বৎসরাবধি বাঙ্গলা ভাষায় গদ্যরচনায় গ্রন্থ প্রকাশ হইতেছে। কিন্তু তিনি লেখেন যে শ্রীরামপুরের মিসিনরি সাহেবেরা ইহার পূর্ব্বে গদ্যরূপে ধর্ম্মপুস্তক তরজমা করিয়াছিলেন কিন্তু ঐ তরজমা ইংগ্লণ্ডীয় ভাষার রীত্যনুযায়ি হওয়াতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের বোধ গম্য হইত না। অপর মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রাজাবলিনামক গ্রন্থ অর্থাৎ ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছিলেন ঐ গ্রন্থ পাঠকবর্গেরা উত্তমরূপে অবগত থাকিবেন…বাবু

কাশীপ্রসাদ ঘোষ ঐ গ্রন্থের শব্দবিন্যাসের নিন্দা করিয়া কহেন যে তাহা নিরাবিল বাঙ্গলা নহে…

পরে পুরুষপরীক্ষানামক এক পুস্তক মুদ্রিত হয়…বাবু কাশীপ্রসাদ ঐ পুস্তকেরও নিন্দাপূর্ব্বক কহেন যে রাজাবলি হইতেও ইহার কথার বিন্যাস অপকৃষ্ট।…ফিলিক্স কেরি সাহেব ইংগ্লণ্ডদেশের বিবরণ তরজমা করিয়া প্রকাশ করেন তাহাতে কাশীপ্রসাদ ঘোষ বিস্তর দোষোল্লেখ করিয়াছেন। ঐ পুস্তক যে দোষরহিত নহে ইহা আমরা স্বচ্ছন্দে স্বীকার করি…অবিকল সংস্কৃতানুযায়ি ভাষায় ইংগ্লণ্ড দেশীয় উপাখ্যান গ্রন্থ রচনা করাতে তাঁহার ঐ গ্রন্থ নিষ্ফল হইল।…

অপর বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ কহেন যে শ্রীরামপুরে বাঙ্গলা ভাষায় যত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে তাহা সকলি দোষযুক্ত এবং এতদ্দেশীয় লোকেরা তাহা শ্রীরামপুরের বাঙ্গলা বলিয়া দোষোল্লেখ করেন…।

[স. সে. ক. ১ । ৫৩-৫৪]

কাশীপ্রসাদ ঘোষের রচনার এই সার-সংক্ষেপ থেকে দর্পণের মতামতও অনুমান করা যায়। ভাষা সম্পর্কে এই ধরনের সচেতনতা থেকেই চন্দ্রিকার বাংলাচর্চার সমর্থন পাঠকসমাজে জুটেছিল। পরবর্তী সময়ে প্রভাকর ও ভাস্করের বাংলাচর্চাও সেই সমর্থনের ওপর অনেকখানি নির্ভর করেছে।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও শ্রীরামপুরের মিশনের চর্চিত বাংলাভাষার পাঠক-সমাজের গ্রহণবর্জন প্রক্রিয়া দ্বারা পরীক্ষিত হওয়ার সুযোগ ছিল না। সেখানে ভাষা ছিল ওপর থেকে আরোপিত। যে-ভাষায় বই লেখা হত তাকেই বাংলা গদ্য ভাষা হিশেবে গ্রহণ করতে পাঠকেরা বাধ্য ছিল। কিন্তু সংবাদ-সাময়িকপত্রের গদ্যচর্চার নিয়তপরীক্ষা ছিল পাঠকের কাছে। পাঠকের অভিজ্ঞতার সঙ্গতিপূর্ণ রচনাশৈলী, আর রচনাপাঠের ফলে পাঠকের অভিজ্ঞতারও পরিবর্তন—এই প্রক্রিয়াতে বাংলা গদ্য সংবাদ-সাময়িকপত্রে বিশেষ চেহারা নিয়েছে। সেই বিশেষ রচনাপদ্ধতির দোষত্রুটি যাই থাক তার প্রধান বৈশিষ্ট্যই ছিল পাঠকের বোধগম্য হয়ে ওঠা। ফলে ১৮৩০ সালেই 'বঙ্গদূত'-এ এই ধরনের মত প্রকাশিত হয়েছে।

বঙ্গদূত। ৬ মার্চ ১৮৩০

…সংস্কৃতাধিক্যে বঙ্গভাষার কাঠিন্য বৃদ্ধি সম্ভাবনায় সংশোধন সিদ্ধি হইতে পারে না…সংস্কৃতানুযায়িকা ভাষা যাহা সাধু পরম্পরায় ব্যবহার হওয়াতে সাধুভাষা-

রূপে খ্যাতা তাহাই শুশ্রাব্যা বিশেষতঃ এ বঙ্গদেশ যাহার প্রাচীন নাম গৌড়-দেশ ইহা অতিব্যাপক এতন্মধ্যে যোজনানন্তর ভাষা প্রসিদ্ধা আছে…।

…ইদানীং নানাদেশীয় কথা বাঙ্গলা ভাষাতে মিলিতা হইয়াছে। বিশেষতঃ ব্যবহার কাণ্ডের তাবৎ শব্দ লুপ্ত হইয়া বহুকাল জবন ও ম্লেচ্ছাধিকার-প্রযুক্ত তজ্জাতীয় ভাষা প্রচলিতা হইয়াছে। এই বঙ্গদেশের মধ্যে স্থানে ২ ভাষার প্রভেদ ও শ্রুতিকটুতা আছে কিন্তু গঙ্গার উভয়তীরস্থ লোকের বাক্য উত্তম ও সুশ্রাব্য।

…ইহার মধ্যেও বিশেষ সুশ্রাব্য এবং সভ্য শৌভ্য ভব্যসকলের বক্তব্য যাহা তাহাকেই সুন্দর বচন নিরাকরণপূর্ব্বক তাহারি রচনার নিয়ম সংস্কৃত ব্যাকরণানুকরণপূর্ব্বক সৃষ্টিকরণ কর্ত্তব্য।

[স. সে. ক. ১। ৫৭-৫৮]

বইয়ের ভাষার প্রশ্নের সঙ্গে ত্রিশের দশকে ছাপার হরফের প্রশ্নটিও প্রধান হয়ে ওঠে। দু দিক থেকে এই হরফের প্রশ্ন উঠেছিল। ১. সংস্কৃত ভাষার চর্চা বাংলা দেশে দেবনাগরী হরফে হওয়া উচিত, না, বাংলা হরফে হওয়া উচিত ; ২. বাংলা ও অন্যান্য ভাষার জন্য রোমান হরফ গ্রহণ করা উচিত কি না।

হরফের সঙ্গে ভাষার প্রশ্নের যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কারণ সরকার যদি বাংলা ভাষার জন্য বাংলা হরফকেই মেনে নেন ও সংস্কৃত বইও বাংলা হরফেই ছাপেন তাহলে ছাপার ব্যবস্থার এমন পরিবর্তন হতে পারে যে তার ফলে বাংলা ছাপাখানার দ্রুত প্রসার হবে। ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি এই দুটি প্রশ্নই কাগজে প্রধান আলোচ্য হয়ে উঠেছিল।

ততদিনে সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতাও কিছুটা জমেছে। তাই দেশীয় ভাষায় পুস্তক প্রকাশের জন্য ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক বরাদ্দ টাকার ভাগ বাংলা ভাষার পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে। ১৮৩৪-এ 'সমাচার দর্পণ'-এ মন্তব্য করা হয়েছে যে পার্লামেণ্ট 'যে লক্ষ টাকা বৎসরে প্রদান করিয়াছিলেন তন্মধ্যে যদ্যাপি এই রাজধানীর অধীন অর্দ্ধেক প্রজারদের ভাষা অর্থাৎ বাংলা ভাষাতে কোন এক গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত হয় নাই।' সংস্কৃত পুস্তক দেবনাগরী হরফে ছাপানোর বিরুদ্ধেও এই রচনায় প্রতিবাদ করা হয়েছে, 'ঐ অক্ষর প্রায় বঙ্গদেশীয় লোকেরা পড়িতে পারেনও না এবং পড়িবেনও না', 'ঐ সকল গ্রন্থ (বাংলা হরফে প্রকাশিত) ভিন্ন২ লোকেদের নিজ ব্যয়েতে নানা মুদ্রণ যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়া অনায়াসে বিক্রয় হইতেছে'।

সমস্ত ভারতীয় ভাষা রোমান হরফে বা ইংরেজি হরফে ছাপানোর প্রস্তাবও এই সময় ওঠে। ততদিনে বাংলা ভাষার চর্চা কিছু বাড়ছে ও সংবাদ-সাময়িকপত্রের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা কিছুটা সংগঠিতও হচ্ছে, যদিও আরো কয়েক বৎসর পর প্রভাকর-ভাস্করের যুগে সে-সংগঠন আরো ব্যাপক হয়। ইংরেজি হরফে বাংলা ও অন্যান্য ভাষার বই ছাপানোর প্রস্তাব প্রায় সকলেই অগ্রাহ্য করেন। এমন-কি সাহেবদের মধ্যেও এ-বিষয়ে মতৈক্য ছিল না। ১৮৩৪-এর ৯ আগস্টের দর্পণে এ-বিষয়ে এক বিস্তৃত আবেদনপত্র মুদ্রিত হয়েছিল। সেই আবেদনে ইংরেজি হরফে কী ভাবে বাংলা লেখা সম্ভব তার উদাহরণসহ আটদফা যুক্তি দেওয়া হয়—ইংরেজি হরফের পক্ষে। আবেদনপত্রের শেষে আবার এই আট দফার সংক্ষিপ্তসার দেয়া হয়েছে। ইংরেজি ভাষাতে দেশীয় ভাষা লিখলে এক অক্ষরজ্ঞানেই অনেক ভাষা লেখা যাবে, দেশীয় ভাষাগুলির মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে ও বহুভাষার ফলে ভারতবর্ষে বিদ্যাচর্চার বাধা দূর হবে—এই তিনটি যুক্তিকেই নানাভাবে উপস্থিত করা হয়। 'সমাচার দর্পণ' বা অন্যান্য কোনো কাগজই এই মত সমর্থন করে নি।

সংবাদ-সাময়িকপত্রে বাংলা ভাষার নিয়মিত চর্চার ফলে ভাষার রূপান্তর ঘটছিল। সেই রূপান্তরের সময় রোমান হরফ ও বাংলা হরফের মধ্যে বাংলা হরফের পক্ষে জনমত বাংলা ভাষার চর্চাকে শুধু বাধামুক্তই করে নি, নতুন উদ্যম দিয়েছে। বাংলা ভাষার অনুকূলে সে-রকমই আর একটি সিদ্ধান্ত—১৮৩৭ সালে আদালতে ও অন্যান্য সরকারি কাজে পারসিক ভাষার ব্যবহার তুলে দিয়ে বাংলা ভাষার ব্যবহার প্রবর্তন।

পারসিক ভাষার বিরুদ্ধে বাঙালি হিন্দুদের আপত্তির সাম্প্রদায়িক কারণও ছিল। কিন্তু দর্পণের মতো আপাত-নিরপেক্ষ কাগজও পারসিক ভাষার বিরুদ্ধে বাংলা ভাষাকে সমর্থন করেছে। তার কারণ বাংলাই এদেশের অধিকাংশ লোকের ভাষা।

কিন্তু দেশের লোকের ভাষাতেই আদালতের ও সরকারের কাজকর্ম চলবে এ যুক্তি বারবার যদিও উত্থাপিত হয়েছে—তবু এ কারণে পারসিক ভাষার বদলে বাংলা ভাষা ব্যবহারের আদেশ জারি (১৮৩৯-এর ১ জানুয়ারি থেকে বলবৎ) হয় নি।

পারসিক ভাষাই চালু রাখার সমর্থনে দর্পণে যে দুটি-একটি মাত্র চিঠি প্রকাশিত হয়েছে তাতে এই যুক্তিই দেয়া হয়েছে যে বাংলা চালু করলেই আদালত ও সরকারি কাজে সব লোক অংশ নিতে পারবে এ ধারণা ভুল। কারণ, 'সাধারণ

ব্যক্তিরা বিশেষ বিদ্যার অভাবে কিয়দংশের লিখন পড়ন যে-কোনো ভাষাতেই হউক বিদ্বানের সাহায্যাভাবে সর্বদাই বুঝিতে অশক্ত আছেন ও থাকিবেন।'

পারসিক ভাষার পক্ষে আর-একটি প্রবল যুক্তি ছিল যে আদালতে ও সরকারি কাজে পারসিক ভাষার দক্ষতা ও ঐতিহ্য, 'এস্থানে গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ প্রণিধান করা কর্ত্তব্য যে আদালত সম্পর্কীয় লিপ্যাদি বিশেষতঃ রোবকারী ও ফয়ছলা ও উভয় বিবাদির সওয়াল ও জবাব অর্থাৎ উক্তর প্রত্যুত্তর কোন ভাষায় লিখনে সুলভ ও পরিপাট্য ছিল।' পারসিক ভাষার পক্ষে সাক্ষী হিশেবে সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি, কোম্পানির বড় চাকুরে সাহেবদের নামোল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার বাঙালিদের মধ্যে 'মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের ঘর এবং দেওয়ান অভয়চরণ মিত্রের' সন্তানদের ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতামত গ্রহণের আহ্বান করা হয়। বাংলা ভাষায় আদালত ও সরকারি কাজকর্ম পরিচালনার প্রস্তাবক ও সমর্থকদের সম্পর্কে বলা হয় যে উল্লিখিত সাক্ষীদের বিরুদ্ধে—

সমাচার দর্পণ। ৭ জুলাই ১৮৩৮

> গবর্ণমেণ্ট যদি কলিকাতা নিবাসী কতিপয় সুতার ও তাঁতী ও তেলি ও তাম্বুলী ও বেণ্যে ও সদ্গোপ অর্থাৎ চাষাগোওয়ালা আধুনিক ও অমূলক বাবু উপাধিধারী চিনাওয়ারীর দোকানদার চর্ম্মপাদুকা ও মুরগীইত্যাদির বাণিজ্য-কারী তথা বাণিজ্যব্যবসায়ি সাহেব লোকেরদিগের মেট সরকার যাঁহারা হৌডু ইউডু ও কোওয়াইট ওএল ইত্যাদি দুই চারি কথা ইঙ্গরেজী অভ্যাস করিয়াছেন ও যাঁহারদিগের সভ্যতা এই যে প্রায় বেশ্যালয়ে বাস করেন ও বেশ্যারদিগকে আপন পরিবারের নিকট অহরহ যাতায়াত করিতে দোষ জ্ঞান করেন না ও যাঁহারা পথে২ নৃত্যগীত নগর কীর্ত্তনাদি করিয়া বেড়ান...
>
> [স. সে. ক ২।২২৩]

এঁরা যদি পারসিক ভাষার বদলে বাংলা প্রবর্তনের কথা বলেন ও গবর্নমেণ্ট যদি সেই কথা শোনে তা হলে তা 'নিতান্তই দুঃখের বিষয়'।

পারসিক ভাষার সমর্থনের যুক্তি দিতে গিয়ে লেখক অবশ্য বাঙালি সমাজের এক সূক্ষ্ম শ্রেণীভেদের ইঙ্গিত দিয়েছেন—যাঁরা ঐতিহ্য পরম্পরায় পারসিক ভাষার চর্চা করে এসেছেন ও তাতে দক্ষতা অর্জন করে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তাঁরা, আর, কলকাতা শহরের পত্তনের ফলে সাহেবদের সঙ্গে নানা ধরনের সম্পর্কের ভিতর দিয়ে যে নতুন বড়লোক শ্রেণী তৈরি হয়েছে তাঁরা, অর্থাৎ যারা পারসিক

ভাষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠার সময়ই পায় নি—এই দুই শ্রেণীর লোক পুরনো সুবিধে ও নতুন অধিকারের মধ্যে ভাগ হয়ে গিয়েছিল।

এই শ্রেণীভাগের ইঙ্গিতের ভেতর বাংলাভাষার সমর্থক জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে শক্তিশালী অংশের একটি আভাস পাওয়া যায়। সরকারি-বেসরকারি নানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে জীবিকার সূত্রেই যাদের সংযোগ তৈরি করতে হয় অথচ ইংরেজি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা যাদের পক্ষে অসম্ভব—বাংলা ভাষার পক্ষে কলকাতার সেইসব নাগরিকের সমর্থনই কি ছিল সবচেয়ে বেশি প্রবল ? তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ইংরেজিজানা বাঙালি মধ্যশ্রেণীর স্বাদেশিকতাবোধ ও মুসলমানবিদ্বেষী হিন্দুদের ধর্মবোধ ? এই ব্যাপক জনসমষ্টির ভাষা হিশেবেই কি বাংলা তৈরি হচ্ছিল ?

পারসিক ভাষার বিরুদ্ধে বাংলা ভাষার সমর্থনে প্রথম ও প্রধান যুক্তি ছিল, 'যে সকল কর্ম্মকারক রাজকর্ম্মে নিয়োজিত আছেন তাঁহারা প্রায় অনেকেই বাঙ্গালি ভাষান্তর অপেক্ষা আপন২ ভাষা বিলক্ষণরূপ জ্ঞাত আছেন এবং সাহেবান ইঙ্গরেজ বাহাদুর যাঁহারা রাজকর্ম্মাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত আছেন তাঁহারা সকলে পারস্যেতে পারদর্শী নহেন।...(স. সে. ক. ২। ২১৮)

কিন্তু এই যুক্তির বিরুদ্ধে পারসিক ভাষার পক্ষেও যুক্তি ছিল।

'যদি গবর্ণমেণ্ট দেশীয় ভাষা প্রচলিত করণে নিতান্ত হিত বোধ করিয়া থাকেন তবে সুপ্রিমক্রোট যে প্রধান আদালত বলিয়া মান্য সেখানে কিরূপে কেবল ইঙ্গরেজী ভাষা প্রচলিত রাখিবেন অর্থাৎ যে লিখন পঠনের বর্ণও এপর্য্যন্ত এদেশস্থ মনুষ্য মাত্রের বোধ গম্য নহে।' (স. সে. ক. ২। পৃ ২২৪)

পারসিক ভাষার বিরুদ্ধে বাংলা ভাষা প্রবর্তনের দাবির যৌক্তিকতা উত্থাপনে সেদিন ইংরেজিকে বিদেশী ভাষা হিসেবে না দেখে, রাজভাষা হিশেবে দেখা হয়েছিল ও পারসিক ভাষাকে সাম্প্রদায়িক কারণেও আক্রমণ করা হয়েছিল। কলকাতা রাজধানীকে ভিত্তি করে যে নতুন নানা শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে তাঁরা ইংরেজদের সঙ্গে নানা ধরনের ব্যাবসাবাণিজ্যে এতটাই যুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন যে রাজকার্য বা আইন-আদালতের ভাষা শেখার কোনো প্রয়োজনও তাঁরা বোধ করেন নি, তেমন অবকাশও বোধহয় পান নি। বাংলা ভাষা যদি রাজকার্যের ও আইন-আদালতের ভাষা হিশেবে আংশিক স্বীকৃতিও পায় তবে তাঁদের সুবিধেই হয়। নাগরিক বাঙালি হিন্দুদের এই অংশ পারসিক ভাষার বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক যুক্তি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছেন। এখন কিছুটা অবাকও লাগে যে পারসিক ভাষাকে

বিদেশী ভাষা বলে তার বিরুদ্ধে তাঁরা বিদেশী রাজার কাছেই আবেদন করছিলেন —ইংরেজি যেন তাঁদের কাছে স্বদেশী-বিদেশী বিতর্কের বাইরের এক রাজভাষা।

সমাচার দর্পণ। ১৬ মে ১৮৩৫

পূর্ব্বকালে যখন জবনাধিকার ছিল তখন তাঁহারা আপন স্বেচ্ছায় প্রজার অনিষ্টচিন্তায় বাঙ্গলা ভাষা রহিত করিয়া আপনারদিগের ধর্ম্মকর্ম্ম বৃদ্ধিকরণ-জন্য নিজভাষা পারস্য চলিত করিয়াছেন তাহাতে নিরীহ বাঙ্গালি প্রজারা কি করিতে পারে সুতরাং তাহাই প্রচলিত আছে।…

দেখুন সংস্কৃত বাঙ্গলা ইঙ্গরেজী লেটিন আরমাণি জর্ম্মনি ফ্রান্সিস ফিরিঙ্গি-সকলেরি লিখনের এক ভঙ্গী অর্থাৎ বাম হইতে দক্ষিণে গমন…কিন্তু এ দুরন্ত পারস্য সমুদয় রীতির বিপরীত অর্থাৎ দক্ষিণ হইতে বামাবর্ত্তি…

প্রজাদির নিজভাষা চলিত না করিয়া অপর ভাষা যাহা অতিদুরন্ত ধর্ম্মসংহারক পাপাত্মা জবনেরা প্রচলিত করিয়াছে এ ধর্ম্মরাজ ইঙ্গরেজ বাহাদুর ঐ জবনদিগের অমূলজ ভাষা প্রচলিত রাখিয়া কেন ঢেরা সহী দেন।

[স সে. ক. ২।২১৮]

যে সময় অর্থাৎ ৬০০ বৎসরাবধি জবনেরা এতদ্দেশ অধিকার করেন লোকেরদের প্রতি এই অন্যায় হইতেছে যে তাহারদের অজ্ঞাত ভাষা দ্বারা কর গ্রহণ বিচারাদি ব্যাপার নিষ্পন্ন হইতেছিল। তন্নিমিত্তে আদালতের আমলারা স্বেচ্ছামতে লোকেরদের কর্ম্ম নির্ব্বাহে ভ্রান্তি জন্মাইয়া অশেষ অপকার করিতে-ছিলেন। অতএব উৎকোচ গ্রহণাদি নানা প্রকার অত্যাচার অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এইক্ষণে ঐ সকল ক্লেশ হইতে লোকেরা মুক্ত হইলেন…

[সে. স ক. ২।২২৮]

রাজকার্যে ও আইন-আদালতের কাজে পারসিক ভাষার বদলে বাংলা ভাষা চালু করায় বাংলা ভাষার অনুকূলে এক পরিস্থিতি তৈরি হয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সময় থেকে কোনোদিনই বাংলা ভাষায় পক্ষে অবস্থা এমন ছিল না। ব্যক্তিগত বা কিছুটা গোষ্ঠীগত বাংলাচর্চার বদলে বাংলাচর্চার একটি সামাজিক ভিত্তি তৈরি হল। সেই সামাজিক ও বাস্তব প্রয়োজনবোধ থেকে বাংলাচর্চাতেও নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। এখন পর্যন্ত যা ছিল নাগরিক-বাঙালি সমাজের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার—তার সঙ্গে বৃহত্তর নাগরিক সংগঠন ও সরকারি ব্যবস্থার যোগ স্থাপিত হয়। ফলে দর্পণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-প্রসারের কাহিনীপ্রাধান্য বা চন্দ্রিকায় বাঙালি সমাজের রীতিনীতিচর্চাপ্রাধান্যের জায়গায় বাংলা সাংবাদিকতায় সেই ব্যবস্থার

প্রতিফলন ঘটতে থাকে—যে ব্যবস্থায় সরকার থেকে শুরু করে বাঙালিরা পর্যন্ত কার্যকারণে যুক্ত। ফলে পারসিক ভাষা বন্ধের আদেশের পর থেকে বাংলাচর্চার নতুন উদ্যোগ সম্পর্কেও আশার সঞ্চার হয়।

সমাচার দর্পণ। ১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮

…ইদানীং বঙ্গভাষার বিষয়ে মনোযোগ না করণে আর কোন ওজর থাকিবে না। অধুনা বিদেশীয় আর কোন ভাষা অভ্যাসকরণে কিঞ্চিন্মাত্র কারণ থাকিল না অতএব আমারদের ভরসা হয় যে বঙ্গভাষাতে বিদ্যাদানার্থ বঙ্গদেশময় গ্রামে গ্রামেই পাঠশালা স্থাপন হইবে।

[স. সে. ক. ২। ২২২]

সমাচার দর্পণ। ৩০ জুন ১৮৩৮

গত ছয় মাসের মধ্যে অর্থাৎ যদবধি বঙ্গভাষা প্রচলিত করণার্থ হুকুম জারী হইয়াছে তদবধি এতদ্দেশীয় লোকেরা বঙ্গভাষা শিক্ষাকরণার্থ এবং তাহা উত্তম করণার্থ মহোদ্যোগ করিতেছেন। অল্পকালের মধ্যেই বঙ্গভাষীয় ব্যাকরণ ও কোষ মুদ্রিত হইবে এবং ঐ ভাষার পারিপাট্য করণার্থ এই ক্ষণে দুই সমাজ অর্থাৎ এক কলিকাতা নগরে দ্বিতীয় ঢাকা নগরে স্থাপিত হইয়াছে।

[স. সে ক. ২। ২২৬]

সেই আশা তখন একমাত্র হিন্দুদেরই আশা। সেই আশার সাম্প্রদায়িকতাও আজকের বিচারে স্পষ্ট। কিন্তু তখন, ইংরেজ আগমনের বিজয় উল্লাসে, ইংরেজ সহযোগিতার স্বল্পস্থায়ী কয়েকটি সেই বছরে হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতার আশা, সমস্ত বাঙালির আশা হিশেবেই স্বীকৃত হয়েছিল। দুর্ভাগ্যও—বাংলা ভাষা নিয়ে এই ভুল আশা শতাব্দী পেরিয়েও সক্রিয় থাকল, স্বাধীনতার পরও থাকল। ফলে বাংলা ভাষা তার এক ঐতিহাসিক অর্জনকে আধুনিক তাৎপর্যে ব্যবহার করে উঠতে পারল না।

ব্যুরোক্রেসির ঐক্য : শব্দ ও অর্থের বিপর্যয়

১৮৩৯-এর পর থেকে বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রের ধারাই সম্পূর্ণ বদলে যায়। জ্ঞানান্বেষণ, প্রভাকর, ভাস্কর দিয়েই বৃহত্তর সামাজিক বিষয় হিশেবে সাংবাদিকতা স্বীকৃত হতে থাকে। চল্লিশের দশক থেকে প্রভাকর, ভাস্কর, তত্ত্ববোধিনী, মাসিক পত্রিকা ও সোমপ্রকাশ—বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র হিশেবে বাঙালি জনমতের

প্রতিনিধি ও সংগঠক হয়ে উঠেছিল। এই প্রতিনিধিত্ব ও সংগঠনে সম্পাদকের মতামত-সংস্কারের চাইতেও প্রধান হয়ে উঠেছিল বাঙালি জনসমষ্টির প্রবণতা। তাই সংকীর্ণ সামাজিক বিতর্ক থেকে সংবাদ-সাময়িকপত্র বদলে যাচ্ছিল প্রায় জাতীয় মতামতের দর্পণে—যদিও সেই 'জাতীয়-মতামত'ও উপনিবেশের কার্য-কারণ প্রক্রিয়ার দ্বারা ছিল সীমাবদ্ধ।

পরস্পরের ভাষা না-জানা সত্ত্বেও সাহেবরা ও পণ্ডিতরা বাংলা গদ্যে সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশের একটা ব্যবস্থা কার্যকর করতে পেরেছিলেন ও তাতে অংশত সফলও হয়েছিলেন। তার কারণ নিহিত ছিল ঐ বিশেষ পরিস্থিতিতে, ইংরেজদের বিশেষ ঐতিহাসিক ভূমিকায় ও পণ্ডিতদের বিশেষ ঐতিহাসিক বিকাশে।

ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংরেজের সম্পর্ক কী হতে পারে তা নিয়ে ইংরেজদের কোনো পক্ষেরই কোনো সংশয় ছিল না। শাসক ও বণিক পক্ষের কর্মসূচি ছিল অতি স্পষ্ট —ইংরেজদের বাণিজ্যিক স্বার্থকে রক্ষার অনুকূলে একটি শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা। এই বাণিজ্য ও এই শাসনের জটিলতা দিনে-দিনেই বাড়তে থাকে। বিরাট এই মহাদেশের বিপুল সামগ্রীর বিচিত্র জটিল নতুন ব্যবহারে বাণিজ্যের নতুন-নতুন সম্ভাবনা ছিল। তার সংগতিতে শাসনেরও নতুন বিধি-উপবিধি ও কলাকৌশল তৈরি হচ্ছিল। বিবিধ জনসমষ্টির নতুন-নতুন অংশ ইংরেজ শাসনের অধীনে আসে। সেই জনসমষ্টিকে শাসনব্যবস্থার অধীনে নিশ্চিত করতে নতুন ধরনের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো প্রয়োজন হয়। এই এক প্রয়োজনেই ভারতীয়দের একটি অংশও শাসন-ব্যবস্থার অংশ হয়ে ওঠে। শাসনব্যবস্থার সেই আংশিক ভারতীয়করণের জন্য প্রয়োজন ছিল কিছু শিক্ষা, কিছু সংস্কার। তার সূত্রে ভারতীয়-বাঙালি সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির পরাক্রান্ত সঞ্চার ঘটে যায়। আর, ভারতীয়দের ভিতরে ইংরেজ তথা পাশ্চাত্য সভ্যতার উচ্চতর মূল্য সম্পর্কে সচেতনতার সক্রিয় ভূমিকা শুরু হয়। ভারতবর্ষে ইংরেজদের সভ্যতাভিযানের তত্ত্বটি ইংরেজরা ভারতীয়দের কাছ থেকেই শিখেছিল কিনা—এ রকম একটা সন্দেহও জাগতে পারে।

খ্রীস্টান ধর্মের প্রচারক যাঁরা এসেছিলেন তাঁদেরও ভারতবর্ষের সঙ্গে সম্পর্কের ধরন নিয়ে কোনো সংশয় ছিল না। মিশনারিদের কর্মসূচি ছিল অতি স্পষ্ট। তাঁরা একটি 'নিম্নতর' ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মের দেশকে, 'উচ্চতর' ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মের দেশে পরিবর্তিত করতে চান।

ইয়োরোপীয় খ্রীস্টান মিশনারিদের বিভিন্ন জনহিতকর প্রয়াস ছিল খ্রীস্টীয় মানবতাচর্চারই প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়াস। তাঁরা কখনোই ধর্ম বা সম্প্রদায়নিরপেক্ষ

মানবতাবোধের প্রেরণায় ভারতবর্ষের মানুষের সেবায় ব্যস্ত হন নি। খ্রীস্টীয় সংস্কৃতির উচ্চতর অবস্থানকে নিশ্চিত করতে এই দেশের ভিতরে একটি সাংস্কৃতিক শূন্যতার পরিস্থিতি গড়ে তোলার উপায় হিশেবেই 'মানবিক প্রয়াস'গুলি ব্যবহৃত হয়েছে। এই প্রক্রিয়া দিনেদিনেই জটিলতর হতে থাকে। এ-দেশের জনসমষ্টি বিচিত্র। তাদের জীবনযাপনের রীতি ও আচার-আচরণের প্রকার বিচিত্রতর। তাদের গায়ের রঙ থেকে জিভের ভাষা সবই আলাদা। তাদের সামাজিক-সংস্কারও স্বতন্ত্র। বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত, নদী-সমুদ্র, সমতল-অসমতল ভৌগোলিক এই বৈচিত্র্য সেই পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্যকেই আরো প্রকট করে তোলে। সেই বৈপরীত্য ও বিভিন্নতার ভিতর কোনো ঐক্যসূত্রের সন্ধান প্রথম ইয়োরোপীয়রা পান নি। তাই খ্রীস্টান ধর্মের অতি নির্দিষ্ট আচরণপদ্ধতি, ক্রিয়াকর্ম ও চার্চের সংগঠন ঐ বৈপরীত্যের সমান্তরালে একটি আদর্শ ব্যবস্থার প্রতীক হয়ে উঠতে চায় যেন। খ্রীস্টান মিশনারিদের লক্ষের আওতায় নতুন-নতুন জনসমষ্টি এসেছে। তাদের সঙ্গে ব্যবহারের নতুন-নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ভারতীয়দেরও একটি অংশ খ্রীস্টান ধর্মের এই বিকল্প সাংস্কৃতিক সংগঠনের অবলম্বন হয়ে ওঠে। যাঁরা সরাসরি খ্রীস্টান হয়েছিলেন তাঁরা নন। কিন্তু যাঁরা খ্রীস্টান ধর্মের বিশ্বাস ও সংগঠনের ভারতীয়করণ ঘটিয়েছিলেন তাঁরা নিঃসন্দেহেই উচ্চতর সংস্কৃতি হিশেবে খ্রীস্টান ধর্মকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। বাংলাদেশের ব্রাহ্ম আন্দোলনই এই স্বীকৃতির প্রথম চিহ্ন। কিন্তু এই স্বীকৃতির বাস্তব পরিস্থিতি নিশ্চয়ই তৈরি হয়েছিল তখনকার হিন্দু সমাজের অবস্থার প্রতিক্রিয়াতে ও আমাদের সমাজের নানা ধরনের কুঅভ্যাস ও কুসংস্কারের প্রতি বিরূপতা থেকেই।

ইংরেজের সব পক্ষ—শাসক, বণিক ও মিশনারি—ভারতবর্ষে তাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ছিল নিঃসন্দেহ ও নিশ্চিত। মতপার্থক্য ও বিতর্ক যা-কিছু ঘটেছে তা ইংরেজ সমাজের ভিতরই সীমাবদ্ধ থেকেছে। সেই বিতর্কের ভিতর কোনো স্তরে কোনো পক্ষ তাদের করণীয় সম্বন্ধে কোনো সংশয় প্রকাশ করে নি। তাদের নিজেদের ভিতর দ্বন্দ্ব ছিল বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক এই লুঠের সুনিশ্চিত পদ্ধতি আর প্রক্রিয়া কী হতে পারে তাই নিয়ে। বা, সাম্রাজ্যের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই তর্ক দেখা দিয়েছে যে সাম্রাজ্য রক্ষার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত হতে পারে কোন উপায়ে। সেই তর্কও উঠেছে ইংল্যাণ্ডে, করা হয়েছে পার্লামেন্টে, লেখা হয়েছে ইংল্যাণ্ডের কাগজপত্রে। সেই তর্কে 'পার্লামেন্টারি শাসনব্যবস্থা', 'প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার', 'প্রজার মঙ্গল', 'আমাদের ভারতীয় প্রজাগণ', 'ন্যায়বিচার', 'বিচারের সমতা'—এই

পরিভাষা নিয়মিতই ব্যবহৃত হত। কিন্তু এ-পরিভাষা তো ইংল্যাণ্ডের জনসমষ্টির একটি অংশ আয়ত্ত করেছিল কয়েক শ বছর ধরে, তার সমাজবিকাশের নিজস্ব নিয়মে। ভারতবর্ষের দিক থেকে এই শব্দগুলির কোনো অর্থ থাকার কথা নয়। এর কোনো শব্দই ভারতীয় সমাজবিকাশের অভিজ্ঞতা থেকে তৈরি হয় নি। কিন্তু তবু ব্রিটিশ-ভারতীয় শাসনব্যবস্থার ও খ্রীস্টান সংস্কৃতির উচ্চতর আদর্শ এই মোহ ছড়িয়েছিল, বুঝি-বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রজা হিশেবে ঐ শব্দগুলিও ভারতীয় হয়ে উঠেছে।

এই শব্দের মোহ ও অর্থের ইতিহাসের বিপর্যয় ঘটানোর মাধ্যম হয়ে উঠেছিল সাহেবদের নির্দেশে ও তত্ত্বাবধানে তৈরি বাংলা গদ্যভাষা। সাহেবদের গদ্যচর্চার এই প্রথম স্তরে বাংলা গদ্যের বিষয়ের পরিধিতে যা আসছে তা বাঙালির অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয় নয়, বাঙালির জীবনের সত্য নয়। একটি ভাষা তৈরি হচ্ছে যার প্রাথমিক ব্যবহার ঘটেছে অনুবাদে—ভাষার অনুবাদ নয়—বর্তমান অভিজ্ঞতার অনুবাদ, ইতিহাসের ব্যাখ্যার অনুবাদ, আর এই দুই-এর মিশ্রণে চৈতন্যের অনুবাদ। 'সমাচার দর্পণ'-এর প্রথম দিকের সংখ্যাগুলির বিষয়সূচি (এই বইয়ের তৃতীয় খণ্ডে) দেখলেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তখনকার বাঙালির দৈনন্দিনের বাইরে এই ভাষা যেন হয়ে উঠতে চাইছে তখনকার ইতিহাসের ব্যাখ্যা। বাংলা গদ্য জন্মক্ষণেই এই জীবনবিচ্ছিন্নতার বীজাণুতে আক্রান্ত হয়ে গেল। আর সেই শূন্যতা জুড়ে থাকল ব্যাখ্যার ফাঁকা প্রবণতা, ঔচিত্যের ফাঁপা শাসন, উপদেশ বা আত্মবিলাপের ছন্দহীন উচ্চাবচতা।[১৬]

এই বাংলা গদ্যচর্চায় সংস্কৃত পণ্ডিতরা সাহেবদের যোগ্যতম মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। সাহেবরা বাংলা জানতেন না—কিন্তু তাঁরা বাংলা গদ্যে কী লেখা হবে, সেই বিষয়টি অতি স্পষ্টভাবে জানতেন। সংস্কৃত পণ্ডিতরাও বাংলা গদ্য জানতেন না—কিন্তু তাঁরা ঐ বিষয়ের উপযুক্ত ভাষা কী হতে পারে তার একটা আন্দাজ জানতেন।

সে-আন্দাজ জন্মেছিল ইতিহাসেরই সূত্রে। সতেরো-আঠারো শতকের বাংলায় সংস্কৃতচর্চা ছিল প্রধানত স্মৃতিশাস্ত্র-ন্যায়-মীমাংসা-নির্ভর। সংস্কৃতকাব্যের ক্লাসিক আদর্শ থেকে সে-ভাষা বহুদিনই সরে এসেছিল। এমন-কি যে-অলংকারের ব্যবহার সংস্কৃতরীতির আনুষঙ্গিক, সতেরো-আঠারো শতকের বাংলার সংস্কৃতে সেই অলংকারও ব্যবহৃত হত না। যেটুকু ব্যবহৃত হত, তাও মাত্র উদাহরণ হিশেবে। সে উদাহরণও প্রথাবদ্ধ, চর্বিতচর্বণ। এই ভাষা প্রধানত ব্যবহৃত হত স্মৃতির বিধি-বিধানকে প্রায় ব্যতিক্রমহীন করে তোলার কাজে। সেই কাজে টীকা ও ভাষ্যের

প্রয়োজন ছিল। ক্রমেই বেড়ে যাওয়া ছড়িয়ে পড়া বাঙালি হিন্দু সমাজের বিভিন্ন কুল-মেলের বন্ধনকে যথানির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধার জন্য এই টীকা ও ভাষ্যকে নির্দিষ্ট থেকে নির্দিষ্টতর হতে হয়েছে। এত নির্দিষ্টতার কাজে যে-ভাষাকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে, তা থেকে অনেক দিন ধরেই ঝরে গেছে প্রাণবান ভাষার অনিয়ম, সৃষ্টিশীল স্বেচ্ছাচার, আবেগের অভিঘাত। বদলে, এই ভাষা পাকিয়ে উঠেছে গাঁঠে-গাঁঠে, প্রায় বিকল্পহীন নির্দিষ্টতায় তার অর্থ হয়ে উঠেছে ব্যঞ্জনাতিরিক্ত, বিধি-বিধানের স্পষ্টতায় তার ধ্বনি হয়ে উঠেছে অনুরণনশূন্য। যথা-বিধি ও যথা-অর্থ হয়ে উঠেছিল সেই ভাষার অস্তিত্বের একমাত্র হেতু ও উদ্দেশ্য। সাহেবদের বিষয়ের দ্বিধাহীনতা আর পণ্ডিতদের ভাষার দ্বিধাহীনতার ভিতর একটা মিল ঘটে গিয়েছিল।

এই মিল সম্ভবত ব্যুরোক্রেসির মিল। একটি ব্যুরোক্রেসি তখন ছড়িয়ে পড়ছে, ব্যবহারে শাণিত হয়ে উঠছে তার উপকরণগুলি, তার প্রয়োগের পরীক্ষা ঘটছে প্রতিদিন। অপর ব্যুরোক্রেসি তখন গুটিয়ে কেন্দ্রীভূত হয়েছে সমাজশাসনে, দীর্ঘ-ব্যবহারে তার উপকরণগুলি ক্ষয়ে ক্ষয়ে তখন তৈলাক্ত মসৃণ, তার প্রয়োগের পরীক্ষার সুযোগ আর নেই—অচলায়তনকে রক্ষা করার ভিতর মাত্র আছে তার বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা।

ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় ইংরেজদের অভিঘাত ঘটেছিল সংগঠিত ব্যুরোক্রেসির নিয়ন্ত্রণে। উৎপাদনের নীতি-নিয়ম ও বাজারের উঠতি-পড়তি নির্ধারণে খোদ ইংল্যাণ্ডে তখন তো একটি ব্যুরোক্রেসি সুপ্রতিষ্ঠিত। ভারতবর্ষে ব্যাবসা-ব্যাণিজ্যের ব্যাপারে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে পার্লামেণ্ট, পার্লামেণ্টের কমিটি ও লণ্ডনের ডিরেক্টর বোর্ডের ভিতরকার সম্বন্ধ তখন এই ব্যুরোক্রেসিরই হাতে। প্রস্তাব, আলোচনা, আপিল, পুনর্বিবেচনা, নোট, মিনিট. চিঠিপত্র—এই সবই ছিল সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রকরণ। খ্রীস্টান মিশনারিরাও এই সর্বব্যাপী ব্যুরোক্রেসির বাইরে ছিল না। ইংরেজরা ভারতবর্ষকে প্রথম যে-ভাষায় সম্বোধন করছে তা তার শিল্প-সাহিত্যের ভাষা নয়, ব্রিটিশ ব্যুরোক্রেসির দক্ষ পরিভাষা।

বাঙালি-ভারতীয় হিন্দু সমাজজীবনের ওপর তথাকথিত প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু জীবনাদর্শের নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত ছিল প্রধানত স্মার্ত-নৈয়ায়িক ব্রাহ্মণ্য ব্যুরোক্রেসির মাধ্যমে। এই ব্রাহ্মণরাই তো ছিলেন ঐতিহ্য-পরম্পরার বুদ্ধিজীবী। তখন স্মৃতি ও ন্যায়ের অনুশাসন এতদূর প্রতিষ্ঠিত যে ইহলোক ও পরলোকের ভিতর কার্যকারণের সংগতিরচনার দায়িত্ব নিয়ে এই স্মার্ত-নৈয়ায়িক-ব্রাহ্মণ্য ব্যুরোক্রেসি বিস্তৃত হয়ে আছে। জন্ম, বিবাহ, সম্পত্তি, পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক, দৈনন্দিন

জীবনের অজস্র সূক্ষ্মভাগ, উৎপাদনের বিভিন্ন স্তর—বৃক্ষরোপণ, বীজবপন, নৌকা নির্মাণ, নৌকা ভাসান—এমন-কি কোনদিন কী ভক্ষ্য ও কী অভক্ষ্য, কোনদিন কখন রতিক্রিয়া বিধেয় ও কখন অবিধেয়, গর্ভাধানের যোগ্য সময়, যাত্রার শুভ ও অশুভ সময়, দশকর্ম-সহস্রকর্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিধান আর প্রতিটি স্খলনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত, এমন-কি জন্মের ও মৃত্যুর যে-মুহূর্তটির ওপর মানুষের হাত নেই তার জন্যও দায়িত্ব বর্তায় ও প্রায়শ্চিত্ত অর্শায়।

ব্রিটিশ ব্যুরোক্রেসি ছিল বিকাশের পথে। আর স্মার্ত নৈয়ায়িক ব্যুরোক্রেসি ছিল পচনের পথে। পচন তাতে আগেই ধরেছিল, তখন ছিল সেই পচা শরীরে বীজাণু উৎপাদনের শৃঙ্খল-ক্রিয়া। দুই ভিন্ন কালে, ভিন্ন কারণে এই দুই ব্যুরোক্রেসির জন্ম। কিন্তু আর-এক ঐতিহাসিক উদ্দেশ্যে এই দুই ব্যুরোক্রেসির সংযোগ ঘটে যায়।

এই সংযোগের ইতিহাসও অনুসরণ করা যায়। আঠারো শতকের শেষ থেকেই ইয়োরোপীয়রা সংস্কৃত আবিষ্কার করে। তারপর থেকেই সংস্কৃতের প্রতি তাদের বাধাহীন অনুরাগ। হ্যালহেড বাংলা ব্যাকরণের ভূমিকায় লিখেছেন—

> I wished to obviate the recurrence of such erroneous opinion as may have been formed by the few Europeans who have studied the Bengalese; none of them have traced its connexion with the Shanscrit...
>
> The grand source of Indian Literature, the parent of almost every dialect from the Persian Gulph to the China Seas, is the Shanscrit, a language of the most venerable and unfathomable antiquity.

উইলকিন্সের গীতা-অনুবাদ, পরবর্তীকালের স্মৃতিশাস্ত্র-অনুবাদ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে 'ভারতবিদ্যা'র চর্চা যেমন শুরু হয়েছিল, তেমনি আবার তৎকালীন বর্তমানকে ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করে বাংলা ভাষার চর্চাকে 'ভারতবিদ্যা'র বৃহত্তর ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়ার ঘটনাও ঘটতে থাকে। তাই সংবাদ-সাময়িকপত্রের নিয়মিত প্রকাশনার সময় ব্যক্তিনিরপেক্ষ বিধি-উপবিধি প্রণয়নে যে-স্বাভাবিক ক্ষমতা স্মৃতি-ন্যায়চর্চার সংস্কৃত অর্জন করেছিল, তাই-ই সাহেবদের ব্যক্তিগত আবেগ-নিরপেক্ষ ভাষা ও সমাজচর্চার যোগ্য বাহন হয়ে উঠতে পেরেছিল।

সাহেব ও ব্রাহ্মণদের ভিতর, ইংরেজি ও সংস্কৃতের ভিতর, এই কার্যকর আপস-

সমঝোওতার অন্য একটি কারণও ছিল। ইংরেজদের দিক থেকে সংস্কৃত পণ্ডিতরা যেমন বাংলা ভাষার সাহেববোধ্য রূপের মাধ্যম হয়ে উঠেছিলেন, তেমনি হিন্দু ব্রাহ্মণদের দিক থেকে সাহেবরা হয়েছিলেন হিন্দু ব্রাহ্মণদের 'লুপ্ত গৌরব' পুনরুদ্ধারের মাধ্যম।

হিন্দু সম্প্রদায়ের এই অংশ ইংরেজ রাজত্বের তুলনায় দীর্ঘদিনের মুসলমান শাসনকে বেশি বিদেশী শাসন মনে করতেন। ইংরেজরা এই দেশ দখল করার ফলে মুসলমান রাজত্ব শেষ হয়েছে—এই ঘটনা হিন্দুদের স্বাধীনতার স্বাদ দিত।

বাঙালি হিন্দুর পারিবারিক-সামাজিক সংগঠন, গ্রাম সংগঠন, সম্পত্তির অধিকার ইত্যাদি সব-কিছুই নির্ধারিত হত স্মৃতির বিভিন্ন বিধি বিধানের দ্বারা। এই স্মৃতি-শাসনের সূত্রেই বাঙালি-হিন্দু তখনকার ভারতের বৃহত্তর অংশের সঙ্গে সংযোগ বোধ করত। বল্লাল সেনের সমাজশাসনও ছিল ঐ বৃহত্তর হিন্দু ভারতের সঙ্গে বাঙালি হিন্দুকে বেঁধে দেয়ার চেষ্টা। মুসলমান শাসনের পুরো সময় জুড়ে বাঙালি হিন্দু সমাজে সেই বল্লালি বিধি শিকড় গেড়েছে। তাই, সংস্কৃত ভাষা ও স্মৃতি-শাস্ত্রের ওপর ইংরেজরা সহজেই নির্ভর করতে পেরেছে।

ইংরেজদের এই নির্ভরতার জন্যেই অনেক দিন পর্যন্ত জিলা স্তর থেকে কেন্দ্র স্তর পর্যন্ত সব রকম সরকারি সংগঠনে সংস্কৃত পণ্ডিতদের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। কায়স্থ, বণিক প্রভৃতি বর্ণ ও পেশার লোক যেমন ইংরেজদের সরকার, বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি হিশেবে নতুন পেশায় ঢুকে পড়েছিল ও নতুন শ্রেণী-বৈশিষ্ট্য আয়ত্ত করেছিল, ব্রাহ্মণরাও তেমনি ভারতীয় সমাজের স্বীকৃত বুদ্ধিজীবী হিশেবে সরকারি সংগঠনে উপদেষ্টা থেকে শুরু করে জিলা-আদালতের পণ্ডিত পর্যন্ত নানা চাকরিতে ঢুকে পড়েছিল। ফলে, ইংরেজরা ক্ষমতাদখলের পর বাংলায় অনেকদিন হিন্দু-প্রাধান্যের ও সেই সূত্রে সংস্কৃত পণ্ডিতদের প্রাধান্যের একটি পরিবেশ ছিল।

বাংলা সাংবাদিকতার এই আদিপর্বে তাই দেখা যায়—পাশ্চাত্যমুখিতা ও প্রাচ্যমুখিতা, রক্ষণশীলতা ও সমাজ সংস্কার, ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃত শিক্ষা এই-সবের ভিতর এক মিথ্যা সংঘাত। 'সমাচার দর্পণ' ও 'সমাচার চন্দ্রিকা', 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'সংবাদপ্রভাকর' ইত্যাদি এক-একটি জীবনাদর্শের প্রতিনিধি সেজেছে। কিন্তু যখনই সাহেবদের কাছ থেকে সুবিধে আদায়ের সুযোগ এসেছে, যখনই নাগরিক ব্যবস্থায় কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে—তখনই এসব জীবন-দর্শনের বিবাদ মুহূর্তে ঘুচে গেছে এবং সমস্ত বাংলা সংবাদপত্র প্রায় একই ভাষায় কথা বলে উঠেছে। প্রতিক্রিয়ার ঐক্য থেকে তৈরি হয়েছে গদ্যের ঐক্য।

দ্বিতীয় খণ্ড

গদ্য ও সমাজ

এক

সক্রিয়তার ভিন্নতা : গদ্যের ভিন্নতা

১

'সমাচার দর্পণ'

কলোনির ইতিহাস কার্যকারণ শৃঙ্খলার বিপর্যয়ের কৌতুকে ঠাসা।

কলকাতার নগরজীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশিত হল কলকাতার বাইরে শ্রীরামপুর থেকে। আর বাঙালির সমাজজীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় এই পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা ও পরিচালনা করলেন সাহেবরা। আর, সাহেবরা কাগজ বের করলেন বাংলা ভাষায়—যে-ভাষায় তাঁরা লিখতে পড়তে জানেন না। যাঁরা কিছুটা শিখেছিলেন তাঁদের পক্ষেও, যে-গদ্য তৈরিই হয় নি প্রায় তাতে, পত্রিকা-সম্পাদনা সম্ভব ছিল না। আর, বাংলা ভাষায় লেখাপড়ার জন্য নিযুক্ত পণ্ডিতরা ইংরেজি জানতেন না। ফলে, সম্পাদকের সঙ্গে লেখকের ও পাঠকের কোনো সরাসরি সংযোগ সম্ভবই ছিল না। অথচ এই অসংযোগের মধ্য দিয়েই বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র ও গদ্যভাষাকে গড়ে উঠতে হয়।

ইয়োরোপীয় বণিকরা এ-দেশে প্রথম এসে যে-পদ্ধতিতে ব্যাবসা-বাণিজ্য করতেন, তাঁদের নিজেদের কথা বোঝাতে চাইতেন, অশিক্ষিত বেনিয়ান-সরকার ও মুৎসুদ্দিরা ইংরেজি না-জেনেও দোভাষী হয়ে উঠতেন, ভাবজগতে মিশনারিরাও প্রায় তেমনি এক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন—তাঁদের পণ্ডিত ও মুনশীরা এ-ক্ষেত্রে বেনিয়ান ও সরকারের কাজ করতেন। একটা গুরুতর তফাত ছিল। বেনিয়ান-সরকাররা সাহেবদের হাত ধরে ধরে এ-দেশের ব্যাবসা-বাণিজ্যের গভীর থেকে গভীরে নিয়ে গেছে যাতে দেশের সমগ্র অর্থনীতিক ব্যবস্থা বেনিয়ানের খাতক সাহেবদের খাতক হয়। আর, ব্যাবসা-বাণিজ্যে তো সাহেবরাই বেশি টাকা খাটাতে ও দিতে পারে—তাই এ-দেশের লোকজনকে খুব দ্রুত ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে বিনিময়ের উপায় আয়ত্ত করতে হয়েছে। অপরদিকে দেশী পণ্ডিত-মুনশীদের কাছ থেকে এই দেশ, সমাজ ও ভাষা সম্পর্কে সাহেব-মিশনারিদের কিছু জানার ছিল না। তাঁদের সঙ্গে এই দেশ, সমাজ ও ভাষার তো কোনো বিনিময়ের সম্ভাবনা ছিল না, উচ্চতর ধর্ম ও সভ্যতার প্রতিনিধি তাঁরা, শুধু দিতেই এসেছেন। পরস্পরবিরোধী এই

পরিস্থিতির সীমার ভিতরেই শ্রীরামপুরের মিশনারিরা প্রথমে 'দিগদর্শন' (এপ্রিল, ১৮১৮), পরে 'সমাচার দর্পণ' (মে, ১৮১৮) প্রকাশ করেন। 'দিগদর্শন' প্রকাশের আগে শ্রীরামপুর মিশনে সিদ্ধান্ত হয়—

> ...it was resolved that there was no objection to the publication of such a journal, provided all political intelligence, more especially regarding the East, be excluded from it and it does not appear in a form likely to alarm government. It must therefore be confined to articles of general information and notice of new discoveries, but a small place may be alloted to local events...
>
> [S. K. De, *Bengali Literature in the Nineteenth Century*, pp 207-08]

'দিগদর্শন'-এ প্রধানত শিক্ষামূলক রচনাই বের হত। কম্পাস, বেলুন, বাষ্পীয় জাহাজ, ভারতের গাছপালা, প্রাচীন ও নতুন জাতিদের ইতিহাস, ভ্রমণ-বিবরণ, ভূগোলের নানা তথ্য, ভারতের উৎপন্ন দ্রব্য—এই সব বিষয়েই রচনা প্রকাশিত হত। 'দিগদর্শন'-এর শেষ পৃষ্ঠায় সামান্য কিছু খবর ছোট হরফে ছাপা হত।

'দিগদর্শন'-এর সাফল্যই তাদের একটি নিয়মিত সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশে অনুপ্রাণিত করে। কিন্তু সরকারের মনোভাব সম্পর্কে তাঁরা অনিশ্চিত ছিলেন। তাই পত্রিকা প্রকাশের আগে তখনকার ইংরেজি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, কাগজের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। প্রথম সংখ্যা প্রকাশের আগে তার একটি ইংরেজি অনুবাদ সরকারি দপ্তরে পাঠানো হয়। সরকারের পক্ষ থেকে আপত্তি না-ওঠায় ২৩ মে, ১৮১৮ থেকে সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হতে শুরু করে। লর্ড হেস্টিংস এই পত্রিকাপ্রকাশকে সমর্থন করেন ও এই পত্রিকার প্রচারের সুবিধের জন্য কম খরচায় ডাকে পাঠাবার অনুমতি দেন। বাঙালি সমাজের প্রধান ব্যক্তিরা দর্পণ-এর গ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষক হন। তাঁদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাম উল্লেখনীয়।

'সমাচার দর্পণ'-এর উদ্দেশ্য প্রথমেই তালিকাভুক্ত করে নেয়া হয়েছে।[১৭]

> ··· [এই স] মাচারের পত্র প্রতি সপ্তাহে ছাপা যাইবে তাহার মধ্যে [এই এই স] মাচার দেওয়া যাইবে।
>
> [১ এতদ্দেশে]র জজ ও কলেক্টর [সাহেবেরদে]র ও অন্য রাজকর্ম্মাধ্য

[ক্ষেরদের] নিয়োগ।

[২ শ্রীশ্রীযু]ত বড় সাহেব যে২ [নূতন আই] ন ও হুকুম প্রভৃতি [প্রকাশ করিবে] ন।

[৩ ইংগ্লণ্ড] ও ইউরোপের অন্য২ [প্রদেশ হইতে] যে২ নূতন সমাচার [আইসে এবং] এই দেশের নানা [সমাচার]।

[৪ বাণিজ্যাদি]র নূতন বিবরণ।

৫ লোকেরদের জন্ম ও বিবাহ ও মরণ প্রভৃতি ক্রিয়া।

৬ ইউরোপদেশীয় লোক কর্তৃক যে২ নূতন সৃষ্টি হইয়াছে সেই সকল পুস্তক হইতে ছাপান যাইবে এবং যে২ নূতন পুস্তক মাসে২ ইংগ্লণ্ড হইতে আইসে সেই সকল পুস্তকে যে২ নূতন শিল্প ও কল প্রভৃতির বিবরণ থাকে তাহাও ছাপান যাইবে।

৭ এবং ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও বিদ্যা ও জ্ঞানবান লোক ও পুস্তক প্রভৃতির বিবরণ।

'সমাচার-দর্পণ'-এর এই উদ্দেশ্য বর্ণনার মধ্যেই ধরা পড়ে পত্রিকার পরিচালক-দের কত সতর্ক থাকতে হয়েছে যাতে এ-দেশের রাজনীতির ব্যাপারে বা হিন্দু সমাজের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাঁরা কোনোভাবেই জড়িত হয়ে না পড়েন। তাই সংবাদের প্রধান উৎস হচ্ছে জজ ও কালেক্টরদের নিয়োগ আর গভর্নর-জেনারেলের হুকুম ও আইন। ৩-নম্বরে ইয়োরোপের সংবাদকে প্রাধান্য দিয়ে শেষে বলে রাখা হয়েছে 'এবং এই দেশের নানা [সমাচার]'। ইয়োরোপের নতুন আবিষ্কার, নতুন পুস্তকের সঙ্গে 'ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস'।

সরকারের উদ্দেশ্য ও নীতির প্রশ্নে দর্পণের কোনো প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল না। আবার, বাঙালি সমাজের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বা কলকাতার বাঙালি সমাজে ব্যক্তিত্বের ও মতাদর্শের সংঘাত ও প্রতিক্রিয়া বিষয়ে 'দর্পণ' কখনোই এমন কোনো ভূমিকা নেয় নি, যাতে বাঙালি ও হিন্দু সমাজের ভিতরের ব্যাপারে নাক গলানো হয়। এই কারণে দর্পণ সব সময়ই তথাকথিত নিরাপদ ও নিরপেক্ষ বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে।

দর্পণের সম্পাদক ছিলেন মার্শম্যান। তাঁর সম্পাদনাতেই দর্পণ সরকারি মহল ও বাঙালি সমাজে বহুপঠিত সংবাদপত্রের মর্যাদা পায়।

আপাতদৃষ্টিতে বিষয়গত বাধা, ভাষার বাধা, লেখক ও সম্পাদকের অবস্থানগত পার্থক্য, সরকারি বিষয় সম্পর্কে সাবধানতা ও উদ্দিষ্ট বাঙালি সমাজ সম্পর্কে

সতর্কতা দর্পণকে প্রায় সবদিক থেকেই সংকীর্ণ করে রেখেছিল। কিন্তু দর্পণের জন্য নির্ধারিত সামাজিক ভূমিকা এই সংকীর্ণতা দ্বারা প্রভাবিত হয় নি।

এত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সংবাদপত্র হিশেবে 'সমাচার দর্পণ'-এর সাফল্যের প্রধান কারণ, নতুন শাসনব্যবস্থার প্রয়োজনীয় খবর জানার ও জানানোর নতুন চাহিদা দর্পণ পূরণ করতে পেরেছিল। কলকাতার নাগরিক জীবনের ব্যাপ্তিতে এ চাহিদা দিনে-দিনেই বাড়ছিল। নইলে, শুধু সংবাদ দেয়ার জন্যে বা কিছু সাহিত্য-ধর্মী রচনার গুণে দর্পণ সংবাদপত্র হিশেবে কখনোই প্রতিষ্ঠা পেত না। এখন আমাদের কাছে দর্পণের যে-অংশ সবচেয়ে অপ্রয়োজনীয় মনে হয়, সেই 'কোম্পানির কাগজ' ও 'জমি বিক্রির ইস্তাহার'-এর মধ্যেই তখন দর্পণের এমন জনপ্রিয়তার মূল কারণ নিহিত ছিল। এ ছাড়া ছিল সরকারের ক্রয়ের জন্যে বিক্রেতাদের কাছে চাওয়া দরের বিজ্ঞাপন।

দর্পণ বরাবরই প্রায় ট্যাবলয়েড সাইজের চার পৃষ্ঠার কাগজ। ১ম সংখ্যা (২৩ মে, ১৮.৮) থেকে ১৬৩তম সংখ্যা (৩০ জুন ১৮২১) পর্যন্ত তিনটি কলমে একটি পৃষ্ঠা ছাপা হত। ৭ জুলাই ১৮২১-এ ১৬৪তম সংখ্যা থেকে কলম কমিয়ে দুটি কলমে একটি পৃষ্ঠা ছাপা শুরু হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পৃষ্ঠার শব্দসংখ্যা বাড়ানো।

দর্পণের হরফগুলি প্রথম দিকে একই মাপের ছিল—ছোট-বড় ভেদ ছিল না। ১৮১৮-র ৫ সেপ্টেম্বর থেকে চতুর্থ পৃষ্ঠার 'ইস্তাহার' অংশটির জন্যে ছোট হরফ ব্যবহার শুরু হয়। এই ছোট হরফ ব্যবহারের প্রধান উদ্দেশ্য বোঝা যায়—প্রথম ও চতুর্থ পৃষ্ঠায় 'কোম্পানির কাগজ', 'জমি বিক্রয়ের ইস্তাহার', 'সপ্তাহের পঞ্জিকা' ও 'লবণের ইস্তাহার' প্রকাশের জন্যে বেশি জায়গা দেয়া। এগুলো কোথায় কোনটা যাবে সে বিষয়ে প্রথম দিকে কোনো নির্দিষ্ট রীতি ছিল না। পরে ধীরে-ধীরে এই রীতি গড়ে ওঠে যে প্রথম পৃষ্ঠায় কোম্পানি সংক্রান্ত বেচাকেনা ও ঋণের বিজ্ঞাপন-গুলো বেরত ও চতুর্থ পৃষ্ঠায় জমি-বাড়ি-সম্পত্তি বিক্রির বিজ্ঞাপন বেরত—তার মধ্যে বেশির ভাগই নিলাম-সংক্রান্ত। 'সপ্তাহের পঞ্জিকা' প্রথম ও চতুর্থ পৃষ্ঠায় যেখানে জায়গা খালি থাকত সেখানে ছাপা হত।

কোনো-কোনো সপ্তাহে সংখ্যা এত বেড়ে যেত যে তৃতীয় পৃষ্ঠাতেও এসব বিজ্ঞাপন ছাপা হত। আবার কোনো-কোনো সংখ্যায় বিজ্ঞাপন কম থাকলে প্রথম পৃষ্ঠাতেও সংবাদ বেরত।

কোম্পানির কাগজের ও জমি বিক্রির বিজ্ঞাপনের সংখ্যা এত বেশি ছিল, তাতে

বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি শহরের বিজ্ঞাপনও থাকত, অনুমান হয় এই বিজ্ঞাপন-গুলি একদিকে দর্পণকে আর্থিক সামর্থ্য দিয়েছে, অপর দিকে, এই বিজ্ঞাপনগুলিই দর্পণকে ক্রমেই ব্যাপকতর পাঠকদের পক্ষে প্রয়োজনীয় করে তোলে।

এই বিজ্ঞাপনগুলি আর-এক দিক থেকে দর্পণকে সংবাদপত্রের চরিত্র দিয়েছিল। দর্পণে যে-খবর ও রচনাগুলি বেরত তার কোনোটিতেই খুব স্পষ্ট ভাবে সময় মেনে চলার দায় ছিল না। সে-সব লেখা যে-কোনো সংখ্যার কাগজেই যেতে পারে। তার ভিতর হয়তো কলকাতা শহরের বা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার খবর মোটামুটি ঠিক সময়েই বেরত। কিন্তু কোম্পানি নতুন ঋণের কাগজ বাজারে ছাড়লে বা নিলামের নোটিশে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা স্বাভাবিক ভাবেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সেই নির্দিষ্ট দিনের পর ঐ নোটিশের আর-কোনো মূল্য থাকত না। সেই কারণে এই নোটিশগুলি দর্পণকে প্রতি সপ্তাহেই পাঠকদের কাছে প্রয়োজনীয় করে তুলত। কোনো-কোনো নোটিশ হয়তো পরপর দু সপ্তাহেও বেরত—কিন্তু বেশির ভাগ নোটিশই ছিল এক সপ্তাহের।

সংবাদপত্র হিশেবে দর্পণের সম্পাদক-লেখকরা যেখানে সংবাদ আবিষ্কার করেছিলেন, পাঠকরা সংবাদ সেখানে আবিষ্কার করে নি—তাদের কাছে সবচেয়ে বড় খবর ছিল সম্পত্তি ও নতুন বিনিয়োগের বিজ্ঞাপনগুলি।

কিন্তু ১৮১৯-এর ৬ আগস্ট সরকারের আদেশ অনুযায়ী গেজেটে জমি বিক্রির ইস্তাহার প্রকাশ করা নিষিদ্ধ হয়, পরিবর্তে কালেক্টরেটে সেই তালিকা টাঙিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা হয়। ফলে, দর্পণেও এই বিজ্ঞাপনপ্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। চতুর্থ পৃষ্ঠায় এই ইস্তাহার প্রকাশ বন্ধ হলে, দর্পণ এই পৃষ্ঠায় সংবাদ ও নানা বিষয়ের লেখা প্রকাশ করতে থাকে। ১৮১৯-এর ৪ সেপ্টেম্বর দর্পণে এক খবর ছাপা হয় :

> যদবধি সমাচার দর্পণ আরম্ভ হইয়াছে তদবধি আমরা ভূমি বিক্রয়ের ইস্তাহার প্রতি কাগজে ছাপাইয়াছি সম্প্রতি ৬ আগস্ত তারিখে গবর্ণমেণ্ট গেজেটে শ্রীশ্রীযুত আজ্ঞা করিয়াছেন যে ইহার পর ঐ গেজেটে ভূমি বিক্রয়ের ইস্তাহার আর ছাপান যাইবে না।...অতএব গবর্ণমেন্ত গেজেটে জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার ছাপিবার হুকুম নাই তৎপ্রযুক্ত আমরাও আর ছাপাইব না...

এই বছরের ডিসেম্বর মাস নাগাদ দর্পণ চতুর্থ পৃষ্ঠায় অন্য একটি নতুন বিজ্ঞাপন ছাপানো শুরু করে। সেই বিজ্ঞাপনেরও একটি চাহিদা যে ছিল তা বোঝা যায় এই নতুন বিজ্ঞাপনের ধারাবাহিকতায়। ১৮ ডিসেম্বর ১৮১৯-এ চতুর্থ

পৃষ্ঠায় 'বাজার ভাও' প্রকাশ শুরু হয়। এই 'ভাও' কখনো সংক্ষেপে, কখনো বিস্তারিত বেরত।

দর্পণে প্রকাশিত নিলামি ইস্তাহার ও বাজার ভাও-এর নিদর্শন কিছু এখানে দেয়া হল।

১৫ আগস্ট, ১৮১৮-তে প্রকাশিত নিলামের বিজ্ঞাপন :

অনেক লোকের জমির শামিল জেলাহায় রোজ ও তারিখ সকল মাফিক নীচের তপসীল প্রকারেস্ব বাকী ও আদায় কারণ প্রকাশ স্থানে নিলামে বিক্রয় হইবেক জমা ও জমিনের কৈফিয়ত বোর্ড রিবন্যুর সকটরি দপ্তর খানায় অথবা জেলাহায় কালেক্তরি কাছারিতে মালুম হইবে।

সরকারের বাকী আদায় কারণ।

যশোহর সোমবার ৭ শেতম্বর সন ১৮১৮ ইং ২৩ ভাদ্র সন ১২২৫ বাং বোর্ডব-রিবনূর শকৃটরি দপ্তরখানায়।

যশোহর সোমবার ৩১ আগস্ত সন ১৮১৮ ইং ১৬ ভাদ্র সন ১২২৫ বাং কালেক্তরি কাছারিতে।

যশোহর বৃহস্পতিবার ১০ শেতম্বর সন ১৮১৮ ইং ২৬ ভাদ্র সন ১২২৫ বাং কালেক্তরি কাছারিতে।

যশোহর সোমবার ৭ শেতম্বর সন ১৮১৮ ইং ২৩ ভাদ্র সন ১২২৫ বাং কালেক্তরি কাছারিতে।

ত্রিপুরা সোমবার ৭ শেতম্বর সন ১৮১৮ ইং ২৩ ভাদ্র সন ১২২৫ বাং কালেক্তরি কাছারিতে।

ইতি তারিখ ৪ মাহ আগস্ত সন ১৮১৮ ইং বোর্ডরিবন্যুর হুকুমে।

২৫ সেপ্টেম্বর ১৮১৯-এ প্রকাশিত সরবরাহকারীদের জন্যে, আধুনিককালে কোটেশনের জন্যে, বিজ্ঞাপন :

ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে ৫০০ পাঁচ শত রিম পাটনাই কাগজ সরবরাহ কারণ কনট্রাকটর দরখাস্ত যে কেহ করিবেক দরখাস্তের খামে মোহর করিয়া ও শিরনামায় কাগজের দরখাস্ত এমত লিখিয়া নাগাইদ আগত ২৭ আকটোবর পর্য্যন্ত ইস্প অফিসের মোক্তিয়ারকার সুপরেনটেণ্ডেন্ট সাহেবের নিকট দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবেক মাফীক তপসীল।

১ দফা। কাগজের রকম নমুনা মাফিক দিতে হইবেক ঐ নমুনা মোকাম আলিপুরে ষ্টম্প অফিসে দরখাস্ত করিলে দেখিতে পাইবেক।

২ দফা। একরারি লিখন সহি করণের পর অৰ্দ্ধেক ২৫০ আড়াই শত রিম আমদানি আরম্ভ পাঁচ দিবসের মধ্যে করিতে হইবেক বাকী অৰ্দ্ধেক ২৫০ আড়াই শত রিম দাঁড়া মত এক মাস অন্তে দাখিল করিতে হইবেক।

৩ দফা। দরখাস্তের সহিত ১ এক একরারি লিখন এক মাতবর লোকের দস্তখতে দাখিল করিতে হইবে ককারন মাতবর লোক কবুল রাখে যদ্যাপি খতরা করে তবে ঐ মাতবর লোক দাইক হইবেক।

৪ দফা। কনত্রাকট তৃতীয় অংশের এক অংশ টাকা একরারনামা দস্তখত হইলে কনত্রাকটরকে দেওয়া যাইবেক আর বাকী অংশের দুই অংশ টাকা কনত্রাকটর বেবাক সরবরাহ হইলে দেওয়া যাইবেক।

৫ দফা। সুপরেনটেণ্ডেন্ট সাহেব যে সকল কাগজ নমুনায় ও মাপে নিরস মালুম করিবেন তাহা ফিরাইয়া দিবেন।

হুকুম বোর্ডরিবিনিউ।

২০ নভেম্বর ১৮১৯ সংবাদ হিশেবে বাজারদর এভাবে বেরিয়েছে :

জালুন তুলা আটার টাকা মোন।

কাছোড় তুলা সতর টাকা মোন।

পাটনাই তণ্ডুল তিন টাকা বার আনা মোন।

পাছড়ি তণ্ডুল উত্তম তিন টাকা দুই আনা মোন।

মধ্যম তণ্ডুল দুই টাকা দশ আনা মোন।

মুগী তণ্ডুল উত্তম এক টাকা বার আনা মোন।

মধ্যম তণ্ডুল এক টাকা এগার আনা মোন।

বালাম তণ্ডুল এক টাকা তের আনা মোন।

নীল উত্তম এক শত ষাটি টাকা মোন।

এই সপ্তাহে তুলার ক্রয় বিক্রয় অত্যল্প হইয়াছে এবং গত সপ্তাহ হইতেও তুলার দর ফি মোন ছয় আনা অধিক মূল্য হইয়াছে।

নিলামি ইস্তাহার ও কোম্পানির ঋণপত্রের বিজ্ঞাপন প্রকাশ বন্ধ হলে ১৮ ডিসেম্বর ১৮১৯ থেকে বাজারদর এভাবে প্রকাশিত হত :

জিনিষ	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
সুপরি	১	৩॥	৩
ভেরণ্ডা তৈল	১	২০	৩২
গাছ মরিচ	১	৫॥	৭॥
নারিকেল তৈল	১	১৪	১৫
তুলা কাছোড়া	১	১৭	১৮॥
আদা রঙ্গপুর	১	৩॥	৩॥
পাটনাই আদা	১	২॥	
চাল পাটনাই	১	৩॥	৩
পাছড়ি উত্তম	১	২॥	২
পাছড়ি মধ্যম	১	২।	২॥
মুগী উত্তম	১	১॥	১॥
মুগী মধ্যম	১	১॥	১॥
বালাম	১	১॥	১॥
দুধা ধান	১	২	২।
পাটনাই বুট	১	৩।	৩।
অড়হর ডালি	১	৪।	৪।
উত্তমগায়েঘৃত	১	২০	১৮
মধ্যম ঘৃত	১	১৬	১৭
ভৈঁসা ঘৃত	১	১৬	
মধ্যম ভৈঁসা	১	১৫	
নীল উত্তম	১	১৬০	
অন্য ২ প্রকার নীল	১	১১০	১৫০
নীল সোরা উত্তম	১	৭	৭।
মধ্যম	১	৫	৬
চিনী কাশীর	১	১০	১১।
মধ্যম	১	৮॥	১০
খার চিনী	১	৫	

জিনিষ	মোন	অবধি	পর্য্যন্ত
তেঁতুল	১		
তামাকু	১	৪॥	৫॥
চন্দন	১	১৫	১৭

মোং কলিকাতায় ২ দিসেম্বর অবধি ৮ তারিখ পর্য্যন্ত এই২ জিনিস আমদানী হইয়াছে। তুলা উনিশ শত একত্রিশ মোন। চিনি পাঁচ হাজার ছয় শত তিন মোন। সোরা তিন হাজার চারি শত অষ্টানব্বই মোন। আদা দুই হাজার এক শত উননব্বই মোন। সুপারি পাঁচ শত এক মোন। কাপড় এক লক্ষ এক হাজার দুই শত ত্রিশ থান।

১ নভেম্বর অবধি ৩০ তারিখ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে জাহাজে অন্য দেশে রপ্তানী হয় এই২ জিনিস। তুলা চারি হাজার সাত শত আটার গাঁঠি। চিনি বাহান্ন হাজার আট শত ত্রিশ মোন। সোরা সাতাইশ হাজার পাঁচশত বিরানব্বই মোন। আদা বাইশ হাজার এক শত সাতাশী মোন। তণ্ডুল এক লক্ষ তেইশ হাজার সাত শত যাটি মোন। কাপড় চারি লক্ষ আটাইশ হাজার চারি শত বাহাত্তর থান। নীল তের হাজার চারি শত বিশ মোন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশের অব্যবহিত ঘটনা হচ্ছে, পুনা চুক্তিতে (১৩ জুন, ১৮১৭) পেশবাদের শক্তি হ্রাস, গোয়ালিয়র চুক্তিতে (৫ নভেম্বর, ১৮১৭) দৌলত রাও সিন্ধিয়ার কর্তৃত্ব হ্রাস, হেস্টিংসের পিণ্ডারি যুদ্ধ (১৮১৭-১৮), মারাঠাদের দ্বারা এতদিন আক্রান্ত রাজপুত রাজাদের সঙ্গে সন্ধি, নাগপুর অধিকার, শীতাবলদিতে নাগপুরের আপা সাহেবের সঙ্গে যুদ্ধ (২৭ নভেম্বর, ১৮১৭), হোলকারের সঙ্গে মহিদপুরের যুদ্ধ (২১ ডিসেম্বর, ১৮১৭), নর্মদা নদীর উত্তরতীরের রাজ্যদখল, মন্দাসরের সন্ধি (৬ জানুয়ারি, ১৮১৮), নর্মদা নদীর দক্ষিণের অংশ হোলকারের অধিকার থেকে ইংরেজদের দখল, ১৮১৮ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে দুটি যুদ্ধের ফলে পেশবার সম্পূর্ণ পরাজয়, পেশবা-পদলোপ, ১৮১৭ থেকে ১৮-এর মধ্যে রাজপুতানার বিভিন্ন রাজাদের সঙ্গে ইংরেজদের সন্ধি।

আঠারো শতকের শেষ ও উনিশ শতকের আরম্ভ-কাল জুড়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতীয় নৃপতিদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। রাজনৈতিক ও সামরিক কারণে ব্রিটিশ সরকার হিমালয় থেকে কন্যা কুমারিকা ও পাঞ্জাব থেকে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত

ভূখণ্ডের সম্পূর্ণ মালিক হয়েছেন। লর্ড হেস্টিংস ভারতে সাম্রাজ্যের সীমা বাড়িয়ে চলেন। তিনি মারাঠা শক্তিকে পরাস্ত করেন, পেশবার পদ তুলে দেন, মধ্যভারতে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন, রাজপুত রাজাদের সঙ্গে বিশেষ বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করেন।

'সমাচার দর্পণ'-এর পাতায় এই সাম্রাজ্য বিস্তারের বাংলা কাহিনী লিখিত হয়েছে। ইংরেজি শিক্ষা তখন পর্যন্ত প্রসারিত হয় নি। কোম্পানির সাম্রাজ্য বিস্তারের যে-সব কাহিনী লোকমুখে শোনা যাচ্ছিল, মাতৃভাষায় শিক্ষিত বাঙালি একমাত্র 'সমাচার দর্পণ' পাঠ করে সে-সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা তৈরি করতে পারত। সুতরাং 'সমাচার দর্পণ'-এর জন্য একটি সামাজিক ভূমিকা প্রস্তুতই ছিল। সেই সামাজিক ভূমিকা দর্পণ পালন করতে পেরেছিল।

১৮১৮ থেকে ১৮২৯ পর্যন্ত বাংলা কাগজ হিশেবে 'সমাচার দর্পণ'-এর প্রায় একক প্রতিষ্ঠা। ব্রাহ্মসভা ও সতীদাহরোধ আইনের প্রতিক্রিয়ায় রক্ষণশীল হিন্দুদের 'ধর্মসভা'য় সংগঠিত হওয়ার ফলে 'সমাচার চন্দ্রিকা' এই বিশের দশকের শেষ দিকে স্বতন্ত্র মর্যাদা পেতে শুরু করে, তা ছাড়া, এই সময় অন্যান্য বাংলা কাগজও বেশ বড় আকারে বেরতে থাকে।

এই সময়ের মধ্যে দর্পণের বিষয় ও লেখার খুব একটা পরিবর্তন হয় নি। এই সময়কার বিষয়গুলোর দিকে তাকালে বোঝা যায় দর্পণ কোনো-কোনো ব্যাপারে অতিরিক্ত জোর দিত, আবার কোনো-কোনো ব্যাপারে ছিল কখনো নীরব, কখনো-বা অনুচ্চ। প্রথম প্রকাশ থেকে ১৮১৯-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ৮৪টি সংখ্যার হিশেব এই বইয়ের তৃতীয় খণ্ড 'সংকলন'-এ করা হয়েছে। তাতে দেখা যাবে দেশী ও বিদেশী সংবাদের মধ্যে একটি আনুপাতিক মিল বরাবর রক্ষিত হয়েছে। কখনো হয়তো এমন সংখ্যা বেরিয়েছে যেখানে ৯টি দেশীয় সংবাদের সঙ্গে মাত্র ২টি বিদেশীয় সংবাদ থেকেছে, (৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮১৯), আবার কখনো-কখনো হয়তো ১০টি বিদেশীয় সংবাদের সঙ্গে মাত্র ৬টি দেশীয় সংবাদ বেরিয়েছে (৩০ অক্টোবর, ১৮১৯)। কিন্তু সাধারণ ভাবে দেশীয় ও বিদেশীয় সংবাদের মধ্যে একটি আনুপাতিক হার বজায় রাখার চেষ্টা ছিল। অনেক সময়ই তা ২ : ১ এই অনুপাতে থাকত কিন্তু তার কোনো নির্দিষ্টতা ছিল না। ৪ জুলাই, ১৮১৮-র সংখ্যায় যেমন ৭টি দেশীয় সংবাদেই কাগজ ভরে যায়, একটিও বিদেশীয় সংবাদ ছিল না। আবার, ১৮ জুলাই, ১৮১৮-র সংখ্যায় ১১টি বিদেশীয় সংবাদ বেরিয়েছে মাত্র ৫টি দেশীয় সংবাদের সঙ্গে। কখনো-কখনো দুই ধরনের সংবাদই সমমর্যাদা পেয়েছে—

১২ সেপ্টেম্বর, ১৮১৮—৭টি দেশীয় ও ৬টি বিদেশীয় সংবাদ, ১৯ সেপ্টেম্বর যথাক্রমে ৭ ও ৬ ; ২৬ সেপ্টেম্বর—৮ ও ৬ ; ২৮ নভেম্বর ৬ ও ৫ ; ৫ ডিসেম্বর ৪ ও ৩। ১৮১৯-এর জুন থেকে বিদেশীয় সংবাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে ও গড়ে দেশীয় সংবাদের সমান হয়ে ওঠে।

দর্পণের প্রথম দশ বছরের বিষয় বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে হিন্দুদের ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁরা সোজাসুজি নাক গলান নি, সামাজিক ব্যাপারে কিছু কৌতুককর ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন—যে-সব বিষয়ের কৌতুক বাঙালি সমাজেও স্বীকৃত, আর, প্রায় ধারাবাহিক ভাবে ইংরেজদের ভারতবিজয়ের কাহিনী ও ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের পরিচয় প্রকাশ করা হয়েছে। এই বইয়ের তৃতীয় খণ্ড 'সংকলন'-এ এই বিষয়ের তালিকাটি থেকে দর্পণের সাংবাদিকতার প্রকৃতি স্পষ্ট হয়।

দর্পণের প্রধান বিষয় ছিল ভারতবর্ষে ইংরেজদের রাজত্ববিস্তারের সংবাদ-কাহিনী, ইয়োরোপ-ইংল্যাণ্ডের রাজপরিবারের সংবাদ, বৈদেশিক ব্যাবসা-বাণিজ্য ও যুদ্ধবিগ্রহের বিবরণ। সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্যে ইয়োরোপীয় শক্তিগুলির পারস্পরিক সংঘর্ষও দর্পণের বিষয় হিশেবে গৃহীত হয়েছে। দর্পণের প্রাসঙ্গিকতা ছিল, বৃহত্তর এই ইতিহাসের সঙ্গে বাংলা ভাষার ও নাগরিক বাঙালির সাযুজ্য তৈরি করা। কলকাতার নাগরিক বাঙালিদের কাছে বাংলা ভাষায় বৃহত্তর ভারতবর্ষ ও বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিত দর্পণের মধ্য দিয়ে পরিচিত হয়ে ওঠে।

সে-তুলনায় দর্পণে বাঙালি সমাজকে কী ভাবে দেখা হত বা বাঙালি সমাজের কোন খবর দর্পণে প্রধান খবরের মর্যাদা পেত ?

বৃদ্ধের বহুবিবাহ, কুলীনের বহুবিবাহ, ঘটকের কারসাজি, বিবাহের অছিলায় প্রবঞ্চনা, পুরোহিতদের কীর্তিকাহিনী, দেশীয় কবিরাজদের চিকিৎসা-বিভ্রাট ইত্যাদি। সহমরণ নিয়ে দর্পণে অনেকদিন ধরে ছোটবড় নানা খবর বেরিয়েছে। কলোনাইজেশন ও জুরি ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু লেখা তো ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থারই অংশ। প্রথম কয়েক সপ্তাহ সংখ্যার পর সংখ্যায় দর্পণে প্রকাশিত হচ্ছে—মান্দরাজ (২৩ মে), যুবরাজের কন্যার মরণ (২৩ মে), বাদশাহের জন্মদিন (৩০ মে), নাগপুরের রাজার বিবরণ (৩০ মে, ১৩ জুন, ৪ জুলাই, ১৮ জুলাই, ৮ আগস্ট, ৩ অক্টোবর), পেশোয়া (৩০ মে, ১৩ জুন), চৌড়িগড় (৩০ মে), সোলাপুর (৩০ মে), ভূপাল রাজ্য (১৩ জুন), বোম্বাই (২০ জুন), সিন্ধিয়া (২৭ জুন), বাজিরাও (২৭ জুন, ১১ জুলাই, ১৮ জুলাই, ১৫ আগস্ট, ৩ অক্টোবর), শ্রী আপা

সাহেব (২২ আগস্ট, ১৯, ২৬ সেপ্টেম্বর), নর্মদা তীরস্থ দেশের সমাচার (৫ সেপ্টেম্বর)।

'সমাচার দর্পণ'-এর প্রথম ১০-বৎসরের বিষয় ভাগ করলে দেখা যায় ইংরেজের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার জন্য গৃহীত সব ব্যবস্থা, সরকারি আইন, গভর্নর জেনারেলের হুকুম, বিভিন্ন সরকারি ব্যবস্থা, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সভা, পাঠশালা-স্কুল-সংস্কৃত কলেজ-মাদ্রাসা-মেডিক্যাল স্কুল ইত্যাদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিবরণ, ইংল্যাণ্ড থেকে আসা নতুন পুস্তকের তালিকা, কলকাতার প্রেসে ছাপানো নতুন পুস্তকের তালিকা, ইংল্যাণ্ড থেকে আসা বা ইংল্যাণ্ডে ব্যবহৃত নতুন যন্ত্রের বিবরণ, ইয়োরোপীয় ও ভারতীয় ব্যক্তিদের মৃত্যু, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের বিবরণ, কলকাতার বিখ্যাত ব্যক্তিদের ছেলের বিয়ে ও মা-বাপের শ্রাদ্ধের বিবরণ, ওলাওঠা প্রভৃতি মহামারির সংবাদ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে সংখ্যায় বেশি। শ্রীরামপুরের মিশনারিদের দ্বারা প্রকাশিত এই সংবাদ-সাময়িকপত্র বস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছিল 'ব্রিটিশ প্যারামাউন্টসি'-র বাংলা মুখপত্র।

এই পত্রসম্পাদনায় সম্পাদক মার্শম্যান-এর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। তিনটি কলমে ভাগ করা চারটি পৃষ্ঠার এই কাগজে ২০০০ মতো শব্দ ছাপার জায়গা ছিল। 'ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে' ও 'জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার'—এই দুটি বিষয় শেষ পৃষ্ঠায় ছোট হরফে ছাপা শুরু হওয়ার (৫ সেপ্টেম্বর, ১৮১৮) পর শব্দসংখ্যা হয়তো একটু বাড়ে।

পৃথিবী ও ভারতবর্ষের নানা অংশের, বিবিধ বিষয়ের ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানাবিধ সংবাদ প্রকাশ করে দর্পণের এই নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার আদর্শ রক্ষা করা মার্শম্যানের প্রধান কর্তব্য হয়ে উঠেছিল। সম্পাদনার এই কাজ মার্শম্যান কী ভাবে সমাধা করতেন তার কোনো সাক্ষ্য নেই। কী পদ্ধতিতে বিষয় বাছাই করা, লেখা ও লেখা শোধরানো হত—তা জানা যায় না। এ-বিষয়ে কিছু অনুমান করাও কঠিন। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার ভিতরেই নিহিত আছে 'সমাচার দর্পণ'-এর, অর্থাৎ সাহেবদের তত্ত্বাবধানে তৈরি বাংলা সাংবাদিকতার, গদ্যের বিশেষ ধরনটির হেতু।

মার্শম্যান বাংলা জানতেন—কিন্তু এমন জানতেন না যাতে একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র লেখা যায় বা প্রতি সপ্তাহের সবগুলি লেখার স্টাইল ও তাৎপর্য বিচার করা যায়। তাঁকে নির্ভর করতে হয়েছে বেতনভুক্ পণ্ডিতলেখকদের ওপর। পণ্ডিতরা না এলে দর্পণ প্রকাশ যেমন বন্ধ থাকত, তেমনি পূজার সময় পণ্ডিতরা ছুটিতে গেলে দর্পণ তাঁরা আগে লিখে দিয়ে যেতেন।

সমাচার দর্পণ। ৭ অক্টোবর ১৮৩৭

রীতিমত এই সপ্তাহে আমাদের পণ্ডিতগণকে বিদায় করিতে হইয়াছে তৎপ্রযুক্ত অগ্রেই এই দর্পণ প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল অতএব মহোৎসবকালীন দর্পণে সম্বাদের কিছু ন্যূনতা দৃষ্ট হইবে।

সমাচার দর্পণ। ২৬ অক্টোবর ১৮৩৩

আমাদের পণ্ডিতগণ আগামী সোমবার পর্য্যন্ত স্ব ২ বাটী হইতে প্রত্যাগত হইবেন না অতএব এই কালের মধ্যে দর্পণে নূতন ২ সম্বাদ প্রকাশ না হওয়াতে পাঠক মহাশয়েরা ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

[স. সে. ক. ১। ভূমিকা।/•]

সমাচার দর্পণ। ২ জুলাই ১৮৩৯

সাম্বৎসরিক রীত্যনুসারে এই শারদীয় মহোৎসব সময়ে আমারদিগের পণ্ডিত প্রভৃতিকে ছুটি দেওনের আবশ্যকতা প্রযুক্ত এই দর্পণ গত সপ্তাহে প্রস্তুত হইয়াছিল অতএব ইহাতে অত্যল্প সংবাদ অর্পিত হইল আগামি দর্পণে অবশিষ্ট সম্বাদ প্রকাশ পাইবেক।

[সে. স. ক. ২। ১৭৮]

দর্পণ-প্রকাশের ব্যাপারে লেখক-পণ্ডিতদের ওপর নির্ভরশীলতা যেমন এতে প্রমাণ হয় তেমনি একটি শোকসংবাদে ইঙ্গিত পাওয়া যায় রচনায় পণ্ডিতদের ভূমিকা কতদূর ছিল।

সমাচার দর্পণ। ৫ জুলাই ১৮২৮

আমরা অতিশয় খেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে ১৪ আষাঢ় বৃহস্পতিবার রাত্রি চারি ঘণ্টার সময় আমাদের আফিসের এক জন পণ্ডিত তারিণীচরণ শিরোমণি ক্ষয়রোগে পরলোকগত হইয়াছেন।...তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্যাদি শাস্ত্রে অতিশয় ব্যুৎপন্ন এবং ইঙ্গরেজী ও হিন্দী ও বাঙ্গলা ও নানাদেশীয় ভাষা ও লিপিতে বিদ্বান ছিলেন।... গত চারিবৎসরের মধ্যে আমারদের সমাচার দর্পণ কি ছাপাখানার অন্য২ পুস্তকে যে সকল শব্দবিন্যাসের রীতি ও ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা লিখনের পারিপাট্য তাহা কেবল তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষতঃ বালককালাবধি এই কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়াতে তর্জ্জমাকরণে শীঘ্রকারী এবং ছাপাখানার অন্য২ কর্ম্মে অত্যন্ত পারক হইয়াছিলেন।

[সে. স. ক. ১। ৪৬]

তর্জমাই তো ছিল বাংলা সাংবাদিক গদ্যরচনার প্রধান প্রক্রিয়া[১৮]। সংবাদ ও রচনার ধরন দেখে বোঝা যায় ইংরেজি থেকে অনুবাদই করতে হত বেশি। অনুমান হয়, সংস্কৃত পণ্ডিতদের মধ্যে যাঁরা ইংরেজি ভাষা কিছু আয়ত্ত করেছিলেন তাঁদের পক্ষেও অনুবাদের স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন সম্ভব ছিল না।

তা হলে 'সমাচার দর্পণ'-এর সাংবাদিকতায় গদ্যচর্চার পরিস্থিতি কী ছিল?

সাম্রাজ্যশক্তির বুদ্ধিজীবী অংশ, মিশনারিরা, অবলম্বন করেছিলেন এই গদ্য-ভাষাকে। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, বাঙালির আত্ম-আবিষ্কারের ধারাকে বিপরীত মুখে চালনা করা—যাতে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতেই ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের আত্ম-আবিষ্কারের মোহ জন্মায়, মূলত যা আত্মবিস্মরণ। কিন্তু সাহেবরা এই গদ্যভাষা লিখতে পারতেন না। তাঁদের নির্ভর করতে হত বাঙালি হিন্দু সমাজের সনাতন বুদ্ধিজীবী অংশ, প্রধানত ব্রাহ্মণদের ওপর।

সাহেবদের চাকুরে সংস্কৃত পণ্ডিতরা ইংরেজি জানতেন না, অথচ তাঁদের সাংবাদিক রচনার প্রধান উৎস ছিল ইংরেজি। 'সমাচার দর্পণ'-এর পরিচালক ও নিয়ন্ত্রা সাহেবরা সংস্কৃত জানতেন না, অথচ তাঁদের সাংবাদিকতার প্রধান নির্ভর ছিল সংস্কৃত। ফলে 'সমাচার দর্পণ'-এর সাংবাদিক গদ্যভাষার ওপর সাহেব ও পণ্ডিত এই উভয় পক্ষের নিয়ন্ত্রণ থাকাটা ছিল নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

এই প্রয়োজনবোধ থেকে একটি ধরন বাংলাগদ্যে অনিবার্য হয়ে ওঠে। ইংরেজি বাক্য-গঠনপদ্ধতির সন্নিহিত বাক্যগঠন করতে হবে—সাহেবরা যাতে বাক্যের অর্থ বুঝতে পারেন। আবার সে-ধরন সংস্কৃত বাক্যগঠনের পদ্ধতির সন্নিহিতও হতে হবে—যাতে পণ্ডিতরা সেই ধরনে লিখতে পারেন।

অর্থাৎ ভাষার নিজস্ব প্রবণতা, কথ্যভাষায়, বা গদ্যের লিখিত রূপের কোনো অস্পষ্ট পূর্ব-আভাস বাংলা গদ্যের আদর্শ হয়ে উঠল না। সম্পাদক-পরিচালক ও লেখক-পণ্ডিতদের ভিতর বোধগম্যতার লেনদেন এই বাংলাগদ্যের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে।

ফলে, যে-বাংলাভাষী জনসাধারণের জন্য পত্রিকা প্রকাশ করা হল, তাদের গ্রহণবর্জনের কোনো স্বাধীনতা ছিল না, তাদের বেলায় এটা ছিল একটি লিখিত ভাষা পড়তে শেখার ব্যাপার মাত্র, সেই লিখিত ভাষার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠার চেষ্টা মাত্র। অর্থাৎ এ গদ্যভাষা ছিল, সরকারি কর্মপদ্ধতি বা আইনকানুনের মতোই, বাঙালি-সমাজনিরপেক্ষ একটি বিষয়।

বাঙালিকে তার নিজের ভাষা সাহেবদের কাছ থেকে শিখতে হচ্ছিল।

২

'সমাচার দর্পণ'-এর গদ্য

'সমাচার দর্পণ'-এ যে বাংলা গদ্য সাহেব ও পণ্ডিতদের সহযোগিতায় তৈরি হচ্ছিল, তাতে বাঙালি বাচনের স্বর শোনা গেল না। ভাষা থেকে কণ্ঠস্বরের এই অবলোপ শুধু সংস্কৃত শব্দবাহুল্য বা সমাসসন্ধির প্রাবল্যে ঘটে নি। বাক্যগঠনের বাঙালিয়ানা আলাদা আলোচনার বিষয়। এই প্রসঙ্গের পরে দর্পণের শব্দব্যবহার ও বাক্যগঠনের বিশেষত্ব খোঁজার চেষ্টা করব। এই গদ্যভঙ্গিতে কণ্ঠস্বরের লোপ বলতে আমরা গদ্যের কোন বিশেষ দিকটির কথা বলছি তা এখানে একটু ব্যাখ্যার চেষ্টা করছি। কণ্ঠস্বরের এই প্রসঙ্গটি আবার 'সমাচার চন্দ্রিকা'র আলোচনায় আসবে।

সম্প্রতি আঠারো শতকে লেখা কিছু বাংলা চিঠিপত্রের খবর পাওয়া গেছে। এই চিঠিগুলি উনিশ শতকের সাহেবদের দ্বারা সমর্থিত ও অনুপ্রাণিত গদ্যচর্চার আগে লেখা। এই সব চিঠিপত্রের গদ্যের সঙ্গে কিছুটা তুলনা করলে হয়তো পরিষ্কার করা যাবে যে দর্পণের বাংলা গদ্যে কী ভাবে বাঙালি কণ্ঠস্বর লুপ্ত হল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আনিসুজ্জামান দুই হাজারের বেশি কিছু চিঠি লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে আবিষ্কার করেছেন। এ-সব চিঠি লেখা হয়েছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ঢাকা কুঠি আর তাদের ৮টি বস্ত্র-উৎপাদন কেন্দ্র বা আরঙের মধ্যে। তা থেকে ১৪০টি চিঠির একটি সংকলন তিনি প্রকাশ করেছেন 'আঠারো শতকের বাংলা চিঠি' নামে।.

প্যারিসের বিবলিওথেক ন্যাশিওনেল-এও ১৮২টি চিঠি ও আনুষঙ্গিক রচনার একটি সংকলন পাওয়া যায়। এই সংকলনটিও 'আঠার শতকের বাংলা গদ্য' (দেবেশ রায়) নামে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

এই দুটি সংকলন থেকে আমরা বুঝতে পারি উনিশ শতকের আগে বাংলা গদ্য কী ভঙ্গিতে লেখা হত। এই সব চিঠিপত্র লেখার কাজ বরাবরই পেশাদার লেখকদের হাতে ছিল। তাঁরা কেউ-কেউ হয়তো কিছু-কিছু সংস্কৃত জানতেন। কেউ হয়তো জানতেন না। কিন্তু এই জানা-অজানা নিরপেক্ষভাবেই এই সব চিঠির একটা 'বয়ান' বা ছাঁচ তৈরি হয়েছিল। লেখকরা সেই ছাঁচটি অনুকরণ করতেন। সেই ছাঁচটি সংস্কৃত আদর্শেই তৈরি। তাই এ-সব চিঠিতে সংস্কৃত শব্দের আধিক্য দেখা যাবে।

কিন্তু পুরো চিঠিটিকে সমগ্রভাবে দেখলে বোঝা যায় — চিঠিগুলির পরিষ্কার তিনটি ভাগ আছে। প্রথম ভাগে, প্রথানুগত বা বিধিসম্মত সম্বোধন। শেষ ভাগে, প্রথানুগত বা বিধিসম্মত সমাপ্তি। মাঝখানে, চিঠির বক্তব্য বা মূল চিঠি। এই প্রথম ও শেষ ভাগে সংস্কৃত রীতি প্রায় অন্ধভাবে, অনেক সময় অর্থহীনভাবে, অনুসরণ করা হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় ভাগে, চিঠির আসল কথাটি বলার সময়, সংস্কৃতের ওপর এই নির্ভরতা থাকছে না, সেখানে যত সরলভাবে সম্ভব মূল খবরটি দিয়ে দেয়া হচ্ছে। মূল কথাটি জানিয়ে দেয়ার এই দায়ে চিঠিব এই দ্বিতীয় ভাগে কখনো মুখের কথা লেখায় ব্যবহৃত হচ্ছে, কখনো আরবি-ফারসি শব্দ আসছে, কোথাও সংস্কৃত শব্দও আসতে পারে। কিন্তু সব-কিছুই আসছে পত্রলেখকের নিজস্ব প্রয়োজনবোধ থেকে, নির্ভুল খবরটি জানাবার দায় থেকে। ফলে চিঠির প্রথম ভাগে ও শেষ ভাগে রীতি ও প্রথাগত ভাষার আড়ালে লেখকের কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ লুপ্ত, সেখানে রীতি, প্রথা ও বিধিই প্রধান। কিন্তু চিঠির দ্বিতীয় ভাগে এই কণ্ঠস্বরটাই প্রধান, যেন কেউ মুখোমুখি কথায় তার বক্তব্য জানিয়ে দিচ্ছে। সেখানে কোনো রীতি, প্রথা বা বিধি এই কণ্ঠস্বরকে চাপা দিতে পারে না। আমরা এখানে মাত্র দুটি উদাহরণ দিচ্ছি। উদাহরণগুলি আমরা বই দুটির যে-কোনো জায়গা থেকে নিয়েছি, কোনো বাছাবাছি করি নি। বানানে ও যতিচিহ্ন ব্যবহারে আধুনিক রীতি অনুসরণ করেছি।

পরমকল্যাণীয় শ্রীযুক্ত রামহরি ঘোষজা

প্রদৌহিত্র বাবাজীউ পরমকল্যাণবরেষু

প্রতিপাল্য শ্রী জয়দেব দাস মিত্রস্য পরমশুভানুরাশয়োপন্ন বিজ্ঞাপনঞ্চ আগে ঘোষজা বাবাজীউর রাজোন্নতি শ্রীশ্রী ৺ করিতেছেন। তাহাতেই অত্রানন্দ। বিশেষ অনেক দিবসের পরে তোমার পত্র পাইয়া সবিশেষ জ্ঞাত হইলাম। তুমি এক মহাজন করিয়া তিন হাজার টাকা কর্জ লইয়া মোকাম খাষদহ চাল খরিদ করিতে গিয়াছ, সে ভালই করিয়াছ। ইহা না করিলে তোমার গুজরান কী রূপে চলিবেক? তোমার বাটীর খরচ আটভারি, পরিজন অনেকগুলিন। তোমরা কোন রূপে প্রতুল করিয়া পরিজনের ভরণপোষণ করহ ইহার বাড়া আর আমার আনন্দ নাই। জেয়াদা কী লিখব, জ্ঞাত করিলাম, তারিখ ১২ চৈত্র

[দেবেশ রায়, 'আঠার শতকের বাংলা গদ্য,' পৃ ৭]

সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রী বাবুরাম চোপড়ে গোমাস্তে আড়ঙ্গে নারায়ণপুর লিখ নং প্রয়োজনঞ্চ বিশেষঃ আড়ঙ্গ মজকুরের এক চালান ১২৪৩ থান কাপড় পাঠাইয়া-ছিলে। সদর যাচাইতে ৭৬৫ থান চুক্তি সহি হইয়া, নিরস বেজাতদিগের সর্ব ৪৭৮ থান ফেরত হইয়া, যাচাইয়ের ফর্দ সংবলিত আড়ঙ্গে যাইতেছে। দৃষ্টি করিয়া তাঁতিলোককে ফেরত দিবে। এ চালানে বার শত কয়েক থান কাপড় আসিয়া ৪৭৮ থান ফেরত হইল। এমন নিরস কাপড় কী নজরে ও কী অস্থুরে চালান করিলা বুঝা গেল না। মকিমের জবানিতে শুনা গেল, যাচাই আমলে মকিম মজকুর দুই-তিন শত থান ফেরত করিয়াছিল। সদর যাচাইতে, দরকার মাহাফিক চুক্তি হইয়া বাকি ফেরত আসিবেক কহিয়া, তুমি মবলগ ফেরত কাপড চাহারম গোছে দিয়া চালান রওয়ানা করিয়াছ। ইহাতে মালুম হইল কিস্তিবাদির অন্দর আমদানি জেয়াদা নজর হওনের মতলবে ফেরত কাপড় পাঠাইয়াছ। অতএব বারদিগর এমত কাপড় না আইসে।......একদাম জেয়াদা মেয়াদ দেওয়া গিয়াছে। ফের প্রায় এক কিস্তির কাপড বাকি হইয়া সরবরাহের নিতান্ত ওসোয়াষ প্রযুক্তে খাপা আছি। অতএব লাগাএদ নাবাম্বার মাহা বেবাক কাপড়ের সরবারাহ অবশ্য করিতে হইবেক। খুব এয়াদ রাখিয়া কার্য করিবা। ইহাতে দের হইলে পশ্চাত মালুম হইবেক। ইতি—

[আনিসুজ্জামান, 'আঠারো শতকের বাংলা চিঠি,' পৃ ৩৮]

আমরা তিনভাগে চিঠিগুলিকে ভাগ করেছিলাম, দ্বিতীয় চিঠিতে শেষ ভাগ নেই। চিঠিটি লিখেছেন ঢাকা ফ্যাক্টরির কর্তা আড়ঙ্গে তাঁর গোমস্তার কাছে। তার ওপর, আড়ঙ্গ থেকে যে-কাপড এসেছিল তার ৪৭৮টি ফেরত যাচ্ছে। গোমস্তাকে শাসিয়ে আর রীতিবিধি মেনে চিঠির 'ইতি' করা হয় নি। কিন্তু দুটি চিঠিতেই সম্বোধন ও প্রথম দিকের সম্ভাষণ সংস্কৃত বিধি অনুযায়ী—ভুল ও শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তারপর চিঠির দ্বিতীয় ও মূলভাগে আমাদের দাগ দেয়া অংশে আসল কথাটি বলা হয়েছে। প্রথম চিঠিতে এই ভাগে প্রমাতামহ তাঁর প্রদৌহিত্রের চালের ব্যবসায় টাকা খাটানো অনুমোদন করছেন প্রায় মুখের ভাষায়—"সে ভালই করিয়াছ। ইহা না করিলে তোমার গুজরান কী রূপে চলিবেক?" ইত্যাদি। দ্বিতীয় চিঠিতে কুঠির সাহেব তাঁর গোমস্তাকে বাজে কাপড়

পাঠানোর জন্যে দোষ দিয়েছেন, এমন-কি তাঁর কাছে কী খবর এসেছে তাও জানিয়ে শাসিয়েছেন, এক মাস বেশি সময় দেয়া হল, সাহেব খেপে আছেন, নভেম্বরের মধ্যে সব কাপড় না এলে, 'পশ্চাত মালুম হইবেক।'

এই চিঠি দুটি, বা এই বই দুটির যে-কোনো চিঠি, পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে—বিশেষণ, হেত্বর্থক বিশেষণ, ক্রিয়া বিশেষণের ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে। যেখানে আছে সেখানেও অদ্ভুতভাবে আছে, যেমন দ্বিতীয় চিঠিতে "ওসোয়াষপ্রযুক্ত খাপা আছি।" আরবি "ওসওয়াস" শব্দের অর্থ আশঙ্কা। সাহেবের পত্রলেখক এই আরবি শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত "প্রযুক্ত" এই হেতুবাচক শব্দ বসিয়ে লিখিয়েছেন ''ওসোয়াষপ্রযুক্ত খাপা আছি"। সাহেবের খেপে যাওয়ার যথেষ্ট কারণ ছাড়া এ-রকম খাঁটি বাংলা শব্দ পেশাদার পত্রলেখকের কলমে তৈরি হতে পারত না।

এ-সাহেব ফ্যাক্টরির সাহেব, এ-পত্রলেখকও নেহাৎ বাঙালি কলমনবিশ। তাঁদের কারোরই গদ্যভাষা তৈরির দায় ছিল না। দর্পণে সাহেবরা তাঁদের গদ্য বানাচ্ছিলেন পণ্ডিতদের দিয়ে, পণ্ডিতরা সাহেবদের ফরমায়েশ অনুযায়ী বাংলা বানিয়ে দিচ্ছিলেন সংস্কৃতের ছাঁচে। এ-রকম বিনিময়ে সাহেবদের ইংরেজি রীতির কাঠামোর মধ্যে পণ্ডিতদের সংস্কৃত রীতি প্রধান হয়ে ওঠে। এই উভয় রীতির সংযোগের ফলে বাংলা গদ্য থেকে বাদ পড়ছিল বাঙালির নিজস্ব বাগ্‌ভঙ্গি। বরং বাঙালির বাগ্‌ভঙ্গির বিশিষ্টতাগুলি সাহেব ও পণ্ডিত দুই পক্ষই বর্জন করলেন। উল্টোদিকে, বাঙালির বাগ্‌ভঙ্গিতে অভ্যস্ত নয় এমন কিছু রীতিতে বাংলা রচিত হতে লাগল। যেমন—অসমাপিকা ক্রিয়ার বহু ধরনের ব্যবহার বাংলা বাগ্‌ভঙ্গির নিজস্ব। দর্পণে এই ব্যবহার তুলনায় কমে এল। বিশেষণের বহু ধরনের ব্যবহার বাংলা বাগ্‌ভঙ্গিতে খুব প্রচলিত ছিল না। দর্পণে বিশেষণের ব্যবহার তুলনায় বেড়ে গেল। আমরা এখন অসমাপিকা ক্রিয়া ও বিশেষণ-এর এই প্রসঙ্গটিতে আসছি।

অসমাপিকা ক্রিয়া দিয়ে বাংলায় ক্রিয়াগুলির কালপরম্পরা ও পারস্পরিক সংযোগ বোঝানো হয়। 'আমি স্টেশনে গিয়ে দেখি ট্রেন এসে গেছে।' এই বাক্যে দুটি সমাপিকা ক্রিয়া—'দেখি' ও 'এসে গেছে'। অসমাপিকা একটি—'গিয়ে'। এই অসমাপিকাটি 'আমার যাওয়া' আর 'ট্রেন আসা' এই দুটি কাজের কোনটি আগে কোনটি পরে তা বোঝাচ্ছে। 'এসে গেছে' পদটি যৌগিক ক্রিয়া। কখনো কখনো অসমাপিকা ও সমাপিকা ক্রিয়া দিয়ে এ-রকম একটি অর্থবাচক ক্রিয়া (যৌগিক

ক্রিয়া) তৈরি করা হয়—দাঁড়িয়ে পড়া, দাঁড়িয়ে থাকা, দাঁড়িয়ে যাওয়া, ঘুমিয়ে পড়া, ঘুমিয়ে থাকা, ঘুমিয়ে যাওয়া, খুঁজতে যাওয়া, খুঁজতে থাকা, বেরিয়ে পড়া, বেরিয়ে যাওয়া, বেড়িয়ে আসা, বেড়াতে বেরনো, পড়তে বসা, পড়তে থাকা, পড়তে যাওয়া ইত্যাদি। বাংলা ভাষার যৌগিক ক্রিয়ায় অল্পসংখ্যক সমাপিকা ক্রিয়া কর্মবোধক অসমাপিকার সঙ্গে মিলে, শব্দার্থের নানা সূক্ষ্ম অর্থভেদ ঘটায়, ইংরেজিতে প্রিপজিশন যেমন ঘটাতে পারে।

অসমাপিকার আর একটি ব্যবহার—তার পুনরাবৃত্তিতে সময়ের একটা ধারাবাহিকতা বোঝানো যায়—'খুঁজতে-খুঁজতে ঠিকানাটা পেয়ে গেলাম', 'রেস খেলতে-খেলতে লোকটার সর্বস্ব গেল'। প্রথম বাক্যটিতে সময়সীমা বেশ ছোট, দ্বিতীয় বাক্যে বেশ দীর্ঘ। কিন্তু অসমাপিকা ক্রিয়ার একই ধরনের পুনরাবৃত্তি এই সময়সীমা বুঝিয়ে দেয়। শুধু ঘটনার কালসীমাই নয়, ক্রিয়ার সম্পাদনবৈশিষ্ট্যও কোনো-কোনো সময় অসমাপিকার পুনরাবৃত্তিতে বোঝানো যায়—'খাটতে-খাটতে জান জেরবার হয়ে গেল', 'ধুঁকতে-ধুঁকতেও চালিয়ে যাচ্ছে', 'মই দিতে-দিতে শেষে মাটির পিণ্ডগুলো ভাঙল', 'গিয়ার মারতে-মারতেই তো কলকাতার রাস্তার ড্রাইভারের হাত ব্যথা'। ক্রিয়ার বিশেষ ধরন বোঝানোর জন্যে অসমাপিকার এই পুনরাবৃত্তিরও রকমফের ঘটে। প্রথমে মূল অর্থবোধক অসমাপিকা ব্যবহার করে, পরে তার সঙ্গে অনুকার শব্দ মিলিয়ে একটা পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয়। এখন অবিশ্যি বহু ব্যবহারে এর অনেকগুলি একটিমাত্র শব্দ হিশেবেই বিবেচিত হয়। 'বুঝেশুনে', 'খেয়েদেয়ে', 'মেরেধরে', 'কেঁদেকেটে', 'জিরিয়েটিরিয়ে', 'ঝাড়লেঝুড়লে'। এগুলি কাল (টেন্স) অনুযায়ী পরিবর্তিতও হয় ও সেখানেও এই পুনরাবৃত্তি ঘটে—'খাবেদাবে', 'খেল দেল', 'মারবে ধরবে', 'মারল ধরল' ইত্যাদি। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'দি অরিজিন এ্যাণ্ড ডেভেলাপমেন্ট অব বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ' গ্রন্থে এই অসমাপিকা ক্রিয়াকে একটি পদ হিশেবে না দেখে 'সংযোজক', 'অসমাপিকা' ইত্যাদি নানা ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আবার, এর ক্রিয়া-বিশেষণ হিশেবে ব্যবহারের কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি এগুলিকে ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপভেদের সঙ্গে মিলিয়েছেন। আমরা এই সবগুলিকেই একই অসমাপিকার বহু প্রয়োগবৈচিত্র্যের উদাহরণ হিশেবে নিতে চাই। সুনীতিকুমারও মন্তব্য করেন, 'The lavish use of the conjunctive is a note-worthy characteristic of Bengali.' (*ODBL*, Pp 1011)।[১৯]

অসমাপিকা ক্রিয়ার অভাবিত ব্যবহার বাংলা বাক্যকে বিচিত্র সামর্থ্য দেয়।

কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য বাংলা বাক্যের এতই নিজস্ব যে ইংরেজি বা সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণের কোনো বৈশিষ্ট্য দিয়ে এর ব্যবহারবৈচিত্র্য বুঝে ওঠা যায় না। সংস্কৃত বা ইংরেজি ভাষার কোনো গঠন-উপকরণকে অসমাপিকার কাজে ব্যবহারও করা যায় না। বাংলা ব্যাকরণ তৈরি হয়েছে ইংরেজি ব্যাকরণের আদর্শে। তাই অসমাপিকা ক্রিয়ার মতো এমন বিশিষ্ট বাংলা রীতিকে ব্যাকরণে নির্দিষ্ট করার জন্যে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কেও পার্টিসিপ্‌ল, ইনফিনিটিভ, ডুপলিকেটেড ভার্ব, কম্পাউণ্ড ভার্ব ইত্যাদি ইংরেজি ব্যাকরণ সম্মত ভাগে অসমাপিকাকে ভাগ করতে হয়েছে।

ইংরেজি বাক্যের গঠন রীতি, কর্তা > ক্রিয়া > কর্ম, এই পরম্পরায় অপরিবর্তনীয়রূপে বাঁধা। এই পরম্পরার মধ্যেই সাব-অর্ডিনেট ক্লজ বা কমপ্লিমেণ্ট হিশেবে বড় বড় বাক্যাংশ ঢুকতে পারে। ইংরেজি বাক্যের এই গঠনরীতি দিয়ে অসমাপিকানির্ভর বাংলা বাক্যকে বুঝে ওঠা দুরূহ। বস্তুত ইংরেজি বাক্যগঠনরীতি অনুযায়ী বাংলা-অজ্ঞ কেউ যদি বাংলা বাক্যকে পরীক্ষা করেন তা হলে তাঁর কাছে বাংলা বাক্যটিকে বিপর্যস্ত মনে হবে।

অন্যদিকে, সংস্কৃত বাক্যগঠনরীতিতে প্রতিটি পদের সঙ্গে প্রতিটি পদের সম্পর্ক কারক-অনুযায়ী বিভক্তি চিহ্ন দ্বারা এতই অবিচ্ছেদ্যভাবে বাঁধা যে বাক্যের মধ্যে পদের স্থানপরিবর্তনেও অর্থের কোনো পরিবর্তন ঘটতে পারে না। বাংলায় বিভক্তি চিহ্ন সব সময় খুব স্পষ্ট নয়, বস্তুত স্বতন্ত্র শব্দ দিয়েই বাংলায় বিভক্তির কাজ সারা হয়—বিভক্তিচিহ্ন পদের অপরিত্যাজ্য কোনো অংশ নয়। ফলে, বাংলা-অজ্ঞ কেউ যদি সংস্কৃত বাক্যের গঠন-রীতি অনুযায়ী বাংলা বাক্য পরীক্ষা করেন তা হলে তাঁর কাছে বাংলা বাক্যটিকে অর্থহীন মনে হবে।

দর্পণের বাক্যগঠনের মধ্যে দেখা যায়—ইংরেজি বাক্যের রীতি অনুযায়ী বাক্যগুলি ক্রিয়াপদ দ্বারা অতিনির্দিষ্ট হতে চাইছে। অর্থাৎ বাক্য এমন কোনো ভাবে গঠিত হচ্ছে না, যাতে ক্রিয়ার প্রাধান্য কোনো ভাবে কমে যায়। ক্রিয়াই দর্পণের বাক্যের প্রধান নিয়ন্ত্রা।

সে-কারণেই অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার কম, কারণ, অসমাপিকা ক্রিয়া বাক্যের ওপর মূল ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ অনেক শিথিল করে দেয়।

অসমাপিকা ক্রিয়া বাক্যের ভিতরে যে-কাজগুলো করতে পারত, অসমাপিকা ব্যবহার না করে সেগুলো নিষ্পন্ন করতে পণ্ডিতরা সংস্কৃত রচনারীতির সমাসসন্ধিবহুল, অনেক সময় প্রত্যয়নিষ্পন্ন বিশেষণ পদের ব্যবহার ঘটালেন। এই ধরনের বিশেষণ পদ একটি মাত্র শব্দ হওয়ায় ও তার সঙ্গে বিশেষ্যের সম্পর্ক অত্যন্ত প্রত্যক্ষ

হওয়ায় সাহেবদের পক্ষে এই বিশেষণের ব্যবহার বুঝে ওঠা সহজতর ছিল। 'মেয়েটি কাঁদতে-কাঁদতে আসছে', 'রোরুদ্যমানা মেয়েটি আসছে'—এই দুটি বাক্যের মধ্যে প্রথমটি, বাংলা যিনি জানেন না, তাঁর পক্ষে কঠিন। কারণ, 'কাঁদতে-কাঁদতে' এই অসমাপিকা পদটি ক্রিয়াকে বোঝাচ্ছে না কর্তাকে বোঝাচ্ছে এটা তিনি সহজে ধরতে নাও পারেন। তাঁর কাছে পরের বাক্যটির 'রোরুদ্যমানা'র সঙ্গে 'মেয়েটি'র সম্বন্ধ সহজবোধ্য। কিন্তু শুধুই বাংলায় কথা বলেন এমন কারো পক্ষে দ্বিতীয় বাক্যটি কঠিনতর, কারণ সেখানে শব্দার্থ ও বিশেষণের লিঙ্গ জানার সমস্যা আছে।

দর্পণের প্রথম দিকের গদ্য সাহেব ও পণ্ডিতদের এই বিপরীত টানে একই সঙ্গে বিশেষণবহুল ও সমাপিকা ক্রিয়াবহুল হয়ে উঠতে চেয়েছে। কখনো-কখনো বিষয়ের টানে পণ্ডিতরাও চকিতে বাংলা লিখে ফেলেছেন—অসমাপিকাও এসে গেছে, মুখের কথাও এসে গেছে। কিন্তু বিষয়ের সেই টানের উপলক্ষ ঘটেছে কচিৎ। দর্পণের অতিনির্দিষ্ট বিষয়গুলি নিয়ে পণ্ডিতরা তাঁদের বিশেষণগুলো সাজিয়ে-সাজিয়ে সাহেবদের ক্রিয়ানির্ভর বাক্য তৈরি করে দিচ্ছিলেন।

নিরপেক্ষতা ও প্রত্যক্ষতাই যেখানে উদ্দিষ্ট সেখানে বাক্যের গড়নকে সরল রাখতেই হয়। এর আগে, বাইবেল অনুবাদের প্রাথমিক যুগে ইংরেজি বাক্যের পদবিন্যাস রীতিতে অবিকল বাংলা শব্দ সাজিয়ে বাংলা বাক্য তৈরির চেষ্টা হয়েছিল সাহেব ও মুনশীর পারস্পরিক সহযোগে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গদ্য-গ্রন্থগুলির ভিতর দিয়ে কোনো এক রীতি নির্দিষ্ট হয় নি। তাই সেখানে প্রায় প্রত্যেক লেখকের বাক্যগঠন পদ্ধতি স্বতন্ত্র।

প্রথমে সাপ্তাহিক ও পরে তার চাইতে ঘন-ঘন একটি বাংলা কাগজ প্রকাশের দায়দায়িত্ব নিলে সাহেব-মুনশীর যৌথ চেষ্টার জন্য দীর্ঘ সময় থাকে না, যেমন থাকে না পণ্ডিতদের বই লেখার মতো স্বাধীনতা। সেখানে নানা রকম বিষয় নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাগজ বের করে দেয়ার দায়টাই প্রধান। এত বেশি লেখালেখির মধ্য দিয়ে গদ্যের একটা ছাঁচ বাধ্যতই নির্ধারিত হয়ে যায়। সেই ছাঁচটিতে বাংলা বাক্যগঠন থেকে শুরু করে পদনির্বাচন ও পদব্যবহারের পদ্ধতিটাও নির্দিষ্ট থাকে।

দর্পণের গদ্যের সেই ছাঁচের প্রধান একটি বৈশিষ্ট্য—সমাস ও সন্ধির তুলনা-মূলক কম ব্যবহার। এইখানে সংস্কৃত রীতি থেকে ইংরেজি রীতির প্রভাব বেশি খেটেছে। সমাস ও সন্ধি একেবারে যে নেই তা নয়। কিন্তু তাও প্রধানত থাকে বিশেষণের ব্যবহারে। সাহেবদের তত্ত্বাবধানে বাংলা গদ্যে সংস্কৃত বিশেষণ

অপরিবর্তিত থেকে যায় কিন্তু বাক্যের অন্যত্র সন্ধি বা সমাস কমে আসে, বিশেষত যেখানে এই রকম সন্ধি বা সমাস বাক্যটির অর্থবোধের বাধা হয়ে উঠতে পারে।

১. ১৯ আগস্ট ১৮২৬

বাঁশাইনপাড়ার সীতানাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের মাহেশের টোলেতে কতকগুলিন কদলীবৃক্ষ আছে তাহার মধ্যে সংপ্রতি এক কদলীবৃক্ষ হইতে এক মোচা নির্গত হইয়া তাহাতে ৮৬ ছড়া কাঁচকলা হইয়াছে এবং অদ্যাপিও হইতেছে ভট্টাচার্য্য মহাশয় ফল ভরে নিম্নমুখ বৃক্ষ দেখিয়া সদয় হইয়া তড্ভঙ্গাশঙ্কায় বংশদ্বারা তদ্ভঙ্গ রহিত করিয়া ঐ বংশ রক্ষা করিয়াছেন।

[স. সে. ক. ১। ৪৫]

২. ২৪ আগস্ট ১৮২২

মৃত্যু ॥—সম্প্রতি পূর্ব্বস্থলী নিবাসী কালীকুমার রায় বৈদিক শ্রেণীতে উত্তমাভিজাত্যাপন্ন ব্রাহ্মণ বহুকালাবধি কালেজ কৌসিলের বাঙ্গালাখোসনবীসী কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন তাহাতে সুখ্যাতিমান্ ও সুলেখক ও স্বীয় সদ্বক্তৃতাহেতুক বহুজন মনোরঞ্জক ছিলেন সম্প্রতি অষ্টাহের জ্বরে ৩২ শ্রাবণ বৃহস্পতিবারে তাঁহার পাঞ্চভৌতিক শরীর পরিহার হইয়াছে। তাঁহার কারণ অনেকের খেদোদয় হইয়াছে।

[স. সে. ক. ১। ৪২]

৩. ১২ সেপ্টেম্বর ১৮১৮

অনেক চিকিৎসকেরা ওলাউঠার কারণ অনুসন্ধান করে তাহাতে কেহ কোন প্রকার ও আর কেহ কোন প্রকার কারণ কহে অতএব যত চিকিৎসক তত কারণ এই প্রযুক্ত তাহারদিগকে উপহাস করিয়া গত রবিবারের সমাচার পত্রেতে এক দরখাস্ত ছাপান গিয়াছে সে ইংগ্লণ্ডীয় ভাষাতে বাঙ্গালি লোকের লিখনের মত দরখাস্ত। তাহার বিষয় এই কোন ব্যক্তি দরখাস্ত করিতেছে। যে সকল বাঙ্গালিরা বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছে যে লালবাজারের নূতন গির্জাঘরের উপরে যে মুরগ আছে সেই কেবল ওলাউঠার কারণ। যেহেতুক সে মুরগ যে দিকে আপন মুখ ফিরায় সেই দিকের লোক মরে। এবং সে মুরগ প্রাতঃকালে বড় সাহেবের ঘরের দিকে মুখ করিয়া থাকে বিকালে বড় বাজারের দিকে মুখ করিয়া থাকে। আমার তিন জন আত্মীয় লোক মুরগ দেখিবার কারণ কয়লাঘাটে গেল সেখানে দেখিল যে মুরগ তাহারদের দিকে মুখ করিয়া আছে তাহাতে তাহারা ভীত হইয়া তথা হইতে পলাইয়া খিদিরপুরে গেল সেখানেও মুরগ মুখ ফিরাইল পরে তথা

হইতে বৈঠকখানাতে পলাইয়া গেল সেখানেও তাহারদের দিকে মুরগ মুখ ফিরাইল পরে তিনজনের মধ্যে দুই জন বৃদ্ধ ছিল সেই দুই জন আর দৌড়িয়া পলাইতে পারিল না অতএব ওলাউঠা হইয়া সেখানেই মরিল। তৃতীয়জন যুবা ছিল এই প্রযুক্ত পলাইয়া রক্ষা পাইল। অতএব সেই মুরগকে যদি হরিণবাটীতে কএদ করা যায় তবে ওলাউঠা রোগ নিবৃত্ত হয় ইতি

[স. সে. ক. ১ । ৯৫]

এই তিনটি উদাহরণ থেকেই দর্পণের গদ্যরীতির ছাঁচটির প্রধান কিছু বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যায় :

১. দ্বিতীয় উদাহরণে সংস্কৃতরীতির বিশেষণ বাহুল্যের নজির মেলে। উদাহরণ তিনটিতে এমন সন্ধি ও সমাসের সংখ্যা খুবই কম (গোটা তিনেক) যেগুলো আজকেও বাংলাগদ্যে ব্যবহৃত নয়। সমাস ও সন্ধির এই নিয়ন্ত্রণ দর্পণের গদ্যকে সংস্কৃত থেকে স্বাধীনতার দিকে এনেছে আবার বিশেষণ ব্যবহারের রীতি সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলা গদ্যকে বেঁধে রেখেছে।

২. সাহেবদের বোধগম্য হওয়ার জন্য বাংলারচনার প্রাথমিক শর্তই ছিল বাক্যের সংগঠনকে প্রত্যক্ষ ও সরল করা। তা হলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম প্রয়োগ করে সাহেবরা বাক্যের অন্বয় করতে পারেন। তাই যা-কিছু সেই অন্বয়কে জটিল করে, তাকেই পরিহার করা হয়েছে।

৩. এই কারণে এখানে বাক্যের কর্তা-ক্রিয়ার সংযোগ অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ও সরল। হয়তো ঠিকমত যতিচিহ্ন, বিশেষত দাঁড়ি, ব্যবহার না করার ফলে বাক্যের অর্থ বুঝতে একটু দেরি হয় কিন্তু তার ফলে বাক্যগঠনের সরলতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

প্রথম উদাহরণটির তিনটি বাক্যের কোথাও কর্তা-ক্রিয়ার সংযোগ ব্যাহত হয় নি।

দ্বিতীয় উদাহরণটিতে বাক্যগঠনের গোলমাল আছে। কোনো একজন পণ্ডিতের মৃত্যু হয়েছে—এই সংবাদটি পাঠকের আগেই বোঝা হয়ে যায় বলে বাক্য-গঠনের গোলমাল অর্থবোধের কোনো ক্ষতি করে না। বাক্যগঠনের এই গোলমাল ঘটেছে সংস্কৃত ও ইংরেজি রীতির ভিতর পণ্ডিতদের দ্বিধার ফলে। এমনও হতে পারে, বাঙালি হিন্দুর এই ধরনের সামাজিক ঘটনা নিয়ে লেখায় সাহেবরা প্রথানুযায়ী শোকজ্ঞাপনই মেনে নিতে চাইতেন—এমন লেখার আনুষ্ঠানিকতাটুকুই স্বীকার করে। যদি শুরুর 'সম্প্রতি', ও পরবর্তী দুটি 'ছিলেন' বাদ দেয়া যায়,

তা হলে বাক্যটির গঠনে আর-কোনো গোলমাল থাকে না। সংস্কৃত রীতির বিশেষণ-ধর্মীয় পদবিন্যাস সমাপিকা ক্রিয়া 'হইয়াছে'-র সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। যদিও সমাপিকা ক্রিয়াটির প্রত্যক্ষ কর্তা 'তাঁহার—শরীর', আর আগের বড় বাক্যটি, 'তাঁহার' পদের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু আরম্ভেই 'সম্প্রতি' শব্দটি ও পরে দুবার 'ছিলেন' এই ক্রিয়াপদটির ব্যবহার লেখকের অভিপ্রায় কী ছিল, ইঙ্গিত দেয়। লেখক বাক্যটিকে সংক্ষিপ্তই রাখতে চাইছিলেন, যেন সমাপিকা পদটি তাড়াতাড়িই চলে আসবে, তাই ক্রিয়া বিশেষণটি প্রথমেই বলে ফেলেন। মাঝখানে বিশেষণজ্ঞাপক পদগুলি এসে সমাপিকাটিকে পেঁছিয়ে-পেছিয়ে দেয়। 'ছিলেন' ক্রিয়াপদটি বাক্যাংশেব সঙ্গে যুক্ত হওয়া সত্বেও, সমাপিকার মায়া জন্মায়। 'শরীর পরিহার'-টি ব্যাকরণগত ভাবে সমাসবদ্ধ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ছাপায় তা হয় নি।

তৃতীয় উদাহরণে বাক্যগঠনে এমন কোনো গোলমাল নেই। লেখকের অভিপ্রায় ও লেখার ভিতরে কোনো ফাঁকও নেই। সমাপিকা ক্রিয়া ও কর্তার ভিতর সম্পর্ক সহজ ও সরল। দর্পণের গদ্যের প্রায় আদর্শ নিদর্শন।

বাক্যগঠনে এই ইংরেজি সরলতা আনার জন্য সমাপিকার ব্যবহার বাড়াতে হয়েছে ও অসমাপিকার ব্যবহার কমাতে হয়েছে। ওপরের উদাহরণগুলিতে প্রথমটিতে অনুচ্ছেদটির প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ 'এবং' দিয়ে জোড়া হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে অসমাপিকার ব্যবহার একটু বেশি ঘটেছে—ভট্টাচার্য মহাশয়কে নিয়ে রসিকতার চেষ্টায়। কিন্তু দ্বিতীয় বা তৃতীয় উদাহরণে অসমাপিকার এ-রকম ব্যবহারও নেই। দ্বিতীয়টিতে তো অসমাপিকা ক্রিয়া নেইই। তৃতীয়টিতে ১০টি অসমাপিকা আছে বটে, তার মধ্যে ২টির ব্যবহার যৌগিক ক্রিয়ার ('পলাইয়া গেল', 'পলাইতে পারিল না')। দুটি সমাপিকার সীমার মধ্যে একটির বেশি অসমাপিকা কোনো সময়ই ব্যবহৃত হয় নি। অর্থাৎ, একটি বাক্য একাধিক অসমাপিকার ওপর নির্ভরশীল নয়।

৪. ১৫ মে ১৮৩০

…যে সকল মহাশয়েরা আমারদিগের লেখাতে বিশেষ মনোযোগ করিবেন তাঁহারা অনায়াসে জানিতে পারিবেন যে কালেজের কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয়দিগের অভিপ্রায় যে বৈদ্যক শাস্ত্রের ছাত্রদিগকে কেবল ইঙ্গরেজী বৈদ্যক পড়াইতে অভিলাষ আছে ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে…তবে একথা স্পষ্টরূপে না কহিয়া

কৌশলে বলা হইয়াছে তোমরা যদ্যপি ইঙ্গরেজী পড়িতে চাহ কালেজে থাক না চাহ চলিয়া যাও···

[সে. স. ক. ২ । ৬]

৫. ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৩৬

অতএব উপলব্ধি হয় এতত্তুল্য ভাগ্যবন্ত বিদ্যালয় ভারতবর্ষে দুষ্প্রাপ্য যাহা হউক এইক্ষণে ইংরেজী ভাষাভ্যাসি অন্তেবাসির অত্যন্তাতিশয্যতা বশত এতৎ পাঠশালায় যে সাতজন বিচক্ষণ শিক্ষক ও দুইজন মনিটর নিযুক্ত হইয়াছেন তন্মধ্যে বিজ্ঞবর শ্রীযুত আই এচ কুপর সাহেব যিনি পূর্ব্বাবধি কলিকাতাস্থ প্রধান বিদ্যামন্দিরে পাঠানুকূল্যার্থে নিযুক্ত ছিলেন।

[স. সে. ক. ২ । ৪৫]

৬. ১ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০

অপর গবর্ণমেণ্ট এই বাটী ক্রয় করণ বিষয়ে সদ্বিবেচনা প্রকাশ করিয়াছেন ইহাতে সন্দেহ নাই কারণ যদ্যপি হুগলির কালেজের বহুসংখ্যক ছাত্রেরদের নিমিত্ত প্রচুর দান করণার্থ অনেক ব্যয় করিয়া এই বাটী আরো বৃহৎ করণ আবশ্যক হইবেক তথাপি আমরা বোধকরি যে এই বিদ্যালয়ের উপযুক্ত এক নূতন বাটী প্রস্তুত করণেতে যে ব্যয় হইত তাহা এই বাটী ক্রয়করণ ও বর্দ্ধিতকরণের ব্যয়াপেক্ষা অধিক পড়িত।

[স. সে. ক. ২ । ৪৮-৪৯]

৭. ১৫ অক্টোবর ১৮৩১

যোগিনীতন্ত্রের কামরূপাধিকার কালিকাপুরাণে ও মৃত্যুঞ্জয় সংহিতা প্রভৃতি মূল গ্রন্থেতে যদ্যপিও কামরূপযাত্রা লিখিত আছে কিন্তু সে এমত বাহুল্য যে তদ্দ্বারা যাত্রিকের কর্ম্ম করা সুদূরপরাহত পাঠ করিয়া সমাপন করা কঠিন যেহেতুক ঐ সকল গ্রন্থে প্রত্যেক দেবায়তনের নাম পরিমাণ ও তদুপলক্ষে নামেতিহাস লেখাতে এমত হইয়াছে যে পাঠ করিতে২ এলিয়া যায়।

[স. সে. ক. ২ । ১৫৩]

এই চারটি উদাহরণের সবগুলিতেই অসমাপিকা ক্রিয়া খুব কম ব্যবহার করা হয়েছে (প্রথমটিতে ২বার, তৃতীয় ও চতুর্থটিতে ১ বার করে)। কিন্তু তার বদলে যে-সে, যেহেতু-সেহেতু, যাহার-তাহার, যদি—ইত্যাদি প্রয়োগে সাবক্লজ তৈরি করা হয়েছে। অসমাপিকা ব্যবহার করলে প্রতিটি উদাহরণই গঠনের দিক থেকে

সরল হত ও অর্থ সহজে বোঝানো যেত। কিন্তু সে-সরলতা বাংলা ভাষার পক্ষেই স্বাভাবিক। অসমাপিকার ঐ ব্যবহার বাক্যকে ক্লজ অনুযায়ী ভাগ করার সুবিধে থেকে ইংরেজি-সংস্কৃতে যাঁরা অভ্যস্ত তাঁদের বঞ্চিত করত।

আবার, অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহার করা হয় নি বলেই, বিশেষত ৪ ও ৬ সংখ্যক উদাহরণে, কাজের পারম্পর্য বোঝাতে বাক্যের পরম্পরা ব্যবহার করতে হয়েছে। যেমন, ৪-সংখ্যক উদাহরণে—

'যে সকল মহাশয়েরা আমারদিগের লেখাতে বিশেষ মনোযোগ করিবেন'

এটি প্রথম কাজ।

'তাঁহারা অনায়াসে জানিতে পারিবেন যে'

এটি দ্বিতীয় কাজ।

'কালেজের কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয়দিগের অভিপ্রায় যে'

এটি তৃতীয় কাজ।

'বৈদ্যক শাস্ত্রের ছাত্রদিগকে কেবল ইঙ্গরেজী পড়াইতে অভিলাষ আছে'

এটি চতুর্থ কাজ। শেষ সমাপিকা ক্রিয়া 'আছে' অপ্রয়োজনীয়।

'ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে'

এটি পঞ্চম কাজ ও ইংরেজি বাক্যগঠন অনুযায়ী প্রধান ক্লজ। সমগ্র বাক্যের এই গঠনে অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রায় কোনো কাজ নেই, অসমাপিকা ক্রিয়ার জন্যে কোনো জায়গাও নেই।

দর্পণের বাক্যগঠনে এমন উদাহরণ আকছার চোখে পড়ে যেখানে বাক্যের মূলগঠন ইংরেজি রীতি অনুযায়ী ক্রিয়ানির্ভর, কিন্তু সেই গঠনের ভিতর নৈয়ায়িক রীতিতে হেতুবাচক ক্লজ বা সমাসবদ্ধ বিশেষণ ব্যবহার করা হচ্ছে। ইংরেজিতেও হেতুবাচক ক্লজ ব্যবহারের রীতি (whereras, as because, because of, so that, on account of) প্রচলিত আছে। ফলে, ক্লজের ব্যবহারে, সংস্কৃত ও ইংরেজি দুই রীতিরই সমর্থনে, এই মিশ্রণ কখনো-কখনো দর্পণের গদ্যরীতির একটি বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। বিশেষণ ও হেতুবাচক ক্লজ ব্যবহার করে ইংরেজি গড়নের বাংলা বাক্য তখন প্রায়ই লেখা হত।

৮. ১৫ নভেম্বর ১৮২৮

পণ্ডিতের পঞ্চত্ব।—নবদ্বীপনিবাসি মিষ্টভাষি সদাশাস্ত্রান্দোলনাভিলাষি কুলীনাচার্য্য রামমোহন বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য্যশরীরে সবল বিকারসহ জরাগমন

করাতে বিবেচনা করিলেন যে বিকার শাস্তারদিগের হইতে এ বিকারের তিরস্কার হইবেক না কেননা…

[স. সে. ক. ১। ৪৬]

এই ধরনের বাক্যগঠন এখনো আমাদের অভ্যাসে আছে।

বিশেষণ ব্যবহারের আর-একটি ধরন দেখা যায়—ইংরেজ সমাজে প্রচলিত সম্ভাষণ, সম্মান বা পদ-সূচক বিশেষণ, বিভিন্ন সভাসমিতির কাজকর্মের বিবরণের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু পদ বা সরকারি কাজকর্মের বাঁধাগতের বাংলা অনুবাদে। এগুলি সবই বাঁধাগত। সব সময় নির্দিষ্ট কোনো অর্থও নেই। অথচ বাঁধাগতের অনুবাদের সময় সেই অর্থের দিকেই লেখককে দৃষ্টি দিতে হয়। ফলে বাক্যের ভিতর এই সম্মান- বা পদসূচক আপাত অর্থহীন ইংরেজি শব্দ বাংলা অনুবাদে বাক্যের মূল গঠনের ভিতর স্বতন্ত্র একটি জায়গা, প্রায় যেন ক্লজেরই মতো, পেয়ে যায়, অথবা বাক্যের বা শব্দের সঙ্গে অসলংগ্ন বিশেষণ হিশেবে বাক্যের ভিতরে থেকে যায়। এ-ধরনের ব্যবহার শুধু বিশেষণবাচক পদগুলিকে নিয়েই হয় না, অন্য পদগুলির বেলাতেও ঘটে থাকে।

উদাহরণে তৃতীয় ব্র্যাকেটে আনুমানিক ইংরেজি শব্দটি দেয়া হয়েছে।

৯. ১১ জুলাই ১৮১৮

পাঠশালার পুস্তকাদি প্রস্তুত কারণ সম্প্রদায়। [ক্যালকাটা স্কুল-বুক সোসাইটি] —গত শনিবারে এই সম্প্রদায়েরা [সোসাইটি] একস্থানে সকলে একত্র হইলেন ও অনেক ভাগ্যবন্ত [অনারেবল] ইংগ্লণ্ডীয় ও হিন্দু ও মুসলমান আসিয়া গত বৎসরে এই সম্প্রদায়েরা কি২ কার্য্য করিলেন এবং কত টাকা আয় ও কি ২ বিষয়ে কত টাকা ব্যয় [অ্যানুয়াল রিপোর্ট অ্যাণ্ড অ্যাকাউণ্টস] তাহা শুনিলেন…

[স. সে. ক. ১। ৩]

১০. ২১ অক্টোবর ১৮২০

স্কুল বুক সোসায়িটী—১১ আক্টোবর বুধবারে কলিকাতা স্কুল বুক সোসায়িটীর তৃতীয় বৎসরীয় মিসিল [মিটিং] হইয়াছে এবং ঐ সোসয়িটী অতি সুন্দররূপ চলিতেছে।…শ্রীযুত মন্তেগু সাহেব ও শ্রীযুত তারিণীচরণ মিত্রজার কথা ক্রমে [অ্যাজ প্রোপজড বাই] মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের পুত্র শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার

ঐ সোসয়িটীর কোম্মিটীতে আপন পিতার ভার পাইয়াছেন এবং শ্রীযুত বাবু উমানন্দ ঠাকুরও ঐ সোসয়িটীর অন্তঃপাতী হইয়াছেন…

[স. সে. ক. ১ | ৩]

১১. ৫ জুন ১৮১৯

…গত শনিবার স্কুল সোসৈয়েটীর বিষয় ছাপাইয়াছিলাম তাহার মধ্যে লিখা গিয়াছিল যে কলিকাতাস্কুল সোসৈয়েটীর ৬ পাঠশালার কর্তৃত্ব [সুপারভিশন] করিতে শিক্ষা করিবার জন্য মেং [মিস্টার] উইলার্ড সাহেবকে বর্ধমান পাঠান গিয়াছে……

[স. সে. ক. ১ | ৪]

১২. ২০ মার্চ ১৮২৪

স্কুল সোসৈয়িটী।—গত ৯ মার্চ মঙ্গলবার টৌনহালে কলিকাতা স্কুল সোসৈয়িটীর মিটিং অর্থাৎ সভা হইয়াছিল তাহার বিবরণ [মিনিটস]।

শ্রীযুত [মিস্টার] লার্কিন্স সাহেব সভ্যগণের অনুমতিতে সভাপতি হইয়া [ভোটেড টু দি চেয়ার] শ্রেষ্ঠাসনে উপবেশনপূর্ব্বক ঐ সভার লিখিত বিবরণ সকল [আইটেমস অব অ্যাজেণ্ডা কিংবা রিপোর্টস] পাঠ করিলেন।…

শ্রীযুত লার্কিন্স সাহেব কহিলেন শ্রীযুত সার আন্তনি বুলর সাহেব প্রেসিডেণ্ট এবং শ্রীযুত হারিন্তন সাহেব বাইস প্রেসিডেণ্ট হউন তাহা শ্রীযুত বেলি সাহেবের পোষকতার দ্বারা [সেকেণ্ডেড বাই] সকলের মত হইল।…

[স. সে. ক. ১ | ৬]

১৩. ১৯ মে ১৮২৭

শ্রীযুত জন পামর সাহেবের ও অন্য ২ সভাপ্রার্থকেরদের প্রতি। লিখিতং শ্রী টি, প্লৌডন সরিফ [শেরিফ] সাহেবের নিবেদনপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে কলিকাতার টৌন হালে ১৭ মে তারিখে সে সভার বিষয় ইশ্‌তেহার [নোটিশ] দেওয়া গিয়াছে সে সভা ১৮১৭ সালের ৯ এপ্রিল তারিখের কলিকাতা গেজেটে যেমন আজ্ঞা [অর্ডার বা রেগুলেশন] আছে যে এ সকল বিষয় প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্টকে জানাইতে হয় সেমত বিস্মৃতক্রমে গবর্ণমেণ্টকে জানান যায় নাই অতএব গবর্ণমেণ্ট আমার নিকট তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। অপর শ্রীশ্রীযুত [হিজ ম্যাজেস্টি] বাইসি প্রেসিডেণ্ট ইন কৌন্সেল সে সভা অস্বীকার করিয়াছেন অতএব আমি এক ইশ্‌তেহার দিয়াছি যে সেই দিনে সে সভা টৌনহালে বসিবে না।…

[স. সে. ক. ১ | ১৭৭]

১৪. ৫ অক্টোবর ১৮৩৩

কলিকাতায় দিস্ত্রিক্ত চারিটাবল সোসৈটি।—সর্ব্বজাতীয় দরিদ্রলোকেরদের উপকারার্থ কএক বৎসরাবধি কলিকাতায় দিস্ত্রিক্ত চারিটাবল সোসৈটিনামক যে এক সমাজ নিযুক্ত হইয়াছে ইহা প্রায় সকলই জ্ঞাত আছেন।

ঐ সোসৈটিতে এক সাধারণ কমিটি [জেনারেল কমিটি] এবং কলিকাতার প্রত্যেক পল্লীর নিমিত্ত সহকারি পল্লীর এক২ কমিটি [সাব কমিটি] আছেন।···

যে লভ্যের উপরে সোসৈটির নির্ভর আছে তাহা এই২। ৺প্রাপ্ত জেনারেল মার্টিন সাহেবের ও ৺প্রাপ্ত বারাটো সাহেবের ও ৺প্রাপ্ত চার্লস উএষ্টন সাহেবের দত্ত মুদ্রার উপস্বত্ব···।

[স. সে. ক. ২ । ৩০২]

১৮১৮ সাল থেকে ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত পনেরো বৎসরে নামপদের অনুবাদের চেষ্টা পরিত্যক্ত হয়েছে, কিন্তু পদসূচক বিশেষণের অনুবাদ অব্যাহত আছে। এই ধরনের বিশেষণ ব্যবহারে দেশীয় রীতি আর বিদেশীয় রীতির মিশ্রণের চরম দৃষ্টান্ত শেষতম উদাহরণটি, যেখানে খ্রীস্টধর্মবিশ্বাসী মৃত সাহেবদেরও বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তির (৺) নির্দেশ আছে।

'সমাচার দর্পণ'-এর এই ধরনেব রচনাগুলির ভাষাগত ত্রুটি বাদ দিলে আধুনিক কালেও এই ধরনের রচনায় একই ধরনের পদবিপর্যয় চোখে পড়ে। তার কারণ আমাদের সভা-সমিতি পরিচালিত হয় বিদেশী পদ্ধতিতে। গত প্রায় দুই শতাব্দীতে সেই পদ্ধতি আমাদের জাতীয় পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে বটে কিন্তু দেশের প্রধান সভা ও প্রতিষ্ঠানগুলিতে ইংরেজি ভাষাই এই পদ্ধতির সঙ্গে জড়িত। ফলে দুই শ বৎসরের অভ্যাসেও 'পদ্ধতি'-র সম্পূর্ণ জাতীয়করণ সম্ভব হয় নি। বাংলাগদ্যের ইংরেজি গঠন সবচেয়ে বেশি ধরা পড়ে এই ধরনের নাগরিক সামাজিকতায়—সভাসমিতির বিবরণে, সামাজিক অভিনন্দনে বা শোকজ্ঞাপনে, সভাসমিতিতে 'গৃহীত' প্রস্তাবে বা তৎসম শব্দবাহুল্য সত্ত্বেও বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পত্রে।

এই ধরনের গদ্যের তেমন কোনো মৌলিক বিবর্তন হয় নি। প্রায় বিপরীত চরিত্রের সামাজিক সক্রিয়তার ফলে সমকালের 'সমাচার চন্দ্রিকা' দর্পণ থেকে আলাদা এক গদ্যরীতি তৈরি করেছিল। কিন্তু সেখানে, বা আধুনিক কালেও, সরকারি বা আনুষ্ঠানিক বিবরণের ও উপলক্ষের বাংলা গদ্য থেকে অনুবাদের গন্ধ

কাটে নি। তার একটি কারণ হয়তো এই যে আমাদের সরকারি ও নাগরিক সামাজিক ব্যবস্থা ও সংগঠনগুলি ইংরেজরা তাদের দরকারে আরোপ করেছিল। সেই ব্যবস্থা ও সংগঠন এখনো চলছে। সারা ভারতবর্ষে এই ধরনের ব্যবস্থা ও সংগঠনের ভাষা এখনো ইংরেজি। তাই অনুবাদের দুই শতকের দায় এখনো ঘোচে নি।

এখানে একসঙ্গে 'সমাচার দর্পণ' থেকে কিছু ছোটবড় রচনা সম্পূর্ণ সংকলন করা হল। এই উদ্ধৃত উদাহরণগুলি ছাড়াও দর্পণের আরো কিছু রচনাতেও আমাদের অনুমানের সমর্থন পাওয়া যাবে।[২০] এই রচনাগুলিতে দেখা যাবে— ১. বাক্যগুলি সমাপিকা ক্রিয়ানির্ভর, ২. অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার তুলনামূলক ভাবে কম, ৩. অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহার না করে (ক) বাক্যগুলিকে সংযোজক অব্যয় (এবং, ও) দিয়ে যুক্ত করা হয়েছে, (খ) সমাসবদ্ধ বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে, (গ) যেহেতু-সেহেতু, যথা-তথা ইত্যাদি শব্দ দিয়ে বাক্যগুলিকে যুক্ত করা হয়েছে, (ঘ) -হেতু, -নিবন্ধন, -প্রযুক্ত ইত্যাদি হেত্বর্থক সমাসকারক শব্দপ্রয়োগে বাক্যগুলির পরম্পরা নির্দিষ্ট হয়েছে।

দর্পণে সাহেব ও পণ্ডিতদের সহযোগিতার ভিতর দিয়ে বাংলা সাংবাদিক গদ্যের যে-রীতি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল তা ইংরেজি সাংবাদিক গদ্যের অনুকরণে এক ধরনের নিরপেক্ষতা অর্জন করতে চাইছিল। ইংরেজি সাংবাদিকতার আদর্শ এর একটি প্রধান কারণ।

সাধারণ ভাবে গদ্য, মুখের কথার আদর্শ অনুযায়ীই প্রথম তৈরি হয়ে থাকে। এমন-কি মুখের কথাতেও জটিল বাক্যের ব্যবহার যেমন বক্তার ব্যক্তিত্বনির্ভর, তেমনি সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম দিককার গদ্যেও লেখকের ব্যক্তিত্ব একটি প্রধান উপাদান। এমন হতেও পারে যে লেখক ভাষার যে-জটিলতা কল্পনা করে নিয়েছেন, সে-ধরনের জটিলতা প্রকাশের যোগ্যতা তখনো ভাষায় তৈরি হয় নি। সেই কারণে লেখকের ভাষা ব্যাকরণের দিক থেকে অবিন্যস্তও হয়ে যেতে পারে। কিন্তু লেখকের ব্যক্তিত্বসঞ্চারের ফলে ও স্বরক্ষেপের ফলে ব্যাকরণের নিয়ম ভেঙেও পাঠকের কাছে বাক্যের অর্থ সঞ্চারিত হয়।

দর্পণের গদ্যে এ-ঘটনা ঘটে নি। সপ্তাহের পর সপ্তাহ যে-ধরনের ছোট-ছোট রচনা, সংবাদ ও মন্তব্য প্রকাশিত হচ্ছে তাতে রচনার ভেতর লেখকের ব্যক্তিত্ব সঞ্চারণের কথা আসেই না। লেখকের স্বরক্ষেপেরও কোনো সুযোগ না থাকায়, এই ছোট-ছোট সাংবাদিক রচনার গদ্য হয়ে উঠছিল সমতল, উচ্চাবচতারিক্ত, স্বরগ্রামশূন্য।

দর্পণে বড় রচনায় খুব একটা জায়গা ছিল না। তবুও কখনো-কখনো বড় রচনা বেরিয়েছে। সে-সব রচনায় অনেক জায়গায় লেখকের ব্যক্তিত্বসঞ্চারের সাক্ষ্য পাওয়া যায়, অনেক জায়গায় লেখকের কণ্ঠস্বরও যেন শোনা যায়। কিন্তু এই সব রচনা সংখ্যায় এত কম যে সেগুলির ভিতর দিয়ে দর্পণের গদ্যরীতির এই বৈশিষ্ট্য প্রধান হয়ে উঠতে পারে নি। সেখানে ছোট-ছোট রচনাগুলিই গদ্যরীতি নিয়ন্ত্রণ করেছে।

১৫. ২৭ মার্চ ১৮১৯

শ্রীযুক্ত কোঙর হরিনাথ রায় বাহাদুরের বিবাহ।—মুরশেদাবাদের কাশীম-বাজারের শ্রীযুক্ত কোঙর হরিনাথ রায় বাহাদুরের শুভবিবাহ ১৬ ফালগুণ হইয়াছে তাহার বরাওর্দ্ধ দুই লক্ষ টাকা সময় মতে জিনিসের কমদামে অধিক ব্যায়ে যেমত বিবাহ হইয়াছে এমত বিবাহ তদ্দেশে কাহার হয় নাই ও কেহ দেখেন নাই ইহার বিস্তারিত রওয়াএশ ঝাড় বাগীচা কাপড়ের ও আবরক ও মুখী বাগীচা ও নানাজাতি বৃক্ষ সকল আম্র কাঁঠাল আনারস কামরাঙ্গা দাড়িম আতা ও ফুল নানাজাতি নির্ম্মিত হইয়াছিল বিজ্ঞ মনুষ্যেতে চারি দণ্ড দৃষ্টি করিলে জ্ঞান করিত যে নির্ম্মিত দ্রব্য নতুবা ছোট২ লোকে প্রকৃত জ্ঞান করিয়াছে এমত উত্তম কারিগরি। ইহারদিগের এক২ বাগীচার মূল্য তিন শত চারি শত তাহাতে মোমবাতি সংযোগ এমত পাঁচ শত বাগীচা গেলাসী ঝাড় তিন হাজার গেলাসী বাগীচা এক হাজার মোমবাতি দুই শত মন রওানি রৌশনী হয়। নাএব মজলিস ইস্তক ৫ ফাল্গুণ নাগাদ ১৫ রোজ দশ তাএফা বাই ও তিন তাএফা ভাঁড় ইহা সেওয়ায় কালওয়াতি গুণীলোক অনেক ঐ ৫ তারিখে শ্রীযুত কোঙর বাহাদুর আইবড় খান পরে স্থানে২ যেখানে নিমন্ত্রণে যান নানাবিধ বাদ্য ও নানাবিধ সলতনৎ এবং রাজঅভরণে ভূষিত অপূর্ব্ব রূপ্যনির্ম্মিত যানারোহণ করিয়া গমনাগমন করিতেন বিবাহের মজলিসে এক২ দিন এক২ ফেরেক্কা লোকের গমন হইয়াছিল তাহার বিস্তারিত প্রথম দিবস নিজআমলাতে বেষ্টিত দ্বিতীয় দিবস গ্রামস্থ যাবৎ মহাজন ও ভদ্রলোক ইং তৃতীয় দিবস লাগাদ অষ্টম দিবস ১৩ ফাল্গুণ পর্য্যন্তা যাবদীয় হাকীমান আমলা আপীল অদালত ও ফৌজদারী ও কালেক্তরি ও পরমিট ও কোম্পানীর কুঠার আমলা ও নেজামতের আমলা ও শহরের যাবদীয় সাহেবান আলীশান ও বহরমপুর ওগয়রহ সাহেব লোক ও বিবিলোক ও বাবালোক একত্র এবং শ্রীযুত নবাব সয়লজঙ্গ বাহাদুর একত্র মজলিসে নাচ ও গান ও বাদ্য ও আতশ নানাবিধ সকল তামাশা

দৃষ্টি করিয়া পরমাহ্লাদিত হইয়াছেন। পরে ১৪ তারিখে মুরশেদাবাদের যাবদীয় ওমরাও ও শ্রীযুত জগৎ সেট সাহেব সকলে আগমন করিয়া মজলিস করিয়া গান বাদ্য শ্রবণ করিয়া তুষ্ট হইলেন এবং সেট সাহেব রওয়াএশখানা নির্ম্মিত স্থানে গমন করিয়া সর্ব্বত্র দৃষ্টি করিয়া হৃষ্টচিত্ত হইলেন পরে ১৫ তারিখে শুভ অধিবাস হয় শ্রীযুত রায়জগন্নাথপ্রসাদ প্রভৃতির আগমন হইয়াছিল ১৬ তারিখে শুভ বিবাহ ইহার রওয়াএশ এবং সলতনৎ ও নানাবিধ বাদ্য ও নানাবিধ সওয়ারি ও হস্তী ও ঘোটকাদি অসংখ্য এবং পদাতিক স্বর্ণ রূপ্য নির্ম্মিত যষ্টি হস্তে অর্থাৎ সোটা-বরদার আসাবরদার ও বাণবরদার ও গুরুজবরদার ও নওবত ইত্যাদি সলতনৎ অনেক কত লিখিব এবং কলিকাতার কারিগর নানাবিধ ছবি নির্ম্মাণ করিয়া রওয়াশ সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল এই সকল সরংজাম লইবার মুটিয়া মজুর ও বেহারা দশ হাজার দুই লক্ষ লোক পথে জমায়ত চলনশক্তি না হইয়া মিসল মাফিক ঐ রাজবাটীর দ্বার আর কোম্পানীর কুঠীর সম্মুখ রাস্তা দিয়া কালিকাপুর হইয়া ঐ দুই ক্রোশ ফিরিয়া পুনর্ব্বার ঐ রাজবাটীর দ্বার পর্য্যন্ত মিসলবন্দী হইল ইহার মধ্যে২ আতশের নানা জাতি কারখানাতে আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছিল তামাশগির মর্দআদমী ওমরা এবং দেশ বিদেশীয় লোক জমায়ত হইয়াছিল পর দিবস কন্যা পাত্র বাটী আইলে কাঙ্গালি ভিক্ষুক ও বিপ্র ও ফকীর ওগয়রহ চল্লিশ হাজার লোক কোম্পানির বানকখানার বাটীতে পুরিয়া খাদ্যসামগ্রী যথাযোগ্য এবং মুদ্রাও যথাযোগ্য প্রদান করাতে তুষ্ট হইয়া সকলেই আশীর্ব্বাদ করিয়া স্ব২ স্থানে গেল আর তদ্দেশের ব্রাহ্মণ ও ভদ্র লোক নবসাখ ও কাঙ্গাল ও গরীব আপামর সাধারণ এক২ পিত্তলের ঘড়া ও তৈল ও চেলী ও মটরাদার শাড়ী ও অসংখ্য মসালা ও ওগরবহ ও এক২ পিত্তলের থাল প্রত্যেক সকলকে দেওয়া গেল। এবং আমলা ওগয়রহেরদিগকে পোশাক শাল ও দোশালা ও যথাযোগ্য ভূষণ দিয়াছেন এবং গুণবান লোকের গুণ বিবেচনা করিয়া তদ্যোগ্য পারিতোষিক দিয়াছেন দেশস্থ বিপ্র সকলের ভূষা হইয়াছে ইহাতেই এ কার্য্যে সকলেই যথেষ্ট অনুরাগ করিতেছেন আপামর সাধারণ লোক নানাবিধ ভক্ষণ সামগ্রীতে তৃপ্ত হইয়াছে এ কর্ম্মের অধ্যক্ষ শ্রীযুত ব্রজানন্দ বাবু নিযুক্ত হওয়াতে কর্ম্মের সকল সুধারা হইয়াছে বাবুর শ্রমের পরিসীমা নাই বাবুর বৈদগ্ধ ও তদবিরে সকল লোক তুষ্ট হইয়াছে।

শ্রীযুত কোঙর হরিনাথ রায় বাহাদুরের বিবাহ যেরূপ হইয়াছে ইহা হইতে অধিক হইলেও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যেহেতুক তিনি কান্ত বাবুর পৌত্র

ও রাজা লোকনাথ রায় বাহাদুরের পুত্র নিজে অতিসুশীল ও গুণবান ও দাতা ও অনুগত-প্রতিপালক এত অল্প বয়সে এত গুণ হওয়া অন্যের দুর্ঘট।

[স. সে. ক. ১। ২৩৮-৩৯]

এই বিবরণে মাত্র দুই জায়গায় প্রত্যক্ষদর্শীর উল্লেখ পাওয়া যায়—জগৎশেঠের পরিদর্শনের কথায় আর কোম্পানির ও রাজবাড়ির সম্মুখ রাস্তা দিয়ে শোভা-যাত্রার বর্ণনায়। প্রায় আর কোথাওই কোনো অসমাপিকার ব্যবহার নেই।

১৬. ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮২০

বিবাহ।—গত শুক্রবার ৩০ মাঘ ১১ ফেব্রুআরি তারিখে শ্রীযুত বাবু রামরত্ন মল্লিক আপন পুত্রের বিবাহ যেরূপ দিয়াছেন এমন বিবাহ শহর কলিকাতায় কেহ কখনও দেন নাই। এই বিবাহে যে২ রূপ সমারোহ হইয়াছে ইহাতে অনুমান হয় যে সাত আট লক্ষ টাকার ব্যয় ব্যতিরেকে এমত মহাঘটা হইতে পারে না। ইহার বিশেষ বিবরণ পবে ছাপান যাইবেক।

সন ১৮১২ সালে মোং দিল্লীতে এই প্রকার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মহ্লাররাও হোলকারের বকসী ভবানীশঙ্কররাও নামে এক জন মহারাষ্ট্রের বিবাহ হইয়াছিল তাহাতে এগার লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছিল সে বিবাহের অধ্যক্ষ প্রধান ২ ইংগ্লণ্ডীয় সাহেবেরা ছিলেন। এই বিবাহও তাহা হইতে ন্যূন বড় নহে যেহেতুক সকল লোকেই এ বিবাহের প্রশংসা করিতেছে ও কহিতেছে যে এমন বিবাহ আমরা দেখি নাই।

[স. সে ক. ১। ২৩৯]

১৭. ২১ ডিসেম্বর ১৮২২

বিবাহ॥—গত ১৩ কার্ত্তিক শুক্রবার ত্রিপুরার রাজা শ্রীশ্রীযুত মহারাজ রামগঙ্গামাণিক্য বাহাদরের পুত্র শ্রীল শ্রীযুত কৃষ্ণ কিশোর বড় ঠাকুরের বিবাহ আসাম দেশের রাজার কন্যার সহিত হইয়াছে আসামের রাজা সপরিবার ত্রিপুরা পাহাড়ের রাজধানীতে আসিয়াছেন। এই বিবাহে অতিশয় সৌষ্ঠব নাচ তামাসা বাদ্য রোশনাই আতস বাজী প্রভৃতি হইয়াছিল এই প্রকার বাহুল্য মত ব্যয়ের এবং সমারোহের বিবাহ পূর্ব্ব দেশে আর কখনও হয় নাই জাহাঙ্গীর নগর ইস্তক পূর্ব্ব দেশের সমস্ত জিলার এবং কোর্ট আপীলের সাহেবান ও আর ২ সাহেবান ও ওমরাও লোক ও রাজ্যের সমস্ত প্রজার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল তাহারদিগের যথোপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা নানামতেই হইয়াছে আর ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ও অন্য জাতি ভিক্ষুক যে সকল লোক গিয়াছিল সকলেই দান এবং আহারে অতিশয় সন্তুষ্ট

হইয়াছে। ঐ মহারাজ চন্দ্রবংশীয় রাজা তাঁহাদের কুলাচার মতে দিবসে বিবাহ হয়···।

[স. সে. ক. ১। ২৪৩]

১৮. ১ মে ১৮২৪

বিবাহ নির্ব্বাহ।—পূর্ব্বে ছাপান গিয়াছে যে কাশীপুর মোকামের শ্রীযুত বাবু রামনারায়ণ রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রের শুভ বিবাহ ৩ বৈশাখ বুধবার হইবেক কিন্তু এক্ষণে শুনা গেল যে সে বিবাহ ৯ বৈশাখ মঙ্গলবারে শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্রীর সহিত সভাবাজারের মহারাজের পুরাতন বাটীতে হইয়াছে। কাশীপুরে বিবাহের পূর্ব্বে পাঁচ দিবস মজলিস হইয়াছিল তাহার প্রথম তিন দিবস কেবল ইঙ্গরাজের মজলিস হইয়াছিল ঐ মজলিসে শহরস্থ অনেক ভাগ্যবান সাহেব লোক ও বিবি লোক আগমন করিয়াছিলেন এবং শহরস্থ তাবৎ নর্ত্তক নর্ত্তকী আসিয়াছিল তাহারদিগের নৃত্য ও গীত দর্শন শ্রবণ করিয়া সকলে তুষ্ট হইয়াছেন এবং বাবুর শিষ্টতা সভ্যতাতে যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধিত হইয়া সকলে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। শেষ দুই দিবস বাঙ্গালি মজলিস হইয়াছিল তাহাতে শহরস্থ অনেক ২ ভাগ্যবান লোক ও দেশ বিদেশস্থ নিমন্ত্রিত ঘটক কুলীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-প্রভৃতির আগমন হইয়াছিল ঐ দুই রাত্রিতে উত্তমরূপ নাচ গানেতে অতিশয় আমোদ হইয়াছিল বিদেশস্থেরদিগের এমত সুন্দর বাসা ও সিধার পারিপাট্য করিয়া দিয়াছিলেন যে তাহারা নিবাসাপেক্ষা সুখ বোধ করিয়াছিলেন। শহরস্থ ও চিতপুর ও কাশীপুর ও বরাহনগরের দলস্থ তাবৎ ব্রাহ্মণের বাটীতে বস্ত্রা-লঙ্কার ও শংখ তৈল হরিদ্রাদি পাঠাইয়া দিয়াছেন। আরো শুনা গেল যে নয় দণ্ড রাত্রির পর লগ্ন স্থির হইয়া সন্ধ্যা সময়ে বর ও বরযাত্র যাত্রা করিলে কৃত্রিম পাহাড় কোটা বাগান নৌকাপ্রভৃতি নানাবিধ ছবি সঙ্গে গিয়াছিল ও ইস্তক কাশীপুর নাগাদ মহারাজের বাটী আন্দাজ দুই ক্রোশ পথ সমান রোশনাই হইয়াছিল। কিন্তু যখন মহারাজের বাটীর মধ্যে সকল লোক প্রবিষ্ট হইল তখন নীচে উপরে স্থানে ২ এমত বিছানা ও রোশনাই ও মজলিস হইয়াছিল যে তাহা দেখিয়া অনেকে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। এবং মহারাজের বংশেরদিগের ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য বিদ্যা বিনয়াদি গুণে সমাগত তাবৎ লোক তৃপ্ত হইয়াছেন। ও নিরূপিত লগ্নে নির্বিঘ্নে শুভবিবাহ নির্ব্বাহ হইল। সভাতে কুলজ্ঞের কুলজ্ঞতার চন্দন ব্যবস্থাদি জন্য কোলাহল ধ্বনি ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের স্বস্বাধীত শাস্ত্র প্রসঙ্গ কোলাহল ধ্বনিতে উদ্বেলম্বিবসাগরং। পরে সমাগত বরযাত্র কন্যাযাত্র মহাশয়ের-

দিগকে বাক্যামৃতদানে ও নানাবিধ জলপানীয় ভোজনে পরমাপ্যায়িত করিলেন। পর দিবস বৈকালে পূর্ব্বমত সমারোহপূর্ব্বক কাশ্মীপুরের বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন ঘটক কুলীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদায়ের বিষয় বিশেষ জানা যায় নাই অনুমান হয় যে তাহাও উত্তমরূপ হইয়া সুখ্যাতি হইবেক।

[স. সে. ক. ১। ২৪৩-৪৪]

১৯. ২৭ মে ১৮২৬

বিবাহ ॥—১১ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার শহর শ্রীরামপুর নিবাসি শ্রীযুত বাবু রাঘবরাম গোস্বামির দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুত বাবু রাজমোহন গোস্বামির বিবাহ হইয়াছে। বাবু রঘুরাম গোস্বামি মহাশয় তদুপলক্ষে সামাজিক ব্রাহ্মণেরদিগকে বস্ত্রাভরণদ্বারা সমাদৃত করিয়াছেন এবং নানা দিগেদশাদাগত স্বশ্রেণী ঘটক কুলীনেরদিগকেও যথোপযুক্ত বিদায় দিয়াছেন তাহাতে কোনপ্রকারে ত্রুটি হয় নাই। বিবাহের রাত্রিতে বরের সমভিব্যাহারে কৃত্রিম পর্ব্বত ও ময়ূরপংক্ষী এবং তদঙ্গীভূত আশা শোটাপ্রভৃতি নানাপ্রকার সজ্জা গিয়াছিল ও অনেক লোকের সমারোহও হইয়াছিল। পথের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীক্রমে উত্তম রোশনাই ও মধ্যে ২ অগ্নিক্রীড়া অর্থাৎ নানাবিধ বাজি হইয়াছিল। কলিকাতা শহরে বাজী পোড়াইতে হুকুম নাই যদি তাহা থাকিত তবে ঐ নগরস্থ ধনি লোকেরা বিবাহোপলক্ষে ঈর্ষা করিয়া বাজী পোড়াইতে ত্রুটি করিতেন না অর্থাৎ আড়াআড়িতে কলিকাতা নগরের অধিক ভাগ পুড়িত। আমাদের শ্রীরামপুর উত্তম স্থান এখানে কোন লেঠা নাই এবং এই বিবাহেতে যেমন স্থান তদুপযুক্ত বাজী হইয়াছে। তৎপর দিবস প্রাতঃকালে দশ ঘণ্টার সময় বর অতি সমারোহ-পূর্ব্বক নিজ বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন তাহার বিশেষ লিখনের প্রয়োজনাভাব যেহেতুক বিবাহের রাত্রির সমারোহের অনুসারে সকলেই অনুমান করিতে পারিবেন।

[স. সে. ক. ১। ২৪৪]

১৮ ও ১৯ সংখ্যক উদাহরণ দুটির ভিতর তুলনায় দেখা যাবে ১৯-সংখ্যক উদাহরণের অধোরেখিত অংশে লেখক অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ। কিন্তু সামাজিক অনুষ্ঠানের নানা বর্ণনায় এ-রকম স্বাচ্ছন্দ্য দর্পণে খুব একটা দেখা যায় না। ২০-সংখ্যক উদাহরণেই দেখা যায় বিবরণের এক আরোপিত নিরপেক্ষতা রচনার স্বাচ্ছন্দ্য কীভাবে নষ্ট করেছে।

২০. ২৭ মে ১৮২৬

মৈথিলির বিবাহ।—মিথিলাদেশে আষাঢ় মাসে বৎসর আরম্ভ হয় ঐ মাসে

চন্দ্রসূর্যাদি নক্ষত্রে বিবাহের লক্ষণ হইলে তাহাকে শুদ্ধা বলে তদ্দেশে শুরাট নামে এক গ্রাম আছে যাহার ২ বিবাহ দেওন বা করণ প্রয়োজন হয় তাহারা ঐ শুদ্ধাতে ঐ গ্রামে যায় এমতে ঐ স্থানে বৎসর ২ এক বড় মেলা হইয়া থাকে ইহাতে প্রায় দেশের তাবৎ ব্রাহ্মণের আগমন হয় কেহবা পুত্রের বিবাহার্থী কেহবা কন্যার বিবাহার্থী কেহবা তামাসা দেখিতে আইসেন ইহাতে কন্যাপর্য্যন্ত পঞ্চাশ হাজার লোক একত্র হইয়া প্রায় এক মাস তথায় বাস করে।

ইহার দিগের বিবাহের সম্বন্ধের নিয়ম বা তদ্বিষয়ক কোন প্রসঙ্গ অন্য প্রকারে হয় না ঐ স্থানে ভাট যাহাকে পাঁজিয়ারা কহে তদ্দারা তৎপণাপণ কোটি দিন ও লগ্ন ইত্যাদি নির্দ্ধার্য্য হয় আর যত দিন অবধারিত না হয় তত দিন উভয় পক্ষ ঐ স্থানে বাস করে বিবাহের কাল উপস্থিত হইলে বরপাত্র যেমত বড় বা ক্ষুদ্র লোক হউক সমারোহের ন্যূনাতিরিক্ত নাই তাহার সহিত একটী চাকরমাত্র যায় তাহাকে খাওয়াস কহে বরের ভূষণ এক ধুতি সাদা পাগড়ি আর একখানি দোপাটামাত্র আর বিবাহের সজ্জা জলের থালি একটী আর পানবাট্টা একযোড়া বরযাত্র খাওয়াসমাত্র বিবাহেতে বরের খরচ কেবল দুই বা চারি পয়শার সিন্দূর আর গুবাক এ তাবৎ দ্রব্যের বাহক ঐ খাওয়াস অথবা বরযাত্র হইয়া থাকে।

বর আপন বাটী হইতে কন্যার বাটীতে এমত সময়ে যাত্রা করেন যে এক প্রহর বা সার্দ্ধ প্রহর দিন থাকিতে তদ্গ্রামের প্রান্তে পঁহুছিতে পারেন তথায় উপস্থিত হইয়া কোন প্রকারে আপন শুভাগমনের সংবাদ কন্যার বাটীতে পাঠাইয়া আর পূর্ব্বোক্ত উত্তীর্ণ দোপাটা মস্তকোপরি নিঃক্ষেপপূর্ব্বক নবকুল-বধূর ন্যায় ঘোম্‌টা দিয়া গামের ভিতর অতি ধীরে ২ প্রবিষ্ট হয়েন ও পিপীলিকার ন্যায় চরণ নিঃক্ষেপ করেন বর এমত আস্তে চলেন যে তাঁহার পদনিক্ষেপ বোধ হয় না অর্থাৎ এমত ধীরে চলে যে দুই প্রহর কালে প্রায় ২০০/৩০০ হাত গমন করিতে পারেন ইহাতে যদি দ্রুত চলে তবে কন্যার দেশের লোক নিন্দা করে ও অসভ্য মূর্খ কহে কিন্তু যত ধীরে চলেন ততই প্রশংসেচ্ছুক হইয়া কতবার দোপাটাদ্বারা দৃষ্টির অবরোধ থাকাতে পাদনিঃসৃত হইয়া মৃত্তিকাতে পতিত হয়েন। কন্যার বাটীতে বিবাহের বেদী প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহাতে আলিপনাপ্রভৃতি মাঙ্গল্য দ্রব্যের অবস্থান করে বরজী আসনোপবিষ্ট হইলে কতকগুলিন মুচি বাদ্যকর আসিয়া বাদ্য করে তাহারদিগকে এক প্রকার পণ্ডিত বলা যায় কারণ তাহারা নান্দী পাঠ করে অর্থাৎ নানাবিধ নাটক গ্রন্থ পড়ে ও বর

কন্যার বংশের উপাখ্যান বর্ণনা করে সেখানে অন্য কোন পুরুষ যাইতে বা থাকিতে পায় না কেবল কন্যাকর্ত্তা মাত্র তেঁহ অত্যল্প বাচনিক মন্ত্রদ্বারা কন্যা সংপ্রদান করিয়া স্থানান্তরে যান স্ত্রী লোকেরা আসিয়া বাদ্য গীত করত বর কন্যাকে বাসর ঘরে লইয়া যায় তাহারা যে ঘরকে কোবর কহে তথাতে স্ত্রী লোকেরা ধূনা জ্বালায় পর দিন গ্রামস্থ আত্মীয় স্বজন ব্যক্তিরা বরকে কুতূহল স্থলে দেখিতে আইসেন আর যৌতুক দানের পরিবর্ত্তে কিঞ্চিত ধূনা জ্বালাইয়া সম্মুখে এক প্রকার আরতি করে কেহবা পান সুপারি দেয় স্ত্রী লোকেরা হরগৌরীর বিবাহের প্রসঙ্গ বিষয়ক ভরকুননামক গীত গায় ও বাদ্য বাজায় এ প্রকারে বর কুতূহল গৃহে ৭/৯/২১ বা ২৭ দিন বাস করিয়া আপনি পদব্রজে আর স্ত্রীকে এক ডুলিতে করিয়া নিজালয়ে গমন করেন।

[স. সে. ক. ১। ২৪৪]

'সমাচার দর্পণ'-এর গদ্যরীতির সংস্কৃতনির্ভরতা ও ইংরেজিনির্ভরতা এই উদাহরণগুলি থেকে অনুমান করা যেতে পারে মাত্র। সতর্ক ভাবে দেখলে, এই উদাহরণগুলির বাক্যগুলি পরস্পরের সঙ্গে কীভাবে বাঁধা পড়ছে ও একটি বাক্যের ভেতরে কর্তা, কর্ম বা ক্রিয়ার সম্প্রসারণ কী ভাবে ঘটছে—এই দুটি বিশেষ ক্ষেত্রে আমাদের এই অনুমানের কারণ স্পষ্টতর বোঝা যাবে।

আর-একটি পরোক্ষ পদ্ধতিতেও দর্পণের গদ্যের এই বৈশিষ্ট্য দেখা যেতে পারে। দর্পণে বেশ-কিছু চিঠিপত্র বেরত। এই চিঠিপত্রের ভাষারীতি দর্পণের নিজস্ব রচনার ভাষারীতি থেকে আলাদা। পত্রলেখকরা প্রায়ই বাংলা প্রবচন ব্যবহার করে ফেলেন, দর্পণে তেমন প্রবচন প্রায় দেখাই যেত না। পত্রলেখকদের বর্ণনায় ঘটনার সঙ্গে তাঁদের বক্তিগত সম্পর্কের আভাসটি খুব স্পষ্ট থাকত। দর্পণের গদ্য তো নৈর্ব্যক্তিক। পত্র-লেখকরা প্রায়ই সংলাপ ব্যবহার করতেন—নিজেদের বর্ণনার মধ্যেই—তাতে রচনায় একটা প্রত্যক্ষতা আসত। দর্পণে অনেক বেশি ব্যবহৃত হত—পরোক্ষ উক্তি, বিশেষত সভাসমিতির বিবরণে। চিঠিপত্রে অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার অনেক বেশি, সে-ব্যবহারে বৈচিত্র্যও আছে; সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী হেত্বর্থক ক্রিয়া ও বিশেষণের ব্যবহার বিরল; যেহেতু-সেহেতু, যত্র-তত্র এ-রকম সংযোজক পদও কম। এই চিঠিপত্রের ভাষার সঙ্গে দর্পণের পণ্ডিতদের লেখা গদ্যের তুলনা করলে সবচেয়ে স্পষ্ট হতে পারে যে দর্পণের গদ্যে লেখকের কণ্ঠস্বরের প্রক্ষেপ বলতে আমরা কোন্ বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে চাইছি। এই চিঠিপত্রের ভাষায় নাম-না-জানা পত্রলেখকও তাঁর কণ্ঠস্বরের বিশেষ ভঙ্গিতে স্পষ্ট ভাবে উপস্থিত। ২২ সংখ্যক

উদাহরণটিতে যদিও বলা নেই যে এটি চিঠি, আমাদের অনুমান—বাইরে থেকে লিখে কেউ এই বিবরণ পাঠিয়েছেন। বাকি উদাহরণগুলিতে বলে দেওয়াই আছে যে এগুলো চিঠি।

২১. ২৬ মে ১৮২১

চৈতন্য মঙ্গল গান শ্রবণের ফল অতিসুমধুর কথা।—কোন স্থানে চৈতন্যমঙ্গল গান হইতেছিল সেই স্থানে নিমন্ত্রিত হইয়া অনেক লোক শ্রবণ করিতে গিয়াছিল বিশেষতঃ স্ত্রী লোক অধিক। ইতোমধ্যে গায়ক আপন গুণ প্রকাশ অনেক করিতে লাগিল এবং অঙ্গভঙ্গী ও কটাক্ষ নৃত্য অনেক দেখাইল। তাহাতে কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির স্ত্রী অতিগুণগ্রাহিকা ও গুণবতী ঐ সকল দেখিয়া মুগ্ধা হইয়া আপন পুত্রের হস্তে গায়ককে পেলা দিবার নিমিত্ত আটটী টাকা দিলেন। সে বিশ বৎসরের বালক বাবু গায়ককে পেলা দিলে গায়ক আপন নায়ককর্তৃক যে পুষ্পমালা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা বাবুর গলে দোলায়মান করিলেক এবং কানে ২ কি কহিয়া দিলেক। পরে ঐ শিশু প্রামাণিক বাবু ঐ মালা গলে দিয়া তাহার জননীর নিকটে যাইবামাত্র গুণবতী ঐ মালা সন্তানের গল হইতে আপন গলে দোলায়মান করত রূপ ঐশ্বর্য্য মাৎসর্য্য প্রকাশ করিতে লাগিল। পরে কোন সুরসিকা বিধবা স্ত্রী তিনিও মহাধনাঢ্য লোকের স্ত্রী তিনি বিবেচনা করিলেন যে আমি সত্বে এই মালার পাত্রী অন্য কেহ নহে ইহাতে ঐ গুণবতীকে কহিলেক যে আমাকে মালা দেহ। গুণবতী উত্তর করিলেক যে কারণ কি। সুরসিকা কহিতে লাগিল যে বিবেচনা কর যদি ধনের সংখ্যা করিস তবে ধনাঢ্য বলিয়া আমার স্বামির নাম খ্যাত ছিল রাঢ়ে বঙ্গে কে না জানে যদি সৌন্দর্য্য বিবেচনা করিস তবে আমার রূপ দেখ এবং এই সভার স্ত্রী পুরুষ সকলে দেখিতেছে আর ঐ গায়ককেও জিজ্ঞাসা কর যদি ভাবিস যে তুই সধবা অনেক অলঙ্কার গায়ে দিয়াছিস আমার গলে যে মুক্তার মালা ও হস্তে যে হীরার আঙ্গুঠী আছে তোর সকল অলঙ্কারের মূল্য ইহার একের তুল্য হইবেক না যদি বয়সের গরিমা করিস তবে দেখ তোর বয়স পঁয়ত্রিশ বৎসরের অধিক নহে আমার বয়স চল্লিশ বৎসর হইয়াছে যদি সন্তানের অভিমান করিস তোর চারি পুত্র বিনা নহে আমার পাঁচ পুত্র ও পৌত্র দৌহিত্র হইয়াছে। পরে গুণবতী কহিলেক যে গায়ক ঠাকুর এ মালা আমাকে দিয়াছেন আমার পুত্রের কানে ২ কহিয়াছেন এবং আট টাকা পেলা দিয়াছি চক্ষুখাগী তাহা কি দেখিস নাই। পরে সুরসিকা কহিলেক তুই আট টাকা পেলা বই দিস নাই আমি

বিলাতি ধুতি ঢাকাই একলাই চেলির জোড় সোনার হার বাজু দিয়াছি আর আমার সঙ্গে অনেক কালের জানা শুনা। এই প্রকার কথোপকথনদ্বারা বড় গোল হইলে গানভঙ্গ হইল শেষে দুই জনে মারামারি করিয়া ঐ মালা ছিঁড়িয়া ফেলিলেক। সে উভয়ের সোনার অঙ্গে হায় কত নখাঘাতে ক্ষত হইয়া অঙ্গ ভঙ্গ শরীর চূর্ণ ও রক্তপাত হইল যত লোক বাহিরে ছিল ঐ রাক্ষসীরদের মায়া দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। শেষে দুই জনে প্রতিজ্ঞা করিলেক যে ভাল দেখা যাইবেক গায়ককে কে কত টাকা দিতে পারে আর গায়ক ঠাকুরকে আপন বাটীতে লইয়া যাইতে পারে।

ইহাতে লেখক কহে উচিত হয় বলা সকলের মুখে ছাই দিয়া কে বাঞ্ছা পুরাইতে পারে—দেখ সমাচার দর্পণ কর্ত্তা মহাশয় চৈতন্যমঙ্গল গায়কের ফল আর শ্রোতার ফল বিবেচনা করিবেন এবং প্রকাশ হইলে অনেক মহাশয় বিবেচনা করিতে পারেন। অতএব—শুনিয়া দরিদ্র দ্বিজ গান শিখ ত্বরা করি। সোনায় মণ্ডিবে ভুজ পাবে সুখসিন্ধু তরি।

কোনহ বিচক্ষণ ব্যক্তি এই কথা সমাচার দর্পণে বিন্যাস করিতে প্রচ্ছন্নরূপে পাঠাইয়াছেন অতএব তাহা করা গেল।

[স. সে. ক. ১। ১০১]

২২. ৩০ জুন ১৮২১

বৃদ্ধের বিবাহ।—দক্ষিণ দেশে ফরকাবাজ নামে এক গ্রামের অবুঝচন্দ্র নামে এক ব্রাহ্মণ বহুকালাবধি মাতামহালয়ে কলিকাতা থাকিয়া শিষ্য যজমান করিয়া কিঞ্চিৎ ধন সঞ্চয় করাতে পাঁচ শত টাকা ব্যয় করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন তাহাতে তিন চারি পুত্র ও দুই তিন কন্যা জন্মিয়া সংসার সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইতেছিল ইতোমধ্যে ঐ ব্রাহ্মণের স্ত্রীর কাল হওয়াতে তিনি দুঃখসাগরে মগ্ন হইয়া পৈতৃক বাটীতে গেলেন।

সেখানে গিয়া অনেক ঘটকের সাক্ষাতে কহিলেন যে আমার গৃহ শূন্য হইয়াছে যদি তোমরা আমাকে স্থাপিত কর তবেইত সংসারে থাকি নচেৎ দুই চক্ষু যে দিকে যাইবে সেই দিকেই যাইব। ইহা কহিতে২ চক্ষুর জলে বুক ভাসিয়া গেল তাহা দেখিয়া ঘটকেরা তাঁহাকে আশ্বাসরূপ ঘোটকারোহণ করাইলেক ও কহিলেক যে এ কোন আশ্চর্য্য মহাশয়ের বয়ঃক্রম কত হইবেক। তিনি কহিলেন যে প্রায় সত্তরি বৎসর কোষ্ঠী রাখি না ঠিক বলিতে পারি না ছেহত্তরের মন্বন্তরের সময়ে আমার বয়স বৎসর পঁচিশ ছাব্বিশ হইবেক আর এই

যে দেখিতেছ দন্তগুলা পড়িয়াছে সে শুদ্ধ জল দোষের কারণ আর বেয়ে ধাতু প্রযুক্ত চুল পাকিয়াছে কিন্তু শক্তি এমত অদ্যাপি ত্রিশ পঁচিশ দণ্ড রোজ ২ করি। পরে ঘটকেরা কন্যার অন্বেষণে দিকে২ গেল মোকাম বৈদ্যবাটীতে আটার উনিশ বৎসরবয়স্কা এক কন্যা স্থির করিয়া আসিয়া কহিল যে ওহে মজুমদার মহাশয় তোমার ভাগ্য ভাল পরম সুন্দরী উনিশ বৎসরবয়স্কা এক কন্যা স্থির করিয়াছি অবীরা কুলীনের মেয়ে ৫০০ টাকা পণ দিতে হইবেক আর সর্ব্বাঙ্গে সোনার গহনা ইহা যদি পার তবে হইবেক আর আমারদের ঘটকালি ১০০ টাকা চাহি। মজুমদার ঐ কথা শুনিয়া আহ্লাদে ডুবু ২ হইয়া কহিলেন যে আজ্ঞা আমি এ সকলি দিব এ কথা প্রকাশ করিবেন না আপনারা শীঘ্র গিয়া লগ্নপত্র করিয়া আইস্থন। ঘটকেরা কহিল যে শুন হে মজুমদার যদি তোমার ভাল করিলাম তবে আর ঢাক ২ গুড় ১ কি সে কুলীনের মেয়ে তাহার পিতা মাতা নাই তত্রাপি অন্য জ্ঞাতি আছে তাহারা হইতে দিবেক না অতএব রাহা খরচের টাকা দেও মেয়ে এই খানে উঠিয়া আনি গিয়া।

ঘটকেরা ১০ দশ টাকা রাহা খরচ লইয়া সেই কন্যার আলয়ে গেল। বালিকা কহিলেন যে কি সম্বাদ। ঘটকেরা সকল কথা কহিলেক। কন্যা সেই দণ্ডে এক পালকীতে আরোহণ করিয়া বরপাত্রের গ্রামের নিকটে উপস্থিতা হইল। পাত্রটি সেইখানে গেলেন কন্যা দেখিয়া হুপ পাঁচ হাত হইল। পরে কোন ভাগ্যবান লোকের বাটীতে কন্যাকে রাখিলেন পর দিবস বিবাহ হইবেক উভয়ের গাত্রে হরিদ্রা দেওয়া গেল হাতে স্থতা বান্ধিয়া বরপাত্র আপনি নান্দীমুখ করিলেন।

বৈকালে সুশীলা কহিলেন বর কোথা। পরে ছেলেটী আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। হাজার যদি শিশু কন্যা হয় তত্রাপি কালের মাহাত্ম্য প্রযুক্ত কহিলেন যে আমি ও বুড়া বরকে বিবাহ করিব না।

এই সম্বাদ পাইয়া যত২ আদবুড়া ও পৌন বুড়া আইবুড়া ছিল তাহারা কেহ২ গোঁপ ছাঁটিয়া দাঁতে মিসি দিয়া কেহ২ মাথাময় বেড়ি রাখিয়া কালাপাড়্যে ধুতি পরিয়া কেহ ঘড়ী একটা চাহিয়া টেঁকে দিয়া ও গোঁফে কলফ লাগাইয়া ঐ কন্যার সম্মুখে ঘুরিয়া২ বেড়াইতে লাগিল ইহা দেখিয়া মজুমদার কহিলেন যে আমার গলায় যিনি ছুরি দিবেন তাহার বংশ থাকিবেক না।

অনেক বুঝান সুজানের পর কন্যা রাজী হইলেন ও কহিলেন যে তবে

আমি বিবাহ করিব যদি গহনা ও টাকা আমার হাতে দেয়। তখন ব্রাহ্মণ বলেন রাম মা দুর্গা দিন দিলেন সেই রাত্রিতে তিনি আপন পরিবারের নিকটে আসিয়া কোন ছল করিয়া গহনা লইয়া গেলেন বাটীখানি বন্ধক রাখিয়া ৫০০ টাকা কর্জ করিয়া লইয়া দিলেন বিবাহ হইল বাসরঘরে অসুসার গেল না। সুশীলা কহিলেন যে আমার পীড়া আছে আমাকে স্পর্শ করিও না। পরে কলিকাতা আনিলেন ডাক্তারের ঔষধি দিতে লাগিলেন দশ পোনের দিবসের পর কুলীনের কন্যা আপন কুলে পলাইয়া গেলেন। মজুমদার পাগলের ন্যায় হইয়া বাপুরে মারে শব্দে কান্দিতে২ বৈদ্যবাটীতে গিয়া দেখেন যে দশ পোনেরজন নেড়া নেড়ী একত্র মহোৎসব করিতেছে। মজুমদার দেখিয়া শুভ যাত্রা করিলেন ওনামটী মুখে আনিলেন না।

অতএব শুন বিবাহেচ্ছুক মহাশয়েরা সাবধান ২।

[স. সে. ক. ১। ১০৩-৪]

২৩. ১ সেপ্টেম্বর ১৮২১

প্রেরিত পত্র বৈদ্যসম্বাদ। এ প্রদেশস্থ ভাগ্যবান বিজ্ঞ লোকেরদের প্রতি আমার এই নিবেদন তোমারদের দেশস্থ লোকেরা কি প্রকারে বাঁচে তাহার কিছু তত্ব তোমরা কেন না কর অনেক২ বিষয়ে তাহারা ক্লেশ পায় কিন্তু তোমরা কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিলে সকলের পক্ষে মঙ্গল হয় যে সকল বিষয়ে ক্লেশ তাহার মধ্যে আমি একটি সম্প্রতি লিখি। ইহার উপায় বিনা অর্থব্যয়ে করিতে পারিবেন। তাহার ধারা আমার বুদ্ধ্যনুযায়ি লিখি দৃষ্ট হইলে যদি গ্রাহ্য হয় তবে করিবেন কিম্বা মহাশয়েরদের বিবেচনায় যাহা হয় তাহাই করিবেন।

যদি কোন লোকের পীড়া হয় তাহাতে বৈদ্য ডাকাইয়া আনে যে সকল জ্ঞানবান্ চিকিৎসক তাহারা অনেক টাকা যেখানে পান সেখানে যান সে সকল কবিরাজ থলী হাতে করিয়া রাস্তায়২ বেড়ায় তাহারাই গরীব দুঃখিরদিগকে দেখিতে আইসে কোন বৈদ্য রোগ নিরুপণ করিলেক কিন্তু ঔষধির ব্যবস্থা করিতে পারে না কেহবা ঔষধি করিতে জানে নাড়ীজ্ঞান নাই কাহারোবা শাস্ত্রজ্ঞান নাই কেবল পেঁতের বৈদ্য কাহারো শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে ধনাভাবে ঔষধি করিতে পারে না ইহাতে কি প্রকার করিয়া লোক বাঁচিতে পারে তবে যে পীড়া হইলে লোক বাঁচে এই আশ্চর্য্য। পীড়া হওনের সম্ভাবনা অনেক আছে কিন্তু সুস্থ হওনের কিছুই নাই।

[স. সে. ক. ১। ১০৬]

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'কলিকাতা-কমলালয়'-এর ভূমিকায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেছেন—এই কয়েকটি রচনা ও ১৮২১-এর ফেব্রুয়ারি থেকে জুনে ধারাবাহিক প্রকাশিত 'বাবুর উপাখ্যান' ভবানীচরণেরই রচনা। অর্থাৎ এই রচনাগুলি যে দর্পণের রচনারীতি থেকে আলাদা রীতিতে লেখা—তা সহজেই বোঝা যায়।

বিবরণের এক আপাত সরল গদ্যই দর্পণের বিশিষ্ট রীতি। এর ভিতর ইংরেজি সাংবাদিকতার আদর্শে সাংবাদিক নৈর্ব্যক্তিকতার চেষ্টাও কিছু-কিছু নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু সেখানেও এক আদর্শ বিভ্রাট ঘটে। ইংরেজি গদ্যের দীর্ঘ ইতিহাসে গদ্যের নানা ধরনের ব্যবহার ঘটেছে। শিল্পবিপ্লব, পার্লামেন্টারি রাজনীতি, বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন, আইন-কানুন, সভা-সমিতি ইংল্যাণ্ডের সমষ্টিজীবনের অপরিহার্য উপকরণ হয়ে উঠেছিল। ফলে ইংলণ্ডের সংবাদ-সাময়িকপত্রের একটি অতিরিক্ত দায় ছিল, নাগরিক সমষ্টিমত সংগঠনের প্রয়োজনে সংবাদের তথাকথিত নিরপেক্ষতা রক্ষা করা, যেন পাঠক-নাগরিকের নিজস্ব সিদ্ধান্তে পৌঁছবার রাস্তা সব সময়ই খোলা থাকে। কারণ নাগরিকের এই স্বাধীন মতই রাষ্ট্র-সংগঠনের ভারসাম্য রক্ষা করে ও তাকে নিয়ন্ত্রিত করে। রাষ্ট্রের স্বার্থেই তার প্রয়োজন। সাংবাদিক নিরপেক্ষতার এমন আদর্শ একমাত্র সেই দেশেই সম্ভব যেখানে মতান্তর, বিতর্ক, সরকারবিরোধিতা ইত্যাদি সবই ঘটে জাতীয় স্বার্থ ও রাষ্ট্রকাঠামো সম্বন্ধে বৃহত্তর মতৈক্যের পরি-মণ্ডলে। যুদ্ধের অবস্থায় বা এমন-কি শান্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার সময়ও শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বী দেশের বক্তব্য ও কাজের সমর্থন কখনোই করতে দেয়া হয় না। সাংবাদিক গদ্যের নিরপেক্ষতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ইত্যাদি নীতি তখন মুলতুবি থাকে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, ইংরেজি গদ্যের বহুব্যবহারের বৈচিত্র্যের ফলে ভারতবর্ষের ইংরেজি সাংবাদিকতাতেও এই নিরপেক্ষ গদ্যরীতিই অনুসরণ করা হত। কিন্তু সেই সাংবাদিকতার নিরপেক্ষতাও কি রক্ষিত হত—প্রশ্নটি যখন দাঁড়াত কোম্পানির বা ইংল্যাণ্ডের স্বার্থ ও ভারতীয় স্বার্থের মধ্যে বাছাইয়ের ?

তাই তথাকথিত সাংবাদিক নিরপেক্ষতার এই চর্চা বাঙালি ও বাংলা সংবাদ-পত্রের পক্ষে প্রাসঙ্গিকই ছিল না। বাংলা ভাষায় গদ্য তখনো তৈরিই হয় নি। গদ্য তো তৈরি হয়ে উঠতে পারে বাস্তবের সঙ্গে ও প্রয়োজনের সঙ্গে প্রতিদিনের নিয়ত সংযোগে-সংঘর্ষে। সেই প্রয়োজনবোধ থেকেই পদ্যের বাঁধাবাঁধি ও দার্শনিকতা-বিমূর্ততা ছেড়ে গদ্যের শক্ত হাতিয়ারের খোঁজ। তাই প্রাথমিক স্তরের

গদ্য একই সঙ্গে হতে পারে আবেগে একটু আগোছালো, চিন্তাতেও একটু বিশৃঙ্খল ; গড়নেও হয়তো একটু খাপছাড়া। বাংলা গদ্যের এই প্রাথমিক চেষ্টায় কিন্তু কণ্ঠের সেই বহুস্বরকে, অভিজ্ঞতার সেই আপাতবিপরীতকে সরল করে দেয়া হয়েছে বিবরণের তথাকথিত নিরপেক্ষতা দিয়ে। দর্পণের গদ্যের এই আপাতনিরপেক্ষতা ও বিবরণের চেষ্টার ভিতর বাংলা লেখকের প্রাণ ও সক্রিয়তা প্রত্যক্ষ নয়। বাংলা-লেখক ও বাংলা পাঠকের ভিতর সংযোগ-সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে বাংলা গদ্য নির্মিত হয়ে উঠছিল না। পরস্পর থেকে এই দুই পক্ষকে আড়াল করে ছিল তৃতীয় ও প্রধানতম পক্ষ—সাহেবরা। তাই এই গদ্যের উপকরণবিন্যাসও ঘটেছিল এই বিশেষ পরিস্থিতির সংগতিতেই।

আজ যখন বাংলা গদ্য এক পরিণতিতে পৌঁছেছে ও সৃষ্টিশীল রচনার জোরে সেই গদ্যের স্বাবলম্বন অনেক দূর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত, তখন, দর্পণের এই গদ্যরচনা-গুলিকে বাংলাগদ্যের যথাযথ পূর্বরূপই মনে হতে পারে। আমাদের উৎপাদন-ব্যবস্থার নানা দিকে বা আমাদের সংস্কৃতির নানা বিষয়ে ব্রিটিশ প্রভাব যে-আধুনিকতা সঞ্চার করতে পেরেছিল, বাংলা ভাষা তার বাইরে নয়। ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থার কাঠামোতে আমরা যেমন এখানেও এক শাসনব্যবস্থা পাচ্ছিলাম, বা ব্রিটিশ অর্থনীতির কাঠামোতে আমরা যেমন এখানেও এক অর্থনীতির ব্যবস্থা পাচ্ছিলাম—তেমনি ভাষার বেলাতেও ইংরেজি বাক্যের কাঠামোর মধ্যে আমরা বাংলা বাক্যের এক সরল, সাবলীল, সহজ পরিচ্ছন্ন রূপ পাচ্ছিলাম। সেই বাংলা গদ্যে কোনো আবেগ ছিল না, লেখকের কোনো ব্যক্তিগত ভূমিকা ছিল না, ভাষার কোথাও বিচ্যুতি ছিল না, একটি নির্মীয়মাণ ভাষার বিশৃঙ্খলাও ছিল না। ব্যক্তিনিরপেক্ষ এক বিবরণের গদ্যে লেখা হয়ে যাচ্ছিল—কলকাতায় প্রথম স্টিমশিপ পৌঁছনোর খবর (উদাহরণ ২৯), আবার সুন্দরবনে একটি মেয়ে কাঁথার আগুনে কী করে বাঘ মারল তার চমকপ্রদ কাহিনী (উদাহরণ ৩০), কলকাতায় গ্যাসের আলো আসার খবর (উদাহরণ ২৪) বা কলকাতার লটারির ইস্তাহার, আবার কোনো এক গ্রামে কী ভাবে ডাকাত মারা হল তার এক দেশী কাহিনী। সাহেবদের ডুয়েলের গল্প বলা হয় যে-সাংবাদিক নিরপেক্ষতায় (উদাহরণ ২৮) ও যে-বিস্তারে, কলকাতার কাছে ভাগীরথী নদীর জল কমে যাওয়ার বিপদ নিয়েও আলোচনা হয় (উদাহরণ ৩১) প্রায় সেই একই উচ্চাবচতাহীন গদ্যে। সারা দেশে তখন ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বের বিস্তার—তাই কোথাও ঝোলানো ব্রিজ, কোথাও লোহার ব্রিজ দিয়ে নদীর ওপর দিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে, কোথাও নতুন রাস্তা

তৈরি হচ্ছে, কোথাও নতুন ঘাট বানানো হচ্ছে আর সেই বিরাট অভিযানের বিবরণ দর্পণে বেরচ্ছে এক শান্ত, চর্চিত, অনুত্তেজ গদ্যে—(উদাহরণ ২৬, ২৭)। দর্পণের বাঙালি পাঠক সেই বিবরণ থেকে জানতে পারেন 'যে-সকল নদীর নিকট পুল প্রস্তুত হইয়াছে সে সকল স্থানে অনেক লোক দস্যু হস্তে মারা পড়িয়াছিল সংপ্রতি সে সকল দস্যুভীতি নাই যেহেতু পুলরক্ষকরা সে স্থানে সর্বদা থাকে' বা 'নানাদেশী তীর্থাভিলাষী সন্ন্যাসী এবং তত্তৎ স্থাননিবাসিরা স্বচ্ছন্দপূর্বক পার হইতেছেন তাহাতে কোনক্রমে ক্লেশের লেশও নাই।' যদি কখনো-কখনো রসিকতার প্রয়োজন হয় তা হলে কলকাতা শহরের শ্রমজীবী মানুষ আছেন (উদাহরণ ২৫)। রসিকতার আবেগে পাল্কি বেহারাদের ট্যাঁকঘড়ি বা তাদের সঙ্গে পশুর তুলনা—'ইতোমধ্যে কলিকাতানগরে ঘোড়াসকল পাল্কীবেহারা হইয়াছে' (উদাহরণ ২৫)।

২৪. ৩০ মার্চ ১৮২২

কলিকাতা ॥—ইংগ্লণ্ড দেশে নলদ্বারা এক কল সৃষ্টি হইয়াছে তাহার দ্বারা বায়ু নির্গত হইয়া অন্ধকার রাত্রিতে আলো হয়। সংপ্রতি শুনা গেল যে মোকাম কলিকাতার ধর্ম্মতলাতে শ্রীযুত ডাক্তর টৌল্মিন সাহেব আপন দোকানে ঐ কল সৃষ্টি করিয়াছেন অনুমান হয় যে লাটিরির অধ্যক্ষেরাও লাটিরির উপস্বত্ব হইতে কলিকাতার রাস্থাতে ঐ রূপ আলো করিবেন।

[স. সে. ক. ১। ৩০৪]

২৫. ২ জুন ১৮২৭

ঠিক বেহারা।—…আমরা শুনিয়াছি যে কলিকাতাস্থ তাবৎ ঠিকা বেহারার-দিগকে পুলিসে ডাকাইয়া মাজিস্ত্রিট সাহেব লোকেরা উত্তমরূপে এই আইনের বিশেষ বুঝাইয়াছেন এবং তাহারদের সকল ওজরও শুনিয়াছেন। শুনা গিয়াছে যে চাপরাসের মূল্যের বিষয়ে তাহারদের প্রধান ওজর ছিল কিন্তু মাজিস্ত্রিট সাহেবেরা ঐ মূল্য তাহারদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন। তাহারদের প্রত্যাগমনকালে এমত বোধ হইল যে তাহারদের সকল ওজর মিটিয়া গিয়াছে এবং তাহারা সকলেই স্ব ২ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবেক কিন্তু এখন কলিকাতায় এক বেহারারও মুখ দেখা যায় না ইহাতে অনুমান হয় যে ইহার মধ্যে কিছু দুষ্টতা থাকিবেক কিম্বা কেহ তাহারদিগকে কুমন্ত্রণা দিয়া থাকিবেক এই নূতন ব্যবস্থাবিষয়ে কেহ ২ এই এক ওজর করে যে কেবল সময়ানুসারে হার নিরূপিত হওয়াতে তাহার-দের পক্ষে অনেক ক্ষতি অতএব সময়ানুসারে হার না করিয়া যদি দূরাদুর বুঝিয়া

করা যাইত তবে ভাল হইত যেহেতুক কলিকাতা হইতে কালীঘাটে কোন বাবুকে লইয়া যাইতে হইলে মরেপিটে এক ঘণ্টার মধ্যে যাওয়া যায় এবং সে এক ঘণ্টার মজুরি তাহারা প্রত্যেকে কেবল এক ২ আনা করিয়া পাইবেক কিন্তু সেই এক ঘণ্টায় তাহারদের তাবৎ দিবসের বল যাইবে।

আরো কলিকাতার এক ইংরাজি সমাচারপত্রে বেহারারদের পক্ষপাতী হইয়া কেহ লিখিয়াছেন যে সময়ানুসারে বেতন নিরূপণের নূতন আইন হওয়াতে বেহারারদের প্রাণ লইয়া টানাটানি হইয়াছে যেহেতুক বেহারারদের ঘড়ী নাই আরোহকেরদের ঘড়ী আছে এবং ইতরলোক অপেক্ষা মান্যলোকের কথা প্রায় সর্ব্বত্রই অধিক মান্য। এমন অনেক মান্যলোক আছেন যে তাঁহারা দেড় ঘণ্টা কিম্বা ততোধিককাল পর্য্যটন করাইয়া ঘড়ী দেখাইয়া এক ঘণ্টার বেতন দান করিবেন বেহারা বেচারা তাহাতে বাক্য কহিতে পারিবে না কহিলে আইনানু-সারে দণ্ডনীয় হইবেক সুতরাং মাদারির মৃত্যু। অতএব ঐ লেখক কহিয়াছেন যে সরকারি ব্যয়ে প্রত্যেক বেহারাকে এক ২টা ঘড়ী দেওয়া যায় তাহা হইলে বেহারারা যখন পালকি ঘাড়ে করিবে তখন টেক হইতে ঘড়ী বাহির করিয়া দেখিবেক ও যখন পালকী নামাইবেক তখন বস্ত্রদ্বারা আপনারদের মুখের ঘাম মুচিয়া পুনর্ব্বার ঘড়ী দেখিবেক তাহাতে আরোহকের ঘড়ীর সঙ্গে যদি ঠিক মিলে তবে কিছু অন্যায় হইতে পারিবেক না কিন্তু যদি না মিলে তবে উভয়ে কলিকাতার বড় গ্রিজায় গিয়া আপনারদের ঘড়ী ঠিক করিবে কিন্তু সেখানে যাইবার মজুরি বেহারারদের নিজ খরচ।

সে যে হউক বেহারারা চলিয়া গিয়াছে হইতে পারে যে তাহারা শ্রীক্ষেত্র দর্শনে গিয়াছে। সংপ্রতি রথ যাত্রা উপস্থিত ভরসা হয় যে একবার রথ টানিয়া কলিকাতায় আসিয়া পুনর্ব্বার পালকী বহিবেক। ইতোমধ্যে কলিকাতা নগরে ঘোড়া সকল পালকীবেহারা হইয়াছে এবং বোধ হয় যে দুই তিন হপ্তার মধ্যে ঘোড়ারদেরও সভা হইয়া এক দরখাস্ত উপস্থিত হইবেক। ইহাও অসম্ভব নয় যেহেতুক হিতোপদেশ প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে ষাঁড় শৃগালাদি কথা কহিয়াছে।

[স. সে. ক. ১। ৩০৪-৫]

১৬. ৪ অক্টোবর ১৮২৮

নূতন পথ।—ভাগীরথীর পূর্ব্ব অংশ টিটেগড় গ্রামে এক ক্ষুদ্র পথ আছে টিটেগড় হইতে সুখচর যাইতে অত্যল্প দূরেই এই রাস্তা পাওয়া যায় ইহার পরিসর বিস্তর নহে কিন্তু পদব্রজে অথবা শকট আরোহণে যাইতে লোকেরদের বিস্তার ক্লেশ

হয় বিশেষতঃ বর্ষার সময়ে কর্দমজন্য তাবতে অত্যন্ত দুর্গম বোধ করেন এমত বিজ্ঞ শ্রীযুত ব্রবর এবং সিক্স্রিপিয়র সাহেব প্রভৃতি সেই রাস্তা ভাঙ্গিয়া কৃপাপূর্ব্বক বৃহৎ রাস্তা করিবেন কল্প করিয়া কতকগুলিন বন্দুয়ান চোর আনিয়া উদ্যোগ করিয়াছেন ইহা শীঘ্র হইবেক শুনা যাইতেছে আমরা মহাহর্ষপূর্ব্বক লিখিতেছি যে শ্রীযুত সাহেবেরা এরূপ লোকেরদের প্রতি দয়াপ্রকাশে তাঁহারদের প্রতিষ্ঠার সীমা নাই এবং তত্রস্থ লোকেরাও এরূপ ব্যাপার দেখিয়া বহুতর প্রশংসা করিতেছে।

[স. সে. ক. ১। ৩০৮]

২৭. ৩০ আগস্ট ১৮২৩

রজ্জুময় সাঁকো।—শুনা গেল যে শ্রীযুত রাজা শিবচন্দ্র রায় পরোপকারার্থে কর্ম্মনাশা নদীতে এক রজ্জুময় সাঁকো নির্ম্মাণ করিতে শ্রীযুত সেক্সপিয়র্স সাহেবকে অনুমতি দিয়াছেন তাহাতে কাশীর উত্তর পশ্চিম বিশ পঁচিশ ক্রোশ দূরস্থ লোকেরদের কাশী আগমনের অতিসুগম হইবেক। এই বিষয়ে গবর্ণমেন্ত সন্তুষ্ট হইয়া ঐ রাজার সুখ্যাতি করিয়াছেন যেহেতুক তিনি স্বদেশীয় লোকেরদের উপকারার্থে ঐ সাঁকো নির্ম্মাণের তাবৎ ব্যয় আপনি দিতে স্বীকার করিয়াছেন। আর ঐ সাহেব ভোজপুরের নিকটে ভেড়ের খালেতে যেমন রজ্জুময় সাঁকো করিয়াছেন সেই মত সাঁকো কর্ম্মনাশা নদীতে করিতে গবর্ণমেন্ত আজ্ঞা করিয়াছেন।

[স. সে. ক. ১। ৩০৮-৯]

২৮. ১৭ আগস্ট ১৮২২

পিস্তল লড়াই॥—মোকাম কলিকাতায় শ্রীযুত ডাক্তর জেমেসন সাহেব ও শ্রীযুত মেং বকিংহাম সাহেব এই উভয়ে পরস্পর বিবাদ করিয়া পিস্তল লড়াই করিতে পণ করিয়াছিলেন তাহাতে শ্রীযুত বকিংহামের পক্ষে শ্রীযুত মেজর সুইনি সাহেব হইলেন ও শ্রীযুত ডাক্তর জেমেসন সাহেবের পক্ষে শ্রীযুত মেং গরডন সাহেব হইলেন। ৬ জুলাই রাত্রি চারি ঘণ্টার সময়ে এই দুই জনকে মধ্যস্থ করিয়া বাদী প্রতিবাদী একত্র হইয়া মোং কলিকাতার গড়ের মাঠে ঘোড়দৌড়ের স্থানে এক বড বৃক্ষের নীচে গিয়া ধাবা মত দ্বাদশ পাদান্তরে উভয়ে দণ্ডায়মান হইয়া পরস্পর এককালে পিস্তল মারিলেন কিন্তু ভাগ্যক্রমে তাহাতে কাহারো হানি হইল না দ্বিতীয়বার পিস্তলে গুলি পুরিয়া মারিলেন তাহাতেও কিছু ক্ষতি হইল না পরে ডাক্তর জেমেসন সাহেব তৃতীয় বার গুলি

মারিতে উদ্যত হইলেন কিন্তু উভয় পক্ষীয় মধ্যস্থ সাহেবেরা অসম্মত হইলেন তাহাতে সুতরাং তাঁহারা ক্ষান্ত হইলেন।

[স. সে. ক. ১। ৩৩২]

২৯. ১০ ডিসেম্বর ১৮২৫

বাষ্পের জাহাজ॥—আমরা অতিশয় আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে ইংগ্লণ্ডদেশ-হইতে বাষ্পের জাহাজ গত কল্য কলিকাতায় পঁহুছিয়াছে। এই জাহাজ তিন মাস বাইশ দিবসে আসিয়াছে কিন্তু এবার প্রথম যাত্রা অতএব বিলম্ব হওয়া আশ্চর্য্য নয় যেহেতুক সকলেই অবগত আছেন যে কোন কর্ম্ম প্রথম করিতে হইলে অবশ্য তাহাতে কিছু বিলম্ব হয়।

[স সে. ক. ১। ৩৩২]

৩০. ২ মার্চ ১৮২২

ব্যাঘ্র।—কলিকাতার পূর্ব্ব দক্ষিণ বাদাবনের অন্তঃপাতী জয়নগরের নিকটে চোরমহল নামে এক স্থান আছে সেখানে অধিক লোকের বসতি নাই কেবল অতিশয় বন এবং ব্যাঘ্র ভীতিও অতিশয়। এক গৃহস্থের স্ত্রী নবপ্রসূতা তাহার স্বামী প্রাতঃকালে কর্ম্মান্তরে গেল ঐ স্ত্রী আপন গৃহের পিঁড়াতে অগ্নি করিয়া দ্বার শক্তরূপে দিয়া বালক লইয়া থাকিল। বেলা এক প্রহরের সময় এক ব্যাঘ্র আসিয়া ঐ গৃহপ্রবেশের উদ্যোগে গৃহের চতুর্দ্দিগে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ঐ স্ত্রীলোক ব্যাঘ্রের এই সকল উদ্যোগ দেখিয়া অত্যন্ত ভীতা হইয়া নানারূপ ভাবিতে লাগিল। বিশেষতঃ এ সময়ে যদি আপন স্বামী আইসে তবে তাহাকে এই ব্যাঘ্র ভক্ষণ করিবে এই২ রূপ নানা চিন্তা করিতেছে ইত্যবসরে ব্যাঘ্র কোন দিগে দ্বার না পাইয়া লম্ফ দিয়া পিঁড়ার চালে উঠিয়া চালের খড় উছাইয়া যৎকিঞ্চিৎ দ্বার করিয়া মুখ দিল কিন্তু মুখ প্রবেশ হইল না। পরে পশ্চাদের দুই পা ও লাঙ্গুল অগ্রে দিল এই সময়ে ঐ স্ত্রী জীবনাশা ত্যাগ করিয়া আপন নিকটস্থ শীত নিবারক কাঁথার এক ভাগে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া অল্পে২ ব্যাঘ্রের মার্গেতে ধরিল। তখন ব্যাঘ্র ব্যস্ত হইয়া পুনরুত্থানের চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু দশ আনা শরীর নিরালম্বনে দোদুল্যমান হওয়াতে উত্থানে সমর্থ হইল না। পরে প্রলয়কালীন গর্জ্জনতুল্য বার২ বৃহৎ শব্দ করিতে লাগিল ইহাতে গ্রামস্থ লোকেরা ভীত হইয়া স্ব২ গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া গৃহ মধ্যে থাকিল। ঐ স্ত্রী ক্রমে ২ গৃহ দাহ না হয় কেবল ব্যাঘ্র দগ্ধ হয় এইরূপ অগ্নি জ্বালাইতে লাগিল। কিছু কাল পরে ব্যাঘ্র নিঃশব্দ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল

নিঃশব্দ হইলে দুই ঘণ্টা পর গ্রামস্থ লোক গৃহ হইতে বাহির হইয়া চতুর্দিগ অবলোকন করিয়া পাঁচ সাত দশ জন একত্র হইয়া ক্রমে২ ঐ স্থানে আসিয়া বিশেষ দেখিল। সে সময় ঐ স্ত্রীর স্বামীও আইল পরে ব্যাঘ্রকে চাল হইতে নামাইয়া দূরে নিঃক্ষেপ করিল।

[স. সে. ক. ১। ৩৩২-৩৩]

৩১. ২৭ নবেম্বর ১৮১৯

ভাগীরথী নদী।—সকল লোক জ্ঞাত আছেন যে ভাগীরথী নদীর জল ষাটি বৎসরের মধ্যে অনেক শুষ্ক হইয়াছে। ষাটি বৎসর হইল চৌষট্টী বন্দুকের দুই জাহাজ চন্দননগর পর্য্যন্ত গিয়াছিল এবং বিশ বন্দুকের এক জাহাজ মোং হুগলী পর্য্যন্ত গিয়াছিল এখন স্থানে২ এমত চড়া পড়িয়া শুষ্ক হইয়াছে যে কোনো প্রকারে কোনো সময়ে বড় জাহাজ সে মত চলিতে পারে না। এই সকল চড়া পড়িবার কারণ এই যে বর্ষা গত হইলে মৎস্যধারকেরা স্থানে২ বাঁশ পোতে ও তাহার নিকটে মৃত্তিকা আটক হয় পরে বাঁশ তুলিয়া লইলেও সেই মৃত্তিকাতে ক্রমে মৃত্তিকা আটক হইয়া বড় চড়া হয়। এবং ভাগ্যবান লোকেরা স্থানে ২ ঘাট বন্ধন করেন তাহাতে মৃত্তিকা জমা হইয়া চড়া পড়ে এইং কারণে ভাগীরথীর ও মাথা ভাঙ্গা প্রভৃতির জল চৈত্র বৈশাখ মাসে এমন শুষ্ক হয় যে তাহাতে নৌকা গমনের পথও থাকে না ইহার উপায় কারণ পূর্ব্বে করনল কৌলবুরুক সাহেব শ্রীশ্রীযুত গবরনর জেনেরাল বাহাদুরের নিকটে দরখাস্ত করিয়াছিলেন যে একটা লৌহযন্ত্র নৌকাতে রসী বান্ধিয়া জলের মধ্যে ফেলিয়া আকর্ষণ করিলে চড়া ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু তাহার কিছুই হয় নাই। এই ক্ষণে এই উপায় আছে যে এখন ঘাট বান্ধিতে হইলে জলের মধ্যে কেহ না বান্ধেন এবং জালিয়ারাও জলের মধ্যে বাঁশ না পোতে ইহা হইলেও যে আছে সে বজায় থাকে এই সমাচার ইংগ্লণ্ডীয় নিউযপেপরে ছাপা গিয়াছে।

[স. সে. ক ১। ৩ ৩]

শিল্পবিপ্লবের ফলে যখন ইংল্যাণ্ডের মানচিত্র বদলে যাচ্ছিল, যখন সেখানে দূর থেকে দূরতর পথকে সংক্ষিপ্ত করে আনা হচ্ছিল নদীর ওপর ব্রিজ বেঁধে, মানুষের উৎপাদনক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেবার জন্যে যখন রাত্রির অন্ধকার ঘুচিয়ে তৈরি করা হচ্ছিল গ্যাসের আলো, সমুদ্রের ঢেউগুলোকে ভেঙে গুঁড়িয়ে যখন পাড়ি দিচ্ছিল বাষ্পীয় জাহাজ—তখন সে দেশের গদ্যের অস্থিরতায়, বৈচিত্র্যে, বিশৃঙ্খলায়, যুক্তিতে, যুক্তিভাঙায় সেই যুগটিই ধরা পড়ছিল। কিন্তু আমাদের

বকলমের শিল্পবিপ্লবের সংগতিতে বকলমের গদ্য তৈরি হয়ে উঠছিল সাহেবদের হাত দিয়ে।

দু হাত খাটিয়ে মানুষ যা উৎপাদন করে না মানুষ তেমন জিনিস দশহাতে ভোগ করতে পারে বটে কিন্তু মুখ দিয়ে যে-ভাষায় কথা বলে না, সে-ভাষা মানুষের ভাষা হয়ে ওঠে না। তাই দর্পণের সমকালীন অন্যান্য বাঙালি পরিচালিত কাগজে—'সমাচার চন্দ্রিকা, 'সম্বাদ ভাস্কর', 'সংবাদ প্রভাকর'-এ—দর্পণের গদ্যের কাঠামো অনেক সময়ই ভেঙে যাচ্ছিল। ঐ সব কাগজের বাংলা গদ্যে বাঙালি কণ্ঠস্বরের খাদ ও চড়া, কম্পন ও ইতস্তত, স্বগতোক্তি ও নাটকীয়োক্তি—অনেক সময়ই শোনা যাচ্ছিল।

৩

দ্বিভাষিক গদ্য

'সমাচার দর্পণ'-এ সাহেব-পণ্ডিত সহযোগিতায় সমাপিকা ক্রিয়া নির্ভর ও কৃৎ-তদ্ধিত প্রত্যয়নিষ্পন্ন বিশেষণভিত্তিক বিশেষ রচনারীতি বাংলা গদ্যে তৈরি হচ্ছিল বলে আমাদের অনুমান। সেই অনুমানের পক্ষে আমরা দর্পণের গদ্যে কিছু বিশ্লেষণও আগের পরিচ্ছেদে করেছি। গদ্যের এই বিশেষ ধরনের জন্যে দর্পণের গদ্য থেকে বাঙালি কণ্ঠস্বর কার্যত লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল বলেও আমরা সন্দেহ করেছি।

আমাদের এই অনুমান ও সন্দেহ সীমাবদ্ধ ছিল মোটামুটি দর্পণের প্রথম ১১ বছর, ১৮২৯-এর মধ্যে—যদিও কখনো-কখনো প্রসঙ্গের প্রয়োজনে এর পরের দর্পণ থেকেও আমরা উদাহরণ নিয়েছি।

১৮২৯-এর পর 'সমাচার দর্পণ' সম্পর্কে আমাদের এই সব অনুমান ও সন্দেহ পরীক্ষা করার আরো সুবিধে পাওয়া যায়। ১৮২৯-এর ১১ জুলাই থেকে 'সমাচার দর্পণ' দ্বিভাষিক সংস্করণ হিশেবে প্রকাশিত হতে থাকে—একই রচনা ইংরেজি ও বাংলা এই দুই ভাষাতেই ছাপা হতে থাকে। অনেক কাগজেরই তখন এই রীতি ছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'বাংলা সাময়িক পত্র' বইটিতে সংকলিত তথ্য সাজালে দেখা যায় 'দিগদর্শন' ১৮১৮ সালের এপ্রিলে বেরয়, তার ১ থেকে ১১ সংখ্যা দ্বিভাষিক ছিল। 'গসপেল ম্যাগাজিন' (ডিসেম্বর ১৮১৯), 'ব্রাহ্মণ সেবধি' (সেপ্টেম্বর ১৮২১), 'বঙ্গদূত' (মে ১৮২৯), 'অনুবাদিকা' (আগস্ট ১৮৩১), 'সম্বাদ সারসংগ্রহ' (সেপ্টেম্বর ১৮৩১), 'জ্ঞানান্বেষণ' (জানুয়ারি ১৮৩৩), 'বিজ্ঞান সার সংগ্রহ' (সেপ্টেম্বর ১৮৩৩)—এই সব কাগজই ছিল দ্বিভাষিক।

দ্বিভাষিকতার একাধিক কারণ থাকতে পারে। ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষার পাঠকের কাছেই যাতে বিক্রি করা যায় ও এই দুই ভাষাতেই যাতে সরকারি ইস্তাহার ও বেসরকারি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা যায়—সেটাই নিশ্চয় প্রধান উদ্দেশ্য। ধর্মপ্রচারের জন্যে যে-কাগজগুলি বেরত, তাদের আরো উদ্দেশ্য ছিল হয়ত একই খরচে দুই ভাষাভাষীদের কাছে পৌঁছনো।

'সমাচার দর্পণ'-এ ১৮২৯-এর ১১ জুলাই বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়—

পাঠকবর্গের প্রতি বিজ্ঞাপন। সমাচার দর্পণ প্রকাশক এগার বৎসরের অধিককালাবধি কেবল বাঙ্গালা ভাষায় এই কাগজ প্রকাশকরণান্তর বর্তমান তারিখ অবধি সম্বাদ ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছেন।...বাঙ্গালা তর্জ্জুমায় মূল কথার ভাব থাকিবে কিন্তু তাহা এতদ্দেশীয় পদ্যের সহিত ঐক্য থাকিবে। প্রকাশক এই ভরসা করেন যে যাঁহারা সম্বাদ-প্রাপণেচ্ছুক আছেন কেবল যে তাঁহারদের উপকারক এমত নহে কিন্তু যাঁহারা ইঙ্গরেজী ভাষা শিক্ষাকরণ বিষয়ে ব্যগ্র আছেন তাঁহারদেরও উপকার দর্শিবে। কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয় সমাচারপত্র হইতে যাহা বাচনী করিয়া লওয়া যাইবে তাহাকেও ইঙ্গরেজী পরিচ্ছেদ দেওয়া যাইবে।

[বা. সা. প. । ৮]

এই নতুন সংস্করণের দর্পণ ১৮৪১-এর ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলে। সম্পাদক মার্শম্যান কাগজটি বন্ধ করে দেন ও 'গবর্ণমেণ্ট গেজেট'-এর সম্পাদনা ভার নেন। 'সমাচার দর্পণ' পরে নানা ভাবে বেরিয়েছে। সেই সব সংস্করণ আমাদের বর্তমান আলোচনার মধ্যে পড়ে না।

দর্পণ বন্ধ হয়ে গেলে 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' কাগজের মন্তব্য ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর বইয়ে উদ্ধার করেছেন।

...With two other Journals, the Friend of India and the Bengalee Government Gazette to attend to, it is not possible to do that justice to the Durpun, whether in reference to the supply of editional observations and intelligence, or to the translation of them into Bengalee,......

[বা. সা. প. । ৮]

দর্পণের বিজ্ঞাপনে ও 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র মন্তব্যে বলেই দেয়া হয়েছে যে বাংলা দর্পণ মূলত অনুবাদনির্ভর ছিল এবং 'মূল কথা'টি থাকত ইংরেজিতেই—

মার্শম্যান বঙ্গানুবাদ দেখে দিতেন। ১৮২৯ পর্যন্ত যা ছিল দর্পণের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা, ২৯ থেকে তা প্রকাশ্যেই এল ও দর্পণ দুই ভাষাতেই বেরতে লাগল। দর্পণের বিজ্ঞাপনে বাংলা সংস্করণের পাঠকদের আশ্বস্ত করা হয়েছে যে দ্বিভাষিক সংস্করণে বাংলা ভাষা দুরূহ হয়ে উঠবে না—'বাঙ্গালা তর্জমায়…এতদ্দেশীয় পদ্যের সহিত ঐক্য থাকিবে।' অর্থাৎ বাংলা রচনারীতি অক্ষুণ্ণ রাখা হবে।

এই বিজ্ঞাপন ও মন্তব্য থেকে একটি কথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে বাংলা কাগজ বলতে দর্পণে তর্জমাই বোঝানো হত। কিন্তু তর্জমাতেও একটি ভাষার নিজস্ব বাকরীতি অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে—এখনো তো বাংলা কাগজের বেশির ভাগই তর্জমা। কিন্তু বাংলা গদ্য ভাষা তখনো সাধারণের বিনিময়ের ভাষা হয়ে ওঠে নি ও ব্যবহারে ব্যবহারে বাংলার প্রচলিত বাকরীতি তখনো বাংলা গদ্যের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে ওঠে নি। সেই সময় ইংরেজি মূল রচনার ছাঁচটির মধ্যেই বাংলা গদ্যকে ব্যবহারযোগ্য ও বোধগম্য হয়ে উঠতে হচ্ছে। ফলে বাংলা গদ্যের রীতি বাধ্যতই তৈরি হচ্ছে ইংরেজি রচনার কাঠামোতে।

আমরা ১৮৩৫-এর ১৮ এপ্রিল থেকে ১৮৩৬-এর ২২ অক্টোবর পর্যন্ত দ্বিভাষিক দর্পণের কিছু রচনা মূল দর্পণ থেকে সংগ্রহ করতে পেরেছি। এখানে দর্পণের গদ্যের বৈশিষ্ট্য খুঁজতে গিয়ে উদাহরণ হিশেবে আমরা সেই রচনাগুলি থেকে কয়েকটি মাত্র রচনা ব্যবহার করছি।[২১]

দ্বিভাষিক সংস্করণের ভূমিকাতে যদিও ইঙ্গিত আছে যে মূল রচনা ইংরেজিতেই হবে, তার তর্জমা বাংলায় থাকবে, আসলে কিন্তু অনেক সময়ই মূল বাংলা রচনারও ইংরেজি অনুবাদ করতে হত। ১১ বছরে দর্পণ কলকাতার বাঙালি সমাজের ভিতর পাঠক-গ্রাহক পেয়েছে, কলকাতার কাছাকাছি শহরগুলিতে, শান্তিপুর থেকে বর্ধমানে, দর্পণ পরিচিত ছিল। কলকাতার ও এই সব অঞ্চলের বাঙালিরা দর্পণে নানা রকম চিঠি পাঠাতেন, খবর পাঠাতেন, দর্পণের তর্ক-বিতর্কে অংশ নিতেন। দর্পণ দ্বিভাষিক হলেও তাঁরা দর্পণে লেখালেখি বন্ধ করেন নি। সে-সব লেখা বাংলাতেই আসত, তার অনুবাদ ইংরেজিতে করতে হত।

তার ওপর, কলকাতায় ইংরেজি কাগজ তখন অনেকগুলি বেরচ্ছে। ইংরেজির ওপরই যে-পাঠকের প্রধান নির্ভর, তাঁরা ইংরেজি কাগজই রাখতেন, পড়তেন। দর্পণ বা এই ধরনের দ্বিভাষিক কাগজের ভরসা ছিলেন কিন্তু বাংলা পাঠকরাই, কিছু ইংরেজি জানা বাংলা পাঠকরাও। দর্পণ পড়লে ইংরেজিও শেখা যাবে—এ-রকম ইঙ্গিত দর্পণের নতুন এই সংস্করণের বিজ্ঞাপনেও ছিল।

দ্বিভাষিক সংস্করণের রচনাগুলি পড়ে সহজে বোঝা সম্ভব নয়, মূল রচনাটি কোন্ ভাষায় লেখা ও কোন্ ভাষা থেকে কোন্ ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। কিন্তু কিছু-কিছু রচনার ভিতরের বা বাইরের সাক্ষ্যে মূল ভাষা অনুমান করাও যায়। এ-রকম কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে আমরা দেখতে চেষ্টা করব ইংরেজি রচনার বাংলা-অনুবাদ ইংরেজির কাঠামোর মধ্যেই কতটা থেকে যাচ্ছে এবং ইংরেজি অনুবাদ করা হয়েছে যে-বাংলা রচনার, সেটাই-বা রচনা হিশেবে কতটা বাংলা আর কতটা ইংরেজির সন্নিহিত।

সমাচার দর্পণ। ১৮ এপ্রিল ১৮৩৫

বালিকা হত্যাবিষয়ক এক বিবরণ আমরা বোম্বাই দর্পণ হইতে গ্রহণ করিয়া প্রকাশ করিলাম। বোধ হয় মধ্যম হি দেশে ঐ কুব্যবহার অদ্যাপি চলি [?]। এই অভাগা নিরপরাধি বালিকাদিগকে এই রূপে হত্যাকরণ ও জীবিত পুড়িয়া মারণ এবং গঙ্গাসাগরে বা নিক্ষেপকরণই ইত্যাদি কুব্যবহার সকল প্রকার। শেষোক্ত দুই কুব্যবহার ভাগ্যক্রমে গর্বণমেণ্ট নিবারণ করিয়াছিলেন কিন্তু ইঙ্গলণ্ডীর অধিকারের মধ্যে বা [?] হত্যা আর হইতেছে না কেবল কয়েকজন স্বাধীন রাজার অধিকারের মধ্যে হইতেছে। তাঁহারাও ইঙ্গলণ্ডীয়রদের [?] নুগত। অতএব আমাদের ভর হয় যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা ঐ আনুগত্যের বিক্রমক্রমে ইন্দোর ও গয়লিয়রের রাজাদিগকে বিশেষ জ্ঞাপন করিবেন যে কদাচার তাঁহাদের রাজ্যে আর না [?]

১. SUMACHAR DURPUN, SATURDAY, 18th APRIL, 1835

We have republished from the Bombay Durpun communication on the subject of Female Infanticide, which apears still to prevail to a great extent in central India. These murders of innocent children are exactly of the same nature as the Suttee, and the drowing of children at Saugor, both of which practices the British Government have happily interdicted. Infant murder is not now practised within the British territories ; it is confined to independent states, over which however we possess no small influence. We trust that influence will be beneficially exerted to induce the sovereigns at Indore and Gwalior to give the strictest order for the discontinuance of this practice.

...the same to the Sirdar, and if any person kills his child, he should be punished. If this is done, the practice would effectually cease, and such a measure would bring great holiness to the person that adopts it.

We hopethat this will be knownevery where through you, so that the Rajas may take steps on this subject ; and putting a stop to this horrid deed may promote the good of all.

"A person who performs a good or bad action, he who causes it, directs it, or consents to its being done, all these four receive equal shares of the holiness or guilt which it brings forth."

11th March, 1835 Yours sincere friend,

A Lover of Virtue.

২. বালিকা হত্যা

বোম্বাই দর্পণ সম্পাদক মহাশয় বরাবরেষু।

রজপুতানা দেশে কুইবৃক্ষের অতিবিষরস এবং অন্যান্য দ্রব্যদ্বারা রজপুতেরা স্ব বালিকারদিগকে জন্মিবামাত্র হত্যা করে। গবর্ণর্ জেনারেল বাহাদুরের এজেণ্ট সাহেব ইহা শুনিয়া অতি আশ্চর্য্য বোধ করিলেন যে ইহারা কিরূপে আপনাদের সন্তান হত্যা করিতে পারে। পরে সন্দিগ্ধ হইয়া এই জনরবের সত্যাসত্যতার নির্ণয়ার্থ চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং তদর্থ প্রথমতঃ গণকেরদিকে ডাকিয়া ঐ দেশের বালক বালিকার সংখ্যা চাহিলেন পরে তাহাদের ফর্দের দ্বারা দৃষ্ট হইল যে স্থলে ১০০ বালক ছিল সে স্থলে ১৫।২০ জন মাত্র বালিকা আছে। কোন স্থানেই বালক অপেক্ষা অধিক বালিকা নাই। এবং কোনস্থানে সমসংখ্যকও নাই। এবং যে স্থানে অধিক বালিকা আছে সেই স্থানেও বালকের চারিগুণের এক গুণমাত্র। ইহাতে এই বোধ হইল যে পৃথিবীর আরম্ভাবধি৺ স্ত্রী পুরুষ সমসংখ্যায় সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব এইক্ষণে যদি স্ত্রীর সংখ্যা এত ন্যূন হয় তবে অবশ্যই তাহাদের হত্যাকরণেতে তাহা হইয়াছে। অতএব ঐ সাহেব বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে এই অতিপাপজনক ব্যাপার কি উপায়েতে নিবারণ করিতে পারা যাইবে। কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহার কোন আজ্ঞাদেওন নিষেধিত হওয়াতে এবং এই ব্যাপার অতিগোপনে হওয়া প্রযুক্ত জ্ঞাত না হওয়াতে তিনি এই উপায়

থাহারিলেন যে রজপুতেরদের বোধ গম্য হয় এমন এক পুস্তক ব্রজভাষাতে প্রস্তুত করা যায় এবং তাহার মধ্যে হিন্দু ধর্ম্মানুযায়ী বালিকা হত্যা করণেতে কি পাপ জন্মে তাহা সংগ্রহপূর্ব্বক করা যায়। পরে ঐ গ্রন্থ কলিকাতার মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত করিলেন এবং ঐ গ্রন্থ এক২ খান রজপুতানা দেশে প্রধান২ রজপুতেরদিগকে দিলেন। এবং বালিকা হন্তারদের পরকালে কি নরকভোগ করিতে হয় তাহার এক নক্সা প্রস্তুত করিয়া ঐ সকল গ্রন্থের সঙ্গে দিলেন। ঐ প্রযুক্ত রাজগড় ও নরসিংহগড় প্রভৃতি স্থানে এই কুব্যবহার রহিত হইল যেহেতুক স্বখতরমারাধ্যতে বিশেষজ্ঞ অতএব যাহারা বিশেষজ্ঞ হইল তাহারা এই কুব্যবহারের দোষ দর্শন করিয়া তাহাতে নিবৃত্ত হইল তাঁহারদের বালিকারা অদ্যাপি বাঁচিয়া আছে। এইক্ষণে কেহ২ স্বকৃত পূর্ব্বপাপের বিষয়ে বিদ্যমান হইয়া কহিতেছেন যে আমরা এই রূপে দুই এক বালিকা হত্যা করিয়াছি।

পুনশ্চ শাস্ত্রে লেখে জ্ঞানলবদুর্বিদগ্ধং বহ্মাপি তংনরং নরঞ্জয়তি। এই প্রযুক্ত অধিকাংশ ব্যক্তিরা ঐ কুপথগামী আছে। এক্ষণে এজেণ্ট সাহেব এই কুব্যবহার নিবারণ চেষ্টার কিছু ত্রুটি করিতেছেন না। সপ্তাহ ছয় সিন্ধিয়ার রাজ্যের মধ্যে জালিম সিংহশ্লোকি নামক যে একজন রজপুত ইহার পূর্ব্বে মিঙ্গলগড়ে বাস করিতেন এইক্ষণে স্বয়াবন্ত জিলার খেমলা গ্রামে আছেন তিনি এক বালিকা হত্যা করিয়াছেন। এই ব্যাপারের সত্যতার প্রমাণ হহলে ঐ গ্রামের জমাদার ঠাকুর কুমান সিংহ শুনিয়া ঐ সিংহের হুঁকাপানীয় বন্ধ করিলেন। যদি স্বজাতীয়েরা সর্ব্বত্র এইরূপ ব্যবহার করিতেন তবে ঐ কুব্যবহার প্রায়ই হইত না কিন্তু স্বজাতীয় সকলে এমত বারণ করেননা এই বিষয়ে কেবল সিন্ধিয়ার মহারাজ অবগত ছিলেন এমত নহে কিন্তু স্বয়াবন্তপুর গ্রামস্থ অতিনীচ লোকেরাও জ্ঞাত ছিল কিন্তু মহারাজ এই অতিপাপের বিষয়ে কিছু মনোযোগ করিলেন না। শাস্ত্রে লেখে রাজ্ঞোরাষ্ট্র কৃতাং পাপং। অতএব প্রজাকৃত পাপ রাজার ভোগ করিতেই হয়।

অতিপূর্ব্বতন রাজারাও এই সকল ব্যাপারের নিবারণ চেষ্টা পাইয়াছিলেন ইহা যদি স্বীকার না করেন তবে আমি ইহার এক উদাহরণ দেই। মহারাজ দৌলাৎ রাও সিন্ধিয়ার আমলে একলার গ্রামে শঙ্করশাস্ত্রি নামক এক মুখশদার অর্থাৎ পুরোহিত ছিলেন। তিনি এক বালিকা হত্যা হইয়াছে শুনিয়া আলোচনা করিলেন যে রাজপাপং পুরোধসঃ অতএব যজমানের কৃতপাপ আমারও ভোগ করিতে হইবে। এই প্রযুক্ত তিনি মহারাজকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিয়া তৎক্ষণাৎ বালিকাহন্তা ঐ রজপুতকে ধৃতকরণপূর্ব্বক অশেষ ক্লেশ দিয়া কারা বদ্ধ

রাখিলেন। কিয়দ্দিবস পরে তাহাকে মুক্ত করিয়া এই শপথ করাইলেন যে এমন কর্ম্ম আমি আর কখন করিব না। যদি করি তবে আমি অত্যন্ত দণ্ড্য হইবে। তৎকালাবধি ঐ ব্যবহার কিঞ্চিৎ কমিল কিন্তু সংপ্রতি মহারাজ সিন্ধিয়া এবং হোলকার সাহেব ও রাজবাধ্যেরা এই বিষয়ে তাদৃশ মনোযোগ করেন না। এবং শঙ্করশাস্ত্রির ন্যায় অমাত্যেরাও এ বিষয় রাজাকে জ্ঞাপন করেন না অতএব ঐ মহাপাপজনক কর্ম্মের নিবারণ ও ঐ কুকর্ম্মকারিরদের দণ্ড অবশ্য কর্তব্য। যেহেতুক যে রাজা নির্দ্দোষির দণ্ড করেন বা দোষিকে দণ্ড না করেন তিনি অবশ্য পাপ-ভোগী হন। অতএব পাপবিষয়ে রাজার মনোযোগ না করনে ইহকালে ও পরকালে উক্ত ফল হয়। অতএব রাজারা এহ কুব্যবহার বিষয়ে যথোচিত মনোযোগ করিয়া গ্রাম ও নগরীয় ধাত্রীরদিগকে ডাকাইয়া হুকুম দেউন যে তাহারা ঐ সকল গ্রামনগরে জ্ঞাতমাত্র বালিকারদের সম্বাদ কামদার ও অধ্যক্ষেরদিগকে দেন এবং ঐ কামদারেরা এই বিষয় যথাসাধ্য সরদারকে সম্বাদ দেউন ও রাজা ঐ বালিকা হত্যাকারিরদের যথাযোগ্য দণ্ড দেউন যদি এমত করা যায় তবে এই অপকর্ম্ম অতিশীঘ্র নিবারিত হইতে পারে এবং ইহার নিবারণোদ্যোগকারিরদেরও অত্যন্ত ধর্ম্ম হইবে।

আমাদের ভরসা হয় যে আপনকার দ্বারা ইহা সর্ব্বত্র প্রকাশ হইবে তাহা হইলে রাজা এই বিষয় জ্ঞাত হইয়া নিবারণে মনোযোগী হইবেন। এহ অতিঘৃণ্য ব্যাপার নিবারণ হইলে সকলেরই মঙ্গল হইবে। যেহেতুক শাস্ত্রে লেখে যে কর্ত্তা কারয়িতাচৈব প্রেরকেশ্চানুমোদকঃ। সুকৃতং দুষ্কৃতং চৈব চত্বারঃ সমভাগিনঃ।

কস্যচিৎ সদ্ব্যবহারাকাঙ্ক্ষিণঃ।

Infanticide

To the Editor of the Bombay Durpan.

The Rajpoots in Rajputana put an end by means of the poisonous juice of Ruitree, and other substances, to the lives of their female children as soon as they are born.

The Agent for the Governor was greatly surprised by hearing this, and being at a loss to conceive how people could murder their own children, resolved to ascertain whether the report was true or false.

In his endeavours to ascertain this, he first tried the

expedient of calling from Rashidvallas Statements of boys and girls in the rising generation of Rajpoots ; from which statements it appeared, that the proportion of girls to a hundred boys was fifteen or twenty, and in no instance did girls exceed the number of male children.

Nay, the two were never equal to each other, and in the most favourable instances the proportion of girls was only one fourth.

From this it was inferred that as God has created equal number of men and women from the beginning of the creation, the deficiency in females must be owing to their destruction.

Considering this he began to reflect on the best means of putting a stop to this sinful practice, but as he was prohibited from issuing any order in matters of religion and as the act could not be easily known on account of its being committed in private, he compiled a work in Braja language, adapted to the comprehension of Rajpoots, in which were detailed the sins of killing girls according to the Hindoo religion.

This work was printed at a press in Calcutta, and copies of it were transmitted to great Rajvadas, and a picture painted by an artist of the sufferings of a murderer of girls in hell after his death, was also exhibited along with the work.

From this the practice was discontinued in some places. Rajgud, Nursingud, &c, for

"he who knows more, is easily made to understand".

Therefore such persons as were considerate, seeing the sinfulness of the practice, immediately abandoned it, and their daughters are living here at present.

Those who now repent of their former sins, confess of their being guilty in one or two instances.

According to the saying

'even Brahmah cannot instruct the man who conceited with a particle of knowledge', the generality of the people still follow the same course.

The agent is unabated in his endeavours to suppress the practice, but in the dominious of Sindia, a person by name Jalumsing Suloukee, a Rajpoot formerly of Mengulgud, now living in Khumla a village in the Zilla of Shoojavuntpoor, committed a girl murder in his house about five or six weeks ago.

This was proved to be true and the Jamidar of that village Thakoor Khoomansing hearing it, put a stop to the hooka panee of Jalumsing.

If members of caste would entertain similar notions on all sides such actions cannot happen ; but all people do not act in this way.

As to the sircar, this news cannot have been known not only to Sindia Saheb, but even to the nearest Kamdar of Shoojavuntpoor.

The Muharaja does not pay atention to this horrid sin.

"The king shares the sins of his subjects.'

According to this the sircar must obtain a portion of the guilt of its ryots.

This subject has engaged the attention of Rajas from the beginning.

If you say—no, I give you an instance.

About fifteen years ago there was a Mukusdar of the village of Ecklar by name Shankur Sastree in the time of Dowlutrao Muharaj.

The shastree was informed of a case of female Infanticide

and considering that 'the guilt of the king is the guilt of the priest,' and fearing that he himself would incur a part of the sin of the perpetrator of the murder in his village, apprized the Muharaj of it, who immediately ordered the Rajpoot to be seized and imprisoned, and punishing him very much sent him to a tower.

After some days he was released on taking on oath, and being strictly ordered not to do so again on the pain of more severe punishment.

The practice was then (partially) discontinued, but of late the Muharaja as well as Holkur Saheb and the Rajvadas do not take any notice of it : neither do their dependents apprize them like Shunkar Shastree.

This great and sinful deed requires a check and punishment, because,

'A king who punishes the innocent or does not punish the guilty, brings upon himself great disgrace and also goes to hell.'

Such is the evil (of a king's countenancing sin) in this world and the world to come.

Let Rajas consider this and make proper enquiries on the subject, by directing nurses in every village to report to the Kamdar there of all births of children.

The kamdar should communicate.

'বম্বে দর্পণ' থেকে নেয়া, তখন যাকে মধ্যভারত বলা হত সে-সব জায়গা সম্পর্কে বিবরণ, লেখার বিষয় ও ভঙ্গি—এই সব কারণে এ লেখাটি ইংরেজিতেই লেখা বলে আমরা ধরে নিয়েছি। বাংলা অনুবাদের ভাষা সরল, সহজবোধ্য ও রচনাগত জটিলতা প্রায় নেই বললেই চলে। সম্পাদকীয় ভূমিকায় ইংরেজির এক-একটি বাক্য প্রায় অবিকৃত রাখা হয়েছে—শুধু ইংরেজির প্রথম বাক্যটি বাংলায় দুটি বাক্য। মূল রচনাতেও ইংরেজি বাক্যের কাঠামো বাংলায় প্রায়

অবিকৃত রাখারই চেষ্টা হয়েছে। তবুও ইংরেজি ও বাংলা বাক্যসংখ্যার তুলনা করে দেখা যেতে পারে এই কাঠামো সম্পূর্ণ রচনাতে কতটা রক্ষিত হয়েছে।

ইংরেজি রচনা	বাংলা অনুবাদ
১ম বাক্য	১ম বাক্য
২য় বাক্য	২য়-৩য় বাক্যর প্রথমাংশ
৩য় বাক্য	৩য় বাক্যের শেষাংশ ও ৪র্থ বাক্য
৪র্থ বাক্য	৫ম ও ৬ষ্ঠ বাক্য
৫ম বাক্য	৭ম ও ৮ম বাক্য
৬ষ্ঠ বাক্য	৯ম ও ১০ম বাক্য
৭ম বাক্য	১১শ ও ১২শ বাক্য
৮ম বাক্য	১৩শ বাক্য
৯ম বাক্য	১৩শ বাক্য
১০ম বাক্য	১৪শ বাক্য
১১শ বাক্য	১৫শ ও ১৬শ বাক্য
১২শ বাক্য	১৭শ ও ১৮শ বাক্য
১৩শ বাক্য	১৯শ বাক্য
১৪শ বাক্য	২০শ বাক্য
১৫শ বাক্য	২০শ বাক্যের শেষাংশ (সম্ভবত মাঝখানে একটা দাড়ি পড়বে।)
১৬শ বাক্য	২০শ বাক্যের শেষাংশ
১৭শ বাক্য	২১শ বাক্যের শেষাংশ
১৮শ বাক্য	২২শ বাক্য
১৯শ বাক্য	২৩শ বাক্য
২০শ বাক্য	২৩শ বাক্য
২১শ বাক্য	২৪শ বাক্য
২২শ বাক্য	২৫শ ও ২৬শ বাক্য
২৩শ বাক্য	২৭শ ও ২৮শ বাক্য
২৪শ বাক্য	২৯শ ও ৩০শ বাক্য
২৫শ বাক্য	৩০শ ও ৩১শ বাক্যের শেষাংশ

২৬শ বাক্য	৩২শ বাক্য
২৭শ বাক্য	৩৩শ বাক্য
২৮শ বাক্য	৩৩শ বাক্য

ইংরেজি বাক্য ও বাংলা বাক্যের এই তুলনা থেকে দেখা যাবে, অনেক সময়ই ইংরেজির একটি বাক্য বাংলায় একাধিক বাক্যে ভাগ করে দেয়া হয়েছে আবার কখনো ইংরেজির একাধিক বাক্য বাংলায় একটি বাক্যে সংহতও হয়েছে। তার সংখ্যা খুব কম, যেমন ইংরেজির ৮ম ও ৯ম বাক্য বাংলায় ১৩শ বাক্য ও ইংরেজির ২৭শ বাক্য বাংলার ৩৩শ বাক্য। ইংরেজি বাক্যগুলিকে বাংলা বাক্যে যে-ভাবে ভাগ করা হয়েছে, তাতে বোঝা যায় ইংরেজি বাক্যের অর্থ যাতে সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকে সে-বিষয়ে অত্যধিক সতর্কতা কাজ করেছে। এমন-কি বড় বড় ইংরেজি জটিল বাক্যের অর্থ অনুবাদে স্বচ্ছ ও প্রত্যক্ষ। শুধু অনুবাদ হিশেবেই এ-রচনাকে আদর্শ অনুবাদ যে বলা যায় তার প্রধান প্রমাণ—'বঙ্গে দর্পণ'-এর নাম না থাকলে মূল রচনা যে ইংরেজিতে লেখা তা বোঝাই যেত না। দ্বিভাষিক সংস্করণের অনেক রচনা সম্পর্কেই এ-কথা সত্য।

অনুবাদের এই সাফল্য অর্জিত হয়েছে বাংলার বাক্যকে ইংরেজি কাঠামোর মধ্যে ফেলার ফলে। এই উদাহরণে ইংরেজি ৬ষ্ঠ বাক্যটি জটিল ও দীর্ঘ। দুটি জটিল বাক্যকে একটি "but" এই কনজাঙ্কশন দিয়ে জুড়ে দেয়া হয়েছে। প্রথম উপবাক্যে প্রধান বাক্যাংশ **he began to reflect**। এর সঙ্গে ২টি ক্লজ যুক্ত আছে। দ্বিতীয় উপবাক্যে প্রধান বাক্যাংশ **he compiled a work**-এর সঙ্গে ৪টি ক্লজ আছে। বাংলা অনুবাদে মূলের সংযোজক **but**-এর অনুবাদ "কিন্তু" দেয়া হয়েছে, অথচ তার আগে একটি দাঁড়িও আছে। আমরা দাঁড়িচিহ্ন অনুযায়ী বাক্য গুনেছি বলে এখানে দুটি বাক্য ধরতে হয়েছে। কিন্তু এই অনুবাদের এখানেও অন্যত্র দাঁড়ি চিহ্ন সব সময় বাক্যের শেষেই যে-পড়েছে, তা নয়। এখানে দাঁড়ি চিহ্ন না দিলে মূলবাক্য অনুবাদে অবিকলই থাকত : অনুবাদে প্রথম উপবাক্যের প্রধান ক্লজ "এই সাহেব বিবেচনা করিতে লাগিলেন।" দ্বিতীয় উপবাক্যের প্রধান ক্লজ "তিনি এই উপায় ঠাহরিলেন"। প্রথম উপবাক্যে মূল ইংরেজি বাক্যের কাঠামো অনুযায়ী প্রধান ক্লজটি আগে, অন্য ক্লজটি পরে। দ্বিতীয় উপবাক্যেও মূল ইংরেজি বাক্যের কাঠামো অনুযায়ী ক্লজগুলি আগে ও প্রধান ক্লজটি পরে। দুটি উপবাক্যেই ইংরেজি কাঠামো অনুযায়ী 'যে' সংযোজকটি দিয়ে প্রধান ক্লজের সঙ্গে অন্যান্য ক্লজকে বেঁধে রাখা হয়েছে। ইংরেজির ছাঁচের সঙ্গে বাংলার ছাঁচকে এমনই

মেলানো হয়েছে যে প্রধান ক্লজটিকে প্রথম উপবাক্যে শেষেও যে দেয়া যেতে পারে—তেমন সামান্য পরিবর্তনও করা হয় নি।

একটি রচনার কোনো একটি মাত্র অংশে নয়—পুরো বাংলা রচনাতেই এই নীতি মেনে চলা হয়েছে। মূল ইংরেজি রচনার যে-কোনো অংশের অনুবাদকে মূলের কাঠামোর সঙ্গে রাখলেই তা দেখা যাবে। আর একটি অংশ পরীক্ষা করা যাক। আমাদের তালিকা অনুযায়ী ইংরেজি তৃতীয় বাক্যটি বাংলায় দুটি বাক্যে ভাগ হয়েছে। কিন্তু লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে এই দুটি বাক্যের ভাগও একটা দাঁড়ির জন্যে ঘটেছে, যে-দাঁড়িটি অনিবার্য নয়। বাংলার ইংরেজি বাক্যের কাঠামো অবিকৃত আছে।

দ্বিভাষিক দর্পণে ইংরেজি মূল রচনার বঙ্গানুবাদে বারবার সন্দেহাতীতভাবে দেখা যাবে ইংরেজি বাক্যের ছাঁচ বাংলায় অবিকল আরোপ করা হয়েছে। এমন-কি সেই আরোপের ফলে বাংলা বাক্যের গঠন, সমকালীন অন্য বাংলা রচনার তুলনায় অনেক সুবিন্যস্ত ও পরিকল্পিত।

দর্পণে সাহেব ও পণ্ডিতরা ইংরেজি গদ্যের যে কাঠামোটাকে বাংলা গদ্যের ওপর আরোপ করেছিলেন, দর্পণের পাঠকদের পক্ষে তা পড়ে বুঝে ওঠা হয়তো সম্ভব ছিল, কিন্তু সম্ভব ছিল না সেই আদর্শ অবিকল অনুসরণের। তা ছাড়াও, দর্পণে সাহেবদের তত্ত্বাবধানে ইংরেজি বাক্যের কাঠামো যে-ভাবে বাংলায় রক্ষা করা সম্ভব ছিল, বাইরে থেকে যাঁরা চিঠিপত্র লিখতেন তাঁদের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। ফলে গদ্যচর্চার অনুকূল পরিস্থিতিতে এই সব চিঠিপত্রে নানা রকম লেখার উদাহরণ যেমন পাওয়া যায়, তেমনি, দর্পণের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বের বাইরের বাংলা গদ্যচর্চার নানা ধরনও দেখা যায়।

অপরদিকে এই সব বাংলা রচনা থেকে ইংরেজি অনুবাদের সময় বাংলা রচনার কাঠামো অক্ষত রাখা হয় নি। অনেক সময় রাখা সম্ভবই নয়। কারণ ইংরেজি গদ্যের রূপ নির্দিষ্ট কিন্তু বাংলা গদ্যের রূপ অনির্দিষ্ট। সাহেবদের শাসন ও পণ্ডিতদের হস্তক্ষেপ যেখানে নেই সেখানে বাংলা গদ্য লেখকরা প্রায় সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাঁদের বাক্য ব্যাকরণের দিক থেকে অসম্পূর্ণ, বাগ্‌রীতির দিক থেকে অনির্দিষ্ট। ফলে বক্তব্যও সব সময় পরিষ্কার নয়। কিন্তু সেই অসম্পূর্ণতা, অপরিচ্ছন্নতা ও অনির্দিষ্টতার ভিতর লেখকের কণ্ঠস্বর কখনো-কখনো প্রায় স্পষ্ট শোনা যায়। যেন, লেখকরা তাঁদের লিখবার অক্ষমতা পূরণ করে দিতে চান কণ্ঠস্বরের ক্ষমতা দিয়ে। এ-রকম ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটত চিঠিপত্রে। এমন-কি অনেক সময় ইংরেজি

অনুবাদের শেষে লিখতে হত যে, চেষ্টা সত্ত্বেও ইংরেজি অনুবাদ যথাযথ করা গেল না।

এই সব রচনার ইংরেজি অনুবাদে বাংলা গদ্যের বিরোধটাই যেন প্রকট। দর্পণে কিন্তু প্রমাণিত হত ইংরেজি গদ্যের সঙ্গে বাংলা গদ্যের মিলের দিকটাই।

আমরা একটা চরম উদাহরণ নিচ্ছি।

৩. প্রেরিতপত্র

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।

আমারদিগের কয়েক পংক্তি মহাশয়ের দর্পনৈকদেশে স্থানদানে প্রৌঢ়া অনূঢ়া পতিহীনা বিরহিনীরদিগের মনের ব্যাখ্যা অনেক শমতা হইতে পারে। অর্থাৎ সগুণ নিগুর্ণো পাসক অসীম বুধগণ দর্পণ-পাঠক-দর্পণে আমারদিগের বেদনাবেদন অবগত হইয়া যদ্যাপি কোনো মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া ভূপতির গোচরপূর্ব্বক আমারদিগের প্রত্যুপকার করেন সে মহাশয়ের দর্পণপার্শ্বে অর্পণ-ব্যতীত হইতে পারে না।

১৪ চৈত্র শনিবার শান্তিপুরনিবাসিনীর উক্ত এক পত্র শ্রীযুক্ত দর্পণ-প্রকাশক মহাশয় প্রকাশ করেন। ২১ চৈত্র শ্রীযুক্ত চন্দ্রিকা প্রকাশক, নবদ্বীপ-নিবাসির উক্ত তাহার উত্তর, বলিয়া যথার্থ শাস্ত্রের দর্পণ শ্রীযুক্ত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়কে অবিবেচনারচনাপূর্ব্বক নানাবিধ ভৎ´সনা করেন। সে তাঁহার অজ্ঞানান্ধতা প্রকাশ করিয়াছেন। কেবল অজ্ঞ সমীপে বিজ্ঞতা. যেন দ্বিতীয় কুন্তীর গর্ভজাত যুধিষ্ঠির রাজার ধর্ম্মপুত্র যেমন গঙ্গাপুত্র এইক্ষণে ধর্ম্মসভা-সম্পাদক কিবা সদ্বিবেচক উত্তরকারক, যেমন যুদ্ধে বিরাট পুত্র উত্তর, তেমনি উত্তরোত্তর পত্রের উত্তরে বিদ্যা প্রকাশ হইতেছে। শেষাবস্থায় বিড়াল স্কন্ধে করিয়া সিংহের সহিত স্বীকারে করিয়াছেন। সে যাহা হউক, ধর্ম্মপুত্রদিগের অধর্ম্মতা দেখিয়া আমারদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রানুযায়ী দেশাধিপতিকে মর্ম্মবেদনা-বেদন অবগত করিয়া আমারদিগের যাতনা নিবারণার্থ ও লম্পটেরদিগের লম্পটতা বারণকরণার্থ উদ্যোগী, তাহাতে দুর্য্যোগ ধর্ম্মপুত্র-প্রতিবাদ। ইহাতে বোধ হইল যে ধর্ম্মপুত্রের স্বীয় পরিবারের মনের বাথা বুঝি অবগত নহেন. কেবল ভেকের ন্যায় কমলমূলে বসিয়া মধু আহরণ করিতেছেন। কিন্তু সঙ্গোপনে ভৃঙ্গ আসিয়া রণভঙ্গে কমলাঙ্গসঙ্গে অনঙ্গপ্রসঙ্গে মধুপান করে। সেই সময় ধর্ম্মশালিনীর ধর্ম্মশালায় ধর্ম্মের ছালা বাঁধা যায়, তাহা কথায়ও রহিত

হয় না। কিম্বা তুলসীপত্রও করদ্বয় দিয়া আটক করিতে পারেন না। তবে যে প্রতিবন্ধক ইহাতে অনুভব এই যে বিরহিনীদিগের উচিত বিহিত ব্যবস্থা হইলে যোটক পটক ঘটকের বৃত্তিছেদ হয়। সুতরাং বিহিতানুসারে বিরহিনীর স্বীয়ং মনোরঞ্জনানুযায়ি মূলধর্ম্মশাস্ত্রমতে স্বামি গ্রহণ অর্থাৎ স্বয়ম্বরা হইলে, অপ্রকাশিত হর্ত্তাকর্ত্তা যোজনকর্ত্তার কি প্রয়োজন ? তাহার আর প্রভুত্ব থাকে না। সে যাহা হউক বিবাহের প্রার্থনা তাহার অন্তে তাৎপর্য্য কতিপয় পংক্তিতে এমত আছে যে স্ত্রীলোকের বৈধব্য যাতনা নিবারণের ব্যবস্থা নিগুঢ় ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহা আছে তাহা রাজ্যাধিপতি আইন অনুসারে প্রকাশ করেন, কিম্বা পুরুষসকল উপস্ত্রীবর্জ্জিত হন, কেননা স্ত্রীলোককে কুলটাকর্ত্তা পুরুষসকল, অতএব পুরুষ উপস্ত্রীবর্জ্জিত হইলে স্ত্রীলোক কুলটা হইতে পারে না স্বভাবে ধর্ম্মে ধর্ম্ম রক্ষা করেন। আমারদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি সকলের প্রতি। তাহাতে পুরুষ বা স্ত্রীলোকের ভেদ নাই। তাহা বিতর্ক না করিয়া কেবল ইতরের পক্ষ বলিয়া কুবাক্য সম্ভাষণ করিয়াছেন। আর দেবাসুরের প্রতি উপমা দেখিয়া লিখিয়াছেন যে দেবাসুরের সহিত উপমা দেওয়া সে উকীলের ঠাকুরালি। তাহার প্রমাণ দৃষ্টি করিবেন। যথা মহাভারতীয়ং অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিতং মহাপাতকনাশং দেবপক্ষে। ভেজে গৌতমসুন্দরীং সুরপতিশ্চন্দ্রশ্চ ইত্যাদি এমত আরং অনেকং দেবী ও দেবতার গুণাগুণ পুরাণে প্রকাশ আছে। সে কি উকীলের ঠাকুরালি কি ঠাকুরদিগের ঠাকুরালি ইহা বিবেচনা না করিয়া কেবলি কুকথা বলিয়া চিত্তে কালি দিতে ক্ষমতাপন্ন হইয়াছেন। সকল অনূঢ়া প্রৌঢ়া পতিহীনা প্রতি যে-বিধি, বিধি নানাবিধ ধর্ম্মশাস্ত্রে বিধান করিয়াছেন, তাহা প্রণিধান না করিয়া, বধিরের মত অব্যবস্থা করিয়া, দুর্ববস্থায় রাখিয়াছেন যেমন চন্দ্রমা রাহুগ্রস্ত তেমনি নিগুঢ়-ধর্ম্মের অবস্থা করিয়াছেন।

পরন্তু রাজ্যাধিপতিকে অধার্ম্মিক অবিচারক বলিয়া নানাবিধ ভৎ'সনা-করণে কি তাৎপর্য্য। রাজ্যাধিপতি তোমারদিগের সাধারণ ধর্ম্ম ধার্য্য করিয়া সুবিচার্য্যমতে আজ্ঞা করেন। যেহেতুক বাঙ্গালা ধর্ম্মশাস্ত্রে এমত আছে যে স্ত্রীলোক পতি পরিত্যাগ করিয়া উপপতি লইয়া জবন ভূপতির হুজুরে হাজির হয় তাহার আরজেতে জাতিতে কি অধিকার থাকে। তিনি পুনরায় পতিগৃহে প্রবেশ করিলেই দেশ-বিদেশে অশেষ লোককে অবনজাতি প্রাপ্ত করান্। যেহেতুক আপনারা ধর্ম্ম ভাবিয়া কহেন যে পাপান্ন গ্রহণ করিলেই জাতিচ্যুত

হইতে হয় তজ্জন্যই দেশাধিপতি সেইমত আজ্ঞা করেন যে হে পুরুষ, তুমি ক্ষান্ত হও, তোমাকে ও চাহে না। সে যাহা হউক, বাদানুবাদে বিরহ যন্ত্রণা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। আমরা অকূলে পড়িয়া আকুলা লইয়া পুনঃ পুনঃ প্রণতিপূর্ব্বক ভূপতিকে নিবেদন করিতেছি, আমারদিগের যাতনানিবারণের ব্যবস্থা আমারদিগের নিগূঢ় ধর্ম্ম যাহা আছে ইঙ্গিতে ভঙ্গীতে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া, এ দুঃখ হইতে রক্ষা করেন। তাহা হইলে প্রাণ রক্ষা হয়। এবং বিপক্ষের কুবাক্যে চক্ষের জলে ভাসিতে হয় না। বিশেষতঃ দেশাধিপতির প্রধান ধর্ম্মসংস্থাপন হয়।

কাসাং শান্তিপুরনিবাস্য নেক
বিরহীনীনাং।

Correspondence

To the Editor of the Durpan.

If you publish these few lines in your Durpun the heartfelt distress of all unmarried ladies will be greatly alleviated. If you give our remarks a place in your paper, some of your holy and intelligent correspondents becoming acquainted with our sorrows, may be making them known to the public graciously procure our deliverance. But if you publish them not, this cannot be.

On Saturday, the 14th of Choitra, you published a letter from the females residing in Santipur. On the 21st of the month the Editor of the Chandrika published a letter from the person of Nudeeya replying to the above, in which he very unfairly reflects on you the Editor of so valuable a paper, and in so doing displays his own folly. His wisdom can only be esteemed such by fools. He is the holy son of another Kunti equal to Judhisteer, like the present sons of Gunga. How wisely does the founder of the Dharma Subha give this opinion. As Ootur the son of Birat manifested

his courage in battle so does he display his wisdom in publishing such replies. He confesses that he has come with a cat on his shoulders to fight with a lion. Be that as it may. Knowing the wickedness that abounds, we are anxious by making our distress known to the rulers of the country, agreeably to our shastras, to put an end at once to our misfortunes, and to wickedness of the profligate ; this, however, he seems anxious to oppose. From this we infer that he is not aware of the distress even of the females of his own family. He is like the frog who sat near the water lily watching the honey ; but the bee coming secretly entered the flower and feasted on the honey to his hearts delight ; what a bushel full of religious merit has this holy being collected in his family temple. The wickedness that prevails cannot be restrained were you even to attempt to do so with branches of the sacred Tulsee in both hands. We apprehend that the restrictions under which we are placed have their to marry whom we please, the profits of the match-makers will be at an end. Because if we are allowed to choose husbands for our selves according to our pleasure and according to laws that formerly prevailed, what need would there be for their services, and how could their authority continue to prevail ? Be that as it may. We wish to choose husbands for ourselves, and for this purpose we earnestly wish that Government would embody in on order what is contained in our shastras on this subject, that the misery of our widows may be done away with. If this is not granted let the profligacy of our lords be restrained ; for they are the cause of the wickedness that prevails among the other sex. If they act properly,

how can we go wrong ? Thus the purity of both will be preserved. The restrictions of our holy shastras are equally binding on all, whether male or female, without any distinction. Without thinking of this, but saying that it belongs only to the lower classes, the Editor of the Chundrika has made many improper statements. The Santipore letter had adduced the ancient example of the Gods and Usoor ; but he says that this only resembles the pleadings of a lawyer. But what are his proofs ? These ; the Muhabarat says. "he who resembles Uhulya, Drupodee, Koonthee, Tara, and Mundoduree is delivered from the consequences of the most heinous sins, Indru and the Sun both violated the wife of their spiritual guide. The poorans have given us the virtues and vices of many gods and goddesses ; but is this the pleading of a lawyer ? Instead of judging in this matters, he was only endeavoured to obscure the minds of others. Instead of attending to the various rules laid down in the shastras for the poor unprotected females, like a deaf man who hears nobody, he has perverted the shastras, and inflicted distress, just as Rahoo seizes upon the moon at an eclipse.

What is his object in abusing the sovereigns of the country by calling them unrighteous, and undiscriminating ? The rulers have guaranteed our common faith and their decisions are according to justice. In the Hindoo lawshastras it is ordered, that if a woman forsaking her husband goes with her paramour before a Moosulman judge, she must lose her caste. If she return to her husband's house, she communicates this loss of caste to all her relatives ; for you say as you think with justice that it one eats the

food of a sinner, he loses caste. On this ground the officer of justice tells the injnred husband to be satisfied, for his wife does not desire to live with him. Be that as it may ; it is not by contentious that the distress of widowhood can be removed. We immersed in a sea of sorrow which has no shore, do again with great humility, entreat our rulers, that they would embody the rules of our own most esteemed shastras in a Regulation for our benefit, that our sight may no longer be obscured with tears. This would be to perform one of the first duties of Government.

The Santipore Widows.

Note : We have translated this letter in the best way in our power. it is very obscure and full to alliterations.

মূল বাংলা রচনাটি যাতে অন্তত কিছুটা পড়া যায়, সেই উদ্দেশ্যে আমরা কিছু যতিচিহ্ন দিয়েছি। এই সময় ধর্মসভার সঙ্গে সমাজসংস্কারপন্থীদের বিরোধ দেখা দিয়েছিল। সতীদাহপ্রথার পক্ষে-বিপক্ষেই এই বিরোধ প্রকাশিত হত। 'সমাচার-চন্দ্রিকা'র সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ধর্মসভা'রও সম্পাদক ছিলেন। তাঁর বক্তব্যের প্রতিবাদে এই চিঠিটি লেখা হয়েছে মেয়েদের নামে। চিঠির মূল বক্তব্য —সরকার ধর্মশাস্ত্র-অনুযায়ী সমাজসংস্কারের যে-কর্মসূচি নিয়েছেন তা সমর্থন করা উচিত। কিন্তু এই বক্তব্যটি খুব বিস্তারিত বলা হয় নি। বরং নানা ভাবে ভবানীচরণকে গালাগাল দেয়া হয়েছে।

এই চিঠির ভাষার সঙ্গে দর্পণের গদ্যচর্চার কোনো মিল নেই। ইংরেজি অনুবাদের শেষে 'নোট' দিয়ে স্বীকার করা হয়েছে যে এ-রকম বাংলার অনুবাদ কত দুরূহ। এই দুরূহতা অনেকটাই নিশ্চয় বাংলাবাক্য গঠন সম্পর্কে অনভ্যাস ও অজ্ঞানতা থেকে। ফলে মূল ক্রিয়ার সঙ্গে বাক্যের অন্যান্য অংশের মিল প্রায়ই থাকছে না। তার ওপর এক কৃত্রিম আলংকারিক রীতি, অনুপ্রাস ইত্যাদি বাংলা রচনাটিকে আরো দুরূহ করে তুলেছে। কোথায় দর্পণের অমন সুগঠিত গদ্য যা ইংরেজি মূলরচনার স্পষ্ট ছাঁচে ঢেলে তৈরি করা আর কোথায় এই চিঠির গদ্য যা ইংরেজি বাক্যের কাঠামোতে আঁটানোই যায় না।

কিন্তু তা সত্ত্বেও চন্দ্রিকা-সম্পাদককে যখন আক্রমণ করা হয়েছে তখন সেই

আক্রমণ যেমন অনেক বেশি ব্যক্তিগত, তেমনি অনেক বেশি বাঙালি সমাজে প্রচলিত। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, ভীষ্মের উপদেশ, বিরাটপর্বে উত্তরের যুদ্ধযাত্রা, বিড়াল কাঁধে বাঘের সঙ্গে লড়াই—এইগুলি রামায়ণ-মহাভারত-অভিজ্ঞ শ্রোতার বা পাঠকের কাছে প্রবাদের মতো পরিচিত। এমন-কি 'ভেক', 'ভৃঙ্গ' এই সব সংস্কৃত শব্দ সত্ত্বেও এই আদিরস মাখানো রসিকতাটুকুকে লুকানো যায় না যে চন্দ্রিকা-সম্পাদক নিজের স্ত্রীর মনের ব্যথাও বোঝেন না, তিনি ব্যাঙের মতো পদ্মের ডাঁটার তলায় বসে মধু খাচ্ছেন আর মৌমাছি এসে পদ্মের মধুপান করে যাচ্ছে। ('ধর্ম্মপুত্রের স্বীয় পরিবারের মনের ব্যথা বুঝি অবগত নহেন, কেবল ভেকের ন্যায় কমলমূলে বসিয়া মধু আহরণ করিতেছেন। কিন্তু সঙ্গোপনে ভৃঙ্গ আসিয়া রণভঙ্গে কমলাঙ্গ সঙ্গে অনঙ্গ প্রসঙ্গে মধুপান করে।') এই বাক্যটির প্রথম 'কমল' শোভা-বাজারের কমলকৃষ্ণদেব—তিনি 'ধর্মসভা'র একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং ভবানীচরণ ও তাঁর চন্দ্রিকাকে সমর্থন দিতেন। দ্বিতীয় 'কমল'-এর ইঙ্গিত ভবানী-চরণের স্ত্রী। সংস্কৃত সন্ধির সুযোগ নিয়ে বলা হয়েছে—'কমলাঙ্গসঙ্গে'—'কমল' না হয়ে 'কমলা'ও হতে পারে।

ইংরেজি-অনুবাদক বলেছেন রচনাটি 'দুর্বোধ্য' ও 'অনুপ্রাসে ভরা'। দুর্বোধ্যতা এসেছে নিহিত অর্থের চাপ থেকে। আর অনুপ্রাস ইত্যাদি অলংকারও লেখক ব্যবহার করেছেন অর্থ নিহিত করার ইচ্ছা থেকে। তাই এ-রচনার যিনি প্রকৃত পাঠক, তাঁর কাছে রচনাটির অন্য ধরনের ব্যঞ্জনা আছে।

এই গদ্যের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে—দর্পণের গদ্য কত পরিচ্ছন্ন, প্রত্যক্ষ ও সহজবোধ্য। আমরা এর আগের দৃষ্টান্তে দেখেছি—বাংলা গদ্যের সেই পরিচ্ছন্নতা, প্রত্যক্ষতা ও বোধ্যতা আসছে ইংরেজি গদ্যের ছাঁচটিকে প্রায় অবিকল ব্যবহারের ফলে। সেই দৃষ্টান্তের সঙ্গে তুলনায় আমরা বুঝতে পারি—এই দৃষ্টান্তটি সেই ছাঁচ থেকে কতটাই আলাদা। এই মূল বাংলার ইংরেজি অনুবাদ থেকে আবার যদি দর্পণের বাংলায় পুনরনুবাদ করা যায়, তা হলে হয়তো আরো নির্দিষ্ট ভাবে বোঝা যাবে—দর্পণের গদ্যের ছাঁচ এই ধরনের বাংলা গদ্য থেকে কত আলাদা ছিল।

কিন্তু দর্পণের বাইরের গদ্য বলতে যে সব সময় এ-রকম গদ্য বোঝাত তা নয়। আমরা অন্য একটি দৃষ্টান্ত নিচ্ছি যেখানে দর্পণের ভাষার আদর্শই মেনে চলা হয়েছে।

৪. সমাচার দর্পণ। শনিবার ১৬ জানুয়ারি ১৮৩৬

প্রেরিতপত্র

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।

গত শনিবাসরীয় দর্পণে প্রকাশ হইয়াছে জিলা হুগলির রাজকর্ম্মকারকেরদের মধ্যে কোন ব্যক্তি উৎকোচ গ্রহণজন্য রাজবিচারে কর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন তাহার বৃত্তান্ত এবং তাহারদের অপরাধ ব্যক্ত করিতেছি দর্পণৈকদেশে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

প্রথমতঃ। মাজিস্ত্রেটী কর্ম্মকারকেরদিগের বৃত্তান্ত যিনি নাজীর ছিলেন তাঁহার দৌবাত্ম্য পূর্ব্বে কৌশলরূপে প্রকাশ হইয়াছে তিনি সংপ্রতি মতি-উল্লানামক এক ব্যক্তির মোকদ্দমায় দারসায়েবী বিচারস্থল প্রাপ্ত হইয়াছেন। অনুমান করি শ্রী শ্রী ৺ইচ্ছায় বিস্তর পাপের শাস্তি এককালীন হইবেক ইহাব্যতিরেকে অন্যান্য অধিক মোকদ্দমা ঐ বিচারস্থলে অর্পণ হইবেক। এবং সেরেস্তাদার ও পেসকার তাহারদেরও প্রতিফল শীঘ্র হইবেক এমত বিবেচনা হইতেছে।

দ্বিতীয়। কালেকৃটরী কর্ম্মকারকদিগের উৎকোচের দৌরাত্মের বৃত্তান্ত লিখন বাহুল্য। কালেকৃটরীর সিরিস্তার মহাফেজ এক ব্যক্তি শহর চুচুড়ার সরকার হইতে প্রজারদিগের পাট্টা দেওনের বিষয়ে উৎকোচের দ্বারা অসম্ভ্রান্ত হইয়াছে। তাহার নামে এক শত কি এক শত পঞ্চাশ কি ততোধিক উৎকোচ লওয়ার বিষয়ে দরখাস্ত হইয়াছে তাহার উপযুক্ত প্রমাণ অনুসারে ক্রমে সকলি প্রমাণ হইবেক এ ব্যক্তিও উক্ত বিচারস্থলে শীঘ্র অর্পণ হইবেক। এবং ঐ কালেকৃটরীর অন্যান্য কর্ম্মকারকেরদের কুকর্ম্ম করা ও উৎকোচ ব্যাঘ্রস্বরূপ গ্রাস করা শীঘ্র প্রকাশ পাইবেক। আমারদের সর্ব্বদাই আক্ষেপ হইতেছে যে বুঝি পাপের শাস্তি হয় না পাপ পুণ্য সজ্ঞামাত্র। এইক্ষণে শ্রীযুক্ত কমিস্যনর সাহেবের আগমনে পাপ ও পুণ্য—দুই সত্য জ্ঞান হইল। বিশেষতঃ ঐ সকল ব্যক্তিরদের উৎকোচ প্রতি অত্যন্ত ভয় ছিল যেহেতুক বিচারকর্ত্তা অর্থাৎ মুনীর যদি উৎকোচগ্রাহিব্যক্তিরদের সহায় থাকেন তবে তাহাদের উৎকোচ গ্রহণের ভয় কি জন্য থাকিতে পারে এবং ইহাও বিবেচনা করিলাম যে উৎকোচ গ্রহণের বিষয়ে বিচার করা অধিক পরিশ্রম অপেক্ষা করে সুতরাং এই পরিশ্রম করিয়া উৎকোচের বিচার করিবার আবশ্যক কি। অন্যান্য বিচারকর্ত্তা না বুঝিয়া তাদৃশ মনোযোগী হইতেন না। অধিকন্তু ধনি ব্যক্তিরদিগের অনায়াসে মনস্কামনা সিদ্ধ হইত যেহেতুক উৎকোচ গ্রহণ করাইয়া আপন কর্ম্ম লইত। সুতরাং দুঃখি ব্যক্তিরা ক্রমাগত উচ্চ২

হাকীমের নিকট বিচারের প্রার্থনীয় হওনের সাধ্য কোন অংশে হইত না। এমতে এতকাল অরাজকে ঐ আমলা লোক রাজ্য করিয়াছে এইক্ষণে শ্রীযুত কমিস্যনর সাহেব কি দুঃখি কি ধনী সকলকে রাজার নিকট সমভাবে জানাইয়াছেন এই ভরসা প্রাপ্ত হইয়া দুঃখিরদিগের দ্বারা আমলারদিগের দৌরত্ম প্রকাশ হইল ইতি।

To the Editor of the Durpun.

Sir,— In your paper of last Saturday you stated that some of the Amlahs at Hooghly had been convicted of bribery and dismissed. I now send you a few particulars regarding their transgression which you will much oblige me by publishing in one corner of your Durpun.

In the first place regarding the officers of the Magistrate, The Nazir, whose evil deeds were made known some time ago, has been committed to trial before the judge in reference to the case of one Motee olla. It is supposed, that through the will of God, many misdeeds will thus be punished at once. Besides this many other complaints have been lodged in that court against him. The sheristadar and peshkar will probably soon suffer for their conduct.

2nd. It would be too long for me to detail all the misdeeds and corruption of the officers of the collector. A mohafez of the collector's office in reference to the granting of pottahs to the residents of Chinsurah has been disgraced on charges of corruption ; from one hundred to one hundred and fifty complaints lodged against him which it is expected will all be substantiated. That person will also be very quickly committed to that court. Many of the other officers of the collectorate will soon be exposed for their misdeeds and their great corruption. We always regretted that sin was not punished and that sin and holiness existed only in name.

Though the arrival of the commissioner sin and merit and known to be actual things. We always lived in dread of the bribery of those individuals, for when they are not sufficiently kept in check by those above them, they are fearless in taking bribes. We have also judged that it is very difficult to judge cases of bribery, and that many will not submit to the necessity of labour, and perhaps some of the other public officers through thoughtlessness might not have agreed to this *exertion*. More particularly the wealthy thus had the means of fulfilling their desires, for they got their work accomplished through bribery, and the poor were necessarily debarred from bringing their complaints to the higher authorities. Thus have the Amlahs reigned long as though there had been no king. Now the commissioner esteems the poor and the rich upon a level, through confidence in this the poor are now bringing forward their complaints.

এই চিঠিটি মূলে বাংলায় লেখা না ইংরেজিতে তা ঠিক করা বেশ কঠিন—দর্পণের বাংলা লেখাগুলি ইংরেজি কাঠামোর কতটা সন্নিহিত এই অনিশ্চয়তাও তারই প্রমাণ। চিঠিটি বাংলায় লেখা মনে করার কারণগুলো থেকে আরো বোঝা যাবে বাংলা বাচনের বৈশিষ্ট্য কতটাই অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল ইংরেজি গদ্যের অনড় কাঠামোতে।

চিঠিটির কোনো-কোনো বাক্য ব্যাকরণের দিক থেকে সামান্য বিশৃঙ্খল। দর্পণের বাংলা অনুবাদে সে-ধরনের বিশৃঙ্খলতা সাধারণত থাকে না। প্রথমত, দ্বিতীয়ত. করে লেখক যে-বিবরণ দিয়েছেন তাতে প্রথমেই বিষয় উল্লেখ করেছেন—"মাজিস্ত্রেটী কর্ম্মকারদিগের বৃত্তান্ত"। এটা ইংরেজি রীতি নয়। পত্রলেখক দু-এক জায়গায় লোকমুখে প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করেছেন, যেমন, "ট্রায়াল" বা বিচার হওয়াকে বলেছেন "দারসায়েরী বিচারস্থল প্রাপ্ত হইয়াছেন।" দর্পণের বাংলা অনুবাদে সাধারণত এ-রকম লোকচলতি শব্দ ব্যবহার করা হত না, তাও আবার ফারসি শব্দ। "অনুমান করি ৺ ইচ্ছায়"—এ রকম কথাও বাংলা চিঠিতেই বেশি ব্যবহৃত হত। "উৎকোচ লওয়ার বিষয়ে দরখাস্ত হইয়াছে"—অনুবাদ হলে হয়তো

বাক্যটি অন্য রকম হত। "উৎকোচ ব্যাঘ্রস্বরূপ"—এই উপমাও বাংলা লেখাতেই স্বাভাবিক।

এই বৈশিষ্ট্যগুলির যে-কোনোটি বাংলা অনুবাদেও থাকতে পারত যদি রচনাটি ইংরেজিতে লেখা হত। কিন্তু সব বৈশিষ্ট্যই একসঙ্গে থাকায় আমরা চিঠিটিকে বাংলায় লেখা বলেই ধরে নিয়েছি।

বাংলা চিঠি ও ইংরেজি অনুবাদের তুলনা করলে দেখা যাবে—ইংরেজিতে যেন চিঠির বক্তব্য আরো পরিষ্কার হয়েছে। বাংলা চিঠির বাক্যগুলি ইংরেজিতে প্রায় অবিকল রক্ষিত হয়েছে। বাংলা চিঠির বয়ানটিকে ইংরেজির কাঠামোর মধ্যে ফেলতে কোনো অসুবিধেই হয় নি। "উৎকোচ ব্যাঘ্রস্বরূপ গ্রাস করা" এই অনিংরেজি অলংকারটুকু স্বচ্ছন্দে বাদ চলে গেছে।

দর্পণের ইংরেজি-কাঠামোয় সংস্কৃতরীতির বাংলা বাক্য বাংলা গদ্যের মডেল হিশেবে কতদূর কার্যকর ছিল তা এই ছোট চিঠিটি থেকেও বোঝা যায়। চিঠিটি প্রায় সম্পূর্ণতই সমাপিকা ক্রিয়ানির্ভর—ছোট ছোট বাক্যও সমাপিকা ক্রিয়ার ওপর ভর দিয়ে লেখা হয়েছে। বাধ্যতই কোনো কারণ-উল্লেখ করতে হয়েছে এমন অন্তত দুটি জায়গায় পত্রলেখক অসমাপিকা ক্রিয়া এড়িয়ে কারণবাচক পদ তৈরি করে নিয়েছেন—"উৎকোচ গ্রহণ জন্য", "উৎকোচ লওয়ার বিষয়ে"। এ-রকম পদ গঠনের উদ্দেশ্য বাক্যের ক্রিয়ানির্ভর সংগঠনকে যতদূর পর্যন্ত সম্ভব বাধামুক্ত রাখা। অসমাপিকা ক্রিয়া বেশি ব্যবহার করলে বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়া-নির্ভরতা কমে আসে ও বাক্যটিকে আর ইংরেজির কাঠামোর মধ্যে ধরানো যায় না। চিঠিটির শেষাংশে চারটি অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে—"এই পরিশ্রম করিয়া উৎকোচের বিচার করিবার আবশ্যক কি", "অন্যান্য বিচারকর্ত্তা না বুঝিয়া ...; " "উৎকোচ গ্রহণ করাইয়া আপন আপন কর্ম্ম লইত" ; "এই ভরসা প্রাপ্ত হইয়া..." ।

এই চারটি অসমাপিকা ক্রিয়াই সমাপিকা ক্রিয়ার খুব কাছাকাছি ব্যবহৃত হয়েছে—ফলে বাক্যটি ইংরেজি কাঠামো ভেঙে বাইরে যেতে পারে নি। সম্ভবত এই শেষাংশে পত্রলেখক তার নিজের মতটি প্রকাশ করছেন বলেই চিঠির প্রথমাংশে বাক্যগুলিকে যে-শৃঙ্খলায় সাজাচ্ছিলেন তাতে একটু চাঞ্চল্য এসে পড়ে। কিন্তু সে চঞ্চলতাও কখনো বাক্যটিকে তার স্বাভাবিক বাংলা হয়ে যেতে দেয় নি। মাতৃভাষায় আবেগপ্রকাশের সময়ও ইংরেজি কাঠামোর মধ্যে থাকার বাধ্যতায় লেখক এ-রকম বাক্য লিখে ফেলেন, "ঐ সকল ব্যক্তিরদের উৎকোচপ্রতি অত্যন্ত

ভয় ছিল।" তিনি বলতে চেয়েছেন ঐ সব লোকদের উৎকোচলোভের জন্যে সাধারণ মানুষের ভয় ছিল। মাতৃভাষার এই বিপরীত ভাষণ ইংরেজি অনুবাদে ঠিক করে নেয়া হয়েছে।

দর্পণের দ্বিভাষিক সংস্করণ থেকে নেয়া এই তিনটি উদাহরণে আমরা যে-কথাটি বলতে চাইছি, এই দ্বিভাষিক সংস্করণের আরো কিছু রচনা থেকে তার যাথার্থ্য পরীক্ষা করে নেয়া যেতে পারে।

৫. সমাচার দর্পণ। শনিবার ১৮ এপ্রিল ১৮৩৫

দারোগা চৌকিদারেরদের স্থানে অ[ ] পূর্ব্বক যে টাকা গ্রহণ করেন তদ্বিষ বসিন্দা ইতি স্বাক্ষরিত এক পত্র আম [ ] পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি। আ[ ] বলা হয় যে এইরূপ অপকর্ম্ম ঐ [ ] শিকরাতে কিঞ্চিৎ নিবারণ হই [ ]। ফলতঃ এই ব্যাপার নিতান্ত [ ] অতএব এতদর্থ গবর্ণমেণ্ট যে এক বিশেষ আইন করিবেন সে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু দারোগা মহাশয়েরা যদি এমত নিশ্চয় বোধ করেন যে আমাদের এই কার্য্য গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর হইলে আমরা নিতান্তই দণ্ড পাইব এবং যদি জানেন যে আমাদের এই সকল কুব্যবহার মুদ্রাঙ্কিত পত্রের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর অবশ্য হইবে তবে বুঝি তাহারা ইহাতে ক্ষান্ত হইতে পারে।

We publish with much pleasure the letter of Basindah regarding the exactions practised by the Darogas on their Chowkedars, in the hope that the exposure will serve to check the practice! As it is altogether illegal, it would be redundant for Government to pass any new and specific Regulation on the subject. But if the Darogahs feel assured that when instances of such conduct are brought to the notice of the Magistrate, they will meet with deserved punishment, and that their evil practices will assuredly be brought to the knowledge of their European superiors by means of the press, they will certainly be less disposed to engage in them.

৬. বাবু রঘুরাম গোস্বামী

গত শুক্রবার স্থপ্রিম কোর্টে এক মোকদ্দমার বিচার হয় তাহাতে মহাজন লোকেরদের অতিশুশ্রূষা জন্মে বিশেষতঃ বাবু রঘুরাম গোস্বামী শহর শ্রীরামপুরে জন্মিয়াছেন এবং বাল্যকালাবধিই ঐ শহরে সপরিবার বাস করিতেছেন। ইনি পূর্ব্বে পামর কোম্পানির দেওয়ান ছিলেন। ১৮২৯ সালের জানুয়ারি মাসে পামর কোং ২৭০০০ টাকা করিয়া দুই বিল অর্থাৎ খত বাবু রঘুরাম গোস্বামীর নামে করেন মুদ্দৎ ১৮ মাস তাহার স্থদ শতকরা ১২ টাকা ছিল। তৎসময়ে রঘুরাম গোস্বামির মহীশূরের রাজবংশ্যেদের সঙ্গে অতি প্রীতি-প্রণয় থাকাতে তিনি তাহাদের মধ্যে কোন এক ব্যক্তিকে ঐ বিলের ডিসকৌণ্ট করিতে পরামর্শ দেওয়াতে তিনি তাহা করিয়াছিলেন। এইক্ষণে ঐ টাকার বাবতে ঐ রাজবংশ্য বাবু রঘুরাম গোস্বামির নামে স্থপ্রিম কোর্টে নালিশ করেন কিন্তু যদ্যপি তদ্বিষয়ে ১০।১২ জন সাক্ষির জেবানবন্দী লওয়া গেল তথাপি উক্তবাবু স্থপ্রিম কোর্টের এলাকার মধ্যস্থ ইহা প্রমাণ করিতে না পারাতে ফরিয়াদী ননস্থট হইলেন।

Baboo Raghoo Ram Gossain

A case was heard in the Supreme Court on Friday last, which excited considerable interest among the mercentile community. Baboo Raghoo Ram Gossain. who was born and has continued to reside with his family in Serampore, was formerly banian to Messrs, Palmer and Co. In January, 1829, Palmer and Co. drew two bills amounting to Sa. Rs. 27,000 in favour of Raghoo Ram Gosain payable eighteen months after date, and bearing interest and 12 per cent. Raghoo Ram who was on intimate terms with the Mysore Princes induced one of them to discount the Bills. An action has now been brought by the Prince against Rughoo Ram Gossain in the Supreme Court ; but though a dozen or more witnesses were examined they were unable to prove him subject to the

jurisdiction of the Supreme Court, and the plaintiff was therefore nonsuited.

৭. গত বুধবারে মীর নোরালি নামক একজন অতি ভয়ঙ্কর মোসলমান কোর্টে এই অপরাধে বিচারিত হইল যে সে বন্নু বিবি নামে আপন স্ত্রীকে কএক আঘাত করে তাহাতে স্ত্রীর প্রাণসংশয় হয়। ঐ স্ত্রীই এই মোকদ্দমার প্রধান সাক্ষী। তাহার গলদেশে ও স্কন্ধে ও বাহুতে অস্ত্রাঘাতের অনেক চিহ্ন দেখা গেল। পরে অন্যান্য স্ত্রীরা সাক্ষ্যের দ্বারা ঐ অভাগা স্ত্রীর কথা সপ্রমাণ করাতে জুরীর সাহেবেরা পোয়া ঘণ্টা পর্য্যন্ত বিবেচনা করিয়া আসামীকে দোষী করিলেন। পরে জজ সাহেব তাহাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে প্রেরণ-দণ্ডাজ্ঞা করিলেন। তাহা ঐ ব্যক্তি ভ্রমশ্রবণে বুঝিল যে আমার প্রাণদণ্ডের হুকুম হইল তাহাতে উচ্চস্বরে কহিল যে ভাল আমার জীবদ্দশায় থাকন অপেক্ষা বরং মরণ ভাল। পরে শ্রীযুত জজ সাহেব তাহাকে কহিলেন ঐ স্ত্রী যদি মরিত তবে তোমার কল্য প্রাণদণ্ডের হুকুম হইত।

On Tuesday, a savage looking Moosulman called Meer Nooralee, was tried in the Supreme Court for having inflicted several cuts on his own wife Bunnoo Bibee by which her life was considerably in danger. The woman was the principal witness and exhibited the marks of the cuts about her neck, shoulder and arm. Several other witnesses confirmed the statement of the unfortunate woman, and the Jury, after a quarter of an hour's deliberation, brought in a verdict of Guilty. The barned Judge sentenced him to transportation for life, but he fancying the sentence of execution had been passed, exclaimed, that he would much rather die than live any longer. His Lordship assured him that if the woman had died of the wounds, he would certainly have been executed the next day.

৮. শনিবার ২৫শে এপ্রিল ১৮৩৫

গত বুধবাসরীয় আপরাহ্নিক কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের দ্বারা যে এক বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে জ্ঞাত হওয়া গেল যে রাহাদারী মাসুল ও ডাক মাসুলের নিয়ম বিবেচনা করণার্থ কমিটি সাহেবেরা গত ১ আপ্রিল তারিখে নিযুক্ত হইলেন। বঙ্গ দেশ ও আগ্রা রাজধানী বিষয়ের বিবেচনার্থ প্রতিনিধিত্বরূপ ঐ কমিটিতে শ্রীযুত ইয়ং সাহেব ও শ্রীযুত সিভিন্স সাহেব ও শ্রীযুত পার্কর সাহেব ও শ্রীযুত ত্রিবিলিয়ন সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন।

গত সপ্তাহে আমরা যে পত্র প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহার চন্দ্রিকা সম্পাদকের উত্তর এইক্ষণে প্রকাশ করিলাম ঐ সম্পাদক মহাশয় লেখেন যে তিনি তাবৎ রিফারমের বিপরীত। আমরা বোধ করি সুতরাং তাঁহার ইচ্ছা আছে যে স্ত্রীলোকেরা যে অজ্ঞান ও ক্লেশাবস্থায় আছে তদবস্থাই থাকে এবং কুলীনেরা এইক্ষণকার ন্যায় যত বিবাহ করিতে চাহেন ততই করেন।

হুগলির জজ শ্রীযুত ডি সি স্মিথ সাহেবকে ঐ জিলার প্রধান২ জমীদার ও অন্যান্য শিষ্ট বিশিষ্ট মহাশয়েরা যে প্রশংসা পত্র প্রদান করিয়াছেন তাহা এবং তদ্বিষয়ে ঐ সাহেবের উত্তর আমরা হরকরা পত্র হইতে গ্রহণপূর্ব্বক প্রকাশ করিলাম। আমরা হুগলী জিলার অতিনিকটবাসী অতএব সাহেবের ঐ প্রশংসা যথার্থ বোধ করিতে পারি ফলতঃ ঐ জিলা উক্ত জজ সাহেবের অধীন হওয়াতে যেমন ভদ্র হইয়াছিল তেমন পূর্ব্বে কখন হয় নাই। তাঁহার নিত্য সতর্কতাতে আমলারা কার্য্যে শৈথিল্য করিতে পারিত না এবং তাঁহার অনবরত উদ্যোগেতে দস্যুরদের দমন এবং জিলার সমস্ত ভদ্রতা হয়।

যে শ্রীযুত আনরবল কর্নল বিলিং সাহেব শ্রীরামপুরের বড় সাহেবী পদে নিযুক্ত হইয়াছেন তিনি তৈলাঙ্গবাড়ে পঁহুছিয়াছেন এইক্ষণে এইস্থানে তাঁহার উত্তীর্ণ হওনের দিন২ প্রতীক্ষা হইতেছে।

কিয়ৎকালাবধি শ্রীরামপুরের শ্রীযুত মাজিস্ত্রেট সাহেব সৌভাগ্যক্রমে এক দল সিঁধাল চোরের দিগকে ধৃত করিয়া তাহারদের মোকদ্দমার তজবীজ করিতেছেন। অপর প্রথমে একজনকে ধৃত করাতে দ্বিতীয় ব্যক্তি ধরা পড়িল পরে ক্রমে ক্রমে ৪০ জন পর্য্যন্ত ধৃত হওন পূর্ব্বক কয়েদ হইয়াছে। এই দল কএক বৎসরাবধি লুঠ করণব্যাপারেতে আসক্ত ছিল এবং তাহারা লুঠের নিয়মসকল অতিপরিপাটি করিয়াছিল। কোন কোন ব্যক্তি এই শহর ও ব্যারাকপুরের নানা স্থান অনুসন্ধান করিয়া কোন্ সময়ে কোন্ দ্রব্য লুঠকরণের উপযুক্ত

তাহার নির্ণয়করণ কার্য্যে নিযুক্ত কেহ কেহ বা সিঁধকাটনে নিযুক্ত কেহ বা অপহৃত দ্রব্য নিকটে রাখনে কেহ ঐ দ্রব্য বিক্রয়করণে নিযুক্ত ছিল। ইহারা সকলই এই নগরনিবাসী নহে শ্রীরামপুরের চতুর্দিগস্থ জিলাবাসী কিন্তু মাজিস্ত্রেট সাহেবেরদের অতিমনোযোগ করাতে তাহাদের অনেকে ইঙ্গলণ্ডীয়াধিকারের মধ্যেও ধরা পড়িয়াছে।

Saturday, 25th April, 1835

We learn from a notice—published in the Calcutta Gazette of last Wednesday evening, that the committee for investigating the question of the Transit Duties and the Post Office Regulations, were appointed on the 1st of April last. Mr. Young, Mr. Siddous, Mr. Parker, and Mr. Trevelyan, are the four gentlemen appointed to represent the interests of the Bengal and Agra Presidencies.

We have inserted the reply of the Chundrika to the letter which we published last week. The chaundrika declares himself an enemy of all reform, and is of course desirous that females should continue in their present degraded and ignorant state, and the koolins should be at liberty to marry as many wives as they choose.

We have republished with sincere satisfaction from the Hurkaru, an address presented to Mr. D. C. Smyth, Late Judge at Hooghly by the principal zemindars and the leading men in the district, together with that gentleman's reply. From our vicinity to the Zillah of Hooghly, we are enabled to corroborate all the facts stated in the letter. Never was the district in better order, than when under the charge of Mr. Smyth. His constant activity kept the native Amlas to their duty; the ill designing were kept down by his unceasing vigilance; and the zillah enjoyed the highest state of prosperity.

The Honourable Colonel Rehling, who has been appointed Governor of Serampore, has, we learn, reached Tranquebar, and may be daily expected.

For some time past the Magistrate of Serampore has been investigating the case of a gang of house-breakers, whom he has been so fortunate as to discover. The detection of one gradually led to that of another, till the number in custody swelled to more than forty. These men have been engaged for several years in a regular system of plunder, under a well defined management. Some were employed in prying about this town and Barrackpore, and fixing upon the most eligible objects and time for plunder ; others in committing the actual thefts, some in receiving, and others in disposing of the stolen property. They were not all residents in this town ; but the assistance of the Magistrates of the districts around Serampore having been promptly afforded, many have been apprehended upon the British territory.

৯. যে দস্যুরা ধরা না পড়িয়াছে তাহারা গত মঙ্গলবার রাত্রিতে আপন বন্ধুবান্ধবেরদিগকে কারা বন্ধন হইতে মুক্তকরণার্থ নিশ্চয় করিয়া রুদ্ধনালয়ের প্রাচীর লঙ্ঘনপূর্ব্বক প্রবিষ্ট হইয়া কারাগারের দেওয়ালে সিঁধ কাটিয়া যে কুঠুরীতে চোরেরা কয়েদ থাকে প্রায় সেই পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছিল। ইতিমধ্যে ঐ কারাবদ্ধ ব্যক্তিরদের খালাসনিমিত্ত তাহারদের বন্ধু বান্ধবেরা যে এইরূপ উদ্যোগ করিতেছিল তাহা ঐ বন্ধু ব্যক্তিরা না জানিয়া ভাবিল যে বুঝি ভূত আইল অতএব শান্ত্রিকে ঐ স্থান দেখিয়া দেওয়াতে তাহারদের কল্পনাসকল ধৃত হইয়া বিফল হইল। ইত্যবসরে বাহিরের দস্যুরা যথাসাধ্য শীঘ্র পলায়ন করিয়া বোধ হয় যে নৌকারোহণে বারাকপুরের দিগে চলিয়া গিয়াছে।

On Tuesday evening last, the theives at large having determined to assist their brethren who were in confinement, jumped over several walls and made an effort to undermine

the Cutcherry ; but just as they were on the point of reaching the chamber in which the theives were confined, one of the theives themselves, not aware it seems of the effort made for his relief, called out that he thought he saw a ghost ; this brought the sentry to the spot ; the plot was discovered and defeated, but the miners had in the mean time made the best use of their heels, and so is supposed crossed over in haste to Barrackpore.

দর্পণে বাংলা গদ্যকে সংস্কৃত পণ্ডিতদের সাহায্যে ইংরেজির কাঠামোর মধ্যে বাঁধা হচ্ছিল সাহেবদের বাংলাচর্চার ঐতিহ্যেই। বাংলা চর্চার প্রধান ইয়োরোপীয় পুরুষ উইলিয়াম কেরিও বাংলাকে ইংরেজির সমতুল্য করে তুলতেই চাইছিলেন। বাংলা যেখানে শুধুই বাংলা—কেরি সেখানেই অস্বচ্ছন্দ। কথ্য বাংলার ক্রিয়া-বৈচিত্র্য ও প্রবচন-বিশিষ্টতাকে তিনি ভাবতেন একটা বড় বাধা। সুশীলকুমার দে তাঁর 'বেঙ্গলি লিটারেচার ইন দি নাইনটিন্‌থ সেনচুরি' বইটিতেই কেরি সম্পর্কে বলেছিলেন, 'The greatest difficulty which puzzled him, as a foreigner in learning the language relates to the unsettled state of its forms and expressions of its grammar and orthography.' উইলিয়াম কেরি স্বয়ং তাঁর এক চিঠিতে লিখেছিলেন, 'The language spoken by the natives of this part though Bengali is so different from the Bengali itself that though I can preach an hour with tolerable freedom so as that all who speak the language or can read or write understand me perfectly ; yet the poor labouring people understand me little.'

কেরি বাংলা ভাষাকে স্ট্যাণ্ডার্ডাইজ করতে চাইছিলেন বাংলার বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করেই। দর্পণে মার্শম্যানও সেই একই কাজ করছিলেন। সাহেবরা যখন বাংলা শিখছিলেন, বা লিখছিলেন, বা বাংলাগদ্য তৈরি করছিলেন—তখন তাঁরা বাংলাকে ইংরেজির মতো করে নিচ্ছিলেন। এক পরাধীন ভাষার ওপর সাম্রাজ্যের ভাষার আধিপত্য নিশ্ছিদ্র ভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল।

৪

সমাচার চন্দ্রিকা

বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রের ত্রিস্তর সংগঠন, পৃষ্ঠপোষক-সম্পাদক-লেখক, অনেক-দিন পর্যন্ত প্রচলিত ছিল যদিও এমন সংগঠনের ভিতরে-ভিতরে দ্বন্দ্বও কম ছিল না। সংবাদ-সাময়িকপত্রের ইতিহাসে দেখা যায়, যে-কটি কাগজ এই সময় দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে তার অনেকগুলিতেই সংগঠনের এই দ্বন্দ্ব নিরসিত হয়ে সম্পাদকই কর্তৃপক্ষ ও প্রধান লেখক। এই সমাধানের প্রথম নিদর্শন 'সমাচার চন্দ্রিকা'।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রকাশের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে কৌমুদীর পরবর্তী বিখ্যাত বিবাদের অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল—কৌমুদীতে তিনি সম্পাদক ছিলেন নাকি সম্পাদকের সহকারী ছিলেন। এই বিবাদের মধ্যেও বাংলা সাময়িক পত্রের বৈষয়িক সংগঠনের স্তরগুলির ভিতরের দ্বন্দ্ব ধরা পড়ে। বাংলা সংবাদপত্রের সেই জন্মকালে লেখা, ছাপানো, প্রকাশ করা ও সম্পাদনা—এই কাজগুলির ভিতর পার্থক্য খুব নির্দিষ্ট থাকার কথা নয়। কিন্তু যিনি টাকা দিচ্ছেন, যিনি টাকা জোগাড় করছেন আর যিনি মাইনে পাচ্ছেন—তাঁদের ভিতর মর্যাদার একটা পার্থক্য নিশ্চয়ই ছিল। 'সম্বাদ কৌমুদী'-র সঙ্গে ভবানীচরণের বিবাদের মধ্যে এই অনির্দিষ্ট মর্যাদার প্রশ্নও জড়িত ছিল।

'সমাচার চন্দ্রিকা'-প্রকাশের যে-বিজ্ঞাপন ভবানীচরণ দিয়েছিলেন তাতে তিনি কৌমুদীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বোঝাতে এই ভাষা ব্যবহার করেছিলেন, 'সম্বাদকৌমুদী নামক সমাচারপত্র ১ প্রথমাবধি ১৩ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়াছেন।' আবার চন্দ্রিকার সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক বোঝাতে একই ভাষা ব্যবহার করেছেন, 'সম্প্রতি সমাচারচন্দ্রিকা নামক এক পত্র প্রকাশ করিতেছেন।' দুই জায়গাতেই তিনি সম্পাদনা-প্রকাশনাকে মিলিয়েই 'প্রকাশ' করা কথাটি ব্যবহার করেছেন। আবার, তার সঙ্গে মালিকানার ইঙ্গিতও থাকতে পারে।

এই বিজ্ঞাপনের উত্তরে কৌমুদীর পক্ষ থেকে যে-প্রতিবাদ জানানো হয় তাতে বলা হয়েছে ভবানীচরণের নাকি দাবি ছিল, যে তিনি প্রথম তেরোটি সংখ্যা সম্পাদনা করেছেন। কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন. …'no more than real Editor's Assistant.'

এই প্রতিবাদেই কৌমুদীর পক্ষ থেকে বলা হয়, 'and as such he was introduced to the notice of the gentlemen under whose

immediate and sole patronage and support the paper has been established.'

এই বিতর্কে কাগজের পরোক্ষ কিন্তু প্রধান ও একমাত্র কর্তৃপক্ষের কথা যেমন স্বীকৃত হয় তেমনি আবার 'প্রকৃত সম্পাদক' আর 'সম্পাদনা-সহকারী'-র বিভ্রাটও বোঝা যায়।

পদমর্যাদার এই প্রশ্ন সত্ত্বেও বাংলা কাগজের সংগঠন সম্পর্কে একটা ধারণা এই বিবাদ থেকে তৈরি হয়। বকলমে সাংবাদিকতার ত্রিস্তর সংগঠনে লেখার বিষয় ও লেখকের ভিতর থাকে প্রায় দুর্ভেদ্য দেয়াল। ফলে লেখক-বিষয়-পাঠক এই যে-সাযুজ্যের ওপর সাংবাদিক-গদ্যের সাফল্য সম্পূর্ণ নির্ভরশীল সেই সাযুজ্য কোনো সময়ই ত্রিস্তর সংগঠনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

চন্দ্রিকা প্রথম বাংলা কাগজ যেখানে এই বাধার দেওয়াল নেই। তাই এর গদ্যভাষায় সেই কণ্ঠস্বরের প্রক্ষেপ প্রায়ই শোনা যায়, উদ্দিষ্ট পাঠকের পরিচয় সম্পর্কে সুনিশ্চিত না হলে বাক্যের ভিতরে যে-স্বরক্ষেপ ঘটতে পারে না। বাংলা কাগজের মধ্যে চন্দ্রিকাই প্রথম ও অনেকদিন পর্যন্ত প্রায় একমাত্র কাগজ যার পাঠকমণ্ডলীকে নাগরিক বাঙালি সমাজের একটি অংশের ভিতর চিহ্নিত করা সম্ভব ছিল। সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করার আইন পাশের পর ও 'ব্রহ্মসভা'-'ধর্মসভা' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর—চন্দ্রিকার পাঠকসমাজ আরো বেশি নির্দিষ্ট ও আরো বেশি সংগঠিত হয়েছে। প্রথম ছ-সাত বছরেই বৃহত্তর পাঠকসমাজের সমর্থন চন্দ্রিকা অর্জন করতে পেরেছিল। এই প্রথম ছ-সাত বৎসর দর্পণের পাশাপাশি একমাত্র বাংলা কাগজ হিশেবে চন্দ্রিকা তার অস্তিত্ব রক্ষা করেছে ও মর্যাদা পেয়েছে।

চন্দ্রিকার এই সামাজিক অন্বয়ের কথা ১৮৩২ সালেও লিখেছেন তখনকারই আর-একটি কাগজ 'সংবাদ তিমিরনাশক'। 'সমাচার দর্পণ'-এ রচনাটি পুনর্মুদ্রিত হয়।

সমাচার দর্পণ। ২১ জানুয়ারি ১৮৩২

> কলিকাতা রাজধানীতে এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রের উৎপত্তি।... সমাচার দর্পণ মিসেনরি সাহেবদিগের বাঙ্গলা কাগজ অনেক লোক গ্রহণ করেন নাই অর্থাৎ ধর্ম্মদ্বেষিরা কাগজ করিয়াছেন অবশ্যই ইহাতে আমারদিগের ধর্ম্মের দ্বেষ আছে বহুদিবসের পরে জানা গেল তাহাতে কেবল নানা দিগ্‌দেশীয় সমাচার প্রচার হয় পরে ক্রমে অনেকে তাহার আদর করিলেন সমাচার দর্পণে কতকগুলিন

প্রেরিতপত্র প্রথম প্রকাশ হয় তাহাতে এ প্রদেশীয় ব্রাহ্মণাগ্রগণ্য কুলীন ঠাকুরদিগের নিন্দা ও বৈষ্ণবদিগেব প্রতি শ্লেষ প্রকাশ হইল ইত্যাদি দেখিয়া অনেক বিশিষ্টলোক বিরক্ত হইয়া কহিলেন আমারদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি একটা সমাচারের কাগজ যদ্যপি সৃষ্টি করেন তবে উত্তম হয় কিছু দিন পরে শুনিলাম শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রীযুত তারাচাঁদ দত্তজ ঐক্য হইয়া সম্বাদ কৌমুদী নাম দিয়া এক কাগজ ১২২৮ সালের কার্ত্তিক মাসে প্রকাশ করেন তাহার মূল্য দুই টাকা স্থির করিলেন এতন্নগরমধ্যে ঐ কাগজ মহাসমাদৃত হইল যেহেতুক হিন্দুর নিউস পেপর হইয়াছে ইহাতে অজ্ঞ বিজ্ঞ সাধারণের আনন্দ জন্মিল ঐ কাগজ সৃজনসময়ে জেম্‌স কাল্ডর সাহেব অনেক সাহায্য করেন এবং তিনি এমত সাহস দিয়াছিলেন যে যত দিন ঐ কাগজের গ্রাহকদ্বারা ব্যয়ের আনুকূল্য না হয় তবে আমি সাহায্য করিব দুই তিন মাস গতে দত্তজের এক সুসন্তান শ্রীযুত হরিহর দত্ত ঐ কাগজের এক সহকারী হইলেন ইহাতে তাঁহার মনোগত কথা ব্যক্ত করিতে বাঞ্ছা করিলেন অর্থাৎ সহগমনের প্রতি তাহাব কটাক্ষ করা মত এজন্য তাঁহার বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুর সহিত অনৈক্য হইল তিনি ঐ কাগজপ্রকাশক ছিলেন তাদৃশ কথা লেখাতে ধর্ম্মহানি এবং হিন্দুসমাজে মানহানি জানিয়া কৌমুদী ত্যাগ করিয়া ঐ সালের ফাল্গুনে সমাচার চন্দ্রিকানামক কাগজের সৃষ্টি করেন ···যাহা হউক বাঙ্গালিরদিগের মধ্যে চন্দ্রিকা ও কৌমুদী এই দুই কাগজ ছিল মাত্র চন্দ্রিকার ক্রমে২ উন্নতি হইতে লাগিল কারণ যত ধর্ম্ম স্ততোজয় অথাৎ সপ্তাহে দুইবার হইয়া পাঁচ শতাধিক গ্রাহক হইল।

[স. সে. ক ২। ১৮৪-৮৫]

বাংলা কাগজ হিশেবে চন্দ্রিকার সাফল্য নাগরিক সম্মতি সংগঠনে। বাংলার সামাজিক ইতিহাসে ও বাংলা গদ্যের বৃত্তান্তে চন্দ্রিকাকে রক্ষণশীল দলের মুখপত্র বলা হয়ে থাকে। চন্দ্রিকা সংবাদ-সাময়িকপত্র হিশেবে তার স্বতন্ত্র মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার পর, এক বিশেষ পর্যায়ে 'ধর্মসভা'র সঙ্গে তার প্রায় অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। চন্দ্রিকা-সম্পাদকই 'ধর্মসভা'র সম্পাদক ছিলেন। এবং চন্দ্রিকা তখন 'ধর্মসভা'র মুখপত্রে পরিণত হয়। সেই বিবর্তন অন্য ধরনের সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল। চন্দ্রিকা সেই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পেরেছিল। পেরেছিল বলেই নাগরিক বাঙালির একটি অংশ যখন সংগঠিত হওয়ার প্রয়োজন বোধ করে, তখন বাঙালি সাংবাদিক ভবানীচরণই তার প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত

হন। কারণ, তার আগেই তিনি চন্দ্রিকার মধ্য দিয়ে মত-সংগঠনে সফল হয়েছিলেন। ভবানীচরণ যে-মত সংগঠন করেছিলেন তার ভালো-মন্দ, রক্ষণশীলতা-প্রগতিশীলতা এই প্রসঙ্গে বিবেচ্য নয়। তিনি তাঁর কাগজের সঙ্গে তৎকালীন বাঙালি সমাজে বিদ্যমান একটি মতকে সংগঠিত আকার দিয়েছিলেন। সেই কাজে তাঁর প্রধান ও প্রায় একমাত্র অবলম্বন ছিল—'সমাচার চন্দ্রিকা', চন্দ্রিকার পাতায় তাঁর লেখাগুলি।

ভবানীচরণের মতামতকে শুধুই রক্ষণশীল ধরে নিলে বাঙালি হিন্দু সমাজের নাগরিক বিন্যাসের প্রক্রিয়াটিকে সরল করে ফেলা হয়। গ্রামীণ হিন্দু সমাজের জনবিন্যাসের রীতিতেই মহানগর কলকাতার বাঙালি হিন্দুরা বিন্যস্ত হবে—ইংরেজের নগরের দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্রেণীর অধিবাসী বাঙালি হিন্দুর আত্মরক্ষার প্রবণতারই এ ছিল এক বিশেষ প্রকাশ।[২২] সেইজন্য চন্দ্রিকা বাঙালি হিন্দুর সামাজিক ক্রিয়াদির খবর বেশি প্রকাশ করত। দর্পণে যখন বেরচ্ছে ব্রিটিশের ভারতবিজয়ের কাহিনী, নতুন-নতুন জাতির বিবরণ, নতুন ধরনের মেশিনের খবর, চন্দ্রিকায় তখন বেরচ্ছে বালকদের বিদেশী পোশাক, ইংরেজি শিক্ষা সত্ত্বেও হিন্দুধর্মে বিশ্বাস, বাঙালি সমাজের প্রধানদের কৌলিক আচার, শ্রাদ্ধোপলক্ষে দান, বিবাহ উপলক্ষে উৎসব—এই সম্পর্কিত সংবাদ ও মন্তব্য। সামাজিক বিবর্তনের মূল্যবোধের নিরিখে এগুলিকে রক্ষণশীল বা প্রগতিশীল এ-রকম কোনো পরিচয়ে চিহ্নিত করা যায় না। এখানেই কার্যকারণের একটি জটিল প্রক্রিয়া তৈরি হয়েছিল।

রামমোহন ও ইয়ং বেঙ্গলদের পক্ষ থেকে সমাজ সংস্কারের এক কর্মসূচি জনসাধারণের সামনে ধীরে-ধীরে আকার নিচ্ছিল। রামমোহনের পরমব্রহ্ম ধ্যান, সতীদাহবিরোধিতা ও ইয়ংবেঙ্গলদের ইংরেজি শিক্ষার প্রতি সমর্থন ও হিন্দু আচার-রীতির বিরোধিতা এই সংস্কার কর্মসূচির প্রধান অংশ। এই সংস্কারের পক্ষে কোম্পানির সরকারের ও সরকারের বাইরের সাহেবদের সমর্থন ছিল।

এর বিরুদ্ধে বাঙালি ও ভারতীয় হিন্দু সমাজের আত্মরক্ষার প্রবণতা প্রধান হয়ে ওঠে। ভবানীচরণ তাঁর চন্দ্রিকায় এই আত্মরক্ষার যুক্তিগুলি উপস্থিত করেন ও আত্মরক্ষার প্রবণতাকে ভাষা দেন। সেদিক থেকে ভবানীচরণ একই সঙ্গে হয়ে উঠেছিলেন বাঙালি হিন্দু সমাজের বুদ্ধিজীবী নেতা, সাংগঠনিক নেতা ও প্রচারক সাহিত্যিক। চন্দ্রিকায় ভবানীচরণ বাঙালি হিন্দু-সমাজের আত্মরক্ষার প্রবণতাকে একটা যুক্তি ও তত্ত্বের আকার দিতে পেরেছিলেন। সেই যুক্তি ও

তত্ত্ব অনুযায়ী চন্দ্রিকা ইংরেজি শিক্ষার সমর্থক কিন্তু ইংরেজি আচার ও সামাজিক রীতির বিরোধী ; কোম্পানির সঙ্গে বাণিজ্য বা কোম্পানির অধীনে চাকরির সমর্থক কিন্তু সাহেবি আদবকায়দার বিরোধী ; সাহেবদের এদেশে জমিদারি করার বিরোধী চন্দ্রিকা নয় কিন্তু সেই 'কলোনাইজেশন'-এর বাঙালি-সমর্থকদের বিরোধী ইত্যাদি।

এই সব যুক্তি ও তত্ত্ব যেন অনেকটাই ছিল কলকাতার বাঙালি সমাজের ভিতরের ব্যাপার। কলকাতায় দিনে-দিনেই বাঙালি হিন্দুদের নিজস্ব জীবন-যাত্রার ওপর মহানাগরিক চাপ পড়ছিল। তার প্রধান কারণ হিন্দুদের সামাজিক জীবনযাত্রা গ্রামজীবনের সামাজিক সংগঠনের ওতপ্রোত ছিল। সেই গ্রামজীবনের সংগঠন কলকাতার নাগরিক জীবনে কোনো ভাবেই টিঁকে থাকতে পারছিল না। গ্রামের রীতি-অনুযায়ী জাতিভেদ অনুসারে পাড়া বা বসতি-এলাকাভেদ কলকাতায় সম্ভব ছিল না। বা গ্রামের রীতি-অনুযায়ী খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে হিন্দুদের জাতিভেদ মেনে চলা কলকাতায় সম্ভব ছিল না। ফলে, হিন্দু-বাঙালির অভ্যস্ত জীবনযাপনের ওপর একটার পর একটা ঘা এসে পড়েছিল।

হিন্দু-বাঙালির সেই আক্রান্ত জীবনযাপনের পক্ষে ভবানীচরণ যে-যুক্তি দিচ্ছিলেন তা থেকে কলকাতাবাসী হিন্দু বাঙালিদের ভিতর একটা আত্মরক্ষার ঐক্যসূত্র তৈরি হতে পেরেছিল।

সেই ঐক্যসূত্রগুলো নিয়ে বাঙালি হিন্দুর আত্মরক্ষার চেষ্টাকে ইতিহাসের বিচারে জাতীয়তাবাদের পূর্বলক্ষণ বলা যায় না বরং সেই জাতীয়তাবাদ নিহিত ছিল রামমোহন ও ইয়ং বেঙ্গলের কর্মসূচিতেই। তার ওপর বাঙালি হিন্দুর আত্মরক্ষার চেষ্টা ছিল সাম্প্রদায়িক চেষ্টা—তার কাছে অবাঙালি ও অহিন্দু জনসাধারণ প্রায় বিধর্মীর মতো পরিত্যাজ্য, বিধর্মী সাহেবের মতো গ্রহণীয় নয়। তবু, ভবানীচরণ যে-যুক্তিকাঠামো খাড়া করছিলেন তার ভিতর ভারতীয়তার একটা অস্পষ্ট ধারণাও নিহিত ছিল।

যদি সাহেবদের প্রবল পরাক্রান্ত উপস্থিতি না থাকত, তা হলে হয়তো রামমোহন-ইয়ংবেঙ্গলদের কর্মসূচি ও ভবানীচরণের প্রতিক্রিয়াকে মনে হতে পারত—জাতীয়তাবোধ উন্মেষের দুই ভিন্ন পথের সংঘাত। কিন্তু উপনিবেশের সমাজে এই দুই বিপরীত পথের সব পথিকই সাহেবদের প্রভুত্ব মেনে নিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, এই উভয় মতাবলম্বীই বিশ্বাস করতেন সাহেবরা আমাদের ভাগ্যনির্ধারক। সেই কারণেই এই দুই ভিন্ন মতের দ্বন্দ্ব জাতীয়তাবোধ

উন্মেষের দ্বন্দ্ব না-হয়ে, হয়ে দাঁড়াল বাঙালি সমাজের আভ্যন্তরীণ বিবাদ। চন্দ্রিকা হয়ে উঠল সেই বিবাদের মুখপত্র। কিন্তু এই হয়ে ওঠারও একটি প্রক্রিয়া আছে।

১৮২২-এ চন্দ্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৮২৩-এ ভবানীচরণ 'কলিকাতা কমলালয়' বের করেন। তারও আগে 'সম্বাদ কৌমুদী'র সঙ্গে তিনি সম্পর্কচ্ছেদ করেন সতীদাহবিরোধিতার প্রশ্নে। 'কলিকাতা কমলালয়'-এ সবচেয়ে স্পষ্ট বোঝা যায়, যে-কলকাতা শহরে ভবানীচরণ এর পরের প্রায় পঁচিশ বৎসর (তাঁর মৃত্যু ১৮৪৮-এ) নাগরিক বাঙালি হিন্দুর একটি অংশকে নেতৃত্ব দেবেন, সেই কলকাতা শহরকে তিনি কী ভাবে দেখেছিলেন। কলকাতা শহর সম্পর্কে তাঁর এই ধারণা ও কলকাতা শহরের বসবাসের বাস্তবতাকে সনাতন হিন্দু সমাজের জীবনযাপনের ধারণার সঙ্গে তিনি কী ভাবে মিলিয়েছিলেন তা তাঁর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও চন্দ্রিকার ভূমিকার সঙ্গে জড়িত।

আধুনিক অর্থে 'কলিকাতা কমলালয়' কলকাতা সম্পর্কে গাইডবুক—"এতদ্‌গ্রন্থ পাঠে বা শ্রবণে অনায়াসে এখানকার ব্যবহার ও রীতি ও বাক্‌চাতুরী ইত্যাদি আশু জ্ঞাত হইতে পারিবেন।"

'কলিকাতা কমলালয়' (১৯২৩)-এ ভবানীচরণ আত্মরক্ষার ভয়ে প্রকট নন, বরং স্টাইলের সহজ বিস্তারে ও সাবলীলতায় কিছু নিরুদ্‌বেগ। কমলালয়ে তিনি যে-ফর্মটি তৈরি করেছিলেন, তার ভিতরই নগরজীবনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব ধরা পড়ে। বইটিতে শহরে আসা গ্রামের লোককে কোনো-এক নগরবাসী শহরের আদব-কায়দা যে-ভাবে শেখাচ্ছে ও গ্রামের লোকটি যে-ভাবে একটির পর একটি প্রশ্ন তুলছে— তাতে লেখকের পক্ষপাত বারবারই গ্রামবাসীর দিকে ঝুঁকে পড়ে আর বারবারই নাগরিক আত্মসচেতনতায় তিনি নগরবাসীকে সমর্থন করেন। লেখকের পক্ষপাতের এই দ্বন্দ্বে কলকাতা শহরের বাঙালি জনসংগঠনের অন্তর্দ্বন্দ্ব যেমন ধরা পড়ে, তেমনি ভবানীচরণের মতো একজন লেখকের সহানুভূতি ও মতাদর্শের দ্বন্দ্বও বাস্তব হয়ে ওঠে। ভবানীচরণকে এই বাস্তবতাতেই ভাষা ব্যবহার করতে হয়েছে।

১. বি. প্র [বিদেশীর প্রশ্ন] ···আমার বাসস্থান পল্লিগ্রাম সেই নিবিড় বনমধ্যে বসিয়া শুনিয়াছি সত্যমিথ্যা ধর্ম্ম জানেন যে কলিকাতার অনেক ভাগ্যবান্ লোক আপন সন্তানদিগ্যে অপূর্ব্ব আভরণ ও বস্ত্রাদি দেন আর বিবাহাদি কর্ম্মে কেহ এক লক্ষ কেহ দুই তিন চারি পাঁচ লক্ষও হইবেক অত্যানন্দে ব্যয় করিয়া থাকেন কিন্তু শুনিতে পাই আপন সন্তান দিগ্যের বিদ্যাবিষয়ে

মনোযোগের অত্যন্ত অল্পতা যেহেতু স্বজাতীয় ভাষা ও অক্ষর শিক্ষার্থে একজন ব্যাকরণাদি শাস্ত্র ব্যুৎপন্ন লোককে কিঞ্চিৎ অধিক বেতন দিয়া না রাখিয়া হ্রস্ব দীর্ঘ ইত্যাদি বিবেচনাশূন্য কেবল অঙ্কশাস্ত্রে কিঞ্চিৎ জ্ঞানাপন্ন লোককে কিঞ্চিৎ বেতন প্রদানে রাখিয়া তাহাই শিক্ষা করান…যদি ধনব্যয় বিবেচনা করি তবে আভরণাদি ও সূতিকা ষষ্ঠী পূজা অবধি পর্য্যন্ত ব্যয়ের খাতা দেখিলে বা শুনিলে আককেল গুড়ুম হয়…

ন. উ [নগরবাসীর উত্তর]…আমার দৃষ্টচয় প্রায় অনেক ধনিলোকের সন্তান অপূর্ব্ব২ গুণবান তবে দুই চারিজন নির্গুণ এ সহরের মধ্যে থাকিতে পারেন …আভরণ ও সূতিকা পূজাদি কর্ম্মে অধিক ধনব্যয় করণের কারণ-শুন সেই সন্তানের জননীর প্রীত্যর্থে এবং সর্ব্বত্র আপন ঐশ্বর্য প্রকাশার্থ. কেহ২ লোকোপকরার্থ এক কর্ম্ম উপলক্ষ করিয়া অধিক ব্যয় করেন…

['কলিকাতা কমলালয়'। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস। পৃ ৩৫]

২. বি. প্র. …সম্প্রতি শুনিয়াছি যে কলিকাতায় নানা শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া অতি কোমল ভাষায় এবং সংস্কৃত মূল রাখিয়া তাহার অর্থ অতি সুগম সাধু-ভাষাতে নানাপ্রকার গ্রন্থ হইতেছে ঐ সকল পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করণার্থ সবিস্ক্রিপসিয়ান না কি, বলিয়া থাকে কে জানে পাড়াগেঁয়ে মানুষ সকল বুঝি না অর্থাৎ চাঁদা করে কোন গ্রন্থের মূল্য ৪।২।৩ ইত্যাদি স্থির করিয়া ধনি লোকের নিকট লইয়া যায় তাহাতে কেহ কহেন আমাব বাঙ্গালা গ্রন্থে কিছু প্রয়োজন নাই কেহ বলেন এ সকল বালকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত হইতেছে আমারদিগের ইহাতে আবশ্যক কি…

[ঐ। পৃ ৩৮]

এর উত্তরে 'নগরবাসী' একটা লম্বা বক্তৃতা দিয়েছে। সে বক্তৃতার আপাতলক্ষ নগরের বড়লোকদের সমর্থন করা। কিন্তু সেই উদ্দেশ্যে নগরের লোকদের যে-শ্রেণীভাগ করা হয়েছে তাতে ভবানীচরণের দৃষ্টির একটি বিশেষ ভঙ্গি ধরা পড়ে। 'একজন মুদী কায়স্থ, মুদীখানার দোকান করিয়া কিঞ্চিৎ সংস্থান করিয়াছে বাটী ঘর দরজাও পাকা বটে', 'আর একজন চিকিৎসক বেশ ধারী হস্তে ঔষধের একটা ডিপা আছে হাড়ি শুঁড়ি ডোম ইত্যাদি লোকের জড়িবড়ি লতা ইত্যাদির দ্বারা চিকিৎসা করে', 'এক ব্যক্তি তাঁত বোনা তাঁতি. চিরকাল তাঁত বুনিয়া অপূর্ব্ব অট্টালিকা করিয়াছে', 'আর একজন কড়ি কিংবা পয়সা ব্যাচা বেণে', 'একজন তেলি. কেবল দাঁড়ি পাল্লা ধবিয়া তুলা বিক্রয় করে তাহাতে ধনোপার্জ্জন দ্বারা

সংগতি করিয়া নানাপ্রকার ঐশ্বর্য করিয়াছে', 'এক ব্যক্তি কামার কেবল লোহা পিটাইত, পরে কলিকাতায় জিউলরি অর্থাৎ সোনারূপার হীরকাদি দ্বারা আভরণ প্রস্তুত করিয়া কিঞ্চিৎ ধন সঞ্চয় করিয়াছে', 'একজন সদ্গোপ কৃষিকর্ম্মে পারগ বড়, কেবল তাহাই বুঝিতে দক্ষ, তাহার অট্টালিকা বাটী···' —এঁদের কারো কাছে বই বিক্রি করতে গেলে তারা বলবেই 'এই ছাপওয়ালাদিগের জ্বালায় আর প্রাণ বাঁচে না সর্ব্বদাই আইসে'। 'অতএব ধনীলোক মাত্রেই পুস্তকের মর্ম্ম বুঝে এবং গ্রাহক হয় এমত নহে ঐ সকল জাতির মধ্যে যাঁহারদিগের বিদ্যাবিষয়ে অধিক আলোচনা আছে তাঁহারদিগের নিকট লইয়া গেলে অবশ্যই অনুষ্ঠানপত্রে স্বাক্ষর করিয়া থাকে।'

কলকাতা শহরের জনবিন্যাস ও সমাজসম্পর্ক নিয়ে ভবানীচরণের ধারণা এ রকমই স্পষ্ট ছিল। নগরবাসীর উত্তরে বড়লোক শ্রেণীর ভিতরেও তিনি যে-ভাগ করেছেন তাতে বর্ণহিন্দুসমাজের ঐতিহ্যের টান অত্যন্ত প্রবল। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে কায়স্থ-মুদি-তেলি-তাঁতি-সদ্গোপ বড়লোকের নিন্দা করার ছলে কি কোথাও নিহিত ছিল কলকাতা শহরের বড়লোকিয়ানারই বিশেষ সংস্কৃতিহীনতার প্রতি ইঙ্গিত ? এই লেখাটুকুর মধ্যে ভবানীচরণের পরবর্তী সমাজতত্ত্বের সংকেত নিশ্চয়ই আছে যখন তিনি বর্ণহিন্দুগোষ্ঠীকেই কলকাতার সমাজের ওপর আরোপ করেছিলেন। কিন্তু এই লেখাটিতে ভবানীচরণের উদ্দেশ্য কী ছিল— শহরে আসা গ্রামবাসীর প্রশ্নগুলি দিয়ে কলকাতার অভিজাত শ্রেণীর সমালোচনা ? অথচ তাঁর নিজের প্রয়োজন ছিল সেই অভিজাতশ্রেণীরই সমর্থন ? সেই সমর্থনই কি আদায় করতে চাইছিলেন নগরবাসীর প্রত্যুত্তরের ব্যাজসমর্থনে আর গ্রামবাসীর প্রশ্নের গূঢ় বাস্তবতায় ?

ব্যক্তিজীবনে তিনি যেমন ছিলেন কলকাতারই নাগরিক, তাঁর কর্মক্ষেত্রও তো ছিল এই কলকাতা শহরই। এই কলকাতার সাহেব-কোম্পানি, বেনিয়ান-মুৎসুদ্দি ইত্যাদিদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখার প্রয়োজন ছিল তাঁর জীবিকারও কারণে, সাংবাদিকতারও কারণে। আর এই জটিল অস্তিত্বের বাস্তবতায় তিনি কলকাতা মহানগর সম্বন্ধে এক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন—সে-সিদ্ধান্তে কলকাতার ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি যেমন অবহিত, তেমনি আবার সেই ঐতিহাসিক অস্তিত্বের আত্মবৈপরীত্যের, কখনো-কখনো হাস্যকর বাস্তবতা সম্পর্কেও তিনি সচেতন।

এই বিশেষ ধরনের সচেতনতার জন্যই বাঙালি লেখকদের মধ্যে ভবানীচরণই

প্রথম এমন সচেতন স্টাইল আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন—যাতে কণ্ঠস্বরের স্পন্দন কখনো-বা ধরা পড়ে, আবার কখনো যুক্তির আপাত-অসংগতিতে বাক্যের গঠন ভেঙে যেতে চায়। আবার, অচেতনেই তিনি ভাষার এমন ভঙ্গি আয়ত্ত করছিলেন যেখানে মনোভাব গোপন থাকে, যেখানে আলংকারিকতা বাস্তবতাকে ভেঙে দিতে পারে। এই সবের ভিতর দিয়ে একজন ব্যক্তিকে যেন দেখতে পাওয়া যায় যিনি এই কলকাতা শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, চাকরি করছেন. নানা রকম লোকের সঙ্গে মিশছেন, নানা রকম লোকের তোষামোদি করতে বাধ্য হচ্ছেন, নিজে একটি প্রেস চালাচ্ছেন আবার এই সামগ্রিক আজগুবি অস্তিত্ব নিয়ে কিছুটা হাসতেও পারছেন. কিন্তু সে-হাসি তাঁকে গোপনও করতে হচ্ছে বা হাসির একটা অন্য সামাজিক অর্থ আরোপ করতে হচ্ছে।

ভবানীচরণের এই আত্মসচেতনতা ধরা পড়ে কলকাতা নগরের বাঙালি জন-বিন্যাসকে ও কলকাতার নতুন তৈরি হতে থাকা বাংলা ভাষাকে তিনি কমলালয়ে যেভাবে সাজিয়েছিলেন সেই ছক দুটিতে।

কলকাতাকে কমলালয় অর্থাৎ সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা ধরে তিনি ব্যাখ্যা করেন 'কলিকাতা মুদ্রারূপ অপেয় অগাধ জলে পরিপূরিতা হইয়াছে বৃহৎ কর্ম্মকালে মুদ্রাজল নির্গত হইয়া নানা দিগদেশগামি হইতেছে নানাবিধা মুদ্রা নদীর নিরন্তর গমনাগমন হইতেছে' (পৃ ১৩)। কলকাতার এই সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনায় কিন্তু তার অন্য কোনো বৈশিষ্ট্যকে তিনি প্রাধান্য দেন নি। যদিও পরবর্তী অংশে সামাজিক ব্যবহারবিধিই তাঁর লেখার বিষয় কিন্তু কলকাতা শহরের পরিপ্রেক্ষিত তাতে কখনোই অস্পষ্ট নয়। ঠিক এর পরই গ্রাম থেকে যারা শহরে আসে তারা কী কী পদ্ধতিতে শহরে নিজেদের জায়গা করে নেয় তার বর্ণনা আছে। প্রথমে তারা এসে কোনো চেনাজানা লোকের বাড়িতে থাকে ও আটঘাট বোঝে। তাবপর, শহরের লোক যে-কাজ করতে চায় না, গ্রাম থেকে আসা লোক 'তাহা অকুতোভয়ে অঙ্গীকার করিয়া থাকেন'। তারপর, 'যে-সকল কর্ম্মে দুই শত টাকা বেতন লভ্য হয় সে কর্ম্ম তাঁহারা অত্যল্প বেতনে অঙ্গীকার করেন।' তারপর, বাড়ির সকলের হুকুম মতো কাজ করে নেন। তারপর গ্রাম থেকে পরিবার আনেন। কিন্তু পারিবারিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের জন্য গ্রামের বাড়িতে যান।

উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে কলকাতা শহরে জীবিকার জন্য বাঙালি মধ্যবিত্তের অন্তর্দ্বন্দ্ব, সংকীর্ণ চাকরির বাজার—এ-সবই ভবানীচরণের দৃষ্টিতে পড়েছিল।

এই মিশ্রিত জনসংখ্যা বাংলা ভাষার ওপর যে-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে ভবানীচরণ তাও লক্ষ করেছেন। তিনি ১৮২টি শব্দের এক তালিকা এখানে দিয়েছেন। এই তালিকা ছাড়া অন্য কোনো সাক্ষ্যেই সম্ভবত জানা যায় না যে তখন প্রধানত কোন শব্দগুলি বেশি ব্যবহৃত হত। এই ১৮২টি শব্দই আরবি-ফারসি শব্দ। তার সংস্কৃত অর্থও এখানে দেয়া আছে। ভবানীচরণ ভাষাব্যবহারের বেলায় বাস্তব যুক্তি দিয়েছেন ও কোনো সংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন হন নি। 'যে সকল শব্দের অর্থ বাঙ্গালা ভাষায় হয় না অথবা সেইমত শব্দ তোমার সংস্কৃত বা তদনুযায়ি শব্দেও নাই তাহার কি কর্ত্তব্য।' এর উদাহারণ হিশেবে তিনি ১৩১টি আরবি-ফারসি ও ইংরেজি শব্দ দিয়েছেন। এই শব্দগুলিকে তিনি বাংলা শব্দ-ভাণ্ডারের অংশ হিশেবেই গ্রহণ করতেন। এর ভিতর বড়জোর ১৫টি শব্দ মাত্র বাংলায় এখন আর ব্যবহৃত হয় না—বাকি সব শব্দই এখনো ব্যবহৃত হয়। বাংলা শব্দ সম্পর্কে ভবানীচরণের ধারণা নির্ভুল ছিল।

'কলিকাতা কমলালয়'-এ একটি বড় অংশে দল, দলপতি ইত্যাদির ব্যাখ্যা—বর্ণনা করা হয়েছে। বিদেশীর প্রশ্নকে ভবানীচরণ পরপর সাজিয়ে দিয়েছেন—

> "১ প্র। এই যে অনৈক্য না হইলে দল হয় না ইহাতে ভদ্রলোকের অনৈক্যতার কারণ কি,। ২ প্র,। দলপতি মহাশয়েরা চেষ্টা করিয়া কি দল করেন,। ৩ প্র,। দলপতির ইহাতে লভ্য কি,। ৪ প্র,। দলপতির দিগের দলস্থ সকলকে বশীভূত রাখিতে কিছু ব্যয় হয় কি না,। ৫ প্র,। দলস্থ সকলে দলপতির সহিত কিরূপ ব্যবহার করেন,। ৬ প্র,। দল করিবার ফল কি,। ৭ প্র,। কোন লোক যদি কাহার দলাক্রান্ত না হয় তাহাতে ক্ষতি কি,। ৮ প্র,। এক ব্যক্তি কোন দলভুক্ত আছে সে ব্যক্তি সে দল পরিত্যাগ করিয়া অন্য দলে যাইতে পারে কি না,। ৯ প্র,। দলপতিরা আপন স্বেচ্ছায় কাহাকেও ত্যাগ করেন কিনা,। ১০ প্র,। এক২ জাতির কি এক২ দল,। ১১ প্র,। ব্রাহ্মণেরা কি দলপতি কি ধনীলোক, বা রাজদত্ত সম্মানিত ব্যক্তি দলপতি হইয়া থাকেন···"

['কলিকাতা কমলালয়'। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস। পৃ ২৬]

এই প্রশ্নমালা থেকে বোঝা যায় ভবানীচরণ নাগরিক বাঙালি হিন্দুর নতুন সমাজবিন্যাসের কথাটি বলতে চান। এখানে আর কলকাতা শহর তাঁর আলোচ্য নয়, কলকাতা শহরের বাঙালিদের যে-অংশের তিনি প্রতিনিধি সেই অংশের কথাই তিনি বলছেন। এই সব প্রশ্নের উত্তরে নগরবাসী নানা কথা বলেছে।

বিশেষ করে দলপতির ভূমিকার যে-ব্যাখ্যা নগরবাসী দিয়েছেন তাতে বোঝা যায় ভবানীচরণ এই ব্যবস্থাকে নাগরিক জীবনে বাঙালি হিন্দুব আত্মরক্ষার উপায় বলে গ্রহণ করেছিলেন।

"আপন দলের মধ্যে কোন ব্যক্তির বাটীতে কোন বৃহৎ কর্ম্ম অর্থাৎ পুরাণ আরম্ভ সমাপন দিবসে এবং পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম উপস্থিত হইলে ঐ ব্যক্তি দলপতির নিকটে আসিয়া আপন বিষয় অবগত করান এবং আপন বিভব অনুসারে ব্যয় করিবার ক্ষমতাও জানান তিনি সেই ব্যয়ের [উ]পযুক্ত লোক নিমন্ত্রণ করিবার ফর্দ্দ করিয়া দেন আপন দলের নৈকষ্য ভাবাপন্ন কুলীন ব্রাহ্মণ এত, ভঙ্গ কুলীন এত, অধ্যাপক এত, সেই ফর্দ্দ প্রমাণ নিমন্ত্রণ হয়···"

[ঐ। পৃ ২৭]

এর পরে ভবানীচরণ এই রকম নিমন্ত্রণের ও তাতে দলপতির ভূমিকার যে-বিবরণ দিয়েছেন তাতে বোঝা যায় তিনি একটি সম্পন্ন হিন্দু গ্রামের জনবিন্যাস, ব্যবহারবিধি ও সামাজিকতা—কলকাতার নাগরিক সমাজের ওপর সম্পূর্ণ আরোপ করছেন। ১৮৩০-এ 'ধর্মসভা' প্রতিষ্ঠিত হলে এই ব্যবস্থাটিই একটা কর্মসূচির আকার নেয়। ভবানীচরণ সেই কর্মসূচি রূপায়ণের নেতা হন। তাঁর চন্দ্রিকা ও চন্দ্রিকায় তাঁর রচনাগুলি সেই কর্মসূচির পক্ষে জনমত তৈরির কাজে নিয়োজিত হয়।

১৮৩০-এর ১৭ জানুয়ারি সংস্কৃত কলেজের এক সভা থেকে ধর্মসভা সংগঠিত হয় ও তার পরে সে-বিষয়ে এক কর্মসূচি নেয়া হয়। 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় প্রকাশিত সেই সব বিবরণ থেকে বোঝা যায়—'কলিকাতা কমলালয়'-এর হিন্দু নাগরিক বাঙালির কলকাতার বাস্তব চেহারাটা কী ছিল। 'ধর্মসভা'র চাঁদা দিতে যাঁরা অঙ্গীকার করেছিলেন তাঁদের তালিকাও বেরিয়েছিল। সেই তালিকা থেকেও একটা প্রমাণ পাওয়া যায় যে ভবানীচরণ বাঙালি সমাজের কোন্ অংশের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। ৫৬ জনের এই তালিকায় ব্রাহ্মণের সংখ্যার (২১) চাইতে অব্রাহ্মণ হিন্দুব সংখ্যা বেশি। অব্রাহ্মণ হিন্দুদের মধ্যেও কুলীন কায়স্থের সংখ্যা কম। হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য। কিন্তু কলকাতার হিন্দু সমাজে অব্রাহ্মণ বা অনেক সময় উচ্চবর্ণের বাইরের বড়লোক হিন্দুদের নেতৃত্বই মানতে হত। অর্থাৎ, ভবানীচরণ এই বাস্তবতা মেনে নিয়েছিলেন যে নাগরিক বাঙালির সামাজিক সংগঠনে নতুন নেতৃত্ব নির্ধারিত হবে নাগরিক জীবনে টাকা-পয়সা উপার্জনে ইংরেজদের সহযোগিতায় সাফল্যের নিরিখে।

সমাচার চন্দ্রিকা। ২৩ জানুয়ারি ১৮৩০

ধর্ম্ম বিষয়ে সভা।—৫ মাঘ ১৭ জানুআরি রবিবার সংস্কৃত কালেজে কলিকাতাস্থ হিন্দু বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী প্রধান লোকেরদিগের এক সভা হইয়াছিল ঐ সভায় সম্ভ্রান্তসমূহ সমাগত হইলে প্রথম শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কহিলেন সতীর বিষয়ে যে আরজী শ্রীশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেণ্টিঙ্ক গবরনর জেনরল বাহাদুরকে দেওয়া গিয়াছিল তাহার যে উত্তর পাওয়া গিয়াছে তাহা আপনারা শ্রবণ করুন সকলের অনুমত্যনুসারে শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব পাঠ করিলেন তাহার স্থূল তাৎপর্য্য সতীনিবারণের যে আইন হইয়াছে তাহা রহিত করিবেন না এবং প্রার্থনাকারিরা যদি এবিষয় বিলাতে শ্রীযুত বাদশাহের নিকট আপীল করেন তবে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর সেই আরজী তুষ্টিপূর্ব্বক বিলাতে পাঠাইয়া দিবেন এতৎশ্রবণে সভ্যগণেরা কহিলেন যে সতীবিষয়ে বিলাতে আপীল করা কর্ত্তব্য এবং শ্রীশ্রীযুতের নিকট প্রার্থনা এই কর্ত্তব্য যে পর্য্যন্ত বিলাত হইতে আমারদের প্রার্থনার উত্তর না আইসে তাবৎকাল সতীহওনের যে রীতি ছিল তাহাই থাকে। অপর প্রশ্ন হইল বিলাতে যে আরজী দেওয়া যাইবেক এবং শ্রীযুত বড় সাহেবের নিকট যে প্রার্থনাপত্র দিতে হইবেক কি রীতিক্রম প্রস্তুত করিতে হইবেক তাহাতে প্রথম শ্রীযুত বাবু রাধাকৃষ্ণ মিত্রকর্ত্তৃক উক্ত হইল যে এই সভ্যগণেরদিগের মধ্যে ১২ জন বিবেচক স্থির হউন তাঁহারাই তদ্বিষয় বিবেচনা কবিবেন ঐ কথা তাবতের সম্মতহওয়াতে শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিক শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেব শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব শ্রীযুত বাবু তারিণীচরণ মিত্র শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ মল্লিক শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর শ্রীযুত বাবু আশুতোষ সরকার শ্রীযুত বাবু গোকুলনাথ মল্লিক শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিক শ্রীযুত বাবু নীলমণি দে এই ১২ জন বিবেচক এবং কর্ম্মনির্ব্বাহক শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মনোনীত হইলেন পরে বন্দ্যোপাধ্যায়কর্ত্তৃক কথিত হইল যে আমারদিগের সর্ব্বসাধারণের বৈঠক নিমিত্তে একটা স্থান হইলে ভাল হয় তাহাতে সর্ব্বসাধারণের বৈঠক হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রাদি বিষয় বিবেচনা করা যাইতে পারে ইহাতে সকলের মত হইল। অনন্তর প্রশ্ন হইল এ সকল ব্যয়সাধ্য ব্যাপার যদ্যপিও এই নগর মধ্যে এবং মফঃসলে এমত হিন্দু অনেক আছেন যে ধর্ম্মরক্ষাহেতুক বিশ পঁচিশ পঞ্চাশ হাজার লক্ষ দুই লক্ষ টাকা অনায়াসে এক ব্যক্তি দিতে পারেন কিন্তু এক জনে

দেওয়া উচিত হয় না ইহা সর্ব্বসাধারণের বিষয় ইহাতে বাবু রাধাকৃষ্ণ মিত্র কহিলেন যে আমি বলি একটা চাঁদা হইলে ভাল হয় সভ্যগণ ঐ কথায় সন্তুষ্ট হইয়া আপন ২ নাম স্বাক্ষর করিয়া অঙ্কপাত করিলেন তদ্বিশেষঃ।

নাম।		টাকা।
শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিক	…	২৫০০
— গোকুলনাথ মল্লিক	…	২০০০
— আশুতোষ দে	…	১০০০
— গোপীমোহন দেব	…	৫০০
— হরিমোহন ঠাকুর	…	৫০০
— বৈষ্ণবদাস মল্লিক	…	৫০০
— কাশীনাথ মল্লিক	…	৫০০
শ্রীযুত বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	…	৫০০
সংস্কৃত কালেজের পণ্ডিত প্রভৃতি	…	২৫০
শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর	…	২০০
শ্রীযুত বাবু শিবনারায়ণ ঘোষ	…	২০০
— রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়	…	২০০
— রামমোহন দত্ত	…	২০০
— নীলমণি দে	…	২০০
— প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস	…	২০০
— গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	…	২০০
— ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	…	১০০
— রামকমল সেন	…	১০০
— ভবানীচরণ মিত্র	…	১০০
— জগন্নাথ দাস বর্ম্মণ:	…	১০০
— শিবচন্দ্র দাস	…	১০০
— ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়	…	১০০
— কৃষ্ণচন্দ্র বসু	…	১০০
— রাধাকৃষ্ণ মিত্র	…	১০০
শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার	…	১০০
শ্রীযুত বাবু গুরুপ্রসাদ বসু	…	৫১

নাম।		টাকা।
শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়	...	৫০
— শিবচরণ ঠাকুর	...	৫০
— রূপনারায়ণ ঘোষাল	...	৫০
— মদনমোহন সেন	...	৫০
— মধুসূদন রায়	...	৫০
— রাজবল্লভ শীল	...	৫০
— চন্দ্রশেখর মিত্র ও শ্রীযুত বাবু ভোলানাথ মিত্র		৫০
— জয়নারায়ণ মিত্র	...	৫০
— দেবনারায়ণ দেব	...	৫০
— তারিণীচন্দ্র মল্লিক	...	৫০
— কালীকান্ত বিদ্যাবাগীশ	...	৫০
— শিবনারায়ণ দে	...	২৫
শ্রীযুত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন	...	২৫
শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১৬
— কালীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১০
— লক্ষ্মীনারায়ণ পণ্ডিত	...	১০
— ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়	...	৫
— শ্যামচাঁদ দাস	...	৫
— তারাচাঁদ মজুমদার	...	৫
শ্রীযুত পার্ব্বতীচরণ তর্কভূষণ	...	৫
শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র বিদ্যারত্ন	...	২
শ্রীযুত বৈদ্যনাথ আচার্য্য	...	১
		১১২৬০

পরে প্রশ্ন হইল অদ্য দিবাবসান হইল সভা ভাঙ্গিবার সময় হইয়াছে ইহার পর স্বাক্ষর করিবার নিমিত্তে বহী সর্ব্বত্র পাঠান যাইবেক কি না তাহাতে উত্তর হইল হিন্দু ধার্ম্মিকের নিকট অবশ্য পাঠান যাইবেক এক টাকা অবধি লওয়া যাইবেক যাহার যেমত স্বেচ্ছা তিনি তাহাই দিবেন। অনন্তর প্রশ্ন এই টাকা আদায় হইয়া কাহার নিকট থাকিবেক তজ্জন্য শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিক

ধনরক্ষক স্থির হইলেন এবং যাহাতে ব্যয় হইবেক তাহার অনুমতি উপর উক্ত বিবেচকেরা বিবেচনা করিয়া অনুমতি দিবেন নির্ব্বাহক তাবৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন এবং যখন সভা করিতে হয় ও ধর্ম্ম সভাধ্যক্ষেরদিগের অনুমতি লইয়া সর্ব্বত্র পত্র পাঠাইবেন।

এই সভায় শ্রীযুত বাবু গোকুলনাথ মল্লিক প্রশ্ন করিলেন যে সকল লোক হিন্দু অথচ আমারদিগের হিন্দুধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হইয়া বিপরীত মতাবলম্ব করিয়াছেন বা করিবেন তাঁহারদিগের সহিত আহার ব্যবহারাদি রহিত করিতে হইবেক ইহাতে সভ্যগণ কহিলেন ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য বটে।

কিন্তু অদ্যকার সভায় কাহারো নামোল্লেখ হয় নাই আমরা অনুমান করি যদ্যপি এমত লোক কেহ থাকেন তাঁহারদিগের নাম আগামি কোন বৈঠকে হইতে পারিবেক আমরা এই ধর্ম্মসভার বিষয়ে যখন যাহা জ্ঞাত হইব তখনি তাহা পাঠকবর্গকে জ্ঞাত করিব।

[স. সে. ক. ১। ২৬৬-৬৯]

সমাচার চন্দ্রিকা। ৩০ জানুয়ারি ১৮৩০

ধর্ম্মসভার আনুকূল্যে যে সকল টাকা চাঁদায় সহী হইতেছে তাহার বেওরা চন্দ্রিকায় প্রকাশ হইতেছে গত বৃহস্পতিবারের চন্দ্রিকায় নীচে লিখিত টাকার সহী দেখিতেছি।

শ্রীযুত বাবু প্রাণনাথ চৌধুরী।		৫০০
—	রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর।	৫০০
—	মধুসূদন সাণ্ড্যাল।	৩০০
—	উদয়চাঁদ দত্ত।	২০০
—	জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।	১০০
—	নবীনচন্দ্র বসু।	৫০
—	ভবানীপ্রসাদ ঘোষ।	৫০
—	শিবচরণ বসু।	৩৫

এতদ্ব্যতিরেকে এগারো জনে অষ্টআশী টাকার সহী করেন।

[স. সে. ক. ১। ২৬৯]

সমাচার চন্দ্রিকা। ৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০

ধর্ম্মসভা। — হিন্দু বিশিষ্ট শিষ্টবর্গ প্রতি বিজ্ঞাপনমিদং।

আমারদিগের দেশে ধর্ম্মশাসনকর্ত্তৃত্বাভাবে ধর্ম্মহানি হইতেছে অতএব স্বধর্ম্ম

ও সদাচার ও সদ্ব্যবহারাদিরক্ষার্থ বিশিষ্ট শিষ্টসমূহের ঐক্য হইয়া সর্ব্বদা সদুপায় চেষ্টা আবশ্যক হয় কিন্তু অনেকে একত্র হওয়া দুঃসাধ্য যেহেতুক পরস্পর কেহ কাহার বাটীতে স্বগণব্যতিরেকে আহ্বান ও গমন করেন না এবং সর্ব্বসাধারণের বৈঠক নিমিত্ত কোন নিরূপিত স্থান নাই অস্মদাদির ঐক্য বাক্য থাকাতেও একত্রহওনাভাবে অনৈক্য বোধ করিয়া বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বিরা আমারদিগের ধর্ম্মহানির নিমিত্ত নিয়ত চেষ্টা পাইতেছে একারণ বর্ত্তমান শকের গত ৫ মাঘের এতন্নগরস্থ বহুতর ভদ্রলোক একত্র হইয়া ধর্ম্মসভা নামে এক সমাজ স্থাপন করিয়াছেন ঐ ধর্ম্মসভার নিমিত্ত এই মহানগরমধ্যে এক বাটী প্রস্তুত হইবেক।

এবং সংপ্রতি সহমরণনিবারণের যে আইন হইয়াছে তাহাতে শ্রীশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের আজ্ঞানুসারে বিলাতে শ্রীলশ্রীযুত বাদশাহের নিকটে আপীল করিতে হইবেক।

[স. সে. ক. ১। ২৬৯]

'কলিকাতা কমলালয়'-এর সময়ই ভবানীচরণ পরিস্থিতির স্ববিরোধিতার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তিনি হিন্দুর প্রাচীন আচার-পদ্ধতি রক্ষা করতে চান কিন্তু জানেন যে কলকাতা শহরে ব্রাহ্মণপ্রধান সেই হিন্দুসমাজের পুনরুদ্ধার অসম্ভব। তিনি কলকাতার হঠাৎ-নবাবদের নিয়ে বা বড়লোকের গণ্ডমূর্খ পুত্রদের নিয়ে 'কলিকাতা কমলালয়'-এ ঠাট্টা করেন অথচ তাদের ভরসাতেই হিন্দুসমাজ পুনর্গঠনের কর্মসূচি নিতে বাধ্য হন। তিনি কলকাতার মুদি-ছুতোর-কাপড়ের ব্যবসায়ী বড়লোকদের কমলালয়ে উপহাস করেন ও তাঁরা শিল্পব্যাপারে কতটা অনাগ্রহী তা সবিস্তারে বলেন অথচ 'ধর্মসভা'র চাঁদার খাতায় তাদের সই সংগ্রহ করতে বেরন। 'কলিকাতা কমলালয়', 'নববাবুবিলাস' ও 'নববিবিবিলাস'-এ ভবানীচরণ তাঁর স্ববিরোধিতা একটা অপরিণত শিল্পের চেহারায় কিছুটা প্রকাশ করতে পারেন কিন্তু 'ধর্মসভা'র প্রতিষ্ঠার পর আর সেই সূক্ষ্ম রসিকতাবোধ রচনায় কার্যকর হতে পারে না। তখন বরং ঐ স্ববিরোধিতাকেই একটা যুক্তির কঠিন কাঠামোর মধ্যে ঢোকাতে হয়।

'কলিকাতা কমলালয়'-এ আমরা দেখেছি বিদেশীর প্রশ্নের ভিতর কী ভাবে ভবানীচরণের সমালোচনাই নিহিত থেকেছে ও নগরবাসীর উত্তরের দুর্বলতা সেই নিহিত সমালোচনাকেই পরোক্ষ সমর্থন দিয়েছে। 'নববাবুবিলাস', 'দূতীবিলাস' ও 'নববিবিবিলাস'-এ তাঁর সমালোচনার ভিতর কোনো দ্বিধাও কাজ করে নি।

সেখানে আমরা প্রায় যেন ঈশ্বর গুপ্তের আগেই ঈশ্বর গুপ্তের ও আলালের আগেই আলালের স্বাদ পাই। 'দূতীবিলাস'-এ আধুনিক বড়লোকের বাড়ির মেয়েদের মজলিশের বর্ণনা—

"ভোজনান্তে সকলে বসিল সভা করি।
তাকিয়া লাগায় তারা লজ্জা পরিহরি ॥
গোপী দাসী সাজি আনি দিল পানদান।
কত মত ভুকুটি করিয়া পান খান ॥
কাহারো আলবোলা এলো কার গুড়গুড়ি।
সকলে তামুক খায় নবীনা কি বুড়ি ॥"

[দূতীবিলাস]

"ধন্য ধন্য ধাৰ্ম্মিক অবতার ধৰ্ম্ম প্রবর্ত্তক দুষ্টনিবারক সৎপ্রজাপালক সদ্বিবেচক ইংরাজ কোম্পানি বাহাদুর অধিক ধনী হওনের অনেক পন্থা করিয়াছেন এই কলিকাতা নামক মহানগর আধুনিক কাল্পনিক বাবুদিগের পিতা কিম্বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া স্বর্ণকার বর্ণকার কৰ্ম্মকার চৰ্ম্মকার চটকার মঠকার বেতনোপভুক হইয়া কিম্বা রাজের সাজের কাঠের খাটের মঠের ইটের সরদারি চৌকিদারি জুয়াচুরি পোদ্দারী করিয়া অথবা অগম্যাগমন মিথ্যাবচন পরকীয় রমণী সংঘটনকামি ভাড়ামি রাস্তাবন্দ দাস্য দৌত্য গীতবাদ্যতৎপর হইয়া কিম্বা পৌরোহিত্য ভিক্ষাপুত্র গুরুশিষ্যভাবে কিঞ্চিৎ অর্থসঙ্গতি করিয়া কোম্পানির কাগজ কিম্বা জমিদারি ক্রয়াধীন বহুতর দিবসাবসানে অধিকতর ধনাঢ্য হইয়াছেন।"

[নববাবুবিলাস]

'কলিকাতা কমলালয়' ও 'নববাবু বিলাস'-এ তাঁর এই দেখা ও বোঝার ক্ষমতা 'ধর্মসভা' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাঁর রচনাগুলিতে আর ব্যবহৃত হতে চায় না। কারণ যেখানে দেখা ও বোঝা অনেকদূর পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত—'ধর্মসভা'র মতাদর্শে। আর সেই পরিবর্তনের ভিতরও বৈপরীত্য কিছু কম ছিল না। কিন্তু সে-স্ববিরোধিতাকে স্বীকার করে নিয়ে ভবানীচরণ কোনো নতুন বোধে পৌঁছচ্ছেন না. বরং সেই স্ববিরোধিতাকে যুক্তিতে বাঁধতে চাইছেন। যে-সংগঠনকে তিনি ব্যবহার করতে চাইছেন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিশেবে, সেই সংগঠনেরই অন্তর্সংকট মেটাতে তাঁকে চোখ ঠারতে হচ্ছে কঠিন বাস্তবতা থেকে, তাঁকে আবেদন করতে হচ্ছে সভ্যদের কাছে।

একটি উদাহরণ দেয়া যাক।

১৮৩২-এর ২২ ডিসেম্বর 'জ্ঞানান্বেষণ'-এ খবর বেরিয়েছিল 'ধর্ম্মসভার দলে ভঙ্গদশা'। ভগবতীচরণ মিত্র ছিলেন ধর্মসভার নেতা। অথচ তিনি তাঁর মেয়ের বিয়ে দেন আঁদুলের মথুরানাথ মল্লিকের ভাগিনেয়ের সঙ্গে। মথুরানাথ মল্লিক 'ব্রহ্মসভা'র পক্ষপাতী ও সতীদাহ নিবারণের একজন প্রধান সমর্থক। এতে 'ধর্মসভা'র বিধি নিশ্চিতভাবেই লঙ্ঘিত হয়। 'জ্ঞানান্বেষণ'-এ বলা হয় ভবানী-চরণের পক্ষে এ-বিষয়ে মিত্রবাবুর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব নয়, 'মিত্র-বাবু রাগ করিলে সম্পাদকত্ব পদেরও পেঁচ পাঁচ ঘটিতে পারে।' এখানে সম্পাদকত্ব বলতে 'ধর্মসভা'র সম্পাদকত্বই বোঝায়।

এই সংবাদ বেরবার পরে চন্দ্রিকায় 'ধর্মসভা'র মাসিক বৈঠকের বিবরণ বেরয়। এই বৈঠক বসেছিল 'জ্ঞানান্বেষণ'-এর সংবাদের আগে। তাতে 'ধর্ম্মসভা সম্পাদকের উক্তি' বলে ভবানীচরণের একটি দীর্ঘ বক্তৃতা ছিল। 'ধর্মসভা'র এক দলপতি যাকে সমাজচ্যুত করে, অন্য দলপতি তাকে দলে নেয়। তখনকার এই অপবাদের বিরুদ্ধে এই বক্তৃতায় ভবানীচরণ প্রায় একটি তালিকা পেশ করেন 'অতএব ধার্ম্মিক মহাশয়েরা যে নিয়ম করিয়াছেন তাহা বিলক্ষণরূপে প্রতিপালিত হইতেছে'। কিন্তু প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বলেন,

> ·দলপতি বা দলস্থ প্রধান মহাশয়েরা অনেকে ধর্ম্মবিষয়ে ঐক্য আছেন বটে কিন্তু কোন২ ব্যক্তির সহিত যদি কাহার অন্য কোন বিষয়ঘটিত বিবাদ থাকে সেই বিবাদ উপলক্ষে ধর্ম্মসভার নিয়মরক্ষার পক্ষে ঐক্য থাকা ভার হয় কেন না এক ব্যক্তি একজনকে স্থগিত করিলে তাঁহার সহিত যাঁহার বিবাদ আছে সেই দলপতির নিকট গিয়া দোষি ব্যক্তি অনুনয় বিনয় করিয়া কহিলে তিনি আপন ক্ষমা বা পুরুষার্থ প্রকাশার্থ তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া লইতে পারেন কেননা মনে করিবেন আমি কাহার অধীন নহি এবং আমার দল আছে · ।
> ···যদি বল তাহা হয় না ধর্ম্মসভার যে নিয়ম হইয়াছে তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া এমত কর্ম্ম কে করিতে পারেন। উত্তর করিলে কি করা যায় সভাধ্যক্ষ মহাশয়েরদিগের হাকিমত্ব ভাব নাই যে তদ্দারা কেহ কাহার কিছু দণ্ড করিবার ক্ষমতা রাখেন তবে লোকলজ্জাভয় কিন্তু সভায় না আইলে সে ভয়ে কে ভীত হন ·
>
> [স সে. ক. ২। ৫৮১-৮২]

১৮৩০ সাল পর্যন্ত চন্দ্রিকায় এমন একটি বিষয় ভবানীচরণের আক্রমণের বড়

লোভনীয় উপলক্ষ হতে পারত। তাতে শ্লেষেব্যঙ্গে বা চাপা স্বরে তাঁর বাক্য-গঠনে নানা অসংগতি হয়তো দেখা দিত কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বরের ব্যক্তিত্বে সে-সবই সংগত হয়ে উঠত। আর এখানে প্রায় ত্রুটিহীন বাক্য পরম্পরায় একটি অবাস্তব পরিস্থিতিকেই ঐতিহাসিক পরিস্থিতি হিশেবে উপস্থিত করার কী করুণ চেষ্টা। ভবানীচরণ তাঁর প্রয়াসের এই অসংগতি জানতেন বলেই এই বক্তৃতার প্রথমাংশ তিনি ব্যয় করেছিলেন প্রায় নৈয়ায়িকসুলভ যুক্তিতে 'ধর্মসভা' ও তাঁর কর্তব্যের যুক্তি উত্থাপনে। যেন, সেই যুক্তিতেই এই ধরনের অসংগতিরও একটা ব্যাখ্যা মিলতে পারে।

·· শাস্ত্রজ্ঞানে এবং রাজশাসনের দ্বারা ধর্ম্ম রক্ষা হয় [।] এই উভয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত বিষয়বিরহ হইলেও রাজশাসনে ধর্ম্ম রক্ষা পায় [।] অরাজক হইলে শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরও ধর্ম্মরক্ষা করা সুকঠিন হয় [।] যখন২ অরাজক হইয়াছে তখনই ধাম্মিকগণে দলবদ্ধ হইয়া স্ব স্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন ··। আমারদিগের ভাগ্যহেতু ধর্ম্মপক্ষ রক্ষাবিষয়ে অরাজক হইয়াছে যেহেতুক ম্লেচ্ছ রাজা। ইঁহার মত এই স্ব স্ব জাতীয় ধর্ম্ম আপনারা রক্ষা করুন··· [।]

[স. সে. **ক. ২** । ৫৮১]

এই অংশটিতে ভবানীচরণ যুক্তির নিগড় কী ভাবে গড়েছেন তা বেশ দেখা যায়, যে-দাঁড়িচিহ্ন [।] নেই সেইগুলো লাগিয়ে পড়লে।

ভবানীচরণ যে-সংগঠনের কাজে নিজেকে যুক্ত করলেন ও তাঁর রচনাক্ষমতাকে ব্যবহার করলেন সে-সংগঠন তো নিজের ভারেই নিজে ভেঙে পড়ল। তাত্ত্বিক ভিত্তিশূন্য যে-সাংগঠনিক কাঠামো প্রায় সহস্র বৎসর ধরে বাঙালি হিন্দুসমাজ আত্মধ্বংসের ভবিতব্যের ভিতর নিজের এক সংকীর্ণ আত্মভুক অস্তিত্বের আশ্রয়রূপে রক্ষা করে আসছিল—এই ১৮৩০-এ সেই সংগঠনটিকে প্রতিরোধের সংগঠন হিশেবে খাড়া করার চেষ্টা হল। 'ধর্মসভা' তো সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কোনো কর্মসূচি নিতে পারে নি। নেয়া সম্ভবও ছিল না। তার অভাব তারা পূরণ করতে চেয়েছে কতকগুলি রীতিবিধি প্রতিষ্ঠা করে। সেই রীতিবিধিপালনও আবার নির্ভর করে সভ্যদের ইচ্ছার ওপর। কিন্তু সভ্যদের ইচ্ছা নিয়ন্ত্রণের অন্য কার্যকারণ তখন সমাজে নেই। ভারতবর্ষের ইতিহাসে কলকাতার মতো নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্রের কোনো নজির নেই। বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিশেবে কলকাতা নগর তখন ক্রমেই বেড়ে উঠেছে, তার নাগরিক হিশেবে ব্যক্তির ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে ও সেই ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার পরিপূরণই

ব্যক্তির জীবনের লক্ষ হয়ে উঠছে। অথচ 'ধর্মসভা' ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সামাজিক ভাবে সেই ব্যক্তির ওপরই কয়েকশ বৎসরের পুরনো এক জীবনাদর্শ চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা হচ্ছে। সামাজিকভাবে হিন্দু ও ব্যক্তিগতভাবে নাগরিক—এই দুই অস্তিত্বের ভিতর দীর্ণ বাঙালি হিন্দুসমাজকে সংহতি দেয়ার চেষ্টা চলছিল 'ধর্মসভা'র কর্মসূচিতে।

চন্দ্রিকা ও ভবানীচরণের এই স্ববিরোধিতা তখনই দেখেছিলেন তাঁর পরবর্তী সমকালীন প্রধানতম দুই বাঙালি সাংবাদিক—গৌরীশঙ্কর ভট্টাচায ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ভবানীচরণের সঙ্গে তাঁদের প্রতিযোগিতা করতে হয়েছে নইলে প্রতিষ্ঠিত চন্দ্রিকার পাশাপাশি তাঁরা নিজেদের কাগজ দাঁড়া করাতে পারতেন না। সে-প্রতিযোগিতায় গদ্যের লিখনশৈলীর মূল্য ছিল সবচেয়ে বেশি। তাঁরা ব্যবহার করছিলেন ভবানীচরণেরই অস্ত্র। সে-অস্ত্র তখন ভবানীচরণের হাতে প্রয়োগতৎ-পরতা হারিয়েছে। 'ধর্মসভা'র সম্পাদক ভবানীচরণের কাছে চন্দ্রিকা-সম্পাদক ভবানীচরণ হেরে গেছেন।

চন্দ্রিকার রচনাগুলি নিয়ে গৌরীশঙ্কর ও ঈশ্বরচন্দ্রের মন্তব্য দেখলে মনে হয়, ১৮৩০-এর আগের ভবানীচরণ, ১৮৩০-এর পরের ভবানীচরণকে নিয়েও এ-রকমই লিখতে পারতেন।

জ্ঞানান্বেষণ। ২৯ ডিসেম্বর ১৮৩২

> ধর্ম্মসভা কেবল গরীব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরই বিত্তচ্ছেদ করিতে পারেন যেহেতুক তাঁহারা কিঞ্চিৎ প্রত্যাশায় বাবুরদের নিকট ছায়ার ন্যায় উপাসনা করেন কিন্তু বড়লোকের প্রতি যে ধর্ম্মসভার নিয়ম সে কেবল সম্পাদকের মুখেই রহিয়াছে ফলে কিছুই হয় নাই নহিলে দেখুন ধর্ম্মসভার পরমধর্ম্ম যে স্ত্রীহত্যা তাবৎ ইঙ্গরেজেরা তাহাতে দ্বেষ করেন তথাপি ঐ সমাজাধিপতিরাও তাঁহারদিগের খোসামোদ করিয়া বেড়ান তাঁহারদিগের সাক্ষাতে কেহ এ কথা বলিতে পারেন না যে তোমরা হিন্দুর ধর্ম্মদ্বেষী কেননা যদ্যপি তাঁহারদের রাগ হয় তবে বেতন কাটা যাইবার সম্ভব তবে যে সম্পাদক বারবার বকেন ইহার কারণ তাঁহার অন্তরের বেদনা যেহেতুক তাঁহার হস্তের সুখ উঠিয়া গিয়াছে এখনও স্ত্রীহত্যাকরণের প্রত্যাশায় রাজ্যাধিপতির গোচরার্থে ওলাওঠা রোগে যে স্ত্রীলোক মরিয়াছে গত বৃহস্পতিবারের চন্দ্রিকায় তাহাকে পতিপ্রাণা সতী বলিয়া লিখিয়াছেন…

[স. সে. ক. ২ । ৫৮৬]

সংবাদ প্রভাকর। ১৬ এপ্রিল ১৮৪৮

·· প্রকাশ্য পত্রের সম্পাদক দিগের ধর্ম্মঘটিত কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে বদ্ধ হওয়া উচিত হয় না, বিশেষতঃ যে সকল বিষয় অতি প্রকাশ্য তাহার সহিত গুরুতর সম্বন্ধ রাখা আরো অধিক দোষের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক, যেহেতুক সংবাদপত্রের অধ্যক্ষেরা সকল বিষয়েই স্বাধীন, ও সকল বিষয়ের বিচারকস্বরূপ, সুতরাং তাঁহারদিগের লেখনীকে বিষয় বিশেষের অধীনী করা কোন মতেই বিচার্য হইতে পারে না, আমারদিগের সহযোগী যখন ধর্ম্মসভার সম্পাদক হইলেন তখন তাঁহার অভিপ্রায় ও লেখনীকে যাবজ্জীবনের জন্য উক্ত সভার নিকট বিক্রীত করিতে হইল · তৎকালীন চন্দ্রিকা পত্রে এক২ দিন দলঘটিত যে যে বিষয় প্রকটিত হইত তাহা পাঠ করিয়া আমরা হাস্য সম্বরণে অক্ষম হইতাম।

[সা. বা. স. ১। ১৬৮-৬৯]

৫

'সমাচার চন্দ্রিকা'র গদ্য

দর্পণ বেরিয়েছে ১৮১৮তে, আর চন্দ্রিকা ১৮২২-এ। ১৮৩১-এ 'জ্ঞানান্বেষণ' বেরতে শুরু করে ও 'সংবাদ প্রভাকর' শুরু হয়েও থেমে যায়। ১৮৩১-এর আগে বাংলা ভাষায় দর্পণ ও চন্দ্রিকা ব্যতীত উল্লেখ করার মতো এমন কোনো সাময়িক-পত্র ছিল না—বাংলা ভাষার চর্চায় বা বাংলা সংবাদপত্র প্রচারে যার তেমন বিশিষ্টতা ছিল। ১৮২২ থেকে ১৮৩১ পর্যন্ত এই প্রায় ন-বছর দর্পণ ও চন্দ্রিকাই ছিল বাংলা ভাষার প্রধান সংবাদ-সাময়িকপত্র।

রামমোহনের নামের সঙ্গে যুক্ত 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রকাশিত হয় ১৮২১-এর ডিসেম্বরে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসগ্রন্থগুলিতে বাংলাগদ্যচর্চা ও বাঙালির সামাজিক রূপান্তরের উপাদান হিশেবে কৌমুদী-চন্দ্রিকা বিবাদের বিবরণ থাকে। এই দুই দিক থেকেই কৌমুদী বোধহয় ইতিহাসে অসংগত গুরুত্ব পেয়ে আসছে। যে-কোনো সাময়িকপত্রের পক্ষেই সামাজিকভাবে বিশিষ্ট হতে হলে প্রায়-নিয়মিত প্রকাশ অনিবার্য একটি শর্ত। দ্বিতীয় শর্ত—ব্যবস্থাপনা ও সম্পাদনার স্থায়ী সংগঠন ও ধারাবাহিকতা। এই দুইয়ের কোনোটিই কৌমুদীর বেলায় ঘটে নি। কৌমুদী নিয়মিতভাবে কখনোই বেরয় নি। ব্যবস্থাপনারও স্থায়িত্ব ছিল না।

কৌমুদী কোনোদিনই কলকাতার নাগরিক সমাজের কোনো একটি অংশের ভিতর সাময়িকপত্র হিশেবে গৃহীত হয় নি। মনে হয়, রামমোহনের নামের সঙ্গে ও ভবানীচরণের কৌমুদীত্যাগের নাটকীয়তার সঙ্গে যুক্ত বলেই ইতিহাসে কৌমুদীর এই অসংগত মর্যাদা।

সাংবাদিকতা ও গদ্যচর্চার দিক থেকে দর্পণ ও চন্দ্রিকা দীর্ঘায়ু সমকালীন। দেশীয় সাংবাদপত্রের মধ্যে চন্দ্রিকার বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল—দর্পণে চন্দ্রিকা থেকে উদ্ধৃত সংবাদসংখ্যা দেখে মনে হয়। আবার, অনেক সময় ইংরেজি ভাষার কাগজে দেশীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ সংকলিত হত। তাতেও চন্দ্রিকারই প্রাধান্য ছিল।

চন্দ্রিকায় যে-গদ্য লেখা হত তার সঙ্গে দর্পণের ভাষার পার্থক্য শুধু স্টাইলগত নয়, আরো মৌলিক। সেই সময় গদ্যলেখার প্রধান দায় ছিল পদবিন্যাস। পদবিন্যাসের রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পরই স্টাইলের প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক হতে পারে। সৃষ্টিশীল রচনা থেকে কল্পনার সংক্রমণ গদ্যের ভিতর না ঘটলে এই স্টাইল বিকশিত হতে পারে না। আবার, উৎপাদনের সঙ্গে গভীর অন্বয়ে যুক্ত সমাজে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির ও নাগরিকসমষ্টির বিনিময় ও মতসংগঠনের ভাষা হিশেবে চর্চিত না হলে গদ্যে সেই সৃষ্টিশীলতার সংক্রমণ সম্পূর্ণ হতে পারে না।[২৩]

চন্দ্রিকার গদ্য-আলোচনার প্রধান বাধা—চন্দ্রিকার কপি এখন আর পাওয়া যায় না। ১৮৩০-এর পরের চন্দ্রিকার কিছু কপি আমরা পেয়ে গিয়েছিলাম। সেগুলো থেকে বেশ কিছু রচনা আমরা কপি করেছি। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' দুই খণ্ডে দর্পণে উদ্ধৃত চন্দ্রিকার যে-রচনাগুলি ছড়িয়ে আছে সেগুলিকে এক জায়গায় এনেছি কিন্তু এ-রকম উদাহরণের সংখ্যা ৩০-এর সামান্য বেশি।

এ-ছাড়াও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চন্দ্রিকায় প্রকাশিত কিছু চিঠিপত্র তাঁর সংকলনে উদ্ধৃত করেছেন। সেগুলিও দর্পণে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। আমরা ১৮৩০-এর পরের যে-কটি চন্দ্রিকা পেয়েছিলাম, তাতেও অনেক চিঠিপত্র বেরিয়েছিল। এই চিঠিপত্র ও সে-বিষয়ে চন্দ্রিকার বক্তব্য আমরা আলাদাভাবে আলোচনা করছি।

চন্দ্রিকার গদ্যের আলোচনায় প্রথমেই দর্পণের গদ্যের সঙ্গে তুলনা প্রায় অনিবার্য হয়ে ওঠে। আমরা এর আগেই অনুমান করেছি দর্পণের বেশির ভাগ রচনাই ছিল অনুবাদ, চন্দ্রিকার বেশির ভাগ রচনাই ছিল মৌলিক। তাই দর্পণ ও চন্দ্রিকার গদ্যের তুলনায় দেখা যায়—বাংলা গদ্যের কোনো কাঠামো দর্পণের

মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার ওপর আরোপ করা হচ্ছিল, আর, সেই কাঠামোর বাইরে মৌলিক বাংলা গদ্য কী ভাবে তৈরি হচ্ছিল।

এই তুলনা আমরা এখানে করছি না। এখানে আমরা চন্দ্রিকার গদ্যের গঠনরীতিই বোঝবার চেষ্টা করব। সেই বিশ্লেষণের সঙ্গে ইতিপূর্বে দর্পণের গদ্যরীতির বিশ্লেষণের তুলনা করলেই উভয়ের প্রধান পার্থক্য ধরা পড়ে। কিন্তু দুটি গদ্যরীতিব পাশাপাশি তুলনায় এক ধরনের যান্ত্রিকতা এসে পড়ারও আশঙ্কা —ভাষার মতো নমনীয় বিষয়কে সে-রকম যান্ত্রিক ভাবে দেখলে বিভ্রাট ঘটায় ভয় আছে।

এই তুলনারই একটা কৌতুককর আভাসমাত্র দিয়ে চন্দ্রিকার গদ্যের আলোচনা শুরু করা যেতে পারে। ১৮২১-এর ফেব্রুয়ারি থেকে জুনে "বাবুর উপাখ্যান" নামে একটি রচনা দর্পণে ধারাবাহিক বেরয়। লেখাটি নানা কারণেই বিশিষ্ট। দর্পণের অন্যান্য লেখার সঙ্গে এ-লেখাটি একেবারেই মেলে না। সমকালীন কিছু সাক্ষ্যে অনুমান হয়—এ লেখাটি ভবানীচরণেরই। এই অনুমানকে প্রমাণ করার মতো কোনো সাক্ষ্য নেই। কিন্তু 'সমাচার দর্পণ'-এর নিবপেক্ষ সাংবাদিক গদ্যের মধ্যে আমরা এই লেখাটিতে পড়ি—

> ···কোন দিবস বাবু মজলিসে পদার্পণ করিবামাত্রেই চাকরকে হুকুম করেন যে জামা জোড়া পাগ ইত্যাদি পোশাক তৈয়ার রাখ কল্য দরবার যাইব। ইহা শুনিতেই কর্ম্মের নিমিত্ত ব্যগ্র ব্যক্তিরা মনে করে যে যাহা অনুভব করিয়াছি তাহা বুঝি সত্য হইয়াছে ইহা বলিয়া কেহ কালীঘাটে পূজা মানে কেহ সত্য পীরের শীরনি দিতে চাহে কেহবা আপন২ ইষ্টদেবতার স্থানে বাবুর মঙ্গল প্রার্থনা করে। সকলেই কর্ণে২ ফুসফুস করে ও পরস্পর জিজ্ঞাসা করে যে বাবু কল্য কোথা যাইবেন কেহ কহে যে চুপ কর সে দিবস আমি যাহা কহিয়াছি সেই বটে বাবু সুন্দরবনের দেওয়ান হইবেন দেখ মা জগদীশ্বরীর ইচ্ছা কিন্তু কেহ সহসা জিজ্ঞাসা করিতে পারে না। বাবু পরদিনে দরবার যাইবেন অতএব মজলিস অল্পরাত্রে বরখাস্ত হইল।···
>
> পরদিনে বাটীর তাবৎ লোক ব্যস্ত কর্ম্মের ভিড়ের সীমা নাই বাবু কুঠী যাইবেন। বাবু প্রাতে স্নান করিলেন কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া উত্তম জামা জোড়া বহুকালে পরিধান করিয়া বেশবিন্যাস পূর্ব্বক অভুক্ত উত্তম গাড়ীতে আরোহণ করিলেন সঙ্গে চারিজন ব্রজবাসী লাল পাগড়ীওয়ালা বাঁকা হামরা চলিল গাড়ী ঘর২ শব্দে দুর্ব্বিধ বাজারে পঁহুছিল সেখানে হাজী হাদী সাহেবের

খেজুরের দোকানে উত্তীর্ণ হইলেন হাদী সাহেব বড় লোক বাবুর সহিত বড় প্রণয় বাবুকে বসিতে চৌকি দিলেন পরে উভয়ে অন্য ভাষায় আলাপ হইল বাবুর বাক্যশক্তি তাদৃক নাই তথাচ বড় লোক গাটমিট করিয়া কহিলেন। হাদী সাহেব বাবুর প্রতি কহিলেন যে অদ্য বড় গরমী তুমি বড় মোটা হইয়াছ তোমার কত টাকা আছে টাকার কি দর এক্ষণে সুদ বাজারে টাকার অল্পতা কেন হইল বাণিয়ারা ইহার কি বলে। বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন যে সাহেব এ দেশে আর একজন কাজী আসিতেন শুনি সত্য কি না লড়াইয়ের কি খবর এত জাহাজ আসিতেছে কেন ইত্যাদি আলাপ হইয়া বাবু ব্রজবাসীরদিগকে ডাকিয়া হুকুম দিলেন যে একজন দেখ মোল্লা ফিরোজ ঘরে আছে কি না আনতনি বদ্রিগু সাহেব ঘরে হাজিরা খান কি না দ্বিতীয় জনকে কহিলেন যে দেখ এয়াগু সাহেব নিশ্চিন্ত বসিয়া আছেন কি না জানিয়া আইস তবে আমি যাইব ইহা কহিয়া গাড়ীতে সওয়ার হইলেন ও নিলাম ঘর হইয়া বাজার দিয়া বাবু বাটী আইলেন বাটীর লোক সকলে স্তব্ধ বড় গরমি বাবু অভুক্ত কুঠী গিয়াছিলেন আহার হইলে হয় সুতরাং সকলেই অতিব্যস্ত পরিশ্রম হইয়াছে- শিরঃপীড়াও হইল আহার সুন্দররূপে করিতে পারিলেন না যৎকিঞ্চিৎ খাইয়া শয়ন করিলেন।

[স. সে. ক. ১ । ৯৮-৯৯]

এই বিবরণের ছন্দে যেন কথা বলার ছন্দ শুনতে পাওয়া যায়। গল্প বলার সেই পরিচিত ছন্দে বাক্যগুলি ছোট-ছোট হয়, ক্রিয়াপদের পর ক্রিয়াপদ মিলে একটি সম্পূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি করে—ইংরেজি রীতি অনুযায়ী সেগুলি অনেক ছোট-ছোট সম্পূর্ণ বাক্যের সমষ্টি আর কথা বলার বাঙালি রেওয়াজে সেগুলি একটিই বাক্য বা একটিই ঘটনা। তখন যতিচিহ্নের ব্যবহার খুব ছিল না। এই লেখাটিতে লেখক কয়েকটিমাত্র জায়গায় দাঁড়ি দিয়েছেন। কিন্তু অচেতন দাঁড়ি দেয়ার পেছনে পুরো রচনার ছন্দটি কাজ করেছে। এক-একটি দাঁড়িতে পরিস্থিতির এক-একটি স্তর বর্ণিত হয়েছে। যদি প্রত্যেকটি সমাপিকা ক্রিয়ায় দম ছেড়ে পরের শব্দটি উচ্চারণ করা যায় তা হলে দেখা যাবে এই রচনাটির ভিতর ব্রতকথা বলার মতো একটা সুর চাপা আছে। দর্পণের গদ্যে 'যে' এই সংযোজক পদটির মূল্য খুব বেশি। এখানে যে-কবার 'যে' উচ্চারিত হয়েছে তা খুব নিম্নস্বরে, গঠনের দিক থেকেও 'যে'-র কোনো মূল্য নেই। অনেক জায়গাতেই প্রত্যক্ষ উক্তি ব্যবহৃত

হয়েছে—দর্পণে এমন হত না। ফলে হেতুবাচক প্রত্যয়নিষ্পন্ন বিশেষণ প্রায় কোথাওই ব্যবহৃত হয় নি।

কিন্তু এগুলোও বাইরের লক্ষণ। এই রচনাটির মাত্র একটি অংশ আমরা এখানে উদ্ধৃত করেছি। এইটুকু অংশে ও পুরো রচনাটিতেই যা লেখা হচ্ছে, বা যা বলা হচ্ছে, তার অতিরিক্ত একটি ইশারা লেখার ভিতর থেকে অভ্রান্ত বেরিয়ে আসছে। কথার অতিরিক্ত এই ইশারা আমাদের কাছে সহজে ও স্বাভাবিকভাবে আসে। গদ্যে তা সঞ্চারিত হতে পারে নিয়ত ও দীর্ঘ অভ্যাসে। সে-অভ্যাস শুধু লেখকেরই চর্চাসাধ্য নয়, পাঠকেরও চর্চাসাধ্য। এই রচনার সময় (১৮২১) বাংলা লেখক বা বাংলা পাঠকের গদ্য লেখার বা পড়ার এমন অভিজ্ঞতা জমে নি যাতে পাঠ-(টেক্সট)-অতিরিক্ত ইশারা পাঠে সঞ্চারিত করা যায় বা পাঠ থেকে গ্রহণ করা যায়।

এখানে, বা, এ-রকম আরো কিছু রচনায় তা বেরিয়ে এসেছে কণ্ঠস্বরের ভঙ্গি অনুযায়ী লেখার ভাষাকে সাজানোর ফলে। যে-পাঠক বাঙালির ব্রতকথা বা কিছুটা পাঁচালি শোনেন নি তিনি এই স্বরভঙ্গি এই রচনার ভিতর খুঁজে পাবেন না এবং তাঁর কাছে এ রচনা দর্পণের সাধারণ রচনার চাইতেও হয়তো দুর্বোধ্য ঠেকবে। কিন্তু সেই স্বরভঙ্গি অনুসরণ করলেই হাদী সাহেবের দোকানে বাবুর পৌঁছনো ও আলাপের বিবরণের ভিতরকার শ্লেষ ধরা পড়ে।

> হাদী সাহেব বড় লোক। বাবুর সহিত বড় প্রণয়। বাবুকে বসিতে চৌকি দিলেন। পরে উভয়ে অন্য ভাষায় আলাপ হইল। বাবুর বাক্যশক্তি তাদৃক নাই। তথাচ বড় লোক। গাটমিট করিয়া কহিলেন।

এই অংশটিকে আমরা মাত্রাচিহ্ন দিয়ে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছি। সেই অসম্পূর্ণ ভাগ পরবর্তী বাক্যাংশটির দিকে যাচ্ছে অথচ প্রায় সম্পূর্ণ বিরতির দ্বারা বিচ্ছিন্ন। এই বিরতির সম্পূর্ণতা ও বিবৃতির অসম্পূর্ণতার মাঝখানে লেখক তাঁর কথা বলার বাঁকা স্বরটি আমাদের কানে ধরিয়ে দিতে পারেন।

'সমাচার দর্পণ'-এর এই রচনাটি ভবানীচরণেরই হওয়া সম্ভব। কিন্তু তিনি স্বনামে এই রচনা প্রকাশ করেন নি। দর্পণের বিশিষ্ট গদ্যের মধ্যে এখনো এই রচনাটি আলাদা হয়েই আছে তার বাগ্‌ভঙ্গির নিজস্বতায়। সে-নিজস্বতা দর্পণের অন্যান্য আরো কিছু রচনাতেও হয়তো মিশে ছিল। কিন্তু চন্দ্রিকায় তাঁর এই নিজস্ব বাগ্‌ভঙ্গি বাধাহীন ভাবে প্রকাশিত হতে পারল।

এই বাধাহীনতা নিজের সম্পাদনার ফলেই কেবল ঘটেছে তা নয়। তখনকার

ঘটনাগুলিতে ভবানীচরণের সক্রিয়তারই একটা নিজস্বতা ছিল। তাই সে সক্রিয়তার ভাষাও ছিল নিজস্ব ও স্বকীয়। সেই নিজস্বতার ভিতরও নানা টানা-পোড়েন, নানা ভঙ্গির মিশ্রণ, কখনো উচ্চকিত কখনো নিম্ন স্বরক্ষেপ, কখনো অস্বস্তি, কখনো সরব যুক্তিক্ষেপ ঘটে যেতে থাকে। সেই জটিল প্রক্রিয়াতেই চন্দ্রিকার গদ্য মৌলিক বাংলা গদ্যের বিশিষ্টতা অর্জন করেছে।

চন্দ্রিকার গদ্যে কণ্ঠস্বরের এই প্রক্ষেপ ঘটত প্রায় অনিবার্য ভাবে। তার প্রধান কারণ চন্দ্রিকার গদ্য অনুবাদের গদ্য নয়, মৌলিক গদ্য। তাই, এমন-কি একটি সংবাদ লেখার সময়ও কোনো একটি জায়গায়, বা, বাক্যের নিরপেক্ষ গঠনের মধ্যে ব্যক্তিগত কথা বলার ভঙ্গি এসে যেত। তার ফলে, কোথাও-কোথাও এমন মিশ্রণও দেখা যেত যে খবরের কাগুজি নিরপেক্ষ গদ্যের আদলে—তখন দর্পণ ও ইংরেজি সংবাদপত্রেই সে-আদলটি ব্যবহৃত হত—একটি রচনা শুরু হয় বটে কিন্তু তার মধ্যেই লেখকের ব্যক্তিগত ঝোঁকটি কোনো একটি জায়গায় এসে পড়ে। এই ব্যক্তিগত কণ্ঠস্বর সব সময় বিষয়নির্ভর নয়—গদ্যের গঠনভঙ্গিরই অংশ। যেখানে বিষয়ের প্রয়োজনে লেখককে একটি বিশেষ কোনো ভঙ্গি নিতে হয়—সেখানে সেই ভঙ্গির আনুষঙ্গিক কণ্ঠক্ষেপ ঘটতেই পারে। চন্দ্রিকায়ও সে-রকম উদাহরণ আছে। বা, এমন-কি, বিষয়ের প্রয়োজনে কণ্ঠের একটি আরোপিত ভঙ্গিও অনেক সময় এসে যায়। লেখক সেখানে সেই আরোপিত ভঙ্গিতে একটা যুক্তি বিশেষ ধরনে উপস্থাপন করতে চান। চন্দ্রিকায় সে-রকম উদাহরণও আছে। কিন্তু কণ্ঠস্বরক্ষেপ যেখানে গদ্যভঙ্গিরই অংশ সেখানে সে-স্বরক্ষেপ বিষয়নির্ভর নয়। লেখক সেখানে অন্য কোনো ভাবেও বাক্যগঠন করতে পারতেন। তখন হয়তো এইরকম বিকল্প খুব বেশি লেখকের কাছে ছিল না কিন্তু তৎসত্ত্বেও লেখক কণ্ঠস্বর-ভঙ্গিই যে বেছে নেন তাতেই তাঁর গদ্যে ব্যক্তিত্বের ছোঁয়া লাগে। কণ্ঠস্বরের এই বিশেষ প্রক্ষেপ চন্দ্রিকার সাংবাদিক গদ্যকেও ব্যক্তিত্ব দিয়েছে ও এই কণ্ঠস্বর-ক্ষেপের অভাবেই দর্পণের গদ্য ব্যক্তিনিরপেক্ষতা পেয়েছে।

১. সমাচার চন্দ্রিকা। ২০ অক্টোবর ১৮২৭

ঔষধ দান।—শুনিলাম শহর চুঁচড়া নিবাসি দ্বিজমিষ্টভাষি শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদার মহাশয় বহুতর ধন ব্যয় পূর্ব্বক নানা রোগের ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দীন দরিদ্র দ্রবিণহীন রোগিদিগকে ঐ ভেষজদানদ্বারা আরোগ্য করিয়া দিতেছেন বিশেষ শুনিলাম ধনবান অর্থাৎ যাঁহারা ধন ব্যয়দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করিতে পারেন এমত ব্যক্তিকে দেন না কিন্তু কাঙ্গাল রোগগ্রস্ত যত লোক যায়

তাবৎকেই দিয়া থাকেন ইহাতে অবারিতদ্বার এই সংবাদ শ্রবণে আমরা আনন্দ মনে প্রকাশ করিতেছি যেহেতুক ইহাতে পাঠকবর্গের অবশ্যই সন্তোষ জন্মিবেক এবং সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইলে দুঃখিত পীড়িত ব্যক্তিদিগের মহোপকার হইবেক হালদার বাবু ধন ব্যয় করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতেছেন রোগি ব্যক্তি রোগহইতে মুক্ত হইতেছে অরোগির ইহাতে কোন লভ্য নাই কিন্তু এমনি সৎকর্ম্মের ধর্ম্ম এই সংবাদ শুনিয়া কে না ধন্যবাদ করিবেন। আর অসৎ কর্ম্মের এমনি জানিবেন যে করে তাহার পাপভোগী সেই হয় তাহারি ধন ক্ষয় হয় তাহাতে অপরের কিছু ক্ষতি নাই কিন্তু তাবতেই কহে নরাধম অধঃপাতে যাউক অতএব প্রার্থনা পরমেশ্বর সকলকেই সৎকর্ম্মে মতি দিউন।

[স. সে. ক. ১ । ১৩৫]

২. সমাচার চন্দ্রিকা। ১৮ মে ১৮২২

নীলকারকের দৌরাত্ম্য॥—মপস্বলে কোন২ নীলকারকেরা প্রজার উপর দৌরাত্ম্য করেন তাহার বিশেষ এই। যে প্রজা নীলের দাদন না লয় তাহার-দিগের প্রতি ক্রোধ করিয়া থাকেন ও খালাসীরদিগেকে কহিয়া রাখেন যে ঐ সকল প্রজার গরু নীলের নিকট আইলে সে গরু ধরিয়া কুঠীতে আনিবা। তাহারা ঐ চেষ্টাতে নীলের জমীর নিকট থাকে কিন্তু যখন গরু নীলের নিকট আইসে যদ্যপি নীলের কোন ক্ষতি না করে তথাপি তখনি সে গরু ধরিয়া কুঠীতে চালান করে সে গরু এমত কএদ রাখে যে তৃণ ও জল দেখিতে পায় না। ইহাতে প্রজা লোক নিতান্ত কাতর হইয়া কুঠীতে যায়। প্রথম তাহার-দিগকে দেখিয়া কেহ কথা কহে না পরে গরু অনাহারে যত শুষ্ক হয় ততই প্রজার দুঃখ হয় ইহাতে সে প্রজা রোদনাদি করিয়া সরকারলোককে কিছু ঘুস দিয়া ও নীল দাদন লইয়া গরু খালাস করিয়া গৃহে আইসে। এবং নীলের দাদন যে প্রজা লয় তাহার মরণপর্য্যন্ত খালাস নাই যেহেতুক হিসাব রফা হয় না প্রতিসনেই দাদন সময়ে বাঁকীদার কহিয়া ধরিয়া কএদ রাখে। তাহাতে প্রজারা ভীত হইয়া হালবকয়া বাঁকী লিখিয়া দিয়া দাদন লইয়া যায়। এইরূপ যাবৎ গোবৎসাদি থাকে তাবৎ ভিটায় থাকে তাহার অন্যথা হইলে স্থান ত্যাগ করে যেহেতুক দাদন থাকিতে অন্য শস্য আবাদ করিয়া নির্ব্বাহ করিতে পারে না।

[স. সে. ক. ১ । ১৫৫]

৩. সমাচার চন্দ্রিকা। ৫ আগস্ট ১৮২৬

নূতন বিমা আপিস।—আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে

গেঞ্জেসরিবর ইন্সোরেন্স কোম্পানিনামক এক নতুন বিমা করিবার আপিস ১ আগষ্ট তারিখে ওল্দ কোর্ট ইস্ত্রিটে শ্রীযুত পামর কোম্পানির দপ্তরখানার বাটীর লাগাও উত্তরে ৫৯ নং বাটীতে খোলা যাইবেক তৎকর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত এন আলেক্সান্দর টি আলপোর্ট ডবলিউ এ লিবিংষ্টোন ই মেণ্ডিস সাহেবেরা আগামি বার মাহার অর্থাৎ হালসালের ১ পহিলা আগষ্ট অবধি ১৮২৭ সালের জুলাই মাহাপর্য্যন্ত ঐ কর্ম্মে স্থির থাকিবেন এবং ঐ বিমা কর্ম্ম কিপ্রকার করিবেন তাহার ধারা এই যদ্যপি কোন ব্যক্তি নৌকাযোগে বাণিজ্যের দ্রব্যাদি বিশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত মূল্য কলিকাতা হইতে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের অধীন সকল দেশে নানা নদীর দ্বারা পাঠাইতে ও সে দেশহইতে এ দেশে আনাইতে ইহার উপর বিমা করিতে বাঞ্ছা করিলে পূর্ব্বোক্ত সাহেবেরা এক পালিস অর্থাৎ ঐ সকল দ্রব্যাদির ঝুঁকি লইলেন এমত লিখিত এক রসিদের ন্যায় দস্তাবেজ দিবেন।

আরো শুনা যাইতেছে যে সওদাগরী জিনিসের বিশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত ঝুঁকী লইবেন এবং নগদ টাকা রূপা সোণার বাসন কিম্বা গহনা এই সকলের ত্রিশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত বিমা করিবেন অর্থাৎ ঝুঁকি লইবেন।

এই সকল দ্রব্যাদির উপর বিমা করিবেন কোন মাস অবধি কোন মাস-পর্য্যন্ত কোন২ স্থানে কি হার বিমার দাম লইবেন ঐ সাহেবরদিগের স্থানে ইহার নিরিখের কাগজ আছে তত্ত্ব করিলে জানিতে পারিবেন এই কর্ম্মে শ্রীযুত হেনরি মোক চাইলড সাহেব কর্ম্মনির্বাহক হইয়াছেন তাঁহাকে অনেকে জানিতে পারেন তাঁহার পিতা চাং চাইলড সাহেব অতি ধনবান এবং খ্যাত লোক ছিলেন ইহাতে বোধ হয় যে এ কর্ম্ম উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারিবেক এই কর্ম্ম সুন্দররূপে চলিলে আহ্লাদের বিষয় বটে যেহেতুক নৌকাযোগে নানাদেশে দ্রব্যাদি পাঠাইতে অথবা আনাইতে পথে ক্ষতি হওনের কোন সম্ভাবনা নাই অনায়াসে অল্পব্যয়ে নিরুদ্বেগে দ্রব্যাদি পঁহুছিবে।

[স. সে. ক. ১। ১৫৫]

প্রথম উদাহরণটিতে 'শুনিলাম', 'বিশেষ শুনিলাম', 'আমরা আনন্দমনে প্রকাশ করিতেছি', তৃতীয় উদাহরণে 'আমরা আহ্লাদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি', 'আরো শুনা যাইতেছে', 'এই কর্ম্ম সুন্দররূপে চলিলে আহ্লাদের বিষয়বটে',— এই বাক্যাংশগুলি মূল বাক্যের বা সমগ্র রচনার পক্ষে অপরিহার্য নয়। বরং এই

বাক্যাংশগুলির ইংরেজি-কায়দা খুবই স্পষ্ট, বিশেষত তৃতীয় উদাহরণে ইংরেজি থেকে অনুবাদ, 'আহ্লাদপূর্বক', 'আহ্লাদের বিষয়' প্রকট। কিন্তু তৎসত্ত্বেও লেখকের ব্যক্তিগত কণ্ঠস্বর বা রচনার ব্যক্তিগত ধরনটি রচনাগুলির ভিতর ধরা পড়ে যায়। হয়তো দ্বিতীয় উদাহরণে তা সবচেয়ে স্পষ্ট কিন্তু প্রথম ও তৃতীয় উদাহরণেও তা বেশ বোঝা যায়, এমন-কি তৃতীয় উদাহরণটির সরকারি-বিজ্ঞাপনসুলভ নৈর্ব্যক্তিকতা সত্ত্বেও।

প্রথম উদাহরণে 'হালদার বাবু ধনব্যয় করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতেছেন, রোগি ব্যক্তি রোগ হইতে মুক্ত হইতেছে, অরোগির ইহাতে কোন লভ্য নাই, কিন্তু এমনি সৎকর্ম্মের ধর্ম্ম, এই সংবাদ শুনিয়া কে না ধন্যবাদ করিবেন। আর অসৎ-কর্ম্মের এমনি জানিবেন, যে করে তাহার পাপভোগী সেই হয়, তাহারি ধনক্ষয় হয়, তাহাতে অপরের কিছু ক্ষতি নাই, কিন্তু তাতেই কহে যে, নরাধম অধঃপাতে যাউক'—কমাচিহ্ন দিয়ে পড়লেই দেখা যাবে এই অংশে লেখক কী ভাবে একটি বাক্যাংশকে বাক্যের অপর অংশের সঙ্গে 'যে', 'যেহেতু', 'যথা' এই সব সংযোজক ছাড়াই যুক্ত করে দিতে পেরেছেন তাঁর কণ্ঠস্বররের গোপন প্রক্ষেপে। সেই স্বরক্ষেপের ফলেই একের পর এক সমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও বাক্যটির বেগ শেষ হয় না—এই সমাপিকা ক্রিয়াগুলি ব্যবহারিক ভাবে অসমাপিকা ক্রিয়ারই কাজ করছে। 'কে না ধন্যবাদ করিবেন', 'এমনি জানিবেন', 'নরাধম অধঃপাতে যাউক' এই সব অংশে পাঠককে সম্বোধন করে ফেলা হয়েছে। আর কখনো প্রশ্নমুখর, কখনো নিশ্চয়তাসূচক, আবার কখনো প্রায় প্রত্যক্ষ উক্তির ব্যবহারে রচনার ইতি-নেতিবাচক বাক্যের সমতা ভেঙে গেছে।

দ্বিতীয় উদাহরণটিতে সংবাদ দেয়া হয়েছে মন্তব্যের আয়তনের মধ্যে। 'নীলকরদের দৌরাত্ম্য'-এর বিশেষ একটি নিদর্শন দেয়া হচ্ছে। ফলে প্রথম থেকেই বিবরণের বাক্যের মধ্যে নিহিত মন্তব্যের সংক্রমণ ঘটে বাক্যের গঠনকে বদলে দিচ্ছে। নীলকররা কী ভাবে কৃষকদের নীলের দাদন নিতে বাধ্য করে সেটাই লেখক বলতে চাইছেন কিন্তু কোথাও সে-কথাটি তাঁকে প্রকাশ্যে বলতে হয় নি। প্রত্যক্ষ বাচনের ব্যবহার এখানেও ঘটেছে 'ঐ সকল প্রজার গরু নীলের নিকট আইলে গরু ধরিয়া কুঠীতে আনিবা'। বাক্যের সংগঠন ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা সত্ত্বেও কী রকম অন্যায় ভাবে গোরু কয়েদ করা হয় তার বর্ণনায় লেখক লেখেন—'যখন গরু নীলের নিকট আইসে যদ্যপি নীলের কোন ক্ষতি না করে তথাপি তখনি সে গরু ধরিয়া কুঠীতে চালান করে'। লেখক এখানে 'যদ্যপি'

'তথাপি' 'যখন-তখন' এই সব শব্দ ব্যবহার করে অসমাপিকার ব্যবহার ঠেকিয়ে রেখেছেন। অথচ বিষয়ের চাপে, বাস্তব ঘটনার বর্ণনার চাপে এ-বিবরণ অনুবাদ না হয়ে, বাংলাই থেকে যায়। ঘটনার এই চাপ পরবর্তী অংশকে নিয়ন্ত্রণ করে। 'গরু এমত কএদ রাখে যে তৃণ ও জল দেখিতে পায় না।' গরু ঘাস ও জল 'দেখতে' পাচ্ছে না—এই ক্রিয়াপদের ওপর ভর দিয়ে যে বাস্তবতা রচনাটিতে সঞ্চারিত হয়ে যায় তার ফলে শেষাংশে একের পর এক অসমাপিকা ক্রিয়া এসে যায়. এই বিশেষ ঘটনার বিবরণ সেভাবেই শেষ হয়ে গিয়ে মূল বিষয়টি উত্থাপিত হয় 'নীলের দাদন যে প্রজা লয় তাহার মরণপর্য্যন্ত খালাস নাই যেহেতুক হিসাব রফা হয় না প্রতিমাসেই দাদন সময়ে বাঁকীদার কহিয়া ধরিয়া কএদ রাখে।' মুখের ভাষা ও প্রচলিত শব্দ—খালাস, রফা, দাদন, বাঁকীদার, কএদ—এই বাক্যটি থেকে বিবরণের নিরপেক্ষতা খসিয়ে দিয়েছে। বিষয়ের সঙ্গে এখানে লেখক এতটাই অন্বিত যে 'যাবৎ গোবৎসাদি থাকে তাবৎ ভিটায় থাকে অন্যথা হইলে স্থান ত্যাগ করে'—এমন একটি অর্থগর্ভ বাক্য লিখে ফেলতে পারেন—যতক্ষণ গোরু-বাছুর বেচে সংসার চালানো যায় ততক্ষণ কৃষক গ্রামে থাকে তারপর ভিটে ছেড়ে চলে যায়।

তৃতীয় উদাহরণটি এর বিপরীত। ইনসিওরেন্স বা বীমা সম্পর্কে একটি বিজ্ঞাপনের প্রায় অনুবাদ। কিন্তু সেখানে মুখের ভাষার কয়েকটি শব্দের ব্যবহারে—'আপিস খোলা', 'বাটার লাগাও', 'ঝুঁকি লইলেন', 'দস্তাবেদ দিবেন', 'নিরিখের কাগজ', 'তত্ত্ব করিলে'—এ-রকম বিজ্ঞাপনও একটা রচনা হয়ে উঠতে পেরেছে। শুধু শব্দ ব্যবহারের ফলে এটা ঘটে নি। প্রথমে বীমার বিশেষত্ব ও সীমা বলা হয়েছে, কত টাকার বীমা করা যাবে ও কত দিন সেটা কার্যকর থাকবে—এগুলোরও বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে। যে-ভাষায় দেয়া হয়েছে তাতে বোঝার কোনো অসুবিধে হয় না। বীমার মতো এমন একটি ব্যবস্থা যার অভিজ্ঞতা লেখকের ছিল না তার বর্ণনায় লেখক অনুবাদের ওপর নির্ভর না করে নিজের ধারণাটি 'নিজের' ভাষায় বলার ক্ষমতার ওপর নির্ভর করেছেন। তাই লেখায় এই স্বাচ্ছন্দ্য আসতে পারে। 'আঠার শতকের বাংলা চিঠি' (অনিসুজ্জামান). ও 'আঠার শতকের বাংলা গদ্য' (দেবেশ রায়)—বই দুটিতে আঠারো শতকের এমন বহু চিঠির নিদর্শন পাওয়া যাবে যেখানে এমন লেনদেন, এমন বিজ্ঞপ্তি, এমন হিশেবনিকেশের বিবরণ খুব স্পষ্ট ভাবে আছে। আঠার শতকের সেই লেখালেখি উনিশ শতকের শুরুতেই নিশ্চয় লোপ পেয়ে যায় নি—বরং দেশী

ব্যবসায়ের এই চিঠিপত্রের ধারা বা বয়ান আধুনিক কালেও চালু আছে। দর্পণে এই ধরনের রচনাগুলিকে অনুবাদ করা হত। চন্দ্রিকায় ভবানীচরণ আঠারো শতকের প্রচলিত দেশী ধারাতেই লিখেছেন। চন্দ্রিকার এই উদাহরণটিতে লেখক বিষয়টিকে এতই নিজের করে নেন যে বীমাব্যবসায়ী সাহেবের পরিচয়টাও দেন দেশী ভঙ্গিতেই—'অনেকে জানিতে পারেন তাঁহার পিতা চাং চাইল্ড সাহেব··· ।'

দর্পণের গদ্য আলোচনার সময় আমরা দুটি-একটি উদাহরণে দেখার চেষ্টা করেছি যে ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদে কী ভাবে ইংরেজির বাক্য-কাঠামো অবিকল রাখা হয়েছে। চন্দ্রিকায় আমরা তার বিপরীত উদাহরণ কিছু-কিছু পেতে পারি। আগের তৃতীয় উদাহরণটি প্রায় সে-রকম একটি রচনা। এখানে আর-একটি উদাহরণ আমরা নিচ্ছি। রচনাটির শেষে বলেই দেয়া হয়েছে এটি একটি ইংরেজি রচনার সংক্ষিপ্ত বাংলা অনুবাদ।

৪. সমাচার চন্দ্রিকা। ৩০ জুন ১৮২৭

বাঙ্গলার বৃত্তান্ত।—শ্রীযুত সর হ্ এচ্ ইয়েষ্ট যিনি বাঙ্গলার প্রধান বিচারকর্ত্তা ছিলেন তিনি বাঙ্গালার বিষয়ে এক পত্র শ্রীযুত লার্ড লিবরপুল সাহেবকে লিখিয়াছিলেন এই বাঙ্গালার বাঙ্গালি লোক সংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটি হইবেক ইহার অধিকাংশ এই প্রদেশে আছে এবং এই অধিক লোকের বিচারার্থ প্রায় ১৫০ শত ইংগ্লণ্ডীয় জজ ও মাজিস্ত্রিট তাবৎ শহরে ব্যাপিত হইয়াছেন অতএব এমত অল্প লোকদ্বারা বহুকর্ম্ম নিষ্পন্ন করণে অক্ষম সুতরাং বাঙ্গালি সদর আমিন ও মনসোব রাখিয়া সামান্য মোকদ্দমা সকল সম্পন্ন করান কিন্তু কর্ম্মের আধিক্য হওয়াতে এরূপ লোকের আধিক্য হইতেছে অতএব ইহাতে কর্ম্মের সূক্ষ্ম না হইয়া বরং মান্দ্য হইতেছে।

অন্য ব্যক্তিরদিগকে ভূম্যধিকারী করাতে কেবল তাঁহারাই তদুপস্বত্বে সুখী হয়েন এমত নহে তাহাতে অনেকেই সুখী হইয়া থাকে এবং তদুপস্বত্বে বড়২ জমীদারেরা বাদশাহের ন্যায় হইয়া সুখ ভোগ করেন বর্দ্ধমানের শ্রীযুত মহারাজাধিরাজ কহেন যে তিনি আপন জমীদারিতে মালগুজারি করিয়াও প্রতি বৎসর দশ লক্ষ টাকা পায়েন ইহাতে অনুভব হয় যে তিনি আপন লভ্যের অর্দ্ধেকও অঙ্গীকার করেন নাই পূর্ব্বে২ প্রজালোকেরা গবর্ণমেণ্টকে জমীদার ও সর্ব্বাধ্যক্ষ করিয়া বোধ করিত এক্ষণে জমীদার লোককেই তদ্রূপ মান্য করিবে এক ব্যক্তি বড় মানুষ জমীদার যাহার অধিক আয় আছে সে ব্যক্তি এক জন ইংরাজকে [যে ব্যক্তি অল্প বেতনে অধিক শ্রম করে

তাহাকে] সামান্য জ্ঞান করে জমীদারেরা প্রজালোকের প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়া থাকেন যদ্যপি আপন জমীদারির মধ্যে পুলবন্দি ও রাস্তাবন্দি করিতে হয় কিম্বা চৌকীদারেরদিগকে মাহিযানা দিতে হয় তবে প্রজালোকের স্থানে চাঁদা করিয়া লয়েন কোন২ সঞ্চয়শীল জমীদার ব্যক্তিরা আপন২ নগদ টাকা ও কাগজপত্রাদি বিক্রয়দ্বারা জমী খরিদ করেন তাহার কারণ এই যে ইহাতে কর্তৃত্ব ও অধিক লভ্য হয়।

গবর্ণমেণ্ট যদ্যপি এক নূতন আইন স্থাপন করেন তবে ইহাতে অধিক কর লভ্য করিতে পারে আর টেক্স প্রজালোকের উপর না করিয়া জমীদার লোকের উপর করিলে ভাল হয়।

গত ২৪ এপ্রিল কলকাতা ক্রোনিকেল নামক সমাচারপত্রে এ বিষয় প্রকাশ হইয়াছিল পাঠকবর্গের জ্ঞাপনার্থে ইহা আমরা সংক্ষেপে তর্জমা করিয়া স্থূল তাৎপর্য্য প্রকাশ করিলাম।

[স. সে. ক. ১। ১৭৮]

এ-রচনাটিকে যদি ভাগ করে দেখা যায় তবে প্রথম অনুচ্ছেদটির ইংরেজি-কাঠামো ধরা পড়ে। বিশেষত অনুচ্ছেদের দ্বিতীয়াংশে 'অতএব', 'স্ুতরাং', 'কিন্তু' 'অতএব'—এই সব সংযোজক শব্দ ব্যবহার করে বাক্যটিকে ইংরেজি বাক্যের মতো আকার দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদেও 'কেবল···এমত নহে', 'ইহাতে অনুভব হয় যে', 'যদ্যপি·· তবে'—এই ধরনের শর্তসাপেক্ষ শব্দ ব্যবহারেও ইংরেজি বাক্যের স্মৃতিই কাজ করেছে। কিন্তু অনুবাদের এই প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য সত্ত্বেও দুটি অনুচ্ছেদের দুটি জায়গায় রচনাটি ইংরেজি কাঠামো থেকে বেরিয়ে এসেছে। সমাপিকা ক্রিয়া দ্বারা নিষ্পন্ন ছোট-ছোট বাক্যাংশ দিয়ে তৈরি একটি বড় বাক্যগঠনকে আমরা বাঙালি কথ্যরীতি বলে এর আগে চিহ্নিত করেছি। এই উদাহরণে প্রথম অনুচ্ছেদে 'লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটি হইবেক (।) ইহার অধিকাংশ এই প্রদেশে আছে (।) (এবং) এই অধিক লোকের বিচারার্থ প্রায় ১৫০ শত ইংগ্লণ্ডীয় জজ ও ম্যাজিস্ট্রিট তাবৎ শহরে ব্যাপিত হইয়াছেন (।)' —এই অংশটিকে দাঁড়ি দিয়ে পড়লে ও আপাতত 'এবং'-টিকে অগ্রাহ্য করলে সেই বাঙালি কথ্যরীতি ধরা পড়ে। সে-রকম, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে 'মালগুজারি করিয়াও', 'অৰ্দ্ধেকও অঙ্গীকার করেন নাই'—এই বাচনভঙ্গিতেও ঐ কথ্যরীতিরই আভাস। কোথাও কোথাও যতি চিহ্ন দিয়ে পড়লেই আমরা বাঙালি কণ্ঠস্বর শুনতে পাব—'এক ব্যক্তি বড় মানুষ, জমীদার, যাহার অধিক আয় আছে,

সে ব্যক্তি একজন ইংরাজকে সামান্য জ্ঞান করে।' অনুবাদের টানে আসা 'যাহার' ও 'সে ব্যক্তি'কে যদি আমরা উপেক্ষা করি তা হলে এ বাক্যটি হয়ে ওঠে বাঙালির বলা বাংলা কথা। রাস্তা ও পুলের কথাতেও সেই বাঙালি আমেজ।

সভাসমিতির বিবরণেও এ-ভাবেই সংবাদের মধ্যে লেখকের বাচনভঙ্গি ঢুকে পড়েছে, এমন-কি, সংবাদের মধ্যে পেরেনথিসিসে কিছুটা মন্তব্যও থাকছে।

৫. সমাচার চন্দ্রিকা। ২৬ ডিসেম্বর ১৮২৯

টৌনহালে সভা।—শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের ইজারার কাল উত্তীর্ণ হইলে হিন্দুস্থান ও চীনদেশের মধ্যে বাণিজ্যকার্য্য সর্ব্বসাধারণ হয় আর ইউরোপীয় লোকেরা এদেশে আসিয়া তালুকদারী ও কৃষিব্যবসায় করিতে পারেন এতদভিপ্রায়ে কলিকাতাবাসি কতকগুলীন সওদাগর ইঙ্গরেজ ও বাঙ্গালী বাবুরা ইংগ্লণ্ডের মহাসভায় দরখাস্ত পাঠাইবার পরামর্শ স্থিরনিমিত্ত গত ১৫ দিসেম্বর মঙ্গলবার টৌনহালে এক সভা করিয়াছিলেন শ্রীযুত জান পামর সাহেব সভাপতি হইয়া উক্তবিষয় ব্যক্ত করাতে মেং জান স্মিত সাহেব-প্রভৃতি কএক জন সওদাগর আপন২ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন এতদ্দেশীয়ের-দিগের মধ্যে ঐ সভায় আর কেহ না গিয়া থাকিবেন কিন্তু কেবল শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর দ্বিতীয় শ্রীযুত বাবু প্রসন্ননাথ ইঙ্গরেজী কাগজে লিখিয়াছে অনুমান হয় বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর হইবেন ইঁহারদিগের অভিপ্রায় ঐ সাহেবেরদিগের সহিত ঐক্য হইল কিন্তু শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সিবিল কিম্বা মিলিটরি চাকর কেহ ঐ সভায় যান নাই এবং তাঁহারদিগের মধ্যে কাহার মত আছে ইহাও কোন কাগজে প্রকাশ পায় নাই।

এতদ্বিষয়ে আমারদিগের অভিপ্রায় কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করিতে অভিলাষ হইল অতএব লিখি ইউরোপীয় লোকের এ অভিলাষ অর্থাৎ ইঙ্গরেজ তালুকদার ও কৃষক হইলে তাঁহারদিগের মঙ্গল আছে বিশেষতঃ নীলওয়ালা লোকের মহোপকার হইবেক যেহেতুক ইউরোপীয় লোক এক্ষণে এতদ্দেশীয় লোকের দ্বারা ভূমি ইজারা লইয়া কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন ইহার পর জমীদার বা তালুকদার হইয়া সংপূর্ণ স্বামিত্বরূপে এ দেশের দীনদুনিয়ার মালিক হইবেন সে যাহা হউক বাঙ্গালী মহাশয়েরা যাঁহারা ঐ প্রার্থনাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন বা করিবেন তাঁহারদিগের ইহাতে কি উপকার তাহা জানিতে বাঞ্ছা করি যদি পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ লিখিয়া বাঙ্গলা সমাচার পত্রে প্রকাশ করেন তবে

এতদ্দেশীয় অনেকে ঐ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া তদুৎপন্ন মঙ্গলের অংশী হইবার চেষ্টা করিতে পারেন।

[স. সে. ক. ১। ১৬০-৬১]

'আর কেহ গিয়া না থাকিবেন', 'প্রসন্ননাথ ইংরেজী কাগজে লিখিয়াছে অনুমান হয় বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর হইবেন'—প্রথম অনুচ্ছেদের এই বাঙালি বাচন বিবরণের মাঝখানে আছে। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ বিবরণ নয়, মন্তব্য। সেখানে লেখক প্রথম দিকে নিজের কণ্ঠস্বর গোপন করতেই চান কারণ তিনি এ দেশে যে-সাহেবরা স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে চান তাঁদের বিরোধিতা প্রকাশ্যভাবে করতে চান না অথচ তাঁর সমর্থন নেই। তাই তিনি একটা যুক্তি পরম্পরার আশ্রয় নিয়েছেন। সেই যুক্তির আড়ালে তিনি 'ইউরোপীয় লোক এক্ষণে এতদ্দেশীয় লোকের দ্বারা ভূমি ইজারা লইয়া কর্ম নির্বাহ করিতেছেন ইহার পর জমীদার বা তালুকদার হইয়া সংপূর্ণ স্বামিত্বরূপে এ দেশের দীনদুনিয়ার মালিক হইবেন'—এই পর্যন্ত মাত্র বলতে পারেন। কিন্তু কথা বানানোর এই ভঙ্গিতে তাঁর চাপা কণ্ঠস্বর বোঝা যায়। তাই এর পরের বাক্যেই তিনি এতক্ষণ যে-আড়াল গড়ে তুলেছিলেন তা ভেঙে ফেলেন, 'বাঙ্গালী মহাশয়েরা...তাঁহারদিগের ইহাতে কি উপকার।'

চন্দ্রিকার লেখায় যে-ব্যক্তিত্বের সংক্রমণ ঘটে গদ্যকে বাঙালি বাচনের কাছাকাছি নিয়ে আসে তা এই বাঙালি ব্যক্তিত্বই, কখনো-কখনো একটু বেশি রকমের গোঁড়া বাঙালি ব্যক্তিত্ব। সে-বাঙালি সাহেবদের বিরোধিতা করতে চায় না, বরং একটু বেশি রকমের অনুগ্রহই চায়। কলকাতা শহরের বাসিন্দা হিশেবে সে সাহেবের আরো নেকনজরে পড়তে চায়। সে-কারণে সে প্রায় সব সময়েই অভিমানী, একটু-বা জেদি, নিজের বঞ্চনাকে একটু বেশি জোর দিয়ে প্রকাশ করতে চায়। সেই অভিমান বা জেদ বা বঞ্চনাবোধ প্রকাশ করার জন্যে সে যে-ভাষায় কথা বলে সে-ভাষায় নানা মোচড়, নানা বাঁক, কণ্ঠস্বরের নানা ভাঙচুর ব্যবহার করে ফেলে।

৬. সমাচার চন্দ্রিকা। ৪ জুন ১৮২৫

নেটিব হাসপাতাল অর্থাৎ এতদ্দেশের লোকের নিমিত্ত চিকিৎসালয়।...এ বিস্তৃত মহানগর কলিকাতার মধ্যে বাঙ্গালিটোলায় হাসপাতাল ও ঔষধের দোকান নাই এক মহানগরমধ্যে ধন ও জনহীন অনেক বিদেশি মনুষ্য আছে তাহারা পীড়িত হইলে পীড়াহইতে মুক্ত হইবার কোন সাধারণ স্থান নাই

ঐ সকল লোকের সামান্য রোগেতে সামান্য উপায়াভাবে প্রাণ নষ্ট হয় এবং বিষয়সত্বেও অনেক লোক ঔষধ পায় না। চাঁদনি চকে যে হাসপাতাল আছে সে শহরের মধ্যস্থানে নহে বাঙ্গালিটোলা হইতে অনেক দূর আর যে প্রকার শহরের ও লোকের বৃদ্ধি হইয়াছে ও হইতেছে ও তাহাতে একটি হাসপাতালে সুন্দররূপে কর্ম্ম নির্ব্বাহ হওয়া ভার।

এই বিবেচনা পুরঃসরে কতক গুলিন মহানুভব মহাশয়েরা আর দুইটা নেটিব হাসপাতাল ও এক ঔষধের দোকান সংস্থাপন করণের চেষ্টা করিতেছেন তাহার একটা কলুটোলার সরতীর বাগানে সংস্থাপিত হইবেক দ্বিতীয় শোভাবাজারে স্থাপিত করিবেন সেই২ স্থানে দেশি ও বিলাতি নানাপ্রকার বহুবিধ রোগের ঔষধ পাওয়া যাইবেক রোগি ব্যক্তিরা বিনা ব্যয়ে ঔষধ পাইবেক।

[স. সে. ক ১। ১৮৮]

৭. সমাচার চন্দ্রিকা। ২০ নভেম্বর ১৮৩০

রেজকী পয়সা কড়িবিষয়ক।—এতদ্দেশে পূর্ব্বাপর বহুকালাবধি রেজকী অর্থাৎ সিকি দোআনী আনী আধআনীপ্রভৃতি সোণা রূপার চলিত ছিল তাহাতে লোকের আয় ব্যয় বিষয়ের সুবিধা হইত এক্ষণে বিশ বৎসরের অধিক হইবেক রেজকীর মধ্যে কেবল আধুলি সিকিমাত্র আছে তজ্জন্য খুচরা দেনা পাওনা-বিষয়ে যে ক্লেশ ছিল পয়সার বাহুল্য হওয়াতে সে সকল কর্ম্ম কষ্টে সম্পন্ন হইতেছে যদি বল পয়সা দেওয়া নেওয়াবিষয়ে কি ক্লেশ উত্তর। পয়সার ভাও সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমান থাকে না অর্থাৎ এক টাকায় কখন ১৫৵ গণ্ডা কখন ১৫॥ গণ্ডা কখন বা ১৫। গণ্ডা হয় ইহাতে আনা দুই আনাইত্যাদির হিসাব করিয়া দিতে এক পক্ষে কিঞ্চিৎ ক্ষতি হয় অপর কোম্পানি সংক্রান্ত কোন খুদরা দেনা দিতে হইলে ষোল গণ্ডার হিসাবে দিতে হয় যদ্যপিও কোম্পানির লোকেরা যাহাকে যখন দেন ষোল গণ্ডার ভাও দিয়া থাকেন সত্য বটে কিন্তু কোম্পানির স্থানে অত্যল্প লোকের পাওনা হয় দেয় প্রায় তাবতেরি ভূম্যাদির কর এবং পরমিটের হাসিল বিশেষতঃ ডাকের মাসুলে প্রায় সর্ব্বদাই অনেক লোককে পয়সা দিতে হয় ইহাতে পয়সা বিষয়ের কষ্ট বোধ হইতে পারিবেক পরন্তু পূর্ব্বে কড়ির অধিক আমদানী হইত এবং অনেক কর্ম্মে কড়ি চলন ছিল পূর্ব্বদেশে কড়ির দ্বারা জমীদার লোক মালগুজারী করিত সে যাহা হউক গৃহস্থ লোকের কড়ি অত্যন্ত উপকারক ছিল যেহেতুক আহারীয় দ্রব্য বিক্রয় অর্থাৎ বাজারে

কেহ এক কাহন আট পণ ছয় পণ চারি পণ ইত্যাদি ব্যক্তি বিশেষে প্রেরণ করিয়া দ্রব্য আনয়ন করিতেন এবং দ্রব্যবিশেষে মূল্যের নির্ণয় করিয়া দিতেন অর্থাৎ ১৫ গণ্ডার তরকারী দশ কড়া ন্যূন এক পণের মৎস্য ষোল কড়ার শাক দেড়বুড়ির মোচা দশ কড়ার রম্ভা আট কড়ার চুণ ইত্যাদি হিসাব করিয়া কড়ি দেওয়া যাইত এইক্ষণে পয়সার বাহুল্যেতে কড়ি একেবারে অদৃশ্য হইয়াছে যদ্যপিও বণিকেরা কিঞ্চিৎ কড়ি রাখিয়া থাকে তাহা প্রায় দেওয়া নেওয়া হয় না বাজারে দ্রব্যের মূল্য এক পয়সা আধ পয়সার নূ্যন কোন দ্রব্য পাওয়া যায় না এবং বিক্রয়কারিরদের কোন দ্রব্যের মূল্য ইহার ন্যূন কহিলে তাহা গ্রাহ্য করে না যদ্যপি আধ পয়সা শাকের ভাগ স্থির হইল কিন্তু প্রয়োজন না থাকিলেও এক পয়সা দিয়া দুই ভাগ লইতে হয় অপর যদি আট কড়া দশ কড়াব কোন দ্রব্য লইতে হয় তথাপি একটা পয়সা তজ্জন্য বাজারে প্রেরণ করিতে হয় অধিক কি লিখিব এক কড়ার ভিক্ষারিরা এক পয়সা চাহে সুতবাং কড়ি না থাকিলে কাযে২ পয়সা দিতে হয় অথবা তাহাকে রিক্ত হস্তে বিদায় করিতে হয় অতএব এইক্ষণে প্রার্থনা মিণ্ট কমিটীর অর্থাৎ টাক্সালের বিবেচক সাহেবেরা বিবেচনা পুরঃসর ইহার বিহিত করিলে ভাল হয় আমার-দিগের মতে পয়সার রেজকী অর্থাৎ এমত কোন ধাতু দস্তা বা সীসা ইত্যাদির আধ পাই সিকি পাই প্রস্তুত করিয়া চলন করেন তাহা হইলে লোকের মহোপকার হইবেক এ বিষয় শুনিতে অতিসামান্য বটে কিন্তু দুঃখিলোকের পক্ষে সামান্য নহে ইহা বিশেষ অনুসন্ধান করিলে ব্যক্তিরদের ক্লেশ জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

[স. সে. ক. ২ । ৩২-৩৩].

৮. সমাচার চন্দ্রিকা। ২৯ মে ১৮৩০ : ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৭

মফঃসলে দারোগার সুরতহাল বিষয়ের আমারদিগের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে তাহা লিখি। কোন গ্রামে যদ্যপি ডাকাইতি কিম্বা চুরি অথবা খুনি বা দাঙ্গা হঙ্গামের সুরতহাল উপস্থিত হইল তবেই দারোগা বাহুস্ফোট অর্থাৎ তাল ঠুকিয়া বা বগল বাজাইয়া তথায় উপস্থিত হয় প্রথমে সুরতহালে চাসার হাল গরু যায় ভদ্রলোক নাজেহাল হয় তাহারদিগের কি হাল করিবেক তাহা স্থির করিতে পারে না শেষ হাড়ির হাল করিরা ছাড়ে অর্থাৎ সকল লোক ধরিয়া অগ্রে আপন লাভের নিমিত্ত অমর্য্যাদাপন্ন করে অর্থাৎ কয়েদ গালাগালি জামিন দাখিল ইত্যাদিতে তাহারা ভীত হইলে মাথট করিয়া

অভিলাষ মত টাকা আনিয়া দিলে শেষ যে কারণে তথায় গিয়াছে তাহার বিষয় অবগত হইয়া রিপোর্ট লেখে যাহাতে তাহার উপর কোন দোষ না স্পর্শে গ্রামের লোকদ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হইল ইত্যাদি লিখিয়া হজুর পাঠায় ইহা অনেক জজ তদারক করিয়া দারোগাকে শাজা দিয়া কর্ম্ম হইতে দূর করিয়াছেন কিন্তু তথাচ নিবারণ হয় না এ বিষয়ের নিমিত্ত এক সুনিয়ম্ হইলে ভাল হয়।

[স. সে. ক. ২। ৩৬২]

৬-সংখ্যক উদাহরণে গদ্যের তেমন কোনো বিশিষ্ট ভঙ্গি না থাকলেও, শহরের বাঙালিদের জন্যেই বিশেষ চিকিৎসার জায়গার প্রয়োজন সম্পর্কে লেখক নিঃসন্দেহ। সেই প্রয়োজনের যুক্তি দিতে গিয়ে তিনি অবিশ্যি প্রথমে শহরের দেশী সব মানুষের কথাই বলে ফেলেন, তখনকার ভাষায় যে-দেশী মানুষরাও বিদেশী। '…অনেক বিদেশি মনুষ্য আছে তাহারা পীড়িত হইলে পীড়া হইতে মুক্ত হইবার কোনো সাধারণ স্থান নাই ঐ সকল লোকের সামান্য রোগেতে সামান্য উপায়াভাবে প্রাণ নষ্ট হয়।' এই যুক্তিতেই এর পরের বাক্যে 'চাঁদনি চকে যে হাসপাতাল আছে সে শহরের মধ্যস্থানে নহে বাঙ্গালিটোলা হইতে অনেক দূর'। এই সব বাক্যে লেখক বিশেষণ ব্যবহারের সময় বাক্যের গঠনের চাইতে বাক্যের অর্থের ওপর জোর দিয়ে ফেলেন 'সামান্য রোগ' 'সামান্য উপায়ভাবে'—এ-রকম বাক্য তাই তাঁর সহজে আসে। বাক্যের অর্থের ওপর এই জোর দেয়ার ফলেই এ-রকম একটি লেখাতেও কাল (tense)-এর কোনো একটি-মাত্র চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না—যেমন ইংরেজিতে করতে হয়। লেখক স্বচ্ছন্দে 'নাই', 'পায় না', 'হইয়াছে ও হইতেছে' ব্যবহার করেন।

এই লক্ষণগুলি আরো স্পষ্ট হয়েছে পরের উদাহরণ দুটিতে। এই দুটি লেখায় কোনো সংবাদ দেয়ার অব্যবহিত দায় নেই, লেখক তাঁর মন্তব্যটিই জানাতে চান। সেই বক্তব্যটিকে ৭-সংখ্যক উদাহরণে একটু প্রমাণ দিয়ে বলতে হয়েছে আর ৮-সংখ্যক উদাহরণে প্রমাণ উল্লেখই করা হয় নি, শুধু মন্তব্যটিই করা হয়েছে। এই সব মন্তব্যে লেখকের কণ্ঠস্বরটিই কখনো কখনো প্রধান হয়ে ওঠে। বাক্য গঠনের যে-রীতি ইংরেজি বা সংস্কৃতের অনুকরণে দর্পণে চর্চিত হত, তা থেকে এই রীতি মূলত আলাদা, কারণ এখানে বাক্যের গঠন অনেক সময়ই মুখের ভাষাভঙ্গিকে অনুসরণ করছে।

উদাহরণ দুটি থেকে এই ভাষাভঙ্গির কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করা যায়।

৭-সংখ্যক উদাহরণে 'বিশ বৎসরের অধিক হইবেক', 'রেজকীর মধ্যে কেবল আধুলি সিকিমাত্র আছে', 'পয়সার ভাও সর্বত্র সমান থাকে না', 'কড়ির আমদানি হইতে', 'কড়ি চলন ছিল', 'জমিদার লোক মালগুজারী করিত', 'তাহা প্রায় দেওয়া নেওয়া হয় না', 'এক পয়সা আধ পয়সার ন্যূন কোন দ্রব্য পাওয়া যায় না', 'শাকের ভাগ', 'কড়ি না থাকিলে কাযে ২ পয়সা দিতে হয়।' ৮-সংখ্যক উদাহরণে '···সুরতহাল উপস্থিত হইল', 'দারোগা বাহুস্‌ফোট অর্থাৎ তাল ঠুকিয়া বা বগল বাজাইয়া তথায় উপস্থিত হয়', 'প্রথমে সুরতহালে চাসার হালগরু যায়', 'নাজেহাল হয়', 'কি হাল করিবেক', 'শেষ হাড়ির হাল করিয়া ছাড়ে'। ৭-সংখ্যক উদাহরণে পয়সাই নিম্নতম মুদ্রা হিশেবে চালু হওয়ায় ও কড়ি উঠে যাওয়ায় কী অসুবিধে তার বিবরণ দিতে গিয়ে লেখক বাঙালি বাড়ির বাজারের এক ফর্দ দিয়েছেন—"১৫ গণ্ডার তরকারী দশ কড়া ন্যূন এক পনের মৎস্য—ষোল কড়ার শাক দেড় বুড়ির মোচা দশ কড়ার রম্ভা আট কড়ার চূণ ইত্যাদি'। এই ফর্দটিই পুরো লেখাটির প্রধান বিষয়। পয়সা দিয়ে বাজার করতে গিয়ে এই ফর্দটি আর কার্যকর থাকছে না। ফলে, দৈনন্দিনের এই অভিজ্ঞতার চাপ লেখাটির ভিতরে এমন এক প্রত্যক্ষতা এনেছে, যার বেগে বাক্যের গঠন ও বাক্যগুলির পরম্পরা নির্ধারিত হয়। ঠিক সে-রকমই ৮-সংখ্যক উদাহরণেও অভিজ্ঞতার চাপ এত প্রত্যক্ষ যে পদবিন্যাসেব সামান্য গোলমাল বাক্যের প্রবাহে কোনো বাধা তৈরি করতে পারে না। 'কয়েদ গালাগালি জামিন দাখিল ইত্যাদিতে তাহারা ভীত হইলে মাথট [মাথায় ২] করিয়া অভিলাষ মত টাকা আনিয়া দিলে শেষ যে-কারণে তথায় গিয়াছে তাহার বিষয় অবগত হইয়া রিপোর্ট লেখে যাহাতে তাহার উপর কোন দোষ না স্পর্শে···।' একটি বাক্যে লেখক অবলীলায় একাধিক সমাপিকা ক্রিয়া, তিনটি অসমাপিকা ক্রিয়া, একটি যৌগিক ক্রিয়া ব্যবহার করে ফেলতে পারেন।

চন্দ্রিকার এই বাঙালি ব্যক্তিত্ব তার নিজস্ব, ও ইংরেজি-সংস্কৃত থেকে স্বতন্ত্র এই বাংলা গদ্য রচনায় অনেক বেশি প্রকট হয়েছে হিন্দু সমাজের সংস্কার সম্পর্কে নানা প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া।

কিন্তু সেই ব্যক্তিত্বের প্রকাশে একটি দ্বন্দ্বও ছিল। চন্দ্রিকা মনে করে যে সাহেবদের সমর্থন নিয়ে হিন্দু সমাজব্যবস্থার ওপর আক্রমণ বা তার সংস্কার চেষ্টাও অন্যায়। চন্দ্রিকা সেই কারণে হিন্দু সমাজকে তার প্রাক্-সংস্কার আকৃতিকেই রক্ষা করতে চায়। ভবানীচরণ 'ধর্মসভা'র মধ্য দিয়ে এই চেষ্টাকে

সামাজিক-সাংগঠনিক আকারও দিতে চেয়েছেন। 'ধর্মসভা'র সেই সামাজিক-সাংগঠনিক কর্মসূচিতে এমন কিছু ছিল না যা দিয়ে হিন্দু বাঙালিকে হিন্দু সমাজের প্রাক্-সংস্কার কাঠামোতে ধরে রাখা যায়। সেইজন্য যাঁরা হিন্দু ধর্মের প্রচলিত রীতিনীতি মানবেন না তাঁদের 'একঘরে' করা, বিভিন্ন দলপতি ও গোষ্ঠীপতির অধীনে হিন্দু সমাজকে ভাগ করা, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সম্মানী দেয়া, এমন-কি প্রাচীন পুঁথির অনুকরণে নতুন সংস্কৃত বই বাংলা হরফে ছেপে ও বাঁধাই করে বিক্রি করা—এই সমস্ত কৃত্রিম ব্যবস্থার সাহায্য নিচ্ছিলেন 'ধর্মসভা'। এই সব ব্যবস্থার কোনোটিরই কোনো সামাজিক বাধ্যতা ছিল না, থাকতে পারেও না। যাঁরা এ-ব্যবস্থা মেনে নিতে রাজি একমাত্র তাঁরাই এ-ব্যবস্থার অধীনে আসতে পারেন। সামাজিক শক্তির পারস্পরিক আঘাতে ও প্রতিঘাতে 'ধর্মসভা'র এ-সমস্ত চেষ্টা ভেসে গিয়েছে। এমন-কি সেই বিশেষ সময়েও 'ধর্মসভা'র এ-সব চেষ্টার কোনো মূল্য ছিল না।

কিন্তু সামাজিক ইতিহাসের দিক থেকে ব্যর্থ এই সব চেষ্টার কথাই তো তখন চন্দ্রিকায় লেখা হয়েছে। বাঙালি সমাজে চন্দ্রিকার প্রতিষ্ঠাকে সম্পাদক ভবানীচরণ ব্যবহারও করেছেন। চন্দ্রিকার রচনাগুলিতে ১৮৩০-এর পর বিশেষ-ভাবে এই বিষয়টিই প্রধান হয়ে উঠেছে যদিও ১৮৩০-এর আগেও চন্দ্রিকার রচনার তত্ত্বগত ভিত্তি ছিল হিন্দু বাঙালি সমাজ রক্ষার এই কর্মসূচি। ফলে ভবানীচরণের ও চন্দ্রিকার বিষয় হিশেবে এই প্রসঙ্গই সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। যাঁরা ভবানীচরণের অনুরাগী অথচ ধর্মসভার বিরোধী তাঁরা ভবানীচরণের মতো সাংবাদিকের এই সমস্ত কাজে তখন দুঃখিতও হয়েছেন। বোধ হয় সে-কারণেই ১৮৩৫-এ ভবানীচরণ খানিকটা কৈফিয়ত দেয়ার ভঙ্গিতেই আত্মপক্ষ সমর্থন করেছিলেন।

৯. সমাচার চন্দ্রিকা। ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫

চন্দ্রিকাপত্র হিন্দুর এডবোকেট ইহার বন্ধু হিন্দু ধর্ম্মিষ্ঠ মাত্র জানিবেন। যদিও কএক মাস অন্যান্য কএকটা সমাচারের কাগজ এতদ্দেশীয় ভাষায় প্রকাশ হইয়াছিল তাহারা সতীদ্বেষী বটে সেসকল হিন্দুর কাগজ নহে তৎপ্রমাণ কৌমুদী কাগজ মৃত রামমোহন রায়ের বঙ্গদূত শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের সুধাকর ঠাকুর বাবুদিগের অধীনে ছিল তাঁহারা কএক জন সতীদ্বেষী অতএব তাহাতে সপ্রমাণ হয় না যে এতদ্দেশীয় কাগজ ঐক্য করাতে শ্রীশ্রীযুত জানিলেন অধিকাংশ লোক সতীর বিপক্ষ। যদি হিন্দুদিগের আর কাগজ থাকিত অথবা

ইঙ্গরেজী সমাচার পত্রপ্রকাশকেরা অপক্ষপাতী হইতেন তবে শ্রীশ্রীযুত কি বিলাতবাসি মহাশয়রা জানিতে পারিতেন যে হিন্দু সকল কি প্রকার মনঃপীড়ায় পীড়িত হইয়াছেন। ইঙ্গরেজী কাগজপ্রকাশকেরা যদি পক্ষপাত-রহিত এমত অভিমান করেন তাহা করিতে পারেন না কেন না শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংলিসমেন কাগজের প্রোপ্রাইটর হইয়াছেন এবং হিরাল্ড-নামক কাগজ সর্জনকর্ত্তা তিনি এইক্ষণে তাহা বাঙ্গাল হরকরার মধ্যে প্রবিষ্ট অপর ইণ্ডিয়াগেজেটনামক পত্র এবং সে আফিস ঠাকুর বাবু ক্রয় করিয়া হরকরার শামিল করিয়া দিয়াছেন আমরা এমত শুনিয়াছি। ভাল জিজ্ঞাসা করি যদি কোন ব্যক্তি ঠাকুর বাবুর কোন দোষ প্রকাশ করে তাহা কি ঐ কাগজ নির্ব্বাহকেরা অপক্ষপাতী হইয়া প্রকাশ করেন এমত কদাচ পারেন না। অপর দর্পণকার মহাশয় যে ঠাকুর পক্ষে আছেন তাঁহার মতের বিপরীত কথা কি তিনি লিখিয়া থাকেন কিম্বা নমব ব্যাপারি গণের বিপক্ষ দর্পণকার ইহা ব্যক্ত হইয়াছে এই ক্ষণে ঐ নমক ব্যাপারিরা যে রোদন করিতেছে তাহা দর্পণে অর্পণ হইয়া থাকে অতএব সমাচারের কাগজের কথা কিছু কহিবেন না যে যে পক্ষে থাকে সে সেই পক্ষে লেখে তবে হিন্দু পক্ষে কেবল চন্দ্রিকা-ব্যতীত এইক্ষণে আর কোন কাগজ নাই।

[স. সে. ক. ২। ২৬৯-৭০]

হিন্দুসমাজকে রক্ষার জন্যে চন্দ্রিকার বাঙালি ব্যক্তিত্ব সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই প্রকাশের মধ্যেও দুটি স্পষ্ট ও প্রায় পরস্পর বিপরীত ভঙ্গি সক্রিয়।

সংস্কার যাঁরা করতে চান তাঁরা সাহেবদের বিশেষত সরকারের সমর্থন যে ভাবে পেয়েছিলেন, ভবানীচরণও সাহেবদের সমর্থন সেভাবেই চান। সাহেব-রাজার সমর্থন নিয়ে যদি হিন্দু সমাজের সংস্কার করা সম্ভব হয়, তা হলে সাহেব-রাজার সমর্থন নিয়ে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করাও নিশ্চয়ই সম্ভব। সেই কারণে সাহেবদের সম্পর্কে ভবানীচরণের ভাষা অধীনস্থ প্রজার ভাষা—আবেদনে কাতর, বঞ্চনায় অভিমানী, দুঃখে বিষণ্ণ। কিন্তু সব সময়ই রাজার কর্তৃত্ব ও সাহেবের মাহাত্ম্য তিনি স্বীকার করে নেন।

সাহেবরাজার সমর্থন যে হিন্দু ধর্মরক্ষার জন্যে পাওয়া যাচ্ছে না তার জন্যে ভবানীচরণ সব সময়ই দায়ী করেন সেই সব স্বদেশীয়দের যাঁরা সাহেবদের ভুল বুঝিয়ে তাঁদের সংস্কারের পক্ষে টেনে নেয়ার চেষ্টা করেন। সেই কারণে এই সব

সংস্কারপন্থী স্বদেশীয়দের সম্পর্কে—অনেক সময়ই তাঁদের 'সতীদ্বেষী' বলে পরিচয় দেয়া হয়—ভবানীচরণ ও চন্দ্রিকার ভাষা আক্রমণকারীর ভাষা—অভিযোগে নিষ্ঠুর, বঞ্চনায় ক্ষুব্ধ, ব্যর্থতায় হিংস্র। কোনো সময়ই এই স্বদেশীয়দের বাঙালি হিন্দু সমাজের অংশ বলে চন্দ্রিকা স্বীকার করে না।

বাঙালি ব্যক্তিত্বের এই দুই ধরনের প্রকাশ যত স্ববিরোধীই মনে হোক না কেন—চন্দ্রিকার গদ্যে এই দুটি ধরন প্রায় একসঙ্গেই সক্রিয় থেকেছে। ফলে. এই গদ্যের আশ্রয়ে বক্তব্য আরো জটিল হয়েছে, বক্তব্যের ভিতরের অংশগুলির অন্তর্গত সম্পর্কের টানাপোড়েনও নিয়তই বদলেছে। চন্দ্রিকা এই জটিলতাকেই ভাষা দিয়েছে।

১০. সমাচার চন্দ্রিকা। ১২ ডিসেম্বর ১৮২৯

লার্ড উলিয়ম বেণ্টিঙ্ক গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর এমন নহেন যে কেহ মিথ্যা কথা বা প্রশংসাসূচক কথার দ্বারা তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারিবেক ইহা আমরা বিশেষ জ্ঞাত আছি। যেহেতুক আমরা শুনিয়াছি শ্রীশ্রীযুতের অভিপ্রায় এই যে এ বিষয় যদি যথাশাস্ত্র না হয় তবে রহিত করিবেন আর যদ্যপি যথাশাস্ত্রসিদ্ধ হয় তবে ঐ সহগমনে যে যে কণ্টক আছে তাহাই রহিত করিবেন ইহাতেই স্পষ্ট বোধ হইতেছে শাস্ত্র বিচার না করিয়া কখন কোন আজ্ঞা দিবেন না এক্ষণে যে সকল কথা উঠিয়াছে সে গোলযোগমাত্র।

যথার্থ কথা ত্বরায় প্রকাশ পাইতে পারিবেক তাহা হইলেই এতদ্বিষয়ের দ্বেষি মহাশয়েরদিগের আস্ফালন ও তর্জনগর্জনের বিসর্জন হইবেক।

অপর প্রায় সকল ইঙ্গরেজী কাগজেই লিখিয়া থাকেন যে এতদ্দেশীয় অনেক হিন্দুর মত আছে কিন্তু তন্মধ্যে শ্রীযুত রামমোহন রায়ের নামমাত্র বাঙ্গাল হরকরায় প্রকাশ পাইয়াছে। উত্তর তিনি হিন্দুকুলোদ্ভব বটেন ইহাতে তাবৎ বা অনেক হিন্দুর মত কি প্রকারে সম্ভবে যদি বল তাঁহার পিতৃপুরুষের বা বংশের মত ইহাতে বুঝা যাইতে পারে তাহা হইলেও অনেক বলা যায় না। উত্তর তাহাও কদাচ নহে কেননা তাঁহার পিতৃপুরুষের ও বংশের আচার ধর্ম্মকর্ম্ম যাহা তাহা অনেকে জ্ঞাত আছেন ইঁহার তদ্বিপরীত দেখিতে শুনিতে পাই সুতরাং তাঁহার মত হইলেও তাঁহার বংশের মত বলা যায় না। পরন্তু সহমরণ রহিত বিষয়ে তাঁহাকে ইঙ্গরেজ সমাচারপত্রপ্রকাশকেরা প্রশংসা দিতেছেন তাহাতে আমরা দুঃখিত নহি কেননা যে কোন বিষয়ে যিনি প্রবৃত্ত হন তাহা সুসিদ্ধ করিতে পারিলে তাঁহাকে প্রশংসা দেওয়া উচিত তিনি ব্রাহ্মণীকেরল

মেকজিন অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সেবধিপ্রভৃতি গ্রন্থ করিয়া মিসনরিপ্রভৃতি গ্রীষ্টিয়ানের-দিগের নিকট অনেক প্রশংসা পাইয়াছিলেন এবং গুণপ্রকাশদ্বারা এদেশে সর্ব্বদাই প্রশংসা পাইতেছেন পাইবেন ইহাতে কে সন্দেহ করে।

[স. সে ক. ১। ২৫৭]

এই রচনাটির বাক্যগঠন লক্ষ করলে 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় ভবানীচরণ যে জটিল দ্বিধাকে ভাষায় প্রকাশ করতে চাইছিলেন তা যেন কিছুটা অনুমান করা যায়। এখানে প্রধানত সতীদাহ নিবারণ আইন পাশ করার বিরুদ্ধে সরকারের প্রধান প্রতিনিধি গভর্নর জেনারেলকে বোঝানোটাই লেখকের উদ্দেশ্য। সেই কারণে তিনি পরপর সুবিন্যস্ত যুক্তি উত্থাপন করেছেন। তাই প্রথমেই বলে নেয়া হল যে সতীদাহ নিবারণের পক্ষে 'অনেক হিন্দুর মত আছে' এই কথাটি অপ্রমাণিত। কেবল রামমোহন রায়ের নাম ছাড়া অন্য কোনো নাম কোনো কাগজে প্রকাশিত হয় নি। রামমোহন রায় সতীদাহনিবারণের পক্ষে সরকারের কাছে আবেদনের নেতা। অথচ এই রচনাতে একবারের জন্যেও রামমোহনের বিরুদ্ধে কিছু বলা হয় নি, এমন-কি, হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি হিশেবে তাঁর অধিকারও কোথাও অস্বীকৃত হয় নি। বরং প্রথমে বলে নেয়া হল 'তিনি হিন্দুকুলোদ্ভব বটেন'। তারপর লেখক নিজেই প্রশ্নটিকে ঘুরিয়ে উত্তর দিলেন, 'যদি বল তাঁহার পিতৃ-পুরুষের বা বংশের মত ইহাতে বুঝা যাইতে পারে তাহা হইলেও অনেক বলা যায় না।' অর্থাৎ একটি বংশের মত যদি মেনেও নেয়া যায়, তা হলেও তা সংখ্যার দিক থেকে নগণ্য। এর পরের ধাপে লেখক অত্যন্ত সংযত ভাষায় বলে দেন যে রামমোহন এ-ব্যাপারে তাঁর বংশের প্রতিনিধি নন—'তাঁহার পিতৃপুরুষের ও বংশের আচার ধর্ম্মকর্ম্ম যাহা তাহা অনেকে জ্ঞাত আছেন ইঁহার তদ্বিপরীত দেখিতে শুনিতে পাই সুতরাং তাঁহার মত হইলেও তাঁহার বংশের মত বলা যায় না।' এরও পর, রচনার একেবারে শেষে রামমোহনের প্রশংসা করে লেখক সতীদাহ বিষয়ে নিজের নিরপেক্ষতা সাহেবদের কাছে সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করেন। এই নিরপেক্ষতা প্রমাণের উদ্দেশ্যেই এই উদ্ধৃতির শুরুতে লর্ড বেন্টিঙ্কের নিরপেক্ষতার কাছে আবেদন করা হয়েছিল।

এই ছোট রচনাটিতে লেখকের সাবধানতা ও সংযম বিশেষ লক্ষ করার মতো। এই সব সামাজিক বিষয়ে চন্দ্রিকার অন্যান্য রচনায় যে তীব্র আক্রমণ দেখা যায়—এখানে তার লেশমাত্র নেই। বরং লেখক তাঁর সেই কণ্ঠস্বরকে অন্য একটি গ্রামে নিয়ে গেছেন। সেই স্বরগ্রামে বক্তব্যকে যুক্তিসিদ্ধ করাই তাঁর প্রধান

কাজ। 'যে সকল কথা উঠিয়াছে সে গোলযোগমাত্র', 'তিনি হিন্দু কুলোদ্ভব বটেন', 'তাহা হইলেও অনেক বলা যায় না', 'তাহাও কদাচ নহে'. 'দেখিতে শুনিতে পাই'—বাংলা বাচনের ঘনিষ্ঠ এই সমস্ত উক্তিতে লেখক নিজের কথার সেই যুক্তিসিদ্ধতাই প্রমাণ করতে চান। মনোভাব গোপন করে উদ্দেশ্যের যোগ্য ভাষা খোঁজার এই চেষ্টার দ্বন্দ্ব চন্দ্রিকার রচনাগুলিকে এক জটিল গদ্যসংগঠনের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল—সেখানে, যা বলা হচ্ছে. তার চাইতেও বেশি জরুরি হয়ে উঠছে, যা বলা হচ্ছে না সেই কথা।

এ-রকম আর-একটি রচনা থেকে আমরা উদাহরণ নিচ্ছি। সেখানেও দেখা যাবে হিন্দু সমাজের ও ধর্মের রীতিনীতি যাঁরা মানেন না তাঁদের বিরুদ্ধে. হিন্দু সমাজের রীতিনীতির পক্ষে. সরকারের সাহায্য চাওয়া হচ্ছে। সেখানে লেখক নিজের বক্তব্যকে যুক্তির পর যুক্তি দিয়েই উপস্থিত করছেন যদিও সেই প্রক্রিয়াতেই যাঁরা হিন্দুরীতিনীতি মানছেন না তাঁদের বিরুদ্ধে আক্রমণও করছেন। অথচ এ-রচনার লক্ষ সেই বিদ্রোহীরা নন. বরং. কিছুটা সরকার আর কিছুটা হিন্দু অভিভাবকেরা। এই ধরনের বিদ্রোহের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করাই লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যে লেখক কী ভাবে যুক্তিগুলোকে সাজিয়েছেন সেটা লক্ষণীয়।

১১. সমাচার চন্দ্রিকা। ১৪ মে ১৮৩১

শ্রীশ্রীযুত ইঙ্গলণ্ডাধিপতির অধীন এপ্রদেশে অর্থাৎ স্থবে বাঙ্গলা বেহার উড়িষ্যার মধ্যে যত মনুষ্য আছে ইহার মধ্যে হিন্দু ৯ নয় কোটি লোক হইবেক তন্মধ্যে কলিকাতানগরে তাহার সহস্রাংশের একাংশ হইবেক ইহাতে ৪।৫ পাঁচ শত বালক হিন্দুকালেজ এবং অন্যান্য ও মিসিনরিদিগের পাঠশালায় ইংরেজি বিদ্যাভ্যাস করিতেছে এই বালকগুলির মধ্যে ৩০।৪০ জন হইবেক নাস্তিক হইয়াছে ইহাতেই কি এদেশের তাবৎ হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্ম লোপ হইবেক এমত নহে এবং যাঁহারা এতদ্বিষয়ে চেষ্টিত আছেন তাঁহারদিগের আশালতা কদাচ ফলবতী হইবেক না কেননা ইহা অতি যথার্থ ধর্ম্ম তাহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন বিশেষতঃ মিসিনরি মহাশয়রা প্রায় ত্রিশ বৎসরাধিক হইবেক হিন্দুর ধর্ম্মলোপের যত্ন করিতেছেন এ পর্য্যন্ত কিছুই করিতে পারেন নাই অতএব আমরা এমত মনে করি না যে এ ধর্ম্ম একেবারে লোপ করিতে কাহার সাধ্য আছে তবে যে বারম্বার এবিষয়ে লিখিয়া দুঃখ জানাইতেছি তাহার কারণ এই যে যদি গোপনে কোন বালক অখাদ্যাদি খায় সেই বালক ঘরে গিয়া

পিতামাতার সহিত একত্র ভোজন করিবেক এবং হিন্দুর খাদ্যাদিদোষে জাতিপাত হইলে পুনর্ব্বার তাহার যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করিলে তাহার পরকাল ভাল হইবেক কিন্তু সে ব্যক্তি সমাজে ব্যবহার্য্য হইতে পারিবেক না আর যাহার সন্তানের এতাদৃশ দশা ঘটিবেক তাহার দুঃখের সীমা নাই যেহেতুক পুত্র জীবিত থাকিতে বোধ করিতে হইবেক যে সন্তানের মৃত্যু হইয়াছে কেননা তাহাকে সংসারে রাখিতে পারিবেন না এবং পরে জলপিণ্ডস্থলও মনে করিতে পারিবেন না ইত্যাদি কারণবশতঃ যত্ন করিতেছি রাজা মনোযোগ করিয়া ইহার দমন করেন তবে ভাল হয় পরন্তু ধার্ম্মিক রাজার এমত মানস নহে যে কোন ব্যক্তি স্বধর্ম্মচ্যুত হয় নতুবা হিন্দুসমূহ মধ্যেও অনেক মোছলমান ইংরেজ ইত্যাদি কি বাস করিতেছেন না আমরা বরঞ্চ এমত বিবেচনা করিব যে কএকজন পাতি ফিরিঙ্গি এদেশে হইল এক্ষণে হিন্দুর ধর্ম্ম লোপেচ্ছুকদিগকে জ্ঞাত করিতেছি তাঁহারা এ উদ্যোগে ক্ষান্ত হইলে ভাল হয় নাহইলে কেবল হাস্যাস্পদের পাত্র হইবেন মাত্র।

[স. সে. ক. ২। ২৩৫-৩৬]

লেখকের যুক্তিগুলিকে পর-পর সাজানো যায়—

১. দেশের জনসংখ্যার তুলনায় নাস্তিকদের সংখ্যা এতই সামান্য যে তাতে হিন্দু ধর্মের কিছু ক্ষতি হবে না।

২. মিশনারিরাও হিন্দুধর্মের কোনো ক্ষতি করতে পারে নি।

৩. হিন্দু ধর্মের নিয়ম অনুযায়ী খাওয়া সংক্রান্ত বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করলে পাপ হয়।

৪. প্রায়শ্চিত্ত করলে সেই পাপ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় ও পরকালে শাস্তি পেতে হয় না।

৫. কিন্তু ইহকালে সে ব্যক্তি আর সমাজে গৃহীত হয় না।

৬. ফলে সেই সন্তানকে সংসারে রাখা যাবে না।

৭. সে সন্তান মা-বাবার শ্রাদ্ধও করতে পারবে না।

৮. ছেলের হাতের আগুন বা পিণ্ড না পেলে আত্মার উদ্ধার হবে না।

৯. রাজাও নিশ্চয় চান না যে কেউ নিজের ধর্ম ছাড়ুক, সুতরাং এই সব দমন করার জন্যে রাজা ব্যবস্থা নিন।

১০. এতে হিন্দুদের খুব একটা এসে যায় না কারণ এ-শহরে হিন্দুদের মতোই

মুসলমান ও ইংরেজরাও তো আছে, তেমনি, এই সময় 'নাস্তিক'দের না-হয় পাতি ফিরিঙ্গি বলেই মেনে নেয়া যাবে।

এই যুক্তিগুলির মধ্যে ৮-সংখ্যক যুক্তিটি লেখা হয় নি কিন্তু ঐ যুক্তিটিই বাঙালি হিন্দুর কাছে সবচেয়ে বড়, লেখক সেখানে এসেই থেমে গেছেন। আর, রচনাটির মধ্যে হিন্দু হিশেবে একটা উচ্চমন্যতার ভঙ্গি বজায় রেখেছেন। 'এবং', 'কেননা', 'বিশেষতঃ', 'অতএব', 'তবে' 'যে', 'এই যে', 'কিন্তু', 'যেহেতুক' 'কারণবশতঃ', 'নতুবা'—এই সমস্ত পদ ব্যবহার করে রচনাটিকে যুক্তির দিক থেকে সংহত করা হয়েছে। দুই জায়গায় প্রশ্নের ভঙ্গিতে বলা হয়েছে 'ইহাতেই কি এদেশের তাবৎ হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্ম লোপ হইবেক', 'হিন্দুসমূহ মধ্যেও অনেক মোছলমান ইংরেজ ইত্যাদি কি বাস করিতেছেন না'। এতে সম্বোধনের একটি ভঙ্গি এসে গেছে। শেষে এই সম্বোধনের ভঙ্গিতেই যেন বলা হয়েছে—'তাঁহারা এ উদ্যোগে ক্ষান্ত হইলে ভাল হয়।'

যুক্তি পরম্পরার এই সংহতি দর্পণের গদ্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য কিন্তু এই সংহতি সত্ত্বেও চন্দ্রিকার গদ্য দর্পণের গদ্য থেকে যে পৃথক হয়ে যায় তার কারণ চন্দ্রিকার গদ্যে এই যুক্তিসংহতিটিও একটি ভঙ্গিমাত্র। দর্পণে সংযোজক পদ, হেত্বর্থক পদ, বিশেষণ পদ ব্যবহার ছিল বাক্যগঠনের অপরিহার্য উপাদান—সাহেবরা ও পণ্ডিতরা যে-ভাবে বাংলা গদ্যের বাক্য গঠন করতে চেয়েছিলেন তার প্রধান উপাদান। চন্দ্রিকায় সংযোজক পদ, বা হেত্বর্থক পদ, কোথাও-কোথাও বিশেষণেরও, ব্যবহার ঘটেছে— লেখক যে-ভাবে কথাটা বলতে চান, লেখাটাকে যে-রকম শোনাতে চান, নিজের বক্তব্যকে যে-স্বর দিতে চান তার প্রয়োজন অনুযায়ী। দর্পণের গদ্যে সাহেব ও পণ্ডিতদের আত্মসচেতনতা সক্রিয় ছিল বাংলা বাক্যের গঠন সম্পর্কে, চন্দ্রিকার গদ্যে লেখকদের আত্মসচেতনতা সক্রিয় ছিল বক্তব্যের উপস্থাপনা সম্পর্কে। তাই দর্পণে সংযোজক, হেত্বর্থক বা বিশেষণ পদ লেখকের কণ্ঠস্বরের লুপ্তি ঘটিয়ে একটা নিরপেক্ষ বাক্য গঠন করে তোলে। আর চন্দ্রিকাতে এই একই সংযোজক, হেত্বর্থক বা বিশেষণ পদ লেখকের স্বরভঙ্গিকে আরো স্পষ্ট করে তোলে। সমাপিকা ক্রিয়ানির্ভর ছোট-ছোট বাক্য কী ভাবে চন্দ্রিকায় একটা বড় বাক্যের অংশ মাত্র হয়ে যায় এই স্বরভঙ্গির ফলে—তা আমরা এর আগেই দেখেছি। এই উদাহরণটিতে তেমন হয় নি বরং সমাপিকা ক্রিয়ানির্ভর বাক্যগুলি যুক্তির এক-একটি ধাপকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছে। লেখকের গদ্যভঙ্গির মধ্যেই এই ভাগগুলি স্পষ্ট। 'এই বালকগুলির মধ্যে ৩০।৪০

জন হইবেক নাস্তিক হইয়াছে'—এ পর্যন্ত প্রথম ধাপ. 'কাহার সাধ্য আছে'—এ-পর্যন্ত দ্বিতীয় ধাপ, 'জলপিণ্ডস্থলও মনে করিতে পারিবেন না'—এ পর্যন্ত তৃতীয় ধাপ, তার পর চতুর্থ ধাপ। এর আগে যুক্তি পরম্পরার যে-তালিকা তৈরি করা হল তার সঙ্গে মেলালে দেখা যাবে গদ্যভঙ্গির চারটি ধাপ ঐ যুক্তি পরম্পরা-গুলির সঙ্গতিপূর্ণ।

দর্পণে যুক্তিপরায়ণতা এল গদ্যের গঠনের প্রয়োজনে আর চন্দ্রিকায় যুক্তি-পরায়ণতা এল ভঙ্গির দরকারে। কিন্তু গদ্যের এই প্রাথমিক স্তরে কোথাওই যুক্তির প্রয়োজনে যুক্তি এল না।

চন্দ্রিকা থেকে আর-দুটি উদাহরণ নিলে আমরা দেখতে পাব এই একই বিষয় নিয়ে চন্দ্রিকায় ভঙ্গির বৈচিত্র্যও এসেছে প্রচুর। কত অনায়াসে লেখক যুক্তি থেকে প্রহসনে, প্রহসন থেকে তিরস্কারে, তিরস্কার থেকে রাজার কাছে আবেদনে পৌঁছে গেছেন। এই ভঙ্গিবৈচিত্র্য গদ্যের চলৎশক্তিরই প্রমাণ। এই চলৎশক্তি এসেছিল চন্দ্রিকার ভাষার অনুবাদনিরপেক্ষ স্বনির্ভরতা ও স্বরের আত্মসচেতনতা থেকে। কিন্তু সেই চলৎশক্তি ব্যবহৃত হচ্ছিল চলৎশক্তিহীন এক হিন্দুব্যবস্থার সমর্থনে। ভাষার এই চলৎশক্তি তৈরি হচ্ছিল না সমাজের প্রবল আলোড়নের সংঘাত থেকে, সংঘাতের ফল হিশেবে। এই সমস্ত লেখাতে দুই বিরোধী শক্তির সংঘাতের যে-আভাস পাওয়া যায় তা নেহাতই ছায়াবাজি, সমাজসংস্কারপন্থী ও সমাজসংস্কারবিরোধী এই দুই ভাগ নেহাতই মেকি। তা স্পষ্ট হয় যখন বিদেশী ও বিধর্মী রাজার অধীনে বিপন্ন হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্যেও সেই রাজার কাছেই আবেদন করা হয়—রাজা জাতিমালা কাছারিতে ম্যাজিস্ট্রেটদের দিয়ে বিচার করিয়ে হিন্দুরীতি যারা ভাঙছেন তাঁদের শাস্তি দিন। হিন্দুধর্মও চাই, ম্যাজিস্ট্রেটও চাই—এই দুই চাওয়ার ভিতরের কোনো দ্বন্দ্ব রচনার মধ্যে বা গদ্যের ভঙ্গিতে আসে না, বরং যেন এই দুটি চাওয়ার ভিতরের সংগতিই এই রচনাটির ও এ-রকম আরো সব লেখার আধা-প্রহসন, আধা-আবেদনের ভঙ্গির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে।

১২. সমাচার চন্দ্রিকা। ৯ মে ১৮৩১

> এক্ষণে এতন্নগরে হিন্দুদিগের ঘরে২ অন্য কোন চর্চাপেক্ষা যে কএক জন নাস্তিক হইয়াছে ইহারদিগের কথোপকথনে অধিক কাল ক্ষেপণ হয় বিশেষতঃ ভাগ্যবন্ত লোকের বৈঠকখানায় প্রায় প্রতি দিন এই কথা হইয়া থাকে কেহ কহেন মহাশয় কি কাল হইল ধর্ম্মকর্ম্ম আর থাকে না কেহ কহেন কালের দোষ কেন দেও এই কলিকাল কি সর্ব্ব দেশ সর্ব্ব জাতির উপর নহে কেননা এমত

বুঝা যায় না যে অমুক ইঙ্গরেজ হিন্দু হইতে বাঞ্ছা করিয়াছেন এবং হিন্দুর কি মুসলমানের ন্যায় পোসাক পরিচ্ছদ করণপূর্ব্বক আপনি সুখ বোধ করেন অথবা যিনি২ বাঙ্গলা পার্সি ইত্যাদি এতদ্দেশীয় লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াছেন তাঁহারা পরস্পর এতদ্দেশীয় ভাষায় কথোপকথন করেন কি পত্রাদি লেখেন এতদ্দেশীয় ভাষাদি যাহা যিনি জ্ঞাত আছেন বিষয় নির্ব্বাহার্থে প্রয়োজনবশতঃ ব্যবহার করেন মাত্র অতএব কালবশতঃ ইহা হইয়াছে এমত সম্পূর্ণ স্বীকার করিতে পারি না। এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে ইদানীং যাহারা ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাস করিয়াছে তাহারদিগের মধ্যে যাহারা ভাল শিক্ষা করিয়াছে তাহারা প্রায় পরস্পর ইঙ্গরেজী ভাষা ভিন্ন পত্রাদি লেখে না এবং ইঙ্গরেজী কথা কহিতে পাইলে বাঙ্গলা বাক্য ব্যবহার করে না ইহারদিগের বাঞ্ছা এমনি হইয়াছে যে ঐ প্রকার পোসাক পরে তাহা পারে না ইহার কারণ আমি বিবেচনা করি সুন্দর দেখায় না অর্থাৎ ইউরোপীয় লোকেরদিগের শ্বেত বর্ণ ইহারা মলিন তাহারদিগের ন্যায় পোসাক পরিলে চাটগেঁয়ে ফিরিঙ্গি দেখায় দ্বিতীয় সেই পোসাক সহিত নিজ বাটীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে অন্য লোক দেখিয়া মনে করিবেক যে এক জন মেটে ফিরিঙ্গি ইহারদিগের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল ইত্যাদি দোষে সেই বেশ অবিকল করিতে পারে না কিন্তু ইহারদিগের ইচ্ছা বটে তাহা করে ইত্যাদি বিষয় শ্রবণ করিয়া কোন মহাশয় উত্তর করিলেন যে ইহারা যদি সাহেব লোকের সঙ্গে খানা খায় তবে সেই বর্ণ হইবেক ইহাতে সন্দেহ কি যেহেতু বর্ণ শব্দের অর্থাৎ জাতি ইঙ্গরেজের খাদ্য খাইলে তৎক্ষণাৎ তজ্জাতি প্রাপ্ত হইবেক দ্বিতীয় শ্বেতাশ্বেত ইত্যাদি বর্ণ ৺ইচ্ছায় কালে তাহার শ্বেত বর্ণ হইবেক তবে যদি বল সর্ব্বাঙ্গ শ্বেত কদাচ হয় ইহা হইতে পারে কিন্তু শরীরের মধ্যে যদি মুখখানি শ্বেত হইয়া উঠে তবেই তাহার অভিলাষ পূর্ণ হইবেক অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া শ্বেত মুখখানি সকলকে দেখাইবে এবং তাহার কালা মুখ ঘুচিবেক ইহা শ্রবণে এক ব্যক্তি কহিলেন মহাশয় যদি সকল মুখ শ্বেত না হয় কিয়দংশ হইয়া উঠে তবে কি হইবেক তাহা দেখিলে লোকে অবশ্যই মুখপোড়া কহিবেক এবং তিনি সে পোড়ার মুখ কাহাকেও দেখাইতে পারিবেন না ইত্যাদি বাক্যে কোন২ স্থানে কৌতুক হয় কোন স্থানে উদ্বেগ অর্থাৎ প্রাচীন বা প্রবীণ লোক সকল ভাবি দুঃখ বিবেচনা করিতেছেন।

পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করুন লোকের বিষয়কর্ম্মের এবং অন্যান্য সুখ

ইচ্ছা রাগরঙ্গাদির চেষ্টা সংপ্রতি কএক বৎসরাবধি প্রায় রহিত হইয়াছে ইহাতে প্রায় তাবৎ সংসারেই অসুখের সম্বাদ পাওয়া যায় ইহাতে ঐ নাস্তিক পশুদিগের সম্বাদে এমনি বোধ হয় যেমন অস্ত্রাঘাতে হইয়াছে যে ক্ষত তাহাকে লবণাক্ত করা হয় এইক্ষণে এই বিষয়ের গোল নিবৃত্ত হইলে আপাতত কিঞ্চিৎ জ্বালা নিবারণ হয় এ গোল নিবারণ করা রাজাভিন্ন কাহার সাধ্য নহে যেহেতুক যদ্যপি রাজাজ্ঞাক্রমে পূর্ব্ববৎ জাতিমালার এক কাছারী হয় এবং মাজিস্ত্রেটসাহেবদিগের উপর ভারার্পণ করেন যে তাবল্লোক আপনার আচার ব্যবহার ধর্ম্মযাজন না করিলে দণ্ডপ্রাপ্ত হইবেক এই আজ্ঞা প্রকাশ হইলেই ঐ ব্যলীকেরা তৎপর দিবসেই ব্রাহ্মণ দেখিয়া কহিবেক ঠাকুর মহাশয় প্রণাম করি দশ জনের সাক্ষাৎ জিহ্মণ হইলে অর্থাৎ হাই উঠিলে রাধাকৃষ্ণ রামনারায়ণ গোবিন্দ কালী দুর্গা ইত্যাদি নাম উচ্চারণপূর্ব্বক অঙ্গুলি ধ্বনি করিয়া আস্তিকতা জানাইবেক কেহ বা কোশা লইয়া প্রাতঃস্নানে যাইবেক কেহ তুলসীমালা ধারণ করিয়া সর্ব্বদা হরিবোল২ বলিবেক অতএব প্রার্থনা যে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর এই হুকুম জারী করিয়া আমারদিগের জাতি-ধর্ম্ম রক্ষাকরণপূর্ব্বক পুণ্যপ্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হউন এবং ব্যালীক বেটারদিগের তামাসা দেখুন।

[স. সে. ক. ২ । ২৩৬-৩৭]

১৩. সমাচার চন্দ্রিকা। ২০ এপ্রিল ১৮৩৩

চৈত্রোৎসব বিষয় নিবারণ নিমিত্ত এতদ্দেশীয় ও বিদেশীয় ব্যক্তিরা গবর্ণমেণ্টে প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং এই ব্রত অশাস্ত্র ইহা ভুয়োং লিখিয়াছেন কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহাতে মনোযোগমাত্র করেন নাই ইহাতে বোধ হয় ধারাবাহিক কর্ম্ম নিবারণ করিতে গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় নহে তদ্ধেতুক গত চৈত্রে পূর্ব্ব রীতিমত চৈত্রোৎসব হইয়াছে। এই সম্বাদে আমারদিগের হিন্দু পাঠক মহাশয়রা সন্তুষ্ট হইবেন যেহেতুক পূর্ব্বে এমত জনরব হইয়াছিল যে চৈত্রোৎসবের বাণফোঁড়া চড়ক প্রভৃতি কর্ম্ম সকল হিন্দু ধর্ম্মদ্বেষিরদিগের প্রার্থনানুসারে গবর্ণমেণ্ট নিবারণ করিবেন এবং কিম্বদন্তী দ্বারা জানা গিয়াছিল যে নিবারিত হইয়াছে, কিন্তু সে সকলি অলীক ব্যলীক বাক্য মাত্র। কিন্তু আশ্চর্য্য কথা যাহাতে গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি বা পাপমাত্র নাই তাদৃশ কর্ম্ম রহিতকরণে প্রজার মনঃপীড়া দিয়া রাজা অপযশঃ লভ্য করিবেন এ কি সম্ভব। ধর্ম্মদ্বেষি মহাশয়রা বিবেচনা করিয়াছেন আমরা রাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র

হইয়াছি প্রিয় গুণের কারণ অন্য কিছুই উপলব্ধি হয় না কেবল সতীনিবারণের আইন প্রকাশ জন্য ধন্যবাদ করিয়াছিলেন মাত্র। যদি বল রাজার আচার ব্যবহার বিদ্যা ধর্ম্ম প্রচারে তাঁহারা যত্নবান আছেন ইহাতে কি রাজপ্রিয় হয় না। উত্তর কদাচ নহে তৎপ্রমাণ এতদ্দেশে মিসনরি মহাশয়েরদিগের আগমন হইয়াছে বিশ বৎসরাবধি হইবেক ইহাতে প্রায় দুই শতাধিক লোক খ্রীষ্টিয়ান হইয়া থাকিবেক তাহারা তদাচার ব্যবহার ধর্ম্মযাজন করিতেছে তন্মধ্যে কেহ রাজার প্রিয় পাত্র এমত প্রকাশ পায় নাই অতএব প্রজা সকল স্ব২ ধর্ম্মযাজন করিয়া সুখে থাকে ইহাতেই রাজার তুষ্টি আছে। তবে যদি ধর্ম্মদ্বেষি মহাশয়রা এতদ্দেশীয়েরদিগের ধর্ম্ম কর্ম্ম আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তনকরণে নিতান্তই ইচ্ছুক হন তবে গবর্ণমেণ্টকে ক্লেশ না দিয়া আমারদের পরামর্শে প্রবৃত্ত হউন তাহাতে অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারিবেক ধর্ম্ম নাশেচ্ছুক দলের প্রধান মহাশয়েরদিগের অভিলাষ অনেক প্রকাশ পাইয়াছে যে দুর্গোৎসবাদি প্রতিমা পূজা না হয় পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ তর্পণাদি তাবৎ লোক রহিত করে সজ্ঞানপূর্ব্বক কাহার গঙ্গায় মৃত্যু না হয় ব্রাহ্মণের কৌলীন্য মর্য্যাদা উঠিয়া যায় সস্ত্রীক হইয়া সভায় গমনাগমন হয় আর বিধবা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ হইতে পারে এই এক ভারি অভিলাষ ইহাতে আমরা বলি তাঁহারা প্রথমতঃ আপনারাই সাহসিক হইয়া এই সকল কর্ম্মে প্রবৃত্ত হউন কেন না কিম্বদন্তী আছে "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" যেমন শ্রীযুত রামমোহন রায় অগ্রে বিলাত গমন করিলেন ইহার পরে কি আর কেহ যাইবে না এবং অন্য২ ব্যক্তির গমনোদ্‌যোগ কি শ্রুত হইতেছে না অতএব ইত্যবধানে আপনারা নিজ২ ভবনের বিধবাদিগের বিবাহ দেউন এবং স্ত্রী লইয়া সভায় গমনাগমন করুন তদ্দৃষ্টে অনেকেই তৎপশ্চাদ্‌গামী হইবেক। যদি বল সন্ধ্যাবন্দনাদি ও পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধাদি তাঁহারা বহু দিবস ত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু অদ্যাপি কেহ তদ্ধারাবাহিক কর্ম্ম করে না। উত্তর তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে করেন না কেন না মুখে বলেন পুত্তলিকা পূজা করা গর্হিত কর্ম্ম কিন্তু আপন বাটীতে প্রতিমা পূজা ও শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকেন তবে যদি মন্ত্রগুলি না পড়েন তাহা কে বিশ্বাস করে অতএব প্রতারণা পরিত্যাগপূর্ব্বক সহসা সাহসী হইয়া এই অসমসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারিবেক অতএব এমত সদুপায় সত্ত্বে সমাচার পত্রে লিখিয়া রাজা প্রজাকে বিরক্ত করিবার আবশ্যক কি।

[স. সে. ক. ২। ৫১৪]

দুটি উদাহরণেই লেখকের আক্রমণের ভঙ্গি লক্ষ করার মতো। প্রথম উদাহরণে (১২-সংখ্যক) তিনি হিন্দুধর্মের দুর্দশার কারণ যুগের রীতির ওপর চাপিয়ে দেয়ার সহজ যুক্তি প্রত্যাখ্যান করেন এক পাল্টা যুক্তি দিয়ে যে খ্রীস্টান বা ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের বেলায় যুগের রীতি ক্রিয়াশীল নয় কেন। সেখান থেকে তিনি অভিযুক্ত করেন, 'এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে ইদানীং যাহারা ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাস করিয়াছে', তাঁদের। এর পর তিনি ইংরেজ ও মুসলমানদের সঙ্গে ইংরেজি-শিক্ষিত হিন্দুদের তুলনা আরো এগিয়ে নেন—ইংরেজরা তো হিন্দু হতে চান না, বা, হিন্দু বা মুসলমানের মতো পোশাক পরেন না, বা, দেশীয় ভাষা শেখা সত্ত্বেও দেশীয় ভাষা সব সময় ব্যবহার করেন না। ঠিক এর বিপরীতে ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু 'পরস্পর ইঙ্গরেজী ভাষা ভিন্ন পত্রাদি লেখে না এবং ইঙ্গরেজী কথা কহিতে পাইলে বাঙ্গলা বাক্য ব্যবহার করে না।' ইংরেজের সঙ্গে ইংরেজি-শিক্ষিত হিন্দুর তুলনা করে লেখক ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দুকে কোণঠাসা করেন। সেই কোণঠাসা অবস্থায় তিনি তাঁকে ব্যঙ্গে ও শ্লেষে বিদ্ধ করেন—বাঙালির ইংরেজ হবার চেষ্টাকে মুখপোড়ানোর লোকপ্রচলিত উপমায় বর্ণনা করেন। রচনাটির প্রথমাংশের যুক্তিপরম্পরার জোরেই দ্বিতীয় অংশের এই শ্লেষ এমন অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু সেই যুক্তিতে যখন লেখক ইংরেজি-শিক্ষিত হিন্দুকে সাহেবদের সঙ্গে তুলনা করেন তখনই সাহেবদের শ্রেষ্ঠতার স্বীকৃতি থাকে। লেখক রচনার শেষাংশে আবার সেই শ্রেষ্ঠতার কাছেই আবেদন করেন, 'এ গোল নিবারণ করা রাজা ভিন্ন কাহার সাধ্য নহে।' এর পর জাতিমালা কাছারির ও ম্যাজিস্ট্রেটদের হাতে হিন্দুসমাজরক্ষার দায়িত্ব দেয়ার প্রস্তাব। রচনার প্রথমাংশে সাহেবদের শ্রেষ্ঠতার কথা এসেছিল তুলনা হিশেবে, শেষাংশে এল হিন্দুধর্মরক্ষার একমাত্র সম্ভাব্য 'সংগঠন' হিশেবে। ইংরেজি-শিক্ষিত হিন্দুরা সাহেবদের আচার-আচরণ নকল করছিল, চন্দ্রিকা যে তার প্রতিকারের জন্যে সাহেবদের হিন্দুসমাজের সমাজপতির স্বীকৃতি দিতেও রাজি—যুক্তির এই বৈপরীত্য তখন বোঝা যায় না। তাই, সাহেবদের শ্রেষ্ঠতার কথা বলেই রচনার শেষে আবার ইংরেজি-শিক্ষিত হিন্দুদের উদ্দেশে শ্লেষ। যদি সাহেবরা হিন্দুরীতিনীতি আচারের পক্ষে মত দেন তা হলে এই ইংরেজি-শিক্ষিত হিন্দু 'ব্যলীকেরা তৎপর দিবসেই ব্রাহ্মণ দেখিয়া কহিবেক ঠাকুর মহাশয় প্রণাম করি···হাই উঠিলে···কালী দুর্গা ইত্যাদি নাম উচ্চারণপূর্ব্বক অঙ্গুলি ধ্বনি করিয়া আস্তিকতা জানাইবেক কেহ বা কোশা লইয়া

প্রাতঃস্নানে যাইবেক।' সেইজন্যে 'প্রার্থনা যে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর এই হুকুম জারী করিয়া আমারদিগের জাতিধর্ম্ম রক্ষাকরণপূর্ব্বক পুণ্যপ্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হউন।'

চন্দ্রিকার উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট—'জাতিধর্ম্মরক্ষাকরণ'। সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রধান অবলম্বনও খুব স্পষ্ট—'শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর'। সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রধান অন্তরায়ও চিহ্নিত—'এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে ইদানীং যাহারা ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাস করিয়াছে' 'মুখপোড়া' সেই 'ব্যলীকেরা'। এমন স্পষ্ট বোধ ও শ্রেণী-ভাগের ফলে চন্দ্রিকার গদ্যরীতিতে কোনো অস্পষ্টতা বা কোনো দ্বিধা নেই। এই স্পষ্টতার ফলেই চন্দ্রিকা এমন অভ্রান্ত ও ইতস্ততবিহীনভাবে নিজের কণ্ঠস্বরের দ্রুত বদল ঘটাতে পারে—নিরপেক্ষ যুক্তির স্বর, স্তাবকতার স্বর, ব্যঙ্গের স্বর, আহত আত্মাভিমানের স্বর। দ্বিতীয় উদাহরণেও (১৩-সংখ্যক) স্বরের এই বৈচিত্র্য লেখাটিকে ব্যক্তিত্ব দিয়েছে। আর, এই স্বরবৈচিত্র্য সত্ত্বেও লেখাটিতে কোনো দ্বিধা আসে নি। বরং এখানে গাজনের মেলায় সরকার কোনো বাধা না-দেয়ায় সাফল্যের একটা পরোক্ষ আনন্দ লেখাটিতে ছড়িয়ে গেছে। ইংরেজি-শিক্ষিত হিন্দু 'ধর্ম্মদ্বেষিমহাশয়রা' 'রাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র'—এই ধারণাটিকেই এবার আক্রমণ করা হয়েছে। কারণ 'সতীনিবারণের আইন প্রকাশ জন্য ধন্যবাদ'কে 'রাজা'র সব সময়ের প্রিয়পাত্র থাকার কারণ বলে লেখক মেনে নিতে রাজি নন। এই রচনাটি প্রধানত ব্যবহৃত হয়েছে রাজার এই সব প্রিয়পাত্রের বিরুদ্ধে। তাই লেখক এই প্রিয়পাত্ররা কী কী কাজ করার প্রস্তাব দিয়ে থাকেন তার তালিকা দিয়ে পাল্টা প্রস্তাব দেন 'তাঁহারা প্রথমতঃ আপনারাই সাহসিক হইয়া এই সকল কর্ম্মে প্রবৃত্ত হউন'।

এই রচনারীতির মধ্যেই সংলাপের একটি নিহিত ধরন আছে। সংলাপের এই ধরনটির জন্যেই চন্দ্রিকার যে-রচনায় মুখের কথা হয়তো তত ব্যবহৃত হয় নি বা বাক্যের মধ্যে স্বরক্ষেপও তত প্রত্যক্ষ নয়, সে-রচনাতেও লেখকের প্রত্যক্ষ ভূমিকাটি বোঝা যায়, যেন পুরো রচনাটিই হয়ে ওঠে তাঁর কথা বলার আনুষঙ্গিক।

কথা বলার ভঙ্গিতে যুক্তি যেমন কখনো স্পষ্ট হয়, তেমনি কখনো আবার স্ববিরোধিতাও ঢাকা পড়ে যায়। 'ইংরেজি-শিক্ষিত হিন্দু' 'ধর্মদ্বেষি' 'ব্যলীকেরা' চন্দ্রিকার আক্রমণের লক্ষস্থল যেমন, তেমনি কখনো-কখনো ইংরেজি-শিক্ষিত অথচ ধর্মপরায়ণ হিন্দুরা তার আদর্শস্থলও হয়ে ওঠে। ইংরেজি শিক্ষা তখন দোষ

না থেকে গুণ হয়ে ওঠে। আর, ইংরেজি শিক্ষা সত্ত্বেও হিন্দুধর্মের প্রতি আসক্তি হয়ে ওঠে ইংরেজি-অশিক্ষিতের ধর্মপরায়ণতার চাইতেও বড় গুণ।

১৪. সমাচার চন্দ্রিকা। ২২ অক্টোবর ১৮৩১

... আমরা অবগত হইলাম কৈবল্য প্রাপ্ত বাবু গোপীমোহন ঠাকুরের পুত্রেরা পৈতৃক বার্ষিক দৈবকর্ম্ম ও পিতৃকর্ম্ম পালা মত করিয়া থাকেন। এবৎসর শ্রীশ্রী ৺শারদীয় পূজা শুনিতে পাই শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরেব পালা তিনিও উক্ত পূজা পূর্ব্বরীত্যানুসারে সুসম্পন্ন করিবেন তাহাতে সন্দেহ কি। এক্ষণে ক্ষুদ্র২ নাস্তিকদিগকে আমরা এই কহি যে তাহারা ইস্ মিস্ ঠিস্ শিক্ষিয়া কহিয়া থাকে যে ইঙ্গরেজী ভাল জানিলে সে ব্যক্তি পুতলা অর্থাৎ দেব দেবীর প্রতিমা পূজা করেন না কিন্তু কএক জন ছোঁড়া উক্ত বাবু হইতে ইঙ্গরেজী বিদ্যা অধিক শিক্ষিয়াছে ইহা কেহ সপ্রমাণ করুক।

অপর অনেকেই জ্ঞাত থাকিবেন শ্রীযুত বাবু নীলমণি দত্তের পুত্র শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত যেপ্রকার ইঙ্গরেজী বিদ্যায় পারগ আমরা অনুমান করি তাঁহার তুল্য অত্যল্প বাঙ্গালি ইঙ্গরেজী বিদ্যায় পারগ পাওয়া যায়। তিনি কি শ্রীশ্রী৺দুর্গোৎসবাদি করেন না। নাস্তিক নরাধমেরা তাঁহার বাটীতে গিয়া দেখিয়া আসুক শ্রীশ্রী৺অম্বিকার্চনের কি পারিপাট্য ও ভক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ঐ মহামহোৎসব সম্পন্ন হইতেছে।

অপিচ এক্ষণে যে কএক জন বাঙ্গালি সম্বাদপত্র সম্পাদক হইয়াছেন ইহার মধ্যে শ্রীযুত ভোলানাথ সেনকে ইঙ্গরেজী বিদ্যায় বিলক্ষণ পারগ বলিতে হইবেক। যেহেতু তিনি রিফারমরনামক ইঙ্গরেজী ভাষায় এক সমাচারপত্র প্রচার করিতেছেন এবং ঐ পত্রেও মধ্যে২ দেব দেবীর পূজার দ্বেষসম্বলিত প্রেরিতপত্র প্রকাশ হইয়া থাকে। অতএব সে সকল পত্রলেখক এবং কচি২ নাস্তিকদিগকে কহিতেছি তাহারা ঐ সেনজর বাটীতে গিয়া মহামায়ার প্রতিমা দর্শন করুক। এবং সেনজ সপরিবারে কি প্রকারে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান-পূর্ব্বক স্তবপাঠ করিবেন অর্থাৎ তাঁহারা অবশ্যই কহিবেন ধন্যোহংকৃত কৃত্যোহং সফলং জীবিতং মম। আগতাসি সদা দুর্গে মাহেশ্বরি মদালয়ং ইত্যাদি।

অতএব ইঙ্গরেজী বিদ্যা ভালরূপে শিক্ষা করিলেই দৈবকর্ম্ম পিতৃকর্ম্ম ত্যাগ করিতে হয় এমত নহে। যদি বল শ্রীযুত রামমোহন রায়ের সহিত যাঁহার-দিগের বিশেষ আত্মীয়তা আছে তাঁহারা তদুপদেশে উক্ত কর্ম্মে ক্ষান্ত

হইয়াছেন। ইহাও সত্য নহে কেননা শ্রীযুত কালীনাথ মুন্সী তাঁহার পরমাত্মীয় এবং তাঁহার স্থাপিত ব্রহ্মসভায় ইঁহার সর্ব্বদা গমনাগমন আছে তথায় যে প্রকার জ্ঞানোপদেশ হয় তাহা কি তিনি শ্রবণ করেন না ফলতঃ তাহাতে বিলক্ষণ মনোযোগ আছে। অথচ তাঁহার বাটীতে শ্রীশ্রী৺দুর্গোৎসবাদি তাবৎ কর্ম্ম হইয়া থাকে এবং শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু নবকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহদিগের সহিত কি রায়জীয় আত্মীয়তা নাই। অপরঞ্চ শ্রীযুত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুরের সহিত রামমোহন রায়ের আত্মীয়তা আছে কিন্তু রায়জী তাঁহার নিত্যকর্ম্ম বা কাম্যকর্ম্ম কিছুই রহিত করাইতে পারিয়াছেন তাহা কখনই পারিবেন না ঐ বাবুর বাটীতে ৺দুর্গোৎসব ৺শ্যামাপূজা ৺জগদ্ধাত্রী পূজা ইত্যাদি তাবৎ কর্ম্ম হইয়া থাকে। অতএব এমত কোন হিন্দু আছে যে দৈব ও পিতৃ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আপনাকে হিন্দু বলাইতে চাহে। উক্ত বাবুদিগের বাটীতে এই মহোৎসবে তাঁহারদিগের আত্মীয় তাবৎ লোক নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করিবেন অনুমান করি কেবল শ্রীযুত রাধাপ্রসাদ রায় ইহাতে বঞ্চিত হইবেন যেহেতু তিনি পিতার নিয়মের অন্যথা করিতে পারিবেন না কেননা আমরা অনেক দিবসাবধি শুনি নাই যে রামমোহন রায় কোন স্থানে প্রতিমা দর্শন করিতে গিয়াছিলেন কিন্তু প্রায় বিশ বৎসরের পূর্ব্বে দেবপূজা করিতেন এবং অনেক স্থানে দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন তাহা এতন্নগরেই দেখা শুনা গিয়াছে।

[স. সে ক. ২ । ২৪০-৪১]

১৫. সমাচার চন্দ্রিকা। ১২ নভেম্বর ১৮৩১

শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর।—সংপ্রতি কএক সপ্তাহাবধি ইষ্টিণ্ডিয়ান জানবুল ইণ্ডিয়াগেজেটনামক সমাচার পত্র ও সমাচার দর্পণ প্রভৃতি পত্রে সম্পাদক সাহেবেরা প্রসন্নকুমার বাবুর দেবীপূজাকরণবিষয় লইয়া মহান্দোলন করিতেছেন তাঁহারদিগের বোধে এ কর্ম্ম অত্যাশ্চর্য্য হইয়াছে। তাঁহারা কি জ্ঞান করিয়াছেন শিলা জলে ভাসিয়াছে কি দিবসে নক্ষত্রসকল দেদীপ্যমান হইয়াছে কিম্বা সর্পের পদদর্শন করা গেল অথবা পশ্চিমদিগে সূর্য্যোদয় হইল কিম্বা বহ্নি শীতল হইলেন বা পর্ব্বতে পদ্ম বিকসিত দেখিয়াছেন ইত্যাদি অসম্ভব দর্শনে যেপ্রকার লোক চমৎকৃত হইয়া থাকে উক্ত সম্পাদকেরা প্রায় সেইমত আশ্চর্য্য বোধ করিয়া মহাগোলযোগ উপস্থিত করিয়াছেন হায় কি ঘৃণার কথা প্রসন্নকুমার বাবু অতি সুবুদ্ধি বিদ্বান্ বিচক্ষণ বিখ্যাত বংশোদ্ভব

বৈকুণ্ঠবাসি ৺বাবু গোপীমোহন ঠাকুরের পুত্র যিনি ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য ধন্ত মান্ত দেবদেবীপূজাদিবিষয়ে পক্ষপাতশূন্য অর্থাৎ হিন্দুরদিগের উপাসনাকাণ্ডবিষয়ে যে ধারা আছে তন্মধ্যে পঞ্চদেবতার উপাসনা প্রধানরূপে চলিতা আছে ইহাতে কেহ শাক্ত কেহ শৈব কেহ গাণপত্য কেহ সৌর কেহবা বৈষ্ণবরূপে খ্যাত হইয়া আপন২ গুর্ব্বাদিষ্ট ধর্ম্ম রক্ষা করিতে অন্য ব্যক্তি তাঁহাকে পক্ষপাতি জ্ঞান করেন। বিশেষতঃ শাক্ত ও বৈষ্ণবের মধ্যে কাহার২ অত্যন্ত অনৈক্য দেখা যাইতেছে কিন্তু ইহার মধ্যে অপক্ষপাতি ব্যক্তি প্রশংসনীয় যেহেতুক তাঁহারা গুরূপদিষ্ট ইষ্ট দেবতার উপাসনা যথাবিহিত করিয়া থাকেন অন্য দেবতাও তাঁহার নিকট তত্তুল্য মান্য যেমন একেই পাঁচ পাঁচেই এক। এতাদৃশ ব্যক্তির মধ্যে উক্ত বাবু গণ্য ছিলেন তৎপ্রমাণ দেখুন শ্রীশ্রী৺বিষ্ণুবিগ্রহ নিজবাটীতে স্থাপনা করিয়াছেন এবং মূলাজোড়ে ৺গঙ্গাতীরে ৺কালীমূর্ত্তি ও শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া কিবা অপূর্ব্ব মন্দির নির্ম্মাণপূর্বক অপূব্ব সেবার পরিপাটী করিয়া গিয়াছেন তাঁহার কীর্ত্তিদর্শনে লোকসকল চমৎকৃত হয় এই মহামহিমাপন্ন মহাশয় আপন সন্তানদিগকে বিলক্ষণরূপে ধর্ম্মকর্ম্মাদির উপদেশ করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহারাও পৈতৃক ধারাবাহিক ঐহিক পারত্রিকের কর্ম্ম যথাসাধ্য সম্পন্ন করিতেছেন ইহাতে আশ্চর্য্য ব্যাপার কি হইয়াছে।

অবোধ বালক কএক জন যাহারা কিঞ্চিৎ ইঙ্গরেজী পড়িয়া পৈতৃক যে ধর্ম্ম দেবদেবীপূজা পিতৃশ্রাদ্ধাদি ত্যাগ করিয়াছে বা করিতে চাহে তাহারদিগের প্রবোধার্থ প্রসন্নকুমার বাবুপ্রভৃতি কএক জনের নাম দৃষ্টান্তার্থে লিখিয়াছিলাম।

অপর তাঁহার এবং তাঁহার সহোদরেরদিগের ব্রাহ্মণ্যানুষ্ঠান অর্থাৎ নিত্যকর্ম্ম ত্রিসন্ধ্যা করা ও স্থাপিত প্রতিমার সেবায় যত্ন ও নিয়মিতসময়ে দর্শন পূজন জপ যজ্ঞাদিতে কিপ্রকার রত ও পিত্রাদির শ্রাদ্ধে কেমত ব্যাকুলচিত্ত এবং তত্তৎকর্ম্মোপলক্ষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাদিকে দান করিতে কেমন সম্মত আর তাহাতে পিত্রাদির অক্ষয় স্বর্গের প্রতি কিপ্রকার বিশ্বাস এতাবৎ শ্রবণাবলোকন করিলে উক্ত সম্বাদপত্র প্রকাশকেরা বুঝি তাঁহাকে একেবারে হেয়জ্ঞান করেন যে ইহাঁর তুল্য অবিবেচক আর নাই।···

অপর উক্ত সম্পাদক মহাশয়েরা যদ্যপি এমত কহেন যে দেবদেবীর পূজাদি কর্ম্ম পরমার্থবিষয় ইহা লইয়া কি কৌতুক করা উচিত। উত্তর অস্মদাদির নাটক গ্রন্থ যদি উক্ত সম্পাদক মহাশয়েরা জ্ঞাত থাকেন অথবা ডাক্তর উইলসন সাহেবপ্রভৃতি যাঁহারা জ্ঞাত আছেন তাঁহারদিগকে জিজ্ঞাসা করেন

যে পরমার্থ চর্চাঘটিত কি প্রকার কাব্য কৌশল পূর্ব্বের রাজারা করিয়াছিলেন এক্ষণেও কালীয়দমনযাত্রা চণ্ডীযাত্রা রামযাত্রাপ্রভৃতি দর্শন করিলেও জানিতে পারিবেন। অতএব কৌতুকার্থ দেবদেবীর কথার আন্দোলন করিলেই তাহাতে দোষ স্পর্শে অথবা অমান্য করা হইল এমত নহে তত্তৎকর্ম্ম অকরণেই দোষ।

পরন্তু যদ্যপি উক্ত সম্পাদকেরা এমত কহেন যে শুনিয়াছি প্রসন্নকুমার বাবু নিজার্থ ব্যয়দ্বারা অনুবাদিকা অর্থাৎ রিফার্ম্মর কাগজের তরজমা বিনা মূল্যে এতদ্দেশীয়দিগকে দিতেছেন অতএব কৌতুকার্থে কি কেহ অর্থ ব্যয় করে। উত্তর আমারদিগের দেশের লোক কৌতুকার্থ কবিতাওয়ালার লড়াই শুনিয়া থাকেন এ বিষয়ও তিনি তাদৃশ বোধ করিয়া থাকিবেন যে রিফার্ম্মর ও ইষ্টিণ্ডিয়ান এই দুই কাগজের প্রকাশকদিগের বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত কিছু অর্থ ব্যয় করিয়া তামাসা দেখিব। অধিক কি লিখিব এইক্ষণে উক্ত সম্পাদক মহাশয়েরা প্রধান লোকেরদিগের হিন্দুয়ানি বিষয়ের বাদানুবাদে ক্ষান্ত থাকুন যদ্যপি দুই চারি জন ইতর জাতির বালক তাঁহার-দিগের মতে প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং সেই কএক ছোঁড়ার নাম আপন২ কাগজে বাবু উপাধি দিয়া তাহারদিগকে বড় লোক জানাইয়া অনেক বিষয় লিখিতেছেন কিন্তু আমরা তাহাতে ক্ষণেক কালের নিমিত্ত দুঃখিত বা ভাবিত নহি তাহারা অতিহেয় তাহারদিগের পরিবারেরা ঐ ছোঁড়াগুলাকে মলমূত্রের ন্যায় ত্যাগ করিয়াছে আপনারা ঐ অর্ব্বাচীন বালকদিগের বিষয়ে যাহা লিখিত হয় তাহাই লিখিবেন প্রসন্নকুমার বাবুপ্রভৃতি লোকের নাম উল্লেখ করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের নিন্দা চর্চা কিছুই করিবেন না ইহা করাতে তাঁহার মানের হানি আছে অতএব বিজ্ঞ সম্পাদকেরা এ বিষয়ে ক্ষান্ত হউন।

[স. সে ক. ২। ৫২৭-২৯]

১৪-সংখ্যক উদাহরণে লেখক একের পর এক দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রমাণ করেছেন 'ইঙ্গরেজি বিদ্যা ভালরূপে শিক্ষা করিলেই দৈবকর্ম্ম পিতৃকর্ম্ম ত্যাগ করিতে হয় এমত নহে।' যুক্তির সেই শৃঙ্খলায় তিনি শেষ পর্যন্ত রামমোহন রায় পর্যন্ত পৌঁছেছেন। রামমোহনের সহযোগী কয়েকজনের নাম করে তিনি দেখান যে ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে হিন্দু-আচারের কোনো বিরোধিতা নেই।

যুক্তির এই পরম্পরা লেখক ব্যবহার করেন প্রতিপক্ষের আচরণেব ফাঁক বুঝে। ব্রহ্মসভায় যাতায়াত কবেও বা রামমোহনের সমর্থক হয়েও হিন্দু কৌলিক আচার ত্যাগ না করায় রামমোহন-অনুগামীদের ব্যবহারে যে-ফাঁক ছিল, বা,

পৌত্তলিকতার বিরোধিতা করেও হিন্দু কৌলিক আচার রক্ষায় ইংরেজিশিক্ষিত হিন্দুদের কারো-কারো ব্যবহারে যে-ফাঁক ছিল—লেখক তাকেই ব্যবহার করেছেন।

ফলে, তাঁকে আগের যুক্তি থেকে সরে আসতে রয়েছে। তিনি এখন প্রাধান্য দিচ্ছেন কৌলিক আচার পালনের ওপর, ইংরেজি শিক্ষার ওপর নয়। এই সরে আসার ফলে ইংরেজি-শিক্ষিত হিন্দুদের ওপর লেখকের আক্রমণ হয়ে উঠতে পেরেছে আরো তীব্র—'এক্ষণে ক্ষুদ্র২ নাস্তিকদিগকে আমরা এই কহি যে তাহারা ইস্ মিস্ ঠিস্ শিক্ষিয়া কহিয়া থাকে যে ইঙ্গরেজী ভাল জানিলে সে ব্যক্তি পুত্তলা অর্থাৎ দেব-দেবীর প্রতিমা পূজা করেন না কিন্তু কএকজন ছোঁড়া উক্ত বাবু হইতে ইঙ্গরেজী বিদ্যা অধিক শিখিয়াছে ইহা কেহ সপ্রমাণ করুক।'

কিন্তু এই দুটি উদাহরণে আমরা চন্দ্রিকার গদ্যভঙ্গির একটি নতুন উপাদান পাই। সাহেবরাজার স্তাবকতা, ইংরেজিশিক্ষিত হিন্দুদের নিন্দা ও হিন্দুধর্মরক্ষার আবেদন—এই ভঙ্গির সঙ্গে এখানে যুক্ত হয়েছে ইংরেজিশিক্ষিত ধর্মপরায়ণ হিন্দু ভদ্রলোকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। এই উদাহরণগুলি চন্দ্রিকার পক্ষে অত্যন্ত দরকারি। অথচ যাঁদের নাম চন্দ্রিকা ব্যবহার করেছে হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁদের সবার পক্ষপাতিত্ব সমান নয়। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দুর্গাপূজা নিয়ে ইংরেজি কাগজে লেখালেখি হয়েছিল। লেখার উপলক্ষ প্রসন্নকুমার নিজেই জুটিয়েছিলেন। যৌথ সম্পত্তির অংশী হিশেবে তিনি যেমন কৌলিক পূজায় অংশ নেন, তেমনি আবার ব্যক্তিগতভাবে হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতার বিরোধিতাও করেন। সে-সব নিয়ে ঠাট্টাতামাসাও করেন। এমন-কি যে-রিফর্মার কাগজে হিন্দুধর্মের সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে তা নিজের পয়সায় কিনে বিলিও করেন।

অথচ চন্দ্রিকা এই প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দুর্গোৎসবকে হিন্দুধর্মের বিরাট জয় বলে প্রচার করতে চান। তাই একই সঙ্গে প্রসন্নকুমারের হিন্দু আচারের সমালোচনাকে 'কৌতুকার্থ দেব-দেবীর কথার আন্দোলন করিলেই তাহাতে দোষ স্পর্শে অথবা অমান্য করা হইল এমত নহে'—এ-রকম দুর্বল যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যার চেষ্টা, আবার সঙ্গে-সঙ্গে আক্রমণের ভঙ্গিতে এমন এক আলংকারিক রীতির আশ্রয় নেয়া যেখানে বক্তব্যের চাইতেও কথা বলার ভঙ্গিটিই প্রধান। 'তাঁহারা কি জ্ঞান করিয়াছেন শিলা জলে ভাসিয়াছে কি দিবসে নক্ষত্রসকল দেদীপ্যমান হইয়াছে কিম্বা সর্পের পদদর্শন করা গেল অথবা পশ্চিমদিকে সূর্য্যোদয় হইল কিম্বা বহ্নি শীতল হইলেন বা পর্বতে পদ্ম বিকশিত দেখিয়াছেন' ইত্যাদি।

চন্দ্রিকাতে হিন্দু-বাঙালির গুণপনা ব্যাখ্যা করতে প্রায়ই এ-রকম একটা আলংকারিক রীতি অবলম্বিত হয়েছে। ইংরেজি বাক্যের কাঠামো চন্দ্রিকায় ব্যবহৃত হয় নি। সংস্কৃত রচনারীতি চন্দ্রিকায় অনুসরণ করা হয় নি। অনুবাদের কোনো দায় চন্দ্রিকাকে বইতে হয় নি। তাই মৌলিক গদ্যের ভিতর লেখকের কণ্ঠস্বরও চিনে নেয়া গেছে। কিন্তু যখনই লেখক একজন হিন্দু বাঙালির গৌরবের বিষয়ে লিখেছেন, তখনই তিনি আলংকারিক এক ভঙ্গির আশ্রয় নেন। চন্দ্রিকায় এই আলংকারিক রীতি লেখকেব কণ্ঠস্বরকে চেপে দেয় নি। বরং কৃত্রিম এক প্রয়োজনবোধ থেকে সেই কণ্ঠস্বরের একটু চিৎকৃত ক্ষেপণই এই আলংকারিক রীতির ভিতর থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উদাহরণে বিপক্ষের যুক্তিও চন্দ্রিকার জানা আছে। তাই 'তাঁহার এবং তাঁহার সহোদরদিগের ব্রহ্মণ্যানুষ্ঠান অর্থাৎ নিত্যকর্ম্ম ত্রিসন্ধ্যা করা…' এ-সব কথা আড়ম্বরের সঙ্গে তাঁকে বলতে হয়েছে।

এই আলংকারিক ভঙ্গির নজির একসঙ্গে দেখা যায় চন্দ্রিকার শোকলেখন-গুলিতে। শোকলেখনের রীতি বাঙালি সমাজে ছিলই না। এই রীতি ও এর ভাষা ইংরেজি সংবাদপত্র থেকে প্রায় সরাসরি গ্রহণ করতে হয়েছে। এই শোক-লেখনগুলিতে লেখকের ব্যক্তিগত কণ্ঠস্বরও শুনে ফেলা যায় বটে, কিন্তু ব্যক্তিগতকে একটা সামাজিক উক্তির আকার দেয়াই এই লেখাগুলিতে লেখকের উদ্দেশ্য। সেখানে তাঁকে সংস্কৃত আলংকারিক রীতির বিশেষণবাহুল্য ও সমাস-সন্ধিনির্ভরতাই অবলম্বন করতে হয়। এর পরের উদাহরণগুলি একসঙ্গে পড়লে গদ্যভঙ্গির এই বৈশিষ্ট্য সহজেই ধরা পড়ে। কিন্তু তারও মধ্যে লেখক যখনই এই ধরনের শোকলেখনের রীতির বাইবেব কোনো প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন তখনই তাঁর গদ্যভঙ্গিও আলাদা হয়ে গেছে। যেমন ১৭-সংখ্যক উদাহরণে কানাই মল্লিক কী ভাবে মারা গেলেন তার বর্ণনা, বা, ২১-সংখ্যক উদাহরণের শেষাংশে দলগত কারণে কৃষ্ণচন্দ্র শেঠের শ্রাদ্ধে 'কতকগুলিন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের আগমনাভাব'-এর কারণনির্দেশ।

১৬. সমাচার চন্দ্রিকা। ৮ ডিসেম্বর ১৮২৭

রাজা শিবচন্দ্র রায়।— গত ৯ অগ্রহায়ণ শুক্রবার রাত্রিতে রাজা শিবচন্দ্র রায় পরলোকগত হইয়াছেন এক্ষণে তাঁহার বিশেষ যাহা অবগত আছি তাহা প্রকাশ করিতেছি রাজা শিবচন্দ্র রায় মহারাজ সুখময় রায় বাহাদুরের চতুর্থ পুত্র ইনি অতিবুদ্ধিমান ছিলেন বুদ্ধিমত্তাপ্রযুক্ত অনেকের নিকট প্রশংসান্বিত

হইয়া কালযাপন করিয়াছেন তাহার পৈত্রিক যে ধন ছিল তাহা পাঁচ সহোদর সহমানে সমান অংশ করিয়া লইয়া সেই ধন বৃদ্ধির দ্বারা অধিক করিয়াছিলেন তাঁহার টাকা প্রায় অপব্যয় হইয়াছে এমত শুনা যায় নাই বরঞ্চ সদ্ব্যয়ে সর্ব্বদা ব্যয় করিতেন যদ্যপি তাঁহার তাবৎ ব্যয়ের বিশেষ জ্ঞাত নহি তথাচ দেশ রাষ্ট্র আছে লিখি পশ্চিমদেশে নানা তীর্থ আছে সেই সকল তীর্থ আছে সেই সকল তীর্থ কর্ম্ম সাধনার্থ সাধু সকল গমন করিয়া থাকেন তাঁহারদিগের তীর্থ পর্য্যটনের নিমিত্ত গমনাগমনের এক প্রধান প্রতিবন্ধক কর্ম্মনাশা নদী আছে তাহার জল স্পর্শে তাবৎ কর্ম্ম নষ্ট হয় এই শঙ্কায় তৎকর্ম্ম সাধকেরা সশঙ্কিত হইয়া কর্ম্মনাশা নদী পার হইতে আত্যন্তিক ক্লেশ পাইতেন ইহার বিশেষ প্রায় অনেকে জ্ঞাত আছেন রাজা এই বৃত্তান্তাবগত হইয়া তাঁহার আত্মীয় বিজ্ঞবর শ্রীযুত কালিন সিক্রিপিয়ের সাহেবের সাহায্য-দ্বারা এক রজ্জুময় সেতু নির্ম্মাণ করাইয়া ঐ নদীর উপর স্থাপন করিয়া দিয়াছেন তাহাতে তীর্থযাত্রি সকল নিরুদ্বেগে তাহার উপর দিয়া কর্ম্মনাশা নদী পার হইতেছেন তাহাতে রাজসংক্রান্ত লোকের এবং তদ্দেশীয় প্রজাবর্গের গমনাগমনেও মহোপকার হইয়াছে অপর এতদ্দেশের বালকদিগের বিদ্যা উপার্জ্জনের উপায়ের নিমিত্ত যে নিয়ম স্থাপন হইয়াছে তাহাতেও অনেক টাকা দান করিয়াছেন ইহা ভিন্ন সর্ব্ব সাধারণের উপকার নিমিত্ত অনেক ধন ব্যয় করিয়াছেন অনুমান করি দেশাধিপের কর্ম্মাধ্যক্ষেরা এতাবৎ অবগত হইয়া তাঁহাকে বিশেষ মর্য্যাদা প্রদান করেন অর্থাৎ রাজা তিনি উপাধিপ্রাপ্ত হন এবং রাজপথে যানবাহনে গমনাগমনকালে রজতময় দণ্ড ও অস্ত্রাদি হস্তে যুক্ত পদাতিক সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতে রাজাজ্ঞাব্যতিরেকে কেহ পারেন না তিনি রাজাজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া আসা সোটা বল্লম ঢাল তলয়ারধারি পদাতিক সঙ্গে লইয়া গমন করিতেন এবং তাঁহার বাটীর দ্বারে সিপাহী অর্থাৎ যুদ্ধ সজ্জান্বিত সৈন্য বন্দুকে সঙ্গিনযুক্ত করিয়া দ্বার রক্ষা করিত ইত্যাদি রাজদত্ত মর্য্যাদার চিহ্নে চিহ্নিত ছিলেন।

অপরঞ্চ দিন যাপনের এক সুনিয়ম করিয়াছিলেন প্রাতঃকালাবধি নিদ্রাদশা পর্য্যন্ত যে সকল কর্ম্ম করিতে হয় তাহাও নিয়মপূর্ব্বক করিতেন অর্থাৎ প্রাতঃকালাবধি স্নানের সময়পর্য্যন্ত গুরু পুরোহিত ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবাদি লইয়া সদালাপ করিতেন এবং দানাদিকরণেরও ঐ সময় ছিল ভোজনান্তে আপন আমলাগণ লইয়া বিষয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন দিবাবসানে অর্থাৎ দুই

প্রহর চারি ঘণ্টার পর অনুগত আশ্রিত আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের সমাগম সময় ছিল সন্ধ্যার পরে খেলাতে বসিতেন সে সময় গাইন গুণি ভাঁড় খোসামুদে তোসামুদে ইয়ার মোসাহেবলোক সমভিব্যাহারে খোস মেজাজে থাকিতেন রাজার নিকট অনেক লোক প্রতিপালিত হইত আপন বিষয় কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে দেওয়ান খাজাঞ্চি মুহরির মুন্সি কেরাণি পদাতিকপ্রভৃতি ভিন্ন ও অনেক লোক মসহরা পাইত তাহারা কেবল দিনান্তে একবার আসিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিত মাত্র অতএব এমত লোকের মৃত্যুতে কি পর্য্যন্ত দুঃখ হয় তাহা বর্ণনা করা যায় না।

[স. সে. ক. ১ । ২১৬-১৭]

১৭. সমাচার চন্দ্রিকা। ১১ আগস্ট ১৮২৭

বাবু কানাই মল্লিকের লোকান্তর গমন।—আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে ২৮ শ্রাবণ শুক্রবার বেলা আড়াই প্রহরের মধ্যে বাবু নিমাইচরণ মল্লিকের চতুর্থ পুত্র বাবু রামকানাই মল্লিক লোকান্তর গমন করিয়াছেন তদ্বিবরণ এই শুনা গিয়াছে কোন পীড়া হয় নাই ঐ দিবস প্রাতে গাত্রোত্থান করণান্তর যে নিয়মিতমত প্রতি দিবস স্বকার্য্য সাধন করিয়া থাকেন তাহা করিয়া পুত্রের বিবাহ নির্ব্বাহের নানা পরামর্শ ও অন্য বাবু-দিগের সহিত তদ্বিষয়ের বহুবিধ কথোপকথন করিলেন এপর্য্যন্ত কোন ব্যামোহ বোধ হয় নাই তৎপরে প্রায় বেলা এগার ঘণ্টার সময়ে বহির্দেশে গমন করিয়া সেখান হইতে আসিয়া কহিলেন আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে এইপ্রকার দুই চারি বাক্য ব্যয়ের পরেই শ্বাসাদি মৃত্যুলক্ষণ হইবাতে ঐ বাটীর মধ্যে সহোদরাদি পরিবার যাঁহারা ছিলেন তাঁহারদিগের সহিত সাক্ষাৎ ও কথা হইয়াছিলমাত্র ইঁহার এই মৃত্যু সংবাদে বহুজনের খেদ হইয়াছে এবং হইবেক যেহেতুক ইনি অতি শিষ্ট সাম্প্রদায়িক মর্য্যাদক পরোপকারক সচ্ছীল মনুষ্য ছিলেন তাঁহার সহিত যাঁহার আলাপ হইয়াছে তিনিই বিশেষ জানেন।

[স. সে. ক. ১ । ২১৯-২০]

১৮. সমাচার চন্দ্রিকা। ৮ নবেম্বর ১৮২৮

৺বাবু রমানাথ ঠাকুর বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্যের পরলোকগমন।—আমরা মহা-খেদান্বিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে গত ১৬ কার্ত্তিক শুক্রবার রাত্রি দুই প্রহরের পর পাথরঘাটানিবাসি বাবু রমানাথ ঠাকুর ৫৭ বৎসর বয়স্ক হইয়া উদরাময় ও জ্বর রোগোপলক্ষে পরলোক গমন করিয়াছেন ইনি ইহলোক

পরিত্যাগ করাতে অনেক লোক দুঃখিত হইয়াছেন যেহেতুক ইঁহার অনেক গুণ ছিল ইনি ৺রামহরি ঠাকুরের পুত্র যিনি আপন ক্ষমতাতে বহুধন উপার্জ্জন করিয়া বহুবিধ দান করত এবং কুলকর্ম্ম করণপূর্ব্বক এই মহানগর মধ্যে গোষ্ঠীপতিত্ব পদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহার যশ কীর্ত্তি সর্ব্বত্র প্রকাশ আছে ইঁহার বিদ্যা সৌজন্যাদি যত কীর্ত্তি তাহা অনেকেই বিদিত আছেন তন্মধ্যে বিশেষ ইদানী চতুষ্পাটী করিয়া অনেক ছাত্রকে বেদান্ত দর্শন পড়াইতেন সুদ্ধ বিদ্যা দান করিতেন এমত নহে ইঁহার ছাত্রদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা ছিল না বাবুর নিকট অধ্যয়ন করিয়া কোন২ ছাত্র কৃতবিদ্য হইয়া টোল করিয়া পড়াইতেছেন তাঁহারদিগের টোল ও অধ্যাপনাকরণের ব্যয়ের আনুকূল্য যথেষ্ট করিতেন ঠাকুর বাবুর সংস্কৃত শাস্ত্রে অসাধারণ বিদ্যা ছিল এ-প্রযুক্ত বাবু ও ঠাকুর উপাধি থাকাতেও বিদ্যারত্ন উপাধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এমত লোক সংপ্রতি সম্ভবে না কেননা বাবু বিষয়ী লোকের নিকট বাবু ছিলেন সভায় বসিলে গোষ্ঠীপতি ঠাকুর হইতেন পণ্ডিতগণের সন্নিধানে বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য খ্যাত অতএব এমত লোকের পরলোক হওয়াতে কে না খেদিত হইতেছেন ও হইবেন বাবু বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য তিন সংসার করিয়াছিলেন তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা স্ত্রী বর্ত্তমানা ইঁহার সন্তান নাই মধ্যমা কনিষ্ঠা গতা তাঁহারদিগের দুই জনের দুই পুত্র হইয়াছে।

[স. সে. ক. ১ । ২২০-২১]

১৯. সমাচার চন্দ্রিকা । ১৫ আগস্ট ১৮২৯

বাবু হরিনাথ মল্লিকের পরলোকগমন। আমরা খেদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে আন্দুলনিবাসি বাবু হরিনাথ মল্লিক কোন বিশেষ পীড়ায় পীড়িত হইয়া গত ২৫ শ্রাবণ শনিবার রাত্রি দশ দণ্ডের পর পরলোক গমন করিয়াছেন তাঁহার বয়ঃক্রম অনুমান ৪০ চল্লিশ বৎসরের অধিক নহে এই অশুভ সম্বাদে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম যেহেতুক ঐশ্বর্য্যশালি লোক তদ্ভোগ না করিয়া অল্পকালে কালপ্রাপ্ত হইলে তাবতেরি মনে খেদ জন্মে।

[স. সে. ক. ১ । ২২১-২২]

২০. সমাচার চন্দ্রিকা । ২৪ মে ১৮২৫

শ্রাদ্ধোপলক্ষে দান।—বাবু রামদুলাল সরকারের শ্রাদ্ধে যে সকল দানাদি উৎসর্গ হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বে প্রকাশ করা গিয়াছে। শ্রাদ্ধ দিবসে দানাদির সহিত সুসজ্জিত সভার শোভার বিষয় বিশেষ বর্ণন করিয়া প্রকাশ করিতে

আমারদের মানস ছিল কিন্তু অনুসন্ধান করা গেল যে সকল লোক সভারোহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা কেহ বিশেষ লিখিয়া প্রেরণ করেন নাই সুতরাং তদ্বিষয়ে বর্ণনে ক্ষান্ত হইলাম। এক্ষণে সকল দান দ্রব্যাদি এবং মুদ্রাদিদ্বারা অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য নিমন্ত্রণাহূত রবাহূত উপস্থিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদিগের যাহা বিদায় করিয়াছেন এবং কাঙ্গালি বিদায়ের বিশেষ যাহা জনশ্রুতি তাহা প্রকাশ করিতেছি।

নবদ্বীপাদি নানাদেশবাসি প্রধান২ অধ্যাপকেরদিগকে নগদ ১০১ মুদ্রা ও রুপার ঘড়া এক। দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি অধ্যাপকেরদিগের নগদে ও রুপার তৈজসে ৭০।৬০।৫১।৪০।৩২।২৫ টাকা। উপস্থিতপত্র যাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহারদিগের বিদায় নগদ ৫ টাকা এক পিত্তলের ঘড়া কাহার বা গাড়ু এবং সিধার ১ কিম্বা ২ টাকা।

সুপারিসপত্রের নগদ ৮ টাকা এক পিত্তলের কলসী কাহার বা ৬ টাকা এক ঘড়া কাহার বা ৫ টাকা এক গাড়ু।

টিকিট পত্রের বিদায় ১।। কাহার ১ টাকা ১ থাল কাহার ১ টাকা কেহবা এক থাল ইত্যাদি।

কাঙ্গালি আপামর সাধারণ ১ টাকা। কাঙ্গালি অনুমান লক্ষ লোক হইয়াছিল ইহাতে এই আশ্চর্য্য যে তাবতেই পাইয়া অনুরাগ করিয়াছে। এবং কাহার ক্লেশমাত্র হয় নাই সকলেই সন্তোষ পাইয়া গিয়াছে।

জনশ্রুতি সভার চমৎকার শোভা হইয়াছিল এবং যাহারা অধ্যক্ষ ছিলেন তাঁহারা স্বীয় বিদ্যা বুদ্ধির দ্বারা ঐ কর্ম্ম নির্ব্বাহের অপূর্ব্ব ধারা করিয়াছিলেন তাহার যদি বিশেষ বৃত্তান্ত কেহ লিখিয়া পাঠান তাহাও আমরা উৎসাহপূর্ব্বক আগামিতে প্রকাশ করিব।

[স. সে. ক. ১। ২৬৩-৬৪]

২১. সমাচার চন্দ্রিকা। ২২ সেপ্টেম্বর ১৮২৭

বাবু কৃষ্ণচন্দ্র সেটের শ্রাদ্ধ।—গত ২৮ ভাদ্র বুধবার বাবু কৃষ্ণচন্দ্র সেটের আদ্য শ্রাদ্ধ হইয়াছে তদ্বিবরণ স্থূল বর্ণন করিয়া কএক পংক্তি প্রেরণ করি সম্বাদপত্রের এক দেশে স্থান দিবেন শ্রাদ্ধ অতিসমারোহপূর্ব্বক হইয়াছে রজত নির্মিতাষ্ট ষোড়শ এবং কাষ্ঠ নির্ম্মিত তদনুরূপ পর্য্যঙ্ক দুগ্ধফেণান্তকৃকৃত চিত্র বিচিত্রিত বস্ত্রে কিবা আশ্চর্য্য শয্যায় সুসজ্জিত হইয়াছিল এবং রৌপ্যদানাদির মধ্যবর্ত্তি মকমলনির্ম্মিত চমৎকৃত মছলন্দ বিস্তৃত তদুভয় পার্শ্বে পিত্তল

কলসে এবং থারি ঝারি সারিসারি শ্রেণীপুর্ব্বক রাখিয়া এই সকল দানাদির তিনদিগে উপবেশাসন প্রদান করা গিয়াছিল তদুপরি এক পার্শ্বে গোস্বামিবর্গ এবং তদুত্তরে মহামহোপাধ্যায়াধ্যাপক ভট্টাচার্য্য সামাজিক ব্রাহ্মণ কুলীন ও কুল শ্রান্ত শ্রোত্রীয় বংশজ ঠাকুর মহাশয়েরা গোষ্ঠীপতি বেষ্টিত হইয়া ধারামত বসিয়া কিবা সভার শোভা করিয়াছিলেন এবং দানসমূহের সম্মুখবর্ত্তি দলপতি ও তাঁহার দলস্থ সমস্ত কায়স্থ এবং কর্ম্মকর্ত্তার স্বজাতি জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধববর্গ বসিয়াছিলেন অন্যান্য দিগে গায়ক বাদক সংকীর্ত্তনাদি করিতেছে স্তুতি পাঠক ভাট বাক্কৌশলাদি করিতেছে সভার মধ্যে এক২ স্থানে দানাদি রক্ষার্থে শান্ত্রি দণ্ডায়মান আছে এবং কর্ম্মকর্ত্তা মন্ত্রি সমভিব্যাহারে বসিয়া দানোৎসর্গ করিতেছেন ইহাতে সভার শোভার সীমা হইয়াছিল।

এমত সময়ে সমাচার পাওয়া গেল যে কলিকাতাস্থ এবং অন্যান্য স্থানস্থ কতকগুলিন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের আগমনাভাব হইল তাহার কারণ দলাদলি প্রতিবন্ধক ইহাতে দলপতি দুঃখিত হইলেন না কেননা আপন২ দলের গণেরদিগের এইপ্রকার আটক করিতে হয় নচেৎ দলের আঁটি থাকে না কিন্তু ইহাতে কর্ম্মকর্ত্তার মনে খেদ জন্মিয়া থাকিবেক যেহেতু সকল দলের অধ্যাপকদিগকে দান দ্বারা সন্তোষ করিবেন মানস ছিল তাহা সম্পন্ন হইল না এক্ষণে শুনিতে পাই যে অধ্যাপকদিগের বিদায় আরম্ভ হইয়াছে একশত টাকা প্রধান দান এই নিয়ম হইয়া ধারাবাহিক বিদায় করিতেছেন ইহার বিশেষ অবগত হইয়া আগামিতে লিখিয়া পাঠাইব কাঙ্গালিদিগকে ।০. ৷৷০ আনা করিয়া দান করিয়াছেন অপর শুনিলাম যে যে সকল অধ্যাপক ঐ শ্রাদ্ধের দান গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারদিগকে মাসিক শ্রাদ্ধেও নিমন্ত্রণ করিবেন।

[স. সে. ক. ১ । ২৬৪-৬৫]

২২. সমাচার চন্দ্রিকা । ২০ মার্চ ১৮৩০

গয়ার শ্রাদ্ধের ঘটা।—গয়াধামের গত ২০ ফাল্গুণের পত্রের দ্বারা অবগত হইলাম যে ৺মহারাজ অমৃতরাও পেশোয়ার পুত্র শ্রীযুত মহারাজা বিনায়ক রাও পেশোয়া সংপ্রতি শ্রীশ্রীযুত ৺গয়াধামে পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছেন তদ্বিশেষ লেখা অত্যন্ত বাহুল্যপ্রযুক্ত স্থূল লিখিতেছি শ্রীশ্রী ৺গদাধরের পাদপদ্মে ১০০ স্বর্ণ পুত্তলিকা ওজন ৬০ তোলা স্বর্ণ তুলসীপত্র এবং তুলসীমঞ্জরী আর হীরার কলিকা ১০০ জরির হাসিয়া পাল্লাদার দোশালা ৩ এই সকল দ্রব্য দিয়া

পূজাপূর্ব্বক পিণ্ডদান করিয়া দক্ষিণা এক লক্ষ ছেষট্টি হাজার টাকা দিলেন পরে অক্ষয়বটমূলে শ্রাদ্ধ সাঙ্গ করিয়া পুনর্ব্বার পাঁচ হাজার টাকা দক্ষিণা দিলেন আর২ দ্রব্য ও ব্রাহ্মণভোজনের পরিপাটীর কি লিখিব দক্ষিণার সংখ্যা বিবেচনায় বিবেচনা করিবেন তথাকার গয়ালিরা কহেন যে এতাদৃশ ঘটাপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ দুই শত বৎসরের মধ্যে কেহ করেন নাই যাহা হউক এক ব্রাহ্মণকে একেবারে অদৈন্য ও অযাচক করিয়া দিয়াছেন।

[স. সে. ক. ১ । ২৬৫]

২৩. সমাচার চন্দ্রিকা । ৫ মার্চ ১৮৩৬

আমরা অতিখেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি খড়দহনিবাসি ৺প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস বাবুজী মহাশয় ন্যূনাধিক ৭০।৭৫ বৎসর বয়সে গত ১ ফালগুণ শুক্রবারে জাহ্নবীতীরনীরে জ্ঞান পুরঃসরে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। এই সম্বাদ শ্রবণে পাঠকগণে বিষাদিত হইবেন যেহেতু ইদানীন্তন এতাদৃশ ধনি ধার্ম্মিক বিচক্ষণ মনুষ্য অত্যল্প সম্ভব। যদিও তাঁহার গুণগ্রাম দিগদিগন্তর প্রকাশমান তথাপি রীত্যনুসারে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিলাম।

বিশ্বাস বাবুজী সত্যব্রত সদাব্রত পরোপকারব্রত ধার্ম্মিকতাব্রত এই ব্রতচতুষ্টয়ে বিশেষ খ্যাত তদ্বিশেষ এই যে আজন্মাবধি সত্যবাদী পরিমিত ভাষী মিথ্যাদ্বেষী যথার্থালাপী। দ্বিতীয় অসংখ্যাত অতিথি অভ্যাগতবর্গের মহাসম্মান পুরঃসর সুচারু বচন রচন সেবার পরিপাটী আহার প্রদান শয়ন-স্থানদান। তৃতীয় এবং চতুর্থ উপকারিতা শক্তি ও ধর্ম্মনিষ্ঠার কথা কি লিখিব বহুতর ধনব্যয়-পূর্ব্বক পণ্ডিতগণের সাহায্যে বিবিধ নিজরচিত সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিয়া বিনামূল্যে পাত্র বিশেষে নানাস্থানে বিতরণ করিয়াছেন বিশেষতঃ "প্রাণতোষণী" "প্রাণকৃষ্ণ ক্রিয়াম্বুধি" শব্দাম্বুধি ইত্যাদি। যাহাতে মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক মহাশয় মহোদয়গণের পরম সন্তোষ হইয়াছে যেহেতু যে কোন বিষয় অন্বেষণ করিতে হইলে নানা গ্রন্থ আন্দোলন করিতে হইত এক্ষণে উক্ত মহাশয়ের কল্যাণে সে কষ্ট নষ্ট হইয়াছে গ্রন্থের সুরীতি সুনিয়ম দ্বারা সকল বিষয়ই অনায়াসে পাওয়া যায়। অপর বৈষ্ণবামৃত গ্রন্থও অপূর্ব্ব সংগ্রহ প্রাণকৃষ্ণ ঔষধাবলিনামক গ্রন্থ গৌড়ীয় সাধু ভাষায় মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করেন। ঐ ঔষধাবলি গ্রন্থের দ্বারা অনেক লোক ঔষধ প্রস্তুত করিয়া আরোগ্য হইতেছে বিশেষ সামান্য চিকিৎসক অর্থাৎ যাহারা পেঁতের বৈদ্য রূপ খ্যাত তাহারা সেই গ্রন্থ দ্বারা মহোপকার স্বীকার করিয়াছে ইহা ভিন্ন আর

কএক খানি গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাও ছাপা হইয়া প্রকাশের সূচনা শুনা গিয়াছে। পরন্তু বহুতর দেবালয় জলাশয় দেবপ্রতিষ্ঠা বিপ্র সংস্থাপন সেতু সংক্রম সোপান নির্ম্মাণ ইত্যাদি বহুবিধ পুণ্য কর্ম্মের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠার সীমা কি নিজাধিকারে নানানগরে অনুগত আশ্রিত আত্মীয় স্বজন সজ্জনগণের অশেষ ক্লেশ মোচন করিয়াছেন ইহাতেই পরোপকারিতা ও ধার্ম্মিকতা বিশেষ প্রকাশ পাইতেছে।—

[স. সে. ক. ২ । ৪৫২-৫৩]

এই শোকলেখনগুলিতে চন্দ্রিকার ও ভবানীচরণের একটি চেষ্টাই প্রধান হয়ে উঠেছে। সে চেষ্টার কথা এই লেখাগুলির কোথাও স্পষ্ট ভাবে বলা হয় নি। কিন্তু চন্দ্রিকা মৃত ব্যক্তিদের হিন্দুধর্মের প্রতি নিষ্ঠা ও সামাজিক জীবনযাপনের প্রতি আগ্রহকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁদের অনেকেই খ্যাতনামা। কিন্তু সেই খ্যাতির প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সব সময় চন্দ্রিকার ধারণা মেলে নি। আর, এই সবের ভিতর দিয়ে চন্দ্রিকা এমন এক নাগরিকের ছবি ফুটিয়ে তুলতে চাইছিল, হিন্দু ও বাঙালি হয়েও যে-নাগরিক ইংরেজ রাজত্বে এক ধরনের প্রাধান্য পেয়েছে। এই ইংরেজ-অনুরাগী ও নাগরিক হিন্দু বাঙালির জন্যে এক ভূমিকা হয়তো ভবানীচরণ খুঁজছিলেন। তাঁর সেই খোঁজার সার্থকতা সম্পর্কে তিনি নিজেই সন্দিহান ছিলেন কখনো-কখনো, এমন কল্পনা যদি আমরা করি, তা হলে মনে হয়, চলমান সমাজে যে-প্রতিনিধিচরিত্র ভবানীচরণ পাচ্ছিলেন না, মৃত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে সেই চরিত্র তিনি নির্মাণ করে তোলার চেষ্টা করছিলেন।

১৬-সংখ্যক উদাহরণে রাজা শিবচন্দ্র রায় চন্দ্রিকার এই ইংরেজ অনুগ্রহধন্য নাগরিক হিন্দু বাঙালি টাইপটির যোগ্য প্রতিনিধি। প্রথম অনুচ্ছেদটিতে লেখক ইংরেজদের ও শিবচন্দ্র রায়ের সহযোগিতার ঘটনা বর্ণনা করেছেন আর সেই প্রসঙ্গেই বলেছেন তাঁকে সাহেবরা 'রাজা' উপাধি দেন। কিন্তু বর্ণনাটি এখানেই থামে না। এই রাজা-উপাধি পাওয়ার ফলে 'তিনি রাজাজ্ঞাপ্রাপ্ত, হইয়া আসাসোটা বল্লম ঢাল তলয়ারধারি পদাতিক সঙ্গে লইয়া গমন করিতেন এবং তাঁহার বাটীর দ্বারে সিপাহী অর্থাৎ যুদ্ধসজ্জান্বিত সৈন্য বন্দুকে সঙ্গিনযুক্ত করিয়া দ্বার রক্ষা করিত ইত্যাদি রাজদত্ত মর্য্যাদার চিহ্নে চিহ্নিত ছিলেন।'

চন্দ্রিকার পক্ষে এটা খুবই গৌরবের কিন্তু চন্দ্রিকা যে বাঙালিকে খুঁজছিল শুধুমাত্র এই গুণটি তার পক্ষে যথেষ্ট নয় তাই 'রাজদত্ত মর্য্যাদা'র চিহ্নগুলির বিবরণ দেয়ার পর চন্দ্রিকা এই শিবচন্দ্র রায়ের মধ্যে হিন্দু বাঙালির সামাজিক

গুণগুলি কী রকম ছিল তার বিবরণ দেয়। সেই সূত্রে ইংরেজ অনুগ্রহধন্য নাগরিক হিন্দু বাঙালির দিনযাপনের আদর্শটিও স্পষ্ট হয়। সকালে 'গুরু পুরোহিত ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবাদি লইয়া সদালাপ' ও 'দানাদি-করণ', দুপুরে 'বিষয়কর্ম্ম নির্ব্বাহ', বিকেলে 'বন্ধুবান্ধবের সমাগম', 'সন্ধ্যার পরে খেলাতে বসিতেন' ও 'খোস মেজাজে থাকিতেন।'

জীবনযাপনের এই দুই বৃত্তকে চন্দ্রিকা এক করতে চেয়েছিল। আর, এই দুই বৃত্তের মধ্যে বিরোধিতা চন্দ্রিকা স্বীকারই করতে চায় নি। চন্দ্রিকার কাছে এই বিরোধিতা কাল্পনিক।

১৮-সংখ্যক উদাহরণে '৺বাবু রমানাথ ঠাকুর বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্যের' শোক-লেখনে লেখক প্রায় সূত্রাকারে তাঁর এই বাঙালি ভদ্রলোকের টাইপটিকে, নির্দেশ করেছেন—'বাবু বিষয়ী লোকের নিকটে বাবু ছিলেন (,) সভায় বসিলে গোষ্ঠীপতি ঠাকুর হইতেন (,) পণ্ডিতগণের সন্নিধানে বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য (,)···।'

বাঙালি ভদ্রলোকের এই টাইপটি ভবানীচরণের কাছে সম্পূর্ণ কাল্পনিক ছিল না। তিনি যেমন এই ধরনের কিছু ব্যক্তিকে বেছে নিয়েছিলেন তেমনি কিছু ঘটনাও বেছে নিয়েছিলেন। সেই ঘটনাগুলি এই ধরনের টাইপকেই প্রতিষ্ঠা দেয়। বাঙালি ভদ্রলোকের এই টাইপটির প্রধান লক্ষণ তার সামাজিক ও আর্থিক সাফল্য। সেই নতুন ধরনের নাগরিক-সামাজিক ও আর্থিক সাফল্য তখন ইংরেজের সমর্থন ছাড়া প্রায় অসম্ভবই। সেই কারণেই ভবানীচরণের আবিষ্কৃত টাইপ ইংরেজ সাহায্যপুষ্ট। কিন্তু ভবানীচরণের কাছে গ্রাহ্য হয়ে ওঠার জন্যে সামাজিক ব্যবহারে এই ব্যক্তিদের হিন্দু রীতিনীতির দ্বারা চালিত হতেই হবে। আবার, এর বিপরীতে—ভবানীচরণ যেমন দুর্গোৎসব ইত্যাদি পুজোআর্চ্চায় খুশি হন, তেমনি আধুনিক নাগরিক জীবনযাপনে হিন্দু মূল্যবোধের সঙ্গে অন্বিত উদারতাও তিনি খোঁজেন। আমরা এখানে তিনটি উদাহরণ নিচ্ছি। প্রথম রচনা বাঙালির বাণিজ্য সম্পর্কে দ্বিতীয় রচনা দুর্গোৎসব সম্পর্কে, তৃতীয় রচনা দুই বাঙালির মধ্যে মামলা নিয়ে।

২৪. সমাচার চন্দ্রিকা। ৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩

বাণিজ্যবিষয়ক।—এতদ্দেশ উন্নতহওনের প্রধান কারণ বাণিজ্যকর্ম্ম ইহা অবশ্যই সর্ব্বজনকেই স্বীকার করিতে হইবেক যেহেতুক প্রত্যক্ষ প্রমাণ কেননা এতদ্দেশীয় লোক পূর্ব্বে অর্থাৎ যবনাধিকারকালে বাণিজ্যব্যবসায় অত্যল্প করিতেন তাহার কারণ জাহাজের গমনাগমন ছিল না ইঙ্গরেজ রাজার অধিকারহওনাবধি

অথবা কহ টুপিওয়ালা এদেশে আসিয়াছেন অবধি সওদাগরির বৃদ্ধি হইতে লাগিল তাহাতে সন্দেহ নাই কেননা ইঁহারদিগের আগমনেই জাহাজ দেখা গেল যে স্থানে জাহাজ যাইতে পারে সেইখানেই বাণিজ্যের প্রাচুর্য্য হয় অতএব সওদাগরির উন্নতি ইঙ্গরেজাবাদাবধিই স্বীকার করিতে হয়। ঐ ইঙ্গরেজদিগের মধ্যে যাঁহারা বাণিজ্যকুঠী করিয়াছিলেন এক্ষণে তাঁহারা প্রায় অনেকেই অবসন্ন হইয়াছেন ইহাতে বোধ হয় তজ্জাতির দ্বারা সওদাগরি কর্ম্মের কুঠীর বাহুল্য আর সংপ্রতি সম্ভবে না অতএব বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যাদির ভূম্যধিকারী অর্থাৎ জমীদার মহাশয়েরা আপন২ জমীদারীর মধ্যে যে২ দ্রব্যোৎপন্নের কুঠী ছিল সেই সকল দ্রব্যের কুঠী করিয়া বাণিজ্যকর্ম্ম করুন তাহাতে তাঁহারদিগের মহোপকার হইয়া দেশ উন্নত থাকিবেক যেহেতুক যে সকল কাপ্তান লোক এদেশে নানা দ্রব্য ক্রয়ার্থে আসিয়া থাকেন তাঁহারা যদি জানিতে পারেন যে পূর্ব্বমত দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে তবে তাঁহারা অবশ্যই আগমন করিবেন। যদি জমীদার মহাশয়েরা এমত বিবেচনা করেন যে ইঙ্গরেজ লোক সওদাগরি করিয়া দেউলিয়া হইয়া গেলেন আমরা তাহাতে কিপ্রকারে মুনাফা করিব। উত্তর এতদ্দেশীয় জমীদার লোক ঐপ্রকার বাণিজ্যকুঠী করিলে তাঁহারদিগের ক্ষতি-হওনের সম্ভাবনা কখনই নাই লভ্যই প্রত্যাশা করা যায় তবে কর্ম্মের গতিকে কখন ন্যূন কখন অধিক লভ্যের বিষয়েই বিবেচনা হইবেক তৎ প্রমাণ যে সকল জমীদারেরা আপন২ অধিকারের মধ্যে নীলের কুঠী করিয়াছেন তাঁহারাই জ্ঞাত আছেন লভ্যভিন্ন কদাচ ক্ষতি হয় নাই যে বৎসর তাঁহারদিগের নীল অল্প জন্মে অথবা অল্প মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে সেই সনের হিসাব দৃষ্টি করিবেন ইঙ্গরেজ লোকের কুঠীতে যে ব্যয় হয় তাহার চতুর্থাংশের একাংশ ব্যয়ে সেইমত তৎপরিমিত দ্রব্য এতদ্দেশীয় লোককর্তৃক প্রস্তুত হইতে পারে বিশেষ জমীদার লোকের ··। যদি তাঁহারা ঔদাস্য বা আলস্যবশতঃ বাণিজ্যবিষয়ে মনোযোগ না করেন তবে তাঁহারদিগের কর আদায়হওনেরও ব্যাঘাত হইবেক ইহাতে সন্দেহ নাই। যদি বল পূর্ব্বে কি রাজকর আদায় হইত না। উত্তর বর্ত্তমান সময়ে যে প্রকার ভূমিসকল হাসিল হইয়াছে পূর্ব্বে এমত ছিল না অনেক ভূমি পতিত ও রাজজঙ্গল ছিল এক্ষণে কাহার জমীদারীর মধ্যে তাদৃশ পতিত বা গরআবাদি জঙ্গল দেখাইতে পারিবেন না তাহার এক প্রধান প্রমাণ পত্তুনে তালুক। দেখ জমীদারের মুনাফাসুদ্ধ তাবৎ মালগুজারী সন২ আদায় করে অথচ পাঁচ গুণের ন্যূন নহে পণ দিয়া পত্তুনে তালুক লয় তার পর দরপত্তুনে সে

পত্তনে চাহার পঞ্চম পত্তনে পর্য্যন্ত তালুকদার হইয়াছে ইহার কারণ কেবল ভূমি হাসিল হওয়া নিশ্চয় জানিবেন অতএব সওদাগরির হিত হইলে এ তাবৎ পত্তনে উঠিয়া গিয়া পুনর্ব্বার জমীদারী মধ্যে রাইয়ত নূতন পত্তন করিতে হইবেক অতএব আমরা বিশেষ বিবেচনা করিয়াছি জমীদার লোক সওদাগরি করিলে দেশের পরম মঙ্গল নচেৎ কিঞ্চিৎকাল পরেই ছারখার হইবেক তৎপরে কলনাইজ অর্থাৎ এ মুলুক আবাদকরণার্থ নানা দিগ্‌দেশীয় লোক আসিয়া চাসবাস করিবেক এবং জমীদার হইবেক অধিক কি লিখিব।

[স. সে. ক. ২। ৩৩৮-৩৯]

২৫. সমাচার চন্দ্রিকা। ১৩ অক্টোবর ১৮৩২

শ্রীশ্রী৺শারদীয় পূজা সুপ্রতুলরূপে সুসম্পন্না।...এতন্নিকটবর্ত্তি স্থানসকলেতে শ্রীশ্রীমহামায়ার মহাপূজা মহাঘটাপূর্ব্বক সুপ্রতুলরূপে সুসম্পন্না হইয়াছে এই পূজোপলক্ষে নগরমধ্যে নৃত্যগীতাদির বাহুল্য তিন চারি স্থানে হইয়াছিল অর্থাৎ শোভাবাজারের মহারাজ বাহাদুরের উভয় বাটীতে ধারাবাহিক বোধন নবমীঅবধি মহানবমী পর্য্যন্ত নাচ তামাসা হইয়াছে তদ্দর্শনে এতদ্দেশীয় ও নানা দিগ্‌দেশীয় এবং উচ্চপদাভিষিক্ত সাহেব লোক গমন করিয়াছিলেন তদ্ভিন্ন শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের বাটীতে প্রতিপদবধি নবমী পর্য্যন্ত নাচ হয় তথায় নেক্কী প্রভৃতি নর্ত্তকী নিযুক্তা ছিল ইহাতেই সকলে বিবেচনা করিতে পারিবেন তদ্বিষয়ে কিপ্রকার আমোদ হইয়াছে। পরন্তু শ্রীযুত মহারাজ হরিনাথ রায় বাহাদুর শ্রীশ্রী৺পূজার সময়ে মুরশিদাবাদের বাটীতে গমন করেন নাই এজন্য এই স্থানেই অম্বিকার্চ্চন করিয়াছেন যদ্যপিও রাজা বাহাদুর শারীরিক কিঞ্চিৎ ক্লিষ্ট আছেন তথাপি রাজার মত কর্ম্মের কোন প্রকারেই ক্রটি হয় নাই কেননা তিনি অতিধার্ম্মিক জ্ঞানী ধনী যথাবিহিত অর্থাৎ অর্চ্চকস্য তপোযোগাদর্চ্চন-স্যাতিশায়নাৎ। অভিরুপ্যাচ্চ বিম্বানাংদেবঃ সান্নিধ্যমৃচ্ছতি ইত্যবধানে অপূর্ব্ব-রূপে প্রতিমা নির্ম্মাণপূর্ব্বক এবং নানা শাস্ত্রবিশারদ সুব্রাহ্মণদিগকে অর্চ্চনাদি কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং দ্রব্যাদির আতিশয্যের সীমা কি। অপর এখানকার ধর্ম্মসভামতাবলম্বি প্রায় যাবদীয় ব্যবসায়ি অধ্যাপক নিমন্ত্রণ করিয়াছেন এবং এতাদৃশ বাহুল্যব্যাপারেও নৃত্যগীতাদির অল্পতা নহে বিশেষতঃ বিসর্জ্জনকালে ৺গঙ্গার উপরে নৌকা শ্রেণীবদ্ধপূর্ব্বক তদুপরি নাচ হয় এপ্রকার তামসা কলিকাতায় কএক বৎসর রহিত হইয়াছিল তাহাতে যাঁহারা২ অসুখী হইয়াছিলেন তাহারদিগেরও সে ক্ষোভ দূর হইয়াছে। শ্রীশ্রী ৺পূজার

সময়ে যেপ্রকার ঘটা কলিকাতায় হইত এক্ষণে তাহার ন্যূন হইয়াছে কেননা ৺বাবু গোপীমোহন ঠাকুর ও মহারাজ সুখময় রায় বাহাদুর ও বাবু নিমাইচরণ মল্লিক প্রভৃতি ইহাঁরা পূজার সময়ে নাচ তামাসাদির অত্যন্ত বাহুল্য করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহারদিগের বাটীর সম্মুখ রাস্তায় প্রায় পূজার তিন রাত্রিতে পদব্রজে লোকের গমনাগমনহওয়া ভার ছিল যেহেতুক ইঙ্গরেজ প্রভৃতি লোকের শকটাদির ও যানবাহনের বহুলবাহুল্যে পথ রোধ হইত। উক্ত মহাশয়দিগের স্বর্গারোহণ হইলে তদ্বিষয়ের কিঞ্চিৎ ন্যূন হয় মল্লিক বাবুদিগের পূজার পালা আট অংশ হইল তাঁহারা বহুদিবস পরে এক জন পালা পান সেই বৎসরই পূর্ব্বরীতি মত কর্ম্ম করেন তথাচ রাজা সুখময় রায় বাহাদুরের পুত্রেরা ও ঠাকুর বাবুর সন্তানেরা এবং শ্রীযুত বাবু দয়ালচাঁদ আঢ্য অনেক দিবস পূজার সময়ে নাচ করিয়াছেন শেষ ক্রমে২ উক্ত মহাশয়েরা ক্ষান্ত হইলেন কিন্তু শোভাবাজারের রাজবাটীতে এবং যোড়াসাঁকোর সিংহ বাবুরদিগের বাটীতে প্রতিবৎসর নাচ হইয়া থাকে এবৎসর সিংহ বাবুরা ক্ষান্ত হইয়াছেন ইহার কারণ আমরা কিছুই জ্ঞাতনহি যাহা হউক ইদানীং এই নগরমধ্যে চারি স্থানে নাচের বাহুল্য ছিল সিংহ বাবুরদিগের বাটীতে না হওয়াতে মনে ক্ষোভ হইয়াছিল মহারাজ হরিনাথ রায় বাহাদুর এস্থানে পূজাকরাতে আমারদিগের আনন্দের অঙ্গ হীন না হইয়া চারি পাদ পরিপূর্ণ হইয়াছে অতএব প্রার্থনা রাজা বাহাদুর ঝটিতি অরোগী হইয়া এই মহানগরে বাসকরত দুর্গোৎসবাদি কর্ম্ম করিয়া এপ্রদেশীয়দিগের আনন্দজনক হউন।···

[স. সে. ক. ২। ২৮৪-৮৫]

২৬. সমাচার চন্দ্রিকা। ৩০ এপ্রিল ১৮৩৬

যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ। —অত্র প্রমাণ শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব ও শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ দেব শ্রীযুত বাবু হরলাল ঠাকুরের তালুক আর এক বাগান দুই লক্ষ টাকা পণ যাহাতে খরিদ করেন তাহার খরিদকী প্রভৃতি কাগজ পত্র যে প্রকার করিয়া লইতে হয় তাহা যথাকর্ত্তব্য করিয়া লন তাহাতে উকীল সাক্ষী এবং রেজেষ্টরীও হয় ঐ দুই লক্ষ টাকা শোধে কেবল মোহর চাহিয়াছিলেন তাহাতে ১১৩৪৭ খান পুরাতন মোহর দর ১৭৸৶০ টাকার হিসাবে ১৯৯১৯০৸৶০ টাকা আর সিক্কা ৯৶০ সর্ব্বসুদ্ধা প্রদান করেন কিন্তু ঐ টাকা দেব বাবুদিগের নিকট আমানত রাখেন তাহার মধ্যে কেবল ৮৫ খান মোহর ও ৯৶০ টাকা গ্রহণ করেন তাহার কারণ শুনা যায় তাঁহার পিতার মহাজনেরদিগের সহিত কোন বন্দোবস্তের পর

লইবেন তৎপরে তালুক বিক্রয় হইয়াছে কিনা ইহা নিশ্চয়করণ কারণ হরলালের পিতৃঋণদাতা শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিক প্রভৃতি কএক জন দেব বাবুদিগের নামে বিল ফাইল করেন তাহাতে তাঁহারা জওয়াব দেন হরলালের তালুক আমরা খরিদ করিয়াছি এবং তাহা কোর্টে সপ্রমাণও করেন তৎপরে হরলাল দেব বাবুদিগের নিকট অতিকাতর হইয়া কহিলেন আমার তালুক যদি আপনারা আমাকে বিক্রয় করেন তবে আমি বজায় থাকি নচেৎ একেবারে বেওতন হইয়া যাই মহাশয়েরা তালুক ও বাগান দুই লক্ষ টাকায় ক্রয় করিয়াছেন আমাকে কেবল তালুক খানি দুই লক্ষ টাকায় দিলে আমি চরিতার্থ হই দেব বাবুরা অতি-দয়ালু দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া ঐ তালুক হরলালের নিকট দুই লক্ষ টাকায় বিক্রয় করিলেন হরলাল কাগজ পত্র হস্তগতকরত বাহ্বাস্ফোটন পূর্ব্বক বাগান খান লইবার নিমিত্ত সুপ্রিম কোর্টে একুটিতে এক বিল ফাইল করেন যে আমি তালুক ও বাগান তাঁহারদিগের নিকট বেনামী করিয়াছিলাম আমার তালুক ফিরে দিয়াছেন বাগান দেন না তাহাতেও দেব বাবুরা জওয়াব দাখিল করেন যে আমরা খরিদ করিয়াছি এ জওয়াব মিথ্যা দাখিল করিয়াছেন বলিয়া হরলাল ঠাকুর গ্রাণ্ডজুরিরদিগের নিকট দুই বাবুর নামে দুই বিল অর্থাৎ অভিযোগ উপস্থিত করেন জুরিরা ফৈরাদীর পক্ষীয় সাক্ষ্য হইয়া বিল ফৌণ্ড অর্থাৎ নালিশ গ্রাহ্য করেন তৎপরে দেব বাবুদিগের নামে গত সেসিয়ানে ইণ্ডাইট হয় সে সময় আশুতোষ বাবু পুত্রের বিবাহ জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন একারণ তৎকালে মোকদ্দমার বিচার রহিতহওনের প্রার্থনা করিয়াছিলেন। গত ১৮ আপ্রিল সোমবার ঐ মোকদ্দমার বিচারারম্ভ হয় এ মোকদ্দমা পিটী জুরির দ্বারা তজবীজ না হইয়া স্পেসিয়ল অর্থাৎ বিশেষ জুরির দ্বারা বিচার হইয়াছিল ফৈরাদীর পক্ষে কৌন্সেলী শ্রীযুত আডবোকেট জেনরল পিয়র্সন সাহেব ও শ্রীযুত প্রিন্সেপ সাহেব নিযুক্ত ছিলেন আসামী দেব বাবুরদিগের পক্ষে শ্রীযুত টর্টন সাহেব ও শ্রীযুত ক্লার্ক সাহেব ও শ্রীযুত লিথ সাহেব ছিলেন প্রথমতঃ শ্রীযুত প্রিন্সেপ সাহেব মোকদ্দমার ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন তৎপরে আডবোকেট জেনরল প্রায় দুই ঘণ্টা বক্তৃতা করিলেন তাহাতে মিথ্যা শপথের বিষয়ে যে অভিযোগ হয় তাহাই প্রতিপন্ন করেন তৎপরে ফৈরাদীর সাক্ষিরদিগের জোবানবন্দী আরম্ভ হয় ক্রমে তিন দিন এক পক্ষীয় সাক্ষ্যই লওয়া যায় বুধবারপর্য্যন্ত ঐ মোকদ্দমার বিচার হয় জুরির সাহেবেরা হরলাল ঠাকুর স্বয়ং যে জোবানবন্দী দেন এবং তাঁহার মানিত শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত

বাবু হরচন্দ্র ঠাকুরপ্রভৃতির জোবানবন্দী দ্বারা বিষয় বিশেষ অবগত হইয়া কহিলেন আসামীদিগের পক্ষের সাক্ষ্য লওনের আবশ্যক করে না আমরা বিবেচনা করিলাম বাবু আশুতোষ দেব নাটগিল্‌টী এণ্ড একুইট অর্থাৎ নির্দোষী হইয়া পরিষ্কৃত হইলেন। তৎপরে ফৈরাদীর পক্ষীয় আডবোকেট জেনরল সাহেবের প্রার্থনামতে শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ দেবের নামে যে নালিশ হয় তাহার বিচার ঐ দিবস স্থগিত থাকে পর দিন অন্য জুরির দ্বারা বিচার হইল তাহাতেও প্রমথনাথ বাবু ঐ প্রকার নির্দোষী হন।

[স. সে. ক. ২। ৪৫৩-৫৪]

২৪-সংখ্যক উদাহরণটিতে বাঙালি সমাজের ভিতরের কোনো বিরোধের কথাই ওঠে না—যে-সব বিরোধ নিয়ে ভবানীচরণ তাঁর চন্দ্রিকাকে সবসময়ই ব্যস্ত রাখতেন। ভবানীচরণ বৈষয়িক উন্নতিকে সবচেয়ে জরুরি মনে করেছেন। জাহাজ ব্যবহার করার সুযোগের ফলে এখন বাণিজ্য খুব দ্রুত বাড়তে পারে—এই অর্থনীতিজ্ঞান তাঁর ছিল। ইংরেজরা অনেকে ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছে—এটা একটা সুযোগ। জমিদারির টাকা আর ব্যবসায় টাকা পরস্পরবিরোধী নয়—এটাও ভবানীচরণ প্রমাণ করেছেন। তাঁর নিহিত উদ্বেগ ধরা পড়ে রচনাটির শেষাংশে—কলোনাইজেশনের সিদ্ধান্ত যদি ইংরেজরা নেয়, তা হলে বাঙালিদের হাত থেকে জমিজিরেত চলে যাবে। তাই শুধু জমিতে টাকা আটকে রাখা নিরাপদ নয়। পুরো রচনাটি একমাত্র এই গুণে সংহত হতে পেরেছে যে, কোনো তাৎক্ষনিক কারণে লেখক বিষয়ান্তরে যান নি বা কোনো কাল্পনিক প্রতিপক্ষের সঙ্গে ঝগড়ায় থাকেন নি। তাই তাঁর যুক্তিগুলোও এক আলাপচারির ভঙ্গিতে সাজানো হয়—'এতদ্দেশীয় জমিদারলোক ঐ প্রকার বাণিজ্য কুঠী করিলে তাঁহারদিগের ক্ষতি হওনের সম্ভাবনা কখনই নাই লভ্যই প্রত্যাশা করা করা যায় তবে কর্ম্মের গতিকে কখন ন্যূন কখন অধিক লভ্যের বিষয়েই বিবেচনা হইবেক।' এর পর 'পত্তুনে তালুক'-এর উদাহরণ দিয়ে লেখক বলেন, 'সওদাগরির হিত হইলে এ তাবৎ পত্তুনে উঠিয়া গিয়া পুনর্ব্বার জমীদারীমধ্যে রাইয়ত নূতন পত্তন করিতে হইবেক।' এই সব কারণেই চন্দ্রিকার সিদ্ধান্ত, 'জমীদারলোক সওদাগরি করিলে দেশের পরম মঙ্গল…।'

চন্দ্রিকার যুক্তিপরম্পরার মধ্যে বিষয়ের সঙ্গে লেখকের আবেগের যোগটাই প্রধান। এই আবেগ এই রচনায় লেখককে হয়ত কথ্যভঙ্গির অতটা ঘনিষ্ঠ করে নি, কিন্তু তাঁর রচনাটিকে মৌলিক করে তোলে। শোকলেখনের লেখাগুলিতে

চন্দ্রিকার উপস্থাপনায় সাবধানতা, কিছুটা যান্ত্রিকতাও হয়ত, আছে। তাঁর টাইপ সেখানে এতই নির্দিষ্ট। কিন্তু এই লেখাগুলিতে সেই যান্ত্রিকতাও ঝরে যায় বাঙালির আর্থিক উন্নতি সম্পর্কে একটি দায়িত্ববোধ থেকে।

কিন্তু এ-রকম উদাহরণ খুব বেশি নয়।

বরং এই আবেগ ও যুক্তির কাঠামোতে ২৫ সংখ্যক উদাহরণের মতো রচনার সংখ্যাই বেশি। হিন্দু নাগরিক বাঙালির দুর্গোৎসব যে শহরের একটি প্রধান উৎসব এতেই লেখক খুশি। এটা প্রধান উৎসব হয়ে উঠল কেমন করে—রচনাটি থেকে আমরা সেই কারণগুলি যদি খুঁজে বের করি তা হলে এর আগে ইংরেজ অনুগ্রহপুষ্ট হিন্দু বাঙালি নাগরিকের টাইপটির কথাই মনে আসে। দুর্গোৎসবের মত হিন্দু উৎসব প্রধান উৎসব হয়ে উঠেছে, কারণ, ১, 'শোভাবাজারের মহারাজবাহাদুরের উভয় বাটীতে', 'শ্রীযুক্ত আশুতোষ দেবের বাটীতে', 'শ্রীযুত মহারাজ হরিণাথ রায় বাহাদুর'-এর কলকাতার বাড়িতে পুজো হয়েছে এবং নাচগান হয়েছে। ২. এই সব 'নাচ তামাসা'-য় 'উচ্চপদাভিষিক্ত সাহেবলোক গমন করিয়াছিলেন।' ৩. 'এই নগরমধ্যে চারিস্থানে নাচের বাহুল্য ছিল।'

এই উদাহরণে দুটি বিষয়ের ওপর লেখকের প্রায় সমান মনোযোগ। শোকলেখনে যেমন মৃতব্যক্তিকে নিয়ে লেখক একটি টাইপকে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন, এই লেখাটির হরিনাথ রায় বাহাদুরের বর্ণনাতেও সে-রকম চেষ্টা করেছেন। এটি প্রথম বিষয়। দ্বিতীয় বিষয়, 'নগরমধ্যে নৃত্যগীতাদির বাহুল্য'। লেখক প্রায় একটা লিস্টি করে দিয়েছেন কেন 'শ্রীশ্রী৺পূজার সময়ে যে প্রকার ঘটা কলিকাতায় হইত এক্ষণে ন্যূন হইয়াছে,' এমন-কি, 'বিসর্জ্জনকালে ৺গঙ্গার উপরে নৌকা শ্রেণীবদ্ধপূর্ব্বক তদুপরি নাচ হয় এ প্রকার তামাসা কলিকাতায় কএক বৎসর রহিত হইয়াছিল···।' দুর্গাপূজার এই দুটি বিষয়ের মধ্যে লেখক দুর্গাপূজার ধর্মীয় রীতির চাইতেও বেশি জোর দিয়েছেন—দুর্গাপূজা উপলক্ষে 'নাচ তামাসা'র ওপর। তার একটি কারণ এই 'নাচ তামাসা' ছাড়া সাহেবরা দুর্গাপূজায় আগ্রহী হবেন না, এটা এতই প্রধান কারণ যে উৎসব সত্যি কত 'মহাঘটাপূর্ব্বক সুসম্পন্না হইয়াছে', তা বোঝাতে লেখককে বলতে হয় 'শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের বাটীতে··· নেক্কী প্রভৃতি নর্ত্তকী নিযুক্তা ছিল ইহাতেই সকলে বিবেচনা করিতে পারিবেন তদ্বিষয়ে কি প্রকার আমোদ হইয়াছে।'

দুর্গাপূজার মত হিন্দু উৎসব কলকাতা শহরের সামাজিক উৎসবগুলির মধ্যে

প্রাধান্য পাচ্ছে—এটাই লেখকের আবেগ ও উৎসাহের কারণ। তাই পূজার ঘটার বর্ণনা, বা ব্রাহ্মণ পুরোহিতের বিবরণ, বা পূজা যে-বাড়িতে হচ্ছে সেই গৃহকর্তার সামাজিক মর্যাদার চাইতেও বেশি প্রাধান্য পায় উৎসবের সেই সব উপাদান যা সাহেবদের কাছেও গ্রাহ্য, সাধারণ মানুষজনের কাছেও গ্রাহ্য।

কলকাতার সামাজিক উৎসবে হিন্দু নাগরিক বাঙালির নেতৃত্ব দেখার ইচ্ছে ছিল এই বিবরণের ভিতর নিহিত। আর, সেই কারণেই এই উৎসবের ভিতর দিয়ে কলকাতার বাঙালি শহর হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াটিই যেন প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে—লেখকের তেমনই এক প্রত্যাশা।

২৪-সংখ্যক উদাহরণের মত এই ২৫-সংখ্যক উদাহরণেও লেখক তাঁর মতো করে শহরের পুরো বাঙালি সমাজটিকেই তাঁর রচনার বিষয় করে তুলেছেন—তাই বাঙালি সমাজের ভিতরের নানা ভাগ-উপভাগ এই উদাহরণেও আসে নি।

২৬-সংখ্যক উদাহরণটি ঠিক এর বিপরীত দিক থেকে শহরের বাঙালি সমাজকে দেখা। নাগরিক বাঙালি সমাজের বিভিন্ন ভাগ-উপভাগ নয়, একেবারে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পত্তি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমার কথা এখানে বলা হয়েছে। লেখক আশুতোষ দেবের পক্ষ নিয়ে কথা বলছেন—এটা তিনি শিরোনামেই স্পষ্ট বলে দিয়েছেন—'যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ।' আশুতোষ দেব ও প্রমথনাথ দেবের বিরুদ্ধে প্রথমে বৈষ্ণবদাস মল্লিক ও পরে হরলালঠাকুরের মামলায় যে আশুতোষ দেব নিরপরাধ প্রমাণ হয়েছেন তার বিবরণ দেওয়াই লেখাটির উদ্দেশ্য। এখানে ধর্মীয় বা সামাজিক কোনো বিরোধ এই ব্যক্তিদের মধ্যেও নেই, এই ব্যক্তিদের সঙ্গে চন্দ্রিকারও নেই। এ-রকম মামলা তখন প্রায়ই হত—এটা অনুমান করা যায়। মামলায় আশুতোষ দেব খালাশ পেয়েছেন বলেই চন্দ্রিকায় এ-রকম একটি বিবরণ বেরতে পারল। কিন্তু, সেই উপলক্ষে চন্দ্রিকার লেখক হিন্দু ধর্মীয় একটি অনুশাসন—'যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ'—এর সঙ্গে যুক্ত করে দেন। শহরের সম্পত্তি নিয়ে মামলাকেও এইভাবে একটি ধর্মীয় 'মামলা'র বিষয় করে তোলা হয়, যেন, আশুতোষ দেবের খালাশ পাওয়ার মানে ধর্মেরই জয়। 'এ মোকদ্দমা পিটী জুরির দ্বারা তজবীজ না হইয়া স্পেশিয়ল অর্থাৎ বিশেষ জুরির দ্বারা বিচার হইয়াছিল', 'জুরির সাহেবেরা হরলাল ঠাকুর স্বয়ং যে জোবানবন্দী দেন এবং তাঁহার মান্যিত শ্রীযুত বাবু দ্বারকনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র ঠাকুর প্রভৃতির জোবানবন্দী দ্বারা বিষয় বিশেষ অবগত হইয়া কহিলেন আসামী-দিগের পক্ষের সাক্ষ্য লওনের আবশ্যক করে না আমরা বিবেচনা করিলাম বাবু

আশুতোষ সেব নাট গিল্টী এণ্ড এক্কুইট অর্থাৎ নির্দোষী হইয়া পরিষ্কৃত হইলেন' —আশুতোষ দেবকে যে-ধর্মের প্রতিভূ হিশেবে দেখেছেন চন্দ্রিকা, সেই ধর্মের এই জয় ইংরেজের কোর্টে ইংরেজ হাকিম ইংরেজ 'কৌশলী'র সাহায্যে ঘটিয়েছেন এবং তার জন্যে 'স্পেশিয়ল · জুরি'রও দরকার হয়েছিল। ইংরেজের এই বিচার ব্যবস্থাকে ভবানীচরণ তাঁর চন্দ্রিকায় হিন্দুধর্মের নীতি-নিয়মের পক্ষে নিয়ে আসেন, বা, পরোক্ষতায় ইংরেজের বিচারব্যবস্থা ও হিন্দুধর্মনীতিকে প্রায় একই করে দেন।

এই একীকরণ, অন্তত এই উদাহরণে ঘটানো হয়েছে প্রায় তুলনাহীন এক গদ্যভঙ্গিতে। এমন ভঙ্গির গদ্যরচনা এই সময় বা এর পরেও দুর্লভ। এক-একটি বাক্যে আরবি-ফারসি শব্দ, সংস্কৃত শব্দ, দেশী শব্দ ও ইংরেজি শব্দ পাশাপাশি এসে গেছে—'হরলাল ঠাকুর গ্রাণ্ডজুরিদিগের নিকট দুই বাবুর নামে দুই বিল অর্থাৎ অভিযোগ উপস্থিত করেন জুরিরা ফৈরাদীর পক্ষীয় সাক্ষ্য হইয়া বিল ফৌন্ত অর্থাৎ নালিশ গ্রাহ্য করেন তৎপরে দেব বাবুদিগের নামে গত সেশিয়ানে ইণ্ডাইট হয়'। হিন্দুনীতি ও সাহেবদের কোর্টের বিচারব্যবস্থার একীকরণের টানে আইনি বাক্য মুখের কথার সঙ্গে মিশে গেছে—'আমার তালুক যদি আপনারা আমাকে বিক্রয় করেন তবে আমি বজায় থাকি নচেৎ একেবারে বেওতন হইয়া যাই।'

শুধু দর্পণের গদ্যরীতির সঙ্গে চন্দ্রিকার গদ্যরীতির পার্থক্য বোঝাতেই নয়—পাঁচ-ছশ বৎসরের মুসলিম শাসনের পর ইংরেজের রাজত্বে নতুন শহরে বাঙালি কোন ভাষায় নতুন কথা বলতে শিখছিল—এই উদাহরণটি তার এক বিরল নজির।

আশুতোষ দেবকে নিয়ে এই লেখাটি বেরয় ১৮৩৬-এ। তার বছরতিনেক আগে এই আশুতোষ দেবকে নিয়েই আর-একটি লেখা চন্দ্রিকাতে বেরিয়েছিল। সেই লেখাটিতে দেখা যাবে—শুধু ধর্মীয়-সামাজিক ক্ষেত্রে হিন্দু-নাগরিক বাঙালির আত্মরক্ষার চেষ্টা কী রকম করুণ ও ব্যর্থ। সেখানে ইংরেজের সঙ্গে সম্পর্ক হিন্দু-আচার আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করছে না। বরং, হিন্দুরা ইংরেজ নিরপেক্ষ ভাবে 'আত্মরক্ষা'র জন্যে ধর্মসভা করছে, বিভিন্ন দল করছে, বিভিন্ন গোষ্ঠী করছে। ২৬-সংখ্যক উদাহরণের সঙ্গে নীচের এই উদাহরণটির বাক্যগঠনের তুলনা করলেই দেখা যাবে—এই একই শ্রীযুত আশুতোষ দেব শুধু হিন্দু-সামাজিক

সীমার মধ্যে কতটাই অর্থহীন অথচ সেই অর্থহীনতাকে চাপা দেয়া আছে ভাষার গম্ভীর ভঙ্গিতে, যুক্তির আপাত সংহতিতে, ও ব্যবস্থাদানের কৃত্রিম ভঙ্গিতে।

২৭. সমাচার দর্পণ। ৫ জানুয়ারি ১৮৩৩

সামাজিকতার নূতন দল।—আমরা অবগত হইলাম শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব সামাজিকতা ব্যবহারে এক দলবদ্ধ করিয়াছেন অর্থাৎ এতন্নগরস্থ ও অন্যান্য স্থানস্থ কতকগুলিন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কুলীন শ্রোত্রিয় বংশজ রাঢ়ীয় বারেন্দ্র বৈদিক ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ কুলীন মৌলিক সম্মৌলিক মুখ্যি বেড়ে মুখ্যি প্রভৃতি স্বজাতীয় জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় আলাপিত পরিচিত আশ্রিত ধনী মানী মাধ্যমিক গৃহস্থ স্বজন স্বজ্জনসহিত নবশাক মিশ্রিত ভদ্রসমূহ একত্র ঐক্য হইয়া এক দল করিবাতে ঐক্য বাক্যতায় বদ্ধ ব্যক্তিসকল তাঁহাকে দলপতিত্ব মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছেন ফলতঃ তাঁহার মতস্থ হইলেন দেব বাবুর অনভিমতে সামাজিকতা ব্যবহারে কোন স্থানে গমন করিবেন না অর্থাৎ যেমন দলের প্রথা আছে। এই নূতন দলহওয়াতে আমরা মহাহৃষ্ট হইলাম যেহেতুক এক্ষণে নগরমধ্যে বহু লোকের বাস হইয়াছে দৈবকর্ম্ম পিতৃকর্ম্ম সর্ব্বদা হইয়া থাকে ইহাতেই বহু দলের আবশ্যক হয় পূর্ব্বে এই নগরমধ্যে দুই দল ছিল মাত্র অর্থাৎ স্বর্গীয় মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের এক দল আর বৈকুণ্ঠবাসী বাবু মদনমোহন দত্তজ মহাশয়ের এক দল এই দুই দলে প্রায় তাবৎ লোক বদ্ধ ছিলেন তৎপরে ক্রমে নগরের বৃদ্ধি হইতে লাগিল দলেরও উন্নতি ক্রমে২ হইতেছে। কিন্তু যত দল হইতেছে ঐ দলের শাখা প্রশাখা বলিতে হইবেক যেহেতুক এক্ষণকার দলপতি মহাশয়েরা উক্ত দলদ্বয়ের দলস্থ সামাজিকমধ্যে গণ্য ছিলেন তাহা কোন দলপতি অস্বীকার করিবেন এমত নহে সে যাহা হউক কিন্তু যিনি যখন কোন দল হইতে নিঃসৃত হইয়া স্বয়ং দল করিয়াছেন তাহার কোন কারণ উপস্থিত হইয়াই হইয়াছে অর্থাৎ দলপতির মতের সহিত অনৈক্য হইলেই প্রায় সকলেই পৃথক্ হন নির্ধন ব্যক্তি অন্য দলে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন ধনবান্ স্বয়ং দল করেন এইপ্রকারেই অনেক দল হইয়াছে তৎপ্রমাণ দেখ উক্ত বাবু শ্রীযুত বাবু উদয়চাঁদ দত্তজর দল হইতে পৃথক্ হইয়া নূতন দল করিলেন কিন্তু আশুতোষ বাবুরদিগের ব্যবহারে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি যেহেতুক প্রায় নূতন দলপতিরা তাঁহারদিগের পূর্ব্বের দলপতির সহিত প্রীতি বিচ্ছেদই করিয়াছেন কিন্তু ইহাঁর দত্ত বাবুর সহিত অনাত্মীয়তা বা অসুজনতা কিছুই প্রকাশ পায় নাই···।

অপর এক্ষণে যে সময় উপস্থিত ইহাতে যত দলের বৃদ্ধি হয় ততই মঙ্গল

কেননা বহুলোক বহু দলপতি হইলে বিলক্ষণরূপে দলের আঁটা আঁটি থাকিতে পারে তাহা হইলে লোক কুপথগামী হইতে পারে না কেননা ধর্ম্মবিষয়ে সকল দল ঐক্য আছে এক দলপতি এক ব্যক্তিকে স্থগিত করিলে কোন দলপতি তাহাকে গ্রহণ করিবেন না ধর্ম্মসভার এই নিয়ম আছে ইহাতেই কহি বহু দল হইলে কেহই অসন্তুষ্ট নহেন। এক্ষণে আমরা প্রার্থনা করি যিনি যখন নূতন দলপতি হইবেন তিনি ধর্ম্মসভার রীত্যনুসারে সমাজে জ্ঞাপন করিয়া সুখে উচ্চ মর্য্যাদান্বিত হইয়া ধর্ম্ম রক্ষা করুন।—চন্দ্রিকা।

[স. সে. ক. ২ । ২৭১-৭২]

এ-রকমই, যেখানে বাঙালি হিন্দু নাগরিক ইংরেজনিরপেক্ষ সেখানে তার পরিস্থিতি বর্ণনায় চন্দ্রিকার গদ্য সবচেয়ে কম মৌলিক, সেই সব রচনায় লেখকের কণ্ঠস্বর সবচেয়ে কম শোনা যায়, আর বিশেষ করে এই সব লেখাতেই চন্দ্রিকার গদ্য যেন ইংরেজি ধরনের কাছাকাছি চলে আসতে চায়, যদিও কোনো সময়ই তা ইংরেজি কাঠামোর ভিতর সম্পূর্ণ ঢুকে যেতে পারে না হয়ত এই কারণে যে শব্দের পরম্পরায় বাক্যগুলি তৈরি হচ্ছিল একজন এমনই বাঙালি লেখকের মনে যিনি ইংরেজি ভাষায় ভাবছিলেন না বা ইংরেজি থেকে অনুবাদ করছিলেন না।

অথচ কলকাতার নাগরিক হিশেবে হিন্দু বাঙালির আত্মরক্ষায় তিনি ইংরেজের সমর্থন ও সাহায্য চাইছিলেন। অস্তিত্বের সমগ্রতা দিয়েই তিনি ইংরেজ-আশ্রয় চান—সে আশ্রয় ছাড়া কলকাতায় বাঙালির বৈষয়িক উন্নতি নেই, সে-আশ্রয় ছাড়া কলকাতায় বাঙালির বাঙালিয়ানা ও হিন্দুর হিন্দুয়ানা টেঁকে-না। সেই আশ্রয়ে থেকেও তিনি ইংরেজের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে চান—ধর্মে হিন্দু ও আচারে বাঙালি থাকতে চান।

সেই চেষ্টায় ধর্মসভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। চন্দ্রিকা সম্পাদক ভবানীচরণ ছিলেন ধর্মসভারও সম্পাদক। ধর্মসভার অধিবেশনের বিবরণ চন্দ্রিকায় নিয়মিত ছাপা হত। এই ধর্মসভা ইংরেজ স্পর্শশূন্য বিশুদ্ধ হিন্দু বাঙালির এমনই প্রতিষ্ঠান যে 'যাঁহারা হিন্দুকুলোদ্ভব কিন্তু সতীর দ্বেষী তাঁহারদিগের সহিত কাহার আহার ব্যবহার থাকিবেক না।'

অথচ এই সব বিবরণের সঙ্গে দর্পণে বিভিন্ন সভা-সমিতির যে-বিবরণ বেরত তার অনেক দূর পর্যন্ত মিল। এই বিবরণগুলি একসঙ্গে পড়লে দেখা যায়—বিবরণটিকে ব্যক্তিনিরপেক্ষ করার দিকেই প্রধান ঝোঁক। অর্থাৎ 'ধর্ম্ম সভা'র বিধি-বিধান ও অনুশাসন প্রায় সাহেবদের সভাসমিতি বা কমিটির সিদ্ধান্তের মত

বাধ্যতামূলক আকার পায়। সরকারি হুকুমের যেমন এক ধরনের ব্যক্তিসম্পর্কহীন সর্বজনীনতা থাকে 'ধর্ম্মসভা'র বিবরণগুলিও সে-রকম হয়ে উঠতে চাইছিল। অথচ সিদ্ধান্তগুলি ছিল নেহাতই ব্যক্তিগত, বড় জোর সাম্প্রদায়িক। হিন্দুদের নিন্দে করে এমন কাগজ কেউ বিনে পয়সাতেও নেবে না, কোন-এক সাহেব উকিল রাধাকান্ত দেবের ইংরেজি লেখার খুব প্রশংসা করেছেন, কোন-এক দলপতি কোন্ তিন পণ্ডিতকে তাঁর দলে ফিরিয়ে নিয়েছেন—'সতীদ্বেষির সংস্পৃষ্ট দোষ··· পরিহার হইয়া', কালীনাথ মুন্সীর বাড়িতে রামলোচন ন্যায়ভূষণ ভটাচার্য সামাজিকতা করেছেন বলে 'অপমানিত হইয়াছি আমি মুন্সীর বাটীতে··· সামাজিকতা করিতে ক্ষান্ত হইলাম', 'শ্রীযুত রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত ভটাচার্য শ্রীযুত মথুরানাথ বাবুর বাটীতে দান গ্রহণ করিয়াছিলেন এ জন্য দোষী হন', 'শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর সতীদ্বেষী · উক্ত ঠাকুর বাবুর বাটীতে যে-বৃহৎ কর্ম্ম উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে অনেকেই পত্র গ্রহণ করিয়াছেন', রাজকৃষ্ণ সিংহের ভাইপোর ছেলের সঙ্গে মথুরানাথ মল্লিকের ভাইঝির বিয়েতে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানের জন্যে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করার আহ্বান ইত্যাদি।

ফলে "ধর্ম্মসভা"র এই বিবরণগুলি গদ্যের উদাহরণ হিশেবেও বিশিষ্ট। নির্দিষ্ট ও ব্যক্তিগতকে অনির্দিষ্ট সাধারণ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বা কোনো সাধারণ নীতি থেকে এক-একটি নির্দিষ্ট ও ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে পৌঁছুনো হচ্ছে—যুক্তির এক বিভ্রান্ত সংহতির মধ্য দিয়ে। আমরা মাত্র কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। আরো কিছু উদাহরণের সূত্র জানাচ্ছি।[২৪]

২৮. সমাচার চন্দ্রিকা। ১৭ এপ্রিল ১৮৩০

> ধর্ম্মসভাধ্যক্ষদিগের অষ্টম বৈঠক।—গত ২৩ চৈত্র রবিবার বৈকালে বটতলার গলিতে বাবু কাশীনাথ মল্লিকের দরুন বাসাবাটীতে অধ্যক্ষদিগের বৈঠক হইয়াছিল ঐ বৈঠকের স্থূল বিবরণ প্রথমতঃ সম্পাদককর্ত্তৃক গত বৈঠকের বিবরণ পঠিত হইল পরে প্রশ্ন হইল সতীর পক্ষ যে আরজী বিলাত পাঠাইতে হইবেক তাহাতে কাহারো কিছু বক্তব্য আছে কি না উত্তর উত্তম হইয়াছে প্রধান ইঙ্গরেজের নিকট ইহা সংশোধনার্থ প্রেরণ কর্ত্তব্য। শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব সে ভার গ্রহণ করিলেন।
>
> যাহার দ্বারা আরজী প্রেরিত হইবেক সে লোকের বিবেচনা নিমিত্ত শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব শ্রীযুত বাবু গোকুলনাথ মল্লিক শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র দাস ও শ্রীযুত বাবু

তারিণীচরণ মিত্র এই ছয় জন বিবেচক স্থির হইলেন তাঁহারা কোন দিবস শ্রীযুত গোপীমোহন দেবের বাটীতে বৈঠককরত লোক বিবেচনা করিয়া স্থির করিবেন।

চাঁদার টাকা আদায়ের ফর্দ্দ দর্শান গেল যাঁহারদিগের নিকট অদ্যাপি টাকা পাওয়া যায় নাই তাঁহারদের নাম ঐ দিবসের সভায় উল্লেখ করিতে নিষেধ হইল আগামিতে শুনিবেন। চাঁদার নিমিত্ত যে কএকখানি বহি পরে প্রস্তুত হইয়াছিল ঐ সভায় উপস্থিত কবাতে শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২ খান শ্রীযুত বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১ খান শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিক ১ খান বহি লইয়া কহিলেন আমারদিগের অনেক আত্মীয় স্বজনগণের ইহাতে স্বাক্ষর হয় নাই তাঁহারদিগের স্বাক্ষরাঙ্কিত করাইব।

অপর শ্রীযুত হরনাথ তর্কভূষণ ভট্টাচার্য্যকর্তৃক সহমরণ মীমাংসাপত্র পুর্ব্বে সংক্ষেপরূপে প্রস্তুত হইয়াছিল পরে তাদৃশ মীমাংসাপত্র ভূরি প্রমাণদ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে তাহা সমাজে অর্পণ করিলেন। সম্পাদকের নিকট রাখিতে অনুমতি হইল প্রয়োজনমতে দিবেন সতীসংহিতানামক গ্রন্থ সংগ্রহকারকের প্রেরিতপত্র পাঠে তাঁহাকে সভার আহ্বানের অনুমতি হইল পরে নানাস্থান হইতে যে সকল পত্র আসিয়াছিল তাহা শ্রবণে সদুত্তর লিখিতে অনুমতি হইল। সম্পাদকের শেষ প্রশ্ন নিয়ম হইয়াছে যেপর্য্যন্ত আরজী বিলাত না যাইবেক তাবৎকাল প্রতি রবিবারে বৈঠক হইবেক কিন্তু আগামি রবিবার মহাবিষুবসংক্রান্তি সে দিবস বৈঠক হইবেক কি না। অনুমতি হইল তাহার পর রবিবারে বৈঠক হইবেক।

অধ্যক্ষদিগের প্রশ্নমতে নীচেব লিখিতব্য কএক জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিপ্রায়ে। শ্রীযুত বাবু রামমোহন দত্ত। শ্রীযুত বাবু হরনাথ তর্কভূষণ ভট্টাচার্য্য। শ্রীযুত বাবু দুর্গাচরণ দত্ত। শ্রীযুত নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য। শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেবের অভিপ্রায়ে। শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য। শ্রীযুত নিমাইচাঁদ শিরোমণি ভট্টাচার্য্য। শ্রীযুত বাবু সত্যচরণ ঘোষাল। শ্রীযুত কান্তিচন্দ্র সিদ্ধান্তশেখর ভট্টাচার্য্য। শ্রীযুত বাবু নীলমণি দত্ত। শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের অভিপ্রায়ে। শ্রীযুত বাবু শ্রীকৃষ্ণ বসাক। শ্রীযুত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য। শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিপ্রায়ে। শ্রীযুত নাথুরাম শাস্ত্রী। শ্রীযুত বাবু রামজয় তর্কালঙ্কার ভটাচার্য্য। শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ

চৌধুরী। শ্রীযুত শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি ভট্টাচার্য্য। শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র দাসের অভিপ্রায়ে। শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিপ্রায়ে। শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র দাসের দ্বিতীয় প্রশ্ন তাহাতে শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের সাহায্য যে আমারদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে নিন্দাসূচক যে সকল নিয়মিত গ্রন্থ বা সম্বাদপত্র মুদ্রাঙ্কিত হইয়া প্রকাশ হইয়া থাকে তাহা ধনদানদ্বারা প্রতিপালন বা উন্নতি করা আমারদিগের কর্ত্তব্য নহে তাহাতে শ্রীযুত বাবু গোকুলনাথ মল্লিক উত্তর করিলেন যে মূল্য দিয়া লওয়া দূরে থাকুক বিনামূল্যে দিলেও গ্রহণ করা উচিত নহে ইহাতে সকলেই সম্মত হইলেন শেষ শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় কহিলেন চন্দ্রিকাকার সকল গ্রন্থাদি লইতে পারিবেন ইহাতে সকলের মত হইল।

[স. সে. ক. ২। ৫৭৫-৭৬]

২৯. সমাচার চন্দ্রিকা। ৩১ জুলাই ১৮৩০

ধর্ম্মসভার বৈঠক।—...এক্ষণে সভার বৈঠক কি প্রকার হইবেক। তাহাতে উক্তি হইল প্রতিমাসের প্রথম রবিবারে বৈঠক হইবেক। ইতিমধ্যে যদ্যপি কোন বিশেষ কর্ম্মের আবশ্যকতা হয় সম্পাদক প্রয়োজনমতে সভায় আহ্বান করিতে পারিবেন। অপর স্থির হইল সমাজের এক প্রধান কর্ম্ম সতীর আরজী বিলাত পাঠান তাহা হইলে এক্ষণে এক বাটী প্রস্তুত-নিমিত্ত উদ্যোগ আবশ্যক। কিন্তু যে পর্য্যন্ত ধর্ম্মসভার বাটীপ্রস্তুত না হইবেক তাবৎকাল বৈঠকের স্থানের নিমিত্ত শ্রীযুত বাবু গোকুলনাথ মল্লিক ভারগ্রহণ করিয়াছেন আয় ব্যয় বিষয়ের বিবেচনা নিমিত্ত তত্ত্বাবধারকদিগের নিকট পত্র প্রেরণদ্বারা সম্পাদক কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন। পরন্তু সমাজের নিয়মপত্র বিশেষরূপে প্রস্তুত হয় নাই কেবল স্থূলবিবরণদ্বারা এ পর্য্যন্ত কর্ম্ম হইয়াছে এক্ষণে নিয়মপত্র প্রস্তুত করা আবশ্যক বিধায় শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন ও শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি ভারার্পণ হইল তাঁহারা ভারগ্রহণপূর্ব্বক কহিলেন শীঘ্র প্রস্তুত করিয়া সমাজে অর্পণ করিবেন অধ্যক্ষগণের বিবেচনাসিদ্ধ হইলে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ পাইবেক। ইত্যাদি কর্ম্ম সমাপনান্তে শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন উঠিয়া সমাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন ধর্ম্মসভাস্থাপনে এবং সমাজের প্রধান কর্ম্ম সতীর আরজী বিলাত প্রেরণে তাবৎ অধ্যক্ষগণের সমান মনোযোগ আছে তথাপি আমারদিগের উচিত হয় শ্রীযুত ভবানীচরণ

বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ মনোযোগ স্বীকারপূর্ব্বক ইহাঁকে ধন্যবাদ করি যেহেতুক ইহার পরিশ্রম ও আপন ক্ষতি স্বীকার যে প্রকার করিয়াছেন যদ্যপিও অনেকে তাহা জ্ঞাত আছেন কিন্তু আমি বিশেষ জানি এইহেতুক সকলকে তাহা জ্ঞাত করাই। পরে বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রমের ও ক্ষতি ও বিবেচনা ও ক্ষমতা বিষয়ের বিশেষ বর্ণন করিলেন তাহা শ্রবণে সভাস্থ সকলেই এতাবৎ যথার্থ কহিয়া ধন্যবাদ করিলেন।

বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজের নিকট বাধিত ও উপকৃত হইয়া কহিলেন আমি এতাবৎ ধন্যবাদের পাত্র হইতে পারি না। যদ্যপি অন্য অন্য অধ্যক্ষাপেক্ষায় অধিক পরিশ্রমাদি করিয়া থাকি তাহা ধন্যবাদের প্রতি কারণ নহে। যেহেতুক অবশ্য উপাস্য যে সন্ধ্যাবন্দনাদি তাহা যে করিবেক তাহাকে কি ধন্যবাদ করিতে হয়। ইহাতে শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত বাবু উমানন্দন ঠাকুর কহিলেন এ কথায় তোমার সৌজন্য প্রকাশ হইতেছে। কিন্তু কাল-সহকারে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিলেও তাহাকে ধন্যবাদ করিতে হয়। পরন্তু শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের অভিপ্রায় যে বন্দ্যোপাধ্যায়কে অদ্য সভায় ধন্যবাদ করা গেল কিন্তু আমারদিগের উচিত ইহার প্রশংসাপত্র লিখিয়া তাহাতে তাবতে স্বাক্ষর করিয়া প্রকাশ করা যায় এবং ধর্ম্মসভার বাটী প্রস্তুত হইলে ইঁহার প্রতিমূর্ত্তি তথায় স্থাপন করা যায়। পরন্তু শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কহিলেন অদ্যকার বিবরণ চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিতে বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মত নহেন যেহেতুক ইঁহার আপন কৃতপত্রে আপন প্রশংসা প্রকাশ করা অনুচিত অতএব আমার মত গবর্ণমেণ্ট গেজেটে কিম্বা সমাচার দর্পণে প্রকাশ হইলে ভাল হয় তাহাতে সমাজের মত হইল আমারদিগের অভিপ্রায়মতে চন্দ্রিকায় প্রকাশ হইতেছে ইহাতে দোষাভাব। অপর চন্দ্রিকা হইতে দর্পণদ্বারা তাবৎ কাগজে প্রকাশ পাইতে পারিবেক।

পরন্তু শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন পুনর্ব্বার উত্থান করিয়া শ্রীযুত তারিণীচরণ মিত্রের অনেক প্রশংসা করিলেন বিশেষতঃ সতীর পক্ষীয় আরজী হিন্দী ও বাঙ্গলা ভাষায় এবং ব্যবস্থাপত্র অত্যুত্তমরূপে তরজমা করিয়াছেন এতদ্বিষয়ে ইহার ক্ষমতা ও বিজ্ঞতা ও পরিশ্রম বিশেষ প্রকাশ হইয়াছে। মিত্র বাবু এ প্রকার পরিশ্রম না করিলে ইঙ্গরেজী আরজীর অর্থ তাবতের বোধগম্য হইত না ইত্যাদি। অতএব ইহাকে ধন্যবাদ করা যাউক সভাস্থ সমস্তই কহিলেন অবশ্য কর্ত্তব্য।

শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উঠিয়া সভ্যগণকে সবিনয়ে সম্মানপূর্ব্বক কহিলেন শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব সতীর পক্ষ আরজী ইঙ্গরেজী ভাষায় প্রস্তুত করেন আরজীতে শ্রীশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের আইনকে এক দেশে স্থান দিয়া তাহার প্রত্যেক কথার সদুত্তর করিয়াছেন ও তাঁহার নিকটে প্রথম যে প্রার্থনা পত্র দেওয়া গিয়াছিল তাহার যে উত্তর তিনি দিয়াছিলেন তৎ-প্রত্যুত্তর ঐ আরজীতে বিলক্ষণরূপে লিখিত হইয়াছে এবং সহমরণানুমরণ ও ব্রহ্মচর্য্যবিষয় যে গ্রন্থে যত বচন আছে তাহা তাবৎ সংগ্রহপূর্ব্বক তরজমা করিয়া আরজীমধ্যে বিন্যাস করিয়াছেন এই আরজী সংশোধনার্থ কোন বিজ্ঞ ইঙ্গরেজের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল তিনি দৃষ্টি করিয়া সন্তুষ্ট পূর্ব্বক বাবুকে বহুতর প্রশংসা করিয়াছেন এবং উকীল ফ্রেন্সিস বেথি সাহেব এই আরজী দেখিয়া সাহস করিয়াছেন যে আমারদিগের প্রার্থনা পূর্ণ হইবেক ইহাতে দেব বাবুর ক্ষমতা ও পরিশ্রমের বাহুল্য বিবেচনা করিলেই অবশ্যই বিশেষ ধন্যবাদের যোগ্য হইবেন। শ্রীযুত বাবু উমানন্দন ঠাকুর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথার পোষকতা করিয়া কহিলেন আমরা দেব বাবুকে আশীর্ব্বাদ ও ধন্যবাদ করিলাম বরঞ্চ নিয়ত করিব এমত মানস হইতেছে। পরে শ্রীযুত রামকমল সেন কহিলেন দেব বাবুর ক্ষমতা বিষয়ের প্রশংসা করা ক্ষমতাপেক্ষা করে শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় কহিলেন ইহা যথার্থ বটে ইহাতে তাবতেই দেব বাবুকে ধন্যবাদ করিবাতে দেব বাবু উঠিয়া মধুমৃদুস্বরে ধন্যবাদ নিমিত্তে সভ্যগণের নিকটে নম্রতা প্রকাশপূর্ব্বক তাবদধ্যক্ষকে প্রশংসা প্রদান করিলেন অপিচ শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পুনরুত্থানপূর্ব্বক কহিলেন যে শ্রীশ্রীযুতের নিকট প্রথমতঃ যে ব্যবস্থাপত্র প্রদান করা গিয়াছিল এবং যাহা বিলাত এইক্ষণে প্রেরিত হইল এই ব্যবস্থার দ্বারা শ্রীযুত নিমাইচন্দ শিরোমণি ও শ্রীযুত শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি এবং শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের সাহায্যে এবং শ্রীযুত নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের ও শ্রীযুত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ভট্টচার্য্য-দিগরের সম্মতিতে শ্রীযুত হরনাথ তর্কভূষণ ভট্টাচার্য্য প্রস্তুত করিয়াছেন এই ব্যবস্থাপত্র অনেক২ সমাজে স্বাক্ষরার্থ প্রেরিত হইয়াছিল তাহাতে তাবৎ, বুধগণ যথাশাস্ত্র ব্যবস্থা দেখিয়া তর্কভূষণ ভট্টাচার্য্যের পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন অতএব তর্কভূষণ ভট্টাচার্য্যকে ধন্যবাদ করা উচিত এ কথায় শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব উঠিয়া কহিলেন তর্কভূষণ ভট্টাচার্য্যকে বিশেষ ধন্যবাদপূর্ব্বক সভাধ্যক্ষ তাবৎ বুধগণকে ধন্যবাদ করিলাম। তৎপরে

সভার আর২ কর্ম্ম-সম্পাদককে ভারার্পণ করিয়া সকলে সন্ধ্যাকালে প্রস্থান করিলেন।

[স. সে. ক. ২ । ৫৭৭-৭৯]

৩০. সমাচার চন্দ্রিকা। ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১

ধর্ম্মসভা। —গত ৩ ফাল্গুণ রবিবার ধর্ম্মসভার বৈঠক হইয়াছিল · । শ্রীযুত বেহারিলাল চৌবে সমাজে উপস্থিত হইয়া আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন তাহাতে অনুমতি হইল সম্পাদক ইঁহার প্রার্থনামত কাগজপত্র দিবেন এবং সমাজের নিয়ম ও রীতি অবগত করাইবেন অপর তাঁহার সৎপ্রার্থনানিমিত্ত ধন্যবাদ করিলেন।

[স. সে. ক. ২ । ৫৭৯]

৩১. সমাচাব চন্দ্রিকা। ৩ মার্চ ১৮৩২

ধর্ম্মসভা।—গত ৮ ফাল্গুণ রবিবার ধর্ম্মসভার মাসিক বৈঠক হইয়াছিল ৺নাথুরাম শাস্ত্রির মৃত্যু সম্বাদ উপস্থিত হইবাতে সভ্যগণ মহাখেদিত হইলেন অপর তিনি ধর্ম্মসভাধ্যক্ষৈক পাণ্ডিত্যে নিযুক্ত ছিলেন তৎপদে শ্রীযুত রামতনু তর্কসরস্বতী ভটাচার্য্য অভিষিক্ত হইলেন ··।

[স. সে. ক. ২ । ৫৮০]

৩২. সমাচার চন্দ্রিকা। ১৫ ডিসেম্বর ১৮৩২

ধর্ম্মসভা।—গত ১৮ অগ্রহায়ণ রবিবার ধর্ম্মসভার মাসিক বৈঠক হইয়াছিল ঐ সভায় সভ্যগণ আগমনানন্তর পূর্ব্ব বৈঠকের অনুমতি মত যে সকল কর্ম্ম হইয়াছে তাহা সমাজের বিদিত করা গেল··· । তৎপরে [হাটখোলার] শ্রীযুত বাবু উদয়চাঁদ দত্তের প্রেরিত পত্র পাঠ করা গেল তাহার তাৎপর্য্য ঐ দত্ত বাবুর দলস্থ শ্রীযুত রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন ও শ্রীযুত অভয়াচরণ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুত কালীপ্রসাদ ন্যায়পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য ইঁহারদিগের উপর সতীদ্বেষির সংস্পৃষ্ট দোষ জনরব হইয়াছিল বিবেচনায় তদ্দোষ পরিহার হইয়া দত্ত বাবুর দলে তাঁহারদিগের নিমন্ত্রণ চলিত হইয়াছে ইহাই বাহুল্যরূপে লিখিয়া সমাজকে জ্ঞাত করাইয়াছেন।

[স. সে. ক. ২ । ৫৮০]

৩৩. সমাচার চন্দ্রিকা। ২৯ ডিসেম্বর ১৮৩২

ধর্ম্মসভা।—গত ৩ পৌষ রবিবার সমাজের মাসিক বৈঠক হইয়াছিল সভ্যগণের আগমনান্তর ঐ বৈঠকের সভাপতি শ্রীযুত বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নির্দ্ধারিত হইলে প্রথমতঃ সম্পাদকের বক্তৃতা ব্যক্ত হইল।

ধর্ম্মসভা সম্পাদকের উক্তি। অমি সবিনয়ে যথাবিহিত সম্বোধন পূর্ব্বক সমাজকে নিবেদন করিতেছি। শাস্ত্রজ্ঞানে এবং রাজশাসনের দ্বারা ধর্ম্ম রক্ষা হয় এই উভয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত বিষয়বিরহ হইলেও রাজশাসনে ধর্ম্মরক্ষা পায় ইহার সন্দেহ নাই অরাজক হইলে শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরও ধর্ম্ম রক্ষা করা সুকঠিন হয় যেহেতুক অরাজকে সজাতীয় বৈধর্ম্মিসমূহ হইতে পারে তৎসংস্পৃষ্টদোষে নির্দ্দোষি ব্যক্তি দোষভাজন হন এইজন্য চিরকালের মধ্যে যখন২ অরাজক হইয়াছে তখনই ধার্ম্মিকগণে দলবদ্ধ হইয়া স্বস্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন এবং ধার্ম্মিকেরা দলবদ্ধ হইয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ বটে মন্বাদি শাস্ত্রে স্পষ্ট লিখিত আছে। আমারদিগের ভাগ্যহেতু ধর্ম্মপক্ষ রক্ষাবিষয়ে অরাজক হইয়াছে যেহেতুক ম্লেচ্ছ রাজা। ইহাঁর মত এই স্ব স্ব জাতীয় ধর্ম্ম আপনারা রক্ষা করুন ইহাতে অধর্ম্ম কর্ম্মজন্য কাহাকেও শাসন করেন না এবং ধর্ম্মযাজন-করণেও উপদেশ দেন না অতএব রাজার বিধি নিষেধ যে কর্ম্মে না থাকে তাহাতে শাস্ত্রানভিজ্ঞ লোক স্বেচ্ছাচারী হইয়া থাকে ইহাতে ধর্ম্মনাশহওন সম্ভাবনা। অপর রাজা কর্তৃকও এক ধর্ম্মবারিত হইল ইহা দেখিয়া ধার্ম্মিক সকল ১৭৫১ শকের ৫ মাঘ রবিবারে সমূহ একত্র হইয়া ধর্ম্মসভা স্থাপিত করেন ঐ সভার নিয়মপত্রে সমাজের কারণ বিশেষ লেখা আছে আমার কথনাধিক তথাপি কিঞ্চিৎ কহি।

নিয়মপত্রের দুই ধারায় লিখিত আছে যে এই ধর্ম্মসভার তাৎপর্য্য হিন্দু-শাস্ত্র বিহিত ধর্ম্ম কর্ম্ম অনাদি ব্যবহার শিষ্টাচার সংরক্ষণ তদ্বিষয়ক নিবেদন-পত্রাদি রাজসন্নিধানে সমর্পণ এবং দেশের মঙ্গল চিন্তন ইত্যাদি।

এই নিয়ম রক্ষাকরণহেতুক ধর্ম্মদ্বেষিদিগের সংসর্গ ত্যাগ অত্যাবশ্যক জানিয়া ১৭৫২ শকের ২৯ ফাল্গুণে সভাধ্যক্ষ দলপতি মহাশয়েরা যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহাও মহাশয়দিগের স্মরণ আছে যদ্যপিও স্মরণ না থাকে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র সমাজে উপস্থিত আছে অনুমতি হইলে পাঠ করা যাইবেক। প্রতিজ্ঞাপত্র নির্দ্ধারিতহওনাবধি ধার্ম্মিকসকল বিশেষ দলপতি মহাশয়েরা বিলক্ষণরূপে নিয়ম রক্ষা করিতেছেন তদ্বিশেষ কিঞ্চিৎ অবগত করাই সমাজের নিয়ম আছে যিনি নিজ দলপতির নিবারণ অমান্য করিয়া কুপথগামী হইবেন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া সভায় জানাইবেন অন্য দলপতি তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন না এ বিধায় সকল দল ঐক্য হইল অতএব কোন প্রকারেই কোন ব্যক্তি দলপতির মতব্যতিরিক্ত কিছুই করিতে পারিবেন না করিলে তাঁহার

নিস্তার নাই তাহার সমুচিত ফল দলপতি দিবেন। এইমত দলপতি মহাশয়েরা করিতেছেন তৎপ্রমাণ প্রথমতঃ মহারাজ শিবকৃষ্ণ বাহাদুরের দলের কোন ব্যক্তি রাজা বাহাদুরের অমতে কোন দোষির সংসর্গ করিয়াছিলেন এজন্য রাজা বাহাদুর সমাজকে জ্ঞাপন করাতে সেই মহাশয়েরদের প্রতিষ্ঠাতে তাঁহার আহ্বানিত পত্রে নগরস্থ পাঁচ দলের এক ব্যক্তিও গমন করেন নাই।

দ্বিতীয় শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের দলে কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়েরও তাদৃশ দোষ জনরব হইবাতে গঙ্গোপাধ্যায় বাবু তাঁহাকে রহিত করিয়া ধর্ম্মসভায় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তৃতীয় শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেব মহাশয়ের দলস্থ কুমারহট্ট বাঁশবেড়িয়া প্রভৃতি সমাজের প্রধান২ অধ্যাপক পাঁচ জনের তাদৃশ অপবাদ উপস্থিত হইবামাত্র দেব বাবু সমাজে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন অদ্যাপি তাঁহারদের মধ্যে এক জনের উদ্ধার হয় নাই। চতুর্থ শ্রীযুত বাবু উদয়চাঁদ দত্তজ মহাশয়ের দলস্থ কএক জনের দোষ জনরব হইয়াছিল তাহাও দত্ত বাবু নিয়মমত তাঁহারদের বিষয় সমাজকে জ্ঞাত করিয়াছেন। অতএব ধার্ম্মিক মহাশয়েরা যে নিয়ম করিয়াছেন তাহা বিলক্ষণরূপে প্রতি-পালিত হইতেছে ইহা আমি স্পষ্টরূপে বোধ করিতেছি ইহার পরেও সেই নিয়ম যে অন্যথা হইতে পারিবেক না ইহাতে নিতান্ত বিশ্বাস আছে কেন না যদ্যপি কাহার প্রতি কোন অংশে রাগদ্বেষ থাকে সেই রাগের পরিশোধার্থ কেহ ধর্ম্মহানিতে বা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে কাহার মত হইবেক না একথা বলিবার তাৎপর্য্য এই দলপতি বা দলস্থ প্রধান মহাশয়েরা অনেকে ধর্ম্মবিষয়ে ঐক্য আছেন বটে কিন্তু কোন২ ব্যক্তির সহিত যদি কাহার অন্য কোন বিষয়-ঘটিত বিবাদ থাকে সেই বিবাদ উপলক্ষে ধর্ম্মসভার নিয়ম রক্ষার পক্ষে ঐক্য থাকা ভাব হয় কেন না এক ব্যক্তি একজনকে স্থগিত করিলে তাঁহার সহিত যাঁহার বিবাদ আছে সেই দলপতির নিকট গিয়া দোষি ব্যক্তি অনুনয় বিনয় করিয়া কহিলে তিনি আপন ক্ষমা বা পুরুষার্থ প্রকাশার্থ তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া লইতে পারেন কেননা মান [মনে ?] করিবেন আমি কাহার অধীন নহি এবং আমার দল আছে আমাকে কেহ স্থগিত করিতে পারেন না এবং ক্রিয়া কর্ম্মও রহিত হইবেক না আপন দলস্থ লোক লইয়া সকল কর্ম্ম করিব বরঞ্চ অন্য দলস্থ কাহাকেও কখন নিমন্ত্রণ করিব না ইহা হইলে অনায়াসে হইতে পারিত। যদি বল তাহা হয় না ধর্ম্মসভায় যে নিয়ম হইয়াছে তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া এমত কর্ম্ম কে করিতে পারেন। উত্তর করিলে কাহার কি করা যায় সভাধ্যক্ষ

মহাশয়েরদিগের হাকিমত্ব ভার নাই যে তদ্দ্বারা কেহ কাহার কিছু দণ্ড করিবার ক্ষমতা রাখেন তবে লোক লজ্জাভয় কিন্তু সভায় না আইলে সে ভয়ে কে ভীত হন। পরন্তু ধর্ম্মের নিকট অপরাধী হইবেন ইহার সন্দেহ কি 'যএব লোকঃ সএব ধর্ম্মঃ' ইত্যবধানে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ সকলেই রক্ষা করিতেছেন এপর্য্যন্ত কাহার মাৎসর্য্যাদি দেখি নাই ইহাতেই নিতান্ত সাহসপূর্ব্বক অক্ষোভে সমাজকে সকল বিষয় জ্ঞাত করিয়া থাকি এবং করিব এমত মানস আছে। মহাশয়েরা আমার এই বক্তৃতা মধ্যে যদি কোন দোষ বুঝিয়া থাকেন তদ্দোষ মার্জনা করিতে আজ্ঞা হইবেক আমি মহাশয়েরদিগের অনুমত্যনুসারে যে কর্ম্মে নিযুক্ত আছি তাহার ক্রটি স্বীয় বুদ্ধ্যনুসারে করিব না এই অভিলাষ। যদ্যপি আমার ভ্রমবশতঃ অথবা অপারগতা জন্য সমাজের কোন কর্ম্মের ক্রটি হইয়া থাকে তাহাও মহাশয়েরা আমাকে দয়াপূর্ব্বক মার্জনা করেন পরম মঙ্গল না করেন তজ্জন্য যে দণ্ড বিধান করিবেন তাহা অবশ্যই স্বীকার করিব আমি এ পর্য্যন্ত এই কর্ম্ম করিতেছি শুদ্ধ কেবল ধর্ম্ম রক্ষা হয় আর ধার্ম্মিকসকলের মান রক্ষা পায় আর বিপক্ষ পক্ষে হাস্য না করিতে পারে মহাশয়েরা এসকল বিষয় বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন অধিক বক্তৃতা বাহুল্য।

সংপ্রতি অনুমতি হইলে অদ্যকার আহ্বান বিষয়ের বিষয় অবগত করাই যদ্যপিও তাবৎ অধ্যক্ষ এপর্য্যন্ত উপস্থিত হন নাই তাহাতেও সমাজের কর্ম্মের ব্যাঘাত হইতে পারিবেক না যেহেতুক সমাজের নিয়মপত্রের ৮ ধারায় লিখিত আছে মাসিক বৈঠকে সভ্যগণের মধ্য পঞ্চ জন সভাস্থ হইলে সভার কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারিবেক পঞ্চজনের ন্যূনে সভা হইতে পারিবেক না। অপর ঐ নিয়মপত্রের ১০ ধারায় লেখেন কোন বিষয়ে সভ্যগণের মতের অনৈক্য হইলে বহুবাদির সম্মত বিষয় কর্ত্তব্য হইবেক তাহাতে কেহ আপত্তি করিতে পারিবেন না।

ইহাতে সভাস্থ কাহারো কোন আপত্তি ব্যক্ত হয় নাই বরঞ্চ সকলেই সন্তুষ্টতাই প্রকাশ করিলে গত বৈঠকের বিবরণাবগত হইয়া সমাজ জিজ্ঞাসা করিলেন যে অদ্যকার বৈঠকে নূতন বিষয় কি উপস্থিত আছে প্রকাশিত হউক, তৎপরে প্রথমে নবদ্বীপ নিবাসি শ্রীযুত রামলোচন ন্যায়ভূষণ ভট্টাচার্য্যের এক লিপি পাঠ হইল তদবিকল এই।

কল্যাণীয় শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ম্মসভাসম্পাদক মহাশয়েষু।

নবদ্বীপ সমাজস্থ শ্রীরামলোচন শর্ম্মণঃ শুভাশিষাং রাশয়ঃসন্তু বিশেষঃ।

আমি শ্রীকালীনাথ মুন্সীর বাটীতে সামাজিকতা করিয়াছি বলিয়া আমি আপনি অপমানিত হইয়াছি আমি মুন্সীর বাটীতে কিম্বা তাঁহার সম্পর্কীয় ব্যক্তির সামাজিকতা করিতে ক্ষান্ত হইলাম ইহা জ্ঞাপনার্থ লিখিলাম ইহা সকল দলপতি মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাত করিবেন ইতি।

এই পত্র শ্রবণে সমাজকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইল যে ভট্টাচার্য্য কোন দলস্থ তাহাতে জানিলেন শ্রীযুত মহারাজ শিবকৃষ্ণ বাহাদুরের দলস্থ ইহাতে সমাজের মত হইল রাজা বাহাদুর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দোষ মার্জনা করিয়া স্বীয় দলে নিমন্ত্রণ চলিত করিলে সর্ব্বত্র চলিত হইবেন। রাজা বাহাদুর সভায় উপস্থিত ছিলেন ভট্টাচার্য্যের প্রার্থনীয় দোষ মার্জনা করিয়া সামাজিকতা করণে স্বীকার করিলেন।

দ্বিতীয় শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ মিত্রজ শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিকের ভাগিনেয়ের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়াছেন। ঐ বিবাহে তাঁহার বাটীতে রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ শ্রীযুত রামতনু রায় ও বাবু কালীনাথ রায়ের কনিষ্ঠ শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ রায় এবং মথুর বাবুর কনিষ্ঠ শ্রীযুত শ্রীনাথ মল্লিক বরযাত্র আসিয়াছিলেন তাঁহারা সভাস্থ হইয়া কর্ম্ম সমাপনান্তর যথা কর্ত্তব্য আহার ব্যবহার করিয়াছেন। এই বিষয় মিত্রবাবু সমাজের নিয়মাতিক্রম কর্ম্ম করিয়াছেন যেহেতুক সমাজের প্রতিজ্ঞা সতীদ্বেষিরদিগের সহিত আহার ব্যবহারাদি কেহ করিবেন না অতএব এবিষয়ে সমাজের মত কি তাহাতে উত্তর হইল সমাজের নিয়ম অতিরিক্ত কর্ম্ম যিনি করিবেন তাঁহার সহিত কাহার ব্যবহার থাকিবেক না ইহাতে সন্দেহ কি অতএব মিত্রজ বাবু শ্রীযুত বাবু উদয়চাঁদ দত্তজ মহাশয়ের দলস্থ তাঁহাকে পত্র লেখা উচিত যদি তিনি এবিষয় জ্ঞাত থাকেন তবে ধারামত কর্ম্ম করিয়া থাকিবেন বিদিত না হইয়া থাকেন এই পত্রের দ্বারা অবগত হইয়া বিহিত করিবেন এবং পত্রের যে উত্তর প্রদান করেন তাহা তাবৎ দলপতি অধ্যক্ষদিগকে জ্ঞাত করান উচিত।

তৃতীয় বহুবাজার নিবাসী শ্রীযুত রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত মথুরানাথ বাবুর বাটীতে দান গ্রহণ করিয়াছিলেন এজন্য দোষী হন। তাঁহার দোষ মার্জনা হইয়াছে কি না ইহা অবগত হইবার নিমিত্ত শ্রীযুত বাবু কালীচরণ দত্তজ শ্রীযুত বাবু রামমোহন দত্তজকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন এবং তাহার যে উত্তর প্রাপ্ত হন সেই উভয় পত্র সমাজকে অবগত করাইবার নিমিত্ত তদুভয় পত্র শ্রীযুত বাবু উদয়চাঁদ দত্তজ সমাজে প্রেরণ করিয়াছেন সে পত্র অবিকল এই।

শ্রীযুত বাবু রামমোহন দত্ত।

নমস্কারা নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ। আমার ৺পিতাঠাকুরের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ ১১ চৈত্র হইবেক মহাশয়দিগের দলস্থ শ্রীযুত রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় মোং রামকৃষ্ণপুর শ্রীযুত মথুরানাথ মল্লিকের বাটীতে ৺দোলযাত্রায় সতীবিবাদি সংসর্গ সভাতে অধিষ্ঠান হইয়াছিলেন ঐ দোষ মার্জনা করিয়া তাঁহাকে সংগ্রহ করিয়াছেন কি না লিখিবেন ইতি সন ১২৩৮ সাল তারিখ ৯ চৈত্র। শ্রীকালীচরণ দত্ত।

শ্রীযুত বাবু কালীচরণ দত্ত।

প্রত্যুত্তর নিবেদনমিদং। মহাশয়ের পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম শ্রীযুত রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সতীবিরোধি সংস্থষ্ট সভায় রামকৃষ্ণপুরের শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ মল্লিকের বাটীতে দোলযাত্রায় সভাস্থ হওয়া সে বিষয় অজ্ঞাতসার হইয়াছিল এক্ষণে তৎস্থানে যাওনে বিরত হইয়াছেন এ বিধায় তাঁহাকে অবিবাদে সংগ্রহ করিয়া লওয়া গিয়াছে কিমধিকমিতি। শ্রীরামমোহন দত্ত।

এই পত্রদ্বয় শ্রবণে প্রথমতঃ সভাপতি কহিলেন দলপতির ক্ষমতা আছে দোষ মার্জনা করিয়া গ্রহণ করিতে পারেন কিন্তু বাবু রামমোহন দত্তজ যে দলপতি হইয়াছেন ইহা সমাজ জ্ঞাত আছেন কি না তাহাতে সম্পাদক কর্তৃক কথিত হইল তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দলস্থ ইহাই বিদিত আছে ইহাতে শ্রীযুত বাবু দুর্গাচরণ দত্তজ কহিলেন আমার পিতা দলপতি নহেন শ্রীযুত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত বিচ্ছেদ হওয়াতে শ্রীযুত বাবু অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যে দল করিয়াছেন আমরা সেই দলস্থ অতএব তর্কসিদ্ধান্তকে তিনিই মার্জনা করিয়াছেন এজন্য পিতা এই উত্তর লিখিয়াছেন যে আমারদিগের দলে চলিত হইয়াছেন এই মাত্র অভিপ্রায়। এমত শ্রবণে শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ দেব কহিলেন সমাজের নিয়ম আছে যে দলপতি রহিত করিবেন তিনি মার্জনা করিলে সকল দলে চলিত হইতে পারেন। শ্রীযুত বাবু কালাচাঁদ বসু কহেন যদি কোন দলপতি এক জনের প্রতি রাগ করিয়া মার্জনা না করেন তবে কি তিনি উদ্ধৃত হইবেন না। সম্পাদক কর্তৃক কথিত হইল যে এই সন্দেহ ভঞ্জনার্থ প্রতিজ্ঞাপত্রের শেষ কএক পংক্তি দেখিলেই হয় তাহাতে লেখেন এমন বিষয় উপস্থিত হইলে সমাজে বিবেচনা হইবেক অতএব বিবেচনা হইতেছে বাবু ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় কহেন

ব্রাহ্মণের প্রতি আমার রাগদ্বেষ নাই তাৎপর্য্য এই যে সমাজের নিয়মাতিক্রম কর্ম্ম না হয় ইহাতেই মহাশয়দিগের যেমত মত হয় করুন। শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ চৌধুরী কহিলেন এক্ষণে এ বিষয়ের আর কোন কথা হইতে পারে না বাবু অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজকে পত্র লিখিলে তবে এ বিষয় বিবেচ্য হইতে পারে এই কথায় শ্রীযুত মহারাজ দেবীকৃষ্ণ বাহাদুর পৌষ্টিকতা করিলে সভাস্থ সকলেই সম্মত হইলেন।

চতুর্থ। শিবপুর নিবাসী শ্রীরামকৃষ্ণ শর্ম্মণঃ ইতিস্বাক্ষরিত এক পত্র উপস্থিত ছিল উত্থিত করিবামাত্র সভাপতি কহিলেন এ ব্যক্তি কে জানা গেল না অতএব তাঁহার পত্র সমাজে পাঠ করিবার আবশ্যক নাই।

[স. সে. ক. ২। ৫৮১-৮৫]

দুই

প্রতিক্রিয়ার ঐক্য, গদ্যের ঐক্য

১

উপনিবেশের সামাজিক ভাষা

১৮৫০ সালের মধ্যে প্রধান কাগজগুলিতে যে-সমস্ত প্রসঙ্গ আলোচিত হত তার নির্বাচনে কোনো মিল ছিল কি না, এই সব প্রসঙ্গ নিয়ে বাঙালি নাগরিকদের নানা গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিক্রিয়ার কোনো মিল ছিল কি না ও সেই প্রতিক্রিয়া প্রকাশের জন্যে কোনো একটি গদ্যভঙ্গি গড়ে উঠছিল কিনা—এই অংশটিতে আমরা এই তিনটি বিষয় দেখতে চাই।[২৫]

দর্পণে সাহেবদের পক্ষে সহজবোধ্য ইংরেজি বাক্যকাঠামোর ঘনিষ্ঠ ছাঁচে কিছুটা সংস্কৃত রীতির যে-বাংলা গদ্য লেখা হত তাতে বাংলা বাগ্‌বিধি বা বাগ্‌-রীতি অনুসরণ করা সহজ ছিল না। তাই দর্পণের গদ্যে অনুভবের চাইতে তথ্য-জ্ঞাপনের দায় বেশি। অন্য দিকে চন্দ্রিকার গদ্যে হয়তো বাঙালি বাচনে বাঙালি অনুভবের কথা একটু বেশিই বলা হয়েছে। কিন্তু কলকাতায় তখন পরবর্তী কালের ব্রিটিশ ভারতের জন্ম হচ্ছে। সেখানে হিন্দু বাঙালির ঐ হিন্দু অনুভব কালানুচিত ও অনৈতিহাসিক। দর্পণের গদ্যে সাহেব ও পণ্ডিতরাই ছিলেন প্রধান, বাঙালির মুখের বাংলা ছিল অনুপস্থিত। আবার চন্দ্রিকার গদ্যে যে-বাঙালি তার মুখের ভাষা নিয়ে উপস্থিত ছিল, তখনকার ইতিহাসে সে ছিল অবান্তর। ইতিহাস ছিল দর্পণের পক্ষে—ইতিহাসের পাত্র সেখানে ইতিহাসের স্রষ্টা নয়। ইতিহাসের পাত্র চন্দ্রিকায় মাতৃভাষা পেয়েছে কিন্তু সেখানে ইতিহাস ছিল না। বিষয় ছিল দর্পণে আর ভাষা ছিল চন্দ্রিকায়—এ-রকম একটু সরলীকরণে হয়তো এই বিচ্ছেদের বর্ণনা

ততদিনে আবার নতুন-নতুন সরকারি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। নানা নিয়ম-আইনের কাঠামোতে বিদেশী সরকারের সঙ্গে দেশী মানুষজনের সম্পর্কের ধারা সাব্যস্ত হতে চলেছে। ইংরেজি জানা একটি নতুন শ্রেণী বাঙালি সমাজে তৈরি হয়ে গেছে। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাঙালির চাকরির আশা বেড়েছে। জিলা ও মহকুমা সংগঠনে ভারতীয় জীবনের ওপর শাসকদের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের পাকাপাকি

ব্যবস্থা তৈরি হয়ে যাচ্ছে। পুলিশ ও সরকারি কর্মচারী হিশেবে সাহেব-বাঙালিরা ঘুষ-অত্যাচার-অনাচারেরও শরিক হচ্ছে। কিন্তু এত শরিকিয়ানা ও ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও ইংরেজিজানা বাঙালি কেন সাহেব নয়, ঘুষ তো সাহেবরাও খায়, কৃষকদের ওপর অত্যাচার তো বাঙালিরাও করে—এই প্রতিক্রিয়ায় বাংলা গদ্য হয়ে উঠতে পারে অসহায়তার অভিমানে একটু চিৎকৃত বা ব্যর্থতার ক্ষোভে বক্র।

এই গদ্যভঙ্গির প্রধান অবলম্বন ছিল অস্পষ্ট এক নৈতিক নিরিখ। সেই নিরিখটি প্রথমেই উপস্থিত করা হয়—তার পর সেই নিরিখে নিজেদের স্থাপন করা হয় অধস্তন অবস্থায়, যাদের বাধ্যতই সহ্য করতে হচ্ছে উর্ধ্বতনের 'অনৈতিক' কাজকর্মের দায়। যেমন, আমাদের এই আলোচনায় বিভিন্ন উদ্ধৃতিতে ব্যবহৃত হয়েছে এ-রকম পদাংশ, 'বিদ্যার সার্থকতার কোন কারণ দেখিতে পাই না', 'চার্টরে বাঙ্গালিদিগের হস্তে তাবৎপ্রকার কর্ম্মার্পণের বিধি আছে, তাহার বিপরীত ব্যবহারে অবশ্য অন্যায় হয়', 'যে ২ গুণদ্বারা অধিকারী হওয়া যায় এতদ্দেশীয়দিগের ঐ সকল গুণবত্তা দর্শান উচিত', 'বাঙ্গালি জাতির দয়া ও সদ্ব্যবহারের প্রমাণ', 'রাজার এক প্রধান ধর্ম্ম অপক্ষপাতী হইবেন', 'আমরা নিয়তই রাজার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকি', 'নিরন্তর কেবল রাজার মঙ্গল প্রার্থনাই করিয়া থাকি', ইত্যাদি।

এই নৈতিক নিরিখটি একবার উপস্থিত করা হয়ে গেলে আত্মসমর্থনের প্রবণতাই প্রথমে আসে কারণ তখন সেই আত্মসমর্থনও হয়ে দাঁড়ায় একটি নৈতিক কাজ, যেন তাতে স্বার্থপরতার দোষ খানিকটা কাটে। তখন নীতিবাক্যের নিরিখ থেকে এ-ধরনের বাক্য বেরয়, 'যে-পর্য্যন্ত সম্ভ্রান্ত রাজকীয় পদে…এতদ্দেশীয়… লোকদিগকে নিযুক্ত করণের নিয়ম নির্ধারণ না করিবেন…তদবধি এই বঙ্গরাজ্যের সৌভাগ্যবৃদ্ধি হইবেক না, যদবধি বাঙ্গালি ও সিবিলিয়ানদিগের সমান পদ না হয়…'। আত্মসমর্থনের এই মোহে ঘুষ নেয়ার ব্যাপারেও বাঙালি আর সাহেবদের ঘুষের ভিতর পার্থক্য করা হয় বারবার।

আত্মসমর্থনের সঙ্গেই যুক্ত থাকে আরো দুটি আনুষঙ্গিক প্রবণতা—আত্মকরুণা ও অভিযোগ। এই আলোচনায় আমরা আত্মগৌরবের প্রতিক্রিয়ায় আত্মকরুণার অনেকগুলি উদাহরণ দিয়েছি। নিজেদের অসহায়তার প্রদর্শন রাজকীয় অনুগ্রহ পাওয়ার যেন প্রায় নিশ্চিত উপায়—বাংলা কাগজের এই লেখাগুলিতে আত্মকরুণার এমনই ছড়াছড়ি। কিন্তু নিজের প্রতি এই করুণা ত সমর্থনযোগ্য হয় না অন্যের প্রতি অভিযোগ ছাড়া। তাই 'রাজপুরুষ'-গণ কী ভাবে অন্যায় করছেন তার তালিকা দীর্ঘতর হয়, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে।

নৈতিক নির্দেশে স্বরগ্রামের গাম্ভীর্য, আত্মকরুণার শ্লেষে স্বরের বক্রতা, দোষারোপে স্বরের তীব্রতা ও আত্মসমর্থনে আবার গাম্ভীর্য—মাত্র এরই ভিতর সমষ্টির এই স্বর ওঠানামা করে। আর, সমষ্টিস্বরের এই যে-প্রতিনিধিত্ব কাগজের ভাষাতে দেখা যায় তাতে জ্ঞানান্বেষণ-প্রভাকর-ভাস্কর তিরিশ, চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে চন্দ্রিকার ভাষারই ধারাবাহী। অনেক প্রসঙ্গে তত্ত্ববোধিনীও এই ধারারই। বিশেষ লক্ষণীয় যে এই ধারাবাহিকতা সমাজবিষয়ক কর্মসূচিতে মতপার্থক্যের দ্বারা ব্যাহত হয় নি বা এমন-কি, প্রভাকর-ভাস্কর কলহও চলতে পারে একই ভাষাতে। এই গদ্যভঙ্গি কোনো প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিমাত্র নয় বা বাক্যগঠনের কোনো ধরন নয়। যে-বোধ ও অনুভব থেকে মানুষ কথা বলতে চায়, সমষ্টির সেই বোধ ও অনুভবে, চন্দ্রিকা-জ্ঞানান্বেষণ প্রভাকর-ভাস্কর-তত্ত্ববোধিনীর ভিতর, তাদের সমস্ত মতপার্থক্য ও ভঙ্গিপার্থক্য সত্ত্বেও নিহিত কোনো মিল ছিল। হয়তো সাম্রাজ্যশক্তির প্রত্যক্ষ প্রবল উপস্থিতিতে অনুগ্রহপ্রার্থীর ভূমিকা সেই অনুভূতির ঐক্য সাধন করে থাকতে পারে। বা, বাঙালি মধ্যবিত্তের প্রবল আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও ইংরেজের সমতুল্য হওয়ার ব্যর্থতা থেকেও উপলব্ধির সেই মিল এসে থাকতে পারে। অনুগ্রহ প্রার্থনা বা ব্যর্থতা যেখান থেকেই আসুক, মিলটিই সত্য।

ভাষাভঙ্গির এই মিল থেকে সমাজ-ইতিহাসেরও একটি প্রশ্ন ওঠে। কেন এমন হল যে, ইংরেজের সমর্থনে সমাজ সংস্কারের বিরুদ্ধে সংকীর্ণ হিন্দু সংস্কারের সমর্থনই ছিল যে-কাগজের প্রধান কাজ সেই চন্দ্রিকার ভাষার সঙ্গেই বাংলা সাংবাদিক গদ্য ধারাবাহিক হয়ে উঠল? রামমোহন যে-সমাজ ও ধর্ম সংস্কারের কর্মসূচির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তার সঙ্গে এই পরবর্তী ভাষা যুক্ত হতে পারল না কেন? জ্ঞানান্বেষণ-প্রভাকর-ভাস্কর, এমন-কি তত্ত্ববোধিনীতেও, বিষয়ে ভাষায় সহজেই ভবানীচরণকে মনে পড়তে পারে কিন্তু কোথাওই রামমোহনকে মনে পড়ে না। অথচ এর বিপরীত হওয়াটাই কি সংগত ছিল না? নতুন সামাজিক কর্মসূচি, নতুন গদ্যভাষা, নতুন নেতা—এই তিনের সহজ সমন্বয়ই তো হতে পারত আদর্শ। তা হয়ে উঠল না কেন?

এই প্রশ্নের একটি উত্তর মিলতে পারে বাস্তব অবস্থায়। 'সম্বাদ কৌমুদী'তে রামমোহন ব্যক্তিগভাবে ততটা যুক্ত ছিলেন না, যতটা তিনি ছিলেন 'মিরাত-উল-আখবর'-এ। পরন্তু এমন তথ্যও পাওয়া যায় যাতে সন্দেহ হয় বুঝি 'সম্বাদ কৌমুদী'-র পেছনে প্রকৃত সমর্থন ছিল সেই অবাধ বাণিজ্যসমর্থক সাহেবদেরই। তাছাড়াও, 'সম্বাদ কৌমুদী' কখনোই সাময়িকপত্র হিশেবে বাঙালি পাঠকসমাজের

কাছে গৃহীত হয় নি, তার প্রকাশ ছিল অত্যন্ত অনিয়মিত। তাই রামমোহনের সাংবাদিক গদ্যরচনার যে-যথার্থ ঐতিহাসিক মূল্য পরবর্তী কালে আমরা নির্ধারণ করি, তাঁর সমকালে তা একটি সামাজিক শক্তি হয় উঠতে পারে নি। বাস্তব কারণেই রামমোহন তাঁর সমকালে বা পরবর্তীকালে বাংলা গদ্যের মডেল হিশেবে গৃহীত হন নি। অন্যদিকে মডেল হিশেবে ভবানীচরণের গ্রাহ্যতা ছিল প্রায় সর্বজনীন। কিন্তু রামমোহনের পক্ষে মডেল হওয়া সম্ভবও ছিল কি? রামমোহনের সামাজিক ও ধর্মীয় কর্মসূচি আমাদের সমাজের ভিতর থেকে তৈরি হয় নি। না হলেও ইংরেজ আগমনের মতো ঘটনাকে তিনি আমাদের সমাজ-পরিবর্তনের কাজে লাগাতে পেরেছিলেন—তাঁর কর্মের আধুনিকতা এখানেই নিহিত।

কিন্তু তাঁর মতো একজন ব্যক্তি বা তাঁর গ্রুপের পক্ষে রাজশক্তির সমর্থনে যদি-বা সম্ভব হয় সামাজিক ইতিহাসের গতি বদলানো, কখনোই সম্ভব ছিল না সেই কর্মসূচির যোগ্য নতুন ভাষারীতি আবিষ্কার করা। বাংলাদেশে ও বাঙালি সমাজের বিবর্তনের ক্রিয়াতে যদি এই আধুনিকতার উত্থান ঘটত তাহলে তার ভাষারীতিও প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই তৈরি হয়ে উঠত। তা হয় নি। হয় নি বলেই কলকাতার নাগরিক জীবন ও সাহেবদের সঙ্গে চাকরিবাকরি ব্যাবসাবাণিজ্য মেনে নেয়া সত্ত্বেও বাঙালি হিন্দুদের যে-অংশ প্রাচীন গ্রামীণ হিন্দু জীবনাদর্শ, স্মৃতিশাস্ত্রের শাসন ও কুলজি-স্বীকৃত সামাজিক জীবনের ধারাটি আঁকড়ে থাকল তারা এমন ভাষারীতিতে পৌঁছল যার গণগ্রাহ্যতা আছে। প্রধানত রাজসমর্থনে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হয়েছে। রামমোহনের কাছেও সেটাই ছিল ভরসা। তার বিরুদ্ধবাদীদেরও তো লক্ষ ছিল রাজানুগ্রহ। কিন্তু তাঁরা তা পান নি বলেই রাজানুগ্রহের পরিবর্তে সামাজিক সমর্থনের মোহ অন্তত তাঁদের পক্ষে তৈরি করা সম্ভব ছিল। প্রথাগত সামাজিক জীবনের নিরাপত্তাবোধেব মোহেই চন্দ্রিকার ভাষার প্রাধান্য স্বীকৃত হতে পেরেছে।

হিন্দুসংস্কারবাদীদের কাগজের ভাষাই পরবর্তীকালে সাংবাদিকতার ভাষা হিশেবে সম্প্রসারিত হতে পেরেছে বলেই কি সে ভাষা প্রায়ই এত সমালোচনা-প্রবণ, প্রায় কোনো কিছুকেই সমর্থন করে না, আত্মকথনবিহ্বল, শ্লথ, অতিকথা-প্রবণ, ক্ষুদ্রদৃষ্টি?

সামাজিক কর্মসূচিরই একটি উদাহরণ নিয়ে দেখা যেতে পারে প্রতিক্রিয়া যেখানে বিভিন্ন, এমন-কি সেখানেও গদ্যভাষার গঠন কী করে অভিন্ন থাকতে পারছে, আর, সে-গদ্যকেও এই ধারাবাহিকতাতে কী করে চিনে নেয়া যায়।

বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহের প্রস্তাব 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'তে প্রকাশিত হওয়ার পর (১৮৫৪) এ নিয়ে নানা রকম বির্তক শুরু হয়। তখনকার সবচেয়ে প্রচারিত বাংলা কাগজ দুটি 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'সম্বাদ ভাস্কর'-ও এ-বিষয়ে তাদের মতামত প্রচার করে। ঈশ্বর গুপ্ত বিধবা বিবাহের সমর্থক ছিলেন না। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ খুবই উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। 'সম্বাদ ভাস্কর'-এ বিধবা বিবাহ নিয়ে যত লেখা বেরিয়েছে ঐ সময়ের আর-কোনো কাগজে তত বেরয় নি। ফলে বিধবা বিবাহ বিধিবদ্ধ (১৮৫৬) হওয়ার পর গৌরীশঙ্কর খুবই খুশি হন ও তাঁর রচনায় সতীদাহ প্রথাবিরোধী ব্যবস্থার ধারাবাহিকতাতে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের খুব তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হিশেবে বিষয়টিকে দেখেন। কিন্তু এই বাস্তবতা ও ইতিহাসবোধের মধ্যেও তিনি ব্যক্তিগত বিষয়টিকে আনতে ভোলেন না। ব্যক্তিগতের সেই প্রসঙ্গেই গুপ্তকবির কথাও আসে, কারণ তাঁর সঙ্গে অনেক দিনের কাগজে ঝগড়া চালু ছিল। এই রচনাটি ভাস্করে বেরয়, ১৮৫৬-র আগস্টে।

১৮৫৭-র জানুয়ারিতে ঈশ্বরগুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকরে'-এ 'স্ত্রী-শিক্ষা তথা বিধবা বিবাহ'-এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটি শুরু হয় বেথুন স্কুলে ছাত্রীর অভাব প্রসঙ্গে। সেই প্রসঙ্গে লেখক নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। সেখান থেকে প্রসঙ্গ ধরে প্রশ্ন তোলেন, ' "স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবাবিবাহ" ইহার কোন বিষয়টি অগ্রে করা বিধেয় হইতেছে ?' তাঁর নিজের পক্ষপাতিত্ব স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি। এই বাস্তবতা ও ঐতিহাসিকবোধে তিনি এমন কথাও লেখেন 'এক্ষণে যাঁহার-দিগেও বিধবাবিবাহ ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসুক দেখিতেছি তাঁহারদিগের মধ্যে অনেক ব্যক্তিকেই এই পাঠালয়ের শ্রীবৃদ্ধিসাধন সম্বন্ধে অনুকূল দেখিতে পাই না,··· পাঠার্থ আপনাপন বাটীর কন্যা প্রেরণ করিলে এতদিনে যে, কতদূর পর্য্যন্ত মঙ্গল হইত, তাহা বচনীয় নহে।' কিন্তু এই সব সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রসঙ্গের মধ্যেও গুপ্তকবি তাঁর ব্যক্তিগত কথাটি আনতে ভোলেন না। সেই সূত্রে ভাস্কর-সম্পাদকের পরোক্ষ উল্লেখও থাকে—প্রভাকর-ভাস্করের চালু ঝগড়ার সুরেই।

অথচ এই দুইজন লেখকই পরস্পর বিপরীত অর্থে সামাজিক-ঐতিহাসিক-ব্যক্তিগতকে সাজান প্রায় অবিকল এক ভাষায়। দোষক্ষালন বা আত্মসমর্থন—উদ্দেশ্য যাই হোক-না কেন, ব্যক্তিগতের সমর্থনে নৈতিক নিরপেক্ষতার সার্বজনীনকে এমন জাহির করা হয় যে আত্মসমর্থন আর দোষারোপ একাকার হয়ে যায়। এমন-কি শেষে মনে হতে থাকে, বিধবা-বিবাহ ও তার সামাজিক-ঐতিহাসিক তাৎপর্যের চাইতেও জরুরি ব্যাপার বিষয়টির সঙ্গে গৌরীশঙ্কর ও ঈশ্বর গুপ্তের ব্যক্তিগত সম্পর্ক,

বাকি সবই সে-তুলনায় গৌণ। রচনাদুটির ভাষার মিল দেখলে বোঝা যায়, বাংলা-গদ্যের গড়ন প্রতিক্রিয়া-নিরপেক্ষভাবেই কী রকম অনড় হয়েছিল। বিষয় ভাষাকে বদলে দেয়, বা, ভাষার সন্ধান বিষয়েরও সন্ধান বটে—এই সব শুদ্ধ নান্দনিক সত্য সেখানে অচল, কারণ বিষয় বা ভাষা কোনোটির সৃষ্টিই বাঙালি সমাজ-প্রক্রিয়ায় ঘটে নি।

সম্বাদ ভাস্কর। ২ আগস্ট ১৮৫৬

গত বুধবাসরীয় কলিকাতা গেজেটে বিধবা বিবাহের আইন প্রচার হইয়াছে…এই দিবস হিন্দুদিগের চিরস্মরণীয় হইবে, মৃত মহাত্মা রামমোহন রায়ের সময়াবধি আমরা সহমরণ নিবারণ ও বিধবা বিবাহ এই দুই মহদুদ্দিশ্য সিদ্ধির সংকল্প করিয়াছিলাম…জগদীশ্বরের কৃপায় অদ্যাবধি স্বচ্ছন্দ শরীরে জীবিত আছি এবং বিধবা বিবাহ আইন প্রচলন হইতেও দেখিলাম, ধন্য জগৎ পাতা…আমরা বাল্যকালাবধি অদ্য পর্য্যন্ত তোমার নিকটে একাগ্রমনে অন্তর্ব্বাহ্যে প্রার্থনা করিতেছি কত দিনে হিন্দু অবলাবলীর দুর্দ্দিন দূর হইবে, এই সদুদ্দিশ্য সিদ্ধার্থে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া ছিলাম। এ জন্য আমরা কত লোকের কোপ বেগ ধারণ করিয়াছি, কত আপদ বিপদ সহ্য করিয়াছি, কত ক্লেশ ভোগ করিয়াছি, তথাপি আমারদিগের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় নাই, প্রতিজ্ঞা পূরণে মস্তক গেলেও ক্লেশ বোধ হয় না…যে সকল প্রধান লোকের বিশেষত প্রকাশ্য পত্র-সম্পাদকদিগের প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা, মতের স্থিরতা এবং চিত্তের প্রশান্ততা নাই তাঁহারা লোকসমাজে আপনা আপনি বড় হইতে চাহেন এ বড় হাসির কথা,…আমরা এস্থলে পাঠকবর্গকে এই বিষয়ের একটি অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দর্শাই, আমারদিগের পাঠক মহাশয়েরা অনেকেই গুপ্ত সম্পাদকের নাম শ্রুত আছেন এবং উক্ত সম্পাদক প্রথমে বিধবা বিবাহের প্রধান গোঁড়া ছিলেন তাহাও জ্ঞাত থাকিবেন, পরে নগরীয় প্রধান২ হিন্দু মহাশয়েরা যখন বিধবা বিবাহ প্রতিকূলে আবেদন করণার্থ সভা করেন তখন গুপ্ত সম্পাদক মান্য লোভে গোপনে গোপনে এ দল ছাড়িয়া অন্য দলে নাম লেখাইলেন, বিধবা বিবাহের প্রধান প্রতিপক্ষ হইয়া উঠিলেন এবং কোন২ প্রধান লোককে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় কবিত্ব প্রকাশ করিলেন, তাহাতে মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতিবাদেই ব্যবস্থাপকেরা ভয় পাইয়া আইন প্রচারে বিরত হইবেন।

[সা. বা. স. ৩ : ৩১৩-১৪]

সংবাদ প্রভাকর। ১ মাঘ ১২৬৩

…হে মহাশয়গণ, সংপ্রতি অনেক মহাশয় এই বিধবাবিবাহের সুযোগ পাইয়া

এরূপ অনুযোগ করিতেছেন যে, এই সূত্রে প্রভাকর সম্পাদকের মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, হে ঈশ্বর ! তুমি সাক্ষী, হে সত্য ! তুমি সাক্ষী, হে ধর্ম্ম ! তুমি সাক্ষী ! —এই অভিযোগ অতি অন্যায় অভিযোগ হইতেছে, যেহেতু আমারদিগের অভিপ্রায়ের পরিবর্ত্তন কিছুমাত্রই হয় নাই, স্বপ্নেও যাহার সংকল্পের সম্ভাবনা নাই, তাহার সম্ভাবনা কি প্রকারের সম্ভাবনা হইতে পারে ? যাঁহারা আদ্য অন্ত না দেখিয়া ও বিশেষ বিবেচনা না করিয়া অন্যায়রূপে এই অঘট ঘটনার ঘটক হইয়া নানা কথার রটনা করিতেছেন, আমি বিশেষরূপে বিনত হইয়া তাঁহারদিগের নিকট এই নিবেদন করি, তাঁহারা অনর্থক কেন আমার প্রতি এই মর্ম্মান্তিক প্রচুর পীড়াকর অতি নিকৃষ্ট পরীবাদ প্রদান করেন ?—আমার জীবনধন হরণ করুন, সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া আমাকে নিঃস্ব করুন, তাহাতে ক্ষণমাত্র ক্ষুব্ধ হইব না, কিন্তু কি ভয়ঙ্কর ! কি পরিতাপ !…আমি কোন অপরাধ করি নাই, "মতের পরিবর্ত্তন" যাহা কখনই হয় নাই, হইবার নয়, এবং হইবে না, সে বিষয়ে কেন এরূপ নিষ্ঠুর উক্তি করিতেছেন ?—"বিধবা বিবাহ বিষয়ে" বিশিষ্ট-রূপ বিবেচনা করিয়া আমরা প্রথমে যাহা উল্লেখ করিয়াছি, এক্ষণেও তাহাই করিতেছি, এবং পরেও সেইরূপ করিব, ইহার অন্যথাচরণ কদাচই করিব না—আমারদিগের লেখনী কোন ব্যক্তি বিশেষের অধীনা কস্মিনকালেই হয় নাই ও হইবে না, ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেও কাহারো নিকট স্বাধীনতা এবং অভিপ্রায়কে বিক্রয় করিব না…

[সা. বা. স. ১। ২১৮]

বিধবা বিবাহ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে এঁরা কেউই একবারের জন্য বিদ্যাসাগরের নামোল্লেখও করলেন না।

২

নাগরিক জীবন ও বাঙালি সমাজের প্রতিক্রিয়া

কলকাতার নাগরিক জীবনে বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যেতে পারে প্রধানত তিনটি ক্ষেত্রে—ক. বাঙালি হিন্দু নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজের ভিতরে নগরজীবনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ; খ. চাকরি ও ব্যাবসা, পৌরজীবন সংক্রান্ত নিয়মকানুন ও সরকারি আইন সম্পর্কে অর্থাৎ পৌরসংগঠন সম্পর্কে সমাজের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ; গ. বেহারা, গাড়োয়ান, ধোপা, মাঝি, বেশ্যা বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত

পৌরজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ এই মানুষজন সম্পর্কে বাঙালি সমাজের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়।

ক. নগরজীবনে বাঙালির সমাজে আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া

কলকাতায় পৌরসংগঠন নির্মাণের চেষ্টা শুরু হয় ফিভার হসপিটাল কমিটির রিপোর্টের ফলে (১৮৩৭-১৮৪০) ১৮৪০ থেকে ১৮৫৬-র মধ্যে ৫টি আইনে।[২৭]

পৌরসংগঠনের আগে এই নগরজীবন তিনের দশক পর্যন্ত প্রায় আকারহীন। কিছু রাস্তাঘাট, কিছু উন্নয়ন প্রয়াস, কিছু স্কুল-কলেজ-এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা— এই সবের ভিতরেই নগরজীবনের বাঙালি, ভারতীয় ও ইয়োরোপীয়দের সম্মিলিত সামাজিকতা সীমাবদ্ধতা ছিল। নগরজীবনে সরকারি ও বেসরকারি ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে নতুন সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ায় বাঙালি মধ্যবিত্ত নাগরিক সমষ্টিমত সংগঠনের বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করছিল। বিভিন্ন ধরনের সোসাইটি, এসোসিয়েশন ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গঠন, এই সব প্রতিষ্ঠানের সভা পরিচালনা, বিদ্যালয়ের পরীক্ষাগ্রহণ, সভা-সমিতি, আবেদনপত্র, কোনো বিশেষ উপলক্ষে সমবেত চাঁদা সংগ্রহ, সংবাদপত্র প্রকাশ—এই সব নাগরিক কাজকর্মে বাঙালি মধ্যবিত্তের বিভিন্ন অংশ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। 'আত্মীয় সভা' থেকে 'ধর্ম্মসভা', ১৮১৫ থেকে ১৮৩০ সালের ভিতর প্রতিষ্ঠিত ১০টি এসোসিয়েশনের মধ্যে ৫টিতেই ছিল ইয়োরোপীয়দের ও সরকারের উৎসাহ, সমর্থন ও অংশ।

এই সময়কার কাগজে, বিশেষত 'সমাচার দর্পণ' ও 'সমাচার চন্দ্রিকা'-য়, এই সব বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সভার ও স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও টোলের পরীক্ষাগ্রহণের বিস্তৃত বিবরণ থাকত। যে-রকম বিস্তৃতভাবে এই বিবরণ লেখা হত তাতে অনুমান করা যায় বিষয়টি বাঙালি সমাজের পূর্ব অভিজ্ঞতার বাইরে। সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা মাদ্রাসা ও হিন্দু কলেজের ছাত্রদের পরীক্ষাগ্রহণ, উপাধি বিতরণ ও নতুন শিক্ষাপ্রণালী জনসাধারণের কাছে পরিচিত করে তোলাটাই ছিল সংবাদ-বিবরণের প্রাথমিক উদ্দেশ্য।

সমাচার দর্পণ। ১১ সেপ্টেম্বর ১৮১৯

কলিকাতায় স্কুল সোসায়িটীর ইস্তাহাম।—গত সপ্তাহে শনিবারে ২০ ভাদ্র মোং কলিকাতার শ্রীযুত রাজা গোপীমোহন দেবের বাটীতে কলিকাতার বাঙ্গালা পাঠশালার বালকেরদের ইস্তাহাম হইয়াছে পূর্ব্বে নিজ কলিকাতা ও শ্রীরামপুর চুচুড়া প্রভৃতি নগরের পণ্ডিত ও ভাগ্যবান লোকেরদের আহ্বানার্থ এক২ পত্র

গিয়াছিল তাহাতে অনেক২ পণ্ডিত ও জ্ঞানবান অথচ ভাগ্যবান ইংগ্লণ্ডীয় লোক ও বাঙ্গালি লোকেরদের সমাগম হইয়াছিল এবং দেড় শত বালক সেখানে প্রত্যেকে ইস্তাহাম দিয়াছিল তাহাতে যে সকল বালকেরদিগকে লিখা পড়াতে উপযুক্ত দেখিয়া সকলে সন্তুষ্ট হইলেন ও তাহারদের শিক্ষকেরা প্রতিজন সরকার হইতে উপযুক্ত পারিতোষিক পাইয়া পরিতুষ্ট হইল। ঐ ইস্তাহাম সাড়ে তিন ঘণ্টার সময়ে আরম্ভ হইয়া ছয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত হইয়াছিল।

[স. সে. ক. ১। ৫]

সমাচার দর্পণ। ৯ জুন ১৮২১

স্কুল শোসইটী। —গত ২ জুন শনিবারে স্কুল শোসইটীর বৎসরীয় বিবেচনা কারণ টৌনহালে অর্থাৎ সাধারণ ঘরে সংপ্রদায়েরা দ্বিতীয় বার বসিয়াছিলেন তাহাতে প্রধান জজ শ্রীযুত ইষ্ট্ সাহেব ছিলেন তাহাতে রিপোর্ট জানা গেল যে কলিকাতার মধ্যে বাজে স্কুল ২১১ দুইশত এগার আছে তাহার মধ্যে চারি হাজার নয় শত বালক। ইহাতে শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত উমানন্দ ঠাকুর ও শ্রীযুত রামচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুত দুর্গাচরণ দত্ত এহারা আপন২ নিকটস্থ স্কুলের তদারক করিয়াছেন ইহা জানিয়া সাহেব লোকেরা তাহারদিগের প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন।

এবং স্কুল শোসইটীর বাঙালি কোমোটির মধ্যে শ্রীযুত মিরজা মোহম্মদ অস্করি নিযুক্ত হইয়াছেন।

[স. সে. ক. ১। ৫]

সভা-সমিতির এই ধরনের বিবরণ পরে বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রের একটা প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছিল। এই বিবরণের ভিতর দিয়ে বাঙালি মধ্যবিত্ত নাগরিক অভ্যাস অর্জন করছিল। এমন-কি যে-সভা আহূত হয়েছে হিন্দু সামাজিকতার ধারায় সে সভার বিবরণেও দেখা যায় এই পাশ্চাত্য রীতির মিটিং বাঙালি সমাজের ধাতে এসে যাচ্ছে।[২৮]

এই সময়ের আর-একটি প্রধান বিষয় সমবেত আবেদন ও সমবেত চাঁদা সংগ্রহ। বোধহয়, এই ধরনের ভারতীয়-ইয়োরোপীয় যৌথ সামাজিকতার নিদর্শন থেকেই স্থানীয় কর আদায়ে সক্ষম একটি স্বয়ংশাসিত পৌরসংগঠনের সম্ভাব্যতা সরকার চিন্তা করতে শুরু করেন। বিশিষ্ট বাঙালি ও ভারতীয়রা তাঁদের পুরনো ঐতিহ্যের টানে ও নতুন শাসনকর্তাদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগের লোভে এই সব

সমবেত কাজে অংশ নিতেন। কিন্তু পৌর সংগঠনের ব্যাপারে সরকার ও বাঙালিদের ভূমিকা ছিল স্বতন্ত্র।

সমাচার দর্পণ। ৩ মার্চ ১৮৩৮

> পশ্চিম দেশীয় দুর্ভিক্ষের প্রতিকার।—সংপ্রতি পশ্চিম দেশে যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে তাহার উপশমকরণের বিবেচনার্থ গত বুধবার অপরাহ্নে টৌনহালে এক সভা হয়। বিশেষতঃ অপরাহ্ন পাঁচ ঘণ্টা সময়ে ১৫০ জনেরো অধিক কলিকাতাস্থ প্রধান২ সাহেব লোক ও এতদ্দেশীয় বহুতর সম্ভ্রান্ত ধনি মহাশয়েরা সভাগত হইয়াছিলেন তাহাতে শ্রীযুত লার্ড বিশাপ সাহেব সভাপতি হন।···
> শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর···কহিলেন যে আমার একজন মিত্র শ্রীযুত বাবু নীলমণি দেব ঐ কষ্টের সম্বাদ পাইয়া দীনহীন লোকেরদের আহারার্থ ৫০০ টাকা গবর্ণমেণ্টের নিকটে অর্পণ করিয়াছেন এবং শ্রীযুতবাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরও আজ্ঞা করিয়া যান যে ঐ ক্লেশোপশমার্থ কলিকাতার মধ্যে যদি কোন উদ্যোগ হয় তবে আমার খরচেও ৫০০ টাকা দেওয়া যাইবে।···শ্রীযুত সর এড্‌বার্ড রয়ন সাহেব শ্রীযুত রষ্টমজি কওয়াসজির দ্বারা যে চাঁদা হইয়াছিল তাহার এক ফর্দ্দ দেখাইলেন। ঐ ফর্দ্দে এই সকল ভারি টাকার সহী ছিল।···
>
> [স. সে. ক. ২ : ৩১৯]

এই বিবরণগুলি থেকে এ-রকম ধারণা হতে পারে নাগরিক মধ্যবিত্ত বাঙালির ভিতরে এক ধরনের জাতীয় কর্তব্যবোধ তখন সঞ্চারিত হচ্ছিল। হয়তো তা অংশত সত্যও। কিন্তু একদিকে যেমন এই ধরনের কাজে বাঙালিরা যোগ দিচ্ছে, অপরদিকে তেমনি বাঙালি হিন্দুর সামাজিক আদর্শ রক্ষার চেষ্টাও লক্ষ করা যায়।

বাঙালি হিন্দুর সামাজিক আদর্শ তত্ত্বের ক্ষেত্রে হয়তো কিছুটা বিমূর্ত। কিন্তু দৈনন্দিন ব্যবহারে এই 'আদর্শ' হয়ে ওঠে অত্যন্ত স্পর্শগ্রাহ্য। সামাজিক সম্পর্কগুলি কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, বয়স্কদের সঙ্গে ছোটরা কীভাবে কথা বলছে, কী সম্বোধন করছে, কী পোশাক পরছে—এ-সব কিছুই বাস্তবক্ষেত্রে এই সামাজিক আদর্শেরই অংশ হয়ে যায়। সংবাদ-সাময়িকপত্রের এই দৈনন্দিনকে ধরেই সেই তত্ত্বকে স্পর্শ করা যায়। তাই ছেলেদের পোশাক, মেয়েদের পোশাক, আরো নানা ছোটখাটো রীতিনীতি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। ১৮২৫ সনে 'সমাচার চন্দ্রিকা'-য় বাঙালি ছেলেদের ইংরেজি পোশাকের বিরুদ্ধে এই চিঠিটি বেরয় :

সমাচার চন্দ্রিকা। ২২ জানুয়ারি ১৮২৫

বালকের ইংরাজী পোশাক।—শ্রীযুত চন্দ্রিকাকর মহাশয়। আমি প্রতি দিন প্রাতঃস্নানে গিয়া থাকি গঙ্গাতীরের নূতন রাস্তায় প্রত্যহ দেখিতে পাই যে কতকগুলিন বালক রাস্থায় বেড়ায় কেহ২ ছোট২ ঘোটকারোহণ কএক জন শকটারোহণ কএক জন অপূর্ব্ব উষ্ণীষধারি পদাতিক সঙ্গে থাকে। ইহা দেখিয়া আমি মনে করিলাম যে এই বালকগুলিন কোন২ বড় মানুষ ইংরাজের হইবেক ইহাই নিশ্চিত করিয়াছিলাম।

এক দিবস দেখিলাম ঐ বালকেরা বাঙ্গালি টোলার দিগে যাইতেছে। আমি মনে করিলাম ইহারা কোথা যায় এটা আমাকে জানা উচিত। তাহাতে আমি নিকটে গিয়া ঐ পদাতিকেরদিগেকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে ইহারা কোন সাহেবের সন্তান পদাতিক আমার কথাতে হাস্য করত কহিলেক "কাঁহাকা ভেকুয়া ব্রাহ্মণ কুচ নাহি সমজতা" "বাবুকা লেড়কা" ইহা আমার বিশ্বাস হইল না যেহেতুক ঐ বালকেরদিগের কুর্ত্তি এবং টুপি ও মোজা ও দাস্তানা প্রভৃতি ইংরাজী বেশের কোন বৈলক্ষণ্য নাই…বালকেরদিগের নিকটে গিয়া আমি কহিলাম বাবু তোমার নাম কি একটী বালক কহিল আমার নাম শ্রীআধাঅমন বাবু। তোমার বাপের নাম কি শ্রী—ইহাতে নিশ্চয় জানিলাম যে বাঙ্গালি বালক বটে। ইংরাজী পোশাক পরিধান করিবার কারণ কি কিছু বুঝিতে পারি না যদি বল উত্তম পোশাক এই নিমিত্তে বালককে দিয়াছেন। আমি মনে করি হিন্দুস্থানি পোশাকাপেক্ষা ইংরাজী পোশাক বাঙ্গালির নিমিত্ত উত্তম কোন মতে নহে।…যখন মস্থ যোয়ান হইয়া ঐ পোশাক পরিয়া বাটীর মধ্যে যাইবেক তখন তাহাকে দেখিয়া যদি পরিবারেরা ভয়যুক্ত না হউক কেননা ঘরের নকল সাহেব জানেন যদি ভিন্ন লোক দেখে তবে অন্য লোকের সাক্ষাৎ কহিবেক যে অমুকেরদিগের বাটীর ভিতর এক জন সাহেবকে যাইতে দেখিলাম ইত্যাদি কলঙ্ক হইতে পারে।…

[স. সে. ক. ১। ১১৫]

বাঙালি বালকের বিদেশী পোশাকে এই আপত্তি পরে আবার হয়েছে 'সংবাদ প্রভকর'-এ, ১৮৩১-এ। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের পোশাক নিয়ে প্রভাকর মন্তব্য করেছে

সংবাদ প্রভাকর। ১৬ জুলাই ১৮৩১

…অপর শ্রীযুত মেম্বর মহাশয়দিগের প্রতি আমারদিগের নিবেদন এইমত আজ্ঞা

তাবৎ ক্লাস মেষ্টর এবং পণ্ডিত মহাশয়দিগের প্রতি দেন যে হিন্দুকালেজের ছাত্রেরা ফিরিঙ্গির মত পরিচ্ছদ না করিতে পায় যথা ফিরিঙ্গি জুতাপায় সবচুল মাথায় খালি আঙ্গরাখা গায় মালা নাই গলায় নেচরের গুণে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয় এবং দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে ইত্যাদি পরিবর্ত্তে মাথা কামায় ফিরিঙ্গি জুতা পায় না দিতে পায় উড়ানি কিম্বা একলাই দেয় গায় মালা দেয় গলায় অস্পৃশ্য দ্রব্য না খায় তিলকসেবা করে ত্রিকচ্ছ করো্যে ধুতী পরে ঈশ্বরের গুণানুকীর্ত্তনে সর্ব্বদা রত হয় কাছা খুলে প্রস্রাব ত্যাগ করো্যে জল লয় ইহা হইলে আপাততো হিন্দুর ছেলেদিগের হিন্দুর মত দেখায় নতুবা মহিষটানা ফিরিঙ্গির ছেলেদের ন্যায় পথে২ বেড়ায় দেখে বিশিষ্ট শিষ্ট লোকের অঙ্গ জ্বলে যায়…

[স. সে. ক. ২ । ২৩৮]

ঠিক এর বিপরীত মত দেখা যায় ১৮৩৫ সনে 'সমাচার দর্পণ'-এ প্রকাশিত একটি চিঠিতে। পত্রলেখক বাঙালি মেয়েদের পোশাক সম্পর্কে আপত্তি জানিয়ে পরিবর্তনের প্রস্তাব করেন। পত্রলেখকের নাগরিক সচেতনতা লক্ষ করা যায় যখন তিনি চিঠিটির শেষে লেখেন শুধু কলকাতা শহরের মেয়েরা যদি নতুন পোশাক পরেন তা হলেই সারা দেশে তা প্রচলিত হবে।

সমাচার দর্পণ। ১ অগস্ট ১৮৩৫

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।…এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকের পরিধেয় অতি-সূক্ষ্ম এক বস্ত্রই সাধারণ ব্যবহার্য্য ইহা অনেক দোষাভাষের ও ভিন্নদেশীয় লোকেরও ঘৃণার্হ এবং নব্য ব্যবহারই অনুভব হয়।…

যেহেতুক বর্ত্তমান ব্যবহারে অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম সর্ব্বাঙ্গাভাদর্শক বস্ত্রে স্ত্রীলোকের তাদৃশ সম্ভ্রম সম্ভবে না যাদৃশ উত্তরীয় তদুপরি সর্ব্বগাত্রাচ্ছাদন বসনে হয়। কিন্তু এতদ্দেশীয় মহাশয়রা এতদবস্থা বিলক্ষণরূপ নিরীক্ষণ করিয়াও দৃষ্টিপাত করেন না। কেবল শক্ত্যনুসারে নানাভরণে স্ত্রীলোকদিগকে সুশোভিতা করিবার প্রযত্ন রাখেন। অথচ যে স্থলে স্বর্ণ মাণিক্য মুক্তাদি বহুমূল্যাভরণ দিতেছেন সেস্থলে একখানি সূক্ষ্ম সাটী হদ্দ পাঁচ ছয় টাকা মূল্যের কি সুশোভিতা হয়।…অতএব বিজ্ঞ মহাশয়রা এই ঘৃণিত ব্যবহার পরিবর্ত্তনে মনোযোগ করুন।…এতদ্দেশীয় বাবু ও জমীদার ও সেরেস্তাদার ও উকীল ইত্যাদি মহাশয়েরা জামা নিমা কাবা কোরতা অর্থাৎ হিন্দুস্থানীয় পরিচ্ছদ সম্ভ্রমার্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহারা স্ব২ কুলাঙ্গনাদিগকে সর্বাঙ্গাচ্ছাদনার্থে লাঙ্গা উড়ানী ইত্যাদি বস্ত্র ব্যবহার করাইলে কদাচ দূষ্য হইতে পারে না।…

যদি বলেন এতদ্দেশমাত্রেই পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন ব্যবহার একদা কিপ্রকার সম্ভাবনা। উত্তর তাহার এক সদুপায় সুলভ অনুভব আছে। অর্থাৎ কলিকাতাস্থ স্ত্রীগণ যাদৃশ পরিচ্ছদ ভূষণ ব্যবহার করেন তদ্রূপই ইতস্ততঃ সর্ব্বত্র প্রচলিত হয়।... অতএব এ বিষয়ে কেবল কলিকাতাস্থ বিজ্ঞ ধনি মানি রাজা বাবু মহাশয়দিগের কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগের আবশ্যক।...কস্যচিৎ বিদেশিনঃ।

[স. সে. ক. ২ । ২৭০-৭১]

'সংবাদ প্রভাকর'-এর মন্তব্যটি সম্পাদকীয়। ফলে ছাত্রদের পোশাক-আশাক ও চলন-বলনে তাঁর আপত্তির প্রায় একটি তালিকাই তৈরি করে ফেলেন তিনি।

কিন্তু মেয়েদের ও বালকদের পোশাক নিয়ে যথাক্রমে 'সমাচার দর্পণ'-এ ও 'সমাচার চন্দ্রিকা'-য় লেখা দুটি চিঠির আকারে বেরিয়েছে। সেই কারণে দুটি চিঠিতেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা একটু সবিস্তারে বলা, প্রায় কাহিনীর মতো।

কিন্তু দর্পণ বা চন্দ্রিকা কোনো কাগজের সম্পাদকই বিষয় দুটিকে স্বতন্ত্র মন্তব্যের বা প্রবন্ধের মর্যাদা দেন নি। অথচ এত বিস্তৃত দুটি চিঠি ছাপিয়ে দুই কাগজেই বিষয়টিকে এক ধরনের গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

দর্পণ প্রত্যক্ষভাবে বাঙালি সমাজের মতামত প্রকাশের মাধ্যম ছিল না, যদিও বাঙালি পাঠক-গ্রাহক নিশ্চয়ই পরোক্ষভাবে তার নীতিকে প্রভাবিত করতেও পারত। দর্পণ প্রকাশের উদ্দেশ্যই ছিল বাঙালি সমাজকে পাশ্চাত্য জীবনমুখী করে তোলা। সরাসরি খ্রীস্টান ধর্মের প্রচার না করেও ভারতীয় জীবনাদর্শের বিপরীতে পাশ্চাত্যের আধুনিক মূল্যবোধের প্রচারে দর্পণ সফল হয়েছিল।

বাঙালি নাগরিক সমাজের ভিতরে আত্মরক্ষার প্রবণতাই ছিল প্রধানত সক্রিয়। ইংরেজ শাসনের দ্রুত বিস্তার কলকাতা শহরকে তাদের চোখের সামনেই বদলে দিচ্ছিল। আবার আধুনিকতার টানও বাঙালি সমাজের ভিতরে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছিল। অথচ নাগরিক জীবনের ও ইতিহাসের সেই বিশেষ পর্বের কার্যকারণে বাঙালি জীবনের স্বাতন্ত্র্যের ওপরও প্রবল আঘাত এসে পড়তে থাকে। ঘরের ছেলে ঘরে এলে লোকে ভাবে অচেনা বিদেশী—এই বাস্তবতাটি বড় কঠিন সত্য। তেমনি করুণ কলকাতার অপরিচিত নাগরিক মুখ। এর ভিতর আত্মআবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষা ও আত্মরক্ষার অস্ফুট অস্পষ্ট প্রয়াস একই সঙ্গে কাজ করে যায়। সন-তারিখ দিয়ে চিহ্নিত করা না গেলেও নাগরিক জীবনের এই বাঙালি প্রতিক্রিয়ার ভিতরেও যেন বদল ঘটে যায় ১৮২৫-৩০ সাল থেকে ৫০ সালের কাছাকাছি। ততদিনে আত্ম-আবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষায় যেন ব্যর্থতাবোধের ছোঁয়া লেগেছে, আত্মরক্ষাও আর

সম্ভব কি না এতেও যেন সংশয়। তাই একই বিষয় নিয়ে 'সমাচার চন্দ্রিকা'-র ১৮২৫-৩০-এর রচনা আর 'সংবাদ প্রভাকর'-এর পরবর্তী রচনায় প্রায় একই মত প্রকাশ পেলেও—প্রভাকরের প্রতিক্রিয়া অনেক বেশি ক্ষিপ্ত, কিন্তু শ্লেষ ভরা, চন্দ্রিকার মতো আন্তরিক নয়। নাগরিক জীবনের প্রতি বাঙালি মধ্যবিত্তের এই প্রতিক্রিয়াতেই কি ১৮৪৭ সালের পর যাবতীয় পৌর ব্যবস্থা সম্পর্কেই প্রায় সব কাগজের এমন তীব্র আক্রমণ?

১৮৩১-এ 'সমাচার চন্দ্রিকা'-র একটি লেখায় ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে কুলাচার-দেশাচারের বিরোধ নেই এটাই প্রমাণের চেষ্টা হয়। আবার, তার প্রায় বিশ বছর পরে 'সংবাদ প্রভাকর'-এ ক্লাসে ছেলেদের দাঁড়ানোর ইংরেজি নিয়ম নিয়ে তীব্র শ্লেষে সম্পাদকীয় মন্তব্য লেখা হয়। এই দুটি লেখাতে প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন ধরা পড়ে।

সমাচার চন্দ্রিকা। ২২ অক্টোবর ১৮৩১

…আমরা অবগত হইলাম কৈবল্য প্রাপ্ত বাবু গোপীমোহন ঠাকুরের পুত্রেরা পৈতৃক বার্ষিক দৈবকর্ম্ম ও পিতৃকর্ম্ম পালা মত করিয়া থাকেন। এ বৎসর শ্রীশ্রী৺ শারদীয়া পূজা শুনিতে পাই শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পালা তিনিও উক্ত পূজা পূর্ব্বরীত্যনুসারে সুসম্পন্না করিবেন তাহাতে সন্দেহ কি। এক্ষণে ক্ষুদ্র২ নাস্তিকদিগকে আমরা এই কহি যে তাহারা ইস্ মিস্ ঠিস্ শিক্ষিয়া কহিয়া থাকে যে ইঙ্গরেজী ভাল জানিলে সে ব্যক্তি পুত্তলা অর্থাৎ দেব দেবীর প্রতিমা পূজা করেন না কিন্তু কএক জন ছোঁড়া উক্ত বাবু হইতে ইঙ্গরেজী বিদ্যা অধিক শিক্ষিয়াছে ইহা কেহ সপ্রমাণ করুক।

অপর অনেকেই জ্ঞাত থাকিবেন শ্রীযুত বাবু নীলমণি দত্তের পুত্র শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত যেপ্রকার ইঙ্গরেজী বিদ্যায় পারগ আমরা অনুমান করি তাঁহার তুল্য অত্যল্প বাঙ্গালি ইঙ্গরেজী বিদ্যায় পারগ পাওয়া যায়। তিনি কি শ্রীশ্রী-৺দুর্গোৎসবাদি করেন না। নাস্তিক নরাধমেরা তাঁহার বাটীতে গিয়া দেখিয়া আসুক শ্রীশ্রী৺অম্বিকার্চনের কি পারিপাট্য ও ভক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ঐ মহামহোৎসব সম্পন্ন হইতেছে।

অপিচ এক্ষণে যে কএক জন বাঙ্গালি সম্বাদপত্র সম্পাদক হইয়াছেন ইহার মধ্যে শ্রীযুত ভোলানাথ সেনকে ইঙ্গরেজী বিদ্যায় বিলক্ষণ পারগ বলিতে হইবেক। …অতএব সে সকল পত্রলেখক ও কচি২ নাস্তিকদিগকে কহিতেছি তাহারা ঐ সেনজর বাটীতে গিয়া মহামায়ার প্রতিমা দর্শন করুক।…

অতএব ইঙ্গরেজী বিদ্যা ভালরূপে শিক্ষা করিলেই দৈবকর্ম্ম পিতৃকর্ম্ম ত্যাগ করিতে হয় এমত নহে। যদি বল শ্রীযুত রামমোহন রায়ের সহিত যাঁহারদিগের বিশেষ আত্মীয়তা আছে তাঁহারা তদুপদেশে উক্ত কর্ম্মে ক্ষান্ত হইয়াছেন। ইহাও সত্য নহে কেননা শ্রীযুত কালীনাথ মুন্সী তাঁহার পরমাত্মীয় এবং তাঁহার স্থাপিত ব্রহ্মসভায় ইঁহার সর্ব্বদা গমনাগমন আছে তথায় যে-প্রকার জ্ঞানোপদেশ হয় তাহা কি তিনি শ্রবণ করেন না ফলতঃ তাহাতে বিলক্ষণ মনোযোগ আছে। অথচ তাঁহার বাটীতে শ্রীশ্রী৺দুর্গোৎসবাদি তাবৎ কর্ম্ম হইয়া থাকে…

[স. সে. ক. ২ । ২৪০-৪১]

সংবাদ প্রভাকর। ১৭ জুলাই ১৮৫১

হুগলিস্থ বন্ধু কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত বিষয় প্রাপ্ত হইয়া অতি সমাদর পূর্ব্বক প্রকটন করিলাম।

"মেং জেম্‌স কার সাহেব হুগলি কালেজের প্রীন্সিপেল অর্থাৎ অধ্যক্ষের পদে অভিষিক্ত হইয়া কত খেল খেলিতেছেন এবং স্বীয় অপূর্ব্ব বুদ্ধির কৌশলে কত২ নিয়ম নির্দ্ধারণ করিতেছেন তাহা ব্যক্ত করিতে লেখনী সঙ্কুচিত হয়েন, সংপ্রতি আবার এক অপূর্ব্ব নিয়ম করিয়াছেন যে "যখন কোন দর্শক কালেজে সমাগমন পূর্ব্বক কোন শ্রেণী দর্শন বা পরীক্ষা করিবেন তখন তচ্ছ্রেণীস্থ যাবতীয় বালক তাঁহার সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হইবেক" ভাল মহাশয়, জিজ্ঞাসা করি শ্রেণীস্থ শিক্ষক দণ্ডায়মান হইয়া অভ্যর্থনা করিলে কি দর্শকের সম্মান করা হয় না? বালকবৃন্দের যাহারদের মধ্যে অধিকাংশের হৃদে মানাপমান জ্ঞান সম্পূর্ণরূপ উদয় হয় নাই তাহারদের অনর্থক কষ্ট পাইয়া "উট বয়েট" করিবার আবশ্যক কি?…সম্পাদক মহাশয়, কার সাহেব অভিনব২ নিয়ম ধার্য্য করত কেবল বিবেচকগণের সমীপে হাস্যাস্পদ হইতেছেন…তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে প্রার্থনা করিলে অমনি স্বীয় স্বাভাবিক বদন ভঙ্গিমা মিষ্ট ভাষার সহিত উত্তর প্রদান করেন "তোমারদের বক্তব্য বিষয় আমাকে officially জ্ঞাত করাও" হায়! প্রচার করিতে হাস্য সম্বরণ করা যায় না যে একদা তাঁহার অধীনস্থ কোন ছাত্র মলমূত্র ত্যাগ করণার্থে বহির্গমন নিমিত্ত তাঁহার নিকট বাচনিক প্রার্থনা করিয়াছিল, তাহাতে তিনি পূর্ব্বোক্ত উত্তর করিয়াছিলেন…।

[সা. বা. স. ১ । ৩৩২-৩৩]

আর-একটি তুলনা করা যায় ১৮২৯ সনে 'সমাচার চন্দ্রিকা'-য় প্রকাশিত একটি একটি চিঠির সঙ্গে ১৮৫৬ সনে 'সম্বাদ ভাস্কর'-এ প্রকাশিত একটি চিঠির। সেখানে

একটি চিঠির আপাত-রক্ষণশীলতা ও আর-একটি চিঠির আপাত-আধুনিকতা সত্ত্বেও মূল্যবোধের কোনো পার্থক্য প্রমাণিত হয় না।

দুটি চিঠিরই বিষয় এক। প্রথমটি—সাহেবদের অনুকরণে তখন বাঙালিদের মধ্যে সংক্ষেপে নাম লেখার যে-রীতি প্রচলিত হয় তার বিরুদ্ধে। দ্বিতীয়টি—বাঙালি মেয়েদের নাম লেখার তখনকার প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় চিঠিটিতে ইংরেজী রীতিতে মেয়েদের নামে কুলোপাধি ব্যবহারের সমর্থন আছে। আপাতদৃষ্টিতে প্রথম চিঠিটিকে একটু রক্ষণশীল ও দ্বিতীয় চিঠিটিকে আধুনিক মনে হতে পারে। কিন্তু প্রথম চিঠিটিতে বাঙালি হিন্দুনামের পরম্পরাগত ব্যবহার যে-সামাজিকতা থেকে চলে আসছে সে-সম্পর্কে সচেতনতা আছে। সেই সচেতনতা আসে ইংরেজ-অভিঘাতে দ্রুত পরিবর্তমান সমাজে আত্মরক্ষার প্রবণতা থেকে। আবার দ্বিতীয় চিঠিটির আপাত-আধুনিকতায় বাঙালি সমাজের আত্ম আবিষ্কারের কুণ্ঠিত আবেগ ধরা পড়লেও নতুন কোনো মূল্যবোধ সম্পর্কে নতুন সচেতনতা প্রকাশ পায় না।

সমাচার চন্দ্রিকা। ২১ নবেম্বর ১৮২৯

নামত্যাগ। শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু—

ইংরেজী শাস্ত্রবেত্তা কলিকাতার কোন২ হিন্দুরা নানাপ্রকার পরিচ্ছদ আচার ব্যবহার ও রীতির পরিবর্ত্ত করিয়াছেন ও করিতেছেন পূর্ব্ব রীতি ত্যাগ যথার্থ কর্ত্তব্য ও শুভদায়ক কি না তাহার ফল বর্ত্তমান যাহা দর্শাইতেছেন তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন ভাবি যাহা তাহাও আশু ভাবিকালে ব্যক্ত হইবেক। স্বজাতীয় অক্ষর ও ভাষা ত্যাগ করিয়া ইংরেজী চলন হইল এই এক আশ্চর্য্যের বিষয় কেননা অনেক ইংরেজ লোক পারসী বাঙ্গলা আরবী জানেন কিন্তু স্বজাতীয়কে চিঠি লিখিতে হইলে স্বজাতীয় ভাষাতেই লেখেন এই রীতি অন্য২ জাতিরও বটে সংপ্রতি এক অভিনব মত স্থাপন হইবার উদ্যোগ দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছি তাহার স্থূল লিখি যদি ইহাতে কি অভিপ্রায় ও বর্ত্তমান সুবিধা কি তোমার অসংখ্যক পাঠকের মধ্যে কেহ লিখিয়া ব্যক্ত করিলে উপকৃত হইব ইহারা আপন নামের কেবল প্রথমাক্ষর লইয়া পদ্ধতি লেখেন যথা রামগোপাল রায় ইহা R. Roy ব্যবহার করেন এক কি সঙ্কেত বুঝিতে পারি না ইংরেজী ভাষায় কৃত নাম ও গোত্র ও উপাধি দুই প্রকার হইয়া থাকে যথা J. J. Bird অক্ষরে John, James, Joseph ইত্যাদি কতিপয় আখ্যা আছে ও এই প্রকার এক নামমালাও আছে আর Bird গোষ্ঠীর উপাধি ইহার স্ত্রীর নামও ঐ আখ্যাতে প্রতিপাদ্য হয়

যথা Mrs. Bird কিন্তু R. লিখিলেই রামগোপাল হয় কিসে জানিব কারণ এই অক্ষরে রামকানাই রামনাথ ইত্যাদি নানাবিধ নাম আছে আর যদি ঐ R. Royর স্ত্রীর নাম কৃষ্ণপ্রিয়া হয় তবে এই অভিনব মতে তাঁহার নাম কি প্রকারে লিখা যাইবেক। আরো এক রীতি আছে যাহার নাম কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তেঁহ K. Banerjee, কৃ বানরজী লিখেন বানরজীর বা অর্থ কি। কস্যচিৎ স্বজাতীয়াক্ষরত্যাগে বিরক্তস্য।

[স. সে. ক. ১। ১১৯-২০]

সম্বাদ ভাস্কর। ২ ডিসেম্বর ১৮৫৬

...এতদ্দেশের সমুদায় স্ত্রীলোকে স্বীয় স্বীয় নাম স্বাক্ষর কালে শ্রীঅমুকী দেবী বা দাসী লিখিয়া থাকেন তাহাতে উভয় নারী সমাখ্যা বিশিষ্ট হইলে কে কোন্ পরিবারস্থা কিছুই বোঝা যাইতে পারে না, তবে কদাচিৎ দেবী বা দাসীতে ব্রাহ্মণ কি ব্রাহ্মণেতর বুঝা যায় বটে তাহাতেই বা কি ফলোদয় হইল যদি দুই জন ব্রাহ্মণী বা দুইজন শূদ্রী হয়েন তবে কোন্ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী তাহা কোন্ শূদ্রের শূদ্রী কিছুই বুঝা যাইতে পারিল না এতাবতা স্বামির উপাধি স্ত্রীর নামের পরিণামে লিখিত স্থির করিলাম যদি ইহা মহাশয়ের মনোরম্য হয় তবে অন্যান্য সকলকে এই উপদেশ দান আজ্ঞা হইবেন ইহা শ্রীচরণ পঙ্কজে নিবেদনমিতি।

শ্রীশ্যামাসুন্দরী বসুমল্লিক

সম্পাদকীয় উক্তি। স্ত্রীলোকদিগের নামের পরে স্ব২ স্বামিনাম সংযুক্ত থাকিলেও বরং ভাল হয়, সভ্য জাতির মধ্যে ইহা প্রচলিত আছে, যথা লেডী বেন্টিং, লেডি কেনিং ইত্যাদি।

[সা. বা. স. ৩। ৩৪১-৪২]

দ্বিতীয় চিঠিটির একটি উপলক্ষ ছিল। 'সম্বাদ ভাস্কর'-এর ১১ নভেম্বর ১৮৫৬ তারিখের সংখ্যায় আন্দুলের জমিদার জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিকের স্ত্রীর একটি দিনের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল—বাঙালি হিন্দু নারীদের জীবনযাপনের আদর্শ বোঝাতে। তাতে তাঁর সারাদিনব্যাপী দানধ্যানের, স্বামীসেবা ইত্যাদির, বিস্তারিত উল্লেখ ছিল। তার উত্তরে মহিলা এই চিঠিটিতে জানান, সমস্ত কিছুই তাঁর স্বামীর আদেশে ও ইচ্ছায় তিনি করেন। শেষে, 'পুনশ্চ' দিয়ে উদ্ধৃত অংশটি লেখা হয়েছে।

নগরজীবনের নানা বিষয় নাগরিক বাঙালি হিন্দুসমাজের ভিতরে আত্ম-আবিষ্কার ও আত্মরক্ষার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। সংবাদ-সাময়িকপত্রে প্রকাশিত নানা রচনা ও মন্তব্যে যেমন এই প্রতিক্রিয়ার সাক্ষ্য পাওয়া যায়, তেমনি বিভিন্ন

পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত চিঠিপত্রও বাঙালি সমাজের ব্যাপকতর অবস্থা বুঝতে সাহায্য করে। আমরা এ-আলোচনায় জনমতের এই ভাষার বিশেষত্ব দেখতে চাই।

আপাতবিচারে 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় যেন এই প্রতিক্রিয়া সবচেয়ে আগে ও সবচেয়ে সংগতিপূর্ণভাবে ঘটেছে। এই প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে 'সমাচার চন্দ্রিকা'-র রক্ষণশীলতার কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। নতুন নগরজীবনের সংগঠিত পৌর-ব্যবস্থার তখনো অপরিচিতপূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে বাঙালি সমাজের একটি অংশের আত্ম-আবিষ্কারের বিশেষ ধরনটি এতে বোঝা যায়। যেমন, এর বিপরীতে, ইয়ং-বেঙ্গলদের যা-কিছু হিন্দু ও যা-কিছু ভারতীয় তা-ই-ই সম্পূর্ণ পরিহার করতে হবে —এ-ও ছিল সেই নগর জীবনের আর-এক প্রতিক্রিয়ায় আত্ম-আবিষ্কারের আর-এক ধরন।

পৌরসংগঠন গড়ে ওঠার আগেই নগরজীবনের অভিঘাতে বাঙালির আত্ম-আবিষ্কার ও আত্মরক্ষা এক হয়ে যাচ্ছিল। সেই ধারাবাহিকতাতেই নগরজীবন সম্পর্কিত এই প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার পরবর্তী স্তরে ১৮৪৭ থেকে পৌরব্যবস্থা সংগঠনের সরকারি চেষ্টা হলে কলকাতার তাবৎ দেশীয় সমাজ প্রায় বিরোধী পক্ষের ভূমিকায় চলে যায়। পৌরব্যবস্থা সংগঠনের এই বিরোধিতা নতুন নগরজীবনে বাঙালির প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াকে নির্দিষ্ট আকার দেয় ও পৌরজীবনে বাঙালির ভূমিকা চিহ্নিত হয়ে যায়।

খ. পৌরসংঠন ও বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রতিক্রিয়া

১৮৪০ সাল পর্যন্ত কলকাতায় কোনো পৌরসংগঠন ছিল না। সরকারি নির্দেশে নগরের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম নির্বাহ হত। কিছু বিষয়ে ছিল ভারতীয়-ইয়োরোপীয় যৌথ উদ্যোগে। তাতেও সরকারি সমর্থন থাকত।

তাই এই সময় বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রে নগরজীবনের বিভিন্ন নতুন অভিজ্ঞতায় বাঙালি সমাজের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ঘটত। এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া খুব নির্দিষ্ট ছিল না। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপলক্ষও খুব স্পষ্ট ছিল না। অনেক সময়ই চিঠিপত্রের আকারে এই মতামত প্রকাশিত হত।

১৮৪০ সালের পর থেকে পৌরসংগঠন গড়ে তোলার সরকারি চেষ্টা চলতে থাকে। পৌরসংগঠনের দায়দায়িত্ব কাদের ওপর থাকবে তা স্থির করা, বিভিন্ন বিধি-উপবিধি প্রণয়ন. নানা ধরনের ট্যাক্স বসানো, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা—এই সবের ভিতর দিয়েই পৌরসংগঠনের আকার ও দায়দায়িত্ব স্থির হচ্ছিল।[২৯]

তাই ১৮৪০ সালের পর থেকে পৌর-জীবন নিয়ে বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রতিক্রিয়া নির্দিষ্ট আকার নেয়। এই প্রতিক্রিয়া বাঙালি সমাজের আভ্যন্তরীণ না থেকে বাইরে প্রকাশিত হতে শুরু করে। পৌরসংগঠনের আকার, দায়দায়িত্ব ও কাজকর্ম বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রের মতামতের প্রত্যক্ষ উপলক্ষ হয়ে ওঠে। এই উপলক্ষ নিয়ে নাগরিক বাঙালির সমষ্টিমত সংগঠিত হতে থাকে। পৌরসংগঠন ও বাঙালির সমষ্টিমত সংগঠন—একই সঙ্গে চলতে থাকে।

কলকাতার পৌরসংগঠনের ইতিহাসে ১৭৯৩ সালের চার্টার খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই চার্টারে 'জাস্টিস অব দি পিস' পদটির কার্যকারিতা বাড়ানো হয়। 'জাস্টিস অব দি পিস'এর ওপর দায়িত্ব দেয়া হয়—তাঁরা শহরের জমি ও বাড়ি থেকে ট্যাক্স আদায় করবেন, শহর পরিষ্কার ও শহরের শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখবেন। ১৭৯৩ সালের চার্টারের এই ব্যবস্থা থেকেই অনেকে কলকাতার পৌরসংগঠনের ইতিহাস শুরু করেন।

'জাস্টিস অব দি পিস'কে পৌরব্যবস্থার দায়িত্ব দেয়ায় মনে হয় কলকাতার জন্য ইংল্যাণ্ডের ছাঁচের একটি পৌরসংগঠন গড়ে উঠতে দেয়াটা বোধহয় সরকারের উদ্দেশ্য ছিল।

অষ্টাদশ শতকের শেষেই বোঝা যায় কলকাতা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে জন-সংখ্যার চাপ এত বেড়েছে ও দেশীয় লোকদের একাংশের হাতে এত টাকা জমেছে যে জীবনযাত্রায় সংকট দেখা দিচ্ছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকেই পাকা বাড়ি তৈরির হিড়িক পড়ে যায়। অনেকে বাড়ি শুরু করতেন, শেষ করতে পারতেন না। ১৮২২ সালের ৩ আগস্ট 'সমাচার দর্পণ'-এ একজন একটি চিঠি লিখে জানাচ্ছেন, 'কোন২ স্থানে চুনকাম হয় না কোন স্থানে বা কতক প্রস্তুত হইয়াছে ও কতক অপ্রস্তুত ও ভগ্ন হইয়া যাইতেছে ও কোন স্থানে কেবল ভিতরে বালির কর্ম্ম করে ও বাহিরে তাহাও হয় না এবং কোন২ স্থানে বাটী প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু বাহিরে ভারার বাঁশ দেওয়ালের গায়ে অমনি লাগান আছে' (স. সে. ক. ১। ১১৪)।

এত বেগে বেড়ে ওঠা শহরের জন্য কোনো গৃহ পরিকল্পনা বা জল নিকাশ ও ময়লা অপসারণের কোনো ব্যবস্থা নেই। এই সংকটে ১৮০৩ সালে লর্ড ওয়েলেসলি কলকাতা পৌরব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর মিনিট লেখেন।

এই মিনিটে বলা হয় নর্দমা ও জলনিকাশের কোনো ব্যবস্থা নেই, বর্ষাকালে শহরের ভিতর জল জমে জঘন্য অবস্থা সৃষ্টি হয়, কবরখানা হয়ে দাঁড়িয়েছে মারাত্মক,

শহরের সর্বত্র বাজার, কশাইখানা, কোনো পরিকল্পনা ছাড়া রাস্তাঘাট বাড়িঘর তৈরি হয়। সেই মিনিটের শেষে শহরের চারজন ম্যাজিস্ট্রেটসহ ৩০ জনের এক কমিটি নিয়োগ করার প্রস্তাব হয়।

১৮০৪ সালে এই কমিটি নিযুক্ত হয়। তাঁরা আবার অনেকগুলি স্পেশাল কমিটি তৈরি করেন।

১৮১৭ সালে কলকাতা উন্নয়নের জন্য লটারি কমিটি তৈরি হয়। তার আগে কোনো সময় ওয়েলেসলি-কমিটির কাজ বন্ধ হয়ে যায়। লটারি কমিটি ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত শহর উন্নয়নের কাজ করে। ১৮১৭ থেকে ১৮৩৭ পর্যন্ত শহরের ময়লা-অপসারণের দায়িত্ব ছিল 'জাস্টিস অব দি পিস'-এর।

১৮৩৭ সালে লটারি কমিটি বন্ধ করে দেয়া হয়। ১৮৩৫ সালে কলকাতায় জ্বররোগের চিকিৎসার জন্য ইয়োরোপীয় ও বাঙালিদের যৌথ উদ্যোগে একটি হাসপাতাল তৈরির চেষ্টা হয়।

সমাচার দর্পণ। ২০ জুন ১৮৩৫

জ্বরভোগের চিকিৎসালয়—এতদ্দেশীয় যে ভূরি২ জ্বরি দীন দরিদ্র ব্যক্তি চিকিৎসাভাবে মারা পড়িতেছে তাহারদের উপকারার্থ কলিকাতাস্থ দেশীয় লোকেরদের মধ্যবর্ত্তী কোন একস্থানে জ্বর রোগের চিকিৎসালয় স্থাপন নিমিত্ত এইক্ষণে যে প্রস্তাব হইতেছে তাহাতে ভরসা হয় যে আমারদের এতদ্দেশীয় পাঠক মহাশয়েরা অবশ্য সাহায্য করিবেন।...

২০ মে তারিখের নেটিব হাসপাতালে এক বৈঠক হইয়া এই বিষয়ের বিবেচনা হইল।...তৎপরে শ্রীযুত স্মিথ সাহেব লেখেন স্বদেশীয় সহস্র২ দুঃখি ব্যক্তিরদের স্বাস্থ্য ও উপকার নিমিত্ত এই মহাব্যাপার সিদ্ধার্থ এই মহানগরবাসি ধনি মহাশয়েরা কদাচ শৈথিল্য করিবেন না। যদি এই বিষয়ে কেহ সন্দেহ করেন তবে আমরা কহিতে পারি যে এই চিকিৎসালয়ে শ্রীযুত নওয়াব উজীর ও শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ ও শ্রীযুত শিবচন্দ্র রায় ও শ্রীযুত নরসিংহ চন্দ্র রায় ও অন্যান্য মহাশয়েরা অতিবদান্যতাপূর্ব্বক যে টাকা প্রদান করিয়াছেন তাহা তিনি নিতান্তই অবগত নহেন। এবং এই মহাব্যাপারেতে যে মহোপকার সম্ভাবনা এবং মনুষ্যের যে উত্তম২ স্বভাবের সম্পর্ক আছে ইহাতে কলিকাতা ও মফঃসল নগর ও গ্রামস্থ কি ইউরোপীয় কি এতদ্দেশীয় লোক সকলই ঐক্য হইয়া সাহায্য করিবেন কাহারো শৈথিল্য হইবে এমত বোধ হয় না।

[স. সে. ক. ২। ২৯০-৯১]

এই প্রস্তাব ১৮৩৫-এর ১ জুন গভর্নর জেনারেল মেটকাফের কাছে পাঠানো হয়। তিনি কোনো জবাব দেন না। তাঁর পরবর্তী গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ড ১৮৩৬ সালে ফিভার হসপিটাল কমিটি নিয়োগের অনুমতি দিয়ে জানালেন, হাসপাতাল তৈরির সঙ্গে সঙ্গে 'Some plan of judicious and adequate local taxation, and independent local management' যেন এই কমিটি বিবেচনা করে। ১৮৩৭ সাল থেকে এই কমিটি কাজ শুরু করে।

১৮৪০ সালে ফিভার হসপিট্যাল কমিটি অনেক সাক্ষ্যপ্রমাণসহ তাঁদের বিরাট রিপোর্টে পৌরসংগঠন ও স্থানীয় কর সম্পর্কে সুপারিশ দাখিল করেন।

কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকেই এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে কলকাতা উন্নয়নের ও কলকাতায় একটি পৌরসংগঠন গড়ে তোলার প্রধান বাধা আর্থিক। সরকার কোনো আর্থিক দায় গ্রহণ করবেন না। ১৮০৫ সাল থেকেই লটারি করে কলকাতার পৌরখরচ যোগানো হয়। এই টাকায় রাস্তাঘাট তৈরি, পানীয় জলের পুষ্করিণী খনন ও নালানর্দমা পরিষ্কারের ব্যবস্থা হত। এই সব কাজের তত্ত্বাবধান করতেন 'জাস্টিস অব দি পিস' ও ম্যাজিস্ট্রেটরা।

১৭৯৩ সালের চার্টার অনুযায়ী কলকাতার উন্নয়নের জন্য আবগারি শুল্ক আদায় করা হত বটে কিন্তু তা জমা পড়ত সাধারণ রাজস্ব খাতে। কলকাতার ভূমিরাজস্বও জমা পড়ত সাধারণ রাজস্বখাতে। ফলে 'জাস্টিস অব দি পিস'-এর কাছে খোলা ছিল একটি উপায়—বাড়িঘরের ওপর কর বসানো ও আদায় করা।

যাকে বলা হত 'ইম্পিরিয়াল রেভিনিউ' তা থেকে কলকাতা উন্নয়নের কোনো পয়সা আসত না। সরকারের উদ্দেশ্য ছিল কলকাতায় বসবাসকারীদের কাছ থেকে ট্যাক্স আদায় করে শহর উন্নয়নের ও পৌরব্যবস্থার খরচ তোলা। বরাবরই সরকারের এই আশঙ্কা ছিল পৌরসংগঠনের সঙ্গে এ দেশীয় লোকদের যুক্ত না করে ট্যাক্স বাড়ানো ঠিক হবে না। জনসাধারণ পৌরব্যবস্থা সংগঠনে সরকারকে সাহায্য করুক এই আদর্শ অবস্থা পৌরস্বার্থে ভাবা হয় নি, টাকার স্বার্থে ভাবা হয়েছে।

ফিভার হসপিট্যাল কমিটির রিপোর্টে ধরা পড়ে—১৮০০ সাল পর্যন্ত শহরের পৌরব্যবস্থার দায়িত্ব ছিল দুইটি পদাধিকারীর ও একটি কমিটির—ম্যাজিস্ট্রেট, 'জাস্টিস অব দি পিস' ও লটারি কমিটি। এঁদের নিজেদের ভিতরে খুব সংযোগ ছিল না। স্থানীয় কর সম্পর্কে কেউই দায়িত্ব নিতে রাজি ছিলেন না। চিফ ম্যাজিস্ট্রেটের হাতেই সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হচ্ছিল। তিনিই ময়লা-অপসারণ

ব্যবস্থা দেখতেন, করনির্ধারণ করতেন ও পুলিশের কর্তা ছিলেন। এই অবস্থা থেকে সরকার বুঝতে পেরেছিলেন যে জনসাধারণের অংশগ্রহণ ছাড়া স্থানীয় কর বাড়ানোর যোগ্য সংগঠন তৈরি করা উচিত ও সম্ভব হবে না।

তাই ফিভার হসপিট্যাল কমিটির রিপোর্ট দাখিল হওয়ার পর পৌরসংগঠন সম্পর্কে ১৮৪০ সালে প্রথম আইন পাশ হয়। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল—পৌর-খরচ নির্দিষ্ট করা, কোন খরচের জন্য কোন ট্যাক্স নির্দিষ্ট করা, শতকরা ৫ টাকা হারের ট্যাক্সের ঢালাও নিয়মবদলানো, নির্দিষ্ট কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সবটাই ট্যাক্স থেকে তোলা ও করদাতারা যেখানে এই দায়িত্ব নিতে চাইবে সেখানে কর-আদায় ও খরচার ভার দেশীয় লোকদের হাতে দেয়া।

এই উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত পৌরসংগঠনে দেশীয় লোকদের অংশ গ্রহণের একটি উপায় বিধিবদ্ধ হয়। যে-চারটি বিভাগে শহরকে ভাগ করা হয়েছিল তার কোনো একটি বিভাগের করদাতাদের দুই-তৃতীয়াংশ যদি নির্দিষ্ট একটি পরিকল্পনা কার্যকর করার উদ্দেশ্যে গভর্নরের কাছে দরখাস্ত করেন ও গভর্নর যদি সেই পরিকল্পনা মঞ্জুর করেন তবে সেই পরিকল্পনাটি রূপায়ণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় "assesment collection and management of the rates"-এর দায়িত্ব সরকার দেশীয় করদাতাদের কোনো অংশ বা প্রতিনিধিদের দেবেন।

এই ব্যবস্থা অনুযায়ী কলকাতার ভারতীয় বাঙালি জনসাধারণের পক্ষ থেকে কোনো দরখাস্তও পড়ে নি। অনেকে মনে করেন, ভারতীয় জনসাধারণ পৌরব্যবস্থা সম্পর্কে আগ্রহী ছিল না বা এ-বিষয়ে তাঁদের কোনো পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছিল না। অর্থাৎ কলকাতার বাঙালিরা এই আইনের যোগ্য হয়ে ওঠে নি।

কলকাতার নাগরিকরা তখন নিজেদের টাকায় গঙ্গার ঘাট থেকে শুরু করে নানা রকম জনকল্যাণমূলক কাজ করছেন। সে-সব কাজই ছিল বাঙালি ও ভারতীয় সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু আইনের উদ্দেশ্যই ছিল কলকাতার নগর-ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় কাজের আর্থিক ও সাংগঠনিক দায় ভারতীয়-বাঙালি নগরবাসীদের ঘাড়ে চাপানো। সরকার নিজে এই দায়িত্ব এড়িয়ে বস্তুত এই দায়িত্ব বিষয়েই উপেক্ষার পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছিলেন। পরন্তু নগরের জন্য প্রয়োজনীয় যে-কোনো কাজের জন্যই ট্যাক্স বৃদ্ধির আতঙ্ক তো এই আইনের ভিতরই নিহিত ছিল।

১৮৪০ সাল পর্যন্ত 'সমাচার দর্পণ', 'সমাচার চন্দ্রিকা', 'জ্ঞানান্বেষণ', 'বঙ্গদূত', 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'সম্বাদ ভাস্কর'-এর প্রায় প্রতিটি সংখ্যায় কলকাতার পথঘাটের

দুরবস্থা, জলাভাব, মহামারী ও নালানর্দমার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ১৮৪০ সালের আইনে ব্যবস্থা থাকলেও এ-বিষয়ে কোনো প্রস্তাবই সরকারের কাছে পাঠানো হয় নি। সরকারের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভারতীয় রাজধানীর ভরণপোষণের দায় দেশীয় লোকদের ঘাড়ে চাপানো। দেশীয় জনসাধারণ সরকারের এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন মনে হয়।

১৮৪৭ সালের আইনে ব্যবস্থা হয় সাতজন কমিশনার নিয়োগের। তাঁদের মধ্যে তিনজন হবেন গভর্নরের মনোনীত আর চারজন হবেন করদাতাদের দ্বারা নির্বাচিত। কমিশনাররা মাইনে পাবেন। তাঁরা কর বসাতে পারবেন। এই আইনেই প্রথম ঘোড়া ও গাড়ির ওপর কর বসানোর অধিকার দেয়া হয়। এই কর আদায়ের জন্য কমিশনাররা এ্যাসেসর ও কালেক্টর নিয়োগ করতে পারবেন ও এই এ্যাসেসর ও কালেক্টরের কাছ থেকে জামানত রাখতে পারবেন। পরে, এক সংশোধনে কলকাতার উন্নয়নের জন্য কমিশনারদের ব্যক্তিগত ভূ-সম্পত্তি কেনার অধিকার দেয়া হয়।

১৮৪৮ সালের আইনে রাস্তাঘাটের সংস্কার ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কমিশনারদের ওপর বর্তায়। খালবিলের, নালানর্দমার, দিঘিপুকুরের অছি তাঁদের নিযুক্ত করা হয়। নালানর্দমা খনন ও সংস্কারের জন্য বাড়ির মালিকদের সঙ্গে যোগাযোগ ও রাস্তাঘাট সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার অধিকার কমিশনারদের দেয়া হয়।

১৮৪৮ সালের আইনের ফলে কমিশনাররা খুব উদ্যোগের সঙ্গে কাজ শুরু করেন। কিন্তু টাকার অভাবে কোনো কাজই এগয় না। কলকাতা থেকে সরকার যে-সব ট্যাক্স আদায় করেন তার একটি অংশ কমিশনাররা পৌরব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারের কাছে চান। কিন্তু সরকার কোনো টাকা দিতে রাজি হন না। ১৮৪৭ সালের আইনে ভারতীয় প্রতিনিধি নির্বাচনের যে-ব্যবস্থা ছিল তা ব্যর্থ হয়ে যায়। কোনো প্রভাবশালী ভারতীয়ই কমিশনার হতে রাজি হন নি।

১৮৪৭ ও ১৮৪৮ সালের এই আইন অনুযায়ী ১৮৫২ সাল পর্যন্ত পৌরসংগঠন চলে। 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকা দুইটিতে এই সময় থেকে নিয়মিতভাবে পৌরব্যবস্থা ও পৌরসংগঠনের সমালোচনা ও সম্পাদকীয় প্রকাশিত হতে থাকে। এই লেখাগুলি থেকেই বাঙালি সমাজের বৃহত্তর অংশের মনোভাব ধরা পড়ে। তাঁরা এই ব্যবস্থা ও সংগঠনকে প্রায় কোনো সময়ই ভালোভাবে গ্রহণ করেন নি। দুটি-একটি বিষয়ে সামান্য মতপার্থক্য থাকলেও, সংবাদ-সাময়িকপত্রের সাক্ষ্য অনুযায়ী, কলকাতার বাঙালি সমাজ পৌরসংগঠনকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

পৌরব্যবস্থা সংগঠিত হওয়ার আগে বাঙালি সমাজের ভিতরে নগরজীবনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় যে-আত্ম-আবিষ্কার ও আত্মরক্ষার মনোভাব একই সঙ্গে কাজ করেছে, পৌরব্যবস্থা আইনত সংগঠিত হওয়ার পর তা আরো সংহত হয়েছে। নগরজীবনের ভিতরে থেকেও আত্মরক্ষার এই প্রতিক্রিয়া প্রথম প্রকাশিত হয়েছে 'সমাচার চন্দ্রিকা'-য়। 'সংবাদ প্রভাকর' বিভিন্ন বিষয়ে তথাকথিত প্রগতিবাদী। আর 'সম্বাদ ভাস্করে'র গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য তো ইয়ং বেঙ্গলদের কাগজেরই পণ্ডিত ছিলেন ও সামাজিক ধর্মীয় কোনো বিষয়েই রক্ষণশীল ছিলেন না। কিন্তু এই সব পত্র-পত্রিকাতেই পৌরব্যবস্থা ও সংগঠনের প্রতিবাদ সবচেয়ে বেশি।

সংবাদ প্রভাকর। ৩ এপ্রিল ১৮৪৮

…গত গুরুবার দিবসাদির পত্রে শ্রীযুত বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বাক্ষরিত যে এক বিজ্ঞাপন পত্র প্রকাশিত হইতেছে, তৎপাঠে অনেকেই সন্দিগ্ধ হইবেন, যেহেতু যে সকল ব্যক্তি টেক্স সংগ্রাহক সরকাররূপে নিযুক্ত হইবেন তাঁহারদিগের প্রতিভূ স্বরূপ কালেক্টর মহাশয় পাঁচশত টাকা গচ্ছিত লইবেন, এবং প্রত্যেক সরকারকে ১৫ টাকা মাসিক বেতন দিবেন, কমিশ্যনর মহাশয়েরা সরকারদিগের বেতন বৃদ্ধিকরণের নিয়ম করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঐ নিয়ম প্রচলিত হওনের বিষয়ে আমারদিগের সংশয় জন্মিয়াছে, কারণ যে ব্যক্তি অনায়াসে ৫০০ টাকা গচ্ছিত রাখিতে পারেন তিনি যে টাকা আদায়করণের সামান্য কার্য্য স্বীকার করেন এমত বোধ হয় না, অধুনা সময় অতি মন্দ হইয়াছে, হৌস সকল ফেইল হওয়াতে অনেক ব্যক্তি কর্মচ্যুত হইয়াছে ইহাতে কি হয় বলা যায় না…

[সা. বা. স. ১। ৭২-৭৩]

সংবাদ প্রভাকর। ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৫১

রাজকীয় বিজ্ঞাপনপত্রে এক নূতন আইনের পাণ্ডুলেখ্য প্রকটিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য গাড়ী ঘোড়ার টেক্স রহিত করত বাটীর কর বৃদ্ধি করিবেন, তদ্বিশেষ যথা।

যে বাটীর মাসিক ভাড়া ৩ টাকার উর্দ্ধ এবং ২০ টাকার ন্যূন তাহার শৎকরা ৫।০ হিসাবে, যে বাটীর ভাড়া ২০ টাকার উর্দ্ধ অথচ ৬০ টাকার অনূর্দ্ধ তাহার শৎকরা ৬।০ টাকার হিসাবে, যে বাটীর ভাড়া ৬০ টাকার উর্দ্ধ তাহার শৎকরা ৭।০ টাকার হিসাবে টেক্স ধার্য্য হইবেক এবং যে বাটীর ভাড়া ৩ টাকার ন্যূন তাহার টেক্স মাত্র গৃহীত হইবেক না।

এই নিয়ম কি নিয়মমতে যথার্থ রাজ নিয়ম বলিয়া বাচ্য হইতে পারে? গাড়ী ঘোড়ার দৌরাত্ম্যেই পথ ঘাট সকল সর্ব্বদাই অপরিষ্কৃত ও অপবিত্র হইয়া থাকে, তাহার কর এককালীন উত্তোলিত হইল, বাটী, যাহার দ্বারা এই নগরের বিশেষ শোভা এবং যাহার অধ্যক্ষেরা এই নগরের চিরস্থিত প্রজা সেই বাটীর কর বৃদ্ধি করত সেই প্রজাদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন, ইহা প্রকৃত রাজধর্ম্মই বটে।

[সা. বা. স. ১ । ৭৬]

গাড়িঘোড়ার ওপর ট্যাক্স অবশ্য এই সময় তুলে নেয়া হয় নি। ১৭ জুলাই ১৮৫১ তারিখের প্রভাকরে গাড়ির ওপরে নতুন ট্যাক্সের পাকা তালিকা প্রকাশিত হয়।

সম্বাদ ভাস্কর। ১২ মার্চ ১৮৪৯

কলিকাতা রাজধানীর উত্তরভাগে অর্থাৎ বাঙ্গালী পাড়ার লোকেদের সৌভাগ্য দেখা দিল, নগর শোভাকারি কমিসনরেরা উত্তরভাগের নর্দ্দমা পরিষ্কার করাইতে আরম্ভ করিয়াছেন…

এই ক্ষণে সর্ব্বসাধারণ লোকেরা দৃষ্টি করুন, বাঙ্গালী পাড়ার প্রতি পথের পার্শ্বে পার্শ্বে নর্দ্দমার কত ময়লা উদ্ধৃত হইয়াছে, এক এক পথের উভয় পার্শ্বে স্থানে স্থানে পর্ব্বতাকার এমত ময়লা রহিয়াছে পথিকেরা এরূপ কখন দেখন নাই, গলিপথের কথা হস্তে থাকুক, শিমলার প্রশস্ত পথ যাহা শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষদেব মহাশয়ের বাটীর গেটের সম্মুখ দিয়া পূর্ব্বমুখে গিয়াছে, তাহাতেও দুই খানি গাড়ি সম্মুখাসম্মুখি হইলে আরোহিরা জ্ঞান করিয়াছেন ঘোর বিপদে পড়িলেন…

[সা. বা. স. ৩ । ২৭৭]

সম্বাদ ভাস্কর। ২১ এপ্রিল ১৮৪৯

কলিকাতা নগরে কি অরাজকতা উপস্থিত হইল, গবর্ণমেণ্ট কি নগর-নিবাসিগণকে নগরে থাকিতে দিবেন না, নগরশোভাকারি কমিসনেরদিগের উৎপাতে নগর বাসিরা অস্থির হইয়াছেন, যাহারা নর্দ্দমায় মজুর খাটায় তাহারা বেতন পায়, এবং মজুরেরাও বিনা বেতনে কর্ম্ম করে না, তথাপি যাঁহারদিগের বাটীর নিকটস্থ নর্দ্দমায় মজুর লাগে তাহারদিগের স্থানে ঐ সকল লোকেরা ঘুষ চায়, তাহা না দিলে রাগারাগী করিয়া প্রজাগণের উপর মোকদ্দমা উপস্থিত করে, এই এক ঘোরতর উৎপাত, ইহার উপর কমিস্যনরদিগের প্রেরিত আমিনগণ যাহারা গাড়ি ঘোড়ার সংখ্যা লিখিতে নিযুক্ত হইয়াছে তাহারা

প্রজাসকলকে আরো ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে, লোকেরদের আস্তাবালের কপাট খুলিয়া হড় হড় শব্দে গাড়ি রাস্তায় বাহির করিয়া ফেলে, এবং এক ঘোড়ার গাড়ির কোম্পাস দেখিয়াও বলে এ যুড়িগাড়ি, ইহার বোম কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছে, এই ছল করিয়া আস্তাবালে যাইয়া সহিশাদির বস্ত্রাদি টানাটানি করে, গবর্ণমেণ্টের ভয়ে কেহ বিবাদ করিতে পারে না কিন্তু সহিশাদির এমত ক্রোধ হয় কমিস্যনরদিগের প্রেরিত নিজ লোকদিগের মস্তক দ্বিধা করে, প্রজা পক্ষীয় কমিস্যনরি কার্য্যে যে কয়েক জন শিশু নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহাদিগের বিদ্যাবুদ্ধির বিষয় অপ্রকাশ নাই, টাক্স দপ্তরখানার বহি বাহির করিয়া বাটীর সংখ্যা অর্থাৎ নম্বর দেখিয়া বাড়ী বাড়ী বেড়াইয়া যাহারা টিকিট লইয়াছেন তাহারা কেমন উত্তম লোক তাহা সকলেই বুঝিতে পারে, প্রজাপক্ষীয় কমিস্যনরদিগের কি কোন বিজ্ঞতম ভদ্রসন্তান আছেন···যাঁহারা কলিকাতা নগরীয় মান্য লোকদিগের আসনের নিকটেও যাইতে পারেন না তাঁহারদিগকে এই মহানগরের কমিস্যনারি কার্য্য দিলেন, গবর্ণমেণ্টের এ বিবেচনা বড় সুবিবেচনা হইয়াছে,···ঐ সকল কনিস্যনরোরই [কমিস্যনরেরাই] গাড়ি ঘোড়ার কর সংগ্রাহক হইয়াছেন, তাঁহারা গাড়ি ঘোড়ার সংখ্যানির্ণয়ার্থ আপনারদিগের আত্মীয় কুটুম্বদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন, কমিস্যনরদিগের ঐ সকল আত্মীয় কুটুম্বাদিরা নগরস্থ লোকেরদের প্রতি কথিত প্রকার অত্যাচার করিতেছে, অতএব আমরা প্রার্থনা করি গবর্ণমেণ্ট তাহারদিগের কর্ম্মের প্রতি নিরীক্ষণ করেন।

[সা. বা. স. ৩। ২৮২]

সম্বাদ ভাস্কর ! ৩ মে ১৮৪৯

কলকাতা নগরীয় বাড়ী সকল জরীপকরণ প্রায় শেষ হইল,···এইক্ষণে কলিকাতা নিবাসী মহাশয়েরা সতর্ক হউন, বাটী জরীপকরণের মূলাভিপ্রায় ট্যাক্স বৃদ্ধি করণ, তাহার অনুষ্ঠান হইতেছে, এই সময়ে সকলে ঐক্যবাক্যে সভা করিয়া ডেপুটি গবর্ণরের নিকট আবেদন করুন, বাটীর ট্যাক্স বৃদ্ধি হইলে বাঙ্গালী পল্লীনিবাসিদিগের পক্ষে অত্যন্ত দুঃখকর হইবে, ইংরেজ পাড়ার বাড়ী সকলের ভাড়া প্রায় নির্দ্দিষ্টই আছে, তাহার ভাড়া বৃদ্ধি করা যাইবেক না, গবর্ণমেণ্ট যদি ট্যাক্স বৃদ্ধি করেন তবে বাটীর কর্ত্তাদিগের উপস্বত্ব হইতে তাহা দিতে ইহবেক, ইহাতেও বাঙ্গালীদিগের পক্ষেই অধিক অনিষ্ট সম্ভাবনা, কেননা ইংরেজ পাড়ার প্রায় সকল বাটী বাঙ্গালীদিগের সম্পত্তি, এবং বাঙ্গালী পাড়ায় বাঙ্গালীরা বসতি করেন বাঙ্গালীদিগের বসতি বাটীর ভাড়া ইংরেজ

পাড়ার বাড়ীর ভাড়ার তুল্য হইতে পারে না, সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীদিগের বসতিবাটীর ভূমি অধিক এবং বৈঠকখানা দালান বাসগৃহও অনেক, গভর্ণমেণ্ট বড় বড় বাড়ীর স্থান এবং কুঠরী অধিক বলিয়া ইংরেজ পাড়ার হারে ট্যাক্স ধরিবেন, কিন্তু বাঙ্গালীদিগের বাড়ীর ভাড়া তৎপরিমিত হইবেক না, বাঙ্গালীদিগের বাটীতে কুঠরী সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, নিচের ঘর সকল প্রায় অকর্ম্মণ্য উপরের ঘরেতেও জানালা অধিক নাই এরূপাবস্থায় কি কোন সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালির বাটীতে কোন মান্য ইংরেজ বাস করিতে পারেন ইহাতে যদ্যপি বাঙ্গালী পাড়ার সকল অন্য দেশীয় লোকেরদের বাসোপযুক্ত না হইল তবে বাঙ্গালীদিগের বড় বড় বাড়ীসকল ভাড়ার সম্ভাবনাই রহিল না, অতএব ইংরেজ পাড়ার বাড়ী ভাড়া নিরূপিত করিয়া তাহার বিংশতি অংশের একাংশ টাক্স ধরিলে বাঙ্গালি প্রজাদিগের প্রতি অন্যায় করা হইবে।...

[সা. বা. স. ৩। ২৮৩]

সম্বাদ ভাস্কর। ২৬ জুন ১৮৪৯

বিধি নির্ব্বন্ধ হইয়াছে কলিকাতানগরীয় গাড়িঘোড়া প্রভৃতির টাক্স হইবে, ইহাতে গো শকট বাহকেরা ঐক্যবাক্য হইয়া গত সোমবারাবধি তাহাদিগের গাড়ি চলায়ন বন্ধ করিয়াছে তাহাতে নগরবাসিদিগের বিশেষত বণিকগণের অনেক ক্ষতি হইতেছে...মুটেরাও গাড়য়ানদিগের সহিত যোগ দিয়াছে...

[সা. বা. স. ৩। ২৮৫]

সম্বাদ ভাস্কর। ২৮ জুলাই ১৮৪৯

...কলিকাতা নগরস্থ প্রজাসকলকে নগরশোভাবর্দ্ধনার্থ চারিজন কমিস্যনর নিযুক্ত করিবার আজ্ঞা প্রদান করিয়া গবর্ণমেণ্ট পাট্টা আরিজ দ্বারা এক লাভের সোপান বাহির করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হইয়াছে, কোন ব্যক্তি একজন কমিস্যনরকে একখানি টিকীট দিবার জন্য বা তৎপদাকাঙ্খি কোন ব্যক্তিকে আপনবাটী আনয়ন করিয়া লন নাই।...

[সা. বা. স. ৩। ২৮৬-৮৭]

শেষ উদ্ধৃতিটির প্রসঙ্গ—কলকাতায় জনবসতির চাপ বাড়তে থাকলে, অনেক-সময়, একই পাট্টার অন্তর্গত জমিতে অনেক লোক বাড়ি তৈরি করেছিল। আইনানু-যায়ী প্রত্যেকেরই উচিত পুরনো পাট্টা খারিজ করে নিজের নতুন পাট্টা করে আনা। অনেক সময়ই তা করা হয় নি। কমিশনারদের ওপর সরকার এই দায়িত্ব দেয়। কমিশনারকে টিকিট দেয়ার অর্থ—ভোট দেয়া। বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ভোট চাওয়া বিষয়েও 'সম্বাদ ভাস্কর' মন্তব্য করেছে।

১৮৪৭ ও ৪৮ সালের আইন অনুযায়ী পৌরসংগঠনের এমন ব্যাপক কর্মসূচিও অর্থাভাবে ঠেকে যায়। কমিশনাররা সরকারের কাছে আবগারি শুল্ক, খাল করের অতিরিক্ত আদায় ও কলকাতার ভূমি রাজস্বের অংশ, পৌরব্যবস্থার জন্য বরাদ্দ করতে অনুরোধ করেন। তাঁদের আশা ছিল—এই অতিরিক্ত আয় ও বাড়ি-গাড়ির ট্যাক্স মিলে তাঁরা পৌরব্যবস্থাকে কলকাতা শহরের যোগ্য করে তুলতে পারবেন। খাল করের টাকা পেলে তাঁরা ভূগর্ভস্থ নালা ও পানীয় জল সরবরাহের পরিকল্পনায় হাত দিতে পারেন।

এ সমস্তই ছিল সরকারের আইনভুক্ত কর্তব্য। কিন্তু সরকার এজন্য সাধারণ খাত থেকে কোনো অর্থ বরাদ্দ করতে রাজি ছিলেন না।

১৮৪৭ ও ৪৮-এর আইনবলে গঠিত পৌরসংগঠনের প্রধান অভিজ্ঞতা হল—কমিশনারদের ভিতর উদ্দেশ্যের কোনো ঐক্য গড়ে উঠতে পারে না ও পৌর-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের অভাব ঘটেছে। কোনো প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় নাগরিক কমিশনার হতে রাজি হন নি, ভারতীয় প্রতিনিধি নির্বাচনও হাস্যকর হয়ে ওঠে।

১৮৫২ সালে পৌর আইনের সংশোধন করা হয়। এই সংশোধনে শহরের বিভাগের সংখ্যা কমিয়ে আনা হয় দুটি বিভাগে—উত্তর ও দক্ষিণ। কমিশনারের সংখ্যা কমিয়ে আনা হয় চারে। এদের মধ্যে দু-জনকে গভর্নর মনোনয়ন দেবেন দু-জনকে দুই ডিভিশন থেকে নির্বাচন করা হবে। নির্বাচিত কমিশনারদের কার্য-কাল হবে এক বছর। ভোটাধিকার থাকলেই নির্বাচনে দাঁড়াবার অধিকার থাকবে। নির্বাচনের খরচ প্রার্থীকে দিতে হবে। স্থানীয় কর থেকে কমিশনাররা মাসে ২৫০ টাকা মাইনে পাবেন। তাঁরা সেক্রেটারি, এ্যাসেসর, কালেক্টর, সার্ভেয়ার, ইনস্পেক্টর, অ্যাপ্রাইজার, বেইলিফ ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য পদের জন্য লোক নিয়োগ করবেন। ট্যাক্স আদায়ের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি তাঁরা স্থির করবেন। এই নতুন আইনে গাড়ি ঘোড়ার ট্যাক্স রহিত হল ও বাড়ির ট্যাক্সের শতকরা হার ৫ থেকে বাড়িয়ে ৬ করা হল। নতুন নর্দমাখননের দায় পৌরসংগঠনকে দেয়া হল। কলকাতা শহরে রাত্রিতে যাতায়াতের সুবিধের জন্য প্রত্যেক বাড়ির সামনে আলো দেয়ার আইন পাশ করা হল। সেই সময়ই ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের দিয়ে কলকাতায় গ্যাসের আলো আনবার চেষ্টা শুরু হয়।

১৮৫২ সালের আইনের দ্বারা গঠিত কমিশনারদের বোর্ড সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে—লটারি কমিটি ছাড়া অন্য কোনো সংগঠন কলকাতায় এত ব্যাপক উন্নয়নের

কাজে হাত লাগায় নি। এই আইনের ফলে ইয়োরোপীয় ও ভারতীয়দের ভিতর পৌরসংগঠন সম্পর্কে কিছুটা আগ্রহের সঞ্চার করা হয়।

ফলে, এই বোর্ডকে নানারকম পৌরনিয়ম প্রচলন করতে হয়। রাস্তায় আলো দেয়া, রাস্তায় মূত্রত্যাগ, রাস্তায় শোভাযাত্রা, রাস্তায় গাড়ি রাখা, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, অশ্লীল পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ ও বিক্রয়, জুতামোজা পরা, গাড়ি ভাড়া—ইত্যাদি সংক্রান্ত নানা আইনে পৌরজীবনের সমস্ত দিককেই পৌর-সংগঠনের আওতার ভিতর আনার চেষ্টা চলে।

১৮৪০ সাল থেকে দেশীয় প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের দ্বারা স্বয়ংশাসিত একটি পৌরসংগঠনের চেষ্টা সরকার করে আসছিল। ১৮৫২ সালের আইনে গঠিত 'কমিশনার বোর্ড' সেই উদ্দেশ্য অনেকখানি সফল করতে পেরেছিল—ঐ পরিস্থিতিতে যতটা সফল করা যায়। কিন্তু সরকারের উদ্দেশ্য ছিল কলকাতার রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের যাবতীয় খরচ দেবে বাঙালি ও ভারতীয়রা আর সেই টাকায় উন্নতি হবে ইয়োরোপীয় বসতি অঞ্চলের। এমন-কি ১৮৫২ সালের সাফল্যও সে-তুলনায় কম। তাই ১৮৫৬-র আইনে দেশীয় প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থাই তুলে দেয়া হয় ও প্রতিনিধিসংস্থার বদলে পুরোপুরি মনোনীত সংস্থা গড়ে ওঠে।

১৮৫২ সালের আইন অনুযায়ী গঠিত কমিশনার বোর্ড-এর কাজকর্ম যত বেশি হয়েছে, সংবাদ-সাময়িকপত্রে তার প্রতিক্রিয়াও হয়েছে তত বেশি! বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র এই পৌরসংগঠনের কোনো ব্যবস্থাকেই গ্রহণ করতে পারে নি।

সংবাদ প্রভাকর। ১৮৫২

> …নিয়ম করিলেন যে, "বড় বড় বাটীর অধ্যক্ষগণকে আপনাপন বাটীর বহির্ভাগের দ্বারের উপর সমস্ত রাত্রি এরূপে লাল্ঠন্ জ্বালাইতে হইবে যেন তাহার প্রভা পথিমধ্যে প্রদীপ্ত হয়, তাহা না করিলে উচিত মত দণ্ড প্রদান করিতে হইবেক।"
>
> এই দণ্ডের ভয়ে তাবতেই দায়ে পড়িয়া আলো দিতে বাধ্য হইয়াছেন, কিন্তু ইহা হিন্দু পল্লীস্থ অনেকের পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশকর হইয়াছে, কেননা এমত গৃহ অনেক আছে যাহার মাসিক ভাড়া শত মুদ্রার অধিক্য হইতে পারে, কিন্তু অধুনা তদধিকারিগণের এতদ্রূপ দুরবস্থা হইয়াছে, যে একবিন্দু তৈলের অভাব জন্য এক এক রজনীতে রন্ধনশালা অন্ধকারময় হইয়া থাকে ইহাতে তাঁহার-দিগের পক্ষে আলো দেওয়া কি প্রকার বিপদের ব্যাপার…

[সা. বা. স. ১। ৮২]

সম্বাদ ভাস্কর। ৯ আগস্ট ১৮৫৬

আমরা শুনিলাম চোর বাগান বাসি ধনরাশিদিগের প্রতি আদেশ হইয়াছিল তাঁহারা আপনারদিগের দ্বারে ২ আলোক দিবেন, তাহাতে বড়২ বাড়ী ধারি মহাশয়েরা আপনাপন ব্যয়ে দ্বারে ২ আলোক দিয়াছিলেন কিন্তু আলোক সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্ট পোলিসে যাইয়া জানাইলেন ঐ সকল লোকেরা ভাল সলিতা দিয়া আলোক দেন না ইহাতেই তাঁহারদিগের নামে শমন আসিল পরে তাঁহারা পোলিস সার্জেন এবং চৌকিদারাদি দ্বারা সাক্ষ্য দিলেন প্রাতঃকাল পর্য্যন্তও তাঁহারদিগের দ্বারে২ বিলক্ষণ আলোক থাকে, তথাচ ঐ সকল মান্য লোকদিগের ১০।৫ টাকা জরীমানা হইয়াছে, ইহাতে কি ভদ্র লোকেরা নগরে তিষ্ঠিতে পারেন? কমিস্যনরদিগের উদরপূরণার্থ একে অন্যায় টাক্স লইয়া প্রজা সকলকে ত্যক্ত বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছেন তাহার উপর ছল ধরিয়া কথায়২ এ প্রকার অর্থ দণ্ডে কি প্রজাদিগের মুণ্ডু ঘুরিয়া যায় না?···

[সা. বা. স. ৩। ৩১৮]

সংবাদ প্রভাকর। মার্চ ১৮৫২

নগরের মধ্যে কি উৎপাত হইল এক মূত্র সূত্র লইয়া পুলিসের কর্ত্তারা কি ফাঁসাৎ করিয়া তুলিলেন, যেখানে যেখানে শুনা যাইতেছে অমুক ব্যক্তি নরদামার ধারে প্রস্রাব করিতে বসিয়াছিল তাহাকে চৌকিদার ও সারজন আসিয়া ধৃত করিল, অনেকেই বলেন এই প্রস্রাবে অমুকের অপমান, অমুকের জরিমানা, অমুকের ঘোড়দৌড়, অমুক ব্যক্তির কাণমলা প্রভৃতি প্রহার প্রাপ্ত হইয়াছে··· রাজপুরুষেরা চুপিচুপি আইন করিলেন, অবোধ বালক বালিকা ও পথের মুটেমজুর বিদেশি পথিক, ও তদনুরূপ অন্যান্য লোকেরা কিরূপে তাহা জ্ঞাত হইবেক, তাহারা বহুকালাবধি মূত পাইলে যেমন মূতিয়া থাকে, এইক্ষণে সেইরূপ করিতেছে, অগ্রে মূতের আইন সকলের জ্ঞাতসারে করুন, প্রত্যেক স্থানে ঢোল মারিয়া গোল করিয়া বারণ করুন, এবিষয় সর্ব্ব সাধারণের জ্ঞাতসার হউক, তবে তো নিবারণ হইবেক, যাহারা অধুনা ইহার কিছুই জানেনা তাহাদের উপর দণ্ড করা অতিশয় অবিচার হইতেছে···

[সা. বা. স. ১। ১৮৫]

সংবাদ প্রভাকর। আগস্ট ১৮৫২

হায় কি অপূর্ব্ব রহস্য! কি আশ্চর্য্য ধীশক্তি! কি অদ্ভুত ভ্রান্তি! কলিকাতার পুলিশ কর্ম্মকারকেরা সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিহার করত এক্ষণে

কেবল রাস্তায় প্রস্রাব নিবারণরূপ মহাগৌরবজনক বৃহদ্ব্যাপারে আদা জল খাইয়া প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই প্রস্রাব বারণ কাণ্ডটী ক্রমে গর্ভস্রাবের কর্ম্মের ন্যায়ই হইয়া উঠিতেছে।...কিন্তু সাবধান নাগরীয় লোক, সাবধান, সাবধান, সাবধান, তোমরা এক্ষণাবধি প্রস্রাবদ্বার রোধের চেষ্টা পাও। বড় কর্ত্তার বাটীর চতুর্দ্দিকে বড় রাস্তার কোন ধারে মুততে বসিলে তখনি মুতের ধার বন্ধ করিয়া ধর, ধর বলিয়া ধরাধরি করত পুলিসে লইয়া যাইবেক।...

[স. ব. স. ১। ১৮৭]

সংবাদ প্রভাকর। মার্চ ১৮৫২

কলিকাতা নগরের পুলিশ ও কান্সরবেন্সির নিয়ম ক্রমে অতি ভয়ানক হইয়া উঠিল। এতদিনের পর রাজপুরুষেরা প্রকাশ্যরূপে হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন, গবর্ণমেণ্ট স্পষ্ট অনুমতি করিয়াছেন যে নগরমধ্যে কোন ব্যক্তি বাদ্যভাণ্ড লইয়া প্রতিমাদি নিরঞ্জন করিতে রাজপথ দিয়া যাইতে পারিবেন না, কোন ব্যক্তি পুত্রের শুভ বিবাহ উপলক্ষে রাজপথে আলোক বা বাদ্য বাহির করিলে তাহার জরিবানা হইবেক···

[সা বা. স ১। ১৮৫]

সংবাদ প্রভাকর। অক্টোবর ১৮৫২

কান্সারবেন্সি অর্থাৎ নগরের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্য কলিকাতা পুলিশ হইতে যে কতিপয় অপূর্ব্ব নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে তাহার অত্যাচার বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে ···ভদ্রলোকেরা শকটারোহণে কোন স্থানে গমন করিয়া যদ্যপি রাস্তার ধারে শকট রাখিয়া যান, তবে ভেড়িওয়ালা মেড়ুয়াবাদী চৌকীদারেরা কোচম্যান অথবা সহীসকে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে সেই গাড়ি লইয়া যাইতে বলে, তাহাতে কোন আপত্তি করিলে চৌকিদার মারিতে উদ্যত হয়, গাড়ি ধরিয়া স্টেসিয়ানে লইয়া যায়, এই নিয়ম প্রজাদিগের পক্ষে অতিশয় পীড়াদায়ক হইয়াছে, কারণ তাঁহারা যে গাড়িতে আত্মীয়স্থলে গমন করেন সেই গাড়িতেই প্রত্যাগত হইবার প্রত্যাশা রাখেন, আর ঐ গাড়ি ভাড়াটিয়া গাড়ি হইলে যাতাআতের ভাড়া একেবারে চুক্তি করিয়া থাকেন তাহাতে ব্যয় সংক্ষেপ হয় কিন্তু পুলিশের এই অপূর্ব্ব নিয়ম দ্বারা ঐ বিষয়ে সংপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হইয়াছে, অনেকে কার্য্যস্থলে কর্ম্মনির্ব্বাহ করিয়া আগমনকালীন গাড়ি দেখিতে পাননা, অথবা যদবধি তিনি সেই কার্য্যনির্ব্বাহে নিযুক্ত থাকেন তদবধি গাড়োয়ানেরা তাঁহাকে বিরক্ত করে···

[সা. ব. স. ১। ১৮৯]

সংবাদ প্রভাকর । ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৩

এইক্ষণে প্রতিদিন কলিকাতার রাস্তা সকল ধূলায় অন্ধকার হইতেছে, নগরের শোভাবৃদ্ধি কারক কমিস্যনরগণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছেন রাস্তায় জল দিবার নিমিত্ত আর ভিস্তি রাখিবেন না, তাঁহারা বসতি বাটীর ট্যাক্স বৃদ্ধি করিলেন, ইহাতেও কি জল দিবার ব্যয় নির্ব্বাহ হয় না? কী আশ্চর্য্য! গবর্ণমেণ্ট যে অভিপ্রায়ে নগর পরিষ্কার রাখিবার নূতন আইন প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মর্ম্মসকল কবে রক্ষা হইবেক?

আমরা শ্রবণ করিলাম, বড় রাস্তার উত্তরভাগে জল দিবার জন্যে স্থানে স্থানে কূপ খনন হইতেছে, নূতন রাস্তা ও অন্যান্যস্থানে ঐরূপ করিলে আপাততঃ ধূলা নিবারণের উপায় হইতে পারে, ইহাতেও কি কমিস্যনরগণ টাকা নাই বলিয়া ছল করিয়া বসিবেন?...

[সা. বা. স. ১ । ৪২৭]

সংবাদ প্রভাকর । মে ১৮৫৩

নগরের শোভা বৃদ্ধি করণ মূলক নিয়মদ্বারা প্রজামণ্ডলি কোথায় সুখানুভব করিবেক, আমারদিগের ভাগ্যদোষে তাহার বিপরীত হইয়াছে। ধূলার নিমিত্ত রাজপথে গমনাগমন করা যায় না, নরদমার পঁচা গন্ধে বিবিধপ্রকার পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইতেছে, এদিকে টেক্সের দায়ে প্রতিদিবস দুঃখি লোকদিগের হাঁড়ি, কলসি, ঝাটা, কুলা পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া যাইতেছে, মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা গাড়োয়ান ও অন্যান্য লোকের দণ্ডের টাকা দ্বারা রাজকোষ বৃদ্ধি করিতেছেন ...যে দুই মহাশয় আমারদিগের প্রতিনিধিরূপে কমিস্যনরের পদ ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা সাহেবের সহযোগীগণের সহিত একত্র উপবেশনপূর্ব্বক "দাদার মতে মত" বলিয়া কেবল নিয়মিতরূপে বেতনের টাকা গণনা করিতেছেন।...

[সা. বা. স. ১ । ১৯৫]

সম্বাদ ভাস্কর । ৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিবেক ইতিপূর্ব্বে কুৎসিত ছবী ও শৃঙ্গার রস ঘটিত পুস্তক প্রকাশ ও প্রকাশ্য স্থানে বিক্রয় করণ এবং সরকারী রাস্তায় বা অন্য কোন সাধারণ স্থানে কুৎসিত প্রতিমূর্ত্তি বাহির ও কদর্য্যগান করণ নিবারণ পক্ষে এক নূতন আইনের পাণ্ডুলিপি প্রকাশ হইয়াছিল সম্প্রতি ঐ পাণ্ডুলিপিতে নম্বর পড়িয়া গত ৩০ জানুআরি দিবসীয় কলিকাতা গেজেটে আইনরূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

[সা. বা. স. ৩ । ৪৬০-৬১]

সম্বাদ ভাস্কর। ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬

কলিকাতা নগরে পূর্ব্বাপেক্ষা লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং বাণিজ্য কার্য্যেরও দিন২ উন্নতি হইতেছে তাহাতে গো গাড়ীর ভাগ অধিক হইয়া উঠিয়াছে, বাঙ্গালিরা ইংরাজী রীতি ব্যবহারের অনুগত হইয়াছেন তদ্ধেতুক অনেকে পাল্কী ব্যবহার উঠাইয়া দিয়া গাড়ী ব্যবহার করিতেছেন, প্রতি দিন গাড়ীতে গাড়ীতে নগরীর পথ পরিপূর্ণ হইয়া যায়, নগর মধ্যগত বড় রাস্তা ও গলী পথ সকল অত্যন্ত অপ্রশস্ত, তাহা প্রায় গাড়ীতেই পূরিয়া যায়, পথিকেরা চলিতে পথ পায় না, যাঁহারদিগের গাড়ীতে সবল ঘোটক যোজিত থাকে তাঁহারাও সম্পূর্ণ বেগে ঘোটক চালাইতে ত্রুটি করেন না···ইংরাজ পল্লীর পথ সকল প্রশস্ত, তাহাতে অধিক লোক চলে না, গো শকটেরও গোল নাই, সুতরাং তাঁহারা কেন এ বিষয়ে মনোযোগ করিবেন···

[সা. বা. স. ৩। ৪৬২-৬৩]

১৮৫২ সালের আইনে পৌরসংগঠন পৌরব্যবস্থার জন্য যে-সব বিধি-নিয়ম তৈরি করেছিলেন বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রে তার প্রায় কোনোটিকেই সমর্থন করা হয় নি। আবার. অর্থাভাবে পৌরসংগঠনও তাদের পরিকল্পিত পথে বিশেষ এগতে পারে নি। অর্থাভাবের কোনো সুরাহা করার জন্য সরকার থেকে উদ্যোগ নেয়া হয় নি। ১৮৫৬ সালের আইন কার্যকর হওয়ার আগে কলকাতার বাঙালিদের তরফ থেকে এক আবেদনে বলা হয়—দেশীয় কমিশনার নির্বাচনের নিয়ম বাতিল করে ইয়োরোপীয় ও দেশীয় জনসাধারণের ভিতর থেকে বেশি সংখ্যায় অবৈতনিক সদস্য তিন বছরের জন্য মনোনীত করে পৌরসংগঠন গড়ে তোলা উচিত।

১৮৫৬ সালের আইনে পৌরসংগঠন সম্পূর্ণ বদলে গেল, ট্যাক্সেরও গুরুতর বদল ঘটল। ড্রেন তৈরি ও পরিষ্কারের জন্য কলকাতার যাবতীয় বাড়িঘর জমিজমার ওপর খরচের অনধিক শতকরা আড়াইভাগ ট্যাক্স ধার্য হল। বাড়িঘরের ট্যাক্স বেড়ে হল শতকরা সাড়ে সাত ও রাস্তার আলোর জন্য ট্যাক্স ধার্য হল শতকরা আড়াই ভাগ। গাড়িঘোড়ার ট্যাক্সও বাড়ল।

১৮৮৫ সালের আইনে সরকার পৌরব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে তুলে নিলেন। তিনজন কমিশনারের মধ্যে একজনও ভারতীয় ছিলেন না। নির্লজ্জতায় নিজেদেরও লজ্জা দিয়ে প্রধানত বাঙালি এলাকা থেকে সংগৃহীত টাকায় চৌরঙ্গিতে ফুটপাথ বানানো, সাহেবপাড়ার রাস্তা সারানো, ড্রেন তৈরি ও রাস্তায় আলো দেয়া হতে লাগল। এর বিরুদ্ধে তীব্র ভারতীয় প্রতিক্রিয়ার কোনো উত্তর ছিল

না। কলকাতায় পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা তৈরি হওয়ার আগেই রাস্তায় গ্যাসের লাইট জ্বলল।

কলকাতার পৌরব্যবস্থা সংগঠনের সরকারি চেষ্টা কোনোদিনই বাঙালি সমাজের সমর্থন পায় নি। শহর কলকাতার অধিবাসী ইংরেজ ও বাঙালিদের ভিতর পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা বরাবরই কাজ করেছে। ইংরেজদের উদ্দেশ্য ছিল বাঙালিদের ওপর দিয়ে পৌরব্যবস্থা গড়ে তোলা ও ট্যাক্স আদায় করে শহরের উন্নতি করা। বাঙালিরা এই সন্দেহেই এই ব্যবস্থায় অংশ নিতে চায় নি।

কিন্তু ১৮৫৬ সালের আইনে যেন মনে হয়, তার আগে প্রায় নয় বৎসরের চেষ্টার শেষে ইংরেজ সরকার সাম্রাজ্যের এই কলোনি-শহর যে তাদেরই পত্তন ও তাদের জন্যই আছে—তা প্রমাণ করলেন। তাই একই সঙ্গে সাহেবরাই পৌর-ব্যবস্থার কর্তা হলেন, নানা বিষয়ে ট্যাক্স বাড়ল ও সে-ট্যাক্সের টাকা সাহেবপাড়ায় খরচ হল। শহর-কলকাতার বাঙালি অধিবাসীরা পৌরব্যবস্থার যে-বিরোধিতা করে আসছিল, তার প্রায় রাজনৈতিক সমর্থন ঘটে গেল।

কিন্তু ১৮৫৬ সালের আইনের বলে গঠিত বোর্ডের কার্যক্রমের বিরুদ্ধে বাঙালি সমাজের প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট হয়ে ওঠার মুখেই সিপাহি বিদ্রোহ দেখা দেয় ও কলকাতার পৌরব্যবস্থাসহ সামগ্রিক শাসনব্যবস্থাই সম্পূর্ণ বদলে যায়।

গ. শ্রমিক-আন্দোলন ও বেশ্যাপল্লি

পৌরব্যবস্থা ও পৌরসংগঠন সম্পর্কে বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রের এই প্রতিক্রিয়া থেকে সহজে অনুমান করা যায়—এ-বিষয়ে নাগরিক বাঙালি মধ্যবিত্ত প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ভূমিকাই বেছে নিয়েছিল। তাতে সফলও হয়েছিল। ১৮৫৬ সালের পৌর আইন প্রমাণ করল—দেশীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত স্বায়ত্তশাসিত পৌরপ্রতিষ্ঠানের ঘাড়ে স্থানীয় কর বাড়ানোর দায় চাপিয়ে বাঙালির পয়সায় সাহেবদের শহর চালাবার সরকারি ফন্দি ব্যর্থ হয়েছিল।

অন্যদিকে, সমস্ত রকম পৌরব্যবস্থা ও পৌরসংগঠন সম্পর্কে বাঙালিদের এই বিরোধিতা এমনই, যেন বাঙালিরা কলকাতার নাগরিক অস্তিত্বই অস্বীকার করতে চায়। কিন্তু ততদিনে তো কলকাতা একটি বাঙালি শহর হয়ে উঠেছে। ইয়োরোপীয় ও ভারতীয় অংশে নগর-কলকাতার ঐতিহাসিক বিভাজনকে সরকার শহরের পৌর বিভাগের সীমানা নির্ধারণের সময় বারবারই বিধিবদ্ধ করেছে।[৩০] ইয়োরোপীয় কলকাতাকে পেছন থেকে ঘিরে বাঙালি এলাকার বিস্তার এই বিভাগ নির্দিষ্ট

করার একটি অব্যবহিত কারণ। শহরটি ইংরেজরা স্থাপন করেছিল—তাদের ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক কাজে। তাতে বাঙালি এলাকা গড়ে উঠতে দেয়া হয়েছিল—ইংরেজদের ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক সুবিধের জন্য। কিন্তু বাঙালি জনসংখ্যার চাপ উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকেই এত বেড়ে যায় যে কলকাতা জনসংখ্যার দিক থেকে বাঙালির শহরও হয়ে উঠেছে। ব্রিটিশ-ভারতের রাজধানী ও প্রথম আধুনিক বাঙালি শহর—কলকাতার এই দুই পরিচয়ের মধ্যে বিরোধ ছিল।

ফলে, পৌরব্যবস্থা ও পৌরসংগঠনের বিরোধিতার সঙ্গে-সঙ্গে বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রে আরেক ধরনের প্রতিক্রিয়াও লক্ষ করা যায়।

মুটে, মজুর, পালকিবেহারা, গাড়োয়ান, মাঝিমাল্লা, খালিয়া, ধোপা—বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত শ্রমিকরা তখন শহর কলকাতার পক্ষে অপরিহার্য। সরকারি কোনো ব্যবস্থার প্রতিবাদে বা তাদের নিজস্ব পেশাগত দাবিতে নানা সময়ে এঁরা নানারকম আন্দোলন করেছেন। বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রে এই সব আন্দোলনের প্রতি সমর্থনই জানানো হয়েছে বেশি।

বাঙালি সমাজের প্রতিক্রিয়ার এই সাক্ষ্য খুব বেশি পাওয়া যায় না। কিন্তু যে-কটি পাওয়া যায় তা বেশ স্পষ্ট। পেশাগত দাবিদাওয়ার ফলে মধ্যবিত্তের ওপর আর্থিক চাপ পড়েছে—সেখানেও সংবাদ-সাময়িকপত্রে আপত্তিটা খুব স্পষ্ট নয়।

শ্রমিকদের প্রতিবাদ তখন অনেক সময় আধুনিক অর্থেই আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। শহরের এই শ্রমিকরা স্ট্রাইক করেছে, স্লোগান দিয়ে মিছিল করেছে, এমন-কি এদের প্রতিনিধিদল গভর্নরের সঙ্গে দেখা করেছে। আবেদন ইত্যাদি তো আছেই।

বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রে এই সব আন্দোলনের কোনো বিরোধিতা করা হয় নি। বরং যে-বিবরণ প্রকাশিত হত তাতে এ-ধরনের আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিই প্রকাশিত হয়েছে। সরকারি বিধিব্যবস্থার বিরুদ্ধে এই আন্দোলনের লক্ষের সঙ্গে বাঙালি মধ্যবিত্তের সহমর্মিতাই বোধহয় এর একটা কারণ। 'সম্বাদ ভাস্কর'-এর একটি মন্তব্যে (২৬ জুন ১৮৪৯) এই শ্রমিকদের আন্দোলনের সঙ্গে বাঙালি মধ্যবিত্তের সম্পর্কটি ধরা পড়ে।

> ...উড়ে বেহারা, রোমানি বেহারা, গরু গাড়য়ান ইত্যাদি নীচ লোকেরা ঐক্যবাক্য আছে কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে ইহা দেখিয়াও এতদ্দেশীয় মান্য লোকেরা লজ্জা জ্ঞান করেন না, আমরা সকলে পরামর্শ করিয়া কি গাড়ি ঘোড়া পরিত্যাগ

করিতে পারি না…সম্ভ্রান্ত লোকেরা গাড়ি ঘোড়ার কষ্ট নিবারণ করিতে পারিলেন না এইক্ষণে গাড়য়ানদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

[সা. বা. স. ৩।২৮৬]

১৮৪৯ সালে এই প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে ১৮২৭ সালে 'সমাচার দর্পণ'-এর একটি বিবরণের তুলনা করা যেতে পারে। দর্পণের এই বিবরণে কিছু কৌতুক আছে, রচনারীতি জড়তামুক্ত ও বিবরণটি সুখপাঠ্য। কিন্তু রচনার মধ্যে শ্রমজীবী মানুষ সম্পর্কে কোনো সমর্থন তো নেই-ই ববং উপেক্ষা ও ঘৃণাই বেশি প্রকাশ পেয়েছে। সময়ানুযায়ী পাল্কিভাড়া বাঁধার সরকারি নিয়মে বেহারাদের আপত্তি থাকায় কলকাতার বেহারারা পাল্কি টানা বন্ধ করে দেয়। দর্পণ সেই বিষয়ে মন্তব্য করেছে।

সমাচার দর্পণ। ২ জুন ১৮২৭

ঠিকা বেহারা।…এখন কলিকাতায় এক বেহারারও মুখ দেখা যায় না ইহাতে অনুমান হয় যে ইহার মধ্যে কিছু দুষ্টতা থাকিবেক কিম্বা কেহ তাহারদিগকে কুমন্ত্রণা দিয়া থাকিবেক এই নূতন ব্যবস্থা বিষয়ে কেহ২ এই এক ওজর করে যে কেবল সময়ানুসারে হার নিরূপিত হওয়াতে তাহারদের পক্ষে অনেক ক্ষতি অতএব সময়ানুসারে হার না করিয়া যদি দূরাদূর বুঝিয়া করা যাইত তবে ভাল হইত…

আরো কলিকাতার এক ইংরাজি সমাচারপত্রে বেহারারদের পক্ষপাতী হইয়া কেহ লিখিয়াছেন যে সময়ানুসারে বেতন নিরূপণের নূতন আইন হওয়াতে বেহারারদের প্রাণ লইয়া টানাটানি হইয়াছে যেহেতুক বেহারারদের ঘড়ী নাই আরোহকেরদের ঘড়ী আছে এবং ইতরলোক অপেক্ষা মান্যলোকের কথা প্রায় সর্ব্বত্রই অধিক মান্য।… অতএব ঐ লেখক কহিয়াছেন যে সরকারি ব্যয়ে প্রত্যেক বেহারাকে এক ২ টা ঘড়ী দেওয়া যায় তাহা হইলে বেহারারা যখন পাল্কী ঘাড়ে করিবে তখন টেক হইতে ঘড়ী বাহির করিয়া দেখিবেক ও যখন পাল্কী নামাইবেক তখন বস্ত্র দ্বারা আপনারদের মুখের ঘাম মুচিয়া পুনর্ব্বার ঘড়ী দেখিবেক তাহাতে আরোহকের ঘড়ীর সঙ্গে যদি ঠিক মিলে তবে কিছু অন্যায় হইতে পারিবেক না কিন্তু যদি না মিলে তবে উভয়ে কলিকাতার বড় গ্রিজায় গিয়া আপনারদের ঘড়ী ঠিক করিবে কিন্তু সেখানে যাইবার মজুরি বেহারারদের নিজ খরচ।

যে যে হউক বেহারারা চলিয়া গিয়াছে হইতে পারে যে তাহারা শ্রীক্ষেত্র

দর্শনে গিয়াছে। সংপ্রতি রথ যাত্রা উপস্থিত ভরসা হয় যে একবার রথ টানিয়া কলিকাতায় আসিয়া পুনর্ব্বার পাল্কী বহিবেক। ইতোমধ্যে কলিকাতা নগরে ঘোড়া সকল পালকীবেহারা হইয়াছে এবং বোধ হয় যে দুই তিন হপ্তার মধ্যে ঘোড়ারদেরও সভা হইয়া এক দরখাস্ত উপস্থিত হইবেক। ইহাও অসম্ভব নয় যেহেতুক হিতোপদেশপ্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে ষাঁড় শৃগালাদি কথা কহিয়াছে।

[স. সে. ক. ১ । ৩০৪]

তা হলে কি এ থেকে এমন অনুমান করা চলে যে, পৌরব্যবস্থার সূত্রেই বাঙালিদের মধ্যে শ্রেণীবর্ণ নির্বিশেষে ইংরেজ শাসন সম্পর্কে একটি সামগ্রিক মনোভাব প্রথম লক্ষ করা যায়? নাগরিক বাঙালিদের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা সে-কারণেই কি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সংগঠনে পরিতৃপ্তি পায় উনিশ শতকের ষাটের দশক থেকে?

নগর-উন্নয়ন ও পৌরব্যবস্থার জন্য দেয় ট্যাক্স সম্পর্কে বাঙালিদের আপত্তিই এর কারণ অনেকে মনে করেন। একটি শহর যদি সেই দেশের জনবিন্যাস, রাজনীতি ও অর্থনীতির বিবর্তনের সংগতিতে গড়ে ওঠে, তবে তার গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ার ভিতরেই নগরের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থব্যবস্থাও নির্দিষ্ট হতে পারে। ঢাকা-মুর্শিদাবাদের মতো বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত নগরগুলির ধ্বংস আর কলকাতা শহরের পত্তন ঘটেছে ইতিহাসের একই যুক্তিতে। কলকাতা শহরের প্রতিষ্ঠা ও সংগঠন ঘটেছিল সম্পূর্ণতই ইংরেজদের স্বার্থে ও প্রয়োজনে। তাই উনিশ শতকের শুরু থেকে কলকাতা শহরকে লালনের জরুরি প্রশ্নে দেখা গেল, এই নগরের প্রতিষ্ঠা ও বেড়ে ওঠার প্রক্রিয়া থেকে লব্ধ টাকাপয়সা 'ইম্পিরিয়াল রেভিনিউ'-এর হিশাবের খাতার অংশ—কলকাতার জন্য তা থেকে কিছু বরাদ্দ হয় না। পরন্তু কলকাতার পৌরব্যবস্থা ও উন্নয়নের উদ্দেশ্য তো শুধু ইয়োরোপীয় অংশের উন্নয়ন।

এই কারণেই, পৌরব্যবস্থা ও পৌরসংগঠন নিয়ে বাঙালি সমাজের বিরোধিতার পেছনে কলকাতা কার শহর এই প্রশ্নটি নিহিত ছিল। ইংরেজি সাময়িকপত্রে বাঙালিদের বিরুদ্ধে এ-কথা বলা হয় নি যে তারা ট্যাক্স দিতে পরাঙ্মুখ। বরং বাঙালিরা শুধু গঙ্গার ঘাট বাঁধানোতে আর মন্দির তৈরিতে পয়সা দিতে রাজি হয়—এ-রকম সমালোচনাও করা হয়েছে। কলকাতার উন্নয়নের জন্য যখন সরকার চেষ্টা করছে টাকা আদায়ের, সেই সময়ই গঙ্গায় ঘাট, ঘাটে মেয়েদের পোশাক-বদলের জন্য বা গঙ্গাতীরে যে-মুমূর্ষুদের আনা হয় তাদের জন্য, ঘর ও নানারকম

মন্দির ও সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য ও নানাপ্রকার জনহিতকর কাজে ভারতীয় ও বাঙালি বড়লোকরা পয়সা খরচ করতে কোনো দ্বিধা করেন নি। এই সময় এমনি কয়েক-জন বাঙালি দানধ্যানের জন্যই বিখ্যাত হন।

সুতরাং পৌরব্যবস্থা ও পৌরসংগঠন নিয়ে ইংরেজ-বাঙালি সম্পর্ক শুধুমাত্র অতিরিক্ত ট্যাক্সের দ্বারাই নির্ধারিত হত না। কলকাতা শহর সম্পর্কে ইংরেজদের ও বাঙালিদের স্বতন্ত্র মনোভাবের মধ্যেই নিহিত ছিল পৌরজীবন সম্পর্কে বাঙালির প্রতিক্রিয়ার হেতু। তত স্পষ্ট না হলেও একটা যেন অস্পষ্ট প্রতিযোগিতাই চলে, কলকাতাকে বাঙালি শহর বানাবার বাঙালি উদ্যোগের সঙ্গে কলকাতাকে বাসযোগ্য আধুনিক রাজধানী বানাবার সরকারি উদ্যোগের মধ্যে। ফলে বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রে নগর-শ্রমিকদের আন্দোলনের বিবরণে শুধু ট্যাক্সবৃদ্ধি সংক্রান্ত বক্তব্য নয়, অন্যতর এক তাৎপর্যও বেশি ধরা পড়ে। প্রকৃতপক্ষে ডিঙি মাঝিদের ও গাড়োয়ানদের ওপর ট্যাক্স ছাড়া নগর-শ্রমিকদের আন্দোলন-বিবরণে ট্যাক্সের কথা আর আসেই নি। এবং এই দুটি প্রসঙ্গেও ট্যাক্সের প্রসঙ্গ এসেছে নেহাতই খবর হিশেবে।

সম্বাদ ভাস্কর। ২ ডিসেম্বর ১৮৫৬

নগরীয় গঙ্গার উপরিস্থ ডিঙ্গী নৌকার নাবিকেরা পরস্পর ঐক্য হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে গবর্ণমেণ্ট নৌকার উপর ট্যাক্স বসাইলে তাহারা নৌকা চালন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে, এই পরামর্শ করিয়া অনেকে নৌকা চালন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে, হাবড়ায় একশত নৌকা বন্ধ করিয়াছে সাধারণে এতজ্জন্য অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন।

[সা. বা. স. ৩। ৩৪৬]

সম্বাদ ভাস্কর। ২৬ জুন ১৮৪৯

বিধি নির্ব্বন্ধ হইয়াছে কলিকাতা নগরীর গাড়িঘোড়া প্রভৃতির ট্যাক্স হইবে, ইহাতে গোশকট বাহকেরা ঐক্যবাক্য হইয়া গত সোমবারাবধি তাহা-দিগের গাড়ি চলায়ন বন্ধ করিয়াছে…মুটেরাও গাড়য়ানদিগের সহিত যোগ দিয়াছে, গাড়য়ান ও মুটে পাঁচ ছয় সহস্র লোক একত্র হইয়া ডেপুটি গবর্ণর বাহাদুরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছে তাহারদিগের প্রতি এই ট্যাক্স ক্ষমা হয়।

[সা. বা. স. ৩। ২৮৫-৮৬]

নগর জীবনে শ্রমিকদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতা এই রচনাগুলির ভিতরে-

ভিতরে লক্ষ করা যায়। তাতে কখনো শ্রমিকদের পেশাগত সমস্যার কথাও এসেছে। ধোপাদের কাপড়কাচার দর বাড়ানো নিয়ে এমনি একটি সংবাদ-মন্তব্য পাওয়া যায়। এই মন্তব্যের সামান্য সাক্ষ্য থেকে বড় কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছনো নিশ্চয়ই অনুচিত, কিন্তু নগরজীবনের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের কোনো-কোনো অংশের সচেতনতার অনুমানটুকু এ-থেকে করা চলে।
সম্বাদ ভাস্কর। ৮ নভেম্বর ১৮৫৬

> কলিকাতা নগরীয় কৃষ্ণবাগানে অনেক ধোপা বসতি করে, তাহারা দেখিয়াছে মুটে্যা মজুর পর্য্যন্ত সকলে স্ব স্ব কর্ম্মে দ্বিগুণ ত্রিগুণ বেতন লইতেছে এই কারণ জ্ঞাতি বন্ধুগণকে আবাহনপূর্ব্বক এক সভা করিয়াছিল তাহাতে প্রামাণিক ধোপারা বক্তৃতা করিয়া সকল ধোপাকে জানাইল এক টাকার চাউল দুই টাকা হইয়াছে, এক পয়সার মাছ দুই পয়সায় বিক্রী হইতেছে, মুটে্যারা মোট লইয়া যে স্থানে এক পয়সায় যাইত দুই পয়সা না পাইলে সে স্থানে যায় না, আমরা এক পয়সার হাঁড়ী দুই পয়সা না দিলে পাই না পূর্ব্বে টাকায় ছয় মোন কাঠ বিক্রয় হইত এখন তিন মোনের অধিক দেয় না এইরূপ সকল বিষয়ে দ্বিগুণ লাভ হইতেছে তবে আমারাই বা কি কারণ চিরকাল এক মূল্যে থাকিব ? অতএব সকলে প্রতিজ্ঞা কর এক পয়সায় যে কাপড় কাচিয়া থাকি দুই পয়সা না পাইলে তাহা কাচিতে পারিব না। ইহাতেই সভাস্থ সমস্ত ধোপা প্রতিজ্ঞা করিয়াছে আর এক পয়সায় কাচাখানা ও কাঁচা হইবেক না, যাহারা নগদ পয়সায় কাপড় ধোলাই করাইত তাহারা ঘোর বিপদে পড়িয়াছে, ধোপারা তাহারদিগের কাপড় লয় না ।
>
> [সা. বা. স ৩। ৩৩৩]

নগরশ্রমিকদের সম্পর্কে 'সম্বাদ-ভাস্কর'-এ ৯ আগস্ট, ১৮৫৬-তে একটি লেখা বেরিয়েছিল। ট্যাক্সবৃদ্ধি বা হার বৃদ্ধির কোনো প্রত্যক্ষ কারণ ছাড়াই কলকাতার খালের মাঝি ও মহাজনদের একটি আন্দোলনের বিবরণ লেখাটিতে দেয়া হয়েছে। কলকাতায় জনবসতির চাপ তখন প্রতিদিনই বাড়ছে। অথচ এই জনসংখ্যার প্রয়োজনীয় দৈনিক বাজারের সরবরাহ চালু রাখতে কলকাতার বাইরে বাংলা-দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ও কখনো-বা বাংলাদেশের বাইরে থেকে সরবরাহের প্রধান পথ ছিল কলকাতার খালপথ ও হুগলি নদী। তাই এই 'খালিয়া' মাঝি ও মহাজনদের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। ২ আগস্ট তারিখের একটি খবরে ভাস্কর লিখেছিল 'বাগবাজারের খালে দাঁড়ি মাঝি ও মহাজনদিগের উপর গুরুতর

অত্যাচার হইতেছে তাহাতে আহারীয় দ্রব্য বোঝাই নৌকার আমদানী বন্ধ হয়ে নিত্যকার জিনিসপত্র দুর্মূল্য হয়েছে। ৯ আগস্টের ভাস্করে এ-বিষয়ে খালিয়াদের আন্দোলনের একটি পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হয়। সেই বিবরণের সূত্রে কলকাতার এই ধরনের শ্রমিক-আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত আভাস পাওয়া যায় বিশেষত দ্বারকানাথ ঠাকুরের লবণের দেওয়ানিগিরির সময় শ্রমিকশোষণের নির্দিষ্ট তথ্য।

সম্বাদ ভাস্কর। ৯ আগস্ট ১৮৫৬

খালের অত্যাচার। আমরা গত বৃহস্পতি বাসরীয় ভাস্করে কলিকাতা খালের অত্যাচার বিষয়ে যে প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম হাতে হাতেই তাহা সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে, গত বুধবার বেলা চারি ঘণ্টার পর হাটখোলা চীৎপুচ, [চিৎপুর] নারিকেলডাঙ্গা, বালীয়াঘাটা, টালিগঞ্জ, খিদিরপুর, ইত্যাদি স্থানীয় মহাজনেরা গবর্ণমেণ্ট হৌসের পশ্চিম দ্বারের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া ছিলেন। ন্যূনাধিক ৫০০ শত ব্যক্তি দুইঘণ্টা কাল চীৎকার করিয়া শ্রীযুক্ত লার্ড বাহাদুরকে আপনারদিগের দুঃখ জানাইয়াছেন, গত প্রস্তাবে আমরা অতি সংক্ষেপে লিখিয়াছি, মহাজনেরা বিস্তারিত রূপে সমস্ত বিষয় বলিয়াছেন, অনুমান করি তাঁহারদিগের চীৎকারে শ্রীযুক্ত বাহাদুর অস্থির হইয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্ট বাটী হইতে কয়েকজন চাপরাশী নীচে আসিয়া মহাজনগণকে কি বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, ইহাতেই পাঠক মহাশয়েরা বুঝিতে পারিবেন শ্রীযুতের কর্ণগোচর না হইলে তাঁহার আজ্ঞাবাহক রাজদূতেরা জিজ্ঞাসা করিতে আসিত না...আমরা অনেকবার দেখিয়াছি দুঃখি লোকেরা গবর্ণমেণ্টের বাটীর সন্নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া এইরূপ চীৎকার করিয়াছিল তাহাতে পূর্ব্ব২ গবর্ণরেরা তাহারদিগের অভিলাষ পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন, লার্ড বেণ্টিঙ্ক বাহাদুরের শাসন সময়ে খালাড়িরা ন্যূনাধিক দুই সহস্র লোক একত্র হইয়া গবর্ণমেণ্ট বাটীর সম্মুখে এইরূপ দুঃখ ধ্বনি করে, লার্ড বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর সেই সময়ে শকটারোহণে বহির্গমন করিতেছিলেন, খালাড়িরা তাঁহার গাড়ির নীচে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে চাহিয়াছিল তাহাতে লার্ড বাহাদুর গাড়ি হইতে নামিয়া সহচর সেক্রেটারি সাহেবকে কহিলেন "ইহারা কি২ বলে তুমি বিশেষ জানিয়া আমাকে জ্ঞাপন কর" এই কথা বলিয়া গবর্ণর বাহাদুর বহির্গমনে বিরত হইয়া উপবেশনাগারে গমন করিলেন, সেক্রেটারি সাহেব খালাড়িদিগের মধ্য হইতে চারিজন ভদ্রলোককে গবর্ণর বাহাদুরের সম্মুখে লইয়া গেলেন তাঁহারা ইংরাজী, বাঙ্গালা, পারস্যাদি ভাষায় সুনিপুণ ছিলেন, তাঁহারা ৫।৬ শত শরা সহিত বাহাদুরের সমীপে উপস্থিত হইলেন, গবর্ণর

বাহাদুর ঐ সকল শরা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এ সকল কেন আনিয়াছ? উক্ত চারিব্যক্তি কহিলেন, গবর্ণমেন্টের নির্দ্ধারিত আছে লবণ প্রস্তুত করিয়া ওজন দিলে খালাড়িরা প্রতি মোন লবণে ৷৷৵ আনা মাত্র মূল্য পাইবে কিন্তু তাহারা প্রতি মোনে পাঁচ আনাও পায় না এবং ওজন মুখে ঠাকুর বাবুর জন্য প্রতি মোনে এই এক এক শরা লবণ রাখিতে হয়,···চারি কিম্বা পাঁচ বৎসর গত হইল উড়ে, বিহারাদিগের উপার্জ্জনের উপর যখন টাক্স স্থাপনের স্বস্তিবাচন হয় তখন তাহারা পাল্‌কী বহন গঙ্গাজল তোলনাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুর্গ প্রান্তর পুরিয়া চীৎকার করিয়াছিল তৎপরে গোশকট চালকেরাও গড়ের মাঠে যাইয়া এই প্রকার দুঃখ ধ্বনি করে তাহারাও অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিল।···

[সা. বা. স. ৩ । ৩১৮]

খালিয়াদের এই আন্দোলন এতটা সংগঠিত ও সফল হতে পেরেছিল বোধহয় মহাজনদের অংশগ্রহণের ফলে। নইলে সমাজ-আন্দোলনের ঐ বিশেষ স্তরে শুধু শ্রমিকদের সংগঠন খুব সম্ভব ছিল না হয়তো। খালের ব্যাপারে মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী ও শ্রমিকদের স্বার্থের মিল ছিল।

এই প্রতিক্রিয়া থেকেই বাঙালিরা নগরের উন্নয়ন, নগরবিন্যাস ও জনবিন্যাস সম্পর্কে স্বতন্ত্র ভিন্ন মত প্রকাশ করতে শুরু করে। কলকাতা শহরের সীমা বাড়িয়ে উপকণ্ঠগুলিকে শহর-এলাকার অন্তর্গত করার সরকারি হুকুমের বিরোধিতা, কলকাতা শহরের ভিতরে বেশ্যাপল্লি সরিয়ে শহরকে আধুনিক বাসযোগ্য করে তোলার প্রস্তাব, শহরের সামাজিক শৃঙ্খলারক্ষা ও সরকারের শাসনব্যবস্থা কায়েম রাখতে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বারবার লেখা হয়েছে।

এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে একটি মিল আছে—নগরবিন্যাস ও নগরসংগঠন সম্পর্কে বাঙালি মধ্যবিত্তের প্রতিক্রিয়া থেকেই এই তিনটি বিষয় সম্পর্কে বাঙালিদের স্বতন্ত্র মত সামাজিকভাবে স্থির হয়েছে।

বাঙালি মধ্যবিত্তের কলকাতা সম্পর্কিত মনোভাব গত প্রায় দেড়শ বছরেও খুব একটা বদলায় নি। বৃহত্তর সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমিতে কলকাতার মতো শহরের প্রাধান্য যেমন স্বীকার করে নেয়া হয় তেমনি দৈনন্দিনে কলকাতার মতো শহরের সংকটের পর সংকটের ধারাবাহিকতা জীবনযাপনের বিপর্যয়কেই প্রধান করে তোলে। মনে হয়, কোনো পূর্ব ভূমিকা ছাড়াই কলকাতার মতো একটি শহরে বসবাসের নিত্যি-নৈমিত্তিক অভিজ্ঞতা বাঙালির সমাজজীবনে কখনোই স্বাভাবিক হয়ে ওঠে নি। তাই কয়েকপুরুষের বাস সত্ত্বেও কলকাতা কারও আপন

হয়ে উঠতে পারে নি। কলকাতার গড়ে ওঠা, ছড়িয়ে পড়া ও আরো পেঁচিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় বাঙালি মধ্যবিত্তের বিব্রত ভাব তখনও ধরা পড়ে।

সংবাদ প্রভাকর। সেপ্টেম্বর ১৮৫৩

কলিকাতা নগরের সীমাবৃদ্ধি। আমারদিগের বর্ত্তমান গবরনর জেনরেল সাহেব সংপ্রতি এরূপ মানস করিয়াছেন যে কলিকাতা নগরের সীমাবৃদ্ধি করিবেন। ভবানীপুর, কালীঘাট, চক্রবেড়ে, শিবাদহ [শিয়ালদহ], ইটালি, বৈঠকখানা, বরাহনগর, কাশীপুর, চিৎপুর, পাকপাড়া প্রভৃতি গ্রাম সকল নগরভুক্ত হইবেক।··· কিন্তু এক বিষয়ে আমারদিগের শঙ্কা উপস্থিত হইতেছে, কলিকাতা নগরীর বসতবাটীর টেক্স গ্রহণের যে নিয়ম চলিত আছে ঐ নিয়ম উল্লেখিত গ্রামাদিতে প্রচলিত হইলে প্রজারা সুখানুভব করিবেন না। আর নাগর্য্য কমিশ্যনর মহাশয়েরা যে সমস্ত বায়না অর্থাৎ নিয়মাদি এতন্নগরে প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা নিরানন্দ হইবেন। পর্ব্বাহ সময়ে আমারদিগের খোদাবন্দ প্রধান মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে যে হুকুম জারি করিয়া থাকেন তাহাতে তাঁহারা ক্লেশ বোধ করিবেন। এই কয়েক বিষয়ে নগরবাসিরা যে ক্লেশ ভোগ করিতেছে পার্শ্ববর্ত্তি গ্রামনিচয় নিবাসি লোকেরা তাহা এপর্য্যন্ত জানিতে পারেন নাই, কিন্তু মহানগর কলিকাতার সীমাবৃদ্ধি হইলেই তত্তাবৎ তাঁহারদিগকে অনুভব করিতে হইবেক। নগরের সীমা বৃদ্ধি হইলে টেক্স অফিসের আয় বৃদ্ধি হইবেক, অতি কষ্টে প্রজাদিগকে টেক্সের টাকা প্রদান করিতে হইবেক, না দিলে তাহারদিগের রক্ষা থাকিবেক না, এদিকে রাস্তা মেরামত, নরদমা পরিষ্কার, আলোক প্রদান ও জলসেচন প্রভৃতি যে যে বিষয়ে রাজপুরুষেরা আইন নিবন্ধন দ্বারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা কিছুই হইবেক না···

[সা. বা. স. ১। ১৯৭]

কলকাতাকে এই বাড়তে না-দেয়া ও যে-বিন্যাস আছে তাকেই বাঙালি মধ্যবিত্তের যুক্তিতে পুনর্বিন্যস্ত করার মনোভাব থেকে শহরের ভিতর বেশ্যাপল্লি তুলে দেয়ার দাবি উত্থাপিত হয়েছে—বিশেষত ১৮৫০ সালের পর।

এই বিশেষ ব্যাপারটিতে বাঙালি সমাজ তার মাত্র দুই-এক পুরুষের দায় মেটাচ্ছিল। পলাশির যুদ্ধের পর কলকাতা শহর বেড়ে ওঠার মুখে বাঙালি দেওয়ান, মুৎসুদ্দি ও বণিক সম্প্রদায়ের লোকেরা কলকাতায় জমি কিনেছে ও সেই জমিতে বাজার, বস্তি ও বেশ্যাপল্লি বসিয়েছে। কলকাতার একেকটি বাঙালিবসতি এলাকার সঙ্গে-সঙ্গে বেশ্যাপল্লি ও বস্তিও গড়ে উঠেছিল। উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগরিক বাঙালি সংস্কৃতি জন্ম নিয়েছে। কিছু নতুন মূল্যবোধও বাঙালি সমাজে সঞ্চারিত

হয়েছে। কিন্তু কলকাতা শহরে কোনো পারিপাট্য, প্যাটার্ন, না থাকায়, বাঙালির এই নতুন নাগরিক ধারণা তার বাসভূমির সঙ্গে মিলছিল না। নগর সংগঠনে তো এ-ঘটনা বারবার ঘটে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে নগরের এক-একটি অঞ্চলের স্থানগত গুরুত্ব বাড়ে-কমে। নতুন গুরুত্বে নতুন বসতি-এলাকা গড়ে ওঠে। সামাজিক আয়ের চলৎশক্তি যত বাড়ে নগরে উন্নততর বসতি-এলাকা তত বেশি গড়ে ওঠে। পৌরব্যবস্থা, রাস্তাঘাট, যানবাহন ও আর্থিক দিক থেকে শ্রেণীসাম্য —এই নতুন বসতি-এলাকা গড়ে তোলাতে আরো সাহায্য করে। তখন, পুরনো এলাকার স্বাভাবিক প্রবণতা হয়—নতুন এই মূল্যবোধের সংগতিতে পুনর্বিন্যস্ত হওয়ার। ১৮৫০ সালের পর কলকাতার দক্ষিণ ও উত্তর উপকণ্ঠে শহরের নতুন বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে শহরের প্রাচীন এলাকাকে পুনর্বিন্যস্ত করার দাবি ওঠে। বেশ্যাপল্লি সরানোর কথা এই পুনর্বিন্যাসেরই দাবি থেকে উঠেছিল। 'তাহার তাৎপর্য্য কি কেবল তাহাদিগের প্রতি কোন উত্তম নিয়ম অদ্যাবধি প্রচলিত হয় নাই বলিয়াই তাহারা স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া যথেচ্ছা তাহাই করিতেছে, কেবল যে বেশ্যাদিগের সংখ্যাবৃদ্ধি হইবার এত উৎপাত হইতেছে তাহাও নহে, বঙ্গদেশীয় ধনবানগণ স্বীয় স্বীয় বসতবাটীতেও অধিক ভট্টালোভী হইয়া ভদ্র পল্লীমধ্যে বেশ্যাগণকে স্থান দান করিয়া অতুল সুখ প্রাপ্ত হইতেছেন যদ্দারা একঘর বেশ্যা-বৃদ্ধি হইবায় সেই ভদ্রপল্লী একেবারে অভদ্র নিয়মে পরিপূর্ণ হইতেছে··· । অতএব হে সভ্য মহোদয়গণ, আপনারা মনোযোগী হইয়া বেশ্যাগণকে নগরের প্রান্তে একত্রে নিবসতি আজ্ঞা করুন নতুবা কোন প্রকারেই ভদ্র ধনবানগণ এই বিশাল ধনপূর্ণ ভদ্র নগরবাসের উত্তম স্থল বোধ করিতে পারেন না। মহোদয়গণ—আমি আপনাদিগের নিতান্ত অনুগত ভৃত্য। শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।' (সা. বা. স. ৩। ৩৩৭-৩৮)

সংবাদ প্রভাকর। মে ১৮৫৭

এই কলকাতা রাজধানীর প্রজাদিগের বসতিশৃঙ্খলা কিছুই নাই যেখানে বাজার সেইখানেই ভদ্রলোকের বাস, বিশেষতঃ বেশ্যারা ইচ্ছানুসারে সকল স্থানে বাস করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়াতে আরো মন্দ হইয়াছে···এখন [এমন] পল্লীপথ বা গলি নাই সেস্থানে বারবিলাসিনীদিগের আবাসস্থান দৃষ্টি-গোচর না হয়, মদ্যপান ধূম্রপান গুলি গাঁজা ছরুরা টান ইত্যাদি টান পানের ব্যাপার বারাঙ্গনা ভবনেই অধিক হইয়া থাকে, দুষ্ট দুরাত্মা তস্কর প্রতারক ঠক ইত্যাদি অসদ্বৃত্তোপযোগি কুলোকেরা বেশ্যাগারেই বাস করে, অতএব বেশ্যা-

দিগকে শাসন করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অতি আবশ্যক হইয়াছে, পূর্ব্বে একবার বলিয়াছিলেন যে বেশ্যাদিগের বাসের নিমিত্ত স্বতন্ত্র পল্লী নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন এবং তাহারদিগের নিমিত্ত কঠিন নিয়মাদি নির্দ্দিষ্ট হইবেক, দশ ঘটিকার পর আর কোন লম্পট বেশ্যাগারে প্রবেশ বা তথা হইতে বহির্গমন করিতে পারিবেন না।··· গবর্ণমেণ্ট লম্পট নট ও বারবিলাসিনীদিগকে সংপূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিতেই নগরমধ্যে লাম্পট্য দোষের আতিশয্য হইয়াছে।

[সা. বা. স. ১ । ২২৩-২৪]

সংবাদ প্রভাকর । অক্টোবর ১৮৫৪

চিঠি

অশেষ গুণিগণাগ্রগণ্য মহামান্য প্রিয় বল্লভ শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় প্রণয়ৈক নিকেতনেষু

এতন্নগরীয়া কতিপয় বারাঙ্গনাগণের নিবেদনমিদং।

···কোন পত্রপেরক মহাশয় পাঠশালা সন্নিকর্ষে হীনজাতি বেশ্যাবর্গের বাস থাকায় বালকবৃন্দের বিদ্যাবিষয়ক ত্রুটিকর বিবেচনায় তদ্বসবাসপরিবর্ত্তনার্থ ইত্যাদি বিবরণ প্রকাকর [প্রভাকর] ও ইংলিশম্যান পত্রে প্রকটিত করণে স্কুলাধ্যক্ষগণ তৎপাঠে যথার্থ হানিজনক বিবেচনায় কতিপয় সহায় সম্পত্তি বিহীনা বারাঙ্গনাকে ইংরাজী স্কুলের নিকট হইতে উঠাইয়া দিয়াছেন। সম্পাদকমহাশয়! এও ত এক আশ্চর্য্য! দেখুন এক যাত্রায় পৃথক পথ ফলিল, যে কামিনী ঐশ্বর্য্যশালিনী ও স্বসহায়া ছিল সে অকাতরে ঘরে বসিয়া ভ্রূক্ষেপও করিল না, কিন্তু কতকগুলি অনাথিনী বাররমণীগণ স্থানভ্রষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ চিরদুঃখিনীর ন্যায়, কেহ বা পর্ণকুটীরে, কেহবা হট্টমন্দিরে, কেহ বা তরুতলে বৃক্ষচ্ছায়াতে যূথভ্রষ্টা হরিণীর ন্যায় হা হুতাশ করত দিন যাপন করিতেছে···মেদিনীপুর

বাসভ্রষ্ট বারাঙ্গনানাং

[সা. বা. স. ১ । ২১১-১২]

৩

সরকারি নানা ব্যবস্থা ও সংবাদপত্র

১৮৩৩-এ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নতুন চার্টার থেকে ১৮৫৩-তে আবার নতুন চার্টার পর্যন্ত বিশ বছর জ্ঞানান্বেষণ-প্রভাকর-ভাস্কর-বেঙ্গল স্পেকটেটার-তত্ত্ববোধিনীর ভিতরেও এইরকম প্রতিক্রিয়ার ও প্রতিবাদের ঐক্য দেখা যায়। তাহার সেই ঐক্য

উৎসারিত হয়েছে চিন্তাভাবনা ও বোধ-অনুভবের ঐক্য থেকে। কোনো-কোনো বিষয়ে, যেমন বাঙালিদের সাহেবদের সমতুল্য চাকরি চাওয়া, সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিক্রিয়া তীব্রতর হয়েছে। আবার একটি বিষয়ের প্রতিক্রিয়া অন্য বিষয়ের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। আবার কখনো একটি সামগ্রিক বিষয় থেকে দুটি-একটি নির্দিষ্ট বিষয় আলাদা হয়ে গিয়েছে।

প্রতিক্রিয়ার এই প্রক্রিয়া প্রধানত নির্ভর করেছে সাহেব-বাঙালি সম্পর্কের ছাঁচের মধ্যে। ইংরেজি শিক্ষার কিছুটা প্রসারের ফলে ইংরেজি জানা বাঙালিদের ভিতর চাকরির উচ্চাশা তৈরি হয়েছিল এই সময়ই। ১৮৩৩-এর চার্টারে ভারতীয় হওয়াটা চাকরি পাওয়ার পথে কোনো বাধা হওয়া উচিত নয়—মাত্র এই স্বীকৃতিটুকুই সে-উচ্চাশা আরো উশকিয়েছে। ১৮৪৩-এ ডেপুটিগিরিতে ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার জুটে গেলে সেই উচ্চাশায় বাস্তব রঙও লাগে।

এই অবস্থায় বাংলা কাগজ যেন ক্রমেই অস্থির হয়ে উঠতে চায় বাঙালিরা যে সাহেবদের সমতুল্য তা প্রমাণ করতে। এই বক্তব্যেরই রকমফের—সাহেবরা অনেক কাজেকর্মেই বাঙালিদের সমতুল্য নয়। আবার, চাকরিতে এই পরাজয় ও সাহেব-মুখাপেক্ষিতা থেকে বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় শিল্প ও বহির্বাণিজ্যে বাঙালিদের ব্যর্থতা নিয়ে আত্মবিলাপও চলতে থাকে। নতুন শাসনসংগঠনে, মফস্বলে বিশেষ করে, সাহেবদের ঘুষ খাওয়া ও পুলিশের অনাচারের বিস্তৃত বিবরণ আসে বাঙালি কর্মচারীদের ঘুষ নেয়া যে প্রায় অপরিহার্য এই বক্তব্য প্রমাণ করতে। দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থার বর্ণনায় কৃষক-রায়ত সম্পর্কের কথাও বারবার আসে। এই সব বিষয়ে ইয়ংবেঙ্গল, হিন্দু রক্ষণশীল, হিন্দু প্রগতিশীল ও ব্রাহ্ম রক্ষণশীল কাগজের ভিতরে মতের ও ভাষার প্রায় কোনো পার্থক্যই ছিল না। এই কাগজগুলির ভিতরে ভাব ও ভাষা-গত এই ঐক্য ক. বাঙালিদের বড় চাকরি, খ. শিল্প-ব্যাবসাতে বাঙালি, গ. শাসনসংগঠন, পুলিশ ও ঘুষ, ঘ. কৃষক রায়ত সম্পর্ক—এই চারটি বিষয়ে ভাগ করে দেখা যায়।

ক. চাকরি ও নাগরিক বাঙালি

১৮৫৩ সালে কোম্পানির চার্টার নতুন করে পাওয়ার বছর। তার অনেক আগে থেকেই বাংলা কাগজে সাহেবদের সমতুল্য চাকরি বাঙালিদের দেয়ার জন্য আন্দোলন চলছিল। এই বছরই নভেম্বরের শেষদিকে 'সংবাদ প্রভাকর'-এর এক সম্পাদকীয়তে 'এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের অবস্থা' সম্পর্কে প্রায় একটি সমীক্ষা-মন্তব্যই

করে ফেলা হয়, যদিও তার অব্যবহিত উপলক্ষ ছিল, 'গবর্ণমেণ্ট একেবারে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছেন যে রাজকীয় কোন প্রধান পদে এদেশের লোকদিগকে নিযুক্ত করিবেন না।' লেখাটিতে এর পর বাঙালিদের পক্ষে এই চাকরি কেন এত জরুরি তার প্রমাণ হিশেবে আর্থিক সংস্থানের অন্যান্য বিষয়ে বাঙালির উপায়ান্তরহীনতা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

'বাণিজ্য দ্বারা এখানকার লোকদিগের সৌভাগ্যবৃদ্ধি হইবার পথেও বিবিধ প্রকার প্রতিবন্ধক আছে', যথা, বাঙালিরা 'বিদেশীয় বাণিজ্য' জানে না— বিশেষত সমুদ্রযাত্রায় শাস্ত্রীয় নিষেধ আছে, তা ছাড়াও বাংলাদেশে বিভিন্ন বাণিজ্যে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর প্রায় একাধিপত্য—'ভিন্ন২ জাতির ভিন্ন২ প্রকার বাণিজ্যকরণের নিয়ম বহুকালাবধি প্রচলিত…', অর্থাৎ কলকাতার সর্বভারতীয় বাজারে তখন বাঙালির প্রবেশাধিকার নেই। আবার, বাঙালি ধনীদের সাহস নেই, 'তাঁহারা লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়া সাহেব বিশেষের অধীনে মুচ্ছুদ্দিগিরি কর্ম্ম করিতে পারেন, তথাচ স্বাধীনরূপে বাণিজ্য করিতে পারেন না। বিশেষতঃ গত পাঁচ বছরের মধ্যে কতিপয় ধনি ব্যক্তি আফিম নীল প্রভৃতি বাণিজ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া অতুল সম্পদের পদ হইতে দুরবস্থায় পতিত হওয়াতে আর কোন ব্যক্তি বাণিজ্য করিতে ইচ্ছা করেন না।'

বাকি থাকে জমিদারি। 'কিন্তু আমারদিগের গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব আদায়ের নিমিত্ত ক্রমে কঠিন নিয়ম সকল নির্দ্ধারণ করাতে…অনেক জমিদারী কালেক্টর সাহেবের নীলাম দ্বারা হস্তান্তরিত হইয়াছে।'

এই যুক্তি পরম্পরায় সিদ্ধান্ত প্রায় অনিবার্য করে তোলা হয়েছে 'যে পর্য্যন্ত আমারদিগের রাজপুরুষেরা সম্ভ্রান্ত রাজকীয় পদে এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য লোক-দিগকে নিযুক্ত করণের নিয়ম নির্দ্ধারণ না করিবেন এবং সাধারণে স্বাধীনরূপে বাণিজ্যকরণে প্রবৃত্ত না হইবেন তদবধি এই বঙ্গরাজ্যের সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইবেক না।' (সা. বা. স. ১। ৯২-৯৩)

হয়তো এই অবস্থার অনেকটাই সত্য কিন্তু এখানে অবস্থার অসহায়তা শুধুমাত্র 'সম্ভ্রান্ত রাজকীয় পদ' সম্পর্কেই প্রাসঙ্গিক। বহির্বাণিজ্যের অভাব, বাঙালি ধনীদের উদ্যোগহীনতা ও জমিদারি নিলাম সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণীর আর্থিক সংকটের আংশিক কারণ হতে পারে কিন্তু 'সম্ভ্রান্ত রাজকীয় পদে' 'এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য লোক-দিগকে নিযুক্ত' করলেও তাতে এই আংশিক কারণেরও ভগ্নাংশিক সমাধান মাত্র সম্ভব কারণ বণিক, মুচ্ছুদ্দি ও জমিদার—সব বাঙালির এই ধরনের চাকরি পাওয়ার

কোনো সম্ভাবনা ছিল না। এই ধরনের বড় চাকরিতে নিযুক্ত হওয়ার স্বার্থ ছিল ইংরেজিজানা নাগরিক বাঙালিদের মধ্যে কারো-কারো। কিন্তু ইংরেজি জানার দৌলতে ও সমষ্টিমত-সংগঠনের পদ্ধতি জানা থাকায় সেই গুটিকয়েক মাত্র বড় চাকরির প্রার্থী বাঙালি সমাজের উচ্চ থেকে মধ্যবিত্ত স্তরের সামগ্রিক প্রতিনিধিত্ব দাবি করছে। ধীরে-ধীরে এই প্রতিনিধিত্বের পরিসর বাড়তেই থাকবে।

এই প্রসঙ্গ মাঝে-মাঝেই ফিরে ফিরে এসেছে। বাঙালি-ইংরেজ সম্পর্কের সমস্ত স্তরকেই এই চাকরির প্রসঙ্গ দিয়েই বিচার করা হচ্ছে। তিরিশের দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত শিক্ষা-বিস্তারই ছিল মুখ্য কর্মসূচি। মাত্র বিশ বছরের মধ্যেই সেই কর্মসূচি সম্পর্কেও সংশয় দেখা দিয়েছে এই চাকরির সূত্রেই। সেখানে আলোচ্য বড় চাকরি নয়, নানা ধরনের ছোটখাটো সরকারি চাকরি।

সংবাদ প্রভাকর। ১২ মাঘ ১২৫৮ [২৭। ২৮ জানুয়ারি ১৮৫২]

> কেহ২ বলিয়া থাকেন পূর্ব্বাপেক্ষা এইক্ষণে অনেক ব্যক্তি বিলক্ষণরূপে বিদ্যানুশীলন করত কৃতবিদ্য হইয়াছেন। এই কথা যদিও আমরা একপ্রকার স্বীকার করি, তথাচ সেই বিদ্যার সার্থকতার কোন কারণ দেখিতে পাই না। বিজ্ঞবর গবরনর জেনরল শ্রীযুক্ত লার্ড হার্ডিঞ্জ সাহেব স্কালার-সিপের নিমিত্ত পরীক্ষা করণের নিয়ম নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক কলিকাতা গেজেটপত্রে এরূপ ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন যে "যে-সকল ছাত্র বিলক্ষণরূপে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া কালেজ পরিত্যাগ করিবেন ...কোনস্থানে গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত কোন কর্ম্মকারকের পদশূন্য হইলে তাঁহারাই তাহাতে নিযুক্ত হইবেন" কিন্তু কি আক্ষেপ! ঐ অনুমতি একপ্রকার অপ্রচলিত হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত প্রধান২ কর্ম্মকারকগণ তাহা কিছুই মান্য করেন না, কোন কার্য্যালয়ে কোন নূতন লোকের আবশ্যক হইলে, কর্ত্তা সাহেব আপন ইচ্ছায় অন্য ব্যক্তিকে তাহাতে নিযুক্ত করেন...।
>
> [সা. বা স. ১। ৮০]

এইসূত্রে কিছুটা আভাস পাওয়া যায় চাকরির বাজারে তখনকার ভিড়ের, 'কোন স্থানে কোন নূতন লোকের আবশ্যক হইলে তত্রস্থ প্রধান কর্ম্মচারির নিকটে শত শতখানা দরখাস্ত উপস্থিত হয়...।'

মাত্র এক বছরের মধ্যেই (জুন ২।৩, ১৮৫৪) চাকরির সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক নিয়ে প্রভাকরে আবার আলোচনা করা হয়েছে—সে আলোচনায় চাকরির সঙ্গে যুক্ত নয় এমন শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে তীব্র প্রশ্ন উঠেছে, 'কালেজে যিনি পরীক্ষার দ্বারা সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে গণ্য হইয়া উচ্চতর ছাত্রীয় বৃত্তি ধারণ করেন তিনি

বহিষ্কৃত হইলে কি কার্য্য করিবেন তাহার কিছুই স্থির করিতে পারেন না, যিনি পাঠাবস্থায় কোন প্রধান পদস্থ সাহেবকে মুরুব্বি ধরিতে পারেন অথবা যাঁহারদিগের পৈতৃক-সম্পদ থাকে তাঁহারদিগেরই কিঞ্চিৎ মঙ্গল দেখা যায়, নচেৎ প্রায় সকলকেই ঘরে বসিয়া থাকিতে হয়…' (সা. বা. স. ১ । ২০৩) ।

কিন্তু চাকরি নিয়ে শুধু বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা অস্পষ্ট এই আলোচনাই হয়েছে—তা নয়। এখান থেকে হয়তো শুরু বা এটা হয়তো অনেক কথার ভিতর একটি প্রাসঙ্গিক কথা। কিন্তু বাংলা কাগজের প্রধান দায় হয়ে ওঠে ১৮৩৩-এর চার্টারের সম্ভাবনাকে বাস্তব করে তোলা আর সেই দায় থেকেই চাকরিপ্রার্থীরা যেন ধীরে-ধীরে জাতীয় প্রতিনিধিত্বই অর্জন করতে চান জাতি থেকে ক্রমবিচ্ছিন্ন হয়ে।

১৮৩৩-এর চার্টার অনুযায়ী ভারতবর্ষের বিভিন্ন সরকারি পদে ভারতীয় নিয়োগের যে অধিকার দেয়া আছে সে-বিষয়ে ১৮৪২ সালের ২১ ডিসেম্বরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টারদের সভায় আলোচনা ওঠে। তার বিবরণ বেরয় ১৬ মার্চের 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর'-এ। আর এ-বিষয়ে মন্তব্য বেরয় এর আগে ও পরে, যথাক্রমে ১৫ জানুয়ারি ও ২৪ মার্চ। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আলোচনায় সালিভ্যান সাহেব ভারতীয়দের দায়িত্বশীল পদে নিয়োগের পক্ষে কয়েকটি যুক্তি দেন। যেমন, এদেশে ৮২৫ জন ইয়োরোপীয় পিছু মাত্র ১ জন ভারতীয় সরকারি চাকরি পায়—কিন্তু ইয়োরোপীয়দের মাইনে পাঁচ হাজার টাকার জায়গায় ভারতীয়দের মাইনে আটশ টাকা। ভারতীয়দের চাকরি না দিয়ে ইয়োরোপীয়দের নিয়োগ যেন একটি নীতি হিশেবেই অনুসরণ করা হয়। নতুন-নতুন রাজ্য দখলে এলে সেখানে ভারতীয়দের তাড়িয়ে ইয়োরোপীয়দের বহাল করা হয়—'মাইশোর রাজ্যেও এইরূপ করিয়াছি এবং নেজাম রাজ্যে যখন যাইব তখন সেখানেও ঐরূপ করিব'। এরপর সালিভ্যান সাহেব ভারতীয়দের বিরুদ্ধে অযোগ্যতার অভিযোগের জবাব দিয়েছেন—

বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর। ১৬ মার্চ ১৮৪৩

…আপনারা কহিতে পারেন যে সেখানকার লোকেরা অতি দুর্নীতি অতএব তাহাদিগকে কোন কর্ম্মে বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। আমি একথা অস্বীকার করি না, আমার বোধ হয় সেই সকল লোকের মধ্যে অধিক দুর্নীতি মনুষ্য আছে, কিন্তু কি জন্য এরূপ হইল? ইহার কারণ এই হইবেক, ইউরোপীয় লোকেরা অধিক বেতন প্রাপ্ত হওয়াতে তাহাদিগের কুকর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় না,

তদ্দেশীয় লোকেরা যে সকল কর্ম্মে নিযুক্ত আছে তাহারদের উপযুক্ত বেতনের তৃতীয়াংশও তাহারা পায় না সুতরাং তাহাদিগের কুকর্ম্মে অধিক প্রবৃত্তি হয়।

[সা. বা. স. ৩। ১৩৮]

এরপর সালিভ্যান সাহেব ভারতীয়দের চরিত্রের দুটি একটি ভালো দিকেরও উল্লেখ করেন। ১৮৩৩-এর চার্টারের উল্লেখ করে তিনি বলেন যে বাঙলাদেশে যদি-বা কিছু-কিছু লোক চাকরি পেয়েছে, মাদ্রাজে তাও হয় নি।

কোম্পানির সভার এই পূর্ণ বিবরণ পাওয়ার আগেই স্পেক্‌টেটর বাঙালিদের চাকরির ব্যাপারে বেশ আইনের তর্ক তুলেছিল :

বেঙ্গল স্পেক্টেটার। ১৫ জানুয়ারি ১৮৪৩

···চার্টরে বাঙ্গালিদিগের হস্তে তাবৎ প্রকার রাজকীয় কর্ম্মার্পণের বিধি আছে, তাহার বিপরীত ব্যবহারে অবশ্য অন্যায় হয়···। তাহারা স্মরণ করিবেন যে আত্মবাঞ্ছা পুরাণার্থে প্রধান নিয়ম-কারিদিগের আজ্ঞার বহির্ভূত কর্ম্ম করিতেছেন···। ভারতবর্ষীয় লোকদিগের মধ্যে কেহ২ কুব্যবহারী ও কর্ম্মাক্ষম ইহা সত্য কিন্তু ইহাই যদি তাহাদিগের প্রতি কর্ম্মার্পণ না করিবার কারণ হয় তবে সিবিল সরবেণ্টদিগের মধ্যেও অনেকের ঐ প্রকার দোষ দেখাইয়া দিব।···এতদ্দেশীয়-দিগের ভাষা ও স্বভাব ও রীতি ইত্যাদির উত্তম জ্ঞান ব্যতিরেকে বিচার ও রাজস্ব বিষয়ক কর্ম্ম সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে না, সিবিল সরবেণ্টরা যে ঐ সকল বিষয় উত্তমরূপে বুঝিতে পারেন তাহাতে আমাদিগের সন্দেহ হয়।

[সা. বা. স. ৩। ১৩১-৩২]

এই আলোচনাতে আইনের এই যুক্তিতেই বেণ্টিঙ্ক যে ১৮৩৪ সালে সিভিল সারভেণ্টদের কাজকর্মের অনুসন্ধানের আদেশ দিয়েছিলেন তা উল্লেখ করে বলা হয়, বোর্ড অব ডিরেক্টর্স-এর আদেশে এই অনুসন্ধান ১৮৩৬ সালে স্থগিত রাখা হয়। '···বাঙ্গালিদিগের আশ্রয় ব্যতিরেকে সিবিলিয়নের কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয় না বিশেষত যাহারা নূতন তাহারা বাঙ্গালি আমলাদের সাহায্য ব্যতীত ছয় মাসও কর্ম্ম করিতে পারেন না।'

সিভিল সারভিসের বিপক্ষে ইংল্যাণ্ডের পত্র-পত্রিকা থেকে বিস্তৃত উদ্ধৃতিও এই রচনায় ব্যবহার করা হয়েছে। এই আলোচনার শেষাংশে সিভিলিয়ান সাহেবদের বিপক্ষে বাঙালিদের অবস্থানকে আরো সুনিশ্চিত করার জন্য বাঙালিদের ভিতরও শ্রেণীভাগ করা হয়েছে। এই শ্রেণীভাগের ভিতরে যেন নিহিত আছে—প্রধানত কলকাতার বাঙালি সমাজের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রতিই ইঙ্গিত—যে-

প্রক্রিয়ার ফলে পুরনো নায়েব-বেনিয়ান-মুৎসুদ্দি 'বাবু'দের জায়গায় ইংরেজি শিক্ষিত, নতুন চাকরিপ্রার্থী 'ভদ্রলোক' কলকাতার নাগরিক নেতৃত্ব গ্রহণ করতে চলেছে :

> প্রায় সকল সিবিলিয়নেরা এতদ্দেশীয় লোকদিগকে তুচ্ছ তাচ্ছীল্য করেন তৎকারণ এই, তাহারা মনে২ বোধ করেন যে তাহারা বিশেষ ক্ষমতাবান, সুতরাং বাঙ্গালিরা স্বাধীনতাবলম্বন করিয়া যে সকল বিষয়ের চিন্তন, অনুষ্ঠানেচ্ছা ও ফলত নির্ব্বাহ করেন তাহাতে তাহারা কদাচ উৎসাহ প্রদান করেন না, এবং যে সকল বাঙ্গালিরা স্বীয় মানরক্ষার্থে তাহাদিগের নিকট সামান্য শিষ্টতাচরণ করেন তাহাদিগের অপেক্ষা যে২ ব্যক্তিরা অতি নম্রতা পূর্ব্বক সেলাম, কৃতাঞ্জলি ও চর্ম্মপাদুকা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সম্মুখে উপস্থাপন ও নানা প্রকার তোষামোদজনক বাক্যদ্বারা তাহাদিগের গর্ব্ববৃদ্ধি করেন তাহারাই অধিক প্রিয় হয়েন। আমরা শুনিতে পাই, সামান্য কথোপকথন, পত্রাদিলিখন এবং রাজকীয় কর্ম্মেতে সিবিলিয়নেরা বাঙ্গালিদিগের প্রতি সর্ব্বদা তাচ্ছীল্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, অনুমান হয় যদবধি বাঙ্গালি এবং সিবিলিয়ানদিগের সমান পদ না হয় তদবধি এরূপ ব্যবহারের অন্যথা হইবেক না।
>
> [সা. বা. স. ৩। ১৩৪]

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সভার পুরো বিবরণ জানার পর ২৪ মার্চের 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর'-এর লেখাটিতে স্যালিভান সাহেবের বক্তৃতার প্রধান যুক্তি তিনটি পরপর সাজিয়ে জোর দেয়া হয় এ-বিষয়ে টাউন হলে যে-সভা আহ্বান করা হয় তার ওপর। সেই সভা কী ভাবে চলা উচিত ও কী ভাবে সেখানে বক্তব্য রাখা উচিত, 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর' এই সব বিষয় নিয়ে রীতিমত বিব্রত।

বেঙ্গল স্পেক্টেটর। ২৪ মার্চ ১৮৪৩

> ...ঐ সভাতে যেরূপ বুদ্ধি, জ্ঞান, অপ্রগল্‌ভতা, সুতর্ক প্রকাশিত হইবেক তদনুসারে তাহার ফল জন্মিবেক। আমরা আরো অনুরোধ করি যে ঐ সভাতে যেন কলহ ও রাগ প্রকাশ এবং বৃথা বাদানুবাদ না করেন। উক্ত সভা আহ্বানের তাৎপর্য্য এই যে ইংরাজেরদের রাজ্যে উচ্চ পদাভিষিক্ত সিবিল সরবেণ্টেরা যে২ সম্মান ও অধিক বেতন প্রাপ্ত হন এতদ্দেশীয়দের তাদৃশ পদপ্রাপ্তিতে যে সম্পূর্ণ অধিকার আছে তদ্বিষয়ের বিবেচনা হইবেক, কিন্তু যৎকালে অধিকারের কথা উল্লেখ হইবেক তখন যে২ গুণদ্বারা অধিকারী হওয়া যায় এতদ্দেশীয়দিগের ঐ সকল গুণবত্তা দর্শান উচিত।...
>
> [সা. বা. স. ৩। ১৪৩]

সিভিল সারভেন্টদের সমানাধিকারের দাবিতে কিছু ইংরেজের সমর্থনে এই নানা ধরনের চেষ্টা সত্ত্বেও ১৮৩৩-এর চার্টারের ভারতীয়দের চাকরির যে-সম্ভাবনার সঙ্কেত ছিল তা ১৮৩৪-এ কার্যকর হয় নি। তাই ১৮৫৩তে নতুন চার্টারের সময় এই পুরনো কথা 'সংবাদ প্রভাকর' তুলতে ভোলে নি। এই সূত্রেই ১৮৫৩-র আগে আবার নতুন দাবি তোলা হয়।

সংবাদ প্রভাকর। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৮৫২

> ...বিলাতবাসি অপক্ষপাতি ভারতবন্ধু মেং সালিবন সাহেব চার্টরের ঐ কথা উল্লেখ করত এদেশের লোকের সিবিলের পদ প্রাপণ বিষয়ে বিস্তর যত্ন করিয়াছেন, অস্মদাদির দৌর্ভাগ্যক্রমে তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, যাহা হউক, এতক্ষণে এই সমস্ত বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করা অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, চার্টরের সময় প্রায় শেষ হইল, সহযোগিগণ বিশেষ অনুরাগ-পূর্ব্বক লেখনী ধারণ করুন।

[সা. বা. স. ১ । ১৮০]

সরকারি চাকরিতে সাহেবদের সঙ্গে সমতার এই দাবিতে বারবারই 'বাঙালি'-প্রসঙ্গটি প্রাধান্য পেয়েছে। একটু সরল করে তাকে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বলতে ইচ্ছেও হতে পারে। কিন্তু ইংরেজিশিক্ষিত গোষ্ঠী বাঙালিয়ানার যে-যুক্তিকে গোষ্ঠীগত স্বার্থে ব্যবহার করছে, তা 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' নয়, অপরদিকে একটি গোষ্ঠীরই 'জাতি'র সমার্থক হওয়ার চেষ্টা। পরবর্তীকালে ব্যাপকভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠীস্বার্থেই যে তথাকথিত 'জাতীয়তাবাদ'কে ব্যবহার করা হয়েছে এখানে তারই যেন সূচনা।

'বেঙ্গল স্পেকটেটর' থেকে উদ্ধৃত উদাহরণগুলিতে দেখা গেছে ১. চার্টারের নির্দেশ বাঙালিদের পক্ষে, ২. বিশেষ করে শিক্ষিত বাঙালিদের সঙ্গে সিভিল সারভেন্টদের খারাপ ব্যবহার ও তাদের ক্ষমতার স্বীকৃতি না দেয়া ও ৩. সিভিল সারভেন্টদের সমযোগ্যতা প্রমাণের জন্য সভাসমিতিতে বাঙালির 'প্রায়-সাহেবদের' মতোই চলা-বলা অভ্যেস করা—এই প্রসঙ্গগুলি বেশ আবেগের সঙ্গেই বারবার এসেছে। ১৮৪৮-এ 'সংবাদ প্রভাকর'-এ এই বাঙালিয়ানার যুক্তি বেশ বিস্তারিতই এসেছে, বাঙালি স্বভাবের গুমরে-

সংবাদ প্রভাকর। ২৪ বৈশাখ ১২৫৫ [এপ্রিল ১৮৪৮]

> ইংরাজরা নানা বিষয়ে বাঙ্গালিদের সহিত দুর্ব্ব্যবহার করিতেছেন, অথচ বাঙ্গালিরা দয়ালু ও সারল্য স্বভাববশতঃ তাঁহারদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে ক্রটি করেন না। ইউনিএন ব্যাঙ্কের বিষয়ে ইংরাজ জাতির অসদাচরণের ব্যাপার

কাহারো অগোচর নাই। কিন্তু দেখুন বাঙ্গালি ধনি মহাশয়েরা তাঁহারদিগের কর্তৃক বিবিধপ্রকার অত্যাচার সহ্য করিয়াও এ পর্য্যন্ত সম্যক্ প্রকারে সাধুতা প্রকাশ করিতেছেন।

[সা. ব়া. স. ১। ১৬৭]

এরপর লেখক এসাইনি অফিসের আর একটি জালিয়াতির ব্যাপার উল্লেখ করেছেন। 'কাকরেল কোম্পানির প্রধান অংশি মেং লারপেণ্ট সাহেব' পামর কোম্পানি নিয়ে এক জালিয়াতি করেন, তার সঙ্গে জয়েণ্ট এসাইনি ছিলেন বলে আশুতোষ দেব পামর কোম্পানিকে দুই লক্ষেরও বেশি টাকা শোধ দিতে বাধ্য হন, আর 'লারপেণ্ট সাহেব…জাহাজযোগে বিলাতে পলায়নপর হইয়াছিলেন'. তাঁর নামে ওয়ারেণ্ট বের করে দেব বাবু তাঁকে ধরে আনেন :

কিন্তু দেববাবুর কি সৎ স্বভাব, এবং করুণাপূর্ণ অন্তঃকরণ কয়েকদিন হইল, ঐ বঞ্চক সাহেব বাবুদিগের বাটীতে আসিয়া অত্যন্ত কাতরতা প্রকাশ করাতে বাবুরা তাহাকে নিষ্কৃতি দিয়াছেন, সাহেব এইক্ষণে সাধুর ন্যায় সন্তোষচিত্তে ড্যাং ড্যাং করিয়া জাহাজে চড়িয়া আঙ্গুল চুষিতে২ মদ্য লুষিতে২ বিলাত গমন করিবেন।… অতএব বাঙ্গালিজাতির দয়া ও সদ্ব্যবহারের প্রমাণ ইহার অপেক্ষা আর কি অধিক হইতে পারে?…

[স'. বা. স. ১। ১৬৭]

১৮৫৩ কোম্পানির চার্টার নতুন করে দেয়ার বছর। তাই তার মুখোমুখি আরো চাকরির ও কভেনেনটেড-আনকভেনেনটেড চাকুরেদের ভিতর বৈষম্য তুলে দেয়ার দাবিতে বিশেষত 'সংবাদ প্রভাকর' সাহেব-বাঙালি তুলনা এ-রকম প্রায়ই ব্যবহার করেন তীব্র ভাবে। কিন্তু বাঙালির তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্বের এই আত্মগরিমাকে চতুরতার সঙ্গেই মানিয়ে দেয়া হত ব্রিটিশ রাজত্বের প্রতি বিশ্বস্ত আনুগত্য প্রকাশের সঙ্গে। ফলে ভঙ্গিটা কখনো কখনো হত যেন অনাদৃত ভক্তের অভিমানের।

সংবাদ প্রভাকর। ৫ জুন ১৮৫১

…এতদ্দেশীয় প্রজাগণ ইংলণ্ডীয় বাহাদুরদিগের সুচারু সুনির্ম্মল বিচার সলিল সুশীতল বোধ করিয়া তথায় অবগাহন করিলেন। কিন্তু তাহাতে শান্তি হইল না বরং দাহ বাড়িতে লাগিল, দেখ রাজার এক প্রধান ধর্ম্ম অপক্ষপাতী হইবেন, বর্ত্তমান ভূপতিরা তাহার সম্যগ্রূপ অন্যথা করিয়া থাকেন।

প্রথম আপন দেশীয় মানুষ অপরাধ করিলে তাহার প্রায় এক মুদ্রা দণ্ড হয়, আর এতদ্দেশীয়দিগের দোষে যত ইচ্ছা করেন ততই দণ্ড করিতে পারেন,…

দ্বিতীয়। এদেশের সুনিপুণ মানুষ যে কার্য্যে একশত টাকা বেতন পান সেই কর্ম্মেই একজন যৎসামান্য ইউরোপীয়কে সহস্র মুদ্রার অধিক বেতন দেন।

তৃতীয়।...বাঙ্গালিদিগের বিচার ইংলণ্ডীয়েরা করিবেন কিন্তু তাঁহারদিগের বিচার ইহাঁরদিগের নিকট হইবে না।

[সা. বা. স. ১ । ১৭৫]

সংবাদ প্রভাকর। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৮৫২

...ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাছুরকে বঞ্চনা পূর্ব্বক গাভীর দুগ্ধ দোহন করত সেই দুগ্ধে হস্তির মস্তি বৃদ্ধি করিতেছেন,...বিলাতে বোর্ড অফ কাণ্ট্রোল এবং কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স নামক দুই সভা আছে,...তাঁহারা যাহা করেন তাহাই হয় ...রাজপুরুষেরা চিহ্নিত এবং অচিহ্নিত কর্ম্মচারী এই দুই ভিন্ন শ্রেণী করিয়াছেন, ইহা কি যুক্তি মতে রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়াছে, বিলাতের লোকেরা এখানে আসিয়া প্রচুর বেতন গ্রহণ করত কেনই বা আমারদিগের উপর প্রভুত্ব করেন, তাঁহারা পরমসুখে রোহিত মৎস্যের মুণ্ডু খাইবেন আমরাই বা কেন অবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট পরিত্যক্ত কণ্টক খাইয়া ক্লেশ প্রাপ্ত হই।

[সা বা. স. ১ । ১৭৯]

বিষয় তো চাকরি, সে কারণেই এত শাসনতান্ত্রিক ব্যাখ্যান, লাগসই লোকায়ত তুলনা। ঐতিহাসিক বোধের এই সম্পূর্ণ বিপর্যয়ের ফলেই এমন সমমর্যাদার দাবি-দাওয়ার পর সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্যও ঘোষিত হয় একটু বেশি অকুণ্ঠিত,

সংবাদ প্রভাকর ২৮ চৈত্র ১২৫৯ (এপ্রিল, ১৮৫৩)

আমরা নিয়তই রাজার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকি, বিশেষতঃ ব্রিটিশ জাতীয়েরা ভারতবর্ষান্তর্গত বঙ্গদেশবাসি প্রজাদিগের ন্যায় নিতান্ত নির্ব্বিরোধি প্রভুভক্ত প্রজা কুত্রাপি প্রাপ্ত হইবে না, রাজদ্রোহিতা কাহাকে বলে ইহারা স্বপ্নেও তাহা জ্ঞাত নহে, ঐ বঙ্গদেশবাসি বাঙ্গালি শব্দে কেবল আমরাই বাচ্য হইতেছি, অপরাপর সকল জাতীয় প্রজার অপেক্ষা আমরাই অধিক সুসভ্য এবং কৃতবিদ্য, রাজার সহিত অধিক আত্মীয়তা আমরাই করিয়া থাকি, রাজনিয়মের দোষাদোষ আমারদিগের দ্বারা আন্দোলিত হইয়া থাকে...।

[সা. বা. স. ১ । ১৯২]

বাংলাদেশে ব্রিটিশ রাজত্বের প্রতিষ্ঠার সূচনা ও বাংলাদেশই ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির অভিঘাতের প্রথম গ্রাহক সুতরাং চাকরিতে বাঙালিদের অগ্রাধিকার থাকা উচিত ; ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের অধিবাসীদের

তুলনায় বাঙালিরা বিশিষ্ট ও ইংরেজদের ঘনিষ্ঠ—এইসব যুক্তি দেয়ার জন্য ইংরেজি শিক্ষিত উচ্চ চাকরি প্রার্থী এক গোষ্ঠী বাংলাদেশে তখন তৈরি হয়ে গেছে। ৪০-এর দশকের উপান্ত্য থেকেই বাঙালির সংবাদ-সাময়িকপত্রে ধর্মীয়-সামাজিক মতপার্থক্য নিরপেক্ষ ভাবেই এই কথা বারবার ঘুরে ফিরে আসে,

> আমরা স্থিররূপে প্রণিধানপূর্ব্বক বিবেচনা করিলাম যে প্রধান প্রধান রাজকার্য্য পরিচালনার্থ এতদ্দেশীয় সৎকুলোদ্ভব সুযোগ্য ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করা উচিত।

[সা. বা. স. ১। ১৯২]

ইংরেজি জানা চাকরিপ্রার্থী নাগরিক এই বাঙালিরা তাঁদের কর্মজীবনের ব্যক্তিগত অভিলাষকেই ভারত-ব্রিটিশ সম্পর্কের নিরিখ করে ফেলেন বটে কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে এও বোঝেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণে ও প্রতিষ্ঠাতেই তাঁদের সেই উচ্চাশা মিটতে পারে মাত্র। তাই তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে এই আপাতবিপরীত মিলে যায় প্রায় এই ছকে—ব্রিটিশ সম্রাটের প্রতি আনুগত্য, বোর্ড অব কণ্ট্রোলও কোর্ট অব ডাইরেক্টার্সের সমালোচনা, এদেশের সাহেব-আমলাদের বিরোধিতা। ভারতের শাসনব্যবস্থায় অপ্রত্যক্ষ মহারাণী তাই বাঙালি চাকরিপ্রার্থীর কাছে প্রায় সবচেয়ে প্রত্যক্ষ, যেন তাঁর প্রতি সন্তানতুল্য আনুগত্যের শপথেই সাহেবদের সমতুল্য হওয়ার অধিকার অর্জিত হয়। মহারানী ভিক্টোরিয়া যেন আর মেমসাহেব নন।

চাকরিতে সাহেবদের সমান অধিকারের দাবি যত জোরের সঙ্গে তোলা হয়েছে প্রায় তত জোরের সঙ্গেই এই ইংরেজিশিক্ষিত নাগরিক বাঙালিরা ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতির ও ভাষার লোকজন থেকে নিজেদের পৃথক করে নিয়েছে। বাংলা কাগজে অন্য প্রদেশের ও অন্য ভাষাভাষীর চাকরির কথা তোলাই হয় নি। 'ভারতীয়' আর 'বাঙালি' সমার্থকই ছিল, আবার প্রয়োজনে বিপরীতার্থকও। এমনিতেই ত মুসলমান শাসনের বদলে সাহেবদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে সাহেবরা গোঁড়া হিন্দুদের কাছে ছিলেন প্রায় গোরা-অবতার। ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষার লোকজনের চাইতে আগে ইংরেজি বলতে-লিখতে পারতেন বলেও বাঙালিরা মনে মনে ইংরেজদের ঘনিষ্ঠ ভাবতেন নিজেদের। যেমন তাঁরা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের বলতেন 'গবর্ণমেণ্টের পোষ্যপুত্র', তেমনি তাঁরা অন্যান্য ভারতীয়দের তুলনায় নিজেদের জন্যও ঐ একই সুবিধে দাবি করতেন। সিপাহি বিদ্রোহে হিন্দুরা যোগ না দেওয়ায় ও শহুরে বাঙালিরা সাহেবদের পক্ষে থাকায় বাঙালি হিন্দুর এই অগ্রাধিকারের ইচ্ছা প্রায় আবদারে পরিণত হয় ১৮৫৮ নাগাদ। আমরা এখানে

'সংবাদ প্রভাকর' থেকে একটি উদাহরণ দিচ্ছি। এই সম্পাদকীয় লেখাটির উপলক্ষ হচ্ছে সিভিল-অডিটরের পদে যে-সাহেব ছিলেন তিনি অবসর নিলে 'তাঁহার সহকারী কর্ম্মচারী বাবু ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তৎপদে অভিষিক্ত হইয়া মাসিক ১৫০০ টাকা বেতন প্রাপ্ত হইবেন।'

এই সংবাদটুকু দিয়েই দ্বিতীয় প্যারা থেকে, 'জগদীশ্বরের নিকট একাগ্রচিত্তে' সম্পাদকের 'প্রার্থনা', 'এই সংবাদটি সংপূর্ণরূপেই সত্য হউক, 'আমারদিগের নবীন গবর্ণমেণ্ট এরূপ অপক্ষপাতি নিয়োগদ্বারা যথার্থরূপ রাজধর্ম্ম প্রতিপালিত করুন, তাহা হইলে শ্রীশ্রী মতি রাজ্যেশ্বরীর ঘোষণাপত্রের অঙ্গীকার রক্ষা করা হয়।' আর, এরপর এক অস্থির দৈর্ঘের বাক্যে ভারতবর্ষের তথাকথিত ঐতিহ্যাগত ধারণায় রাজা কে, প্রজা কে ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু প্রশংসাসূচক নীতিকথা, 'রাজার নিকট সর্ব্বসাধারণ প্রজামাত্রেই সমান', 'রাজা…শাদা ও কালো বলিয়া কিছু মাত্রই ইতরবিশেষ করিবেন না', 'জগদীশ্বরের প্রতিনিধিস্বরূপ', ইত্যাদি। আর তারপরই আদর্শ প্রজা হিশেবে নিজেদের সাফাই,

সংবাদ প্রভাকর। নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৮৫৮

> …আমরা ভারতবর্ষবাসি রাজহিতাভিলাষি নিতান্ত রাজানুগত প্রজা, নিরন্তর কেবল রাজার মঙ্গল প্রার্থনাই করিয়া থাকি, অস্মাদাদির ন্যায় রাজভক্ত অনুরক্ত নির্ব্বিরোধি প্রজা আর কুত্রাপিই নাই, আমরা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বি একদেশীয় ভিন্নজাতীয় প্রজা হইয়া ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বি ভিন্নজাতীয় ভিন্নদেশীয় রাজপুরুষদিগের সহিত আন্তরিক-কৃতজ্ঞতা সহকারে যদ্রূপ আনুগত্য ও সরল সাধুব্যবহার করি, কোনো স্বদেশীয় স্বজাতীয় স্বধর্ম্মাবলম্বি প্রজারা বোধকরি, স্বজাতীয় স্বদেশীয় স্বধর্ম্মাবলম্বি রাজার সহিত কখনই তদ্রূপ সদ্ব্যবহার করেন না। একশত বর্ষ গত হইল, ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা এই সুদীর্ঘ ভারতবর্ষে প্রচুর প্রভুত্ব প্রচার করিয়া ক্রমশই উন্নত হইয়া আসিতেছেন। এই শতবর্ষের মধ্যে কত বর্ষের কত প্রকাণ্ড ব্যাপার হইয়াছে তাহার বিস্তার বর্ণনা কি করিব? কিন্তু ঐ শতবর্ষের ভিতরে এই প্রকাণ্ড বর্ষে গত বর্ষের ন্যায় প্রকাণ্ড ভয়ানক কাণ্ড আর কখনই সংঘটিত হয় নাই কিন্তু আনন্দের বিষয় এই যে, এতদ্রূপ বিষমতর বিদ্রোহ বিধায়ক বিলাপ-বিঘটিত বিষাদ-বিশিষ্ট বিপদের ব্যাপারে এক ব্যক্তিও বাঙালি বিযুক্ত হয় নাই এবং বিদ্রোহিদলভুক্ত হিন্দুর সংখ্যাও অতি অল্প।… হিন্দু, বিশেষত হিন্দুর মধ্যে বাঙালি জাতিরা একান্ত প্রভুভক্ত, এ বিষয়টি সপ্রমাণ করণের কিছুমাত্রই অপেক্ষা করে না, সর্ব্বসাধারণ দূরে থাকুক রাজপুরুষদিগ্যে

> মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে হবেই হবে। শ্রীশ্রীমতি রাজ্যেশ্বরী বিশ্বমাতা বিক্টোরিয়া বিলাতের প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণ, ভারতবর্ষের গবরণর জেনরেল লার্ড কেনিং বাহাদুর এবং অপরাপর রাজপুরুষ মহোদয়েরা একথা বারম্বার শ্লাঘাপূর্ব্বক অঙ্গীকার করিয়াছেন, অতএব প্রকৃত রাজভক্ত কৃতজ্ঞ নাম ধারণ করণের অপেক্ষা আমারদিগের অধিক সুখ-সৌভাগ্য ও আনন্দের ব্যাপার আর কি আছে?
>
> [সা বা. স. ১ । ২৪৮ ৪৯]

দেড়হাজার টাকা মাইনের একটি চাকরি বাঙালিবাবু পাবেন সেই কারণে মহাভারতের অনুশাসনপর্বের রাজাদর্শ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককালে প্রজা হিশেবে 'হিন্দু', বিশেষত হিন্দুর মধ্যে বাঙালি জাতির ব্যবহার পর্যন্ত প্রমাণ হিশেবে জাহির করতে গেলে কোথাও অনুপ্রাসের গমকে ঐতিহাসিক নৈষ্কর্ম্য (সিপাহি বিদ্রোহে 'হিন্দু', বিশেষত হিন্দুর মধ্যে 'বাঙালি' যোগ দেয় নি) প্রায় ঐতিহাসিক কর্মোদ্যম হয়ে উঠতে চায় যেন, আবার সঙ্গে-সঙ্গে আনুগত্যপ্রকাশের প্রগল্‌ভতায় মুখের ভাষায় ক্রিয়াপদই বেরিয়ে পড়ে।

নিজেদের 'ভারতবর্ষবাসি' বলে পরিচয় শুধু এই কারণেই দেয়া যে মহারানী এই নামেই ভারতপ্রজাকুলকে চেনেন। কিন্তু তারপর থেকে, প্রথমে বাঙালি হিশেবে, পরে হিন্দু বাঙালি হিশেষে, যেন ভারতবর্ষবাসি বলতে হিন্দু বাঙালিকেই বোঝায়। এই ভাবেই চাকরিপ্রার্থী হয়ে উঠেছিল জাতির প্রতিনিধি—হিন্দু বাঙালি তার বিশ্বাসঘাতকতার দাম চাইছিল।

খ. শিল্প ব্যাবসা ও নাগরিক বাঙালি

আত্মগৌরবের অপর পিঠেই আত্মনিন্দা, বিশেষত সে গৌরববোধ যখন সমাজ-ইতিহাসের কার্যকারণের দ্বারা অর্জিত নয়। বাঙালির আর্থিক উন্নতি কিসে এই প্রশ্নের উত্তরে মাঝেমাঝেই শিল্প ও বাণিজ্য, বিশেষত বহির্বাণিজ্যের প্রসঙ্গ এসেছে। চাকরিতে সাহেবদের সমতার দাবিতে যেমন আত্মশ্লাঘা, শিল্প ও বাণিজ্যে ব্যর্থতার জন্যও তেমনি আত্মনিন্দা। চাকরির দাবিতে যেমন ধরে নেয়া হয়েছে মহারানীর সমস্ত প্রজারই সম-অধিকার, শিল্প-বাণিজ্যের বেলায় তেমনি ধরে নেয়া হয়েছে বাঙালির পশ্চাদপদতার কারণ যেন তার স্বভাবেই নিহিত—সাম্রাজ্যবিস্তারের কার্যকারণের ফল নয়।

১৮৩৮-এ ইয়ং বেঙ্গলদের কাগজ 'জ্ঞানান্বেষণ'-এ উপদেশ দেওয়া হয়েছে, 'এতদ্দেশীয় জনগণ স্বাভাবিক অলস ও নিদ্রা প্রভৃতি যে দোষবর্গ তাহা পরিত্যাগ

করিয়া উক্ত বাণিজ্যাদিরূপ অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্ব্বক সৌভাগ্যের বিরোধী যে কুস্বভাব তাহাকে জয় করিয়া সৌভাগ্যকে প্রবল করুন' আর তারপরই তার একটা সহজ ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা হয়েছে।

জ্ঞানান্বেষণ। ২১ এপ্রিল ১৮৩৮

…আমরা জানি এতদ্দেশীয় যাঁহারা পৈতৃক ধন পাইয়াছেন তাঁহারা সেই ধনের উত্তমরূপে ব্যবহার ত্যাগ করিয়া গবর্ণমেণ্টে অতিক্ষুদ্র কার্য্যের ভার লইয়া তাহাতেই স্বচ্ছন্দবোধ করিয়া গৃহে বসিয়া বৃথা জল্পনায় বৃথা কালক্ষেপ করেন ইহাতে ইহাদিগের সেই সকল ধনের বৃদ্ধি হইতে পারে না আর ক্রমে২ নানা কার্য্যে মূল ধন বিনাশ পায়…

এতদ্বিষয়ে অনেকের সহিত কথোপকথন হয় কিন্তু তাঁহারা বলেন যে ধন নাই আমরা কিরূপে বাণিজ্যাদিতে প্রবৃত্ত হইব। …তাঁহারা সাহেবের মুচ্ছুদ্দি হয়েন সে সাহেবকে কি টাকা দেন না আর ঐ সাহেব আপদ্‌গ্রস্ত হইলে তাহাকে কিছু দিয়া কি সেই কুঠীর মান রাখেন না এবং ঐ মুচ্ছুদ্দি মহাশয় কি ইহা দেখিতে পারেন না যে তাহার ধনে নির্ধনী সাহেব অতি ধনাঢ্য হয় আর যাঁহারা কিঞ্চিৎ সুদগ্রাহী তাঁহারা জানেন না যে আমার টাকায় সাহেব ধনাঢ্য হইবেন…

[স. সে. ক. ২। ৩৩১-৩২]

প্রায় দশ বৎসর পরে প্রায় একই ভাষায় এই একই মন্তব্য করে 'সংবাদ প্রভাকর'। সেখানে 'শিল্পবিদ্যার সূচনা না হইলে পৃথিবীর অবস্থা কদাচ উত্তম হইত না'—এর প্রমাণ হিশেবে আমেরিকা ও ভারতের তুলো দিয়ে কী করে কাপড় বানানো হয়, 'ছাপার যন্ত্রের সৃষ্টি হওয়াতে' শিক্ষার বিস্তার ঘটে, 'বনের কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া' জাহাজ বানানো হয়—এ জাহাজ দ্বারা 'বাণিজ্য কার্য্য ধার্য্য' হয়, —ইত্যাদি উদাহরণ দেয়া হয়েছে। শিল্পবিদ্যার পক্ষে আধ্যাত্মিক যুক্তিও দেয়া হয়েছে যে 'জগদীশ্বর যখন পৃথিবীকে সৃজন করিয়াছিলেন তখন তাঁহার এমত অভিপ্রায় ছিল যে আপন সৃজিত পদার্থ সকল মনুষ্যদিগের পরিশ্রমে ও বুদ্ধির কৌশলে শিল্পবিদ্যার দ্বারা পরিবর্তিত হবে। আর তারপরই আসে আত্মনিন্দার গমক।

সংবাদ প্রভাকর। ৮ জুন, ১৮৪৭

অস্মদ্দেশীয় লোকদিগের এই এক চমৎকার স্বভাব যে, তাঁহারা অল্প অর্থের

মুখ দেখিতে পাইলেই বাবু হইয়া পড়েন এবং সর্ব্বদা গোলবালিসে ঠেস্ দিয়া আলস্যের সহিত গলাগলি প্রেম করিতে থাকেন, ...

[সা. বা. স ১ । ৬৮]

এই লেখাটির ওপর জনৈক পত্রলেখকের চিঠির সূত্রে ২২ জুলাই আবার লেখা হচ্ছে, বেশ ছড়িয়ে, আত্মবিলাপের সুরে শুরু করে—'অস্মদ্দেশীয় লোকেরা মনের মধ্যে এমত ঠিক দিয়া রাখিয়াছেন যে, পরিশ্রমের নাম দুঃখ এবং আলস্যের নাম সুখ, সুতরাং যাঁহারা বিনা পরিশ্রমে অন্নদাস হইয়া অথবা যৎকিঞ্চিৎ উপস্বত্ব পাইয়া ঘরে বসিয়া কেবল বংশ বৃদ্ধি করিতে পারিলেই সুখ জ্ঞান করেন আমরা তাহার দিগ্যে কি কথা উল্লেখ করিব বিবেচনা করিতে পারি না—' ধীরে ধীরে বিশেষ বিষয়গুলি আলোচিত হয়। সেই প্রসঙ্গে আবার এক আত্মবিলাপের আবেগে প্রায় দশবৎসর আগের 'জ্ঞানান্বেষণ'-এর উদ্ধৃত অংশের ভাষাতেই প্রায় লেখা হয়,

সংবাদ প্রভাকর। ২২ জুলাই, ১৮৪৭

...যাহাদের কিঞ্চিত অর্থ আছে সাহেব কেনা রোগেই তাঁহারদিগের সর্ব্বনাশ হয়, সেই টাকায় যদি আপনারা স্বাধীনরূপে ব্যবসা করেন তবে কত সম্মান কত সৌভাগ্য হইতে পারে, তাহা না করিয়া বাবুজিরা এক ২টা সাহেব কিনিয়া বসেন, সে সকল সাহেব যখন এদেশে আইসেন, তখন তাঁহারদিগের ঐশ্বর্য্যের কথা কি বলিব, এক ছেঁড়া টুপি, পচা কাপড়ের জ্যাকেট পাণ্টুলন এবং এক কাঁচের টম্বল সম্বল মাত্র, কৌশলক্রমে কোন ব্যবসা ফাঁদিয়া বাবু কাড়িতে পারিলেই কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার আর আধিপত্যের সীমা থাকেনা...যখন কিছু থাকে না তখন কত তোষামোদ করে, পরে হৃষ্টপুষ্ট হইলেই "ডেম, বগর, লায়ার বেঙ্গালিস" ভিন্ন আব কোন কথা শুনা যায় না, ...অনেক সাহেব কাড়া বাবুকে দেখিতে পাই কহেন, "সাহেবের এখন বড় মেজাজ গরম রহিয়াছে, কাছে যাওয়া হইবে না" কেন হে বাপু এত ভয় কেন...

[সা. বা. স. ১ । ৬৯-৭০]

এরপর শিপমেণ্টের ব্যবসার কথায় আবারও বলা হল যে বিভিন্ন এজেন্সি হাউস বাঙালি বাবুর মাথায় হাত বুলিয়ে টাকা করে নেয়। আর তাতেই প্রভাকরের প্রায় রাগত উপদেশ বাঙালিরা নিজেরা কোন সমুদ্রবাণিজ্য করছে না, 'বিলাতে যাইতে না পার, সিলন, সিঙ্গাপুর, মরিচোপদ্বীপ, বোম্বে, মাদ্রাজ প্রভৃতি যে সকল স্থানে হিন্দুর বসতি আছে সেই সেই স্থানে আপনারা গমন করহ। কিন্তু সমুদ্রযাত্রায় হিন্দু শাস্ত্রের নিষেধ আছে। প্রভাকর বেশ আধুনিক বিধান বের করেন, 'জাহাজে

চড়িবার প্রতিবন্ধকতা কি ? কেবল ম্লেচ্ছ দাঁড়ি মাঝি ভিন্ন কিছুই দেখিতে পাই না, তাহাদিগের সহবাসে আহারাদি করিলে জাতি যাইবেক…হিন্দু দাঁড়ি মাঝি নিযুক্ত করুন তাহাতে আর কোন ব্যাঘাত হইবেক না।…

গ. শাসনসংগঠন—জিলা ও মফস্বল, ঘুষ ও পুলিশ

শাসনযন্ত্রের ভাষায় যাকে বলে 'ডিস্ট্রিক্টস', কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত শাসনসংগঠনের আওতায় আনা হয় যে-ব্যবস্থায় তার পত্তন ঘটে ১৮২৯ থেকে বেন্টিঙ্কের আমলে। কয়েকটি জিলা নিয়ে একটি ডিভিশন ও প্রত্যেক ডিভিশনে একজন কমিশনার—এই ব্যবস্থা শুরু হয়। এখন পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই চালু। জিলা আদালতে জিলা জজ বিচারব্যবস্থার দায়িত্বে। তাঁর কোনো শাসনতান্ত্রিক দায় থাকল না। শাসন কাজের জন্য নতুন পদ তৈরি হল। ফলে, জজ, কালেক্টর, ম্যাজিস্ট্রেট, কভেনেনটেড সিভিল সারভিসের অন্তর্গত সহকারিগণ—কমিশনারের অধীনে এঁরাই জিলা শাসন করতেন।[৩১]

ভারতীয়দের ভেতর থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর নিয়োগ শুরু হল। প্রিন্সিপ্যাল সদর আমিনের নতুন একটি পদ তৈরি হল—তার প্রধান কাজ ছিল দেওয়ানি মামলা নির্বাহের। তাঁর আদালত থেকে কলকাতার সদর দেওয়ানি আদালতে সরাসরি আপিলের নিয়ম চালু হল।

জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের পদ তৈরি হয় ও তাঁদের এক-একটি মহকুমার দায়িত্বে দেয়া হয়। ধীরে-ধীরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদেরও মহকুমার দায়িত্ব দেয়া শুরু হয়।

১৮৫৪ সাল থেকে বাংলা-বিহার-ওড়িশার জন্য লেফটেনান্ট গভর্নরের পদ সৃষ্টি করে এই প্রদেশের শাসন কর্তৃত্বকে আলাদা করে ফেলা হয়।

এই ক্রমসম্প্রসারিত শাসন-সংগঠন বাঙালি সমাজের সমস্ত দিককেই স্পর্শ করে। এই সময় থেকে বাংলা কাগজে মফস্বলের শাসনসংগঠন নিয়ে প্রায় নিয়মিত লেখা-লেখি শুরু হয়। শাসনসংগঠনের এই সমালোচনাতে ও চাকরিক্ষেত্রে সাহেব-বাঙালি অসমতার কথা বারবারই এসেছে ও সে কথা শুধু মফস্বলের শাসনব্যবস্থার প্রসঙ্গে সীমাবদ্ধ না থেকে সেক্রেটারিদের স্তর পর্যন্ত গেছে। কমিশনারদের প্রসঙ্গও প্রায়ই আসে। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও প্রধান আলোচ্য ছিল এই ক্রমবিস্তারমাণ সংগঠনে সাহেব ও বাঙালি কর্মচারীদের ভূমিকা—দেওয়ানি আদালত থেকে সেক্রেটারিয়েট পর্যন্ত।

সরকারি কাজকর্মের এই সব আলোচনারই প্রায় অনিবার্য আনুষঙ্গিক ঘুষ ও

পুলিশ। ঘুষ ছাড়া কোনো স্তরে কোনো কাজ সম্ভব নয়—সে আলোচনাতেও বাংলা কাগজের বাঙালি সমাজতত্ত্ব সক্রিয়। আর, ততদিনে সমস্ত কর্মচারীর মধ্যে পুলিশ সংখ্যার জোরে ব্যাপকতম এলাকায় সরকারের প্রতিনিধি, কোনো-কোনো এলাকায় একমাত্র প্রতিনিধি। নতুন জিলা সংগঠনের ভিত্তি এক-একটি থানাকে কেন্দ্র করেই। মহকুমারও নিম্নস্তরে এক একজন থানাদার সরকারের প্রতিনিধি হিশেবে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। জিলা বা বিভাগীয় সদরেও পুলিশই সরকারের প্রধান কর্মকারক। পুলিশের ক্ষমতার এই অনির্দিষ্ট, অবিধিবদ্ধ, কিন্তু ব্যাপকতম বিস্তার হয়ে উঠছে সদ্য সংগঠিত মফস্বলের প্রায় সবচেয়ে বড় সত্য। এই সময় সমস্ত বাংলা কাগজেই পুলিসের প্রসঙ্গ ফিরে-ফিরে এসেছে।

বেঙ্গল স্পেকটেটর। ১ সেপ্টেম্বর ১৮৪২ (চিঠি)

সকল লোকে সর্ব্বদা কহিয়া থাকেন যে সরকারী কর্ম্মকারক আমলাদিগের বেতন বৃদ্ধি করিলেই তাহাদিগের অর্থ তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইয়া উৎকোচ গ্রহণের ব্যাপার রহিত হয়।

আমার বোধ হয় যে এ যুক্তি যথার্থ ও প্রবল নহে, কারণ যে সকল ব্যক্তিরা উৎকোচ অন্যায়াচরণের প্রধান শিক্ষালয় স্বরূপ মফঃসল কোর্টে বহুকাল পর্য্যন্ত সুশিক্ষিত হইয়া উৎকোচ গ্রহণ বিষয়ে বিশেষ পারগ ও লুব্ধ হইয়াছেন তাহা-দিগের অধিক বেতন বৃদ্ধি হইলেই যে ঐ লোভ যাইবেক ইহা কদাচ সম্ভাব্য নহে, এবং অধিক বেতনে যে উৎকোচের লোভ নিবৃত্তি হয় না ইহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে।

[সা. ব. স. ৩। ১০০]

এরপর পত্রলেখক কয়েকটি বাস্তব উদাহরণ দিয়েছেন। উদাহরণ নির্বাচনের মধ্যেই নতুন আদালত ও কাছারি সংগঠিত হওয়ার সময় এগুলির সঙ্গে দেশীয় লোকের সম্পর্কের একটি আঁচ পাওয়া যায়।

১. গবর্নমেণ্ট গেজেটে ঘুষ নেয়ার জন্য মুন্সেফকে শাস্তি দেয়ার খবর বেরিয়েছে। পত্রলেখক দুজনকেই চেনেন, তা বোঝা যায়। তাদের মধ্যে একজন আগে কোর্টে কম মাইনেতে কাজ করত ও ঘুষ নিত। গবর্নমেণ্ট তাকে মুন্সেফ করেন এই আশায় হয়ত বা সে তা হলে আর ঘুষ নেবে না। কিন্তু তবু সে ঘুষ নেয়ায় পত্রলেখকের বক্তব্যই প্রমাণিত হল।

২. দেশীয় লোকদের মধ্যে যাঁরা সৎ তাঁরা গবর্মেণ্টের উচ্চপদে যেতে চান। এমনি একজন সেরেস্তাদারের কথা উল্লেখ করে পত্রলেখক লিখেছেন, সেই ভদ্রলোক

মুন্সেফ হতে চান না কারণ মুন্সেফ না হলে চলবে না অথচ মুন্সেফ হয়ে ঘুষ নেয়া অন্যায়, 'বেতনের অল্পতার জন্য সদর আমীনী পদও তদ্রূপ', 'ডেপুটি কালেক্টরী বাবদ তাঁহার পরিশ্রম পোষায় না'… ।

৩. বহরমপুর ও রঙ্গপুরের মাঝামাঝি একজন সৎ ও ধার্মিক সদর আমীন ছিলেন। কিন্তু তাঁহার আদালতে যে একজন পেস্কার আছেন তাহার তুল্য ধূর্ত ও শঠ সচরাচর দেখা যায় না।

এই চিঠি সম্পর্কে আপত্তি জানিয়ে ১ অক্টোবর আর-একটি চিঠি প্রকাশিত হল। তাতে পত্রলেখকের বক্তব্য 'অধিক বেতনভোগি আমলাদিগের' সম্পর্কে হয়ত বেশি মাইনে সত্ত্বেও ঘুষ নেয়ার অভিযোগ সত্য কিন্তু যারা সরকারি কাজে ভবিষ্যতে যোগ দেবে তারা যদি দেখে যে ঐ মাইনেতেই তাদের চলে যায় ও ঘুষ না নিলে চাকরির উন্নতি হয় 'তখন তাহারা অবশ্য সৎ হইবেক'। এর সমর্থনে পত্রলেখক সাহেবদের উদাহরণ দেন, 'পূর্ব্বে যখন সিবিল সরবেণ্টদিগের অল্প বেতন ছিল তখন তাঁহারাও ইদানীন্তন এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারিদিগের ন্যায় কুকর্ম্ম করিতেন।' এরপর আগের চিঠির উদাহরণগুলির উত্তর দিয়ে শেষ ঘটনাটি সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'ইহা নিশ্চয় কহিতে পারি যে সিবিল সরবেণ্ট অপেক্ষা (অর্থাৎ শপথ বিনা কর্ম্মে প্রবৃত্ত), কর্ম্মকারকেরা অধীনস্থ আমলাদিগের কার্যাদির অনেক তদারক করেন।' কভেন্যান্টেড চাকরিতে ভারতীয় নিয়োগের অধিকারের দাবিতে পত্রলেখক দেশীয় কর্ম্মচারীদের ঘুষ নেয়ার পক্ষে দুই-দুইবার জোর যুক্তি দেন। একবার চিঠির আরম্ভে

বেঙ্গল স্পেকটেটর : ১ অক্টোবর ১৮৪২

…মফঃসলে যে সকল ব্যক্তিরা কর্ম্ম করে তাহারা অন্য লোকের নিকট হইতে উপরিবৎ কিঞ্চিত যাহা প্রাপ্ত হয় তাহাই তাহাদিগের শ্রমের বেতন, গবর্ণমেণ্ট হইতে যে বেতন পায় তাহাতে পরিশ্রম পোষায় না…

আরও একবার চিঠির শেষে

…অল্প বেতনভোগি আমলারা কুকর্ম্ম করিয়াই আপনাদিগকে প্রতিপালন করেন ও তাহাদিগের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা সে সকল কর্ম্মের তাদৃশ অনুসন্ধান করেন না এ সমস্ত বৃত্তান্ত গবর্ণমেণ্ট উত্তমরূপে অবগত আছেন। হে মহাশয় গবর্ণমেণ্ট সিবিল সরবেণ্টদিগকে যে বেতন প্রদান করেন তাহাতে অল্পকালের মধ্যে তাহারা ধনসঞ্চয় করিয়া ভাগ্যবন্ত হয় কিন্তু ঐ সিবিলিয়ানদিগের অধীনে যাহারা কর্ম্ম করে তাহাদিগকে যে বেতন দেন তাহাতে তাহাদিগের জীবন-

ধারণও হয় না, অতএব এদেশের লোকেরা যে উৎকোচ গ্রহণাদিরূপ কুকর্ম্ম করে তাহা কেবল তাহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ কুঅভ্যাস জন্য নহে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বেতনদানের যে কুরীতি করিয়াছেন তাহাতেই হয় সুতরাং বেতন বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ঐ সকল মন্দ ব্যবহার কখনই শুধরাইবেক না।

[সা. বা. স. ৩। ১০৬-১০৭]

ঘুষ নেয়ার প্রসঙ্গ বারবারই আসে।

১৮৫৬তে লর্ড ক্যানিং এক নিয়ম জারি করেন যে মামলা-মোকদ্দমার আগে যাদের মামলা তাদের কেউ সরকারের সেক্রেটারি বা সমপদমর্যাদার কোনো কর্মচারীর সঙ্গে দেখা করতে পারবে না। এ-বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে 'সম্বাদ ভাস্কর' সরকারি কর্মচারীদের ঘুষ নেয়ার কথাটিই এনেছে। আর সেই মন্তব্যের সুযোগে সাহেব কর্মচারীদের ঘুষ নেয়ার ব্যাপারটিকেই প্রাধান্য দিয়েছে, যেন এই পরোক্ষ উপায়ে বাঙালি কর্মচারীদের ঘুষের দায় থেকে কিছু অব্যাহতি জুটিয়ে দেয়া হয়।

সম্বাদ ভাস্কর। ১৩ মার্চ ১৮৫৬

বিচারস্থানে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে বাদি প্রতিবাদি কেহ সেক্রেটরী প্রভৃতি প্রধানদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন না ইহাতেই অনুভব হয় শ্রীযুক্ত লার্ড স্বদেশে থাকিতে শুনিয়াছেন প্রধানেরা বাদি প্রতিবাদির নিকট হস্ত পাতেন পূর্ব্ব২ ডেপুটি গবর্ণর প্রভৃতি অনেক এই কাজ করিয়া গিয়াছেন··· প্রধানদিগের সহিত বাদি প্রতিবাদিগণের সাক্ষাতের অপেক্ষা নাই, তলে২ চিরকুটে চিরকুটেই আদান প্রদান সম্পন্ন হয়···শ্রীযুক্ত লার্ড যদি বাছনী করিতে আরম্ভ করেন তবে লোম বাছিতে২ কম্বল যেমন হইয়া যায় সেই কাজ ঘটিয়া উঠিবে···। এই যে গবর্ণমেণ্টের বাড়ীটী ঐ বাড়ীটীও সামান্য বাড়ীটী নয় ইহার প্রতি কুঠরীতে নানাপ্রকার কল আছে, সেই সকল কলে জলের ন্যায় টাকা যাতায়াত করে কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সে টাকা দেখিতে পান না···।

[সা. বা. স. ৩। ৩১০-১১]

সরকারের দ্রুত প্রসরমাণ শাসন-সংগঠন মফস্বলে জিলা স্তর পর্যন্ত কী ভাবে বিস্তৃত হচ্ছে সে-বিষয়ে বাংলা সাংবাদিকতার এক ধরনের বিশেষ দৃষ্টিই ছিল। মফস্বলের বাঙালি কর্মচারীরা ঘুষ খায় কিনা ও কী ভাবে খায়। ঘুষ খাওয়ার যুক্তি কী, মফস্বলে যে-ভাবে বিচারব্যবস্থা কার্যকর করা হচ্ছে তাতে সাধারণ মানুষের সুবিধে-অসুবিধে কী, এ-বিষয়ে যেমন বারবার মন্তব্য করা হয়, তেমনি

আবার মফস্বলের সরকারি অফিসগুলি নিয়েও প্রায়ই লেখা হয়েছে। সরকারি খরচ কমাবার জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা নেওয়া হয়। যে-সব ব্যবস্থায় সাহেব কর্মচারী-দের অসুবিধে, বাংলা কাগজে সেগুলি সমর্থন করা হয়েছে। কিন্তু যেগুলিতে দেশীয় কর্মচারীদের অসুবিধে সেগুলির বিরোধিতা করা হয়েছে।

সংবাদ প্রভাকর। ২৮ চৈত্র ১২৫৯ (এপ্রিল, ১৯৫৩)

…সংপ্রতি "ষ্টেসনরী" অর্থাৎ কাগজকলমাদির ব্যাপার অতি চমৎকার হইয়াছে, সমুদয় মফঃসল কার্য্যালয়ে জঘন্য সামগ্রী-সকল প্রেরণ করিয়াছেন, পূর্ব্বে প্রত্যেক আমলা ও কেরাণি লোকেরা দস্তার কলমদান, দুইটা দস্তার দোয়াৎ, হাড়ের-বাঁটের ছুরী, ভাল কলম ও ভাল কাগজ ইত্যাদি প্রাপ্ত হইতেন, ইদানীং ঋণের ঝোঁক ঘাড়ে পড়াতে ব্যয়ের লঘুতা করণ কারণ তাহার পরিবর্ত্তে যৎসামান্য কাঠের কলমদান, মাটির দোয়াৎ, কাঠের-বাঁটের ছুরী, ওয়াস্তির কলমের বদলে মড়া-পোড়ানে খাঁকড়ার কলম, (যাহা গঙ্গা-তীরে পড়িয়া থাকে) এবং আর আর দ্রব্যও ঐরূপ কুৎসিত দিয়াছেন।

[সা. বা. স. ১। ১৯২]

এই আপত্তির ভিতরে কি কোম্পানির ব্যবস্থার সমালোচনা নিহিত নাকি নতুন ধরনের শাসন-সংগঠনে বাঙালি কেরানি যে-নতুন উপকরণ ভোগে অভিজ্ঞ হয়েছে—তারই অধিকার রক্ষার চেষ্টাই এ লেখার উদ্দেশ্য? কেরানি বাবুর নতুন টেবিলের নতুন সাজরক্ষার দায়েই সরকারের ব্যয়কুণ্ঠার এমন সরব সমালোচনা।

শাসনসংগঠনের সমালোচনায় বাংলা সংবাদপত্রে এর চাইতে গভীরতর বিষয় উত্থাপন হয়ত কিছুটা অসম্ভবও ছিল কারণ সেই শাসনসংগঠন পরিকল্পনায় বা কার্যকর করায় বাঙালিদের কোনো ভূমিকা থাকতেও পারে না, ছিলও না। সেখানে বাঙালি শিক্ষিত নাগরিকের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সাহেব কর্মচারীদের সমতুল্য প্রাধান্য প্রমাণের। আর, সেই সুযোগে আরো চাকরির ও মাইনের দাবি তোলা।

১৮৫৬ সালে লর্ড ক্যানিং ভারতের শাসনদায়িত্ব নিলে বাংলা সংবাদপত্রে আর-একবার বেশ লোভনীয় সুযোগ জুটে যায় তাদের এই সাহেব-বাঙালি তুলনাটি জাহির করার।

সম্বাদ ভাস্কর। ১৩ মার্চ ১৮৫৬

…অন্য জাতীয় ভৃত্যেরা বেতন অধিক পান না তাঁহারা অল্প বেতনে ভৃতের ন্যায় খাটিয়া মরেন, গবর্ণমেণ্টের সকল কর্ম্ম তাঁহারাই করেন, সাহেব জাতিরা কেবল

বসিয়া২ অধিক টাকা হাত মারেন কলিকাতা নগরীয় সরকারি কর্ম্মালয় সকল গবর্ণমেণ্টের চক্ষের উপর রহিয়াছে ইহাতেও গৌর জাতিরা প্রায় কেহ দুই প্রহরের আগে কর্ম্মগারে যান না, ইচ্ছানুরূপ সময়ানুসারে কর্ম্মমন্দিরে উপস্থিত হইয়া বান্ধবদিগের এবং বিবীগণের সহিত আলাপ করিতেই অধিক সময় যায়, তৎপরে অনেকে কয়েকখানা কাগজে কেবল নাম স্বাক্ষর করিয়া স্বেচ্ছানুরূপ সময়ে বাসস্থানে প্রস্থান করেন···

[সা. বা. স. ৩।৩০৯]

এরপর প্রায় একটা তালিকাই উপস্থিত করা হয়েছে ক্যানিং-এর কী কী ব্যবস্থা নেয়া উচিত আর সেই তালিকার সঙ্গে মন্তব্যও ছড়িয়ে দেয়া আছে। '···লার্ড কেনিং মহাশয় যদি বেতনভোগি সংখ্যা ন্যূন করিতে চাহেন তবে যাঁহারা অধিক বেতন পান অথচ ফুলবাবু হইয়া বেড়ান তাঁহারদিগের কর্ম্মপক্ষে চক্ষুঃপাত করিবেন, মাস২ চারি পাঁচ সহস্র টাকা বেতন, অথচ একশত টাকা বেতনের কর্ম্মও হয় না···' 'ফ্রিঙ্গীরা গবর্ণমেণ্টের পোষ্যপুত্রের ন্যায় হইয়াছেন আবার তাঁহারদিগের হাতটানা রোগটীও আছে', 'জেলায় জেলায় নানা কর্ম্মে যে সকল গৌরাঙ্গেরা নিযুক্ত আছেন তাঁহারা···বেতনানুরূপ কর্ম্ম করেন না, মাজিষ্ট্রেট কালেক্টরেরা প্রায় নীলকর-দিগের ঘরে ঘরেই খানা খাইয়া বেড়ান', 'কমিস্যনরদিগের মধ্যে অধিকাংশই নির্বোধ' 'বিশেষতঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, জজ, কালেক্টর, কমিস্যনরাদিরমধ্যে অনেকে এতদ্দেশে ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন, কে কাহার টাকা ধারেন আমরা তাঁহারদিগের নাম নির্দ্দেশ বলিতে পারি।'

বাঙালি উচ্চরাজকর্মচারীদের দায়িত্ববোধ তুলনায় যাতে বেশি প্রমাণিত হয় সে বিষয়ে বাংলা কাগজ অত্যন্ত তৎপর ছিল। কিন্তু সাহেব কর্মচারীদের সমালোচনা করতে গিয়ে তাঁরা সরকারি শাসনসংগঠনকেই প্রায় হাস্যকর প্রমাণ করছিলেন। লর্ড ক্যানিং সমস্ত রাজকর্মচারীকে যথাসময়ে অফিসে আসার ও থাকার নির্দেশ দেয়ায় বাংলা কাগজের উল্লাস প্রায় নির্লজ্জ.

সম্বাদ ভাস্কর। ১৮ মার্চ ১৮৫৬

গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটরি মহাশয়েরা পূর্ব্বে প্রায় বসিয়া২ বেতনভোগ করিতেন, এইক্ষণে শ্রীযুক্ত লার্ড কেনিং বাহাদুরের কর্ম্মের সত্ত্বরতা দেখিয়া সকলে ভীত হইয়াছেন প্রায় প্রতিদিন তাঁহারা প্রায় সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত রাজকর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন, হাতের কর্ম্ম অর্দ্ধেক করিলেন, অর্দ্ধেক ফেলিয়া রাখিলেন আর সে কাল নাই, যিনি কর্ম্ম ধরেন তাহা না সারিয়া যাইতে পারেন না, বেলা চারি ঘণ্টা

বাজিলে সকলের অন্তঃকরণ যাই২ করে কিন্তু উপরে মুদ্গর ভয়ে গৌর বাবুরা অমনি বসিয়া পড়েন···

[সা. বা. স. ৩। ৪৭০-৭১]

১৮৩৬-এর ৩১ ডিসেম্বর 'জ্ঞানান্বেষণ'-এ একটি কৌতুককর খবর বেরয়, 'বেঙ্গল হরকরা' থেকে অনুবাদ। হরকরাতে এটি বেরিয়েছিল সম্পাদকের কাছে লেখা চিঠিপত্রের বিভাগে।

পোলীসের দারোগারা চুরি ডাকাইতির এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের আজ্ঞা-প্রামাণিক তদারকের উপার্জনভিন্ন যে প্রকারে উপরি লাভ করেন ··আমরা তাহা নীচে প্রকাশ করিতেছি···

দারোগার মাসিক বেতন ২৫ বৎসরে		···	৩০০
প্রথম থানাতে আসিলে চৌকীদারপ্রতি		···	১
দোলের পার্ব্বণি	ঐ	···	ঐ
দুর্গোৎসবে	ঐ	···	ঐ
আড়াইশত চৌকীদারপ্রতি গড়ে বৎসরে		···	৭৫০
এক স্থান হইতে অন্যত্র যাইতে প্রত্যেক প্রজাপ্রতি			১ অবধি ৩
বৎসরে এইরূপ দুই শত প্রজা প্রতি গড়ে		···	৪০০
জমিদারেরদের গোমস্তা ও ক্ষুদ্র২ তালুকদারেরদের ষাণ্মাসিক রিপোর্টপ্রতি অনিশ্চিত লাভে তালুক বুঝিয়া গড়ে		···	৮০০
প্রথম আসিলে তালুকদারের গোমস্তা ও ক্ষুদ্র২ তালুকদারের দত্ত নজর বৎসরে		···	২০০
			২৪৫০

[স. সে. ক. ২ । ৩৬৩-৬৪]

পুলিশের ব্যক্তিগত অর্থনীতির এমন নিপুণ নির্ণয় পুলিশ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার হদিশ দেয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রথম পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরে সরকার দেশীয় জমিদারদের হাতে মফস্বল বস্তুত ছেড়েই দিয়েছিলেন। তখন মফস্বলে পুলিশ-চৌকিদাররাই ছিল সরকারের একমাত্র প্রতিনিধি। তাদের কোনো দায়িত্ব ছিল না অথচ ক্ষমতা ছিল। সেই দায়িত্বহীন কর্তৃত্বে তারা যে-কোন পদ্ধতিতে নিজেদের আয় বাড়াবারই চেষ্টা করে যেত শুধু। বাধাহীন এই প্রক্রিয়ায় সরকারের পুলিশব্যবস্থা হয়ে ওঠে অপরাধের ও অত্যাচারের দক্ষ

সংগঠন। এই সংগঠনের পেছনে সরকারের পরোক্ষ সমর্থন প্রায় সবসময়ই কার্যকর ছিল কারণ পুলিশ নিজ প্রয়োজনে শাসনব্যবস্থাকে ব্যবহার করতে পারত, যেমন ইচ্ছে। তখনকার বিভিন্ন কাগজে অপরাধের যে-খবর বেরত তার কতগুলি পুলিশের আর কতগুলি অপরাধীদের, আর সেই অপরাধগুলির ধরনের ভিতর পার্থক্য আছে কিনা এ নিয়ে গবেষণা হলে অনেক সামাজিক তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

সরকারি পুলিশের কাজ কী হবে ও শাসন-সংগঠনে পুলিশকে কী ভাবে ব্যবহার করা হবে এ নিয়ে সরকারের কোনো স্থির ধারণা ছিল না। কলোনির বিশেষ পরিস্থিতিতে তেমন কোনো ধারণা থাকা হয়তো সম্ভবও ছিল না। একদিকে যেমন ছিল লণ্ডন পুলিশের মডেল, আর-একদিকে ছিল এই দেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে কোম্পানির ব্যাবসাপত্র, লাভক্ষতি ও সরকারের বিশেষ দায়। ফলে একটিই পুলিশ বাহিনীর ওপর দুটি পরস্পরবিপরীত দায় এসে জুটেছিল। প্রথম দায়, সরকারের আইনকানুন রক্ষা। দ্বিতীয় দায়, জনসাধারণের নিরাপত্তা।

পুলিশ দিয়ে এই দায় মেটাতে গিয়ে নানা সময় পুলিশের সংগঠনকে নানাভাবে বদলাতে হয়েছে। সেই সব বদলে সরকারের অনিশ্চয়তা বোঝা যায়। আবার, আইনশৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ইত্যাদির অর্থ সময়ভেদে ও স্থানভেদে বদলে-বদলেও গেছে। আইনশৃঙ্খলা বলতে আঠারো শতকের শেষ ভাগ থেকে উনিশ শতকের প্রথম কয়েকটি বছর যা বোঝাত, ত্রিশের দশকে তা বোঝাত না। কলকাতা শহরে নাগরিকদের নিরাপত্তা বলতে যা বোঝাত, মফস্বলে তা বোঝাত না। ফলে একই পুলিশবাহিনীর কাজকর্ম স্থানভেদে বদলে যেত।[৩১]

কলকাতা ও মফস্বলের মধ্যে এই ভাগ সম্পর্কে সরকারও সচেতন ছিলেন। তাই কলকাতার পুলিশকে এক-এক সময় এক-একভাবে সংগঠিত করার চেষ্টা হয়েছে। কলকাতায় পুলিশের প্রধান দায় সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষার। কোনো এক সময় তাদের 'জাস্টিস অব দি পিসে'র অধীনস্থ করা হয়েছিল। সে-ব্যবস্থাও দ্রুত বদলে যায় এবং কলকাতার পুলিশকেও ম্যাজিস্ট্রেটের অধীন আনা হয়। মফস্বলে প্রত্যেক জিলাকে এক-একজন দারোগার অধীনে আনা হয়, সেই দারোগাদের কর্তৃত্বে থাকেন একজন ম্যাজিস্ট্রেট। ১৭৯৬ পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই চলতে পারে কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে তারপর থেকে অবস্থা বদলাতে থাকে। প্রজাদের বিরুদ্ধে জমিদারিগুলিতে জমিদার আর দারোগার দ্বৈতশাসন চলে পারস্পরিক সহযোগিতায়। ঘন-ঘন জমিদারি বদলের ফলেও খাজনার দায়ে

উৎখাত চাষি সামাজিক জীবনের বাইরে ডাকাতি, লুঠ ইত্যাদিতে জীবিকার্জনের চেষ্টা করে। ফলে আইনশৃঙ্খলার সাধারণ পরিস্থিতি দিনে দিনে খারাপ হতে থাকে। ১৭৯৩ থেকে ১৮২৮-এর মধ্যে মফস্বলের বড়-বড় শহরগুলিতে ও জিলা সদরগুলিতে জবরদস্ত পুলিশ সংগঠন কায়েম হয়। চারজন পুলিশ সুপারিন-টেনডেন্ট ছিলেন—কলকাতা, ঢাকা, পাটনা ও মুর্শিদাবাদে। এরাই জিলার পুলিশ সংগঠনের প্রধান কর্তা ছিলেন। ১৮২৯ থেকে এই পুলিশ সুপারিনটেন-ডেন্টের পদ তুলে দিয়ে পুলিশ সংগঠনকেও নতুন বিভাগীয় কমিশনারের অধীনে আনা হয়। কিন্তু কমিশনারের ওপর কাজের চাপ বেশি পড়ায় নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নানা রকম ছোটখাটো বদল ১৮৪০-এর আগে পরে ঘটতে থাকে। ১৮৬১ পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই বহাল ছিল।[৩৩]

পুলিশের যে-দুটি প্রধান দায়—আইনরক্ষা ও নিরাপত্তাবিধান—যেন খানিকটা স্পষ্ট ভাবেই মফস্বল ও কলকাতার মধ্যে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। মফস্বলে পুলিশের সম্পর্ক আইন ও আদালতের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল—আদালতের ডিক্রি জারি আর খাজনার দায়ে সম্পত্তি নিলামই প্রায় হয়ে উঠেছিল আইন রক্ষার প্রধান দুটি কাজ। কলকাতায় তেমন কাজ কমই ছিল। আবার কলকাতায় ছিঁচকে চুরিকেও অপরাধ বলে ধরা হত। গ্রামে ডাকাতিকেও অনেকসময় স্বাভাবিক ঘটনা মনে করা হত। তাই এই সময়ের কাগজে পুলিশসংক্রান্ত আলোচনাকেও মফস্বলের পুলিশ ও কলকাতার পুলিশ এই দুইভাগে ভাগ করা যায়—যদিও খবর পাওয়া তখনকার দিনে বেশ দুরূহ ছিল বলেই মফস্বলের সংবাদ সংখ্যায় অনেক কম।

মফস্বলের পুলিশের ঘুষের হিশেব যেমন কাগজে বেরিয়েছিল, তেমনি আর-একটি খুব দামি সাক্ষ্য ১৮৩৭-এর ২৫ নভেম্বর 'সমাচার দর্পণ'-এ লেখা গৌরী-শঙ্কর ভট্টাচার্যের একটি চিঠি। গৌরীশঙ্কর 'জ্ঞানান্বেষণ'-এর প্রধান লেখক ছিলেন। তখনও তাঁর 'সম্বাদ ভাস্কর' বেরয় নি। তিনি বর্ধমানে গিয়েছিলেন বর্ধমানের মহারাজা তেজশ্চন্দ্রের কনিষ্ঠা স্ত্রী মহারানী বসন্তকুমারীর মামলার মোক্তার হিশেবে। সমাজে প্রতিষ্ঠিত এমন এক ব্যক্তি বর্ধমানের মহারানীর মোক্তার হিশেবে বর্ধমানেই আছেন, তবু

> …পোলীসের কোন আমলা লোভেতে উন্মত্ত হইয়া প্রথমত বরকন্দাজ দিয়া পাঠাইল "আমি এক দিবস বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব"… । আমি তাহাতে সম্মত হইলাম না এইরূপ দুই তিন দিবস বলিয়া শেষে আমার নিকট এক

পরবানা পাঠাইল তাহার অভিপ্রায় এই যে আমি ঐ পরবানারূপ কার্য্য করিব না তবেই সে মিথ্যা এক মোকদ্দমার ভয় দেখাইয়া আমার স্থানে বিলক্ষণ হাত মারিবে।

ঐ আমলার পরবানাতে লেখে কলিকাতা হইতে যে-ব্যক্তি আসিয়া বাসা করিয়া রহিয়াছে এবং আপনাকে বাবু কহলাইতেছে তাহার নাম সাকিম জিলা এবং বাসাতে কত লোক থাকে আর কখন কোন লোক বাসাতে কি কারণে আইসে এবং ঐ বাবু কহলানেওয়ালা কি নিমিত্তে আসিয়াছে এই সকল অবিলম্বে লিখিয়া থানায় পাঠাইতে হইবে যদি না দেয় তবে তাহার কারণ লিখিবে আর বাসায় যখন যে লোক আসিবে তাহার আসিবার কারণ প্রত্যহ লিখিয়া থানায় পাঠাইতে হইবে।···তৎক্ষণাৎ এই বিষয় মাজিস্ত্রেট সাহেবের নিকট লিখিয়া পাঠাইলাম কিন্তু বিজ্ঞবর মাজিস্ত্রেট সাহেব এবিষয়ে আমার প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়াছেন।

[স. সে. ক. ২ । ৩৬৪-৬৫]

গৌরীশঙ্কর তাঁর এই অভিজ্ঞতা কিন্তু ব্যক্তিগততে শেষ করেন নি। যেমন তিনি আরম্ভও করেছিলেন 'মফস্বল সম্পর্কীয় পোলিসের কার্য্য শোধনার্থ সংপ্রতি গবর্ণমেণ্ট লোক নিযুক্ত করিয়াছেন'—তাদের জানাতে, তেমনি শেষ করেছেন আরো দুটি ঘটনার উল্লেখে। এই দারোগাটিই এক খুন ও এক চুরির ঘটনায় যথাক্রমে ১৪০০ টাকা ও যা-ইচ্ছে ঘুষ নিয়েছে।

কিন্তু এই চিঠির সুবাদে মফস্বলে পুলিশের এই ধরনেব কাজের কারণও অনুমান করা যায়। এই চিঠির প্রতিবাদে একটি চিঠি দর্পণে বেরয়। তাতে আইন উল্লেখ করে দেখানো হয় যে দারোগা ঠিক কাজই করেছিলেন, এমন-কি দারোগার বিরুদ্ধে ঘুষেব অভিযোগটি নিয়েও পাল্টা প্রশ্ন তোলা হয়। তাতে বোঝা যায় এই সম্পত্তিঘটিত মামলায় অপরপক্ষের প্রতি থানার সমর্থন ছিল। এ-রকম মামলায় থানার সাহায্য সংগ্রহ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যস্বত্বভোগীদের জমিদারি চালানোর প্রায় অপরিহার্য অংশ ছিল।

কলকাতা পুলিশের বেলায় বাঙালি ভদ্রলোকের এমন বিপরীত পক্ষ নেয়ার সুযোগ কম, কারণ চুরি ও অন্যান্য অপরাধ ঠেকানোই সেখানে পুলিশের প্রধান কাজ। বাংলা কাগজ প্রায় সমস্বরে পুলিশের অপকর্ম প্রকাশ করত ও তার বিরুদ্ধে জনমত তৈরির চেষ্টা কবত। প্রায় একই ঘটনায় প্রভাকর ও ভাস্করের প্রতিক্রিয়ার এমন একটি সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

সংবাদ প্রভাকর। ৬ বৈশাখ, ১২৫৬ (১৫।১৬ এপ্রিল ১৮৪৯)

…কয়েকদিবস হইল একজন সারজন ও কয়েকজন চৌকীদার অন্যায়পূর্ব্বক চাঁপাতলার একজন ভদ্রলোকের ভবনে প্রবেশ করত অতিশয় অত্যাচার করে, পরন্তু বটতলায় এক বেশ্যার গৃহে সে দিবস ঐরূপ এক ঘটনা হইয়াছিল… সারজনেরা মধ্যে২ হাতটান দোষে ধৃত হয়েন, মধ্যে একজন চৌকীদার লালবাজারে একজন খালাসির জেব হইতে অর্থাপহরণ করাতে চারি মাসের জন্য মৃগশালায় মৃগয়া করিতে অনুমতি পাইয়াছে…

[সা. বা. স ১। ১৭২]

'সম্বাদ ভাস্কর' ২১ এপ্রিল ১৮৪৯ এই ঘটনাগুলিরই বিবরণ দিয়েছে, প্রভাকরেরই মতো, কিন্তু সেখানে প্রতিক্রিয়া অনেক বেশি তীব্র। 'আর কতকাল কলিকাতার পোলীস প্রহরিদিগের দোষ গোপন করিয়া রাখিবেন, রক্ষক হইয়া যাহারা ভক্ষকের কর্ম্ম করে তাহাদিগের অপরাধ কি গোপন থাকে', এই চড়া সুরে শুরু করে ভাস্করে নানা ঘটনার বিবরণ দেয়া হয়েছে। চোররা যাতে দেখতে না পায় ও চৌকিদার যাতে লুকিয়ে থেকে চোর ধরতে পারে 'এই কারণ চৌকিদার-দিগেকে কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে সজ্জীভূত করিয়াছিল'। ফলে চৌকিদাররাই লুকিয়ে থেকে রাত্রিতে 'স্বচ্ছন্দে পথিকদিগের দ্রব্যাদি অপহরণ করে।' প্রভাকরে উল্লিখিত ঘটনাটি সম্পর্কে ভাস্করে লেখা হয় যে ঐ চৌকিদারের চারমাস জেল কোনো শাস্তিই নয়, 'এমত বিশ্বাসঘাতির প্রাণদণ্ড করিলেও রাগ যায় না তাহাকে দ্বীপান্তরে প্রেরণ করিলে উচিত দণ্ড হইত, এবং এই দৃষ্টান্তে চৌকিদারেরা সকলে ভীত হইয়া আর কেহ পথিকদিগের কটিদেশে বস্ত্রে হস্ত দিত না…।' লেখাটির শেষে আরো প্রত্যক্ষ ও তীব্র অভিযোগ বেশ অলঙ্কৃত কায়দায় তোলা হয়েছে,·· 'পোলীস স্থুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট মেং মেকান সাহেব যদি মনে করেন তিনি প্রধান মাজিষ্ট্রেট পেটন সাহেবের মুখের পান হইয়াছেন তবে কি ইহাও বলা যাইতে পারে না আমরাও গবর্ণরবাহাদুরের মুখের চুরুট হইয়াছি, চুরুটের অগ্নিদ্বারা কি বিচারস্থল আলোকময় করা যায় না…'। (সা. বা. স. ৩। ২৮১-৮২)

ঘ. রায়ত ও কৃষক

গ্রাম ও কৃষকের প্রসঙ্গ বারবারই আসে। বেশির ভাগ সময়েই তার সঙ্গে যুক্ত থাকে ভূমিব্যবস্থা ও কৃষি উৎপাদনের কথা। প্রায় অধিকাংশ কাগজেই এ প্রসঙ্গে কম বেশি আলোচিত হয়েছে। সেই আলোচনাগুলির ভিতর মতের

মিলই বেশি—অন্তত ভূমিব্যবস্থা ও কৃষি উৎপাদন ও জমিদার-কৃষকের সম্বন্ধ নিয়ে মতানৈক্যের উদাহরণ প্রায় পাওয়াই যায় না। কারণ নিয়ে কিছু-কিছু পার্থক্য কখনো কখনো ঘটছে কিন্তু পরিস্থিতির বাস্তবতা নিয়ে নয়। এই মতৈক্যের বিস্তৃতিতে কোনো-কোনো সময় বিস্ময়ই লাগে। ১৮৩৩-এর চার্টার নতুন করার আগে প্রাচীন জমিদার ও নীলকর সাহেবদের মধ্যে তুমুল তর্ক বেধেছিল। সে-তর্কে দুই পক্ষের এই নিয়ে কোনো মতপার্থক্য ছিল না যে কৃষক ও প্রজাদের অবস্থা খুবই খারাপ। একজন নীলকর সাহেব 'ইণ্ডিয়া গেজেট'-এর এক চিঠিতে তার জন্য দায়ী করছেন পুরনো জমিদারদের—তাদের অত্যাচারেই নাকি কৃষকরা জমি থেকে উৎখাত হয়ে ডাকাত হচ্ছে। এর উত্তরে জমিদারদের পক্ষ থেকে বেশ কড়া জবাবে এক জমিদার 'বেঙ্গল হেরাল্ড'-এ নীলকরদের অত্যাচারের বিবরণ দিয়ে জানতে চান—নীলকররা কেন জমির খাজনা কমান না।

বিস্তৃত এই মতৈক্য থেকে কয়েকটি বিষয় বের করে নেয়া যায়। ১. অতিরিক্ত ভূমিরাজস্ব, ২. রাজস্ব জমা দেয়ার নির্দিষ্ট সময়-সীমা, ৩. প্রাচীন জমিদারি ধ্বংস, ৪. নতুন ইজারাদারদের জমিদারি, ৫. বাজে আদায় ও অতিরিক্ত সুদ আদায়, ৬. নীলকরদের অত্যাচার।

এই মতৈক্যের অভিমুখিনতা সবসময়ই প্রায় কৃষকদের দিকে। সেই কারণেই নতুন জমিদার-ইজারাদারদের অমানুষিকতা উদাহরণ দিয়ে দেখানো হত আর সরকারের উদাসীনতার নিন্দে করা হত।

রায়ত-কৃষক প্রসঙ্গটি এই সময়ের কাগজে এত বেশি প্রাধান্য পেল কেন? বাঙালি মধ্যবিত্তদের ভিতর যাদের হাতে টাকাকড়ি ছিল তারাই তো জমিদারি কিনছিল। এমন কোনো বাঙালি মধ্যবিত্ত পাওয়াই তো মুশকিল যার জমিতে কোনো টাকা খাটানো ছিল না। তা হলে, সেই মধ্যবিত্তদেরই কাগজে আবার এই সব জমিদারির এত সমালোচনা বেরত কেন আর সে-সব লেখাতে বাঙালি মধ্যবিত্তের আবেগ-সহানুভূতি কেন জড়িত হয়ে যেত কৃষকদেরই সঙ্গে, যদিও তা সবসময় জমিদারবিরোধীও ছিল না?

এই কার্যকারণের প্রক্রিয়াটি জটিল। বিচ্ছিন্নভাবে তার অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে। কিন্তু সমস্ত প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছে বাঙালি মধ্যবিত্ত ও জমিদারি ব্যবস্থারই উদ্ভট আকারহীনতা থেকে।

বাঙালি মধ্যবিত্ত বলে কোনো একটি শ্রেণীর কোনো নির্দিষ্ট আকারই ছিল

না। শিক্ষিত, সংস্কারপ্রবণ, ধর্মনিরপেক্ষ, যাঁরা নাগরিক তাঁরা অনেকসময় পরিবারে, ও সমাজের আভ্যন্তরীণ শ্রেণীসম্পর্কের ব্যাপারে, গ্রাম্য পশ্চাৎপদ। সে-পশ্চাৎপদতাকে সামন্ততান্ত্রিক বলেও চিহ্নিত করা যায় না। ইয়ং বেঙ্গল-ব্রাহ্মদের সঙ্গে তথাকথিত রক্ষণশীলদের সমাজসংস্কারের কর্মসূচি নিয়ে এত বিতর্ক এতদিন ধরে চলল কিন্তু এই সমস্ত পরিবারের আচার-আচরণে, বিবাহসম্পর্কে, সম্পত্তি-সম্পর্কে কোনো 'আধুনিক' ঘটনা ঘটল না—সবটাই সীমাবদ্ধ থাকল কাগজের পাতার তর্কে আর মিটিঙের প্রস্তাবে। এই তথাকথিত মধ্যবিত্তের টাকাপয়সা উপার্জিত হত না উৎপাদন ব্যবস্থায় তার অনিবার্য কোনো ভূমিকা থেকে। ফলে উড়চন্তি দালালি, সুদ, জমি কেনাবেচা ও এ-রকম আরো নানা ফন্দিফিকির থেকে পয়সা আসত। একই উৎসের ওপর আর্থিক নির্ভরতা থেকে যে-সমমাত্রা গড়ে ওঠে—এদের মধ্যে তাও ছিল না। রামমোহন ও দ্বারকানাথের মতো সামাজিক বিষয়ে মুক্তবুদ্ধি, বিশ্বদৃষ্টিসম্পন্ন, ক্ষমতাবান বাঙালিরাও তো একইসঙ্গে ছিলেন—জমিদার, নায়েব ও ব্যবসায়ী। ফলে এমন এক আকারহীন মধ্যবিত্ততা থেকে জমিজমা ও কৃষকসম্পর্কিত প্রতিক্রিয়ার ভিতর ঐক্য থাকলেও সে-ঐক্যের কারণ ছিল বিভিন্ন।

জমিদারশ্রেণীর মধ্যে অবশ্য অর্থভিত্তির সমতা ছিল—সব জমিদারেরই টাকা-পয়সার এক ও অদ্বিতীয় উৎস জমির খাজনা ও তার একমাত্র উৎস প্রজা-কৃষক। কিন্তু ১৮৩০-নাগাদ জমিদারশ্রেণী একটিমাত্র শ্রেণী হিশেবে গড়ে উঠতে পারে নি, কারণ, তার ভিতর তিনটি স্বতন্ত্রগোষ্ঠী ছিল। এই গোষ্ঠীগুলির ইতিহাস পরস্পর থেকে আলাদা। জমিদারিতে তাদের উদ্দেশ্যও ছিল পৃথক। তাঁদের কর্মসূচিতেও কোনো মিল ছিল না।

১. যাঁরা বংশানুক্রমে বহুদিন ধরে প্রায় রাজত্ব করে আসছেন—এমন প্রাচীন জমিদারদের একটি অংশ ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এই প্রাচীন জমিদারিগুলো বিক্রি হয়ে যাচ্ছিল, ছোট হয়ে যাচ্ছিল ও তাঁদের পুরনো ধরনধারন নতুন অবস্থায় খাপ খাচ্ছিল না। কিন্তু সেই গুটিকয়েক পুরনো জমিদারি তো ছিল বাংলাদেশের সামাজিক জীবন সংগঠনের একমাত্র কেন্দ্র। তাদের মাথার ওপর এমন কোনো সরকার ছিল না ভূমিরাজস্বের নগদটাকার ওপর যে-সরকারের প্রধান নির্ভরতা। জমির খাজনা কী হবে, কত তারিখের মধ্যে সে-টাকা জমা দিতে হবে—এ-সব নির্ধারণের দায়ও সেই সরকারের ছিল না। ফলে জমিদার-কৃষক সম্পর্কে কালানুক্রম, বংশানুক্রমে একটি অপরিবর্তনীয় কিন্তু নির্দিষ্ট আকারে

চলত। তাতে অত্যাচার ও শোষণ কিছু কম ছিল না। কিন্তু তার প্রক্রিয়াটি খানিকটা নির্দিষ্ট ছিল ও পারিবারিক-মানবিক সম্পর্কের আদল সেই শোষণকে কিছু পরোক্ষেও রাখত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এই কালানুক্রম ও পুরুষানুক্রম নষ্ট হল। জমিদারি ও জমিদার-কৃষক সম্পর্ক বংশানুক্রমের ওপর নির্ভরশীল থাকল না। সবটাই নির্ভর করত নির্দিষ্ট দিনের ভিতর খাজনা দেয়ার ওপর। প্রাচীন জমিদাররা ঐতিহ্য ও আইনের দোটানায় পড়ে গিয়েছিলেন।

২. যাঁরা নগদ পয়সায় নিলামি সম্পত্তি কিনে রাতারাতি জমিদার হয়ে বসতেন তাঁদের ভিতর ছিল এই দোটানার বিপরীতে দ্রুততম সময়ে খরচ তোলা ও তারপর লাভের অঙ্ক বাড়ানোর লোভ। কলকাতাব বাঙালি মুৎসুদ্দি বেনিয়ানরা সামাজিক মর্যাদার সন্ধানে ও টাকাবিনিয়োগের ক্ষেত্র হিশেবে জমিদারি কিনতেন। এই ধরনের বিনিয়োগ সম্ভব করে তোলারও একটি উদ্দেশ্য ছিল। জমিদারি কিনে সামাজিক মর্যাদা অর্জন বা জমিদারির কোনো এক ভগ্নাংশ আঁকড়ে সামাজিক মর্যাদা রক্ষা তো এমন-কি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্তও মধ্যবিত্তের জীবনযাপনেরই অংশ ছিল। তারাশঙ্করের 'সাড়ে সাত গণ্ডার জমিদার' ও সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এ 'বকরহাটা এস্টেট' সেই সামাজিক বাস্তবতারই ইঙ্গিত। বড় জমিদারির সংখ্যা কমল ও উনিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ছোট জমিদারির সংখ্যা বাড়ল। জমিদারদের মধ্যে এই ধরনের নতুন জমিদারের উদ্ভব সম্বন্ধে সেকালেই, ১৮৫৭-তে, প্রভাকব মন্তব্য করেছে, '…গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের ন্যূনাতিরেক বিবেচনায় জমিদারি সকলের মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং ধনাঢ্যব্যক্তিগণ মূল্য দিয়া তাহা ক্রয় করত সম্পত্তির মধ্যে গণ্য করিয়াছেন, অর্থাৎ যেমন কোম্পানির কাগজ ও অন্যান্য ভূমি সম্পত্তি, সেইরূপ জমিদারী…'। (সা. বা. স. ১। ১০১)

এই মুৎসুদ্দি-জমিদাররা ভূমি ও কৃষি সম্পর্কের ভিতর সেই অব্যবহিত লাভের তাড়না সঞ্চারিত করে দিল—যে-ধরনের লাভের লোভে তারা এক-একজন সাহেব ধরে তাঁর পেছনে টাকা খাটিয়ে নিজেরা বড়লোক হয়েছে। ফলে এই মুৎসুদ্দি জমিদারিগুলি এক অর্থে ছিল জমিদারিতে মুৎসুদ্দি প্রক্রিয়ার ফল, আরেক-অর্থে ছিল মুৎসুদ্দিগিরিতে জমিদারির প্রক্রিয়ার ফল। কলকাতা শহরে জমিদারি-নবাবি কায়দায় অকারণ পয়সা ওড়ানো আর গ্রামে মুৎসুদ্দি কায়দায় কৃষকের শিরা-উপশিরা থেকে পয়সা আদায়। কারণ, এই জমিদারির কোনো পরম্পরার দায় ছিল না, ছিল না কোনো পৌবাপর্ব রক্ষার দায়িত্ব। আবার

এই ধরনের জমিদারদের ভিতর অনিশ্চয়তাবোধও তাদের শোষণপদ্ধতিকে করেছে অনেক তৎপর, প্রত্যক্ষ ও নগদ-লাভমুখীন। ইতিহাস, আচরণ ও মূল্যবোধের দিক থেকে জমিদারির প্রাচীন ধারার সঙ্গে এই ধরনের জমিদারির কোনো মিল ছিল না।

৩. ভূমিব্যবস্থা ও কৃষিসম্পর্কিত তৃতীয় গোষ্ঠী ছিল ইয়োরোপীয়রা। দীর্ঘদিন পর্যন্ত নীলকররা ছিল ইয়োরোপীয় মধ্যস্বত্বভোগী, জমির ইজারাদার। তাদের প্রধান চাষ ছিল নীল। নীলচাষের পদ্ধতি-প্রক্রিয়া, খাদ্যশস্য বা পণ্যশস্য চাষের মতো নয়। নীলচাষ বাংলাদেশের কৃষি অভিজ্ঞতার অন্তর্গতও নয়। নীলচাষের ফলে জমির উর্বরাশক্তিও অনেক কমে যেত। তাছাড়া নীলকররা কৃষিতে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির অত্যন্ত প্রত্যক্ষ চাপ তৈরি করেছিল। প্রাচীন জমিদার বা নতুন জমিদার কেউই সেই ধরনের চাপ দিতে পারত না এ কারণেও বটে যে তারা সেই ধরনের চাপ তৈরি করতে অপারগ ছিল, তাদের অর্থনীতিতে পুঁজির টাকার এই গতিবেগ ছিল না। নীলকররা যেভাবে দাদন দিত, যেভাবে তাদের দাদনের উশুল নিত, তাদের পছন্দসই জমিতে নীলচাষ করার জন্য যেভাবে বাধ্য করত—তা এদেশের কৃষি-সম্পর্কের সমস্ত অভিজ্ঞতার বাইরে। অত্যাচার ও শোষণে নতুন ইজারাদার-জমিদাররা নীলকরদের চাইতে কিছু কম যেত না। বরং তাদের অত্যাচার-শোষণে বিদেশীর অজ্ঞানতাটুকুও ছিল না। কিন্তু নীলকরদের শোষণের ধারণাটিই ছিল আলাদা। শোষণের প্রকৃতিতে সম্পর্কের প্রকৃতিও বদলে গেছে।

বাংলাদেশের ভূমিসম্পর্ক ও কৃষিসম্পর্কে নীলকররাই একমাত্র ইয়োরোপীয় ছিল না। কোম্পানির চার্টার নতুন করার (১৮৩৩) মুখোমুখি অবাধ বাণিজ্যের সমর্থক ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীরা ও তাদের রাজনৈতিক নেতারা ইংল্যাণ্ডে ও ভারতবর্ষে একসঙ্গেই দাবি তোলে যে ইয়োরোপীয়দের এদেশে জমিদারি কেনার অধিকার দেয়া হোক। কৃষিকে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনার মতলবেই এ দাবি করা হয়েছিল।

ইয়োরোপীয় অবাধ বাণিজ্যের সমর্থকদের মতামতের দ্বারা রামমোহন-দ্বারকানাথ প্রধানত চালিত হতেন। সেই প্রভাবের ফলেই তাঁরা নীলকরদেরও সমর্থন করেছিলেন ও ইয়োরোপীয় জমিদারির সমর্থনে তাঁদের মত জানিয়েছিলেন। ফলে কৃষি ও ভূমি সম্পর্কে ইয়োরোপীয়রা একটি গোষ্ঠীমাত্র ছিল, তা-ই নয়, তাদের স্বার্থের সমর্থনে বাঙালিদের ভিতরও একটি গোষ্ঠী ছিল ও সে-গোষ্ঠী মতামতের দিক থেকে সবচেয়ে প্রগতিশীল বলে গণ্য হত।

কিন্তু জমিদারি বলতে যে এই তিনটি গোষ্ঠীকেই বোঝাত তাও তো নয়। এই তিন ধরনের জমিদারি-ইজারাদারির শোষণের প্রকৃতির ওপর তাদের শোষণ-সংগঠনও নির্ভর করত। নায়েব, গোমস্তা এই সব প্রাচীন নাম ব্যবহৃত হলেও এই তিন ধরনের জমিদারিতে তাদের কাজ সবসময় একরকম ছিল না। ফলে এই তিন ধরনের জমিদারির তিন ধরনের সংগঠন গ্রামের প্রজা-কৃষককে এমনভাবে ঘিরে ধরেছিল যে তার পরিত্রাণের কোনো পথই খোলা ছিল না। আর, এই তিন গোষ্ঠীর সঙ্গেই থানাপুলিশের সরকারি ব্যবস্থা এসে জুটে সেই যক্ষপুরীর দেয়ালকে নিরন্ধ্র করে তুলত।

আবার, এই তিনগোষ্ঠীর পারস্পরিক পার্থক্য সত্ত্বেও জমিদারি স্বার্থরক্ষার প্রশ্নে এরা মুহূর্তে একজোটও হয়ে যেতে পারত। বরাদ্দ জমির বাইরে অনেক পরিমাণ জমি বেদখল করে, ও লাখেরাজ সম্পত্তির নামে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সব জমিদারই তাদের সম্পত্তির পরিমাণ বহুগুণ বাড়িয়ে নিয়েছিল। তার ফলে বিশ-পঁচিশ বছরের মধ্যেই সরকার বুঝতে শুরু করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সরকারের রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ প্রতিদিনই বাড়ছে। এই ধরনের বেআইনি দখল বন্ধ করতে ১৮২৯-এ রেগুলেশন থ্রি তে কমিশন নিয়োগের প্রস্তাব উঠলে শহর-গ্রামের সব জমিদারই একত্রিত হয়ে আবেদনপত্র পাঠান (১৮৩০)। সে-আবেদনে গোপীমোহন দেব, রাধাকান্ত দেবের সঙ্গে রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুরও সই দেন ও জমিদারদের ক্ষমতাকে গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রায় নিরঙ্কুশ করার ব্যবস্থা চান।

শোষক ও শোষণের চরিত্র, পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য আলাদা হতে পারে, কিন্তু শোষণযোগ্য পাত্র যেখানে একজনই, প্রজাকৃষক, তখন এই সব ধরনের জমিদারের ভিতর, হাতের শিকার যেন না ফসকায় এই নীতিতে, ঐক্য ঘটা কখনো-কখনো সম্ভবও বটে। রেগুলেশন থ্রির ঐক্য ১৮৩৭-এ 'ভূম্যধিকারী সভা' প্রতিষ্ঠার দিকে যায়। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি (১৮৪৩) সেই প্রস্তুতিরই সম্প্রসারণ। চল্লিশের দশকের শুরুতে জমিদাররা শ্রেণী হিশাবে সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করে।

আর ঠিক এই সময় থেকেই জমিদারি-কৃষি-কৃষক নিয়ে কাগজপত্রে লেখার সংখ্যা বাড়তে থাকে। 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর'-এ একটি আখ্যান ধরনের দীর্ঘ রচনা ধারাবাহিক বেরয় ১৮৪২-এ। ১৮৪৩-এ 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র পক্ষ থেকে তিরিশটি প্রশ্নের এক তালিকা নিয়ে কৃষি-কৃষক ও জমিদার-কৃষক সম্পর্কের

অনুসন্ধানের প্রস্তাব হয়।[৩৪] 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র বিখ্যাত রচনাটি বেরয় ১৮৫০-এ। ১৮৪৯ থেকে ৫৪ সালের মধ্যে 'সংবাদ প্রভাকর'-এ নানা ধরনের সংবাদ, মত ও মন্তব্য বেরয়। ১৮৫৬-তে ভাস্করের একটি মন্তব্যে আন্দাজ করা যায় সেই সময় থেকে এই প্রস্তাবটি যেন তত আর প্রাধান্য পাচ্ছিল না, 'এইক্ষণে অশান্ত জমীদারেরা প্রায় শান্ত মূর্ত্তি হইয়াছেন, প্রজাগণের উপর তাঁহারদিগের কুবৃত্তির বিষয় আর প্রায় শ্রবণ সন্নিধানে আইসে না' (সা. বা. স. ৩। ৩৫০)। তত্ত্ববোধিনীর রচনাটিতে জমিদাররা কত রকম 'আদায়' আদায় করেন ও কত রকম শাস্তি প্রজা-কৃষকদের দেন তার একটি বিস্তৃত তালিকা ও বেশ কয়েকটি নির্দিষ্ট ঘটনার উল্লেখ সত্ত্বেও জমিদার ও কৃষক সম্পর্কিত এই সব রচনায় কৃষকদের দুরবস্থা ও জমিদারদের অত্যাচার সম্বন্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগের চাইতে অনির্দিষ্ট ও অতি বিস্তারিত আলোচনাই কিন্তু বেশি হয়েছে। তখনকার বাংলা সাংবাদিকতায় নির্দিষ্ট ব্যক্তির ঘটনার বিবরণ দেয়া ছিল অন্যতম রীতি। যাকে বলে রিপোর্টিং তার নৈর্ব্যক্তিতা বাংলা সাংবাদিকতায় এসেছে পরে, ধীরে ধীরে, একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। সতীদাহের পক্ষপাতী যাঁরা ছিলেন তাঁরা সতীদাহ বন্ধ আন্দোলনের ধার ভোঁতা করতে কোথায়-কোথায় সতী ঘটছে তার বিবরণ দিতেন। বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলনে বিদ্যাসাগর কোথাকার কোন কুলীন কটা বিয়ে করেছে তার একটি তালিকা বানিয়েছিলেন। সংস্কৃত বা ইংরেজি বিদ্যায় কৃতবিদ্যদের নাম ও বিবরণ এই সব কাগজে সব সময়ই বেরত। তা ছাড়া, সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের পরিবারের জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ বা অন্য কোনো পারিবারিক অনুষ্ঠানে, বা সরকারি স্বীকৃতি, দানধ্যান, বিভিন্ন ধর্মীয় সামাজিক অনুষ্ঠানে এঁদের অংশ, কোন অনুষ্ঠানে কে কত চাঁদা দিয়েছেন তার তালিকা—এগুলোও কাগজে বেরত। কিন্তু জমিদার-কৃষক সম্পর্কে নিয়ে এত লেখা হলেও কোনো নির্দিষ্ট অভিযোগ কোনো জমিদারের বিরুদ্ধে বা কোনো প্রজার প্রতি অত্যাচারের নির্দিষ্ট ঘটনা উপস্থিত করা সাধারণভাবে হয় নি। ফলে মনে হয় স্ত্রীজাতির উন্নতি, শিক্ষার প্রসার ইত্যাদির মতো আদর্শ সামাজিক কর্মসূচিরই অংশ হিশেবে কাগজেপত্রে কৃষকদের প্রতি এত বেশি সহানুভূতি প্রকাশিত হয়েছে। পরিচিত বিষয় হিশেবে এর সাংবাদিক মূল্য ছিল কিন্তু এর কোনো সামাজিক কর্মসূচিগত তাৎপর্য হয়তো ছিল না। উনিশ শতকের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি নাগরিকের কাছে যে-নতুন মূল্যবোধ উপস্থিত করেছিল, সেই মূল্যবোধই ছিল কৃষকদের প্রতি সহানুভূতির একটি উৎস। তাই একই ব্যক্তি

জমিদার হয়েও, জমিদারি চালিয়েও, কৃষকদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতে পারে। সাম্রাজ্যের খাত দিয়ে যে-শিক্ষা আমাদের দেশে এসেছিল, তার উদ্ভট মূল্যনির্মাণক্ষমতার জন্যই বিশ্বাসের ও ব্যবহারের জগতের এই পৃথক অস্তিত্ব অথচ সহাবস্থান সম্ভব হয়েছে।

সাহেবরা, বিশেষত অবাধ বাণিজ্যের সমর্থক সাহেবরা, পার্লামেন্টের মেম্বারও কেউ-কেউ, কোনো-কোনো রাজনৈতিক নেতা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে কোম্পানির বিরুদ্ধে লিখতে বা বলতে গিয়ে কোম্পানির আমলের ভারতবর্ষের দুরবস্থার যে বর্ণনা দিতেন তাতে অনিবার্যতই কৃষকদের কথাই আনতে হত বেশি কারণ তারাই তখন ভারতবর্ষের প্রায় পনেরো আনা। সাহেবদের এই সমালোচনাগুলিও বাঙালিদের কাউকে কাউকে প্ররোচিত করে থাকবে, যার ফলে কাগজের পাতায় কৃষক নিয়ে এই বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব হত।

কোনো-কোনো সময় সাহেবদের এই লেখা বা বক্তৃতাই ছাপা হয়েছে বাংলা কাগজে। যেমন হাউস অব কমন্সে জনৈক ব্রাউনের বক্তৃতার সারাংশ দিয়ে প্রভাকরে লেখা বেরিয়েছে ১৮৪৯-এর জুনের মাঝামাঝি। ১৮৫৭-র আগস্টের প্রভাকরে 'রবিন্সন সাহেব এই ভারতবর্ষের রাজস্ব বিষয়ে লেখনী সঞ্চালনপূর্ব্বক বঙ্গদেশীয় কৃষকদিগের দুরবস্থার বিষয়' যা লিখেছিলেন তার কিছু অনুবাদ ও সারমর্ম বেরিয়েছে। ১৮৫২-র সেপ্টেম্বরে 'ইংলিশম্যান'-এর সম্পাদকীয়র ওপর নির্ভর করে প্রভাকরে লেখা বেরিয়েছে।

সাহেবদের সঙ্গে একমত হয়ে কৃষকদের দুরবস্থা দেখতে গিয়ে অবশ্য কিছু কৌতুককর বিপদও ঘটেছে। যেমন রবিনসন সাহেব এই দুরবস্থার জন্য দায়ী করেছেন একমাত্র জমিদারদের। প্রভাকরের পক্ষে এত সুনির্দিষ্টভাবে কারণ মেনে নেয়া সম্ভব ছিল না, তাই প্রভাকরে এই কারণটি নিয়ে মতপার্থক্য জানানো হয়।

> মেং রবিন্সন সাহেব এই ভারতবর্ষের রাজস্ব বিষয়ে লেখনী সঞ্চালনপূর্ব্বক বঙ্গদেশীয় কৃষকদিগের দুরবস্থার বিষয় যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,·· বোধ হয় প্রদেশ মধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক কৃষকের পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিয়া তাহার বিপন্নদশা ও পরিবারের অবস্থা স্বচক্ষে সন্দর্শন করিয়াছেন···
>
> ···কৃষকের দুরবস্থা দর্শন করিলে পাষাণ তুল্য কঠিনান্তঃকরণও করুণায় আর্দ্র হইয়া যায়, তাহার মাসিক ব্যয় ১৷৷০ অথবা ৩ টাকার অধিক নহে, বার্ষিক ব্যয় একশত টাকার অধিক হয়, একশত কৃষকের মধ্যে এমত অবস্থান্বিত পাঁচ ব্যক্তিও প্রাপ্ত হওয়া যায় না······

মেং রবিন্সন সাহেব বঙ্গদেশীয় কৃষকের দুরবস্থা এতদ্রূপে বর্ণনা করিয়া পরিশেষে জমিদারদিগের প্রতিই সমস্ত দোষারোপ করিয়াছেন, তিনি লিখিয়াছেন, "জমিদারেরাই এই সকল দুঃখের মূল হইয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট জমিদারি বিশেষের যেরূপ রাজস্ব নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিলে গবর্ণমেণ্ট ভূমির উৎপন্নের অর্দ্ধাংশও গ্রহণ করেন না…অপরার্দ্ধাংশ সত্ত্বে কৃষককুল কি কারণে এত কষ্ট সহ্য করে, তাহা কোথায় যায়, কে বণ্টন করিয়া লয় ? · "

…বহু ধনদ্বারা অর্জ্জিত জমিদারী হইতে ভূম্যধিকারিরা লভ্য-প্রত্যাশা করিবেন ইহা কোনমতেই বিচিত্র বোধ হয় না, গবর্ণমেণ্টের নিয়মের বিশৃঙ্খলতা ও কৃষকদিগের মূর্খতা দোষই তাহারদিগের সমূহ ক্লেশের কারণ হইয়াছে, জমিদার পত্তনিয়াদার তালুকদার দরপত্তনিয়াদার ইত্যাদি ভূমির উৎপন্নভোগির সংখ্যা রাজনিয়মবলে যত বৃদ্ধি হইয়া আসিয়াছে ততই কৃষকের ক্লেশ বৃদ্ধি হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন খোদকস্তা, পাইকস্তা, যোতদার, বীজধান দাতা ইত্যাদিও ভূমির উৎপন্ন গ্রহণকারি বিস্তর আছে, তাহারা সহস্তে কিছুই করে না, অথচ কৃষকের উপর কর্ত্তৃত্ব করে…

[সা. বা. স. ১ । ১০০-১০২]

অবশ্য কৃষকদের দুঃখের এই কারণনির্দেশে কিছু-কিছু সাহেবের সাক্ষ্যও কখনো-কখনো মিলে গিয়েছে। ১৮৪৯-এর জুনে প্রভাকরেই ব্রাউন সাহেবের উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে,

তিনি [মিঃ ব্রাউন] অতি আক্ষেপপূর্ব্বক ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে "গবর্ণমেণ্ট অর্থ লোভ জন্য ভূমির উৎপন্ন হইতে অধিক টাকা সংগ্রহ করণের অভিপ্রায় করাতে কৃষকেরা সমূহ ক্লেশে পতিত হইয়াছে।…তাহারা…যে সকল শস্য উৎপাদন করে তাহার প্রায় সমুদয় অংশ ভূম্যধিকারিরা রাজস্ব বলিয়া গ্রহণ করেন, ইহাতে ভূম্যধিকারিদিগের কোন দোষ নাই…"

[সা. বা. স. ১ । ১৭৩-৭৪]

বা ১৮৫২-র সেপ্টেম্বরের একটি লেখায় উদ্ধৃত 'ইংলিশম্যান' কাগজের সাক্ষ্য,

…কৃষকমণ্ডলীর এই দুরবস্থার কারণ অবধারণে আমরা একপ্রকার অক্ষম হইয়াছি, কেহ২ ভূম্যধিকারিগণের প্রতি সকল দোষ অর্পণ করেন, কিন্তু প্রকৃত বিবেচনায় তাহা কোন মতেই গ্রাহ্য হইতে পারে না, কারণ জমিদারেরা ভূমির নির্ণীত জমাই গ্রহণ করিয়া থাকেন,…এই বিষয়োপলক্ষে আমারদিগের দৈনিক

সহযোগী ইংলিসম্যান্ সম্পাদক মহাশয় অনেক উত্তম যুক্তি লিখিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন যে "যদিও কোন২ জমীদার খাজানার জন্য কোন প্রজার প্রতি অন্যায় আচরণ করেন তথাচ বিশিষ্টরূপ বিচারে সেই দোষ গবর্ণমেণ্ট প্রতিই অর্পিত হইতে পারে, কারণ রাজপুরুষেরা নীলাম করণের যে এক ভয়ানক নিয়ম করিয়াছেন, তাহাতে কোন মতেই জমীদারের রক্ষা নাই··· গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিষয়ক চলিত নিয়মকে বঙ্গদেশীয় কৃষক ও জমীদারগণের দুরবস্থার কারণ বলিতে হইবেক।"

[সা. বা. স. ১। ৮৪-৮৫]

জমিদার-কৃষক সম্পর্ক ও কৃষকের অবস্থা নিয়ে ১৮৪২-এ 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর' তিন সংখ্যা জুড়ে প্রকাশিত 'রাইয়ত' ও ১৮৪৪-এ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় তিন সংখ্যা জুড়ে প্রকাশিত 'পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা বর্ণন' রচনা দুটি সাংবাদিক গদ্যের দিক থেকে এই পর্বের অন্যতম প্রধান দুটি রচনা—সম্পূর্ণ বিপরীত কারণে। 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর'-এর রচনাটি তথ্যভিত্তিক রচনা নয়। সেখানে মিয়াজান নামক একজন কৃষকের কাহিনী বলা হয়েছে। আর, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র রচনাটিতে এ-রকম কোনো নির্দিষ্ট ঘটনাই নেই—সেখানে সমস্ত বিষয়টির তথ্য ও অভিজ্ঞতানির্ভর বিবরণ দেয়া হয়েছে। কিন্তু দুটি রচনাতেই গ্রামের কৃষকের বাস্তবতাকে খোঁজা হয়েছে—মাঝপথে কোথাও থেমে না গিয়ে। দুটি রচনাই বড় ও ধারাবাহিক। এতই সম্পূর্ণ এদের বিস্তার যে কোনো একটি অংশের উল্লেখ বা উদ্ধৃতিতে রচনা দুটিকে বোঝানো যায় না।

'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর'-এর রচনাটি (রাইয়ত) 'পত্র প্রেরক হইতে প্রাপ্ত'। শুরুতে 'হুগলিস্থ কোন ভূম্যধিকারির অধিকার মধ্যে মিয়াজান নামক অতিদীন এক ব্যক্তি মুসলমান বাস করিত' বলে ঘটনাটিকে কিছুটা নির্দিষ্টতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু তার পরে আর কোনো নির্দিষ্ট বিবরণ নেই—ফলে মিয়াজান হয়ে উঠেছে একজন গরিব রায়তপ্রজার প্রতিনিধি। রচনাটির বাস্তবতা প্রথম থেকেই দ্বিধাহীন।

মিয়াজান কদমি পাট্টার রাইয়ত বলেই তার ধারণা ছিল তার খাজনা বাড়বে না কিন্তু 'উক্ত ভূম্যধিকারী নূতন তালুক ক্রয় করিয়া মানস করিলেন যত মূল্যে তালুক ক্রয় হইয়াছে প্রজাদিগের উপর দৌরাত্ম্য করিয়া তৎসমুদয় সংগ্রহ করিবেন।' ঐ জমিদার মিয়াজানকে আবাদি জমির খাজনা হিশাবে বৃদ্ধি ধার্য করেন। মিয়াজানের কোনো আবাদি জমি ছিল না। সে তাই বৃদ্ধি দিতে

অস্বীকার করে। আট-দশ দিন পর তালুকদার মিয়াজানকে কাছারিতে ডেকে নিয়ে যান ও তাকে আটক করেন। তালুকদারের আদেশে কালেক্টরের পিয়াদা মিয়াজানকে গ্রেপ্তার করে। সারাদিন ও রাত্রি ঐ সরকারি কর্মচারিরা জমিদারের আদেশে মিয়াজানকে অমানুষিক মারে। সকালে তাকে জিলা সদরে চালান দেয়। সেখানে মোক্তাররা তাকে বুদ্ধিতে রাজি হওয়ার জন্য অনেক বোঝানো সত্ত্বেও মিয়াজান রাজি হয় না। মামলার নিষ্পত্তি পর্যন্ত তাকে জেলহাজতে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়।

মিয়াজান বারোদিন জেলে ছিল। জেলখানায় তার সঙ্গে এ-রকম আরো অনেকের দেখা হয়। তারা সবাই প্রায় এ-রকম মিথ্যা মামলার আসামি। মিথ্যা মামলাই শুধু নয়—জমিদারের দল আসামিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পর্যন্ত দেয় নি—আদালতে সমন বেনামিতে নিয়ে একপক্ষীয় ডিক্রির জোরে নিরপরাধ লোকটির কারাবাস অনিবার্য করে দিয়েছে। সেখানে একজন মোক্তারও ছিল—সে যার জামিন ছিল সে পালানোতে মোক্তারকে জেল খাটতে হচ্ছে। মোক্তার সবিস্তারে জানায় জমিদার ও তার অধস্তনগণ কী কী উপায়ে কৃষকের সর্বনাশ করে।

পরদিন সকালে মিয়াজান হঠাৎ খবর পায় তাকে জেল থেকে ছাড়া হবে। কিন্তু এই খবরটি দিয়ে জেলের বরকন্দাজ বকশিশ চাইলে মিয়াজানকে রাজি হতে হয় সত্যিই মুক্ত হলে তার খোরাকির পয়সা সে বরকন্দাজকে দেবে। সেই বরকন্দাজ তাকে জেলের বাইরে একজনের সঙ্গে দেখা করতে নিয়ে যায়। সে লোকটি জবরদস্ত খাঁ নামে আর-এক জমিদারের নায়েব। সে প্রস্তাব দেয় যদি মিয়াজান এই সাক্ষ্য দিতে রাজি হয় যে তারা জবরদস্ত খাঁর প্রজা—নতুন ইজারাদারের রাইয়ত নয়, তা হলে তারা জামিন হয়ে মিয়াজানকে ছাড়িয়ে নেবে। এমন তারা অনেককেই করেছে।

দুই জমিদারের লড়াইয়ের প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য হিশেবে তার এই যুক্তির সম্ভাবনার প্রস্তাবে মিয়াজান রাজিই হয়। সে রাজি হওয়ার পরে প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদারের নায়েব তার মুক্তির জামিননামা দাখিল করে ও তাকে মুক্ত করে সেই জমিদারের বাড়িতে নিয়ে আসে। সেখানে তালুকদার-জমিদারের সঙ্গে তার নায়েবের কথাবার্তা থেকে সে বুঝতে পারে তাদের সবাইকে দিয়ে এই বলে সাক্ষ্য দেয়ানো হচ্ছে যে তারা সবাই জবরদস্ত খাঁর রাইয়ত ও তারা সব খাজনা দিয়েছে, জবরদস্ত খাঁও তাদের রায়ত বলে স্বীকার করে। সেখানে এ-রকম

বানানো রায়ত আরো অনেকে ছিল। তারা সকলেই এ-সব প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায়। পরে মুহুরিকে ডেকে কবুলিয়ত তৈরির নির্দেশ দেয়া হয়। সেই কবুলিয়ত তৈরি হয়ে এলে তাতে টিপসই দিয়ে রায়তরা যে যার বাড়ির দিকে রওনা দেয়। 'মিয়াজান অসংখ্যক নমস্কার পূর্ব্বক বিদায় লইয়া বাটীতে চলিলেন।' (সা. বা. স. ৩। ১১২-১১৩, ১২৮)

এই লেখাটিতে কোথাও কোনো তত্ত্বকথা নেই। লেখক একের পর এক ঘটনা বর্ণনা করে গেছেন। নতুন জমিদারের খাজনাবৃদ্ধি, জমিদার-আদালত-জেলখানা-জবরদস্ত খাঁর কাছারি—এই চারটি জায়গার যাবতীয় পাত্রপাত্রী, কাজকর্ম যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তাতে মনে হয় তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত পরবর্তী রচনাটির অগ্রিম বাস্তব উদাহরণ হিশেবেই যেন এটি লেখা। কৃষকের জীবনের প্রতি মুহূর্তের অনিশ্চয়তা ও তার জীবনযাপনের প্রতিদিনের কষ্ট—এই কঠিন বাস্তবতার সামনে সরকার, জমিদার, পেয়াদা, দারোগা, হাকিম কে যে দায়ী আর কে যে দায়ী নয় এই প্রশ্নটি কেমন অবান্তর হয়ে যায়। এর আগে যে-রচনাগুলি থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে তাতে বাস্তবতাকে স্বীকার করেও তার দায়িত্ব এড়ানোর একটা চেষ্টা ধরা পড়ে যায়। কিন্তু এই রচনাটিতে শুধু বাস্তবকেই প্রায় মন্তব্যহীনভাবে এমন উপস্থিত করা হয়েছে যেন মিয়াজান এক আধুনিক প্রতীকী চরিত্র—তার নিয়তির বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে তার ইচ্ছা-নিরপেক্ষ সঞ্চরণ। এমন-কি বাস্তবতা এতই সামগ্রিক যে মিয়াজানের উদ্ধারকর্তা জমিদার ও তার নায়েবও, মিয়াজানের উচ্ছেদকর্তা জমিদার ও তার নায়েবের মতোই স্বার্থান্বেষী, শোষক, অত্যাচারী ও জালিয়াত—এই কথাটি শেষ পর্যন্ত প্রমাণিতই থাকে। আধুনিক উপন্যাসের কোনো পাঠক জমি থেকে উৎখাত ও জমিতে ফিরে আসা এই কৃষকটিতে যেন উপন্যাসের নায়কের পূর্বাভাস খুঁজতে উৎসাহিত হতে পারেন।

জমিদার-কৃষক সম্পর্ক নিয়ে বাংলা কাগজের প্রতিক্রিয়ার যে-গড় আমরা কবেছি এই লেখাটির নৈর্ব্যক্তিক বাস্তবতা সে গড়েব বাইরে চলে যায়। সতর্ক বিষয়বুদ্ধি ও বাস্তব বিবেচনা থেকে সৎ প্রতিক্রিয়ার প্রকাশেও সাবধানতা থাকতে পারে, থাকেও। উন্নত ভাষায় সেই ক্ষতিপূরণ হয় সৃষ্টিশীল সাহিত্যের শিল্প-রহস্যঘন প্রতিবাদে। বাংলা ভাষায় সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচিত হতে-হতে উনিশ শতকের ষাটের দশকে পৌঁছতে হয়। তার আগেই এই রচনাটিতে বোধের গভীরতা রচনার নিরলংকার সৌন্দর্যে প্রায় যেন শিল্পকর্মই হয়ে উঠতে চেয়েছে।

এই ধরনের রচনার ইঙ্গিতেই যেন বোঝা যায় সৃষ্টিশীল সাহিত্য আর বেশি দূরে ছিল না।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র রচনাটিও (১৮৫০) বোধের এই গভীরতা থেকেই লেখা। কিন্তু তার পদ্ধতি আলাদা—প্রায় বিপরীত। রচনার প্রধান জায়গায় ঘটনা সম্পর্কে মন্তব্য ও পাদটীকায় অত্যন্ত নির্দিষ্ট ঘটনার উল্লেখে এই রচনাটি প্রায় একটি সৃষ্টিশীল গবেষণাপত্রের মতো। রচনাটিতে বাজে আদায়ের একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে—তার বর্ণনাও দেওয়া হয়েছে। 'ভূস্বামির ভবনে বিবাহ, আদ্যকৃত্য, দেবোৎসব বা প্রকারন্তর পুণ্য-ক্রিয়া ও উৎসব ব্যাপার উপস্থিত হইলে প্রজাদের অনর্থ পাত উপস্থিত; তাহারদিগেকেই ইহার সমুদয় বা অধিকাংশ ব্যয় নিষ্পন্ন করিতে হয়। ···প্রজাদেরও গৃহে কোন কর্ম্ম উপস্থিত হইলে ভূস্বামির খরতর দৃষ্টি তদুপরি তৎক্ষণাৎ পতিত হয়। ভূস্বামিকে তাহার শুল্কদান না করিলে নিস্তার নাই। ···কুকর্ম্মের উপর কর স্থাপন করিয়া ধনোপায়ের প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহা 'বাজে আদায়ের' প্রধান অঙ্গ' (সা. বা. স. ২। ১০৯-১০)। এই প্রবন্ধটিতে বাজে আদায়ের এই তালিকা ১৯৪০-এর কাছাকাছি বাংলাদেশে বর্গাদার আন্দোলনের সূচনাতে 'বাজে আদায় বন্ধ কর' আন্দোলনের অনেক দাবির সঙ্গেই প্রায় মিলে যায়।[৩৫]

এর পরের অংশ দুটিতে যথাক্রমে জমিদারি সংগঠন ও নীলকরদের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানেও তথ্য দিয়ে প্রায় তর্কাতীত প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছে পরিস্থিতির উপায়হীন অসহায়তার বোধ থেকে—'···যাহারদিগকে উপর্য্যুপরি জমীদার, পত্তনীদার, ইজারাদার ও দরইজারাদার এই চারি প্রভুর লোভানলে আহুতি দান করিতে হয়, তাহারা যে কি প্রকারে প্রাণধারণ করে তাহা ভাবিয়া স্থির করা যায় না।' '···পল্লীগ্রামস্থ প্রজারা সকলের সমবেত চেষ্টায় দিন দিন দৈন্য-দশা প্রাপ্ত হইতেছে, দশের ষড়যন্ত্রে শ্বাসাগত প্রাণ হইয়াছে। তাহাদের এই মুমূর্ষু অবস্থায় যদিও কেহ কেহ ভিষক্ বেশে আগমন পূর্ব্বক ঔষধ প্রদান করে, কিন্তু সে অতি ভয়ঙ্কর ঔষধ'। (সা. বা. স. ২। ১১৪-১৫)

প্রজাদের ওপর জমিদাররা কী কী অত্যাচার করেন তার একটি ১৮-দফা তালিকা এই লেখাটিতে তৈরি করা হয়েছে। শুধু সেই তালিকাটিই বোঝাতে পারে অবস্থা কী ছিল। তত্ত্ববোধিনীর এই রচনাটি এই তালিকা দুটির জন্যই এত বিখ্যাত। আর এই তালিকাদুটিতে বিষয়ের বিস্তার দেখে বোঝা যায় রচনাটির উৎস কৃষকদের সম্পর্কে গভীর সহানুভূতির বোধ। লেখক এতদূর পর্যন্ত মগ্ন যে

তাঁর কাছে দেশ, জাতি ও মানবতার মহৎ পরিপ্রেক্ষিত উপস্থিত হয়—সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর অসংগঠিত শ্রেণীস্বার্থও তুচ্ছ হয়ে পড়ে। তাই তিনি লিখতে পারেন—

> সমুদায় বাঙ্গলাদেশ সিংহ-ব্যাঘ্র্যাদি-সমাকীর্ণ মহারণ্যের ন্যায় বোধ হয়,—যেখানে কোন নিয়ম নাই, কাহারও শাসন নাই,—যেখানে নৃশংস স্বভাব হিংস্র জীবসকল নিরুপদ্রব নির্বিরোধ প্রাণিদিগের প্রাণ নাশার্থেই সর্ব্বদা সচেষ্ট আছে।

আর, একটি সভ্য সমাজে এই পাশবিকতা ও প্রাকৃতিকতার বিপরীতে কৃষকই বেরিয়ে আসে নায়ক হিশেবে,

> পরমেশ্বর তাহারদিগকে [কৃষকদের] লোকাতীত তিতিক্ষা শক্তি প্রদান করিয়াছেন সন্দেহ নাই।—উত্তপ্ত লৌহদণ্ড হৃদয় মধ্যে প্রবেশিত হইলেও সেই দুর্জ্জয় তিতিক্ষাকে পরাভব করিতে পারে না! …মস্তকোপরি অজস্র বারি বর্ষণ হইতেছে, তথাপি ভ্রূক্ষেপও করে না,—ভূমি হইতে ক্ষণমাত্র নেত্র উৎক্ষেপ ও হস্ত উত্তোলন করে না।

[সা. বা. স. ৩। ১১৬]

তি ন

গদ্যের বিকল্প

পদ্য সাংবাদিকতা

১৮২৯-এর ১১ জুলাই 'সমাচার দর্পণ'-এ একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় যে সেদিন থেকে দর্পণ শুধু বাংলায় ছাপা হবে না, ইংরেজি-বাংলা এই দুই ভাষাতেই ছাপা হবে। বাংলা পাঠকদের আশ্বস্ত করতে এই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল—'বাঙ্গালা তর্জ্জমায় মূল কথার ভাব থাকিবে কিন্তু তাহা এতদ্দেশীয় পদ্যের সহিত ঐক্য থাকিবে।'

এ-দেশের পদ্যের সঙ্গে 'ঐক্য' বলতে হয়তো বোঝানো হয়েছিল ইংরেজির সংসর্গে দর্পণের বাংলাও ইংরেজি হয়ে উঠবে না, বাংলা পাঠকরা সে লেখা পড়তে ও বুঝতে পারবেন।

কিন্তু বাংলা বলতে 'পদ্যের' কথাটাই বিশেষ করে এসেছিল হয়তো এই কারণে যে বাংলা পাঠকরা তখনো বাংলায় ছাপা গদ্য বইয়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচিত হয়ে ওঠেন নি। যেটুকু হয়েছেন তাতে, ও পূর্ব অভিজ্ঞতায়, তাঁরা বই বা পুথি বলতেই পদ্য বুঝতেন। তখন দর্পণে নতুন বইয়ের যে-খবর বেরত তাতে দেখা যায় ইংরেজি-বাংলা-সংস্কৃত-পারসিক এই চার ভাষা বা এর মধ্যে যে-কোনো দুই ভাষায় প্রতিশব্দ আছে এমন অভিধান ধরনের বই, কিছু হাতের লেখা বা চিঠিপত্র লেখা বা অঙ্ক শেখার বই, পঞ্জিকা, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, দু-একটি পাঁচালি, গীতার পয়ার-অনুবাদ, ভাগবতের কোনো-কোনো অংশের পয়ার-অনুবাদ, গঙ্গাস্তোত্রের পয়ার-অনুবাদ, দু-একটি পুরাণ, মিতাক্ষরার অনুবাদ, অমরকোষ ও স্মৃতিশাস্ত্রের কোনো-কোনো তত্ত্বের অনুবাদ, চৌরপঞ্চাশিকা-চাণক্যশ্লোক, শৃঙ্গারতিলক-মার্কণ্ডেয় চণ্ডী-বত্রিশ সিংহাসন-এর অনুবাদ, চৈতন্যচরিতামৃত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, বিদ্যাসুন্দর—এইগুলিই সবচেয়ে বেশি ছাপা হত। এর মধ্যে গদ্য বই প্রায় নেই বললেই চলে। সাময়িকপত্রের বাইরে গদ্যচর্চা তখনো স্বীকৃতি পায় নি। সেই কারণেই সাময়িকপত্রেরই দায় ছিল, তাদের যে-ভাষায় লিখতে হয় সেই গদ্য যেন পাঠকের প্রত্যাশা বা অভিজ্ঞতার বাইরে না যায়।

দায় থাকলেও সে দায় মেটানো সহজ ছিল না কারণ কাগজের নিয়মেই কাগজের রচনাগুলিকে গদ্য হতে হত। দর্পণ ও চন্দ্রিকার গদ্যের আলোচনায় আমরা দেখেছি—এই কাগজের গদ্যরচনাগুলিতে পদ্যের অনুকরণ ছিল না। এর পরে 'বঙ্গদূত', 'জ্ঞানান্বেষণ', 'সংবাদপ্রভাকর', 'সম্বাদ ভাস্কর', 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ইত্যাদি কোনো বাংলা কাগজের গদ্যেই সাধারণভাবে পদ্যের অনুকরণ তেমনভাবে ছিল না।

কিন্তু ১৮১৮-তে দর্পণ থেকেই দেখা যায় কাগজের কোনো লেখা কখনো-কখনো প্রচলিত গদ্যভঙ্গি থেকে সরে যায় ও একটা অন্য রকমের চেহারা নেয়, যা পদ্যের একটা ধরনের কাছাকাছি। এই লেখাগুলিতে হয়তো লেখকের নিজস্ব স্টাইলটাও প্রাধান্য পেয়েছে ও এই পদ্যতুল্য হয়ে ওঠার চেষ্টাটা হয়তো সেই ব্যক্তিগত স্টাইলেরই ফল। কিন্তু যে-কারণেই হোক, এ-রকম লেখা অনিয়মিত-ভাবে কিছু-কিছু দেখা যেত।

১৮২৫-এর ৫ মার্চ দর্পণে একটি চিঠি বেরিয়েছিল। তাতে বৃদ্ধের বিবাহ-ইচ্ছা ও ঘটকের কপটতা প্রায় মুখের ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। লেখাটির মধ্যে প্রত্যক্ষ উক্তিও আছে। একেবারে শেষে এসে এই সবের সঙ্গে কোনো মিল না রেখে লেখক লেখেন, 'ঐ বিশিষ্ট বয়োজ্যেষ্ঠ কুলশ্রেষ্ঠ বর নষ্ট ঘটকের মিষ্ট কথায় ইষ্টজ্ঞানে হৃষ্ট হইয়া যথেষ্ট চেষ্টাতে তাবৎ পৈতৃক বিষয় নষ্ট করিয়া প্রকাণ্ড বকাণ্ড প্রত্যাশাবৎ জণ্ডপিণ্ডাশতে ঐ গণ্ড মূর্খ এক মাংসপিণ্ড ক্রয় করিয়া পণ্ডশ্রমমাত্র করিল···।' 'ষ্ট' আর 'ণ্ড'—এই দুই ধ্বনির অনুপ্রাসে-অনুপ্রাসে লেখাটি হঠাৎ বদলে গেল। 'সম্বাদকৌমুদী'তে একটি ধর্ষণের খবর লেখা হচ্ছে ৯ জুলাই ১৮২৫-এ। 'শুনা গেল মোং মীরজাপুর নিবাসি কোন কায়স্থের এক পরমাসুন্দরী যুবতী স্ত্রী সমীপবর্তিনী পুষ্করিণীমধ্যে গাত্রধৌতার্থ গমন করিয়াছিল ইতিমধ্যে ঐ কামিনীকে একাকিনী পাইয়া তত্রস্থ বর্ধিষ্ণু সীতারাম ঘোষের পুত্র বাবু পীতাম্বর ঘোষ কএক জন লোক সমভিব্যাহারে আসিয়া বলে অবলার অম্বর ধরিয়া অন্তরপুরে লইয়া স্বাভিলাষ পূর্ণ করিয়া পরিত্যাগ করাতে কামিনী রাগিণী হইয়া অতিদ্রুত-গমনে পটলডাঙ্গার থানায় গমন করিয়া সমুদায় বিবরণ নিবেদন করাতে ···।' ১৮২৮-এর ১৫ মার্চ 'সম্বাদ তিমির নাশক' থেকে 'বৃদ্ধাবস্থায় বিবাহ করিতে গমন'—লেখাটির আরম্ভ—'বলীপলিত কলেবর ধবলিত কুন্তল শেখর আসন্ন সময়াসঙ্গ কম্পিত সর্ব্বাঙ্গ বিগলিত দশনাবলীক প্রাচীন গৃহশূন্য জন্য মতিচ্ছন্নাবসন্ন কোন শিল্পবিদ্যাপন্ন ব্যক্তি পুনর্ব্বার বিবাহ বাসনা নিতান্ত বিভ্রান্ত বুদ্ধিপ্রযুক্ত

তদ্বিষয়াসক্তচিত্ত হইয়া অন্তরঙ্গ নিকটে কোন প্রসঙ্গ না করিয়া তলে২ ঘটক সহায়তাবলে কলে কৌশলে বার্দ্ধক্যকালে কুতূহলে কলিকাতার কলুটোলার কোন এক নিজ কুটুম্বের সপ্তমবর্ষীয়া কন্যার ভাবি যৌবন জনপদাধিকার করণে বাঞ্ছিত হইয়া লাঞ্ছনা ভয়ে লুকাইয়া নির্লজ্জ সুসজ্জ মাধ্যর্য্যবেশ ধারণ করিয়া বাসরাবসরে সন্ধ্যোত্তরে আনন্দভরে কন্যাকর্ত্তার ঘরে গমন করিতেছিলেন··· ।' এই লেখাটিরই শেষ, 'এ কেমন বুড়া বর বুঝি ইহার কুন্তলদর্শনে স্বীয় মান্যাবলোকনে অভিমানে কালিমার গহিনা মন আপন বর্ণ পরিমোচন করে··· ।' ১৮২৮-এর ৩১ মে 'এক নবীন যোগির উপাখ্যান'-এ 'সমাচার দর্পণ'-এ এ-রকম বাক্য লেখা হয়েছে '···কিয়ৎ কালানন্তর যৌবনসম্পত্তি বিপত্তির মূল হইয়া নানা সুখাভিলাষে মত্ত কুরঙ্গের মত যৌবনতরঙ্গে বিবিধ রঙ্গভঙ্গে অনঙ্গ সঙ্গে আপন সচঞ্চল মনকে নিক্ষেপ করিল ।'

এই বিশেষ রীতি যে কোনো-কোনো বিশেষ বিষয়ের জন্যে নেয়া হত তাও নয় । ১৮২৭-এর ১৫ এপ্রিল 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় বসন্ত রোগ সম্পর্কে একটা খবর বেরয় । প্রতি বছরই নানা কাগজে এ-রকম খবর বেরত । যেমন, 'সমাচার দর্পণ'-এ ১৮১৯-এর ২১ অগস্ট লেখা হয়েছে, 'মোকাম বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে হিজলনা গ্রামে এমত বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে যে প্রায় প্রতিদিন দুই এক জন ঐ রোগদ্বারা মরিতেছে···', বা ঐ বছরের ৩ এপ্রিল দর্পণেই লেখা হল, 'এ দেশে এই বৎসর অতিশয় বসন্ত রোগ বৃদ্ধি হইয়া অনেক লোক মরিতেছে যে লোকের টীকা না হইয়াছে এমত অনেক লোক মরিতেছে সেই ভয়ে যে২ লোকের টীকার না ছিল তাহারদেরও টীকা দিতেছে··· ।' কিন্তু এই একই বিষয় নিয়ে চন্দ্রিকার লেখাটিতে লেখা হল—'বসন্তে বসন্ত রোগের আগমন । পূর্ব্বে যে সকল প্রবল রোগ ছিল সে সকলকে দুর্ব্বল করিয়া মহাবল পরাক্রম ওলাউঠা-রোগে স্ববাহুবলে পূর্ব্ব রোগ রাজেরদিগের রাজ্যচ্যুত করণান্তর সর্ব্বদেশে সেনা-সন্নিপাত সঙ্গে লইয়া কিয়ৎপ্রজাগণের স্থানে প্রাণরূপ কর গ্রহণপূর্ব্বক রাজ্য স্বহস্ত-গত হওয়াতে সুস্থচিত্ত ছিলেন সংপ্রতি এ অশান্ত বসন্তরোগের আগমন হওয়াতে রোগাধিক ওলাউঠা তাঁহার চরিত্র দেখিয়া গাত্রোত্থান করিয়াছেন আর যে২ ভবনে বসন্ত বাস করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অত্যাচার দেখিয়া অবিবোধে পূর্ব্ব রাজা রোগাধীশ ওলাউঠাও স্বীয় প্রতাপ কোন২ স্থানে প্রকাশ করিতেছেন··· ।' বসন্ত রোগের ওপর ব্যক্তিত্ব আরোপের এ-ভঙ্গি সংস্কৃত কাব্য থেকে নেয়া । লেখক কখন এ-ভঙ্গি নেবেন তার কোনো আভাস রচনাগুলির ভিতর থেকে

পাওয়া যায় না। ভঙ্গিটা সংস্কৃত কাব্য থেকে এসেছে বলে হয়তো তখন এই ভঙ্গিটিকে লেখার বিশিষ্টতা বলেই মনে করা হত। চিঠিপত্রে এই ধরনটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হত। বোধহয়, চিঠি যিনি লিখছেন তিনি দূর থেকে নিজের এই বিশিষ্ট ভঙ্গি দিয়ে পত্রিকার কর্তৃপক্ষকে 'মুগ্ধ' করতে চাইতেন। সে-রকম একটি চিঠি 'সংবাদ প্রভাকর' থেকে ১২৬১ (১৮৫৪)-র উদাহরণ হিশেবে উদ্ধৃত হচ্ছে।

অশেষ গুণিগণাগ্রগণ্য মহামান্য প্রিয় বল্লভ শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় প্রণয়ৈক নিকেতনেষু।

এতন্নগরীয়া কতিপয় বারাঙ্গনাগণের নিবেদনমিদং।

সম্পাদক মহাশয়! কোন প্রবল যুবকদল হীনবলা অবলাগণকে নিতান্ত অবলা বোধে অবাধে বধার্থে করাল করবাল ধারণ ও প্রহার করিয়াছিলেন. কিন্তু শ্রীপতি, স্ত্রী প্রতি সদা সদয় বশতঃ অস্মদাদির জীবন নষ্ট না হইয়া কেবল স্থান ভ্রষ্ট হইয়াছে, দেখ সেও আক্ষেপের বিষয় বটে, লোকে অপরাধী হইয়াই দণ্ডনীয় হয়. অবলারা অবলা দোষেই বাসভ্রষ্ট ও নানা কষ্ট পাইতেছে, হে সুবিবেচক সম্পাদক মহাশয় একবার অভাগিনীগণ পক্ষে কৃপাকটাক্ষে স্বল্প ক্ষণ ঈক্ষণ করিলে বিলক্ষণরূপে অলক্ষণ দূর হয়, কোন পত্রপ্রেরক মহাশয় পাঠশালা সন্নিকর্ষে হীনজাতি বেশ্যাবর্গের বাস থাকায় বালকবৃন্দের বিদ্যাবিষয়ক ত্রুটিকর বিবেচনায় তদ্বসবাস পরিবর্ত্তনার্থ ইত্যাদি বিবরণ প্রকাকর [প্রভাকর] ও ইংলিশ-ম্যান পত্রে প্রকটিত করণে স্কুলাধ্যক্ষগণ তৎ পাঠে যথাথ হানিজনক বিবেচনায় কতিপয় সহায় সম্পত্তি বিহীনা বারাঙ্গনাকে ইংরাজী স্কুলের নিকট হইতে উঠাইয়া দিয়াছেন। সম্পাদকমহাশয়! এও ত এক আশ্চর্য্য! দেখুন এক যাত্রায় পৃথক ফল ফলিল. যে কামিনী ঐশ্বর্য্যশালিনী ও স্বসহায়া ছিল সে অকাতরে ঘরে বসিয়া ভ্রূক্ষেপও করিল না. কিন্তু কতকগুলি অনাথিনী বাররমণীগণ স্থানভ্রষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ চির দুঃখিনীর ন্যায়, কেহ বা পর্ণকুটিরে, কেহ বা হট্ট মন্দিরে, কেহ বা তরুতলে বৃক্ষছায়াতে যূথভ্রষ্টা হরিণীর ন্যায় হা হুতাশ করত দিন যাপন করিতেছে. কিন্তু ইহাতে আমাদের দুঃখবোধ নহে. যেহেতুক 'অবশ্যম্ভাবি নো ভাবা ভবন্তি মহতামপি নগ্নত্বং নীলকণ্ঠস্য মহাহি শয়নং হরেঃ।' ···অপর ধরাগ্রগণ্য মান্য সুবিচক্ষণ স্কুলাধ্যক্ষগণ ভদ্রাভদ্র কি লক্ষণে বিবেচনা করিলেন তাহা বোধাতীত. এতন্নগরীয় সদসৎব্যক্তিমাত্রেই অনেকে কামিন্যুপার্জ্জিতার্থেই ধনাঢ্য হইয়াছেন, সুতরাং ধনকরণক মান্য ও ভদ্র রূপে গণ্যও হইতে পারেন, আর ইহাও প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান হইতেছে, সধন ব্যক্তিরই জীবন ধন্য, উক্ত

কল্পিত ভদ্রকুলবধু স্থলোচনাগণ সর্ব্বসাধারণের লোচনানন্দদায়িনী হইয়া নিঃশঙ্কায় স্বামী বর্ত্তমানে পরপুরুষকে সুখসম্ভোগ করিতেছে, কিন্তু তাহাতেও তাহারা ধন গৌরবে এবং স্বামী সত্ত্বেও সাধ্বী হইয়া পরমারাধ্যা ও অহল্যাদি পঞ্চকন্যা তুল্যা প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়াছে, হায় কি দুঃখ ! আমরা পতি প্রতি অপ্রীতি প্রকাশ ও ত্যাগ করিয়াই কি এই অপরাধিনী হইয়াছি ? ঐ প্রবলা কল্পিত কুলবালারা পুরুষ মন বিহঙ্গ ধৃত জন্য যে নবনিতম্ব বাগুরা বিস্তার করত ঈষদ্বস্ত্রাচ্ছাদিত বঙ্কিম নয়নে সহাস্যআস্যে যৎকালীন বারি আনয়ন ছলে স্কুলের নিকটবর্ত্তি বর্ত্মে গমন করে তৎকালীন কি বিদ্যার্থি বালকবৃন্দ নেত্রযুগল অঞ্জলী আচ্ছাদন দেয় ? না সে সময়ে ফুলবান বাণে পরাভূত করে ? অথবা কি কন্দর্প দর্পশূন্য হয় ? সম্পাদক মহাশয়, উক্ত কুলাভিমানী কুলীনা ললনাগণ অস্মদাদি অনুরূপ এরূপ বিরূপ কলঙ্কে অঙ্কিতা কোন প্রকারেই হইতে পারে না, কেননা উক্ত মহিলাগণ মনুষ্য মনোমোহনীয় মোহিনী বেশ দিবসেই প্রায় ধারণ করত মনোরথ সম্পন্ন করিয়া থাকে, কিন্তু নিভৃত রজনী সময়ে নির্ভয়ে নির্ব্বেশ নিবৃত্তি নিবৃত্তি কোন প্রকারে করণে সমর্থা নহে কারণ তৎকালীন শ্বশ্রূ নন্দাদি গৃহজনে গঞ্জনা ও কুলটার কুলটাপবাদ ভয় নিরন্তর অন্তরান্তরে সমুদিত থাকে, এবং লোক লজ্জাভয়ে ঘৃণিত পতির প্রতিও প্রীতি প্রকাশ করে। মহাশয় অধীনাগণ পক্ষে বিধি যে বিধি সৃজন করিয়াছেন তাহাতে নিরবধি উভয় পক্ষেই সঙ্কট। সংপ্রতি যদি উক্ত সুমতিগণের অনুমতি হয় তবে অনন্ত দোষ পরিহারার্থ অনন্ত কূলে বিক্রীত হই আর স্বচ্ছন্দে সচ্চিদানন্দে মান, জ্ঞান, কায় প্রাণ প্রদান পূর্ব্বক গৌরাঙ্গ লীলায় লীন হওত অনায়াসে মনোভিলাষ সম্পন্ন করি এবিষয়ে মহাশয়ের যেমত অভিমত হয়, অলমতি বিস্তরেণ

মেদিনীপুর বাসভ্রষ্ট বারাঙ্গনানাং

[সা. বা স ১। ২১১-১২]

দর্পণ ও চন্দ্রিকার গদ্যের আলোচনায় আমরা অস্পষ্ট ভাবে দুটি আদর্শের কথা অনুমান করেছিলাম। একটি আদর্শ ইংরেজি কাঠামোতে সংস্কৃত রীতির অনুসরণ করা হয়েছে। আর-একটি আদর্শে লেখকের কণ্ঠস্বরের প্রক্ষেপে রচনার ভিতর ব্যক্তিত্ব সঞ্চারিত হয়েছে।

বিশের দশকের দর্পণ থেকে পঞ্চাশের দশকের প্রভাকর পর্যন্ত কখনো-কখনো উদাহরণ পাওয়া যাচ্ছে এই তৃতীয় আর-একটি আদর্শের। এই আদর্শে ইংরেজি কাঠামো অনুসরণ করা হয় নি বা লেখকের কণ্ঠস্বরের প্রক্ষেপের ফলে এই

আদর্শের রচনাগুলিতে কোনো ব্যক্তিত্বও সঞ্চারিত হয় নি। বরং, কখনো সংস্কৃত সমাসোক্তির বিবেচনাহীন প্রয়োগে, কখনো অনুপ্রাস-যমক-অলংকারের যথেচ্ছ ব্যবহারে এই রচনাগুলিতে একদিকে বাক্যের শৃঙ্খলা ব্যাহত হয়েছে, অন্য দিকে লেখকের কণ্ঠস্বর একটি সামাজিক ভঙ্গিতে চাপা পড়েছে। সেই সামাজিক ভঙ্গি কখনো প্রধানত কবিওয়ালাদের কাছে ধার করা, কখনো আবার সংস্কৃত থেকে নেয়া। কবিওয়ালাদের একটি বিশেষ ধরনও সংস্কৃত থেকেই নেয়া হয়েছিল।

এই রচনাগুলিতে গদ্যের কাজ খবর জানানো বা পাঠকের সংযোগ প্রতিষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এই রচনাগুলিতে পাঠকের মনোরঞ্জন করা, পাঠককে কিছুটা খুশি করাই লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই ধরনের রচনার পরিমাণ এত বেশি নয়, যার জোরে বলা যেতে পারে যে পাঠকবিনোদনও সাংবাদিকতার একটি উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছিল, কিন্তু, এই অল্পপরিমাণ উদাহরণের জোরেও বলা যায় যে পাঠকবিনোদনও কোনো-কোনো রচনার একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সেই বিনোদনের উদ্দেশ্যে লেখকরা গদ্যের কোনো নতুন প্রয়োগ আবিষ্কার করলেন না, বরং, পদ্য-পাঁচালির যে-ধাঁচটির সঙ্গে পাঠক পূর্বপরিচিত ছিলেন, কলকাতা শহরে যে কবিগান ও হাফ-আখড়াই গানের অভিজ্ঞতা পাঠকের ছিল—তার সঙ্গে মিল রেখেই গদ্যের ধরন কোথাও-কোথাও কখনো-কখনো বদলে গেছে। আর সেই বদলের ঝোঁকেই কখনো-কখনো লেখক খুব সহজেই পদ্য ছড়াও লিখে ফেলেছেন—গদ্যের মধ্যেই।[৩৬]

১৮২২-এর ২ মার্চ 'সমাচার দর্পণ'-এ 'বিদেশস্থ ব্যক্তির পত্র' নামে একটি রচনা বেরয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেছেন এই লেখাটি ভবানী-চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর। চিঠিটির বিষয় কলকাতা শহরে কেউ-কেউ ব্রাহ্মণদের চাইতেও বৈষ্ণবদেব বড় মনে করেন। বৈষ্ণবদের মন্দির বা আখড়া থেকে প্রসাদ এনে তাঁরা খান। এই সাধারণ মন্তব্যের একটি দৃষ্টান্ত লেখক দেন। কোনো এক গৃহবধূ বাড়ির কর্তার অজ্ঞাতে এ-রকম কাজ করে যাচ্ছিলেন। খবর পেয়ে বাড়ির কর্তা একদিন লুকিয়ে থেকে হাতেনাতে ধরলেন যে ঐ আখড়ার অধিকারী কোনো এক বৈষ্ণবের হাত দিয়ে ঐ গৃহবধূর কাছে নানা রকম প্রসাদ পাঠিয়েছেন। বাড়ির কর্তা বৈষ্ণবকে মারলেন ও বাড়ির দারোয়ানকে মারলেন।

লেখাটি এখানেই শেষ—খবর হিশেবে ও ঘটনা হিশেবে। কিন্তু লেখাটির শেষে লেখক যোগ করলেন, 'পুরবাসীগণেরা নানাবিধ সান্ত্বনা করিলে পরে ঐ বৈষ্ণব ও দ্বারপাল উক্তি প্রত্যুক্তিতে বিলাপ করিতেছেন।

পয়ার বিলাপ

বৈষ্ণব কহিছে দ্বারি করি নিবেদন।
এই কর্ম্মে প্রতিদিন মোর আগমন ॥
এমন বিপাকে আমি কবু ঠেকি নাই।
ভালমন্দ সুখ দুঃখ কিছু জানি নাই ॥
ঘোল খায় কৃষ্ণদাস কড়ি দেয় নিধি।
সেই মত মোর ভাগ্যে ঘটাইলা বিধি ॥
নাহি ছুল্যাম নাহি পাল্যেম সুখ উদ্দীপন।
রাবণ আজ্ঞাতে মারীচ মজিল যেমন ॥
রাবণ হরিল সীতা বদ্ধ মহোদধি।
এই কর্ম্মে সেই মত ঘটাইল বিধি ॥
না আইলে অধিকারী অধিক রুষ্ট হবে।
এবার এখানে আইলে এ বেটা মারিবে ॥
রাম মারে রাবণে মারে অবশ্য মরণ।
দুই মতে দায়ে কাটে কুমুড়া যেমন ॥

দ্বারপাল কহিতেছে।

শুনিয়া বৈষ্ণব বাক্য কহে দরোয়ান।
এবার আমার হাতে হারাইবে প্রাণ ॥
সুন্দর করিল সুখ বিদ্যারে লইয়া।
কোটালের যায় প্রাণ কিসের লাগিয়া ॥
বার ২ মুরগীতে খায়ে যায় ধান।
এই বার মুরগীর বধা যাবে প্রাণ ॥
ভক্ত গুরুর লণ্ড চেলা হইয়াছে মেলা।
নিত্য২ এই রূপ কর লীলাখেলা ॥
আমি জানি শিক্ষা পড়া শিখান গোঁসাই।
শিক্ষা পড়া এত পোড়া আগে জানি নাই ॥
আমার চৌকিতে পাখি এড়াইতে নারে।
জানিলে কি ভণ্ড বেটা ফাঁকি দিতে পারে ॥

[স. সে. ক. ১। ১১১-১২]

পদ্য ছড়াটিতে গদ্যের চাইতে কোনো নতুন তথ্য নেই, কিন্তু গদ্যে যে-ইঙ্গিত

দেয়া যায় নি, পদ্যে অধিকারী ও গৃহবধূর ভিতরে অবৈধ সম্পর্কের সেই একটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দেয়া সম্ভব হয়েছে। 'রাম মারে রাবণ মারে'—এই সংকটে বৈষ্ণব বেশ নাটকীয় হয়ে ওঠে ও পাঠক-দর্শকের কাছে গ্রাহ্য হয়। আর দারোয়ানের জবাবে তো একটা বেশ ছোট নাটকই জমে ওঠে, 'কোটালের প্রাণ যায় কিসের লাগিয়া'—এই কথা বলে বিদ্যাসুন্দরের চকিত উল্লেখে গদ্যরচনার ভিতরে অন্য একটি মাত্রা যুক্ত হয়। শুধু গদ্যরচনাতে এ মাত্রা ছিলও না, এ-মাত্রা আনাও যেত না।

শুধু যে আদিরসের কারণেই পদ্য লেখা হত তা নয়, অন্য রকম প্রয়োজনেও লেখক পদ্যের আশ্রয় নিতেন, হয়তো গদ্যের এক ধরনের অসম্পূর্ণতার বোধ থেকেই। রঘুমণি ভট্টাচার্য নামে এক পণ্ডিত কাশীতে মারা গেছেন। তাঁর মৃত্যু-সংবাদটি বেরিয়েছে ১৮১৯-এর ৯ জানুয়ারির দর্পণে। মৃত্যু সংবাদটি দেয়ার পর যুক্ত হল, 'কোন পণ্ডিত তাঁহার মরণের সমাচারে অতিশয় খেদান্বিত হইয়া এই শ্লোক লিখিয়া এই দর্পণের নিমিত্ত পাঠাইলেন।

বিদ্যা কল্প বৃক্ষ ছিল মন্দাকিনীতীরে।
কূলভগ্ন হেতু মগ্ন হইল সেই নীরে॥
ব্যাপিল অজ্ঞানরূপ অন্ধকার ঘোর।
রঘুমণি হরণ করিল কাল চোর॥
অলঙ্কার নিরাধার করে হাহাকার।
হইল বেদান্ত অন্ত নিতান্ত এবার॥
স্তব্ধ অতি শব্দ শাস্ত্র আশ্রয়রহিত।
মন্ত্রণা করেন তন্ত্র যন্ত্রণাযন্ত্রিত॥
ধর্ম্মশাস্ত্র মর্ম্ম পীড়া প্রাপ্ত এত দিনে।
অগণিত স্থিতি চিন্তা গণিতের মনে॥
মীমাংসা করিতে নারে মীমাংসা ভাবিয়া।
অসংখ্য সাংখ্যের দুঃখ স্থান না পাইয়া॥
কর্কশ স্বভাব তর্ক তর্কিয়াছে ভাল।
অন্যের আশ্রয়ে বরং কাটাইব কাল॥
মনে খেদ করে বেদ হইল হতাশ।
গৌড়ভূমি পরিহরি করে কাশীবাস॥

[স. সে. ক. ১। ৩৯-৪০]

গদ্য শোকলেখনটিতে এমন কিছুই অনুল্লেখিত ছিল না যা পদ্যের বিশেষ সুযোগে বলা গেল। কিন্তু পদ্যে তাঁর পাণ্ডিত্যের বৈশিষ্ট্য বোঝাতে কোনো আলংকারিক অতিশয়োক্তি ব্যবহারের সুযোগ ছিল না। পদ্যে মৃত ব্যক্তিকে বিদ্যাকল্প বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা দিয়ে শুরু করা হয়েছে। তারপর, 'কাল চোর' বলে মৃত্যুর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তারপর, অলংকার, বেদান্ত, ধর্মশাস্ত্র, গণিত, মীমাংসা, সাংখ্য ও তর্কশাস্ত্র—এই বিষয়গুলিকে সমাসোক্তির সাহায্যে এক-এক চরণের ব্যক্তিত্ব দেয়া হয়েছে।

আগের উদাহরণটির সঙ্গে এই উদাহরণটির বিষয়গত পার্থক্য সত্ত্বেও, ভঙ্গিগত মিল বেশ স্পষ্ট। দুটি জায়গাতেই গদ্যে যা বলা যায় নি, পদ্যে তাই বলার চেষ্টা, বা অন্তত তার ইঙ্গিত দেয়ার চেষ্টা।

কিন্তু এ-রকম আলংকারিক প্রয়োজন নয়, শুধু সাংবাদিক কারণেও গদ্যরচনা পদ্যে বদলে গেছে কখনো-কখনো। ১৮২৬-এর ১৯ আগস্ট দর্পণে খবর বেরিয়েছিল যে কলকাতায় মণিপুর থেকে যাত্রার একটি দল এসেছে। তারা কলকাতার নানা জায়গায় গান করছে। এইটুকু তথ্যই মাত্র গদ্যে আছে। কিন্তু তারপর পদ্যে লেখা হচ্ছে—

> আশ্চর্য্য সম্প্রদায় এই স্ত্রীলোকের দল।
> স্ত্রীলোকেতে কৃষ্ণ সাজি করয়ে কৌশল ॥
> ললিতা বিসখা চিত্রা আর রঙ্গদেবী।
> সুদেবী চম্পকলতা তং বিদ্যাদেবী।
> ইন্দুরেখা সাজি সবে রাসলীলা করে।
> পুরুষে বাজায় বাদ্য নারী তাল ধরে।
> কৃষ্ণের সহিত রঙ্গ করয়ে রসিকা।
> রসিকার রূপ শুন নাহিক নাসিকা।
> গুণবতীদিগের গুণ অতি উচ্চস্বরা।
> শুনিলে সে মিষ্টস্বর না যায় পাসরা।
> বাদ্যতালে নৃত্য বটে কিন্তু লম্ফঝম্প।
> গান করে জয়দেব মুদ্রা তার কম্প।

[স. সে. ক. ১। ১২৫-২৬]

এ লেখাটিকে পদ্যে মৌলিক সাংবাদিকতার উদাহরণ বলা যেতে পারে। কারণ, পদ্যছড়াটিতেই ঘটনার বিশদ বিবরণ আছে—রসিকার নাকের খর্বতা সম্পর্কিত

খবর সহ। হঠাৎ মণিপুরের এই যাত্রাদলটির সংবাদ দিয়ে পদ্য লেখা হল কেন? তার জবাব বোধ হয় ছড়াটির মধ্যেই দেয়া হয়েছে—মেয়েরাই কৃষ্ণ সেজেছে, পুরুষরা বাজাচ্ছে, মেয়েরা গান গাইছে। কলকাতার লোকজন তখন মেয়েদের এই সক্রিয়তায় হয়তো কিছুটা চঞ্চলই।

এ-পর্যন্ত আমরা দেখলাম, সাংবাদিক গদ্য কখনো-কখনো সংস্কৃত রীতির অনুসরণে ও কবিগানের অনুকরণে যমক ও অনুপ্রাস অলংকারে একটা এমন চেহারা নিয়েছে যা প্রায় পদ্যের কাছাকাছি। এ-ছাড়াও কখনো কখনো অতিশয়োক্তির টানে, বা, আদিরসঘেঁষা ইঙ্গিতের লোভে গদ্য রচনা গিয়ে শেষ হয়েছে পদ্যে।

কিন্তু এর বাইরেও, এমন কতকগুলি বিশেষ পরিস্থিতি সাংবাদিকতায় দেখা গেল যেখানে গদ্যের সমর্থন বা ভূমিকা ছাড়াই পদ্য লেখা হচ্ছে সাংবাদিক প্রয়োজনেই। সেখানে পদ্য হয়ে উঠেছে গদ্যের বিকল্প। পদ্য সেখানে সাংবাদিকতার প্রয়োজনীয় ভাষা—অলংকারমাত্র নয় বা গদ্যরচনার সম্প্রসারণমাত্র নয়। পদ্যছড়া যে গদ্যের অলংকরণ বা সম্প্রসারণ থেকে গদ্যের বিকল্প হয়ে উঠছে, এর ভিতরে কোনো কালানুক্রমিকতা কি নিহিত আছে? তখনকার সব কাগজপত্র এখন পাওয়াই যায় না। যা পাওয়া যায় তাও ধারাবাহিক নয়। ফলে এ-রকম বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্যে তথ্যের যে-ভিত্তি দরকার, তা তৈরি করে তোলা প্রায় অসম্ভব। আমরা শুধু অন্যান্য সাক্ষ্যের জোরে এই অনুমানটুকুমাত্র করতে পারি যে সাংবাদিকতায় পদ্যব্যবহারের এই পরিবর্তনের মধ্যে একটা কালানুক্রমিকতা হয়তো ছিল।

তিরিশের ও চল্লিশের দশকে কবিওয়ালাদের ভাষার সন্নিহিত রচনারীতি বাংলা সাংবাদিক গদ্যের একটি প্রধান ধারা হয়ে উঠেছিল প্রধানত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রভাবে ও গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের সমর্থনে। তাই এই বিশেষ গদ্যভঙ্গির একটা কালানুক্রমিকতা আমরা অনুমান করতে চেয়েছি। এই কালানুক্রমেই কবিওয়ালাদের গদ্য কখনো-কখনো পয়ারের চেহারা নিয়েছে।

১৮৩১-এ (১২৩৮) 'সংবাদ প্রভাকর' থেকে এই কবিতাটি 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় 'প্রায় অবিকল' প্রকাশিত হয়—সম্পাদক শুধু ছন্দের মাত্রার সমতার জন্যে "হইল" স্থানে "হৈল" করেছেন ও "ওয়াইনগ্লাস" শব্দের পরিবর্তে "টমলর" লিখিত হইয়াছে।'

কালে কালে ভাল কাল হইল উদয়।
নিত্য২ নিত্যকর্ম্ম পরিবর্ত্ত হয়॥

শয্যা হৈতে উঠে সবে পায়ে দিয়া বুট।
বাসিমুখে আহার হয় রুটী বিস্কুট ॥
বাহ্যে গেলে পরে সব নাহি লয় জল।
কাগজ দিয়া মুছে ফ্যেলে গুহ্য হইতে মল ॥
হাতে মাটী দিতে জেন হয় বজ্রাঘাত।
তাড়াতাড়ি পুঁছে ফ্যেলে রুমালেতে হাত ॥
মুখ ধুতে হলে বলে যত গুণ পুরুষ।
লেয়াও লেয়াও জলি [জলদি ?] সাবান বুরুষ ॥

*　　　*　　　*

একই বদনে কিবা করিব বর্ণন ॥
গ্রাস　*　*　বাবুদের তৈল হৈল ভাই।
ভাগীরথী হয় টব মোল্যো কি বালাই ॥
আহ্নিকের অনুষ্ঠান শুন বলি স্থূল।
পূজার আসন চ্যার বেঞ্চ আর টুল ॥
ধ্যানের কহিতে কথা হয় নানা ধ্যান।
ধ্যানের কএক মন্ত্র কম সেকেন　*　*　॥
কোশাকুশী টমলর জল তাতে জীন।
নৈবেদ্য এণ্ডাসিদ্ধ আর ভাজা মীন ॥

*　　　*　　　*

মিল্ক রোজ চরণামৃত ও এফর ফুল ॥
হুমরো টুমরো ফুলবাবু হৈল সবে ফুল।
ভিন্ন গোত্রে নাহি খান বাবু সমুদয়।
সান বেয়ের কাবাব রুটী হবিষ্যান্ন হয় ॥
বাবুদিগের নব কীর্ত্তি শুন অতঃপর।
শ্রবণ করেন পুরাণ অপূর্ব্ব লেকচর ॥
ধন্য ধন্য পুণ্যবান নববাবুগণ।
সোসাইটী হল তীর্থ কাশী বৃন্দাবন ॥
যাগযজ্ঞ শ্রাদ্ধ শান্তি শুন বিবরণ।
নিশাতে যবনীসঙ্গে রঙ্গেতে রমণ ॥

ধিক ধিক অধিক লিখনে কিবা ফল।
ঈশ্বর সদয় হল্যে দিব প্রতিফল ॥

এর প্রায় পাঁচ বছর পরে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়'-এ এই একই বিষয় নিয়ে প্রায় একই ভাষায় একটু ভিন্ন তালের ছন্দে লেখা হয় এই কবিতাটি।

সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়। ৩ মার্চ ১৮৩৬

পঞ্চপদী

গিয়াছিনু কলিকাতা, যা দেখিনু গিয়া তথা, কি লিখিব তার কথা,
হা বিধাতা, এই হলো শেষে। ভদ্রলোকের ছেলে যত,
কদাচারে সদা রত, সুরাপান অবিরত, কত মত কুচ্ছ দেশে২।
কাঙ্গালি বাঙ্গালি ছেলে, ভুলেও না বাঙ্গালা বলে, ম্লেচ্ছ কহে
অনর্গলে, তেরিয়াঁ হয়ে পথে চলে, কাছ দিয়া গেলে, বলে
গো টো হেল। পেন্‌টলুন জাকিট পরে, ধুতি চাদর তুচ্ছ করে,
সদাই চাবুককরে মুখে বোল ইয়েস বেরিওয়েল। এবে
করি নিবেদন, গিয়াছিনু যেইক্ষণ, করিলাম নিরীক্ষণ, কোন
ধামে নব্যভব্য বাবু কত জন ॥ ইংরাজ ফিরিঙ্গি সনে, বসি
সবে একাসনে, টিপিন করে হৃষ্টমনে, জনে২ কথোপকথন ॥
একজন বলে হিয়ের, ডোন লেফ্ ও মাই ডিয়ের, হুইচ আই সে
হিয়ের২ ফিয়ের গাড২। বেড সোয়ের নো ওয়েল, দেট ইজ
রোড টো গো হেল, আল ওবে বাইবেল, দেন উইল গো
নিয়ের লাড২। পরে বলে একদুষ্ট, অশিষ্ট ও অবিসৃষ্ট,
লেটকরকালী কৃষ্ণ, না ভজিও দুষ্ট ইষ্ট, তুষ্ট হবেন প্রভু য়িশুখ্রীষ্ট।...

[স. সে. ক. ২। ৬৯১]

'সংবাদ প্রভাকর'-এর সঙ্গে এ-রকম প্রভাব ও বিনিময়ের আরো কিছু উদাহরণ দেয়া যায়। আগের উদাহরণে প্রভাকর থেকে কবিতাটি যেমন চন্দ্রিকায় সংকলন করা হয়েছে, তেমন সংকলনের বদলে প্রভাকরের আদর্শে একটি বিশেষ বিষয় নিয়ে কবিতারচনার নজিরও পাওয়া যায়। এর পরের উদাহরণটি সে-রকমই একটি রচনা। চন্দ্রিকার গদ্য প্রসঙ্গে ভবানীচরণের দ্বিধার কথা আলোচিত হয়েছে। এই কবিতাটিতে সেই দ্বিধারই আর-এক প্রকাশ ঘটেছে। ভবানীচরণ ইংরেজি শিক্ষার বিরোধিতা করতে চান না, কিন্তু যে-ইংরেজি শিক্ষা স্বদেশীয় আচার ও হিন্দু ধর্মের রীতিনীতি সম্পর্কে ছাত্রকে বীতশ্রদ্ধ করে তোলে—তার বিরোধিতা

করেন। দ্বিধার মীমাংসা হিন্দুমতে ইংরেজি শিক্ষা। 'শ্রীযুত গৌরমোহন আঢ্যের ইংরাজী বিদ্যালয়'-এ সেই হিন্দু-ইংরেজি শিক্ষাদর্শ প্রমাণের সুযোগ পাওয়া গেল। পাঁচ মাসের ব্যবধানে একটি গদ্যে ও একটি পদ্যে 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় এই বিদ্যালয়টি সম্পর্কে লেখা হল। পদ্য রচনাটিতে এমন কোনো বিশেষ বাচন নেই যা পদ্যে ছাড়া বলাই যেত না, এমন কোনো ইঙ্গিতও নেই যার জন্যে পদ্যের ছন্দ ও অলংকারের সুযোগ অপরিহার্য। বরং যেন মনে হয়—পদ্যবন্ধে বিষয়টির গুরুত্বই খানিকটা কমেছে। কিন্তু তখন এই বিষয়টির পাঠক যে নাগরিক বাঙালি আবেদনটিকে তার কাছে আরো গ্রাহ্য করে তোলার জন্যেই পদ্য ব্যবহার করা হয়েছে। তা হলে সে-ই নাগরিক বাঙালাকি গদ্যের নির্দিষ্টতার চাইতে পদ্যের ছন্দ—অলঙ্কারের আড়াল একটু পছন্দ করছিল ?[৩৭]

১৬ মে ১৮৩১

শ্রীযুত গৌরমোহন আঢ্যের ইংরাজী বিদ্যালয়। —অনেকেই অবগত আছেন এতন্নগরে গরাণহাটায় শ্রীযুত গৌরমোহন আঢ্য অরিএন্‌টেল সিমিনরি নামক এক ইংরাজী বিদ্যাভ্যাসের পাঠশালা স্থাপনা করিয়াছেন তাহাতে ইংরাজ শিক্ষক রাখিয়া স্বয়ং অধ্যক্ষতা করণপূর্ব্বক বালকদিগকে বিলক্ষণ রূপে সুশিক্ষিত করাইতেছেন তাহাতে কোনমতেই নাস্তিক হইতে পারিবেক না ইহাতে অনুমান হয় আঢ্য মহাশয় অতি ত্বরায় বিলক্ষণ আঢ্য হইবেন যেহেতু যেসকল পাঠশালায় ইংরাজী পড়িয়া বালকেরা নাস্তিক হয় ভদ্রলোকেরা তাহা প্রায় জ্ঞাত হইয়াছেন তথায় বালক পাঠাইতে যাঁহার অনিচ্ছা হইবেক তিনি বালককে ইংরাজী বিদ্যা উপার্জ্জনের দ্বারা আঢ্য করণাশয়ে আঢ্যের নিকট অবশ্যই পাঠাইবেন সুতরাং ইহাতে আঢ্য বাবুর পাঠশালায় অনেক বাবুর সন্তান পাঠার্থী হইলে ঐ গুণী মহাশয় কেননা ধনী হইবেন ভাল আমরাও তাঁহার ধাম্মিকতা গুণশ্রবণে মনে সন্তুষ্ট হইয়া ধাম্মিকদিগকে অনুরোধ করিতেছি এবং মদেকাত্মীয় বিজ্ঞবর সম্বাদ প্রভাকর সম্পাদকেরো এতদ্রূপ অভিপ্রায় বটে যে সকল বালক ত্যক্ত হইয়া অন্য পাঠশালায় গমন ত্যাগ করিয়াছে তাহারা ঐ পাঠশালায় গমন করিলে ভাল হয়—১২ সেপ্টেম্বর ১৮৩১

পরম পূজনীয় শ্রীল শ্রীযুত চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণাম্বুজেষু—

ওরিএণ্টেল সিমেনরি নামে বিদ্যালয়।

এতন্নগরী মধ্যে গরান হাটায়॥

ঐ * * শুন বিবরণ।
ইংরাজ শিক্ষকতায় আছে তিনজন ॥
স্থাপক তাহার হন আঢ্য মহাশয়।
নিজে তিনি গুণী বড় ইংলিস ভাষায় ॥
সুশিক্ষক যে তিনজন তাহার বিশেষ।
উক্ত শ * * বিদ্যা তাঁদের আছয়ে অশেষ ॥
তার মধ্যে * * * * ল নামে একজন।
প্রধান শিক্ষক তিনি অতি বিচক্ষণ ॥
প্রথম * * * শ্রেণী তাঁহার অধীন।
স্বয়ং সকলকে পাঠ দেন প্রতিদিন ॥
ঐ শ্রেণীর পাঠ * * * অর্থ ভাল পায়।
বিলক্ষণ উচ্চার * * *র শূনা যায় ॥
তাহার পরের শ্রেণী তৃতীয় চতুর্থ।
লাডলিমোর নামে তার শিক্ষক সমর্থ ॥
প্রেনটেল * * তিনি সুবিখ্যাত অতি।
তথায় * * * শ্রেষ্ঠ ছিলেন সুমতি ॥
উক্ত দুই শ্রেণী আছে তাঁহার অধীনে।
তাঁর অধীনের বৃদ্ধি হয় দিনে২ ॥
পঞ্চম ষষ্ঠ শ্রেণীর শুন বিবরণ।
সেবেজ নামক এক শিক্ষক সুজন ॥
স্পেলিংআদি নানা গ্রন্থ পড়ে তার কাছে।
তাহাতেই তাঁহার সুখ্যাতি হইয়াছে ॥
যেহেতু বালকে করে স্পষ্ট উচ্চারণ।
এবং কিঞ্চিৎ পারে কথোপকথন ॥
অতএব নিবেদন করি মহাশয়।
বালককে শিক্ষাইতে বাঞ্ছা যার হয় ॥
উচিত তাঁহার ঐ স্থানেতে পাঠান।
রাখিয়া আপন ধর্ম্ম হইবে বিদ্বান ॥
আমার লিখনে যদি প্রত্যয় না হয়।
তথায় গমন করি জানিবা নিশ্চয় ॥

সংক্ষেপেতে রচিলাম সব বিবরণ।
উপহাস না করিবেন এই নিবেদন॥

কস্যচিৎ পত্রপ্রেরকস্য।

আমরা···পাঠকবর্গকে অনুরোধ করিতেছি যদ্যপি ইংরাজী বিদ্যা বালককে শিক্ষা করাইতে হয় তবে উক্ত পাঠশালায় পাঠাইলে ভাল হয় আমরা বিশেষ অবগত হইয়াছি শ্রীযুত গৌরমোহন আঢ্য অতি ধার্ম্মিক এবং বালকগণের যাহাতে সুরীতি হয় তাহাতে বিশেষ মনোযোগ আছে।

[স. সে. ক. ২ । ৬৬৪-৬৫]

উদাহরণ দুটির তুলনা করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়। তখন পদ্য বলতে যে-অন্ত্যমিলসর্বস্ব পয়ার ও অনুপ্রাস-যমক অলংকার বোঝাত তার অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য গদ্যরচনাটিতেই আছে। আর, যে-নিরাভরণতা, প্রত্যক্ষতা ও তথ্যসর্বস্বতা গদ্যের গুণ হয়ে উঠেছিল—পদ্য অংশটিতে তেমন অনেক বৈশিষ্ট্যও আছে। শুধু অন্ত্য মিলই গদ্য ও পদ্যকে আলাদা করেছে। গদ্যে পদ্যলক্ষণ আর পদ্যের গদ্যলক্ষণ—এই পদ্যসাংবাদিকতার সময় ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। এই বিষয়টি আমরা পরের অংশে আলোচনা করব।

কিন্তু গদ্য ও পদ্যসাংবাদিকতার এই ভূমিকাবদল একটি বিচ্ছিন্ন ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ ঘটনা নয়। 'সমাচার চন্দ্রিকা'তেই এমন কিছু পদ্যরচনা দেখা যাচ্ছিল যাতে বিষয়ের দিক থেকেই পদ্যের গড়নটি অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। সেগুলিতে কবিওয়ালাদের রচনারীতি সম্প্রসারিত করে পয়ারে পৌঁছচ্ছিল বলা চলে না। এক অনিবার্যতাবোধ থেকেই কখনো-কখনো পদ্যের গড়নে রচনা লেখা হয়েছে। ১৮৩০-এর ৪ ও ৮ নভেম্বর পর পর দুটি সংখ্যায় 'সমাচার চন্দ্রিকা'তে একটি দীর্ঘ পদ্যরচনা বেরয়। আধুনিক পাঠক পড়েই বুঝবেন রচনাটি রামমোহন রায়কে নিয়ে, স্বগতোক্তি বা স্বীকারোক্তির ধরনে। রামমোহনের জন্ম, বাল্যকাল, ফারসি শিক্ষা, ইংরেজি শিক্ষা, খ্রীস্টধর্ম্ম সম্পর্কে আগ্রহ, বেদান্তের সঙ্গে পরিচয়, বাদশাহি পাঞ্জা নিয়ে বিদেশ যাত্রা, 'যবনী রমণী'র সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, তার গর্ভে তাঁর কন্যা সন্তানের জন্ম, বিদেশযাত্রার আগে মনের দুঃখ—এই বিষয়গুলি বেশ বিস্তারিত-ভাবে বলা হয়েছে। কোথাও যে রামমোহন সম্পর্কে অশ্লীল আক্রমণ করা হয়েছে তাও নয়, বরং, এমন একটি রচনায় তখনকার রীতি অনুযায়ী লেখকের কাছে থেকে যে-আক্রমণ প্রত্যাশিত তা এখানে ঘটেই নি বলা যায়। যেন স্বদেশ ছেড়ে

বিদেশে যাবার আগে রামমোহনের দুঃখই লেখক বর্ণনা করতে চান। মোট ১২৪ চরণের পদ্যবন্ধটি থেকে আমরা মাত্র ৪৬টি চরণ উদ্ধৃত করছি।

সমাচার চন্দ্রিকা। ৪ নবেম্বর ১৮৩০

দ্বিজরাজের খেদোক্তিঃ।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রিকাকর শুন মহাশয়।
নিবেদন করি কিছু মনের আশয়॥
ব্রহ্মকুলোদ্ভব হই দ্বিজরাজ নাম।
নগরে বসতি কিন্তু নহে নিজধাম॥
পরিচয় দিনু এবে মনোদুঃখ শুন।
কহিতে২ দুঃখ হইবে দ্বিগুণ॥
প্রথম বয়সে হই হরিপরায়ণ।
তিলক তুলসী কণ্ঠী করিয়া ধারণ॥
হরি বলে ফিরি গলে বান্ধি শালগ্রাম।
দেশে২ ভ্রমিলাম ছাড়ি নিজগ্রাম॥
ধন বিনা মান নাই বিশেষ বুঝিয়া।
কেমনে পাইব ধন না পাই ভাবিয়া॥
পাইলাম উপদেশ পারশী পড়িতে।
বহু শ্রম করিলাম তদর্থ বুঝিতে॥
যখন যবন বিদ্যা হইল উপার্জ্জন।
কুল ধর্ম্ম কর্ম্ম সব করি বিসর্জন॥

. . .

যবনী প্রেয়সী গর্ভে সুপুত্র জন্মিল।
রাজা নাম দিনু তার নিকটে রহিল॥
পরে দেখি এ বিদ্যায় নাহি হয় ধন।
শিক্ষিতে ইংরাজী বিদ্যা রত হল মন॥
কোন খ্রীষ্টীয়ান দয়া করি অতিশয়।
শিক্ষাইল নানা বিদ্যা যাতে জ্ঞান হয়॥

. . .

আসিয়া মিলিল এক দ্বিজ সুপণ্ডিত।
বেদান্তের ব্যাখ্যা শুনি হইনু বাধিত॥

কিছু কাল তাঁর কাছে শুনিয়া বিশেষ।
ক্রাইষ্ট প্রতি অতিশয় হইল বিদ্বেষ ॥

...

বাতিক হইল জোর স্বপ্ন দেখি কত।
পাতশাই পাঞ্জা পাই এই অভিমত ॥
এদেশের রাজা হয়ে প্রজারে পালিব।
আপন মতের মধ্যে তাবতে আনিব ॥
কাহার সাক্ষাতে এই মনের বাসনা।
কহিবাতে সে আমারে কহিল মন্ত্রণা ॥
যদ্যপি বিলাতে তুমি যেতে পার ভাই।
পূরিবে বাসনা তার সন্দেহ ত নাই ॥
মনভ্রমে কয়েছিনু অবশ্য যাইব।
বিবাহের কথা কও পাঞ্জা দেখাইব ॥
সেই ব্যক্তি ঐ উক্তি রাষ্ট্র করি দিল।
লজ্জা ভয়ে ভীত হয়ে যাইতে হইল ॥

...

[স. সে. ক. ২ । ৬৭২-৭৩]

৮ নবেম্বর ১৮৩০

...

ভাগ্যগুণে মিলেছিল যবনী রমণী।
পরম সুন্দরী তিনি সুপ্রিয়বাদিনী ॥
তার গর্ভে জন্মে এক সুলক্ষণা কন্যা।
আমার নয়নতারা রূপে গুণে ধন্যা ॥

...

এখন তোমরা মনে এই ভাব ভাই।
এত দিনে দেশ হইতে গেল রে বালাই ॥
যাহা হউক এই এক সখ মনে আছে।
উইলের হুন পাওনা আছে যার কাছে ॥...

[স. সে. ক. ২ । ৬৭৪-৭৫]

এ-রচনাটির প্রধান বৈশিষ্ট্য এর সূক্ষ্ম যুক্তি। সেই যুক্তিতে রামমোহনের বিলাত-

যাত্রাকে ন্যায়বিচারের জন্যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে ভারতীয়দের প্রথম প্রতিনিধিত্বের ঘটনা থেকে উল্টে দেয়া হয়েছে যে এই বিদেশযাত্রা আসলে রামমোহনের শাস্তি—'দেব দ্বিজ দ্বেষ আমি করিয়াছি যত / তার প্রতিফল বুঝি হয় শাস্ত্রমত।' কারণ জাহাজে একমাত্র অপরাধীদেরই কালাপানিতে পাঠানো হয়, সুতরাং কালাপানি পার হওয়া মানেই অপরাধীর শাস্তি ভোগ করা। এতদিন হিন্দু ধর্মের বিরোধিতা করার কারণেই রামমোহন ধর্মের হাতে এই শাস্তি পাচ্ছেন।

অবশ্য কহিবে লোকে পাপের এ ফল।
আমিও স্বীকার করি দণ্ড এ সকল॥
অতি উৎকট পাপ ফলে এই জন্মে।
আমি কি যাইতে চাহি নিয়ে যায় ধর্ম্মে॥

[স. সে. ক. ২ । ৬৭৫]

এই যুক্তিতেই বিদেশযাত্রায় রামমোহনের এই পাপবোধের কারণও লেখক খুঁজে পেয়েছেন—'এদেশের রাজা হয়ে প্রজারে পালিব'—তাঁর এ-রকম ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু এখন বিদেশে গিয়ে স্বজনহীন ভাবে তাঁকে প্রায় 'নির্বাসন' দণ্ড নিতে হবে।

পদ্যের এই ধরনে ছাড়া রামমোহনের বিদেশযাত্রার যুক্তিকে এমন উল্টে দেয়া সম্ভব হয়েছে। কবিগান-পাঁচালিগান-কৃষ্ণযাত্রায় নানা রকম প্রহেলিকা ও প্রশ্নোত্তরে অভ্যস্ত শ্রোতারা ও দর্শকরা, ও ভারতচন্দ্রের রচনারীতির সঙ্গে পরিচিত পাঠকরা—পদ্যের এই ধরনটিতে অভিজ্ঞ। সেই অভিজ্ঞতা নিয়েই এই পাঠক যখন বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রের পাঠক হয়েছে, তখন, সে স্বচ্ছন্দেই এই যুক্তি-বিপর্যয়ের কৌতুক ধরতে পারে। সেই কৌতুক রামমোহনের বিরুদ্ধে আক্রমণ নয়। কিন্তু রামমোহনের ব্যক্তিত্বের বিপর্যয় ঘটানোর পক্ষে যথেষ্ট। বাংলা গদ্য তখনো ভাষার এই জটিল প্রয়োগের ক্ষমতা অর্জন করে নিতে পারে নি। অভ্যস্ত পদ্য তাই তখন লেখকদের অবলম্বন হয়ে উঠেছে।

'সংবাদ প্রভাকর' ও ঈশ্বরচন্দ্রের আগেই এই প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল কিন্তু তার কোনো ধারাবাহিকতা ছিল না, বা, পদ্যই তখনো পর্যন্ত লেখকদের কাছে আবশ্যিক ফর্ম হয়ে ওঠে নি। তখনো গদ্য—গদ্যই, পদ্য—পদ্যই। ঈশ্বরচন্দ্রই পদ্যকে গদ্যের বিকল্প করে তুললেন।

১৮৩১-এর ২৮ জানুয়ারি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'সংবাদ প্রভাকর' বেরয়। দেড় বছর নিয়মিত প্রকাশের পর কাগজটি বন্ধ হয়ে যায়। চার

বছর পরে ১৮৩৬-এর ১০ আগস্ট থেকে প্রভাকর নতুন করে বেরয়—সপ্তাহে তিনবার। তিন বৎসর নিয়মিত প্রকাশের পর ১৮৩৯-এর ১৪ জুন প্রভাকর বাংলাভাষায় প্রথম দৈনিক কাগজ হিশেবে বেরতে শুরু করে।

১৮৩১ থেকে সাপ্তাহিক 'জ্ঞানান্বেষণ'-এর প্রকাশ। এব প্রধান লেখক ও কার্যত সম্পাদক ছিলেন গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ। ১৮৩৫-এর ১০ জুন থেকে মাসিক 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' আরম্ভ। প্রায় এক বছর পর এই কাগজটি সাপ্তাহিক হয়ে যায় ও ১৮৪৪ থেকে দৈনিক হয়ে যায়। ১৮৩৯-এর মার্চ থেকে সাপ্তাহিক 'সম্বাদ ভাস্কর' প্রকাশিত হয়। প্রধান লেখক ও কার্যত সম্পাদক ছিলেন গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ। ১৮৩৯-এই গৌরীশঙ্করের পরিচালনায় সাপ্তাহিক 'সম্বাদ রসরাজ' বেরতে শুরু করে। ১৮৪২ থেকে দ্বিভাষিক মাসিক 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' বেরয় ও ১৮৪৩ থেকে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'। ১৮৪৬ থেকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নেতৃত্বে সাপ্তাহিক 'পাষণ্ডপীড়ন' মাত্র পনেরো মাস বেরিয়েছিল।

এগুলি তখনকার বিশিষ্ট সাময়িক ও সংবাদপত্র। এছাড়াও আরো অনেক কাগজ বেরিয়েছে ও বন্ধ হয়ে গেছে। এই তালিকা থেকেই বোঝা যাবে যে ১৮৩১ থেকে বাংলায় কাগজের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে। একসঙ্গে অনেক-গুলি কাগজ বেশ আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল। তার মানে, বাংলায় কাগজের সমর্থক একটি পাঠক শ্রেণী ততদিনে তৈরি হয়ে গেছে।

এর ভিতর সাংবাদিক হিশেবে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠায় প্রধান হয়ে উঠেছিলেন। তার একটি কারণ নিশ্চয়ই তাঁদের রচনাশৈলী। কিন্তু এই রচনাশৈলীর ফলেই বাংলা সাংবাদিকতার ধরনটি তাঁরা সম্পূর্ণ বদলে দেন। এই লেখাগুলিতে তাঁরা গদ্যচর্চার সেই তৃতীয় আদর্শটিকে অনুসরণ করে কবিওয়ালাদের বাকরীতি ও স্টাইল গদ্যে ব্যাপক অনুসরণ করেন। কিন্তু সেই অনুসরণ থেকে ঈশ্বরচন্দ্রের পদ্যসাংবাদিকতা স্বতন্ত্র ও গদ্যনিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠা পায়।

কিন্তু শুধুমাত্র রচনাশৈলীর জন্যেই এঁদের সাংবাদিকতার বিশেষ এই ধরনটি পাঠকদের ভাল লাগত না—এই শৈলীর পক্ষে যোগ্য বিষয়ও তৈরি হয়ে উঠছিল। বা অনেক সময়ই বিষয়ের একটা নতুন মাত্রা আবিষ্কৃত হতে থাকে। ফলে এই বিশেষ ধরনের রচনাগুলি কখনো অশ্লীলতার দিকে চলে যায় ও কখনো-কখনো ব্যক্তিগত কেচ্ছা বা 'গসিপ' এই সব লেখার অন্যতম অবলম্বন হয়ে ওঠে। এই বিশেষ ধরনের রচনা এতটাই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ও সংবাদ-সাময়িকপত্রের মূল

রচনাগুলি থেকে এতটাই স্বতন্ত্র হয়ে যায় যে শেষ পর্যন্ত গৌরীশঙ্কর ১৮৩৯-এ 'সম্বাদ রসরাজ' নামে ও ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৪৬-এ 'পাষণ্ডপীড়ন' নামে দুটি বিশেষ কাগজ বের করে ছাপা হরফে কবির লড়াইয়ে মাতেন। 'সম্বাদ রসরাজ ও 'পাষণ্ডপীড়ন'-এর প্রকাশ প্রমাণ করে যে এই ছাপা হরফে কবির লড়াই তখন পাঠকসমাজের কাছে কতটা জনপ্রিয় হয়েছিল।

'সম্বাদ রসরাজ'-এ কাশিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ ও তাঁর স্ত্রী স্বর্ণময়ী সম্পর্কে কুৎসা রটানোর জন্যে ১৮৪৩ সনে ও লালা ঈশ্বরীপ্রসাদের মানহানি করায় ১৮৫৫-তে সুপ্রিম কোর্টে গৌরীশঙ্কর দোষী প্রমাণিত হন ও শাস্তি পান। বিধবাবিবাহ আইন পাশের পর কলকাতার বাঙালি ধনী পরিবারের নানা কেচ্ছা নিয়ে একটি রচনা প্রকাশ করায়, বিশেষ করে শোভাবাজারের কমলকৃষ্ণ দেবের বিরোধিতার ফলে রসরাজ বন্ধ করে দেয়া হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'পাষণ্ডপীড়ন'-এ গৌরীশঙ্করের সঙ্গে কবিতাযুদ্ধ শুরু হয়। এই কবিতাযুদ্ধ তখনকার পাঠকদের কাছে এতই জনপ্রিয় ছিল যে বাংলা সাময়িক পত্র বা সংবাদপত্রের একটা জনভিত্তিই তাতে তৈরি হয়ে যায়।

ঈশ্বরচন্দ্রের পদ্যসাংবাদিকতা বাংলা কাগজের পাঠকরা এতটাই গ্রহণ করে ফেললেন কেন ?

ঈশ্বরচন্দ্রের দিক থেকে তার প্রধান কারণ তিনি তাঁর এই সাংবাদিক পদ্য-রচনাগুলিকে সম্পূর্ণতই গদ্যের বিকল্প করে তুলেছিলেন। অন্যান্য সাংবাদিক-লেখকদের মতো তিনি সংস্কৃতের বা কবিগানের কিছু রীতি গদ্যে ব্যবহারমাত্র করলেন না, বরং যে-যে-নতুন বিষয়ের জন্যে নতুন সাংবাদিকতার প্রয়োজন হয়েছিল সেই নতুন বিষয়গুলিকেই তিনি কবিগানের বা পাঁচালির ফর্মে ঢেলে নতুন কবিগান বা পাঁচালি লিখলেন। পাঠকরা তাদের পরিচিত ও পরম্পরাগত পয়ারে, লাচারিতে বা কবিগানেই নতুন বিষয়কে নতুনভাবে পেলেন। কিন্তু নতুন গদ্যভাষা পাঠের ও অর্থবোধের বাধা তাতে থাকল না। অথচ সেই নতুন বিষয়গুলি যখন কবিগান বা পাঁচালির পুরনো ধরনে পাঠকদের কাছে এল, তখন বিষয়ের টানে সেই ধরনটাও অনেকখানি বদলে গেল। ফলে, পাঠকদের কাছে পরিণতিতে এমন একটি ফর্ম হয়ে ঈশ্বর গুপ্তের পদ্যসাংবাদিক কিছু রচনা এল যার সঙ্গে অন্বয়বোধ করতে পাঠকের অভিজ্ঞতাগত বা শিক্ষাগত কোনো বাধাই থাকল না অথচ যে-রচনা পাঠকের আধুনিক জিজ্ঞাসার বা কৌতূহলেরও কিছু তৃপ্তি ঘটাল। সেখানে কবিগান, হাফ-আখড়াই গান, লাচারি-পাঁচালি সম্পর্কে

ঈশ্বর গুপ্তের অভিজ্ঞতা তাঁকে প্রায় পরাক্রান্ত করে তুলেছে। তিনি এক-একটি দীর্ঘ গীত রচনা করতেন সাংবাদিক নিবন্ধের মতোই। 'নীলকর' তেমনই একটি রচনা। এই রচনার ফর্মটির উদাহরণ হিশেবে আমরা সামান্য কিছু অংশের উদ্ধৃতি দিচ্ছি। (সব উদাহরণই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনাবলির বসুমতী-সংস্করণ থেকে উদ্ধৃত।)

নীলকর

(গীত)

(১)

কবির সুর

মহড়া

কোথা রৈলে মা বিক্টোরিয়া মাগো মা

কাতরে কর করুণা।…

নামেতে নীলের কুঠি হ'তেছে কুটি কুটি

দুখীলোক প্রাণে মারা যায়।

পেটে খেতে নাহি পায়।

কুঠেল সব শাহেবজাদা ধপধপে বাইরে শাদা

ভিতরে পচা কাদার ভড়ভড়ানি

পেঁকো গন্ধ তায়।

ও মা একে মন্‌সার ফোঁস-ফুস্থনি

ধুনোর গন্ধ তায়।

হ'লে চোরের কাছে ধর্ম্ম-কথা

মর্ম্ম কভু বোঝে না॥

চিতেন

হলো নীলকরদের অনরারি

মেজেষ্টরি ভার।…

কুইন মা, মা, মা মাগো।

হলো নীলকরদের অনরারি

মেজেষ্টবি ভার।

কুঠিয়াল বিচারকারী লাটিয়াল সহকারী

বানরের হাতে হ'ল কালের খোন্তা,
লোন্তাজলে চাষ।
হ'ল ডাইনের কোলে ছেলে সঁপা,
চীলের বাসায় মাছ।
হবে বাঘের হাতে ছাগের রক্ষে,
শুনেনি কেউ শুনবে না ॥

অন্তরা

প্রজা ধচ্ছে আর খাচ্ছে তারা এককালে,
পিটেতে মাচ্ছে খুব কোঁড়া।
কাটা ঘায়ে লুনের ছিটে পোড়ার উপর পোড়া
যেন গোদের উপর বিষফোঁড়া ॥

চিতেন

হ'লে ভক্ষকেতে রক্ষাকর্ত্তা ঘটে সর্ব্বনাশ।
কালসাপ কি কোন কালে দয়াতে ভেকে পালে
টপাটপ অমনি করে গ্রাস।
বাঙ্গালী তোমার কেনা এ কথা জানে কে না?
হয়েছি চিরকেলে দাস ॥

করি শুভ অভিলাষ।
মা কল্পতরু আমরা সব পোষা গরু
শিখিনি সিং বাঁকানো,
কেবল খাবো খোল বিচিলি ঘাস ॥

যেন রাঙ্গা আমলা তুলে মামলা
গামলা ভাঙ্গে না,
আম্‌রা ভুসি পেলেই খুসি হব,
ঘুসি খেলে বাঁচব না ॥...

(৩)

রাগিণী পরজ—তাল কাওয়ালী

"বেঁচে থাকুক্ বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে"—সুর।

ও মা কুইন তোমার ইণ্ডিয়া ধাম
রুইন কোরো নাক।
যদি সোনার ভারত, খাস্ করেছ,
বাস ক'রো মা, থাক থাক।
শাস্ত্র বলে পরামর্শে,
আপন চক্ষে সোনা বর্ষে,
তুমি এলে ভারতবর্ষে,
হর্ষে রবে সব।...

ঈশ্বর গুপ্ত পরিষ্কার বলেই দিয়েছেন এটি একটি 'গীত'। মহড়া, চিতেন-অন্তরা-চিতেন-অন্তরা-চিতেন—এই বাঁধা গতে এই কবির গীতটি লেখা। ফলে তখনকার পাঠক রচনাটি দেখা মাত্র এর শ্রাব্য-দৃশ্যরূপ কী হবে—তা ধরে নিতে পারতেন। সেই শ্রাব্য-দৃশ্যরূপ কবিগান, হাফ-আখড়াই গান, রথের বা অন্যান্য অনুষ্ঠানের সঙ-এ যে-তৎপরতায় তখনকার সামাজিক ব্যাপার সম্পর্কে মন্তব্য করা হত, এই ছাপা কবিতাটিও তেমনই তৎপর মন্তব্য বলে গৃহীত হতে পারত। লেখার ভিতরের সেই নাটকীয়তা, সেই পাল্টা কথার শক্তি, সেই ইটের বদলে পাটকেল বাধাহীন ভাবে পাঠকের কাছে পোঁছে গেছে। এক-একটি মন্তব্য বা বাক্যবন্ধ প্রবচনের দ্রুততা পেয়ে যায়—'ও মা কুইন তোমার ইণ্ডিয়া ধাম / রুইন কোরো নাক,' 'কুঠিয়ালের মেজেষ্টরি, লাঠিয়ালের রেজেস্টরি,' 'ঠিক ধর্মহীন ধর্মতলার ধর্ম অবতার'। ঈশ্বর গুপ্তের পদ্যসাংবাদিকতার ভাষার এই তৎপরতা তাঁর যে-কোনো রচনাতেই দেখা যাবে। বাউলের সুরে ভৈরবী রাগিণীতে পোস্তা তালে তিনি নতুন গীতের মিনতি শোনান

ওগো মা, বিক্টোরিয়া কর গো মানা
কর গো মানা॥
যত তোর রাঙা ছেলে আর যেন মা
চোক রাঙে না চোক রাঙে না॥

বা যে চিরটা কাল মাছ খেয়েছে
কেমনে সে শুকনো খাবে ?
মাছ চিনে প্রাণ বেরিয়ে যাবে ?

বা ও মা, গো হত্যাটি উঠ্‌য়ে দেহ
অভয় পদে এই বাসনা
মাগো, সকল গরু ফুরিয়ে গেলে
দুগ্ধ খেতে আর পাব না।

বা আড়খেমটা তালের আড়ে-আড়ে পৌষ পার্বণে পিঠে খেতে না-পারায় বিলাপ

এবারে বছরকার দিন কপালে ভাই,
জুটলো নাক পুলি পিঠে
যে মাগগির বাজার, হাজার হাজার,
মোত্তে'ছে লোক কপাল পিটে ॥
গিন্নী মাগীর বদন বাঁকা,
হাতে মাত্র দু গাছা শাঁকা,
সময়ে না পেলে টাকা,
কপাল ভাঙে আস্ত ইটে ॥
রুক্ষু হাতে গিয়ে ঘরে,
কাছাতে দাঁড়ালে পরে,
'ড্যাকরা বুড়ো ন্যাকড়া করিস'
বলে দেবে খ্যাংরা পিটে ॥

এ-রকমই পয়ারে-পয়ারে ঈশ্বর গুপ্ত নতুন পাঁচালিও লেখেন নতুন বিষয় নিয়ে। সেটা এতই নিপুণ পাঁচালি যে পুরনো পাঁচালির মতোই সেখানে একটির পর একটি ঘটনা আসে, একটির পর একটি বর্ণনা আসে, প্রায় কোনো সময়েই নাটকের বেগে সে-ঘটনা বা সে-বর্ণনা এগয় না। 'ইংরাজী নববর্ষ' বা 'পৌষ-পার্বণ'-এ একই বিবরণ দেন। প্রত্যেকটিই দীর্ঘ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ রচনা।

ইংরাজী নববর্ষ

... .

প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ যত শ্বেত নর ॥

চারু পরিচ্ছদযুক্ত রম্য কলেবর।
নানা দ্রব্যে সুশোভিত অট্টালিকা-ঘর॥
মানমদে বিবি সব হইলেন ফ্রেস।
ফেদরের ফোলোরিস ফুটিকাটা ড্রেস॥
শ্বেত পদে শিলিপর শোভা তায় মাখা।
বিচিত্র বিনোদ বস্ত্রে গলদেশ ঢাকা॥
চিক্ চিরুণি চারু চিকুরের জালে।
ফুলের ফোয়ারা আসি পড়িতেছে গালে॥
বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছুটে॥
আহা তায় রোজ রোজ কত রোজ ফুটে॥···

পৌষ পার্ব্বণ

···　　　···　　　···

ও বাড়ীর মেয়েদের বলিয়াছি খেতে।
নূতন জামাই আজ আসিবেন রেতে॥
তোমার কি ঘর পানে কিছু নাই টান।
হাবাতের হাতে যায় অভাগীর প্রাণ॥
কি বলিব বাপ মায় কেন দিলে বিয়ে।
একদিন সুখ নাই ঘরকন্না নিয়ে॥
কোনদিন না করিলে সংসারের ক্রিয়ে।
দিবানিশি ফেরো শুধু গোঁপে তেল দিয়ে॥
সবে মাত্র দুইগাছা খাড়ু ছিল হাতে।
তাহাও দিয়াছি বাঁধা মেয়েটির ভাতে॥
সুদে সুদে বেড়ে গেল কে করে খালাস?
বাঁচিবার সাধ নাই মলেই খালাস॥···

এই ধরনটিতে অভ্যস্ত পাঠকের কাছে ছোট কবিতাও এ-রকম কবিগানের বা পাঁচালির বা হাফ-আখড়াইয়ের অংশ হয়ে যায়।

কিন্তু সেই ছোট কবিতার বেলায় ঈশ্বর গুপ্ত আরো একটি সুযোগ তৈরি করে নেন। তিনি একটা কোনো বিষয় বেছে না নিয়ে, তার বদলে এক-একটা

সামাজিক চরিত্রকে বেছে নেন। 'সংবাদ প্রভাকর' চার ও পাঁচের দশকে বাংলা ভাষার সবচেয়ে বড় কাগজ হয়ে উঠেছিল। তখন নাগরিক বাঙালি সমাজের এই সব সামাজিক টাইপ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, কখনো-কখনো বাঙালি সমাজের বাইরের টাইপও বাংলা পাঠকের বেশি চেনা হয়ে গেছে। ঈশ্বর গুপ্ত এই সামাজিক টাইপগুলিকে, 'ঠোঁটকাটা', 'কানকাটা', 'তোষামুদে', 'মেকি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত', 'ইংরাজ সম্পাদক', তাঁর সাংবাদিক পদ্যরচনার বিষয় করে নিলে পাঠকের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময়েব সুযোগ জুটে যায়—কারণ, একটা বিশেষ সময়ের অভিজ্ঞতা থেকেই এই সামাজিক টাইপগুলির জন্ম। তখন আর কোনো বিশেষ ঘটনার সঙ্গে এই টাইপগুলি বাঁধা নয়, বরং. তাদের টাইপ অনুযায়ী ঘটনা তৈরি করে যায়। ঈশ্বরচন্দ্র এই সুযোগটি তাঁর সাংবাদিক পদ্যগুলিতে অনায়াসে নেন।

ঠোঁটকাটা

পিপে শুদ্ধ পার করে শুষে খাই রম।
লাঠালাঠি কাঁটাকাঁটি কিসে আমি কম ॥
বাবা কিসে আমি কম ?
...		...		...
গোডিম ভাঙে নি যবে উঠে নাই গোঁপ।
তখন করেছি আমি পিতৃপিণ্ড লোপ ॥
শালগ্রাম ফেলে দিয়া বেশ্যা আনি ঘরে।
ভার্য্যা তারে রেঁধে দিয়ে পদসেবা করে ॥
চক্ষে দেখে চুপ মেরে কাষ্ঠ হন বাবা।
গো টু হেল ওল্‌ড ফক্‌স ড্যাম ড্যাম হাবা ॥

কানকাটা

আমার নিকটে তুই নাহি পাস ক্ষম।
লাঠালাঠি কাটাকাটি কিসে তুমি কম ?
বাবা কিসে তুমি কম ?
ফাইট লড়েগা ফের কম্‌ কম্‌ কম।
বাবা কম্‌ কম্‌ কম ॥

তোষামুদে

তুড়ি মারে টপ্পা গায় টাকা ভেবে সার।
বয়ে মরে রাশি রাশি যে-আজ্ঞার ভার ॥…
বাগানেতে শশা তোলে পাড়ে পিচ নীচু।
কথায় কথায় কহে জল উঁচু নীচু ॥

মেকি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যত সকলেই অনুগত
অবিরত উপকার পান।
তোমাদের মত হ'লে বিধি আছে আছে ব'লে
এখনই দিবেন বিধান ॥

ইংরাজ সম্পাদক

এ দেশেতে আছে যত সম্পাদক শাদা।
সকলেই আমাদের বড় ভাই—দাদা ॥…
আগেই তোমরা আছ উপরেতে চোড়ে।
আমরা রয়েছি নীচে একপাশে প'ড়ে ॥…
গবর্ণরে কহিতেছ কেমন করিয়া।
থাকুন হিঁদুর শিরে খাড়া ওচাঁইয়া ॥

ছদ্ম মিশনরি

হেদো বনে কেঁদো বাঘ রাঙ্গামুখ যার।
বাপ বাপ বুক ফাটে নাম শুনে তার ॥…
কহিতে মনের খেদ বুক ফেটে যায়।
মিশনরি ছেলেধরা ছেলে ধরে খায় ॥

ঈশ্বর গুপ্ত পদ্যসাংবাদিকতার বিষয়টিকে এইভাবে অব্যবহিত থেকে একটু দূরে সরিয়ে নিয়েছিলেন যার ফলে সাংবাদিক গদ্যরচনায় সংবাদ বা ঘটনার যে-চাপ থাকে, তা থেকে তাঁর সাংবাদিক পদ্য মুক্ত থাকতে পারে। সেই সামান্য বিচ্ছিন্নতাতেই এই পদ্য, সংবাদের চাইতে কিছু বেশি হয়ে ওঠে পাঠকের কাছে।

এই পদ্য পাঠককেও ঘটনার অব্যবহিত চাপ থেকে কিছুটা মুক্তি দেয়। এমন-কি যখন তিনি 'কোন মোকদ্দমা উপলক্ষে', বা 'বুলবুল পক্ষীর যুদ্ধ', বা 'বাবু চণ্ডীচরণ সিংহের খ্রীষ্টধর্ম্মানুরক্তি', বা, 'বাবু দ্বারকানাথ · মৃত্যু' এ-রকম কোনো অব্যবহিত ঘটনা নিয়ে পদ্য লেখেন, তখনো, ঘটনাটিকে একটা বিচ্ছিন্নতায় নিয়ে যান। সে-বিচ্ছিন্নতায় ঘটনাটিকে ও সেটি কী করে পদ্যের বিষয় হয়ে উঠল সেই প্রক্রিয়াটি আস্বাদ করা যায়। আমরা একটি ঘটনার সাংবাদিক রিপোর্ট ও একই রকম ঘটনা নিয়ে ঈশ্বর গুপ্তের পদ্যের তুলনা করলে দেখতে পাব পদ্যে ঈশ্বর গুপ্ত পাঠককে ঘটনার কোন অতিরিক্ত বিবরণ দিচ্ছেন।

১৮৫৩-র ১৮ জানুয়ারি 'সংবাদ প্রভাকর'-এ বুলবুল পাখির লড়াই নিয়ে একটি খবর বেরিয়েছিল। খবরটির দুটো ভাগ। একটি পত্রলেখকের পাঠানো রিপোর্ট, আর-এক ভাগে সম্পাদকীয় মন্তব্য। পাখির এই একই লড়াই নিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র একটি কবিতাও লেখেন—'বুলবুল পক্ষী'র যুদ্ধ। এই দুটি লেখার তুলনা করলে বোঝা যায় একই লেখক কোন ভিন্ন উদ্দেশ্যে গদ্য ও পদ্য ব্যবহার করছেন।

বুল্‌বুলি-পক্ষির যুদ্ধ

গত দিবস আমরা বুল্‌বুলি যুদ্ধের সংবাদ অতি সংক্ষেপে লিখিয়াছি; অদ্য কোন সম্ভ্রান্ত বন্ধু তদ্বিস্তারিত বর্ণনা করত অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রেরণ করাতে সানন্দচিত্তে নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম; পাঠকগণ অবলোকন করুন।

"সিমুলিয়াস্থ শ্রীযুত বাবু দয়াল চাঁদ মিত্র মহাশয় এবং যোড়াসাঁকো নিবাসি শ্রীযুত রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর উভয়ে শীতকালে বুল্‌বুলি পক্ষি সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহারদিগের যুদ্ধ দ্বারা আমোদ-প্রমোদ করিয়া থাকেন, তাহাতে উভয়েই বিশেষ উদ্যোগী হইয়া দেশ বিদেশ হইতে পক্ষী আনয়ন করত সাধারণ জনগণের মনোরঞ্জন এবং তদুপলক্ষে অনেকানেক মনুষ্য প্রতিপালন করিয়া থাকেন। এই আমোদের এই এক মহা সুখ যাহা আমরা প্রতিবৎসর প্রাপ্ত হইয়া থাকি তাহা অপর কোন কাণ্ডে দৃষ্টিগোচর হয় না, অর্থাৎ এই সামান্য সংগ্রাম সন্দর্শনার্থ কলিকাতাস্থ যাবতীয় ধনাঢ্যব্যক্তি একত্রীভূত হইয়া স্বীয় পুত্র পৌত্র দৌহিত্র অমাত্যবর্গকে সমভিব্যাহারে লইয়া উপস্থিত হইয়া থাকেন, অন্য নিমন্ত্রণে সম্ভ্রান্ত লোকের এতদ্রূপ সমারোহ হওয়া অতি সুকঠিন, কেননা দেব দর্শন ও নৃত্য গীতাদি উপলক্ষ্যে ধনাঢ্যব্যক্তিকে আহ্বান করিলে কেহ বা স্বয়ং কেহ বা প্রতিনিধি দ্বারা সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন; কিন্তু এই সূত্রে সংবাদ করিবামাত্র সহস্র কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলে

অতি প্রত্যুষে প্রাণপণ যত্নে প্রাত্যহিক ক্রিয়া সমাধা করিয়া সভায় কিঞ্চিৎ স্থান প্রাপ্ত হওনাভিলাষে সত্বর হইয়া আগমন করেন এবং ইহাতে কেহ উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত স্থান বিবেচনা করেন না। অতএব জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, উক্ত মহাশয়দিগকে যেমত দশটা সৎক্রিয়ায় লিপ্ত করিয়াছেন, এই আমোদকেও তাহার সহিত সংযুক্ত করুন।"

"শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের সিমুলিয়াস্থ সদনের সম্মুখে যে পক্ষিশালা শ্রীযুক্ত বাবু দয়াল চাঁদ মিত্র মহাশয় প্রস্তুত করিয়াছেন সেই পক্ষিশালায় রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পক্ষি সমস্ত অষ্টাহ হইতে আনীত হইয়াছিল, পরে গত ৪ মাঘ রবিবার বেলা দশ ঘটিকা হইতে দুই প্রহর আড়াই ঘণ্টা পর্য্যন্ত উভয় দলের বুলবুলির যুদ্ধ বিক্রম হয়; ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৭ যোড়া পক্ষির সংগ্রাম হইয়াছিল, তন্মধ্যে মিত্র বাবুর পক্ষীয় ২৭ পক্ষি এবং রাজপক্ষীয় ১০ পক্ষি জয়ি হয়, এ বিষয়ের মধ্যবর্ত্তি স্বরূপ শ্রীযুত হরিনারায়ণ গোস্বামী মহাশয় ব্রতী হইয়াছিলেন, ঐ মহাশয় এ বিষয়ে অতি সদ্বিবেচক এবং সুমীমাংসক বটেন, ইহার মীমাংসায় উভয় পক্ষিদলের পক্ষি পক্ষের পক্ষগণ সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং আমরাও সন্তুষ্ট হইয়াছি; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, রাজা বাহাদুর তিন বৎসরাবধি আহার নিদ্রা পরিহার পূর্ব্বক নানা স্থান হইতে পাখি সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেছেন, ফলে কোন বৎসর তিনি জয়ী হইতে পারেন নাই, ইহাতে কি নির্দ্দয় মিত্র বাবুর দয়া হয় না? তিনি কোন্ বিবেচনায় রাজাকে হেঁট-মুণ্ড এবং সজলনেত্র করিয়া বিদায় করিলেন? ভাগ্যে রাজা বুদ্ধিমান, এই কারণে তিনি পূর্ব্বেই সাবধান হইয়া স্বীয় রথে চতুরশ্ব সংযুক্ত করিয়া পক্ষিদিগ্যে আনিয়াছিলেন, সেই জন্য তিনি অতি দ্রুত চম্পট পূর্ব্বক অশ্রুধারা নিক্ষেপ করিয়া আক্ষেপ দূর করিলেন।"

[সা. বা. স. ১। ৪২৪-২৫]

বুল্‌বুল্ পক্ষীর যুদ্ধ

যেরূপেতে হয়েছিল পক্ষীর সমর।
কিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত তার লিখি অতঃপর॥
ধনীর প্রধান পক্ষী ভূপতির ছিল।
হুনুরির হাতে পোড়ে রণে ভঙ্গ দিল॥
ঘাড়ের পালক তার করে তুলাধনা।
অধোমুখে রহে রাজ-পক্ষ যত জনা॥

সেই ভাল গত সম শাঁসে যায় কাটা।
অনায়াসে তারে ছাড়ে কি বুকের পাটা॥
বাবুর বেতাল পক্ষী অতিশয় রোষে।
সে তালে বানায়ে তাল নুটি ক'রে চোষে॥
তাল ঠুকে এসে তাল সাত তাল খায়।
তালকানা হলো শেষ বেতালের ঘায়॥
একে একে রাজাজীর ভাল পাখী সব।
বাবুর পাখীর কাছে হলো পরাভব॥
অপর পক্ষীর কথা কি কহিব আর
সমর করিল যেন অমর-কুমার॥
হায় হায় কি লিখিব দে'খে হয় দয়া।
সপ্তমী না হতে হতে হইল বিজয়া॥
বাবুর দুধের শিশু গোটা দুই নয়া।
করিয়াছে নৃপতির কুরুচের গয়া॥
টাইম্ বাড়াতে ছিল বাসনা রাজার।
পূর্ব্বের নিয়ম রক্ষা করা হলো ভার॥
নিজ পাখী সকলের দেখিয়া সঙ্কট।
দেড় ঘণ্টা আগে রাজা দিলেন চম্পট॥
বসনে ঢাকেন মুখ চক্ষে বহে নীর।
জুতা ফেলে ভিড় ঠেলে হলেন বাহির॥
সহায় তাঁহার পক্ষে এসেছিল যারা।
দুঃখ পেয়ে তারা সব বলবুদ্ধি হারা॥
ছোঁড়া বুড়া গোড়াগুলো ফেবাতাড়া খেয়ে।
শিরে করে করাঘাত মনস্তাপ পেয়ে॥
কেহ বা নয়নজলে ভিজাইল মাটি।
কেহ কারে বুঝাইয়া লয়ে যায় বাটী॥
বার বার তিনবার তাহে নাহি খেদ।
অবশ্য ভূপতি শেষ পড়িবেন বেদ॥

গদ্য রিপোর্টের চাইতে কবিতায় কাহিনীর সূক্ষ্ম বর্ণনা অনেক বেশি। গদ্যে

পাখিদের চাইতেও প্রধান হয়ে উঠেছে পাখির মালিকরা। রিপোর্টে তাই হওয়ারও কথা। পদ্যরচনাটিতে মালিকদের বর্ণনা গৌণ, পাখিরাই প্রধান। তা ছাড়াও যুদ্ধের বর্ণনায় 'ঘাড়ের পালক তার করে তুলাধনা', 'নুটি করে চোষে', 'কুরুচের গয়া', 'তাল ঠুকে এসে'—এইভাবে বুলবুল পাখির যুদ্ধের বিষয়টিকে একটা বিশেষ ঘটনা থেকে বদলে দেয় একটা পদ্যের বিষয়ে। তখন আর রাজা আর বাবুর দুই ভিন্ন চরিত্র প্রধান থাকে না। গদ্যরচনায় রাজা ও বাবুর চরিত্র ও আচার-আচরণ সম্পর্কে শেষ দিকে সামান্য ইঙ্গিত আছে। পদ্যরচনাটিতেও রাজা সম্পর্কে কয়েক চরণ আছে কিন্তু পদ্যের সেই চরণকটি এই ঘটনা থেকে অনেকখানি বিচ্ছিন্ন, যেন কাব্যিক একটি উল্লেখমাত্র। গুপ্তকবির সাংবাদিক পদ্যে ঘটনা থেকে বিষয় এ-রকম বারেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

নীলকরদের অত্যাচার সম্পর্কে প্রভাকরে নিয়মিত রচনা বেরত। সে রচনাগুলির প্রধান বিষয় ছিল ঘটনার যথাযথ রিপোর্টিং—যাতে সরকারের নজর পড়ে। মুর্শিদাবাদ, রাজশাহি, কৃষ্ণনগর, যশোহর, পাবনা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ঢাকা—এই সব জেলায় নীলকরদের অত্যাচারের নানা বিবরণ প্রভাকরে এক সময় নিয়মিত বেরিয়েছে। ১৮৪৮-এর জুনের একটি রচনায় সাধারণভাবে নীলকরদের অত্যাচারের বিবরণ দিয়ে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে সাহের ম্যাজিস্ট্রেট নীলকরদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন, 'ম্যাজিস্ট্রেটদিগের সহিত কোনো নীলকরের আলাপ ও কুটুম্বিতা আছে'।

১৮৫৪-র একটি রচনায় এই একই অভিযোগ। সেখানে লেফটেনান্ট গভর্নর হ্যালিডে সাহেবের বিরুদ্ধেও অভিযোগ করা হয়েছে যে তিনি গবর্নমেণ্টের কাছে যে রিপোর্ট করেছেন তাতে এ-সব উল্লেখ করেন নি।

অথচ এই নীলকরদের নিয়ে লেখা গুপ্তকবির 'নীলকর' নামে যে-কবিতাটি থেকে আমরা এর আগে উদাহরণ দিয়েছি, সেই কবিতাটিতে কোথাও কোনো বিশেষ ঘটনার উল্লেখ নেই। একটি 'চিতেন'-এ শুধু উল্লেখ করা হয়েছে 'হলো নীলকরদের অনররি মেজেষ্টরি ভার'। এই উল্লেখটুকুর সূত্রে পরপর এতগুলি উপমা কবি ব্যবহার করে গেছেন—'বানরের হাতে হ'ল কালের খোন্তা', 'লোন্তাজলে চাষ', 'হ'ল ডাইনের কোলে ছেলে সঁপা', 'চীলের বাসায় মাছ', 'বাঘের হাতে ছাগের রক্ষে', 'গোদের উপর বিষফোঁড়া', 'ভক্ষকেতে রক্ষাকর্ত্তা', 'কালসাপ·· ভেকে পালে'! এ-ছাড়াও কবিতাটির বাকি অংশে আছে রাজভক্ত প্রজা হওয়া সত্ত্বেও নীলকরদের হাতে বাঙালিদের দুর্দশার বিবরণ ও উদ্ধার করার জন্যে রানী

ভিক্টোরিয়ার কাছে আবেদন। দীর্ঘ এই কবিতাটির সেই বিবরণ ও আবেদনে কখনো হয়তো 'চারটাকা মণ দর উঠেছে, নূতন চেলে'—এমন কোনো নির্দিষ্ট ঘটনার উল্লেখ থাকে কিন্তু কবিতার প্রধান বিষয় আবেদনের স্বরবৈচিত্র্যে। যে-স্বরবৈচিত্র্যে মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা করা হয়, প্রায় সেই নির্ভরতায় রানী ভিক্টোরিয়ার কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে। উপমার বিচিত্রতায়, প্রার্থনার বিচিত্রতায়, এই রচনাটিতে শেষ পর্যন্ত যেন নীলকর একটি উপলক্ষমাত্র হয়ে ওঠে, আর বাস্তব-চরিত্র থাকে না। পুরাণের নানা অসুরের অস্তিত্ব যেমন কাল্পনিক, এই নীলকরও তেমনি কাল্পনিক চরিত্র হয়ে ওঠে, বিশেষত রানী ভিক্টোরিয়ার ভগবতী রূপের সংগতি রেখে।

গুপ্তকবির গদ্যের প্রত্যক্ষ বিষয় এই ভাবেই পদ্যে দূরের বিষয় বা উপমার বিষয় হয়ে ওঠে। তাঁর সাংবাদিক গদ্যে সংবাদ হয়ে ওঠে একটি উপলক্ষ। সেই উপলক্ষকে ধরে গুপ্তকবি পাঠক-শ্রোতাকে একটা আনন্দ দিতে পারেন। সে আনন্দের সঙ্গে উপলক্ষের বাস্তবতার কোনো সম্পর্ক থাকে না। সে বাস্তবতার চাইতেও পদ্যের মজা আরো বেশি বাস্তব হয়ে ওঠে।

কিন্তু, পাঠকই-বা এই সাংবাদিক পদ্যকে এত গভীরভাবে গ্রহণ করেছিল কেন ? গুপ্তকবির রচনাশৈলীর জন্যেই কেবল তা তো ঘটে নি। নতুন বিষয় নিয়ে কবিগান রচনার এই দক্ষতা পাঠকের এমন প্রশ্রয় তো এই কারণেই পেয়েছিল যে পাঠক ছাপার হরফে এমন কবিগান পড়তেই চাইছিল।

আঠারো শতক থেকে উনিশ শতকের প্রথম পঁচিশ বছর কলকাতায় কবিগান, হাফ-আখড়াই গান, টপ্পা এই জাতীয় গানের জনপ্রিয়তা বেড়েছিল এবং কলকাতার বাঙালি সমাজে এগুলিই হয়ে দাঁড়িয়েছিল সামাজিক বিনোদনের বিষয়। এই সব গানের অশ্লীলতা ও রুচিহীনতার বিকারও ইতিহাসের সূত্রে আমাদের জানা। কিন্তু এই বিকারের মধ্যেও কি নাগরিক বাঙালির আর-এক পরোক্ষ প্রত্যাখ্যান নিহিত ছিল সেই সময়ে ? ইংরেজের সঙ্গে নতুন বাণিজ্য-সম্পর্কের ফলে কলকাতার বাঙালিদের টাকাপয়সা হচ্ছে, টাকাপয়সার নতুন-নতুন উপায়ও তাদের হাতে আসছে—কিন্তু সেই টাকাপয়সা ও তার উপায়গুলি অসহায়ভাবে সম্পূর্ণতই সাহেব-নির্ভর। সাহেবের ব্যাবসার পক্ষে দরকারি বলেই বাঙালিও সে-ব্যাবসা থেকে কিছু টাকা পায় বটে কিন্তু সে ব্যাবসায় বাঙালির সাহেবনিরপেক্ষ কোনো অস্তিত্বই নেই—এ-বোধ সেই দেওয়ান, মুৎসুদ্দি, বেনিয়ান, গোমস্তা, নায়েবদের না থাকার কথা নয়। কলকাতা শহরের এই বাঙালিরাই তো চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিল

কী ভাবে তাদের ঘরদোর বিদেশ হয়ে গেল। শাদা কলকাতার পেছনে কালা কলকাতায়, বাগবাজার-শোভাবাজারের নেপথ্যে, নাগরিক বাঙালি যেখানে তার নতুন শহরজীবন যাপন করছে সেখানে তার নিজস্ব আমোদ-প্রমোদ, কবিগানের বা হাফ-আখড়াই-এর চিতেন-পরচিতেনে, যে-কোনো একটি উপলক্ষ ধরে 'খেউড়ে' অশ্লীল গালিগালাজের বাধাহীন উদ্গীরণে সেদিনকার নাগরিক বাঙালি শ্রোতা একটা কোনো রেচন ঘটাতে চাইছিল। সেদিনের কবিগানের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল আসরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে নতুন-নতুন খেউড় তৈরি করা। নানা প্রসঙ্গের মধ্যে প্রতিপক্ষকে হারাবার যত্ন ও চেষ্টা সক্রিয় থাকত। সেই কারণেই রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ ও রাধাকৃষ্ণের নানা প্রসঙ্গের ওতপ্রোত থাকত এই খেউড়—সমকালীন নানা ঘটনা, বেশির ভাগই কেচ্ছা। সেই সব কবিগানের যা-কিছু সংকলন আমাদের সময় পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে তাতে পৌরাণিক অংশের বা টুকরো গানগুলিরই প্রাধান্য। কিন্তু তখনকার দিনের বাস্তবতা কবিগানের আসরে যে-খেউড়ের বিষয় হয়ে উঠেছিল—যার ভিতর নিহিত ছিল সমাজ ইতিহাসের তথ্য, সেগুলি লুপ্ত হয়ে গেছে।

আমাদের এমন একটি অনুমানের ইচ্ছে হয় যে বাঙালির নিজ বাসভূমির কলকাতা নামের একটি শহর সাহেবরা যখন নিজেদের করে নিল, আর, বাঙালি যখন বাধ্য হল সেই শহরেরই অধস্তন নাগরিক হয়ে থাকতে, তখন, সেই নাগরিক বাঙালি এই বিকারের আত্মগঞ্জনার মধ্য দিয়েই সেই ঘটনাটিকে মেনে নিল।

উনিশ শতকের ত্রিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে, সিপাহি বিদ্রোহ পর্যন্ত, কলকাতায় ইংরেজের সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। সতীদাহপ্রথা রদ, মেয়েদের শিক্ষা, বিধবাবিবাহ—এমন কয়েকটি মাত্র ব্যবস্থায় সেই নেতৃত্বের প্রমাণ সীমাবদ্ধ নয়। বাঙালি হিন্দুর জীবনযাপন ও জীবনবোধে, তার দৈনন্দিন অভ্যাসে, তার পোশাক-আশাক থেকে শুরু করে নিজের নামোচ্চারণের রীতিতে পর্যন্ত, তার অন্তঃপুর থেকে তার দৈনিক বাজার পর্যন্ত সেই সংস্কৃতির অপরাজেয় আক্রমণ ঘটে গেছে। বাঙালি হিন্দুর পক্ষে তার পুরনো অভ্যস্ত জীবনযাত্রা বজায় রাখা অসম্ভব ছিল। ইংরেজ সংস্কৃতির এই আক্রমণ ও নিজের এই অপ্রতিরোধ্য আত্মসমর্পণকে বাঙালি হিন্দু অনিবার্যত মেনে নেয়। সেই মেনে নেয়ার প্রক্রিয়াতেই সে ইংরেজকে ও নিজেকে একটা দৃশ্য হিশেবে মাত্র দেখে, বা নাটকের পাত্রপাত্রী হিশেবে মাত্র দেখে—নাটকের ঘটনার ওপর সেই পাত্রপাত্রীর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।

এখানেও পরোক্ষে একটা রেচনক্রিয়াই ঘটছিল। কিন্তু তখন তো শিক্ষা-সংস্কৃতির

একটা ধরন বাঙালি সমাজেও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। তখন তো সংবাদপত্র, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সরকারি চাকরি, পৌরসংগঠন—এ-সবে নাগরিক বাঙালি নিজেকে সাজিয়ে নিয়েছে। তাই গুপ্তকবি যখন ছাপার হরফে ছাপা-হরফের নিয়ম মেনেই 'আধুনিক' কবিগানের আসর খুললেন, পাঠক তা সঙ্গে-সঙ্গে গ্রহণ করল।

গুপ্তকবির সাংবাদিক পদ্যের এমন জনপ্রিয়তার পেছনে হয়তো সক্রিয় ছিল সরকার ও সমাজের নানা ঘটনা সম্পর্কে নাগরিক বাঙালির প্রত্যাখ্যান। সাংবাদিক গদ্যে সমস্যার যে-আয়তন ভয় দেখায়, সাংবাদিক পদ্যে সেই আয়তন অনেক কমে আসে, সেই আয়তনের নির্দিষ্টতা আর তত নির্দিষ্ট থাকে না, বরং, সেই সমস্যাটিই হয়ে উঠতে পারে পরিস্থিতি নিয়ে কৌতুকের এক উপলক্ষ। সরকার ও নীলকর ঐক্যের সামনে নিরুপায় বাঙালি এই কৌতুকের পরিত্রাণই গুপ্তকবিতে পেয়ে যায় যখন গুপ্তকবি কবিগানের ঢঙে বলেন,

মা কল্পতরু আমরা সব পোষা গরু
শিখি নি সিং বাঁকানো,
কেবল খাবো খোল বিচিলি ঘাস ॥
যেন রাঙ্গা আমলা তুলে মামলা
গামলা ভাঙ্গে না,
আমরা ভুসি পেলেই খুসি হব
ঘুসি খেলে বাঁচব না ॥

সরকারি সমর্থনে মিশনারি সাহেবদেব আক্রমণে পর্যুদস্ত বাঙালি হিন্দু অন্তত এই প্রতি-আক্রমণের স্বস্তিটুকু পেয়ে যায়, যখন প্রথমে 'সমাচার দর্পণ'-এর ও পরে 'সরকারি গেজেট'-এর সম্পাদক মার্শম্যানকে বিদায় দিতে গিয়ে গুপ্তকবি লেখেন,

শ্রী ধাম শ্রীরামপুর কৈলাশ শিখর।
বিশ্ব মাঝে অপরূপ দৃশ্য মনোহর ॥
কোম্পানির প্রতিষ্ঠিত তুমি বুড়া শিব।
তথায় বিরাজ কবি তরাতেছ জীব ॥

বা, বাঙালি সমাজের ভিতরের ব্যাপারেও বাঙালি নাগরিক যেন দর্শকই মাত্র। বিধবা বিবাহ আইন তৈরি হয়ে গেলে সেই হিন্দু বাঙালির অভিমানে লাগে বটে কিন্তু সেই অভিমান সত্ত্বেও তাকে পরাজয় মেনেই নিতে হয়। সেই পরাজয়ে কৌতুকের প্রতিশোধ একটু নেয়া যায় যখন গুপ্তকবি লেখেন

অনেকেই এই মত লতেছে বিধান।
অক্ষত যোনির বটে বিবাহবিধান॥
কেহ বলে ক্ষতাক্ষত কেবা আর বাছে।
একেবারে তরে যাবে যত রাঁড়ী আছে।

বা

শ্রুতমাত্র দূরে গেল মনের বিলাপ।
বিধবার খালিরুম হইল ফিলাপ॥…
ধামধুম, টামটুম, অন্ধকারে আলো।
ছুম্ করে, উম পেয়ে, ঘুম হবে ভালো॥

ইংরেজের নানা প্রতিষ্ঠান—সে হাইকোর্ট-সুপ্রিমকোর্টই হোক আর পৌর কর্তৃপক্ষই হোক—বাঙালি নাগরিক জীবনকে সব দিক থেকে নিয়ন্ত্রণ করছে। যখন সে-নিয়ন্ত্রণ মেনে নেয়া ছাড়া কোনো গতিই নেই, তখন কোর্টের মামলা-মোকদ্দমা নিয়ে বা আকাশে বেলুন ওড়ানোর মতো ঘটনা নিয়ে গুপ্তকবি রসিকতার স্বস্তিটুকু অন্তত দিতে পারেন।

চাহিয়া জজের মুখ সকলেই রয়।
কেহ বলে এই হবে কেহ বলে নয়॥
এই রূপে গোলযোগ কলিকাতাময়।
কেহ বলে দুই পাঁচ কেহ বলে ছয়॥…
কেহ বলে দেখা যাবে পনজুড়ি পয়।
কেহ বলে চার দানা মন্দঅতিশয়॥

[কোন মোকদ্দমা উপলক্ষে।]

রাত্রিদিন সমভাবে রয়েছি "টাইট"।
এ আবার কোথা হতে আইল "কাইট"?
বিনাসূত্রে উড়িয়াছে কেমন "কাইট"।
পাখা নাই শূন্যে এসে কেমন "ফাইট"॥
নাহি বলে বলে চলে কলের "কাইট"।
মর্ত্যলোকে শব্দ করে "কাইট, কাইট"।

[ব্যোমযান]

গুপ্তকবির সাংবাদিক পদ্যের জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ এই পদ্যের ভাষা। কবিওয়ালার গানের সঙ্গে এই পদ্যের যতই মিল থাকুক, এই পদ্য পাঠক পড়ত,

গান হিশেবে শুনত না। তাই পদ্যের ভাষার একটা প্রত্যক্ষে সংযোগ ঘটত পাঠকের সঙ্গে।

কবিওয়ালাদের গানের ভাষার সঙ্গে প্রচলিত পাঁচালি, মঙ্গলকাব্য বা যাত্রার ভাষার কোনো মিল ছিল না। এই সমস্ত পুথির ভাষা ছিল সংস্কৃত কাব্যের অনুকরণে অলংকৃত। তার উপমা ইত্যাদি অলংকারও ছিল সংস্কৃত কাব্যরীতি অনুযায়ী। কবিওয়ালাদের গানে কখনো-কখনো সেই কাব্যরীতিই হয়তো মেনে চলা হয়েছে—বিশেষত ভবানী বিষয়ক বা গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদে। কিন্তু এই পদগুলি বা এই ভাষা কবিগানের বৈশিষ্ট্য নয়, এ-সব অংশে প্রথাই বেশি মানা হয়েছে। কবিগানের প্রধান বৈশিষ্ট্য তার তৎপর পদসৃষ্টিতে, কথার পাল্টা কথার মতো পদের পাল্টা পদে। যেখানে পদেব পাল্টা পদ তৈরি হচ্ছে না, একটা বিষয়ই ক্রমে বিস্তৃত হচ্ছে সেখানেও একটা ক্রমপর্যায় মেনে চলা হত। মহড়াতে বিষয়টি উত্থাপন, চিতেনে তার একটু সম্প্রসারণ, অন্তরায় আবার একটু দ্রুত মন্তব্য—এই ভাবে বিষয়টির পর্যায় ভাগ হত। এর ভিতর কবির 'লহর' বা 'তরজা'য় দুই পক্ষের মধ্যে বাকযুদ্ধ শুরু হত। কবিগানের ঐতিহাসিকরা কবিগানের সমৃদ্ধির যুগ, অধঃপতনের যুগ ইত্যাদি নানা ভাগ করে থাকেন। কৃষ্ণযাত্রা, পাঁচালি, পদাবলী কীর্তন, এই সমস্ত সত্ত্বেও কবিগান যে কলকাতায় জনবিনোদনের প্রধান উপায় হিশেবে গৃহীত হয়েছিল তার অন্যতম প্রধান কারণ—যাত্রা-পাঁচালি-কথকতা-কীর্তন থেকে নানা উপকরণ নিয়ে কবিগান একটা স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট নাগরিক ফর্ম হয়ে উঠতে পেরেছিল। সেখানে কিছুটা অভিনয়-ঘেঁষা 'কবি'র নিজের ভূমিকাটিই ছিল প্রধান। সেই কারণেই চুটকি, লহর বা খেউড় কবিগানের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে ও এই লহর বা খেউড়ের জন্যেই কবিগান কলকাতা শহরের বাঙালিদের এত প্রিয় হয়ে উঠেছিল। সেই 'তরজা' বা 'খেউড়'-এর প্রামাণিক কোনো উদাহরণ পাওয়া যায় না। তবু কিছু-কিছু লোকশ্রুতিতে চলে এসেছে। সেই সামান্য উদাহরণ থেকেও বোঝা যায় 'তরজা' বা 'খেউড়'-এ কী ভাবে মুখের ভাষা পদ্যে ব্যবহৃত হচ্ছিল।

রাজা নবকৃষ্ণের বাড়িতে রাম বসু ও কবিওয়ালা নীলুঠাকুরের ভাই রামপ্রসাদের মধ্যে এ-রকম কবির ভাষায় কাথাবার্তা হয়েছিল।

রামপ্রসাদ

নাইক রাম বোসের এখন সেকালের পৌরুষ।

এখন দল করে হয়েছেন রাম বোস রাম কামারের···

রাম বসু

তেমনি এই নীলুর দলে রামপ্রসাদ একটিন।
যেমন ঢাকের পিঠে [···] থাকে বাজে নাক একটি দিন ॥
যেমন রাত ভিখারিরি ধামা বওয়া থাকে এক-একজন।
হরিনাম বলে না মুখে পিছু থেকে চাল কুড়ুতে মন ॥
কর্মে অকর্মা ঐ রামপ্রসাদ শর্মা···
ঠিক যেন ধোপার বিশ্বকর্মা ॥···
নীলমণি মলে, নীলমণির দলে
ঢুকল শিং ভাঙা এঁড়ে বাছুরের পালে
যেমন নবাব মলে নবাব হল উজির আলি আড়াই দিন।
যেমন মেগের কাছে পেগের বড়াই ঘরে করেন হাঁক,
দুনিয়ার কর্মেতে কুঁড়ে, ভোজনে দেড়ে
বচনে পুড়িয়ে করেন খাঁক।
তেমনি শ্রী ছাঁদ, এই পেটকো মুলুকচাঁদ
ধরে কৃষ্ণপ্রসাদ, তরেন রামপ্রসাদ
যেমন জন্মে কভু হাত পোরে না
দোলে লবেদার আস্তিন।

['প্রাচীন কবিওয়ালার গান,' প্রফুল্লচন্দ্র পাল]

এ গান মুখের কথা ছাড়া আর কিছুই নয়। মাঝে-মাঝে অন্ত্যমিলে একে আজ পদ্য বলে চেনা যায় আর তখন সুরের আশ্রয়ে গান বলে চেনা যেত।

ভাষার এই কথ্যভঙ্গি শুধু, 'তরজা' বা 'খেউড়', এতেই সীমাবদ্ধ ছিল না—কবিগানের নানা পর্যায়ে এই কথ্যভঙ্গিই ছিল প্রধান বাকভঙ্গি। এই কথ্যভঙ্গির জন্যেই শ্রোতা-দর্শকের সঙ্গে সংযোগ তৈরি হয়ে যেতে পারত দ্রুততম।

তোরে এক গোটা ফল খেতে বললাম,
সকলগুলি খেয়েছ।—
জ্ঞানবান বীর বাঁদর হয়ে একি করেছ।
দিলাম রামের জন্যে ফল
সে ফল কেমনে তুই খেলি রে পাগল।
বাছা টুঁটিতে লাগয়ে আঁটি
শ্রীরাম বলে ডেকেছ।

তুমি যার সেবক তাকে যে ফাঁকি দিয়েছ।
তোর গলাতে আঁটি লেগেছে একটি।
পড়ে সমুদ্রেতে দণ্ড চার করলি ছটফটি।
সেই রামকে স্মরণ করে বাছা তবে প্রাণে বেঁচেছ।

[লালু-নন্দলাল, 'প্রাচীন কবিওয়ালার গান', প্রফুল্লচন্দ্র পাল সম্পাদিত]

তুমি আমার প্রাণের প্রাণ,
প্রধান শিষ্য হনুমান,
তোমার বীরপনা
সব আছে জানা
শমন দেখে করে ভয়॥
মোটমাট কেনে আজ করে হেঁট মাথা।
বলো সব কথা, কেন-বা বসে হেথা
বুড়মির নাইক যোগ্যতা
তোর হেঁট বদন দেখে আমার মনেতে বড় সন্দেহ হয়।
তোকে যে জন্যে পাঠালাম কী হল সে বিষয়।

[ঐ]

তোমার যে অবধি বুদ্ধি সাধ্যি করো না কসুর,
আমি তোমার জামাই তুমি হও আমার শ্বশুর।
কালু পাল আমার শ্বশুর বলে অতঃপর,
পালের ব্যাটা সম্বন্ধী ভানুমতীর সহোদর।
এরা চারজনে, আসুক এখানে,
আনিতে কও সভার মাঝে তুমি সে জনে।

[রঘুনাথ দাস। ঐ]

ওগো তারা, আয় মা দুখ পাসরি
বল দেখি 'মা' আমারে।
কন্যে দিয়ে দৈন্যের ঘরে,
সদাই ভাবতেম তোমার তরে,
দুঃখে মন পোড়ে।
জামাই ভিক্ষে করে খায়

শ্মশানে বেড়ায়
কোথা ছিলে তুমি ভিখারির ঘরে।

[হরু ঠাকুর। ঐ]

দুর্যোধন কুরুপতি হে,
তোমার মামা শকুনির কথায় বিবাদ ঘটালে।
দেখিল সকল কপট ছলে পাশা খেলালে
পঞ্চ পাণ্ডবের রাজধানী সব জিতে নিলে
তাদের রাজ্য হতে তাড়িয়ে দিলে
মুখ চাইলে না ভাই বলে।
পরের কথায় এক কালে বুদ্ধি হারালে।
দ্রুপদ রাজকন্যে,
তোমার ভাদ্রবধূ ছিল হস্তিনে,
তুমি নেংট করেছ তারে সভার মাঝখানে।
সে যে কুলবধূ ভাদ্রবধূ তোমার,
তার আবরু সরম কল্লে হরণ
বাম উরুতে বসালে।

[ভোলা ময়রা। ঐ]

গদ্যভাষার চর্চার জন্যে ন্যূনতম শিক্ষা দরকার কারণ মুখে-মুখে পদ্য বাঁধা যায়, গান গাওয়া যায় কিন্তু গদ্য না-লিখলে গদ্য হয় না। তা ছাড়াও গদ্যচর্চার জন্যে ছাপাখানাও অপরিহার্য। উনিশ শতকে গদ্যচর্চা ও ছাপাখানার ব্যবহার শুরু হয়েছিল সাহেবদের নেতৃত্বে, সাহেবদের প্রয়োজনে। কিন্তু নাগরিক বাঙালির জীবনেও গদ্যের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। সে প্রয়োজন নাগরিক বাঙালির একটু উঁচু শ্রেণীর মধ্যে পত্র-পত্রিকা ও বইপত্র ছাপার মধ্য দিয়ে অংশত মিটছিল। উনিশ শতকের বিশের দশকের শেষভাগ থেকে বাঙালিদের গদ্যচর্চার প্রসার ঘটেছে, তিরিশ ও চল্লিশের দশকে তা অনেকটা ছড়িয়েছে। কিন্তু আঠারো শতকের শেষ ভাগ থেকে উনিশ শতকের প্রথম পঁচিশ বছর পর্যন্ত বাঙালিদের হাতে গদ্যচর্চার কোনো অবলম্বন ছিল না। ঠিক এই পঞ্চাশ বছরই কলকাতার কবিগান হাফ-আখড়াই গানের প্রসার ঘটেছে। এই পঞ্চাশ বছরেই কবিগানের আসরে, তরজা ও খেউড়ে নাগরিক বাঙালি কলকাতা শহরে তার বসবাস ও নতুন জীবনযাপনের অভিজ্ঞতার কথা শুনেছে গদ্যের বিকল্প এক নতুন ভাষায়। সেই কবিগানের বিষয়

তখনো উমা-মহেশ্বর, মালসী, ধামালি, রাধাকৃষ্ণ সংবাদে বাঁধা। কিন্তু ক্রমেই এই বিষয়কে ছাপিয়ে ওঠে তরজা ও খেউড়। সেখানে কবির লড়াইয়ে—দুই কবির বা দুই দলের দ্বন্দ্ব অনেক সময়ই ব্যক্তিগতের ওপরে হয়তো উঠতে পারে নি। কিন্তু সে-ব্যক্তিগতও তো নাগরিক কলকাতার সমষ্টিতে বাঁধা। সে ব্যক্তিগতও তো সাহেব-কলকাতার পেছনের কালো কলকাতার নতুন জীবনের সঙ্গে জড়িত। সেই কলকাতার কবিওয়ালা ভোলা ময়রা এই আত্মপরিচয় দেন,

আমি ময়রা ভোলা
ভিঁয়াই খোলা
বাগবাজারে রই

বা ফিরিঙ্গি কবিওয়ালা বলেন

এই বাঙলায় বাঙালির বেশে আনন্দে আছি।
হয়ে ঠাকুরো সিঙ্গির বাপের জামাই
কুর্তি টুপি ছেড়েছি।

বা তার প্রতি আক্রমণে বলা হতে পারে

'যিশু খ্রিস্ট ভজ্ গা যা তুই
শ্রীরামপুরের গির্জাতে।

বা গ্রামের জমিদারের কলকাতায় নবাবি নিয়ে কবিওয়ালা গাইতে পারে

বাবু ত লালাবাবু কলকাতাতে বাড়ি।
বেগুন পোড়ায় নুন দেয় না সে ব্যাটা ত হাড়ী॥
পিঁপড়ে টিপে গুড় খায়, মুকুতের মধু অলি।
মাপ করো গো রায়বাবু, দুটো সত্য কথা বলি॥
জগা বেনে খোসামুদে অধিক বলব কী
তপ্ত ভাতে বেগুন পোড়া, পান্তা ভাতে ঘি॥

কবির গান একদিকে যেমন নাগরিক কলকাতার নতুন সংস্কৃতির সামনে যাত্রা-পাঁচালি-কীর্তন ইত্যাদি পুরনো নানা শ্রাব্য-দৃশ্য ফর্মের ধ্বংসকালীন মিশ্রণ, তেমনি আর-একদিক থেকে আবার কলকাতার নতুন নাগরিক জীবনে বাঙালি সমাজের প্রতিক্রিয়ারও নতুন রূপ। সে-রূপ অনেক দূর পর্যন্ত গদ্যের বিকল্প। কবির গানের এই দ্বিতীয় উপাদান সম্পর্কে কোনো আলোচনাই হয় নি। তেমন আলোচনার জন্যে 'তরজা' ও 'খেউড়'-এর যে-উদাহরণ দরকার, তাও সংকলিত হয় নি বা লোকশ্রুতিতে আসে নি। কিন্তু এই দ্বিতীয় উপাদানটিই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভাকরে

তাঁর সাংবাদিক পদ্যে ব্যবহার করেন। তাই গুপ্তকবির এই সাংবাদিক পদ্যগুলি ভাষা ও ভঙ্গির দিক থেকে তখনকার বাংলা সাংবাদিকতার ঘনিষ্ঠ নয়, বরং যে-কবিগান তখন প্রায় লুপ্তির পথে সেই কবিগানেরই ঘনিষ্ঠ। সেই কারণেই গুপ্ত-কবির সাংবাদিক পদ্যে পাঠকরা এক ধারাবাহিকতা পাচ্ছিলেন—বাঙালি সমাজের নিজস্ব ধারাবাহিকতা, ইংরেজি সাংবাদিকতা বা বাংলা গদ্যচর্চা-নিরপেক্ষ বাঙালি ধারাবাহিকতা। এই কারণেই আমরা এই সাংবাদিক গদ্যগুলিকে 'ছাপার হরফে কবির লড়াই' বলেছি। কবিগানের কথ্যভাষার আধুনিক সম্প্রসারণ ঘটিয়ে ফেললেন গুপ্তকবি তাঁর সাংবাদিক পদ্যে অনায়াসে প্রচুর ইংরেজি শব্দ ঢুকিয়ে। গুপ্তকবির অন্যান্য পদ্যরচনায় দেখা যায় তিনি প্রাচীন রীতিতে তৎসম শব্দবহুল পদরচনাতেও দক্ষ ছিলেন। সেগুলি 'পারমার্থিক ও নৈতিক' কবিতা বলে বর্ণিত হয়েছে। এমন-কি অতটা গম্ভীর নয় যে-বিষয়, যেমন, 'পাঁটা' বা 'আনারস', বা 'তপসে মাছ' সেখানেও তাঁর সংস্কৃতবহুল পদব্যবহারের এক ছদ্ম ভঙ্গি ছিল। তাতে দেশী শব্দ দিয়ে তিনি হয়তো এক ধরনের পদবিন্যাস করতেন কিন্তু ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করতে চাইতেন না। এই কবিতাগুলি অন্তত সে-ধরনের পদব্যবহারের জন্যে বিশিষ্ট নয়।

ত্রিতাপেতে তরে লোক তব নাম নিয়া।
বাঁচালে দক্ষের প্রাণ নিজ মুণ্ড দিয়া॥
চাঁদমুখে চাপ দাড়ি গালে নাই গোঁপ।
শৃঙ্গ খাড়া ছাড়া ছাড়া লোমে লোমে খোপ॥

[পাঁটা]

কষিত কনককান্তি কমনীয় কায়।
গালভরা গোঁপ-দাড়ি তপস্বীর প্রায়॥
মানুষের দৃশ্য নও বাস কর নীরে।
মোহন মণির প্রভা ননীর শরীরে॥

[এণ্ডাওয়ালা তপ্সামাছ]

কিন্তু তাঁর সাংবাদিক পদ্যে তিনি মুখের বাচন ও ইংরেজি শব্দ মিশিয়ে বাক্যের একটা চমক আনেন। তার ওপর ইংরেজি শব্দের ওপর অন্ত্য মিলের নির্ভরতায় অভাবিতের প্রত্যাশা এসে যায়। ফলে তাঁর এক-একটি চরণ পাঠকের কাছে সঙ্গে-সঙ্গে পৌঁছে যেতে পারে। কবিগানের পদ্যের দেশী বাক্যবিন্যাসের সঙ্গে ইংরেজি

শব্দকে মিশিয়েই তিনি তাঁর এই রচনাগুলিতে কবিগানের রীতির সম্প্রসারণ ঘটিয়ে ফেলেন।

গুপ্তকবি অনেক রচনাতেই এ-রকম লাইন লিখেছেন। আমরা এখানে শুধু সে-রকম কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি যেখানে দেশী বাক্‌রীতির সঙ্গে ইংরেজি শব্দের মিশ্রণই তার উদ্দেশ্য। এই মিশ্রণের সচেতন অতিরেক ঘটিয়ে তিনি ভঙ্গির মধ্য দিয়েই তাঁর বিষয়টিকে একটা বিশেষ চেহারা দেন।

আয় লোভ চল যাই হোটেলের সপে।
এখনি দেখিতে পাবি কত মজা চপে॥
গড়াগড়ি ছড়াছড়ি কত শত কেক।
যত পার কসে খাও টেক্ টেক্ টেক্॥···
করি ডিম আলুফিস ডিসপোরা কাছে।
পেটপুরে খাও লোভ যত সাধ আছে॥···
রাঙ্গা মুখ দেখে বাবা টেনে লও হ্যাম।
ডোণ্ট কেয়ার হিন্দুয়ানী ড্যাম ড্যাম ড্যাম॥
পিঁড়ি পেতে ঝুরো লুসে মিছে ধরি নেম।
মিসে নাহি মিস খায় কিসে হবে ফেম॥

[ইংরাজী নববর্ষ]

যে-প্রকার খৃষ্টানের পূর্ব্ব-প্রকরণ।
কেথলিক চার্চ্চে গিয়া দেখে এস মন॥···
ওল্ড এক টেস্টমেণ্ট গোল্ড তায় বাঁধা।
কোল্ড করে মানুষেরে লাগাইয়া ধাঁধাঁ॥
রিফরম প্রটেষ্টাণ্ট বিশপের দল।
বড দিন পেয়ে মুখে হাস্য খল খল॥
মিলিটারি সিবিল বণিক আদি যত।
ছুটি পেয়ে ছোটাছুটি আস্ফালন কত॥

[বড়দিন]

টাউনসেণ্ড রবার্টসন নন্দী ভৃঙ্গী দুটো।
নিয়ত নিকটে আছে দাঁতে করি কুটো॥
ছাই ভস্ম বিভূষিত এঁটো কাঁটা খায়।
গালবাদ্য করি সদা বগল বাজায়॥

ডেবিল দুপাশে তারা টেবিল ধরিয়া।
এবিল হতেছে সুখে তোমারে স্মরিয়া ॥

[বুড়াশিবের স্তুতি]

ভাষার এই মিশ্রণ সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে কবিগানের ভাষার ধারায় গুপ্তকবি কলকাতার দেশী বাগভঙ্গিকে তাঁর সাংবাদিক পদ্যে গ্রহণ করেছিলেন। সেই বাগভঙ্গি লোকের মুখের ভাষা থেকে নেয়া তাই এমন অনায়াসে ইংরেজি শব্দ সেখানে মিশে যেতে পারে।

কিন্তু ইংরেজি শব্দের মিশেল ছাড়াও শুধু দেশী বাগভঙ্গিতেই এ-পদ্যরচনা তাব বিশিষ্টতা রক্ষা করতে পেরেছে। সেটাই তার মূলভিত্তি। সেই দেশী বাগভঙ্গিতেই গুপ্তকবির সাংবাদিক পদ্য একদিকে কবিগানের সন্নিহিত, অপরদিকে উনিশ শতকীয় তিরিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকে কলকাতার নাগরিকদের সাংবাদিক রুচিরও ঘনিষ্ঠ। সেই বাগভঙ্গিই এই সাংবাদিক পদ্যগুলিকে গদ্যের বিকল্প করে তুলেছে, যেন, এই পদ্যরচনাগুলিতে যে-গদ্য লেখা হয়েছে তা সংবাদ-সাময়িকপত্রের ছাপা-গদ্যের চাইতে অনেক বেশি সংযোগক্ষম, অনেক বেশি ভারবহনক্ষম, অনেক বেশি মন্তব্যক্ষমও, হয়তো, অনেক বেশি আত্মগোপনক্ষম।

আমরা এখানে দু-একটি মাত্র উদাহরণ নিয়ে শেষেরটি বাদ দিয়ে অন্য তিনটি বৈশিষ্ট্য চিনতে চেষ্টা করব। এই বাগভঙ্গি কোন ধরনের আত্মগোপনতার সাহায্য করেছিল, এর পরে আমরা সেটা পরীক্ষা করব।

সংযোগক্ষমতার কিছু প্রমাণ আমরা ইতিপূর্বেও দিয়েছি। এই উদাহরণ-গুলিতেও আমরা দেখব বাগভঙ্গির প্রত্যক্ষতা ও মুখের কথার সঙ্গে তার মিল এই পদ্যকে কত সহজে পাঠকযোজ্য করে তুলেছে, যে-পাঠাকযোজ্যতা গদ্যের একটি প্রধান লক্ষণ ও গদ্য তৈরি হয়ে ওঠারও প্রধান কারণ। স্নানযাত্রার বিবরণ তখন সংবাদ-সাময়িকপত্রে প্রায়ই দেখা যেত। ১৮২১-এব ২৩ জুন 'সমাচার দর্পণ'-এ এ-রকম একটি স্নানযাত্রার বিবরণ বেরিয়েছিল। রচনাটিতে গল্পের একটা সংকেত ছিল ও সে গল্পটি ধীরে-ধীরে লেখক বলেছেন। ভাষাও বেশ সহজ। দু-একটি জায়গাতে লেখক প্রত্যক্ষ উক্তি ব্যবহার করায় রচনাটিতে কিছু নাটকীয়তাও এসেছে।

নগরবাসি অনেক ভাগ্যবান লোক ও বাবু লোক অনেকে দর্শন সুখার্থী অল্প পারমার্থিক স্নানযাত্রা দেখিতে কেহবা দেখাইতে বৎসর২ গিয়া থাকেন এবং এ বৎসরও গিয়াছিলেন যাঁহার যাহাতে মনোরঞ্জন হয় তিনি তাহার মত দ্রব্যাদি

এবং লোক লইয়া যান কেহ২ গায়ক গুণী কেহবা বেশ্যা কেহবা ভাঁড় কেহবা বাই লইয়া বজরা অথবা পিনীষ কিম্বা কয়্যাটর ভাউলে পানসী ডিঙ্গী এবং জেলে ডিঙ্গী প্রভৃতি যাহার যেমত শক্তি তাহাই ভাড়া করিয়া গিয়াছিলেন। ঐ সকল প্রতিবৎসর দেখিয়া শুনিয়া এ বৎসর একজন নূতন শৌকীন বাবু শৌক করিয়া আপন স্ত্রীকে লইয়া এক হাপ বজরা ভাড়া করিয়া স্নানযাত্রা দেখিতে প্রস্থান করিয়া যখন নৌকায় আরোহণ করেন তখন মাজিরা কহিলেক যে বাবুজী নৌকায় যাইতে বড় কাদা অতএব বিবি ঠাকুরাণীকে আমরা দুই জন মাজি লইয়া নৌকারোহণ করাই পরে আর২ বিবিরদিগকে যে প্রকার করিয়া লইয়া যায় এ বিবিকেও সেই প্রকার না করিলে হইবেক কেনো।

অনন্তর নৌকার উপরে গিয়া বাবু চতুর্দিক অবলোকন করিয়া দেখিলেন যে সকল বজরা প্রভৃতির উপরে আর২ যত অপ্সরারা আছেন সকলি প্রায় নৃত্য করিতেছেন কেহবা গান কেহবা পান কেহবা মান ইত্যাদি করিতেছেন। এ সুন্দরী তাহার কিছুই জানেন না ইহাতে বাবু খেদান্বিত হইয়া কহিলেন তুমি এক কর্ম্ম কর কেবল শোজা খেঁউড় গীত গাও আমি খেমটা বাদ্য বাজাই আর সেই তালে নৃত্য কর। তিনি সাধ্বী স্ত্রী বাবুর শৌক অনুযায়ি তাবৎ কর্ম্ম সমস্ত রাত্রি করিলেন কোন প্রকারে বাবুর খেদ রাখিলেন না।

প্রভাতে মাহেশের ঘাটে যখন নৌকা লাগিল গুণনিধি বাবু স্নান দর্শনার্থে চলিলেন সেই সময়ে তাহার মনোরমা নৌকা হইতে নামিয়া পূর্ণিমার মধ্যে গঙ্গা-স্নান করিতেছিলেন এমত সময়ে তাঁহার সতীত্ব রক্ষা করিতে ভগবান জোয়াররূপ হইয়া আইলেন পরে অনেক নৌকাব ভিড় হওয়াতে বড় গোল হইল। গুণবতী আপন নৌকা চিনিতে না পারিয়া অন্য কোন পুণ্যবানের নৌকাতে পদার্পণ করিয়া পবিত্র করিলেন কিম্বা কাহারো সহিত সঙ্কেতইবা ছিল কিছু বুঝা গেল না কিন্তু পুনরায় গুণনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল না সেই স্নানযাত্রায় শুভ যাত্রা করিয়াছেন মনে করি হতভাগার ভাগ্যে আর দেখা হয় কি না হয় কিন্তু বাবু সেই ঘাটে২ মঙ্গল গাইয়া বেড়াইলেন এবং ঐ নগরের মধ্যে দ্বারে২ অন্বেষণ করিলেন সাক্ষাৎ হইল না।

অতএব নিবেদন হে শৌকীন মহাশয়েরা এই মত শৌক শুনিয়া বমি উঠে সাবধান২ এমত কর্ম্মে আর কেহ না করেন।

[স. সে. ক. ১ । ১০২]

গুপ্তকবি এ-রকমই এক স্নানযাত্রার বর্ণনা লিখছেন। সে বর্ণনায় তিনি কোনো

একটি বিশেষ ঘটনায় বাঁধা পড়েন না, পুরো মেলাটিকেই তাঁর বর্ণনীয় করে তোলেন। সেই বর্ণনায় মুখের কথা এমন অব্যর্থ ব্যবহৃত হয় যেন কোনো প্রত্যক্ষদর্শী স্নানযাত্রার অভিজ্ঞতা বলছেন। পদ্যরচনাটির পয়ারের ত্রিপদী ঠাট, এমন-কি তিন জায়গায় মিত্রাক্ষরের বাধ্যতাও সেই মুখের ভাষার গতি ব্যাহত করতে পারে না।

চরণে বিলাতী জুতি পরিলেন ধোপ ধুতি
হরিলেন পৈতৃক তসর।
চাঁপাতলা শূন্য করি যান যত নরহরি
ঘস্ ঘস্ ঘসর ঘসর॥
ঘাটে গিয়ে কত চোট স্থখেতে সাজান বোট
বাঁধে কোট তাহার ভিতর।
দলে দলে গালাগালি দলে দলে দলাদলি
বলাবলি হয় পরস্পর॥

আবার, আর-এক জায়গায়

চোপায় কে পারে আর খোঁপায় ফুলের হার
কোপায় কথায় যেন কাঠ।
কত হাসে কত ভাষে ঘুরে ঘুরে চারি পাশে
একা মাগী লাগায়েছে হাট॥

মেলার লোকের মুখের কথা তিনি তুলে আনেন

'লোচন গিয়াছে ঘর নক্ষীর হয়েছে জ্বর
নৈকা চড়ি আমরা সবাই।
লিতাই লারান ঐ নৈতুন ইয়ার কই
লল্ লিস্ লবীন লবাই॥'

এবার মাতালদের বর্ণনা

বিলাতীর শেষ হলে দেন শেষ ভাবে গোলে
ধেনো গাঙ্গে বেনো জলে ডুব।
প্রথমেতে চুপি চুপি শেষ হন বহুরূপী
আর নাহি থাকে লজ্জা ভয়।
চালে উঠে নগ্ন ছবি হাঁসা মূর্ত্তি গান কবি
লোকে বলে জয় বাবু জয়।

'হেমন্তে বিবিধ খাদ্য' নামে একটি খুব দীর্ঘ পদ্য লিখেছিলেন গুপ্তকবি। হয়তো বাংলাদেশের শীতকেই তিনি হেমন্ত বলেছিলেন। এই দীর্ঘ পদ্যে শীতের আনাজ ও ফলের প্রায় প্রত্যেকটিকে ধরে-ধরে তার গুণের তালিকা তৈরি করেছিলেন। এই পদ্যরচনাটিতে গুপ্তকবির রচনাশৈলীর অনেকগুলি বিশিষ্টতা একসঙ্গে দেখা যায়। তিনি একটু গম্ভীর স্বরেই শুরু করেন

শরতের রাজ্য লয়ে হিম মহাশয়
কুয়াশার ধ্বজা তুলে করিলেন জয়।

শীত ও শিশির নিয়ে এ-রকম অলংকারের খেলা কিছুদূর এগনোর পর তিনি এক-একটি খাদ্যকে আলাদা-আলাদা করে ধরেন। সেই বর্ণনাতেও কখনো-কখনো গম্ভীর স্বর আসে, সংস্কৃত রীতিতে কিছু সমাসোক্তিও জোটে কিন্তু কবি প্রায় অপ্রতিহত বেগে বার বারই নিজের মুখের কথায় ফিরে এসে সেই শৈলীগত কৃত্রিমতাকে নিজেই ভেঙে ফেলেন। তখন এই দীর্ঘ পয়াররচনার মধ্যে গদ্যের গতি এসে যায়।

গম বা ময়দা সম্পর্কে

দেবতার প্রিয় খাদ্য সকলের আগে।
ময়দার কাছে আর কিছুই না লাগে॥
দুধে গমে ঘিয়ে ভাজা যার নাম লুচি।
ছেলেবুড়া সকলেরই ভোজনেতে রুচি॥···
পেটুক যদ্যপি শোনে লুচির ফলার।
দড়ি ছিঁড়ে ছুটে যায় রাখে সাধ্য কার॥

অড়হর ডাল সম্পর্কে

কাছে যেন নাহি আনে পেটরোগা দলে।
খেতে সুখ কিন্তু দুখ বুক বড় জলে॥···
পশ্চিমের পালোয়ান লোক সমুদয়।
অড়হর বিনা তারা কিছুই না খায়॥

মুগের ডাল সম্পর্কে

আদা দিয়া হিং দিয়া রাঁধো যদি ঝোল।
থাবা থাবা মেরে দেও কিছু নাই গোল॥

কলাইয়ের ডাল সম্পর্কে

সকলের মুখপ্রিয় কলায়ের বড়ি
কুমড়া যাহার পায় যায় গড়াগড়ি॥

তিসির তেল সম্পর্কে

কত মতে বিলাতে হতেছে প্রয়োজন।
যেখানে সেখানে দেখি তিসির ওজন ॥
আগুন হয়ে দর বিলাতের ঠাঁই।
দিশী হয়ে তিসি আর আমরা না পাই ॥

সরষের তেল সম্পর্কে

শরীর হতেছে রক্ষা খেয়ে আর মেখে
অন্ধকারে আলো দেয় প্রদীপেতে থেকে ॥

নলেনগুড় সম্পর্কে

এ প্রকার সুখসেব্য আর নাহি আছে।
নলিনীর মধু কোথা নলেনের কাছে ॥
মাতে মন সুখদ পয়ড়া গুড় পেলে।
অরুচির রুচি হয় লুচি দিয়ে খেলে ॥
ভোজালের পাটালি যে খায় একবার।
কখন সে ভুলিতে পারে না তায় তার ॥

বেগুন সম্পর্কে

শাদা কাল নানারূপ ত্রিভঙ্গ সুঠাম।
দোলায় দুলিছে যেন কৃষ্ণ বলরাম ॥

লাউ সম্পর্কে

প্রাচীনার স্তন সম অঙ্গের ধরণ।
বোঁটা সরু মোটা মুখ বিমল বরণ ॥···
চিঙ্গরির সহ যোগ লাউ যদি করে।
হাতে হাতে স্বর্গে যাই মুখে দিলে পরে ॥···
ভাতে কিংবা ঝোলে ডাঁটা যুক্ত হলে মাছে।
তেমন সুখাদ্য আর জগতে কি আছে ?

পয়ারের বাঁধা ছকের মধ্যে, অন্ত্যমিলের নিগড় মেনে নিয়েও গুপ্তকবি তাঁর বর্ণনাতে মুখের কথার বেগ আনতে পারেন বলেই এই এক-একটি জোড়া-চরণ একই সঙ্গে বর্ণনা ও মন্তব্য হয়ে ওঠে। শুধুমাত্র লিখিত গদ্যে বর্ণনা একটা যুক্তিপরম্পরায় বাঁধা থাকে, মন্তব্য তা থেকে স্বতন্ত্র হয়ে যেতে পারে। কিন্তু মুখের কথায় বর্ণনার ভাষার মধ্যেই মন্তব্য বেরিয়ে পড়ে। গুপ্তকবির এই পদ্যরচনাগুলিতে বর্ণনা আর মন্তব্য

এক হয়ে যেতে পারে মুখের কথার বেগে। সেই কারণেই তাঁর পক্ষে কৃত্রিম সংস্কৃত রীতিতে একটি চরণ লিখে ফেলা বা একটি বিশেষণ দেয়া সম্ভব হয়—কারণ তাঁর বিশিষ্ট এই রচনাশৈলীতে শেষ পর্যন্ত সেই চরণ বা বিশেষণের কৃত্রিমতা আর বিচ্ছিন্ন থাকে না।

তাঁর সাংবাদিক পদ্যে তিনি মুখের বাগভঙ্গিকেই প্রধানত ব্যবহার করেছেন, কখনো-কখনো সেখানে ইংরেজি শব্দও লাগিয়েছেন, ফলে তাঁর এই সব রচনায় একই সঙ্গে সমকালীনতা ও গতি এসেছে। সেই সমকালীনতা ও গতি তাঁর সাংবাদিক পদ্যগুলিতে এমনই এক তাৎক্ষণিকতা দেয়, অর্থের এমন এক আশু লক্ষ সহজেই ধরিয়ে দেয় যে গুপ্তকবি সেই তাৎক্ষণিকতায় আড়াল নিতে পারেন ও কখনো-কখনো তাঁর প্রকৃত লক্ষকে গোপন করতে পারেন।

এ-রকম আত্মগোপনের সুযোগেই কবিগানের ভঙ্গিকে তিনি অবিকল যখন ব্যবহার করেন নীলকরদের অত্যাচার রানী ভিক্টোরিয়াকে জানাবার জন্যে বা দুর্ভিক্ষের বর্ণনা দিতে, তখন সেই পদ্যরচনায় প্যারডির একটা অর্থেরও সংক্রমণ ঘটে যায়। কবিগানের ভবানীবিষয়ক পদের ভাষাভঙ্গিতে গুপ্তকবি যখন ভিক্টোরিয়ার বন্দনা করেন বা নীলকর সম্পর্কিত পদ্যে যখন গৌরাঙ্গবিষয়ক পদের স্মৃতি অবধারিত এসে পড়ে, তখন ভবানীর সঙ্গে ভিক্টোরিয়ার ও গৌরাঙ্গের সঙ্গে নতুন গৌর-অবতারের এক গোপন উপমাও পাঠকের কাছে পৌঁছে যায়। সেই উপমা পাঠকের কাছে এক শ্লেষের মাত্রা পায়। তখন সে পদে প্যারডির ছোঁয়া লাগে।

এই প্যারডির ছোঁয়া কতটা সচেতনতার ফল তা জানার বা অনুমানের কোনো নিরিখ নেই। এমনও কি হতে পারে যে আজকে এই সব পদ্যরচনায় এই প্যারডির গোপন স্বাদ আমরা পেয়ে যাই আমাদের পরবর্তী অভিজ্ঞতার জোরে? গুপ্তকবির কাছে বা তাঁর পাঠকদের কাছে এই প্যারডি গোপনভাবেও সক্রিয় ছিল না?

হয়তো এইখানেই গুপ্তকবির নিজের মধ্যেও ও তাঁর পাঠকদের কাছেও সেই বিশেষ সময়ের অভিজ্ঞতাই একটু তির্যক্ ভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। ধর্মসংস্কার, সমাজ-সংস্কার ইত্যাদির কর্মসূচি পঞ্চাশের দশকেই ক্রমনিঃশেষিত হয়েছে। রামমোহন সংস্কার-আন্দোলনের কর্মসূচির বেগেই বিলেত যেতে পেরেছিলেন বিশের দশকের শেষে। আর পঞ্চাশের দশক শেষ হতে-না-হতেই বিদ্যাসাগরকে কলকাতা শহরেই প্রায় নির্বাসন মেনে নিতে হয়, সাহেবদের সহযোগিতাও অনিশ্চিত হয়ে যায়। ইংরেজদের সংস্পর্শে ব্যক্তিগত আর্থিক উন্নতিও তখন আটকে গেছে। নাগরিক বাঙালি, বিশেষত হিন্দু বাঙালি ততদিনে নিজের জন্যে ইংরেজি শিক্ষার পথ ধরে

অন্ত এক পরিত্রাণ খুঁজছে। এমন একটা সময়ে ঈশ্বর গুপ্ত যখন কোনো-কোনো সময় গদ্যের বদলে পদ্যে সাংবাদিকতা করেন তখন তাঁর অজ্ঞাতেও তো তাঁর রচনায় শ্লেষের একটা অন্তর্ঘাতী প্রবণতা সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে ও পাঠকের অজ্ঞাতেও তো সেই প্রবণতা পাঠকের কাছে পৌঁছে যেতে পারে।

গুপ্তকবি নীলকরকে খুব সহজ উপলক্ষ পান। তিনি লিখতে পারেন,

কুঠেল সব শাহেবজাদা ধপ্‌ধপে বাইরে শাদা
ভিতরে পচা কাদার ভড়ভড়ানি
পেঁকো গন্ধ তায়।

[নীলকর]

এখানে আত্মগোপনের প্রয়োজন নেই, কারণ, নীলকর এ-রাজ্যের শাসক নন। কিন্তু এর পর নীলকরদের সঙ্গে এ-রাজ্যের শাসকদের বন্ধুত্বের কথা যখন বলা হয়, তখন নীলকরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তো অনেকখানি এই শাসকদের বিরুদ্ধেই অভিযোগ হয়ে ওঠে। তখন

দেশের ছোটকর্ত্তা দিলেন তাদের
হর্ত্তাকর্ত্তা করে।
জোরে বেঁধে আনে ধরে॥

[ঐ]

এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্য থেকে যে-অভিযোগ পাঠকের কাছে পৌঁছয় তা সংক্ষিপ্ততার সীমা ভেঙে ফেলে। ছোটকর্তার বিরুদ্ধে এখানে এর বেশি কথা নেই। এইটুকু কথাতেও একটা তির্যক্ অর্থ যুক্ত হয়ে যায়।

নীলকর-ছোটকর্তা সম্পর্কের বিবরণের পর যখন গুপ্তকবি লেখেন,

ও মা কুইন তোমার ইণ্ডিয়া ধাম
রুইন কোরো নাক।
যদি সোনার ভারত খাস করেছ
বাস করে মা থাক থাক।

[ঐ]

তখন এর ভিতরেও শ্লেষের একটা ভঙ্গি যেন নিহিত থেকে যায়। সেই নিহিত শ্লেষ এই সাংবাদিক পদ্যটিকে বিশেষ-বিশেষ জায়গায় গোপনে হিংস্রও করে তোলে, যদিও কথ্য ভঙ্গি, কবিগানের ঢঙ ও ইংরেজি শব্দের কৌশলী প্রয়োগের আড়ালে কবি আত্মগোপন করে ফেলতে পারেন—

ঠিক ধর্ম্মহীন ধর্ম্মতলার ধর্ম্ম অবতার
কটু কথার কল্পতরু বামুন গরু বাছে নাক
চাষার হাতে খোলা দিলে,
নীলে সকল জমি নিলে,
জমিদার সব কাছা ঢিলে,
চীলের মুখে মাছ।
ঘণ্টা গরুড় খাড়া থাকেন, কাচেন কাপের কাচ
সাপের কাছে কেঁচো যেন ;
সাত চড়ে রা ফোটে নাক ॥
তুমি সর্ব্বশুভকরী,
বিলাত-ভারতেশ্বরী
বিপদে শ্রীপদে ধরি কর করুণা।

[নীলকর]

সন্দেহ হয় রানী ভিক্টোরিয়ার শ্রীপদধারণ কতটা আন্তরিক, আর কতটাই-বা ভঙ্গি, আর কতটাই-বা নিজের গলার প্রকৃত স্বর চাপা দেবার কৌশল।

মিশনারিরাও গুপ্তকবির সহজ লক্ষ—'যত মিশনরি এ দেশেতে। এসে করে কি কারখানা।' সেই মিশনারির বিরুদ্ধেও তিনি 'মা ভিক্টোরিয়া'র কাছেই নালিশ জানান। সেই নালিশের সূত্রেই এমন কথায় পৌঁছে যান

তার পাশে 'হুমো' হুতম থুমো
ঘুমো ছেলের জাত রাখে না
যত শাদা জুজু জোটেবুড়ী
'ছেলেধরা' প্রতি জনা।

[দুর্ভিক্ষ]

আর তার পর রানীকে জানান

নয় তোমার অধীন, স্বাধীন এরা
কেমন করে কর্ব্বে মানা ?
ও মা আমরা যেটা বুঝতে পারি
খোট্টা লোকে তা বোঝে না।
তুমি সর্ব্বেশ্বরী যদি তাদের
চোক রাঙায়ে কর মানা।

তবে টুপী খুলে আড্ডা তুলে
পালিয়ে যাবার পথ পাবে না।
নগর কমিশনার যারা
তাঁদের এ কি বিবেচনা।
এ কি প্রাণে সহে ষাড় দিয়ে মা
ময়লাফেলার গাড়ী টানা।

[দুর্ভিক্ষ]

মিশনারি আর কলকাতা শহরের কমিশনার গুপ্তকবির সাংবাদিকপদ্যে এক হয়ে গেছেন। কিন্তু যে-'মা ভিক্টোরিয়া'র কাছে তাঁর আবেদন তাঁর সুবাদেই গুপ্তকবি এঁদের এক করতে পারেন। ভিক্টোরিয়াকে মা ডেকে ও আব্দারে ছেলের সুরে তাঁকে সব জানানোর এই ভঙ্গি বাইরের দিক থেকে যেমন কবিওয়ালাদের গানের অনুকরণ, বিষয়ের দিক থেকে কি অসচেতন শ্লেষের লক্ষে ভিক্টোরিয়াও কখনো-কখনো চলে আসেন না ?

কিন্তু প্যারাডির এই অনুমানবোধ্য চাপা ইঙ্গিতের সামান্যও আর অবশিষ্ট থাকে নি, যখন ব্রিটিশ ক্ষমতার প্রতি আনুগত্য প্রকাশের প্রয়োজন হয়েছে, যখন ব্রিটিশ মহিমাকীর্তনের বাধ্যতা এসেছে। গুপ্তকবির বেলায় এই প্রয়োজন ও বাধ্যতা এসেছে দুবার—একবার চল্লিশের দশকে ও পরে কোম্পানি যখন শিখদের ও ব্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল, আর-একবার সিপাহি বিদ্রোহ দমনের জন্যে কোম্পানি যখন উত্তরভারতে দমন-অভিযান চালিয়েছিল।

প্রথম উপলক্ষ—শিখযুদ্ধ ও ব্রহ্মযুদ্ধের বর্ণনায়[৩৮] গুপ্তকবি তাঁর নতুন বিষয়কে নতুন ভাষা দিতে চান। কবিগানের ভাষার মডেলে ইংরেজি শব্দের মিশেল ঘটিয়ে কখনো-কখনো প্রায় অবিকল মুখের ভাষা ব্যবহার করে গুপ্তকবি তাঁর সাংবাদিক পদ্যে গদ্যের এক বিকল্প তৈরি করেছিলেন—যেন, এই পদ্য গদ্যের চাইতে বেশি গদ্য। কিন্তু ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শক্তির সম্প্রসারণের যে-কাহিনী তিনি পদ্যে লিখতে চাইছিলেন, তার সংখ্যা খুবই কম। তবু সেই কয়েকটি পদ্যেও বোঝা যায় তিনি নতুন ধরনের বীররসের বা যুদ্ধবিষয়ক পদ্যই লিখতে চাইছিলেন। সেই চেষ্টায় ইংরেজরা নতুন বীর হিশেবে বর্ণিত হচ্ছিল। সেই বীরত্ব বর্ণনায় বিপক্ষীয়দের হীনবল দেখানোটা ছিল অনিবার্য। সেই হীনবল প্রতিপক্ষের তুলনায় ইংরেজরা বিজয়ী বীর হিশেবে সহজেই প্রমাণিত হচ্ছিলেন। এ-রকম পদ্যে গুপ্তকবির সামনে কোনো ছক ছিল না। কারণ তখন পর্যন্ত বাংলায় নতুন ধরনের কবিতাচর্চার ধারা

প্রতিষ্ঠিত হয় নি, এক রঙ্গলালের কিছু রচনায় সেই নতুনত্বের সামান্য ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে মাত্র। কিন্তু রঙ্গলালের কবিতার বিষয় হিশেবে এমন সমকালীন ঘটনা আসে নি। সেখানেও গুপ্তকবিকে রামায়ণ-মহাভারত-পাঁচালির যুদ্ধবর্ণনার সাহায্যই প্রাধান্য নিতে হয়েছে। কিন্তু 'শিখযুদ্ধে ইংরেজের জয়'—নামের কবিতাটিতে

গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয়,
শতলজ পার হল   শিখ সমুদয়।
রণে ব্রিটিসের জয়   রণে ব্রিটিসের জয়॥

এই ধুয়ো পুরোটা বা এর অংশবিশেষ পদ্যরচনাটিতে ব্যবহৃত হয়েছে। তার ভিতর কবি লিখছেন

কালগুণে বিপরীত বুঝিবার ভ্রম।
এসেছিল শিখ সব করিয়া বিক্রম॥
বামনের অভিলাষ ধরিবেক শশী।
উর্দ্ধভাগে হস্ততুলে ভূমিতলে বসি॥
তুরঙ্গের খরগতি খর করে শক।
বাস্থকি করিতে বধ বাঞ্ছা করে বক॥

বা, এ-রকমই আর-একটি অংশ

পাঞ্জাবীয় শিখদের আশা ছিল মনে।
ব্রিটিশ বিনাশ করি জয়ী হবে রণে॥
সমুদয় অস্ত্র লয়ে হয়ে অগ্রসর।
করিল শিবিরে আসি সম্মুখ-সমর॥
প্রথমে জঙ্গল পেয়ে মঙ্গল-সাধন।
দঙ্গল বাঁধিয়া করে ঘোরতর রণ॥

'ব্রহ্মদেশের সংগ্রাম' নামের কবিতাটিতে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও যুদ্ধের বর্ণনা দুটোই আছে।

বীররসে বিভাসে জুড়িয়া জোর তান।
গাহিতেছে সেনা সব রণজয়ী গান॥
হইল বিবাদ-বহ্নি বড় বলবান্।
না হয় নির্ব্বাণ আর না হয় নির্ব্বাণ॥
কতদুর ছুটে অগ্নি নাহি পরিমাণ।
করুণ ধরণী সুখে নররক্ত পান।

আবার

ইংরাজ সহিত রণে পাইবে আসান।
ভেক হয়ে ধরিয়াছে ভুজঙ্গের ভান॥
ক্ষণমাত্র নাহি করে মনে প্রণিধান।
কেমনে হইবে রক্ষা জাতিকুল মান॥
শোভা পেতো হলে পরে সমান সমান।
পর্ব্বতের সহ কোথা তৃণের প্রমাণ॥

ব্রিটিশের কীর্তি বা বীরত্ব ব্যাখ্যা করতে গুপ্তকবির কাছে কোনো বিশিষ্ট শব্দভাণ্ডার নেই বা নতুন কোনো উপমাদি অলংকারও নেই। সেখানে তাঁকে নির্ভর করতে হচ্ছে প্রধানত পৌরাণিক ও পাঁচালি ধারার ওপরেই।

বোধহয়, এই অভাব দূর করতেই তিনি ছন্দের নানা রকমফের ঘটিয়েছিলেন। পয়ারের কাঠামোর মধ্যেই কখনো-কখনো তিনি ছন্দের চাল পাল্টেছেন। এক শিখদের সঙ্গে ব্রিটিশ সৈন্যের যুদ্ধ নিয়েই তাঁর এতগুলি সাংবাদিক পদ্য—'শিখযুদ্ধে ইংরেজের জয়', 'দ্বিতীয় যুদ্ধ', 'মুদকির যুদ্ধ', 'শিখযুদ্ধ', 'ফিরোজপুর যুদ্ধে জয়'। এতে তিনি পয়ারের ছাঁদকে এই ভাবে ভেঙেছেন ও সাজিয়েছেন

কালবেশ ধরেছিল প্রাণপুঞ্জ হরেছিল
করেছিল ভয়ানক গতি।
বহুলোক জরেছিল চক্ষে জল ঝরেছিল
মরেছিল বহু সেনাপতি॥

[শিখযুদ্ধ]

যুদ্ধের বিষম ধুম গগনে উঠিল ধুম
ঘুম নাহি নয়ননিকটে।
ঘুচিল শিখের শঙ্কা বাজিল বিজয় ডঙ্কা
লঙ্কাজয়ী কাণ্ড ভাই ঘটে॥

[ফিরোজপুর যুদ্ধে জয়]

ব্রিটিস, গণে। অভয়, মনে।
শিখের সনে। সেজেছে রণে॥
লাহোর, ধিপ। শিশু দ, লিপ।
তার স, মীপ। সমর, দীপ॥

ধনের, আশ। করি প্রকাশ।
প্রাণী বি, নাশ। দয়া না, বাস ॥
স্বরূপ, বটে। সকলে, রটে।
শতদ্রু, তটে। পাছে কি ঘটে ॥
তোমার, কার্য্য। নহে নি, বার্য্য।
পাইবে ধার্য্য। শিখের রাজ্য ॥

[ফিরোজপুর যুদ্ধে জয়]

চরণের পর্বভাগ অনুযায়ী পাঠক যাতে পড়তে পারেন সেজন্য কবি পর্বভাগ করে দিয়েছেন।

এ-ছাড়াও আরো নানারকম বৈচিত্র্য কবি করতে চেয়েছেন তাঁর উপকরণের সংকীর্ণতা সত্ত্বেও। 'মুদকির যুদ্ধ' রচনাটিতে প্রতিটি চরণের প্রথমে একই ধরনের সমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহার করেছেন।

চেগেছে বিষম যুদ্ধ শিখগণ সঙ্গে।
রেগেছে ইংরাজলোক রণরস-রঙ্গে ॥
সেজেছে অগণ্য সৈন্য কি কব বিস্তার।
বেজেছে জয়ের ডঙ্কা নাহিক নিস্তার ॥

[মুদকির যুদ্ধ]

আবার 'শিখযুদ্ধ' রচনাটিতে এ-রকম একই ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন প্রথম দুই পর্বের শেষে ও তৃতীয় পর্বে

যত চাপ দেঁড়ে ছিল দাড়ি গোঁফ নেড়েছিল
বড় বড় খেড়ে ছিল সাতে।
ভাল আড্ডা গেড়েছিল রণভূমি ফেঁড়েছিল
মেড়েছিল বারুদ তাহাতে ॥

সাহেবদের নিয়ে গুপ্তকবির নতুন বীরগাথা রচনার প্রয়াস ভাষা আর ছন্দের পৌরাণিকতার দ্বারাই সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই বীরগাথা রচনার কোনো বস্তুভিত্তি ছিল না। তাই সর্বত্রই শুধু ইংরেজের স্তবস্তুতি। ছন্দের সামান্য হেরফেরে বা শব্দের গম্ভীর ব্যবহারে সে স্তবস্তুতির ভিতরে কোনো বৈচিত্র্য আসে না। শিখ-যুদ্ধ, ব্রহ্মযুদ্ধ বা কাবুলযুদ্ধের বর্ণনায় যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য বা স্থানের নিজস্বতা পদ্যরচনা-গুলিতে আসে না, এমন-কি এই সব যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাও আলাদা ভাবে বর্ণিত হয় না। যেন সমস্ত মানুষই দুটি ভাগে বিভক্ত—ব্রিটিশ ও ব্রিটিশবিরোধী।

সাংবাদিক পদ্যরচনায় গুপ্তকবির যে—বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি, সেগুলি এই যুদ্ধপদ্যগুলিতে দেখা যায় বিশেষ করে সেই সব অংশেই যেখানে তিনি ব্রিটিশ প্রতিপক্ষ ভারতীয়দের বর্ণনা দিয়েছেন। সাহেবদের সম্পর্কে যখন তিনি লিখেছেন তখন দেশী কথা বা বচনের চাইতে গম্ভীর শব্দ বা চরণের প্রতি তাঁর পক্ষপাত। ইংরেজি শব্দের ব্যবহার তুলনায় কম। এমন জায়গা অবিশ্যি আছে যেখানে এই ভঙ্গি উদ্দেশ্যের বিপরীত ফল তৈরি করেছে। কিন্তু এই দেশী কথা, বচন ও ইংরেজি শব্দ তিনি ব্রিটিশের স্বদেশীয় প্রতিপক্ষদের বেলায় স্বাভাবিক ভাবে ব্যবহার করেছেন। তাই সেই অংশগুলি গুপ্তকবির অন্যান্য সাংবাদিক পদ্যের সঙ্গে ভাষাভঙ্গির দিক থেকে অনেক বেশি মেলে।

রণভূমি ছেড়ে যায় যত চাঁপ দেড়ে।
গুলীগোলা অস্ত্র তোপ সব লয় কেড়ে॥
মাথার পাগড়ী উড়ে পড়ে নদী কূলে।
বুদ্ধিলোপ দাড়ি-গোঁপ সব যায় ঝুলে॥
চড়াচড় মারে চড় সিফায়ের দলে।
ধড়ফড় ক'রে ধড় পড়ে ধরাতলে॥

[শিখযুদ্ধে ইংরেজের জয়]

দ্বিতীয় শিখযুদ্ধে ঈশ্বরগুপ্ত 'ভারতের অবোধ দুর্ব্বল লোক যত' তাদের ধিক্কার দিচ্ছেন, 'ভাল ভাত মাছ খেয়ে নিদ্রা যাবে কত ?' কারণ 'লাহোরের শিখ সেনা শক্ত অতিশয়।' এবং এই যুদ্ধে যদি ব্রিটিশদের সাহায্য করা যায় তা হলে, 'আমাদের প্রত্তি হবে ভূপতির প্রীতি।' গুপ্তকবির উৎসাহবাক্য---

আমরা তাদের সঙ্গে রোকে রোকে রুকে।
দাড়ি ধরে দিব টান বাড়ী মেরে বুকে॥

[দ্বিতীয় যুদ্ধ]

কী ভাবে যুদ্ধ যেতে হবে ও যুদ্ধ করতে হবে সে-বিষয়ে স্বদেশীয়দের প্রতি তাঁর পরামর্শ

সাহসে করিবে যুদ্ধ যত বুদ্ধি ঘটে।
কোনক্রমে নাহি যাবে গোলার নিকটে॥···
গায়ে দেহ আচকান পায়ে চটি জুতি।
মাথায় পাগড়ী বাঁধ পর সাদা ধুতি॥

দোবছা দোছট করি চোট কর মনে।
হোঁচট না খাও যেন ঘোরতর রণে॥
সাইনের অগ্রভাগে যেয়ো নাক বয়কে।
চোট্ চোট্ কাট্ কাট্ মালসাট মুখে॥

[দ্বিতীয় যুদ্ধ]

রণক্ষেত্রে হোঁচট খাওয়ার সমস্যাই তাঁর কাছে এমন প্রাধান্য পায় যখন তিনি স্বদেশীয়দেরই তাঁর পদ্যরচনার বিষয় করে তোলেন।

এক গাড়ে গাড়িতে মগের বাচ্চা যান।
শ্বেত সেনাপতি যত জলযানে যান॥···
জলেস্থলে আগে তিনি হলে আগুয়ান।
কোথা রবে মগেদের বগমারা বান?···
ফণি-ফণা তুচ্ছ করি কুচ্ছ বহুতর।
তেক লয়ে ভেক ডাকে গ্যাঙ্গর গ্যাঙ্গর॥···
ইংরাজে করিবে দূর কদাকার মগে।
কোথায় লাগেন "বগা বাঙ্গালের লগে"॥
ধ'রে খাক্ পাখাভাঙ্গা মাছরাঙ্গা খগে।
বাঁচুক আবার অজা দোক্তা চূণ রগে॥

[ব্রহ্মদেশের সংগ্রাম]

ইংরেজি ভাষা, দেশী শব্দ ও বাচনের মিশ্রণে এই সব পদ্যে কখনো-কখনো যে বিপরীত ফল হয়েছে সে-কথা এর আগে আমরা উল্লেখ করেছি। কিন্তু সেই সব জায়গায় বোধহয় ব্রিটিশ মাহাত্ম্য বর্ণনায় গুপ্তকবির উৎসাহের প্রবলতার সঙ্গে তাঁর ভঙ্গির সীমাবদ্ধতার একটা সংঘাত ঘটে গেছে। তাই সে-সংঘাতের ফলে গুপ্তকবি ব্রিটিশের স্তুতিজ্ঞাপক যে-চরণ লিখেছেন তা, অন্য অংশের সংস্কৃত-আলংকরিক রীতির সঙ্গে একেবারেই মেলে নি।

বেঁধে হোপ ক'রে কোপ দিলে তোপ দেগে।
নাহি রব পরাভব গেল সব ভেগে॥
যত দল হত বল প্রতিফল পেলে।
রেজিমেণ্ট করে সেণ্ট তাঁবু টেণ্ট ফেলে॥

[শিখযুদ্ধে ইংরেজের জয়]

লাহোরের দরবার আশু হবে অধিকার
দেখি তার অনুষ্ঠান নানা।

এবিল ইংলিশ যত ডেবিল করিয়া হত
টেবিল পাতিয়া খাবে খানা ॥
চারিদিকে সেনাগণ মধ্যভাগে চ্যাপিলন
সরমন্ পড়িবেন জোরে !
যতেক গোরার ক্লাস ধরিয়া সেরির গ্লাস
কহিবেক হিপ হিপ হুরে ॥

[ফিরোজপুর যুদ্ধে জয়]

ব্রিটিশের কীর্তি বর্ণনা করতে গিয়ে পদ্যরচনায় গুপ্তকবি ভঙ্গির নিশ্চয়তা পান নি, প্রধানত তাঁর ভরসা সংস্কৃতনির্ভর রীতি। ব্রিটিশের জয় বর্ণনায় গুপ্তকবি ব্রিটিশ প্রতিপক্ষের বর্ণনায় তাঁর স্বাভাবিক ভঙ্গি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সিপাহি বিদ্রোহে বিদ্রোহী সিপাহিদের বিরুদ্ধে ও ইংরেজের এক-একটি জয়ে তিনি যে-পদ্য রচনা-গুলি লেখেন তাতে তাঁর আবেগের প্রকাশ ঘটেছে। সেই আবেগের টানে পদ্যের যে ধরন তিনি আবিষ্কার করেন তা তাঁর অন্যান্য সাংবাদিক পদ্য থেকেও আলাদা।

এই রচনাগুলিকে তাই হয়তো সাংবাদিক পদ্য বলাও ঠিক নয়। কারণ, সাংবাদিক রিপোর্টিং এই সব পদ্যরচনার উপলক্ষ নয়, গদ্যের পরিবর্তে আরো তাড়াতাড়ি ও সহজে পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য রচনা লেখাও এই সব পদ্যরচনার লক্ষ নয়। 'নানাসাহেব', 'কানপুরের যুদ্ধে জয়', 'দিল্লীর যুদ্ধ', 'এলাহাবাদের যুদ্ধ', 'আগরায় যুদ্ধ' বা 'যুদ্ধশান্তি'[৩৯] এই পদ্যরচনাগুলির কোনো-কোনোটিতে কোথাও-কোথাও সাংবাদিকতার সামান্য চেষ্টা থাকলেও এ রচনাগুলিকে গদ্যের বিকল্প রচনা বলা ঠিক নয়, কারণ, এ-রচনার বেশির ভাগ অংশই পদ্যের বিশেষ ধরনের সঙ্গে মিশে আছে। পদ্যের ভাষাতেই কবি তাঁর কথা বলতে চেয়েছেন কারণ এখানে তাঁর বলবার কথা নিয়ে কোনো দ্বিধা নেই।

সমাজ-সংস্কার সম্পর্কিত তাঁর সাংবাদিক পদ্যরচনাগুলি আলোচনার সময় আমরা অনুমানের চেষ্টা করেছি যে হয়তো সমাজসংস্কার-আন্দোলন থেকে মানসিক দূরত্ব তখন বাঙালি নাগরিক সমাজে এসে গিয়েছিল বলেই তাঁরা এ নিয়ে দায়িত্বহীন হালকা রসিকতাও করতে পারতেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই সামাজিক ভঙ্গিটিকে ভাষা দিতে পেরেছিলেন।

ইংরেজের কীর্তিবর্ণনার সময়ও তাঁর ভঙ্গি ভক্তের। যে-ভাষায় পৌরাণিক দেবদেবীদের কীর্তিকাহিনী বর্ণনা করা হয়ে থাকে, সেই ভাষায় তিনি ইংরেজদের

কীর্তিকাহিনী বর্ণনা করে গেছেন। যেখানে তিনি মৌলিক ভঙ্গি নিয়ে ফেলেছেন সেখানে রচনার অর্থান্তর ঘটে গেছে।

কিন্তু ব্রিটিশ রাজত্ব যে-মুহূর্তে দেশীয় সিপাইদের আক্রমণে অনিশ্চিত হয়েছে সেই মুহূর্তে গুপ্তকবি তাঁর পদ্যরচনার ক্ষমতা নিয়েই ব্রিটিশের পক্ষে সিপাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নেমেছেন।

বিদ্রোহের শেষে গুপ্তকবি প্রাণ ফিরে পাওয়ার আনন্দে লেখেন—

ভয় নাই আর কিছু ভয় নাই আর।
শুভ সমাচার বড় শুভ সমাচার ॥
পুনর্ব্বার হইয়াছে দিল্লী অধিকার।
"বাদশা বেগম" দোঁহে ভোগে কারাগার ॥···
করেছিল যে-প্রকার বিষম ব্যাপার।
হাতে হাতে প্রতিফল ফলে গেল তার ॥

আনন্দের এ প্রকাশ পয়ারের মধ্যে বাঁধা থাকতে চায় না। তাই একই রচনায় কবি আরো একটু আবেগমথিত ভঙ্গিতে বলে ওঠেন

যমুনার জল আর পূর্ব্ববৎ নাই রে।
হয়েছে রুধিরে ভরা কেমনেতে নাই রে?
তৃষ্ণায় সে জল আর কেমনেতে খাই রে?
ভাসিছে তাহাতে সব শব ঠাঁই ঠাঁই রে ॥
ঝাঁপ দিয়া মরিতেছে সকল সিপাই রে।
এ কূলে ও কূলে তার ভস্ম আর ছাই রে ॥···
স্থানে স্থানে মৃতদেহ পর্ব্বতের চাঁই রে।
পচাগন্ধে নাক জ্বলে কোথায় দাঁড়াই রে?
মলহীন একটুকু স্থান নাহি পাইরে।
কোথা খেয়ে কোথা শুয়ে সুখে নিদ্রা যাই রে?

[যুদ্ধশান্তি]

এ-রচনা সাংবাদিক পদ্য নয়, গদ্যের বিকল্পও নয়। সমকালীন ঘটনা নিয়ে যে-কথা কবি বলতে চান তা যেন এই পদ্যের ভাষাতেই সম্ভব। ব্রিটিশ রাজত্ব নাও থাকতে পারে—এই আশঙ্কায় গুপ্তকবি এতই মথিত যে তাঁর পক্ষে যেন পদ্যের ভাবাও যথেষ্ট নয়।[৪০] 'দিল্লীর যুদ্ধ'-এ সিপাহিদের পরাজয়ের বর্ণনা

হোরা মেরে গোরাগণ ছুটিল যখন।
সামাল সামাল রব উঠিল তখন॥
পলাতে না পথ পায় নাহি সয় ব্যাজ।
উঠে ছুটে পলাইল মুখে করে ল্যাজ॥
মেও মেও ডাক ডেকে বিল্লীর সমান।
দিল্লীর প্রদেশ ছেড়ে করিল প্রস্থান॥
পূর্ব্ববৎ পুনর্ব্বার নাহি আর দায়।
প্রণাম তোমায় প্রভু প্রণাম তোমায়॥

[দিল্লির যুদ্ধ]

এরপর ছন্দের চাল বদলে যায়, যেন ইংরেজকে প্রণাম জানিয়ে কবির কাজ শেষ হয় নি। কবি তাদের ধ্বংস করতে চান, অন্তত পদ্যে, যারা এমন ইংরেজেরও বিরোধিতা করে। তাই ভিন্ন চলনে তিনি বলেন, একই পদ্য রচনায়

প্রতিফল পেলে ভাল হাতে হাতে।
ঠেকাঠেকি হয়ে গেল পাতে পাতে॥
উড়ে গেল কত সেনা গোলাঘাতে।
বনে বনে ফিরিতেছে খোলা হাতে॥
ধরে ধরে ভয় পেয়ে মরে ত্রাসে।
সাধ্য কিবা লোকালয়ে পুন আসে॥

সাহেবদের কীর্তিকাহিনী যে-পদ্যরচনার বিষয় তাতে যেমন গুপ্তকবি পাঁচালি-পুরাণের ভাষাভঙ্গি সচেতন বেছে নেন, বিদ্রোহী সিপাইরা যে-পদ্যরচনার বিষয় তাতে অনেক সময়ই তিনি বেছে নেন লৌকিক কোনো ধরন। এই নির্বাচন যে সচেতন ভাবে ঘটে তাও যেন নয়, তাঁর স্বতঃস্ফূর্ততায় কোথায় যেন বিষয় ও প্রকরণের এমন একটা মিল ঘটে যায়, যা তখনকার রচনায় থাকবার কথা নয়। কখনো ছড়ায় তিনি নানাসাহেবের ভূমিকা নস্যাৎ করেন, আবার কখনো তরজার এক চরণের শেষাংশ নিয়ে পরের চরণের প্রথমাংশ তৈরির কায়দায় এক ব্যালাড লেখেন।

নানার কি নানাকেলে, আজো আছে ধন ?
নানার কি নানাকেলে, আজো আছে জন ?
নানার কি নানাকেলে, আজো আছে মন ?
নানাব কি নানাকেলে, আজো আছে পণ ?

নানার কি নানাকেলে, আজো আছে ডাক ?
নানার কি নানাকেলে, আজো আছে জাঁক ?
প্রকাশিছে পাপপন্থা, হয়ে পন্থী "ঢুঢু ?"
'ঢু' মারিতে জানে শুধু, ঘটে তার "ঢুঢু" ॥
নানা পাপে পটু নানা, নাহি শুনে না, না।
অধর্ম্মের অন্ধকারে হইয়াছে কানা ॥
ভাল-দোষে ভাল তুমি, ঘটালে প্রমাদ।
আগেতে দেখেছ ঘুঘু, শেষে দেখ ফাঁদ ॥

[নানাসাহেব]

বাজী রাও পাসা যিনি,
বাজী রাও পাসা যিনি, সাধু তিনি,
মান্য নানা মতে।
মহারাষ্ট্র, মহা রাষ্ট্র, পূজ্য এ জগতে ॥
ছেড়ে সে নিজ দেশ,
ছেড়ে সে নিজ দেশ, রাজবেশ,
বাঁচিবার তরে।
আত্ম-সমর্পণ করে, ব্রিটিসের করে ॥
হয়ে সে পুত্রহত,
হয়ে সে পুত্রহত, ক্রমাগত,
করে কত দান।
আঁটকুড়ো কপালে তবু, হ'ল না সন্তান ॥···

[কানপুরের যুদ্ধে জয়]

গুপ্তকবির যে-'আদর্শ' ও 'বিশ্বাস' সিপাহি বিদ্রোহে বিপন্ন হয়ে পড়েছিল, তার পক্ষে তাঁকে অগত্যা পদ্যই লিখতে হয়, কারণ, বিদ্রোহী সিপাহিদের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর হাতে অন্য কোনো অস্ত্র নেই, থাকার কথাও নয়। তাই যে-কবিগান, তরজা, খেউড় তিনি সাংবাদিকপদ্য রচনার কাজে ব্যবহার করেছিলেন, সিপাহি বিদ্রোহের বিরুদ্ধে পদ্যরচনায় তিনি সেই ভঙ্গিগুলির নতুন ব্যবহার ঘটাবার মতো দূরত্বও রাখতে পারেন না, আসল তরজা ও খেউড়ই লিখে ফেলেন।

এই ভাই বড় মজা,
এই ভাই বড় মজা, হয়ে অজা,

বাঘের মুখে চরে।
পিপীড়া ধরেছে ডানা, মরিবাব তরে ॥
হ্যাদে কি শুনি বাণী ?
হ্যাদে কি শুনি বাণী, ঝাঁসির রাণী,
ঠোঁটকাটা কাকী।
মেয়ে হয়ে সেনা নিয়ে, সাজিয়াছে নাকি ?
নানা তার ঘরের ঢেঁকি,
নানা তার ঘরের ঢেঁকি, মাগী খেকী,
গোয়ালের দলে।
এতদিনে ধনে জনে, যাবে রসাতলে ॥
হয়ে শেষ নানার নানী,
হয়ে শেষ নানার নানী, মরে রাণী,
দে'খে বুক ফাটে।
কোম্পানীর মুলুকে কি, বর্গিগিরী খাটে ?

[কানপুরের যুদ্ধে জয়]

আসল কবিগানের সঙ্গে এই ছাপার কবিগানের পার্থক্য শুধু এই যে কবিগানের তরজা ও খেউড় ছাপা হতে পারত না কিন্তু গুপ্তকবির এই খেউড় ছাপাও হত, লোকে পড়তও, কারণ সাহেবরা আমাদের ছাপাখানাও দিয়েছিল, লেখাপড়াও শিখিয়েছিল।

চা র

গদ্যের সংগঠন : যতিচিহ্নের ব্যবহার

গদ্যভাষার সঙ্গে মুখের কথার সাযুজ্য থাকায় ও যুক্তিভিত্তিক রচনা গদ্যচর্চার অন্যতম প্রধান ভিত্তি হওয়ায় গদ্যের ভাষাভঙ্গির সঙ্গে মুখের কথার ভঙ্গির একটা মিল থেকেই যায়। এই মিলের অন্যতম প্রধান লক্ষণ ধরা পড়ে বাক্যের অন্তর্গত যতিগুলির মধ্যে। আবার, গদ্যের যুক্তিশৃঙ্খলার পরম্পরারক্ষারও অন্যতম প্রধান অবলম্বন এই যতি। তাই যতি ব্যবহারের ইতিহাস হয়ে পড়ে গদ্যের গড়ন বা অবয়বের (structure) ও ন্যায়স্থাপনের (logic) ইতিহাসের ওতপ্রোত।

কিন্তু বাংলা গদ্যের গড়ন ও ন্যায়ের বিকাশ খুব স্বাভাবিক ছিল না। ইংরেজ আগমনের আগে দলিলদস্তাবেজে, চিঠিপত্রে ও আইনকানুনে যে-গদ্যভাষা আভাসিত হচ্ছিল তা ইংরেজ আগমনের ফলে নষ্ট হয়ে যায়। উনিশ শতকের গোড়া থেকে যে-বাংলাগদ্যের সূত্রপাত তা ইংরেজপূর্ববর্তী বাংলাগদ্যের আভাসের সম্পর্কশূন্য।[৪১] উনিশ শতক থেকে বাংলা গদ্যের প্রধান উৎস অনুবাদ। অথচ সে-অনুবাদের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র এক বাংলা গদ্য তৈরি করা।[৪২] অনুবাদ হিশেবে যে-গদ্য-ভাষার শুরু, তার বিকাশে গড়ন ও ন্যায়ের নিজস্বতা না থাকারই কথা! থাকেও নি। তাই বাংলা গদ্যে এমন আপাত বিস্ময়কর ঘটনা আছে যে বাংলা গদ্যচর্চার একেবারে প্রাথমিকপর্বেই খুব সুষ্ঠু গদ্যরচনার দেখা পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু যেহেতু সেই সৌষ্ঠবের ও সাফল্যের প্রধান ভিত্তি অনুবাদ, তাই তা কোনো ঐতিহাসিক ধারা সৃষ্টি করে না বা ঐতিহাসিক আদর্শও প্রতিষ্ঠা করে না। তাই কোনো একটি রচনায় বা কোনো একজন বিশিষ্ট লেখক তাঁর রচনায় গদ্যভাষার ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি উপকরণ সমাবেশ ঘটানো সত্ত্বেও ততদিন পর্যন্ত তা বাংলাগদ্যের একটি আবশ্যিক উপকরণ হিশেবে গৃহীতই হয় না, যতদিন না বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রে গদ্যরচনার পরিমাণগত প্রধান ধারায় তা ব্যবহৃত হয়।

পরন্তু যতিব্যবহার যেমন বাক্যের গড়ন ও ন্যায়ের ওতপ্রোত, তেমনি গদ্যের লেখক ও পাঠকসমাজের ভিতর বাগভঙ্গির মিল, মুখের কথার বাক্যরচনার কৌশল ও যতিব্যবহারের অভ্যাসের সঙ্গেও তার সম্পর্ক প্রায় কার্যকারণের শৃঙ্খলাতেই গ্রথিত। বাংলা গদ্যরচনার প্রথম যুগের লেখক ছিলেন প্রধানত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত

সমাজ। মিশনারি বা হিন্দু রক্ষণশীল ও প্রগতিশীলদের পক্ষ থেকে যে-পত্রপত্রিকা বেরত তার প্রধান লেখকও ছিলেন তাঁরাই। এই পণ্ডিতসমাজের ভিতর সংস্কৃত আদর্শের প্রতি আনুগত্য ছিল নতুন বাংলা গদ্যরচনার দায়িত্বের চাইতে বেশি। তাঁদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব ও আনুগত্যবোধের অন্তর্গত বিরোধের ফলে সংস্কৃত রচনা থেকে আদর্শগত বিচ্ছিন্নতা কখনোই সম্ভব হয় নি। রামমোহনের যতিস্থাপনের আদর্শ তাই তাঁরা গ্রহণ করেন নি। হিন্দু কলেজের নব্য ইংরেজিশিক্ষিত ছাত্ররা ও রামমোহন-অনুগামী যুবকেরা যখন সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশ শুরু করেন তখন তাঁরা সংস্কৃত আদর্শ থেকে সরে আসতে চান। কিন্তু নতুন বাংলা গদ্যের আদর্শ তাঁদের সামনে উপস্থিত না থাকায় তাঁদেরও নির্ভর করতে হয় প্রধানত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের ওপরই। তবু, হিন্দু কলেজের ছাত্ররা ও রামমোহন-অনুগামী যুবকেরা পত্রিকা প্রকাশ শুরু করলে নতুন একটি পাঠকসমাজের কাছে পৌঁছনোর তাগিদ তাঁদের ভিতর দেখা যায়। এই তাগিদ যেমন বাংলা গদ্যের বাক্যগঠনের পরিবর্তন ঘটায়, তেমনি যতিব্যবহারেরও পরিবর্তন ঘটায়।

বাংলা বাক্যগঠনে ও যতিব্যবহারে রামমোহন, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাদর্শন, তত্ত্ব-বোধিনীর আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও সংবাদ-সাময়িকপত্রে তা গৃহীত হতে যে কত সময় লাগে তার প্রমাণ মেলে ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত যে-কোনো পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠায়। দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন, উদ্ধৃতিচিহ্ন—এই সবই হয়তো তখন ব্যবহৃত হচ্ছে—কিন্তু এগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে লেখকের ধারণা স্পষ্ট নয় বা বাক্যের গড়ন ও ন্যায়ের দ্বারা এই ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত নয়, বা এই যতিব্যবহার বাক্যের ও প্যারার গড়ন ও ন্যায়কে নিয়ন্ত্রণ করে না, বা সামাজিক কোনো শ্রেণী বা গ্রুপের বাগভঙ্গিব অনুসরণও এতে ঘটে নি। ১৮১৯ সালে 'দিগ্‌দর্শন পত্রিকা'র স্কুলবুক সোসাইটি কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত পাঠেই কমা চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে ও ১৮২০ সালে 'সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার' বইটিতে রামমোহন রায় ইংরেজি উদ্ধৃতিচিহ্ন, ফুলস্টপ, কমা ও সেমিকোলনও ব্যবহার করেছেন। ১৮৪২ থেকে 'বেঙ্গল স্পেকটেটর'-এ আর 'বিদ্যাদর্শন' ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রধানত অক্ষয়কুমার দত্তের প্রয়াসে, বাংলা যতিচিহ্ন ব্যবহারের রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। তৎসত্ত্বেও ১৮৬০ সালের আগে তা সংবাদ-সাময়িকপত্রের গদ্যলেখকদের অধিকাংশের রচনায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে নি ও সেই রীতিনীতি বাংলা গদ্যের স্বাভাবিক উপাদানে পরিণত হয় নি। আবার, ১৮৬০ সালের পর পত্রপত্রিকার পাতায় যতিচিহ্ন সম্পর্কে অনভ্যাসের উদাহরণ প্রায় বিরল। থাকলেও তা কোনো লেখকের ব্যক্তিগত

ত্রুটি। বাংলা গদ্যে এই যতিচেতনা ১৮৬০ সাল নাগাদ গদ্যচর্চার অঙ্গীভূত হয়ে যায়।[৪৩]

তাই বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রে যতিচিহ্ন ব্যবহারের প্রবণতাগুলি পরীক্ষা করার কালসীমা ১৮১৮ থেকে ১৮৫৮ এই চল্লিশ বছর, 'দিগ্‌দর্শন' 'বঙ্গাল গেজেটি' থেকে 'সোমপ্রকাশ' পর্যন্ত।

১৮১৮ থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রে যতিব্যবহারের কয়েকটি প্রবণতা লক্ষ করা যায় :

১. দাঁড়ি ছাড়া অন্য কোনো যতিচিহ্ন ব্যবহার করা হচ্ছে না। কিন্তু দাঁড়ি ব্যবহারেরও কোনো সাধারণ নিয়ম খুঁজে পাওয়া যায় না। এক-এক জায়গায় এক-এক কারণে দাঁড়ি পড়ছে। তৎসত্ত্বেও বাক্যের গড়ন এমন ও একটি বাক্য থেকে আরেকটি বাক্যের ব্যাকরণগত পার্থক্য এত স্পষ্ট যে কোনো যতিচিহ্ন না থাকলেও পাঠকালে বিরতি গ্রহণ সম্ভব। অর্থাৎ গদ্যের ভিতর যতি নিহিত থাকছে। এই প্রবণতাকে 'নিহিত যতি' নামে নির্দিষ্ট করা যায়।

২. বাক্যের গড়নটাই এমন হয়ে ওঠে যে সেখানে বাক্য থেকে আরেকটি বাক্য পৃথক হতে পারে না। সংযোজক অব্যয়, সাপেক্ষ সর্বনাম বা হেতুবাচক শব্দ ব্যবহার করে বাক্যে-বাক্যে এই সংযোজন ঘটানো হয়। ফলে দাঁড়িচিহ্ন ব্যবহার করা সত্ত্বেও তার কোনো নির্দিষ্ট কারণ যেমন বোঝা যায় না, তেমনি পাঠকালে বিরতি গ্রহণেরও কোনো অবকাশ থাকে না—যেন চেষ্টা চলে বাক্যের গড়ন দিয়ে যতিচিহ্ন ব্যবহারকে অপ্রয়োজনীয় করে দেয়া যায় কি না। এই প্রবণতার ভিতর যতিব্যবহার আর বাক্যের গড়নের মধ্যে এক বিরোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই প্রবণতাকে 'উপহিত যতি' (উপ-ধা+ক্ত) নামে নির্দিষ্ট করা যায়।

৩. দাঁড়ি ছাড়া কোনো যতিচিহ্ন ব্যবহার করা হচ্ছে না বটে কিন্তু দাঁড়ি ব্যবহারের একটা নিয়ম যেন অনুসরণ করা হচ্ছে। ফলে দাঁড়ি ব্যবহারের পরিমাণ বাড়ছে। এই লক্ষণকে 'স্পষ্ট যতি' নামে নির্দিষ্ট করা যায়। অন্য কোনো চিহ্ন ব্যবহৃত হচ্ছে না বলে দাঁড়ির সঙ্গে-সঙ্গে নিহিতযতিও থেকে যাচ্ছে।

৪. দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন, প্রশ্ন ও বিস্ময়চিহ্ন, উদ্ধৃতিচিহ্ন সবগুলিই ব্যবহৃত হচ্ছে। এই প্রবণতাকে 'যথার্থ যতি' বলা যায়।

৫. কমা ব্যবহার শুরু হওয়ার পর শুধু কমা দিয়েই যতি ব্যবহারের সব প্রয়োজন নির্বাহ হতে লাগল, যেমন আগে শুধু দাঁড়ি দিয়ে করা হত। এই প্রবণতাকে 'অনভ্যস্ত যতি' বলা যায়।

এই প্রবণতাগুলি কালানুক্রমিক নয়। আবার এও নয় যে সবগুলি প্রবণতাই এই চল্লিশ বছর ধরে সক্রিয় থেকেছে। ১৮১৮ সালের পর যতিচিহ্ন ব্যবহার সম্পর্কে চেতনা ও অভ্যাসের অভাবে অনেক জায়গায় যতিচিহ্ন নিহিত থেকে গেছে। তারপরই ধীরে-ধীরে যতিচিহ্নের বিকল্প বাক্যগঠনের একটা চর্চা ১৮৩০ সালের আগে থেকেই দেখা দেয়, যেটাকে 'উপহিত যতি' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু এই 'উপহিত যতি'-র লক্ষণ যখন দেখা দিয়েছে, তখনই আবার 'নিহিত যতি'-র সঙ্গে 'স্পষ্ট যতি' ব্যবহারের প্রবণতাও লক্ষ করা যায়। ১৮৩৫ সাল নাগাদ সময় থেকে ১৮৪২-এ 'বেঙ্গল স্পেকটেটর'-এর প্রকাশকাল পর্যন্ত 'উপহিত যতি'-র প্রবণতা কমে এসে 'স্পষ্ট যতি'-র প্রবণতা বাড়তে থাকে। ১৮৪২ থেকে 'বেঙ্গল স্পেকটেটর', 'বিদ্যাদর্শন' ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'তে যথার্থ যতি ব্যবহার শুরু হয়ে যায়—যদিও তারপরও ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত যতির অনভ্যস্ত ব্যবহার চলতে থাকে।

এই প্রবণতাগুলিকে কোনো সময়ই খুব নির্দিষ্ট লক্ষণে চিহ্নিত করা যায় না। এক-একটি প্রবণতার ভিতর নানারকম আভ্যন্তরীণ বৈচিত্র্য দেখা যায়। আবার এই আভ্যন্তরীণ বৈচিত্র্য সত্ত্বেও একটি বিশিষ্টতাও লক্ষ করা যায়। এই বৈচিত্র্য ও বিশিষ্টতার মধ্য দিয়েই যতিব্যবহারের নির্দিষ্টতা আকার নিয়েছে। আবার এই পুরো সময় জুড়েই এই একটি প্রবণতার নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের ভিতর বিভিন্ন উপাদানের বিরোধ-বিচ্ছেদ ও সমন্বয় ঘটেছে। যতিচিহ্ন যেহেতু গদ্যেরই একটি প্রধান উপাদান, গদ্যের অন্য উপাদানগুলির বিন্যাস ও সম্পর্কও যতিব্যবহারের প্রবণতাকে প্রভাবিত করেছে।

নিহিত যতি

সংবাদ-সাময়িকপত্রের গদ্যচর্চায় ইংরেজি বা সংস্কৃত বা পারসিক প্রভাব বিশেষত স্পষ্ট হয়ে ওঠে ধর্মীয়, সামাজিক ও আইনসংক্রান্ত দীর্ঘ রচনাগুলিতে। কিন্তু একেবারে প্রাথমিক পর্বে 'সংবাদ'-অংশগুলিতে গদ্যের এক তথ্যগত বিবরণের রীতি দেখা যায়। এই ধরনের রচনার তাত্ত্বিক ভার নেহাত কম বলে ও লেখকের মন্তব্যের লক্ষ নেহাতই আপাত-প্রাসঙ্গিক কোনো বিষয় বলে গদ্য প্রায় আধুনিক বাঙলা সাংবাদিক গদ্যের মতোই, পার্থক্য শুধু যতি ব্যবহারে।

১. সমাচার দর্পণ। ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯

মাথা ভাঙ্গা খাল। এ বৎসর মাথা ভাঙ্গা খালের মোহনা প্রায় রুদ্ধ হইয়াছে [।] তৎপ্রযুক্ত ভারী বোঝাই নৌকা তাহার উপরে কোন কষ্টে গমনাগমন

করিতে পারে না [।] সেখান কার চড়াতে অনেক বোঝাই নৌকা আটক হইয়া রহিয়াছে এবং ছোট২ নৌকাতে জিনিস বাহির করিতেছে [।] তাহাতে জিনিসের অপচয় যথেষ্ট [,] খরচও অধিক ও কালবিলম্ব ও হইতেছে। ইংগ্লণ্ডীয় গোড়া সৈন্য গাজীপুর হইতে কলিকাতা আসিতেছিল তাহারা একমাস পর্য্যন্ত সেখানে বদ্ধ আছে।

আধুনিক রীতিতে যতিবিন্যাসের তৃতীয় বন্ধনীগত চেষ্টাতেই দেখা যায় যে গদ্যরীতি এই যতিবিন্যাসের সামান্যতম বিরোধীও নয়। গদ্যরীতির ভিতর নিহিত এই যতি বিষয়ের টানে ও গদ্যরীতির নিজস্ব যুক্তিতে কখনো-কখনো বাইরেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

২. সমাচার দর্পণ। ৮ মে ১৮১৯

নূতন টাকা। এই সনে যে নূতন টাকা টাকশালে প্রস্তুত হইয়াছে কলিকাতাস্থ দুষ্ট লোকেরা সেই টাকার চতুর্দিক কিনারা উখা দিয়া ঘষিয়া লইয়া পুরাণা-কল টাকার মত ছোট করে [,] ইহাতে কেবল তাহারদের লাভ হয়। আমরা শুনিতেছি যে এই কারণ শ্রীশ্রীযুত একটা নূতন মোহরের কারণ ইংগ্লণ্ডে পত্র পাঠাইয়াছেন।

এই উদাহরণে মাঝখানে একটি জায়গায় কমা বা ড্যাশ ব্যবহার করা চলে বটে কিন্তু শেষ খবরটির স্পষ্টতা ও তার আগে প্রয়োজনীয় বিবরণের সরলতার ফলে ঐ কমা বা ড্যাশ অপরিহার্য হয়ে ওঠে না। বরং নতুন টাকা ঘষে পুরোন টাকার মতো আকার করার ঘটনাটি খুব সহজে বলা হয়েছে।

সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রথম পর্বে অন্তত ছোট-ছোট সংবাদে ও মন্তব্যে এই পরিণত গদ্যরীতি প্রায়ই দেখা যায়। তার একটি কারণ হয়তো এই ধরনের রচনায় লেখক খানিকটা দায়-দায়িত্বমুক্ত ছিলেন। কিন্তু দীর্ঘতর রচনায় বা ছোট সংবাদেও যখন বিষয়গত কোনো জটিলতা আসে, তখন গদ্য যেমন আর সরল থাকে না, নিহিত যতিও তত স্পষ্ট থাকে না বা হয় না।

৩. সমাচার দর্পণ। ১ মে ১৮১৯

বিদনূর নবাবের উকীল। বিদনূর শহরের নবাবের উকিল সাহেব গোলমুদ্দীন আপন মুনীবের কোন কর্ম্মে ইংগ্লণ্ডে যাইতেছে [।] তাহার সমাচার পাওয়া গেল যে সে মিসর দেশ দিয়া ফ্রান্স দেশে পঁহুছিয়াছে [।] সে যে কর্ম্মে যাইতেছে তাহার প্রকাশ হয় নাই [।] সে অতিশয় ঐশ্বর্য্যপূর্ব্বক যাইতেছে। একত্রিশ বৎসর হইল এই দেশ হইতে কোন উকীল ইউরোপে যায় নাই [।] ইহার পূর্ব্বে টিপু সুলতানের এক উকীল ফ্রান্স দেশে গিয়াছিল।

মাথাভাঙ্গার খাল বা নূতন টাকা সংবাদলেখকের কাছে যত হালকা বিষয় বিদনূরের নবাবের উকিল বা তাঁর বিদেশ গমন নিশ্চয়ই ততটা নয়। বিশেষত তাঁর প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তও যখন লেখককে টানতে হয়েছে। ফলে এই লেখাটি আকারে ছোট হলেও, গদ্যরীতির দিক থেকে বেশ জটপাকানো। তৃতীয় বন্ধনীতে যে-দাঁড়িচিহ্নগুলির সম্ভাব্য ব্যবহারের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে তার তৃতীয়টির পরের বাক্যটি বিষয়ের দিক থেকে খানিকটা খাপছাড়া অথচ ঠিক ঐ বাক্যটির পরই লেখক একটা দাঁড়ি দিয়েছেন। ঐ বাক্যটি যদি সম্ভাব্য প্রথম দাঁড়ির পরের বাক্য হত, তাহলে প্যারাটিতে রচনার ব্যক্তিনিরপেক্ষ শৃঙ্খলা অটুট থাকত।

গদ্যরীতির অপরিণতির ফলে গদ্যের শৃঙ্খলা যে-ধরনের বাক্যে বা বাক্যাংশে ব্যাহত হচ্ছে সেখানে আচমকা দাঁড়ি পড়ে যায়, যেন লেখকের গদ্যশৈলীর আত্মরক্ষারই এক স্বভাব-তাগিদে ; আবার ব্যবহৃত দাঁড়ির সঙ্গে প্রায় সম্পর্কশূন্য ভাবেই গদ্যের ভিতরে-ভিতরে দাঁড়ি বা কমা নিহিত থেকে যায়। দীর্ঘতর রচনায় নিহিত যতি ও ব্যবহৃত যতির এই বিরোধ আর গদ্যরীতির বিশৃঙ্খলা কখনো-কখনো স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

৪. সমাচার দর্পণ। ২৭ মার্চ ১৮১৯

শ্রীযুত কোঙর হরিনাথ রায় বাহাদুরের বিবাহ।—মুরশেদাবাদের কাশীমবাজারের শ্রীযুত কোঙর হরিনাথ রায় বাহাদুরের শুভবিবাহ ১৬ ফাল্গুণ হইয়াছে [।] তাহার বরাওর্দ্দ দুই লক্ষ টাকা [।] সময় মতে জিনিসের কম দামে [,] অধিক ব্যয়ে যেমত বিবাহ হইয়াছে [,] এমত বিবাহ তদ্দেশে কাহার হয় নাই ও কেহ দেখেন নাই [।] ইহার বিস্তারিত রওয়াএস ঝাড় বাগীচা কাপড়ের ও আবরক ও মুখী বাগীচা ও নানাজাতি বৃক্ষ সকল আম্র কাঁঠাল আনাবস কামরঙ্গা দাড়িম আতা ও ফুল নানাজাতি নির্ম্মিত হইয়াছিল [।] বিজ্ঞ মনুষ্যেতে চারিদণ্ড দৃষ্টি করিলে জ্ঞান করিত যে নির্ম্মিত দ্রব্য নতুবা ছোট২ লোকে প্রকৃত জ্ঞান করিয়াছে এমত উত্তম কারিগরি। ইহারদিগের এক২ বাগীচার মূল্য তিনশত চারিশত [,] তাহাতে মোমবাতি সংযোগ [,] এমত পাঁচশত বাগীচা [,] গেলাসী ঝাড় তিনহাজার [,] গেলাসী বাগীচা এক হাজার [,] মোমবাতি দুই শত মন [,] রওানিরোশনী হয়। নাএব মজলিস ইস্তক ৫ ফাল্গুণ নাগাদ ১৫ রোজ দশ তাএফা বাই ও তিন তাএফা ভাঁড় [,] ইহা সেওয়ায় কালওয়াতিগুণী লোক অনেক [।] ঐ ৫ তারিখে শ্রীযুত কোঙর বাহাদুর আইবড় খান [।] পরে স্থানে২ যেখানে নিমন্ত্রণে যান

নানাবিধ বাদ্য ও নানাবিধ সলতনৎ এবং রাজ অভরণে ভূষিত অপূর্ব্ব রূপ্যনির্ম্মিত যানারোহণ করিয়া গমনাগমন করিতেন [।] বিবাহের মজলিসে এক২ দিন এক২ ফেরেক্কা লোকের গমন হইয়াছিল [।] তাহায় বিস্তারিত [—] প্রথম দিবস [,] নিজ আমলাতে বেষ্টিত [,] দ্বিতীয় দিবস [,] গ্রামস্থ যাবৎ মহাজন ভদ্রলোক ইং [,] তৃতীয় দিবস লাগাদ অষ্টম দিবস ১৩ ফাল্গুণ পর্য্যন্ত [।] যাবদীয় হাকীমান [,] আমলা [,] আপীল অদালত ও ফৌজদারী ও কালেক্তরি ও পরমিট ও কোম্পানীর কুঠীর আমলা ও নেজামতের আমলা ও শহরের যাবদীয় সাহেবান [,] আলীসান ও বহরমপুর ও গয়রহ সাহেব লোক ও বিবিলোক ও বাবালোক একত্র এবং শ্রীযুত নবাব সয়লজঙ্গ বাহাদুর একত্র [।] মজলিসে নাচ ও গান ও বাদ্য ও আতস নানাবিধ সকল তামাশা দৃষ্টি করিয়া পরমাহ্লাদিত হইয়াছেন ।

[স. সে. ক. ১ । ২৩৮]

বিষয়ের ভার না থাকলেও ও মন্তব্যের দায় না থাকলেও লেখাটি বড় বলে ও বিবরণে নানাধরনের ঘটনা আসছে বলে উদ্ধৃতিটিতে বাক্যগঠন অনেকক্ষেত্রে ব্যাকরণসম্মত নয় । আমাদের নির্দেশিত দ্বিতীয় দাঁড়ির পরের বাক্য ও তৃতীয় দাঁড়ির পরের বাক্যের পদবিন্যাসে অর্থবোধের বাধা ঘটে । তদুপরি একটি ধারাবাহিক বিবরণে ক্রিয়ার কালসাম্য থেকে যে চলমানতা আসে, এই অংশটিতে তাও নেই । সংবাদ-সাময়িকপত্রে পদ্যচর্চার প্রাথমিক পর্বে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ রচনায় এগুলি সাধারণ লক্ষণ হওয়া সত্ত্বেও আরবি-ফারসি শব্দের প্রচুর ব্যবহারে উদ্ধৃতিটি বিশিষ্ট ।

একেবারে শেষের দাঁড়িটিকে বাদ দিলে প্যারার ভিতরে মাত্র দুইবার দাঁড়ি ব্যবহৃত হয়েছে । যে-দুই জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে, ঠিক সেই দুইটি জায়গাতেই দাঁড়ি কেন পড়ল ও অন্যত্র কেন পড়ল না এর কোনো আপাত কারণ নেই । তবু লক্ষ করলে দেখা যায়, কাপড়ের গাছপালা ফুলফল কত চমৎকার বানানো হয়েছিল বলতে গিয়ে প্রথমবার, আর আলোর কত রোশনাই হয় বলতে গিয়ে দ্বিতীয়বার, দাঁড়ি পড়েছে । মাত্র ঐ দুটি বর্ণনাই লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল । হয়তো নিজে দেখেছেন—বিবাহের বাকি বিবরণ তো তাঁর কানে শোনা । অর্থাৎ বাক্য গঠন বা অর্থবোধের সুবিধের জন্য নয়, শ্বাস নেওয়ার জন্যও নয়, কণ্ঠস্বরের অনুসরণেও নয়—দাঁড়ি ব্যবহৃত হচ্ছে বড়জোর লেখকের প্রত্যক্ষণের উত্তেজনায় ও সেই প্রত্যক্ষণের সঙ্গে গদ্যরীতির সাযুজ্যের টেনশনে, আচমকা, হতে পারে অজান্তেই । একবারও ব্যবহৃত না হতে পারত । কিন্তু ভাষাগত জড়তা ও

ব্যবহারের এই চমক সত্ত্বেও এই উদ্ধৃতিটিতে যতিচিহ্ন না থাকায় কিন্তু বাক্য-বিন্যাসের কোনো জটিলতা ঘটে নি। কোনো বাক্যের কোনো পরিবর্তন না ঘটিয়েও আধুনিক রীতিতে প্যারাটিকে যে-যতিচিহ্নিত করা সম্ভব তা খুবই স্পষ্ট।

অর্থাৎ যতিচিহ্ননিরপেক্ষভাবেই প্যারাটিতে বাক্যগুলি এমনভাবে গড়ে উঠেছে যাতে সমাপিকা ক্রিয়া বাক্যগুলিকে পরস্পর থেকে পৃথক রাখতে পেরেছে। এই প্যারাটিতে বিশেষত দুটি বাক্যের ভিতর কোনো সময়ই কোনো সংযোজক পদ ব্যবহৃত হয় নি। যে-২২ বার সংযোজক পদ ব্যবহৃত হয়েছে তার প্রথমটি ব্যতীত প্রত্যেকটিই দুটি শব্দের ভিতর সংযোজন ঘটিয়েছে—কোনো সময়ই দুটি বাক্যের ভিতরে নয়।

বাক্যগঠনের এই সরলতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যতি, বাক্যের ভিতর নিহিত থেকে যাচ্ছে। যে-যতি প্রকাশ্যত ব্যবহৃত হচ্ছে তা বাক্যের গড়ন বা লেখকের অভিপ্রায় বা অন্য প্রয়োজন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। বাংলার সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রাথমিক স্তরে এই নিহিত যতি অনেকদিন পর্যন্ত কার্যকর ছিল। কিন্তু এই ধরনের দীর্ঘ রচনায় ব্যবহৃত যতি ও নিহিত যতির ভিতর পারস্পরিক সম্পর্কের অভাব থেকে পারস্পরিক বিরোধিতারও আশঙ্কা থেকে যায়।

গদ্যরীতিরই অন্তর্গত এই বিরোধিতা যতিস্থাপনকে যেমন নিয়মিত হতে দেয় না, তেমনি গদ্যরীতির বিকাশেও বাধা দেয়। কিন্তু যতিস্থাপন ও গদ্যরীতির এই বিরোধিতার মূল নিহিত ছিল গদ্যরীতির সঙ্গে সামাজিক অন্বয়ের অভাবের ভিতর। তাই এই আদিপর্বে দাঁড়ি চিহ্ন ব্যবহারের একটি সুসংগত উদাহরণের ভিতরও দেখা যায় গদ্যের প্রসঙ্গ-অনুপ্রসঙ্গ সম্পর্কে সচেতনতার অভাব। ফলে দাঁড়িচিহ্নের কিছুটা শৃঙ্খলাও গদ্যের আত্মআবিষ্কার ঘটায় না।

৫. সমাচার দর্পণ। ২৩ সেপ্টেম্বর ১৮২০

> দেবীপূজা। হিন্দুস্থানের মধ্যে শরৎকালীন দেবীপূজা অনেক স্থানে হয় [। বা, বা—] বিশেষত গঙ্গানদীর উভয় পার্শ্বে অত্যধিক সমারোহ হয় [।] যদি কোন ভাগ্যবান হিন্দু এ পূজা না করে তবে রীতি আছে যে রাত্রিকালে প্রতিমা আনিয়া লোকেরা সঙ্গোপনে তাহার চণ্ডীমণ্ডপে রাখিয়া যায় [।] পরে গৃহস্থ ব্যক্তি জানিয়া ধর্ম্মভয়ে কিংবা লোকভয়ে যে রূপে হয় তাঁহার পূজা করে। তাহাতে গত সপ্তাহে ৫ আশ্বিন মঙ্গলবার রাত্রে বেলঘরিয়া গ্রামের বালকেরা ঐ গ্রামের কোন ভাগ্যবানের বাটীতে এক দোমাটীয়া প্রতিমা রাখিয়া আসিয়াছিল [।] ৬ আশ্বিন বুধবার প্রাতে সেই ভাগ্যবান আপন

বাটীতে ঐ দোমাটীয়া প্রতিমা দেখিয়া অতিশয় রাগান্বিত হইল ও আপন ঘর হইতে দা আনিয়া প্রতিমাকে শতধা করিয়া আপন পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিয়া বাঁশ ও কাষ্ঠ দ্বারা চাপা দিয়া রাখিল। যাহারা ঐ প্রতিমা রাখিয়া আসিয়াছিল তাহারা দেখিল যে যেখানে প্রতিমা ছিল সেখানে নাই [। বা ; বা—বা,] পরে অন্বেষণ করিতে২ জানিল যে প্রতিমা কাটিয়া পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিয়াছে [।] অপর তাহারা ঐ প্রতিমা সরকারি স্থানে আপনারা পূজা করিবেক নিশ্চয়ই করিয়া প্রতিমা ফিরিয়া আনিতে গিয়াছিল [। বা ; বা—বা 'কিন্তু'] তাহাতে সে ভাগ্যবান ব্যক্তি তাহারদিগকে প্রতিমা উঠাইয়া লইতে না দিয়া মারিপিট করিয়া বিদায় করিল।

পূর্ব্বাবধি এই রীতি চলিয়া আসিতেছে তাহাতে যেখানে এইরূপে তাহার আগমন হয় সেখানে কোনমতে অন্নবস্ত্রে পুরস্কৃতা হইয়া দশমীর দিবস জলমগ্না হইয়া থাকেন কিন্তু আগমনমাত্রে এরূপ পুরস্কৃতা হইয়া জলে মগ্না হইতে হিন্দুস্থানের মধ্যে কেহ দেখে নাই ও শুনে নাই।

[স. সে. ক. ১ । ২৩০]

রচনাটিতে তিনটি ভাগ আছে। দাঁড়ি দিয়ে শিরোনামটি নির্দিষ্ট হয়েছে ও মন্তব্য একটি ভিন্ন প্যারায় করা হয়েছে। প্রথম প্যারায় ঘটনার বিবরণ—এই বিবরণে তিনটি জায়গায় দাঁড়ি চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। দাঁড়ি দিয়ে আলাদা করা এই তিনটি অংশে তিনটি স্বতন্ত্র বিষয়ের বিবরণ। প্রথম অংশে হিন্দুদের বিশেষ রীতির উল্লেখ। দ্বিতীয় অংশে 'বেলঘরিয়া গ্রামের বালকেরা' ও 'সেই ভাগ্যবান্' কী করেছে তার ধারাবাহিক বিবরণ। তৃতীয় অংশেও দ্বিতীয় অংশের ধারাবাহিকতায় 'যাহারা ঐ প্রতিমা রাখিয়া আসিয়াছিল তাহারা' ও 'সে ভাগ্যবান ব্যক্তি' কী করল তার বিবরণ।

অর্থাৎ, এই প্যারাতে দাঁড়িচিহ্নের ব্যবহারের একটা নির্দিষ্টতা আছে। দাঁড়ি দেয়া হয়েছে প্রসঙ্গান্তর বোঝাতে। যতিচিহ্নের এটি একটি স্বীকৃত ব্যবহার। কিন্তু প্রসঙ্গান্তর বাছাইয়ের সময় লেখক একটি প্রসঙ্গের ভিতরে যে-অনুপ্রসঙ্গ আছে, তাকে কোনো যতিচিহ্নের দ্বারা নির্দিষ্ট করেন নি। এই অনুপ্রসঙ্গ বোঝাতে দাঁড়ি, সেমিকোলন বা ড্যাশ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বর্তমান রীতিতে আলোচ্য প্যারাটির যতিচিহ্ন ব্যবহার কী হতে পারে তা প্যারাটির উদ্ধৃতির ভিতর তৃতীয় ব্র্যাকেটে বোঝানো হয়েছে। অনুপ্রসঙ্গ নির্দিষ্ট করার এই অক্ষমতার ফলে বাংলা

সাময়িকপত্রের গদ্যের প্রাথমিক পর্বে, যতিচিহ্ন, গদ্যের গড়নের সঙ্গে গ্রথিত হতে পারে নি।

আলোচ্য প্যারাটিতে অন্তত তিনটি জায়গায় দাঁড়ি ছাড়া কোনো চিহ্ন ব্যবহারই করা যায় না অথচ লেখক কোনো চিহ্নই ব্যবহার করেন নি। এই তিনটি জায়গা বিষয়গতভাবে অনুপ্রসঙ্গ নয়, প্রসঙ্গান্তর। পরন্তু তিনটি জায়গাতেই ক্রিয়ার ব্যবহারে একটি কাজের সমাপ্তি বোঝায়। ফলে, শুধু অনুপ্রসঙ্গ নির্দিষ্ট করার অক্ষমতাই নয়, গদ্যের গড়নের অপরিহার্য উপকরণ হিশেবে যতিচিহ্ন ব্যবহৃত হচ্ছিল না। ফলে গদ্যের গড়ন ও যতিচিহ্নের ব্যবহার প্রায়ই পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। গদ্যে প্রসঙ্গ, অনুপ্রসঙ্গ বা প্রসঙ্গান্তর চিহ্নিত করাটা কোনো ব্যাকরণের বা রচনানৈপুণ্যের প্রশ্নে নয়—বিষয়ের সঙ্গে লেখকের আত্মতার প্রশ্ন। বর্তমান উদাহরণে তার পরিচয় পাওয়া যায় না। তেমন দৃষ্টিভঙ্গি-নিরপেক্ষ বা-বিরহিত রচনাও সংবাদ-সাময়িকপত্রে গ্রাহ্য হতে পারে। কিন্তু এই উদাহরণটিতে আসলে দৃষ্টিভঙ্গির বিভ্রাট ঘটেছে। মিশনারিদের কাগজের হিন্দু পৌত্তলিকতাবিরোধী একটি দৃষ্টিভঙ্গি আছে। অথচ সংস্কৃত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আবার অন্য দৃষ্টিভঙ্গি—অথচ তিনিই লেখক। পরন্তু সংবাদ-সাময়িকপত্রের একটা নিরপেক্ষতার ভূমিকা। দৃষ্টিভঙ্গির এই বিভ্রাটে বাংলাগদ্যের লেখকদেব কাছেই গদ্যের স্বরূপ তাই স্পষ্ট হতে পারছিল না।

একাট ঘটনার বিবরণ যখন দেয়া হয় তখন সেই বিবরণ বিষয়গতভাবে এক নিজস্ব ধরনের ধারাবাহিকতা অর্জন করে। বাংলা সাময়িকপত্রের গদ্যের এই প্রাথমিক পর্বে বিষয়ের নিজস্ব এই ধারাবাহিকতা সম্পর্কে অনবহিতির ফলে প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার সময় 'অপর' 'তাহাতে' এ-রকম শব্দের অব্যয়-ব্যবহারের সাহায্য নেওয়া হত। আলোচ্য অংশে তিন জায়গায় যথাক্রমে 'তাহাতে' 'অপর' 'তাহাতে' এই তিনটি শব্দ অর্থহীন ভাবে ও বাক্যের গড়নের সংগতিহীনভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এটা স্পষ্টতই সংস্কৃত আখ্যানরীতির অথ, অনন্তর, অপিচ, তৎচ—ইত্যাদি অব্যয়তুল্য ব্যবহারের প্রভাবে ঘটেছে। এই ব্যবহার যতিচিহ্নের ব্যবহারকেও প্রভাবিত করেছে। হাতে এই ধরনের শব্দ থাকলে প্রসঙ্গান্তর সূচনায় যতিচিহ্নের ওপর অনন্যনির্ভরতা আর লেখকের থাকে না।

প্রাথমিক পর্বে বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রের রচনাগুলিতে দৃষ্টিভঙ্গির বিভ্রাট গদ্যের উপাদান সমাবেশে যে-বিঘ্ন ঘটায় তা দূর করতে বা এড়াতে বা তা থেকে আত্মরক্ষা করতে লেখককে বাধ্যতই কতকগুলি আনুষ্ঠানিক ব্যাকরণগত পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়েছিল। সেখানে তার একমাত্র নির্ভর সংস্কৃত ব্যাকরণ। যতক্ষণ

পর্যন্ত সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতি বাংলা বাক্যগঠনের নীতিকে গ্রাস না করে, ততক্ষণ নিহিতযতি কার্যকর থেকে বাক্য চলমান রাখতে পারে। আর নিহিতযতি কার্যকর বলেই আলোচ্য অংশটির গদ্যভাষা জড়তামুক্ত, বিবরণে গতি আছে, বাক্যগঠনে সংস্কৃত বা ইংরেজি রীতির এমন কোনো যান্ত্রিক প্রভাব নেই যা রচনাটিকে অনড় করে, বাক্যগুলি পরস্পরবিচ্ছিন্ন নয়, একটি বাক্য থেকে আরেকটি বাক্য বেশ সহজে আসে। যতিচিহ্নের সঙ্গে বাক্যের গড়নের ও ন্যায়ের অসংগতি সত্ত্বেও এটা সম্ভব হয়েছে বটে কিন্তু এটা তো গদ্যের বিকাশের ফলে সম্ভব হয় নি —সম্ভব হয়েছে বাক্যের ভিতরে, রচনার ভিতরে কতকগুলি জায়গা ফাঁক থেকে গেছে—যে-ফাঁক আজও আমরা যতিচিহ্ন দিয়ে ভরাতে পারি। কিন্তু সামাজিক বিষয়ের প্রতি লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিকতা যতিচিহ্নসহ গদ্যের উপকরণগুলিকে যে-শৃঙ্খলায় বিন্যস্ত করতে পারে, সেই শৃঙ্খলার অভাব লেখককে ঐ ফাঁক ভরাবার এক কৃত্রিম উপায় খুঁজতে ব্যস্ত করবে। তখন আর যতি নিহিত থাকে না, যতি লুপ্ত হয়ে যায়।

তাই বাংলাগদ্যের বিকাশে আদিপর্বে যেমন সরল সহজ বাংলা গদ্যের জায়গায় সংস্কৃত-ঘেঁষা গদ্য দেখা দেয়, তেমনি নিহিতযতির কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে সেখানে আসে যতির উপাধি নিয়ে উপহিতযতি, যা আসলে যতিই নয়, শব্দ মাত্র।

তার আগে এমন একটি উদাহরণ বিশ্লেষণ করা যেতে পারে যেখানে বিষয় ও লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির ঐক্যে যতিবিন্যাসসহ গদ্যরীতিটি সার্থক বাঙলা গদ্যরীতি হয়ে উঠতে চায়।

৬. সমাচার দর্পণ। ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮২১

বাবুর উপাখ্যান।—আমরাবতী নগরে রাজচক্রবর্ত্তী নামে একজন অতিবড় ধনবান কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। চক্রবর্ত্তী প্রথমাবস্থায় রাজকীয় ও জমিদারী সংক্রান্ত নানাপ্রকার বড়২ কর্ম্ম করিয়া ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

তিনি বড় বিজ্ঞ মন্ত্রী [,] বুদ্ধিমান [,] আদালতের রীতিজ্ঞ এবং বড় চাকুরিয়া প্রচরদ্রূপে ব্যক্ত হইবাতে সুলতান আহম্মদ খলীফা [,] ভারতবর্ষের ব্যাপক. মনাজন [,] তাহাকে ডাকাইয়া আফীমের কুঠীর দেওয়ানি কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। আফীম মহলের কর্ম্ম বড় [,] উপার্জনের সীমা নাই। অত্যল্প খরচে আফীম প্রস্তুত হইয়া চীন দেশে যায় [। বা,] সেখানে বিক্রয় হইয়া সুলতান খলীফার যথেষ্ট লাভ হয়। দেওয়ান চক্রবর্ত্তী দেখিলেন যে আকাঙ্ক্ষামত ধনবৃদ্ধি হয় না অতএব কৃত্রিম অকৃত্রিম আফীম প্রস্তুত করিতে

লাগিলেন। তাহাতেই তিনি অসংখ্য ধনশালী হইলেন। কিন্তু চক্রবর্ত্তী নিঃসন্তান [,] সর্ব্বদা দুঃখী [,] কহেন যে আমার এত বড় নাম ডুবিল [,] নির্ব্বংশ হইলাম [,] সন্তান নাই [,] ধন কাহাকে দিয়া যাইব। তৎপ্রযুক্ত সর্ব্বদা …যাগ দান করেন।

[স. সে. ক. ১ । ৯৫-৯৬]

এটি উপাখ্যানের প্রথম অংশ। তখন কমা বা অন্য কোনো যতিচিহ্ন ব্যবহৃত হওয়া শুরু হয় নি, আলোচ্য অংশটিতে লেখক শুধুমাত্র দাঁড়ি চিহ্নই দিয়েছেন। কিন্তু কোথাও দাঁড়ির সঙ্গে বাক্যগঠনের বৈপরীত্য নেই। বর্তমান রীতি অনুযায়ী আমরা অংশটিতে কমা চিহ্নগুলোই শুধু বসাতে পারি, একটি জায়গায় দাঁড়ি দেয়া চলে। এই একই রচনার প্রথমাংশের তুলনায় শেষাংশে দাঁড়ি কম ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও সমাপিকা ক্রিয়ার ওপর গঠিত সরল বাক্যে, ক্রিয়ার কাল ও রূপের ঐক্যে, নিহিতযতি কার্যকর থেকে যায়।

পরদিনে বাটীর তাবৎ লোক ব্যস্ত [,] কর্ম্মের ভিড়ের সীমা নাই [,] বাবু কুঠী যাইবেন। বাবু প্রাতে স্নান করিলেন [,] কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া উত্তম জামা জোড়া বহুকালে পরিধান করিয়া বেশ বিন্যাস পূর্ব্বক অভুক্ত উত্তম গাড়ীতে আরোহণ করিলেন [,] সঙ্গে চারিজন ব্রজবাসী লাল পাগড়ীওয়ালা বাঁকা হামরা চলিল গাড়ী ঘর২ শব্দে দুর্ব্বিধ (?) বাজারে পহুঁছিল [।] সেখানে হাজী হাদী সাহেবের খেজুরের দোকানে উত্তীর্ণ হইলেন [।] হাদী সাহেব বড় লোক [,] বাবুর সহিত বড় প্রণয় [,] বাবুকে বসিতে চৌকি দিলেন [।] পরে উভয়ে অন্য ভাষায় আলাপ হইল [।] বাবুর বাক্যশক্তি তাদৃক্ নাই তথাচ বড় লোক গাটমিট করিয়া কহিলেন। হাদী সাহেব বাবুর প্রতি কহিলেন যে অদ্য বড় গরমী [,] তুমি বড় মোটা হইয়াছ [,] তোমার কত টাকা আছে [,] টাকার কি দর [,] এক্ষণে সুদ বাজারে টাকার অল্পতা কেন হইল [,] বাণিয়ারা ইহার কি বলে। বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন যে [,] সাহেব [,] এ দেশে আর একজন কাজী আসিতেন শুনি সত্য কি না [,] লড়াইয়ের কি খবর [,] এত জাহাজ আসিতেছে কেন ইত্যাদি [।] আলাপ হইয়া বাবু ব্রজবাসীদিগকে ডাকিয়া হুকুম দিলেন যে একজন দেখ মোল্লা ফিরোজ ঘরে আছে কি না [,] আনতনি বব্রিগু সাহেব ঘরে হাজিরা খান কি না [,] দ্বিতীয় জনকে কহিলেন যে দেখ এয়াণ্ড সাহেব নিশ্চিন্ত বসিয়া আছেন কি না জানিয়া আইস তবে আমি যাইব [।] ইহা কহিয়া গাড়ীতে সওয়ার হইলেন ও

নিলাম ঘর হইয়া বাজার দিয়া বাবু বাটী আইলেন [।] বাটীর লোক সকলে স্তব্ধ [।] বড় গরমি [,] কুঠী গিয়াছিলেন বাবু অভুক্ত [,] আহার হইলে হয় সুতরাং সকলেই অতিব্যস্ত [।] পরিশ্রম হইয়াছে [,] শিরঃপীড়াও হইল [,] আহার সুন্দররূপে করিতে পারিলেন না [,] যৎকিঞ্চিৎ খাইয়া শয়ন করিলেন ।

[স. সে. ক. ১ । ৯৮-৯৯]

একই রচনার অপেক্ষাকৃত ছোট প্রথমাংশে যেখানে ৯ বার দাঁড়ি দেয়া হয়েছিল, রচনাটি বেশ খানিকটা এগনোর পর এই শেষাংশে সেখানে মাত্র ৪ বার দাঁড়ি পড়েছে। প্রথম দাঁড়ি পড়েছে 'কুঠী যাইবেন' এই ঘোষণায়। দ্বিতীয় দাঁড়ি পড়েছে বাজারে পৌঁছনোর পর। তৃতীয় দাঁড়ি পড়েছে হাদী সাহেবের কথার পর। চতুর্থ দাঁড়ি প্যারার শেষে। তৃতীয় দাঁড়ির পরে বাবুর কথার শেষে যদি একটি দাঁড়ি থাকত তাহলে দাঁড়ি ব্যবহারের যুক্তি হত প্রায় নিখুঁত। দাঁড়ি ব্যবহার সংখ্যায় কম হলেও প্রথমাংশের তুলনায় এই দ্বিতীয়াংশে স্টাইলের কোনো পরিবর্তন ধরা পড়ে না। একমাত্র শেষের দিকে একটি 'সুতরাং' ব্যতীত লেখক এখানেও কোনো সংযোজক অব্যয় ব্যবহার করেন নি।

সংবাদ-সাময়িকপত্রের গদ্যচর্চার এই আদিযুগে সামাজিক নকশা, ব্যঙ্গ রচনা, হালকা লেখার ভিতর গদ্যের একটা নিজস্ব বাঙালি চেহারা ধরা পড়ছিল বলেই, এই ধরনের রচনায় যতিচিহ্নের অসম্পূর্ণ ব্যবহারও গদ্যরীতির সামগ্রিকতায় এক সম্পূর্ণতা পেয়েছিল। লেখক ও বিষয়ের এই ঐক্য অবশ্য খুব বেশি ঘটে নি। তাই ব্যাপকতর সেই সব ক্ষেত্রে বাক্যের গড়ন আর ইংরেজি যতিচিহ্ন পরস্পরবিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল। বাক্যের ভিতর নিহিতযতির অবকাশে গদ্যের প্রাথমিক গতিশীলতা তাই সংস্কৃত ব্যাকরণের নিগড়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। একই বিষয় নিয়ে দুটি লেখার তুলনা দিয়ে তা স্পষ্ট করা যেতে পারে।

৭. সমাচার দর্পণ। ৭ এপ্রিল ১৮২১

মহামহাবারুণী।—গত শনিবারে মহামহাবারুণীর যোগে গঙ্গা স্নানে অনেক২ দেশীয় লোক আসিয়াছিল [।] তাহাতে মোকাম বৈদ্যবাটীতে উৎকল দেশীয় অনেক লোক আসিয়াছিল [।] তাহারা অধিক পথ গমনেতে দুর্ব্বল হইয়া অতিশয় প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপেতে উত্তপ্ত জল পান করিয়া ওলাওঠা রোগে অনেক লোক পথে ও মোকাম বৈদ্যবাটীতে মরিয়াছে এবং তদ্দেশস্থ লোকেরা অতিশয় নির্দয় [,] ঐ বৈদ্যবাটীতে যেং লোকের ওলাওঠা রোগ হইয়াছিল তাহারা অবসন্ন হইলে তাহার সঙ্গী লোকেরা ত্যাগ করিয়া পলাইল। ইহাতে

গঙ্গার তীরে যেং অবসন্ন লোক ছিল তাহার মধ্যে অনেকে জোয়ার সময়ে সজীব গঙ্গা পাইয়াছে। তথাকার দারোগা অনেক লোককে উঠাইয়া ঘোল ও দধি প্রভৃতি খাওয়াইয়া ছিল। তাহার মধ্যে অনেক মরিল [.] কচিৎ কেহ২ বাঁচিয়াছে।

মোং ত্রিবেণীতে মহামহাবারুণীতে ছেষট্টী লোক মরে [।] ইহার মধ্যে ওলউঠা রোগে ৩০ ত্রিশ জন·ও লোকের চাপাচাপিতে ছত্রিশ জন মরে [।] ইহার মধ্যে বৃদ্ধ ৪ চারি জন ও বালক ৭ সাত জন [,] অবশিষ্ট সকলি যুবা। এই সকল লোক প্রায় উড়িষ্যা প্রদেশীয় [,] অন্য২ দেশীয় অল্প। ঐ মোকামে দারোগারা অনেকে আসিয়া তদারক করিয়াছিল কিন্তু কিছুই হইল না কারণ লোকের হঙ্গামে লোক মারা পড়িয়াছে।

[স. সে ক. ১। ১৩৫].

উদ্ধৃত অংশটির প্যারাভাগ অত্যন্ত নির্দিষ্ট। প্রথম প্যারাতে ওলাওঠার বিশদ বিবরণ ও দ্বিতীয় প্যারায় এই সমস্ত ঘটনার নির্যাস হিশেবে নিরপেক্ষ তথ্য—সাংবাদিক তথ্যের নিরপেক্ষতায় 'লোকের চাপাচাপিতে' মৃত্যুর বীভৎসতাও অস্পষ্ট হয়ে যায়। অপেক্ষাকৃত ছোট এই দ্বিতীয় প্যারাটিতেই ৩ বার দাঁড়ি দেয়া হয়েছে—দীর্ঘতর প্রথম প্যারাটিতে মাত্র ৪ বার। দ্বিতীয় প্যারার দাঁড়ি দেওয়ার ভিতরে একটা নিয়ম লক্ষ করা যায়। মৃত্যুর তালিকা দিয়ে প্রথম দাঁড়ি ও মৃতদের দেশপরিচয় দিয়ে দ্বিতীয় দাঁড়ি। তৃতীয় দাঁড়িটি প্যারার শেষ দাঁড়ি। প্রথম প্যারার 'তাহারা অবসন্ন হইলে তাহার সঙ্গী লোকেরা ত্যাগ করিয়া পলাইল' এই নির্দয় অংশটির পরই প্রথম দাঁড়িটি পড়েছে। তারপর নিয়মিতভাবেই এক-একটি বাক্যের শেষে দাঁড়ি পড়ে। কিন্তু খানিকটা তথ্যাতিরিক্ত আত্মপ্রক্ষেপে প্রথম দাঁড়িটির আগে যে কোনো যতি চিহ্নই ব্যবহৃত হয় না তার ফলে কিন্তু বাক্যগুলির পারস্পরিক পার্থক্য নষ্ট হয় নি, বিবরণের ধারাবাহিকতারও ক্ষতি হয় নি। পাঁচটি সমাপিকা ক্রিয়ার দ্বারা নির্দিষ্ট নিহিতযতির ভিত্তিতে এই পার্থক্য ও ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়েছে। উদ্ধৃতিটিতে সাপেক্ষ সর্বনামসহ সংযোজক পদ ব্যবহৃত হয়েছে মোট ৯ বার। তার ভিতর ৪ বার ব্যবহৃত হয়েছে শব্দের মধ্যে। বাকি ৫ বারের ভিতর ২ বারই ব্যবহৃত হয়েছে সুগঠিত শেষ বাক্যটিতে।

৮. সমাচার দর্পণ। ৩ এপ্রিল ১৮২৪

মহামহাবারুণী।—মোং অগ্রদ্বীপে এই বৎসর যে প্রকার লোকসমারোহ হইয়াছিল এমত প্রায় কখন হয় নাই যেহেতুক পূর্ব্বপশ্চিম উত্তরদক্ষিণ চতুর্দিগের

লোক দশ দিবসের পথ হইতে আসিয়াছিল কিন্তু ইহার মধ্যে বৈদ্যবাটীতে ওলাউঠা রোগে অধিক লোক মারা গিয়াছে (।) ইহাতে বোধ হয় যে ওলাউঠাও বুঝি যোগেতে বৈদ্যবাটীতে গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছিল এবং সেখানে তাহার শাসক কেহ না থাকাতে অবাধিতরূপে ঐ সকল বিদেশীয় যাত্রিকেরদের উপর আপন পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছে।

[স. সে. ক. ১। ২৩৪-৩৫]

এই অংশটির গড়নই এ-রকম যে একটি মাত্র জায়গা ছাড়া আর-কোথাও দাঁড়ি দেয়ার অবকাশটুকুও রাখা হয় নি। যে, এমত, যেহেতুক, কিন্তু, এবং—এই সংযোজক ও হেতুবাচক পদগুলি ব্যবহারের ফলে একটি বাক্যের সঙ্গে আর-একটি বাক্য এমন জুড়ে গেছে যে প্যারাটিকে মাত্র দুটি ভাগে ভাগ করা চলে।

এই ভাগ কোনো প্রকাশ্য যতিচিহ্নের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় নি বা এই দুই ভাগের মাঝখানে কোনো যতি নিহিতও নেই। বিভক্তি চিহ্ন ও সমাসে শব্দের সঙ্গে শব্দের সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সংস্কৃত বাক্য যেমন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে যেতে পারে লেখকের পছন্দমতো আর যতিচিহ্ন যেমন সেখানে অবান্তর হয়ে যায় সেই আদর্শে এই বাক্যগুলি রচিত ও গ্রথিত হয়েছে। গদ্যচর্চায় প্রয়োজনীয় উপকরণের সন্ধানে সংবাদ-সাময়িকপত্রের গদ্যে বাক্যের অনড় গড়নে যতিচিহ্নকে অপ্রয়োজনীয় করে দেয়ার প্রবণতা দেখা গেল। এই উদাহরণটি তারই প্রাথমিক সংকেত।

সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রাথমিক পর্বে যতিচিহ্ন ব্যবহারের যে-প্রবণতাকে নিহিতযতি বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে তার উদাহরণ, বিশ্লেষণ ও আলোচনাকে সূত্রাকারে উপস্থিত করে বলা যায় :

১. ছোট-ছোট সংবাদ-মন্তব্যে ও সামাজিক নকশায় গদ্যের সাবলীলতা ছিল। যতিচিহ্ন ব্যবহার না করার ফলে সেই সাবলীলতা ব্যাহত হয় নি। এই রচনাগুলির গদ্যে যতি নিহিত ছিল।

২. রচনায় ব্যবহৃত প্রকাশ্য যতিচিহ্ন ও নিহিত যতিচিহ্নের মধ্যে বিরোধ ছিল।

৩. সেই বিরোধের ফলে, ব্যবহৃত যতিচিহ্ন গদ্যের গড়ন ও ন্যায়ের সঙ্গে গ্রথিত হতে পারে নি—যতিচিহ্ন যেন ছিল গদ্যের বাইরের একটি উপকরণ।

৪. সেই কারণে রচনার প্রসঙ্গ, অনুপ্রসঙ্গ ও প্রসঙ্গান্তর বোঝাতে যতিচিহ্ন

ব্যবহৃত হতে পারছিল না। কিন্তু গদ্যের ভিতর নিহিত যতি গদ্যের চলমানতা একটা সীমা পর্যন্ত রক্ষা করতে পেরেছে।

৫. বিষয়ের সঙ্গে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির অনৈক্যের ফলে ও দৃষ্টিভঙ্গির নিজস্ব অসংগতির ফলে গদ্য হয়ে উঠতে পারছিল না লেখকের ব্যক্তিত্বের বাহন। তাই যতিচিহ্নও লেখকের ব্যক্তিত্বের ওতপ্রোত স্টাইলের অপরিহার্য উপকরণ হয়ে ওঠে নি।

উপস্থিত যতি

স্বর ও শ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করে, উচ্চারণের বৈচিত্র্যে, যতিচিহ্ন বাক্যের ভিতরে শব্দের সঙ্গে শব্দকে গেঁথে দেয়। আর, বাক্যের শেষে স্বর ও শ্বাসের বিরতি ঘটিয়ে যতিচিহ্ন বাক্যকে মুক্ত করে দেয়। পদ্যে আরো অনেক কায়দাকানুনের সুযোগ আছে। কিন্তু গদ্যে, যতির এই বিপরীত চালেই ছন্দ স্পন্দিত হয়ে ওঠে। সেই ছন্দ-স্পন্দন অর্থের সঙ্গে অন্বিত ও শব্দের অক্ষর-সমাবেশের হ্রস্বদীর্ঘতায় ওতপ্রোত। এটা গদ্যের স্বভাব। ব্যাকরণের দ্বারা সেই অন্বয় নির্দিষ্ট হয় না, নির্দিষ্ট হয় শ্রম আর উৎপাদনের জটিলতার সঙ্গে সামাজিক মানুষের অন্বয় সাধনের অভিজ্ঞতার নান্দনিক উত্তরণ দিয়ে। শব্দের উচ্চারণের বিশিষ্টতাও আসে না ব্যাকরণের নির্দেশে—আসে মানুষের জিভে-জিভে পৌরাণিক স্মৃতিঘন শব্দ-মালার উচ্চারণের বর্ণবাহারে। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির কর্কটমূল আমাদের গদ্যভাষার প্রথম পর্বের সমকালীন সামাজিক শ্রম আর উৎপাদনকে বিষাক্ত নিষ্ক্রিয় করে দেয়। তাই গদ্যে শব্দের নতুন অন্বয় আর উচ্চারণের নতুন ধ্বনি খুঁজতে সংবাদ-সাময়িকপত্রে জনসংযোগের সাপ্তাহিক-পাক্ষিক-মাসিক দায় ঘোচাতে আমাদের বাধ্যতই যেতে হয়, ইংরেজি গদ্যের কাছে, নয় তো সংস্কৃত ব্যাকরণের কাছে। আমাদের গদ্যভাষা তৈরি হল এমন এক ভাষার আদর্শে যা পরভাষা—স্থানগত কারণেই যার সঙ্গে আমাদের যোগ নেই, আর এমন এক ভাষার আশ্রয়ে যা মৃতভাষা—কালগত কারণেই যার সঙ্গে আমাদের যোগ নেই। সেই প্রাথমিকযুগে সংস্কৃতের আশ্রয়ে ইংরেজি আদর্শ অনুসরণের অন্তর্নিহিত সংঘাতের অনিবার্য পরিণামে, যতিচিহ্ন ব্যবহারের বিকল্প পথ হাতড়াবার প্রয়োজনে, বাংলা গদ্যকে, সংস্কৃত বাক্যের অবিচ্ছিন্নতার রীতির অনুকরণে বিবরণের ধারাবাহিকতা, ঘটনার চলমানতা, শব্দের গড়নের নিটোলতাকে নষ্ট করতে হয়েছে।

বাংলাদেশের সংস্কৃত পাণ্ডিত্যের প্রধান ভিত্তি স্মৃতিশাস্ত্র ও নব্যন্যায়। তাই সাময়িকপত্রে গদ্যের বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে যতিচিহ্ন ব্যবহারের মতো গদ্যরীতির অপরিহার্য উপকরণ বিকশিত হয়ে ওঠে নি। সংস্কৃত রীতিপ্রয়োগের দ্বারা সেই ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাটুকুও যেন অস্বীকৃত হতে চায়। বাংলাগদ্যের প্রাথমিক-পর্বের গড়নের ভিতরই যতিচিহ্নের বিকল্প সন্ধানের চেষ্টা সক্রিয় থাকায় বাংলায় সাময়িকপত্রের গদ্যে যতিচিহ্ন ব্যবহার বিলম্বিত হতে থাকে। তার প্রভাব সাময়িকপত্রের গদ্যরীতির ওপরও পড়ে। যতিচিহ্ন ব্যবহারের প্রয়োজন আছে, অথচ যতিচিহ্ন ব্যবহার না করে সেই প্রয়োজন নির্বাহের চেষ্টায় বাংলার সাময়িক-পত্রের গদ্যরীতি প্রাথমিকপর্বে, ১৮৩০ সাল নাগাদ, ক্রমেই সংস্কৃতনির্ভর হয়ে ওঠে। এই সংস্কৃতনির্ভরতার অন্যান্য কারণও আছে কিন্তু যতিচিহ্নের অভাব বাক্যের গড়ন দিয়ে মেটানোর চেষ্টাও তার একটি কারণ। প্রথমে দুটি উদাহরণ দিয়ে প্রবণতাটিকে ব্যাখ্যার চেষ্টা করা যায়।

৯. বঙ্গদূত। ১৩ জুন ১৮২৮

গৌড়দেশের শ্রীবৃদ্ধি ॥— গত কএক বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় ও গৌড়রাজ্যের সর্ব্বত্র অনেক ধনবৃদ্ধি হইয়াছে ইহার কোন সন্দেহ নাই **অতএব** কি কারণে বৃদ্ধি হয় তাহার অনুসন্ধান করা আমারদিগের **সুতরাং** আবশ্যক, **অতএব** লিখিতেছি এই দেশের পূর্ব্বাপেক্ষা যে এক্ষণে অবস্থান্তর হইয়াছে ইহার কারণ এই যে পূর্ব্বাপেক্ষা ভূম্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, দ্বিতীয়তঃ এদেশে অবাধে বাণিজ্য ব্যবসায় চলিতেছে, বিশেষতঃ অনেক য়োরোপীয় মহাশয়েরদিগের সমাগম হইয়াছে, **অতএব** এই ত্রিবিধ কারণকে দৃঢ়ীভূত করণার্থে নানাপ্রকার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে **কিন্তু যেহেতুক** ঐ সকল কারণ সহজেই প্রত্যক্ষ **অতএব** তাহার ভূমিকার অপেক্ষা নাই **যেহেতুক** প্রত্যক্ষে কিং প্রমাণং। পূর্ব্ব ত্রিশ বৎসর যে সকল ভূমি ১৫ পোনের টাকা মূল্যে ক্রীতা হইয়াছিল এক্ষণে ৩০০ তিনশত টাকা পর্য্যন্ত তাহার মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে এবং এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দৃষ্ট, এমতে ভূম্যাদির মূল্যবৃদ্ধির দ্বারা সম্পদ হওয়াতে জনপদের পদবৃদ্ধি হইয়াছে যে সকল লোক পূর্ব্বে কোন পদেই গণ্য ছিল না এক্ষণে তাহারা উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট উভয়ের মধ্যে বিশিষ্টরূপে খ্যাত হইয়াছে এবং দিন দিন দীনের দীর্ঘতা হ্রস্বতাকে পাইয়া তাহারদিগের বাস্তব দিন প্রকাশ পাইতেছে।

[স. সে. ক. ১। ৩৫২]

প্রথম দাঁড়ির দ্বারা প্যারাটি যে-দুটি ভাগে বিভক্ত হয়েছে তার প্রত্যেকটি

ভাগকে যদি বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে প্রথমাংশে একটি বাক্য থেকে আর-একটি বাক্য যাতে বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়ে, বাক্যগুলি যাতে অত্যন্ত দৃঢ় বন্ধনে বাঁধা থাকে ও গদ্যের ন্যায় (logic) যাতে অত্যন্ত প্রকট থাকে সেই কারণে লেখক ৪ বার 'অতএব', ২ বার 'যেহেতুক', ১ বার 'সুতরাং' ও ১ বার 'কিন্তু' ব্যবহার করেছেন—ব্যাকরণের দিক দিয়ে 'সুতরাং'-টি একেবারেই না চললেও। আধুনিক পাঠে এই সংযোজক পদগুলির জায়গায় শুধু যতিচিহ্নই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অভিপ্রেত। যদি এই সংযোজকপদ না থাকত তাহলে বলা যেত যতিচিহ্নগুলি ব্যবহৃত না হলেও নিহিত আছে। কিন্তু যতিচিহ্নের বদলে সংযোজক পদ ব্যবহারের ফলে বাক্যটি একটা তথাকথিত নৈয়ায়িক গড়ন নিল। হেত্বর্থক সংযোজক পদ দিয়ে বাক্যশৃঙ্খলা রক্ষা করার এই রীতি এসেছে বাঙলা-দেশের স্মৃতিশাস্ত্রীয় নব্যনৈয়ায়িক ধারার অনুসরণে।

১০. সমাচার দর্পণ। ১৪ ডিসেম্বর ১৮৩৩

মহামহিমবর শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু। আমরা কএকজন বঙ্গদেশীয় এক বিষয়ে অপমান ও আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া আপনাকে জানাইতেছি **যে** হিন্দুস্থানে বাঙ্গালিদিগের প্রধান কর্ম্মাদি প্রাপণে তদ্দেশস্থ লোকে কহে **যে** পূর্ব্বেকার বোর্ডের সাহেবদিগের নিষেধ আছে **এবং** উক্ত কথাও সত্য বোধ হইতেছে **কেননা** সাহেবলোক প্রায় বাঙ্গালিদিগকে প্রধান কর্ম্ম দেন না [।] যাঁহারদিগের দেওনে ইচ্ছাও আছে তিনিও সক্ষম হন না **কারণ** আপন আপন এলাকার কমিস্যনর সাহেব মঞ্জুর করেন না **কিন্তু** শত২ হিন্দুস্থানি লোক বাঙ্গালা ভাষায় **ও** অক্ষরে অনভিজ্ঞ থাকাতেও অস্মদ্দেশে নানাস্থানে প্রধান২ কর্ম্ম করিতেছেন [।] বাঙ্গালিগণের কি দুর্ভাগ্য **যখন** ১৮৩১ সালের কানুন পঞ্চম জারী হয় **তখন** বোধ হইয়াছিল **যে** অনেক বাঙ্গালি সদরঃ সদূর হইবেক তাহাও হইল না এবং ইঙ্গরেজীতে পারগ **যে** বাঙ্গালি কোন সরকারী আপীসে কর্ম্ম খালি হইলে তচ্চেষ্টা করিলে **যদিস্যাৎ** তৎসময়ে কোন অক্ষম ফিরিঙ্গি উপস্থিত হয় তবে ঐ খ্রীষ্টীয়ান ফিরিঙ্গিতে কর্ম্ম পায় **যাহা হউক** রাজা ও ঈশ্বর প্রায় তুল্য এবং সর্ব্বজীবে সমভাব তবে হিন্দুস্থানে আমারদিগকে কি কারণে' এমত অসহিষ্ণু অপমান করেন **যদি** বলেন যে গবর্ণমেণ্ট এমত হুকুম কদাচ দেন নাই **তবে** অকারণে আমারদিগের প্রতি এমত অন্যায় আচরণ কেন হয় [।] **যত্তপি** কহেন যে পূর্ব্বকার বোর্ডের সাহেবেরা হুকুম দিয়া গিয়াছেন, সেই হুকুমানুসারে উচ্চপদস্থ সাহেবলোক বাঙ্গালিদিগকে প্রধান কর্ম্ম দেন না,

উত্তর, উক্ত ঐ বোর্ডের সাহেবলোকের সমীপে **যদি** কোন বাঙ্গালি কুকর্ম্ম করিয়া থাকে **কিম্বা** তৎকালীন পারস্যভাষাতে অপারগ জানিয়া **অথবা** অন্যকারণবশতঃ হুকুম দিয়া থাকেন এ হালতে এক ব্যক্তি কি তদধিক ব্যক্তিদিগের অপরাধে দেশের তাবৎলোক দোষী হইতে পারে না [।] ইহা হইলে কোন জাতীয় লোক ব্রিটিস গভর্ণমেণ্টের কর্ম্ম পাইতে পারেন না [।] আপনি কৃপাবলোকন-পূর্ব্বক এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিয়া গভর্ণমেণ্টের অনুমত্যনুসারে সর্ব্ব-সাধারণ গেজেটে অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট গেজেট ও ইণ্ডিয়া [গেজেট] হরকরা প্রভৃতি সংবাদপত্রে ছাপাইয়া দেন **যে** হিন্দুস্থানে বাঙ্গালি কি অন্যান্য জাতির কোন কর্ম্ম পাইতে নিষেধ নাই [।] ইহা হইলে আমরা সর্বেতোভাবে আপনার নিকট পরমোপকৃত আছি **ও** হই এবং বাঙ্গালিগণ **যে** এ বিষয়ে আত্যন্তিক ম্লান আছেন তাহাও আপনার দয়াপ্রকাশে প্রফুল্ল হন নিবেদন ইতি সন ১২৪০ সাল তারিখ ২৫ অগ্রহায়ণ। শ্রীকমলপ্রসাদ রায়। শ্রীহরিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। শ্রীচন্দ্রকান্ত চট্টোপাধ্যায়। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মোং কলিকাতা।

[স. সে. ক. ২ । ৩৩০]

সরকারি বড় চাকরিতে বাঙালিদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁরা চিঠি লিখছেন, ধরেই নিতে হয় তাঁরা শিক্ষাদীক্ষায় সমাজে বেশ অগ্রসর ও প্রতিষ্ঠিত। এ চিঠিটিকে সংবাদ-সাময়িকপত্রের গদ্যের উদাহরণ হিশেবে যেমন, তেমনি তখনকার বাঙালি শিক্ষিতদের একটা অংশের গদ্যচর্চার নমুনা হিশেবেও গ্রহণ করা যেত কিন্তু চিঠিটির একেবারে শেষে 'পরমোপকৃত আছি ও হই', 'আত্যন্তিক ম্লান আছেন', 'আপনার দয়াপ্রকাশে প্রফুল্ল হন'—এই অংশগুলি দেখে অনুমান হয় চিঠিটি ইংরেজিতে লেখা হয়েছিল, এটি তার বাংলা অনুবাদ।

এত বড় একটি চিঠিতে দাঁড়িচিহ্ন একবারও ব্যবহৃত হয় নি—একমাত্র চিঠিটির শেষে ছাড়া। যে, যখন, যাহারদিগের ইত্যাদি সাপেক্ষ সর্বনাম বা কেননা, কারণ, ইত্যাদি হেতুবাচক শব্দ ও যদি, তবে, ইত্যাদি অব্যয় প্রয়োগে (২২ বার) তাই বাক্যগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে নৈয়ায়িক শৃঙ্খলে বাঁধা হয়েছে। এই শব্দগুলি নিহিতযতিকে যেমন বাতিল করে, তেমনি, স্পষ্টযতি ব্যবহারের অবকাশও বন্ধ করে। মাত্র ৪টি জায়গা এমন আছে যেখানে উপহিতযতি ব্যবহৃত হয় নি, নিহিতযতির সুযোগ আছে, কিন্তু সে-সুযোগও বাক্যের গড়নের জন্য স্পষ্ট হতে পারে নি। তার ভিতর শেষ দুটি জায়গা 'ইহা হইলে' এই শর্তসমন্বিত বাক্যাংশ ব্যবহারের ফলে পরবর্তী বাক্যের সঙ্গে গ্রথিত হয়ে যায়। প্রথম

জায়গাটিতে 'কেননা সাহেব লোক প্রায় বাঙ্গালিদিগেকে প্রধান কর্ম্ম দেন না' এরপর লেখা হচ্ছে, 'যাঁহারদিগের দেওনে ইচ্ছাও আছে তিনিও সক্ষম হন না'। ফলে এই বাক্যাংশটিকেও পূর্ববর্তী বাক্যের 'কেননা'-র সঙ্গে অন্বিত করা যায়। সুতরাং বাক্যগঠনের বিচারে এই রচনাটিতে একমাত্র দ্বিতীয় জায়গাটিতে 'বাঙ্গালিগণের কি দুর্ভাগ্য' এই বিস্ময়বাক্যের আগে দাঁড়ি দেয়ার যথাযথ অবকাশ আছে। কিন্তু এই দাঁড়ি ব্যবহারের পেছনে একটি বাক্যের ও প্রসঙ্গের অবসান যতটা সক্রিয় হতে পারে তার চাইতে অনেক বেশি সক্রিয় পরবর্তী বাক্যের 'বাঙ্গালিগণের কি দুর্ভাগ্য' গঠনের এই নতুনত্ব। অথচ বাক্য গঠনের এই আলংকারিক ভঙ্গি সম্পর্কে এই আংশিক সচেতনতা যতিব্যবহারে বা অন্যান্য বাক্যগঠনে লক্ষ করা যায় না। তবে, এই উদাহরণে আরো ৪।৫টি জায়গায় সংযোজক পদ সত্ত্বেও দাঁড়ি বা অন্য চিহ্ন দেয়া যায়। তা হলে, সংযোজক পদ অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

সামাজিক বিষয়ই যেহেতু সংবাদ-সাময়িকপত্রের গদ্যচর্চার প্রধান অবলম্বন ছিল, তাই, গদ্যচর্চার শাস্ত্রীয় আদর্শের সঙ্গে-সঙ্গে সামাজিক বিষয়ের চাপও গদ্যচর্চাকে নিয়ন্ত্রিত করছিল। ফলে, গদ্যের গড়নেও এই দুই দিকে থেকে দুই ধরনের প্রভাব পড়ছিল। যেমন সংস্কৃত রচনারীতির অনুসরণে যতিচিহ্নকেই অপ্রয়োজনীয় করে দেয়া হচ্ছিল, তেমনি আবার কোনো কোনো সামাজিক বিষয়ের সঙ্গে লেখকের এক ধরনের ঐক্যস্থাপনের চেষ্টাও চলছিল। সেই চেষ্টার ফলে দেখা যায় সংযোজক পদ দ্বারা বাক্যের সঙ্গে বাক্যের বন্ধন ঘটানোর সঙ্গে-সঙ্গে আবার লেখকের বক্তব্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিষয়কে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গে ভাগ করার চেষ্টা চলে। এমন-কি একটি প্রসঙ্গের ভিতরও যুক্তিপরম্পরার শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলে।

যতিচিহ্ন ব্যবহারের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য এই প্রসঙ্গ ও অনুপ্রসঙ্গ নির্দেশ। রচনার প্যারাভাগ বা দাঁড়িচিহ্ন দিয়ে বোঝা যায় লেখক কী ভাবে তাঁর বিষয়ের প্রসঙ্গ ও অনুপ্রসঙ্গকে নির্দিষ্ট করতে চান। এই ভাগ, বিষয়উত্থাপন সম্পর্কে, লেখকের শৈলী সচেতনতার ফল যেমন হতে পারে, বিষয়ের সামাজিক তাৎপর্যের সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিত্বের যোগবিয়োগের ফলও তেমনি হতে পারে।

১৮৩০-এর দশকে যখন সমাজ সংস্কারের নানা বিষয় নিয়ে বাঙালি সমাজ নানা মতগোষ্ঠীতে স্পষ্ট বিভক্ত ও ইংরেজি শিক্ষিত যুবকরা সরকারি কর্মপ্রার্থী—তখনই সংস্কৃতব্যাকরণসম্মত গদ্যরচনারীতি অনুসরণের সঙ্গে-সঙ্গে আবার গদ্যের যুক্তি-

পরম্পরাপ্রতিষ্ঠার চেষ্টাও চলে। এই দুই চেষ্টার ভিতর বিরোধিতা ছিল। যতিচিহ্ন না দেয়া আর প্রসঙ্গ ও যুক্তিপরম্পরানির্দেশের ভিতর এই বিরোধিতা গদ্যশৈলীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। হিন্দু সমাজের কৌলীন্য প্রথা, ইংরেজি শিক্ষিতদের জন্য সরকারি চাকরি ও খ্রীস্টান আর হিন্দুধর্ম—এই তিনটি সামাজিক বিষয় সংক্রান্ত তিনটি বিশিষ্ট রচনার উদাহরণ বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

১১. সমাচার দর্পণ। ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১

···কুলীন মহাশয়দিগের দৌরাত্ম্যপ্রযুক্ত যোত্রহীন শ্রোত্রিয় **অথবা** বংশজ ব্রাহ্মণদিগের বিবাহ হওয়া অতি দুঃসাধ্য হইয়াছে **যেহেতুক** অর্থ্যব্যয় ভিন্ন তৎকর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া উঠে না **সুতরাং** যাঁহারা যোত্রহীন তাঁহারদিগের বিবাহ হওয়া ভার [।] কতশত যোত্রহীন শ্রোত্রিয় **এবং** বংশজ ব্রাহ্মণ বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকিয়া পঞ্চত্ব পাইয়াছেন **এবং** এইক্ষণেও অনেকে ৩০।৪০।৫০ **বা** ততোধিক বৎসর বয়স্ক হইয়া অবিবাহ রূপে শোকে জরজর খরখর **এবং** মরমর হইয়া রহিয়াছেন তাঁহারদিগের এ কাটামোতে আইবুড় নাম ঘুচে কিনা বলা যায় না। ··উক্ত কুলীন প্রাধান্য এতদ্দেশীয়দিগের নির্দ্ধন হওনের এক বলবৎ কারণ **যদিস্যাৎ** তাঁহারদিগের ধননাশের প্রতি অন্যান্য২ কএক কারণ আছে **কিন্তু** তন্মধ্যে ইহা **যে** এক প্রধান কারণ ইহা অবশ্য বলিতে হইবেক **বিশেষতঃ যাঁহারদিগের** কুলমর্য্যাদা আছে তাঁহারা **বা** তাঁহারদিগের সন্তানেরা অন্যান্য ব্রাহ্মণের ন্যায় বিদ্যাভ্যাস করণে উৎসাহান্বিত হন না **কারণ** তাঁহারা জানেন **যে** কোন শ্রোত্রিয় **বা** বংশজ ব্রাহ্মণেরা নানাগুণে গুণবান হইলেও জাত্যংশ বিষয়ে তাঁহারদিগের তুল্য মান্য কদাচ হইতে পারিবেন না **অর্থাৎ** উক্ত ব্যক্তিরা অর্থব্যয় ব্যতিরেকে বিবাহ করিতে সমর্থ হইতে পারিবে না **এবং** আপন২ দারাদি পরিবারের ভরণপোষণের ভার হইতেও তাঁহারদিগের ন্যায় মুক্তহস্ত হইতে পারিবেন না। **যদিস্যাৎ** কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে **বা** তাঁহারদিগের সন্তানদিগের মধ্যে কেহ২ এইক্ষণে কিঞ্চিৎ২ বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন **বা** করিতেছেন কিন্তু তাঁহারদিগের সেরূপ বিদ্যাভ্যাসে দেশের কুশল নাই **যেহেতুক** তাঁহারা কায়স্থ হইলে আপন২ পৈতৃক কুলমর্য্যাদাকে এক লভ্যজনক ব্যাপার জ্ঞান করিয়া তাহার রক্ষার্থে পৈতৃক ধারাবাহী হইয়া অহঙ্কৃত হয়েন **এবং** অহঙ্কারের **যে** দোষ তাহা বিজ্ঞ মহাশয়দিগের অগোচর কি আছে যাহাহউক নবগুণ বিশিষ্টত্ব কুলীন **অর্থাৎ** আচারো বিনয়োবিদ্যা **ইত্যাদি** নয়গুণ কৌলীন্যের প্রসিদ্ধ লক্ষণ **কিন্তু** এইক্ষণে **যে২** মহাশয়দিগকে কুলীন

বলিয়া মান্য করা যায় তন্মধ্যে অনেকে উক্ত নবগুণবৰ্জ্জিত বরং তাঁহারদিগকে নির্গুণচূড়ামণি বলা যাইতে পারে [।] কোন২ স্থানে এমত ঘটিয়াছে যে কোন২ কুলীন জামাতা আপন২ শ্বশুর প্রভৃতির প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া রাত্রিমানে রাগভরে আপন২ পত্নীর সহশয়নে থাকিয়া সূর্য্যোদয়ের প্রাক্‌কালে আপন নিদ্রিত পত্নীর গাত্রের সমস্ত স্বর্ণ রৌপ্যাদির আভরণ এবং পরিধেয় বস্ত্র অতি সাবধান পূৰ্ব্বক খুলিয়া লইয়া পলায়ন করিয়াছেন এবং আরো শুনা এবং দেখা গিয়াছে যে কোন২ কুলীন মহাশয়েরা রাগচ্ছলে আপন শ্বশুরের বাটী হইতে স্ব২ পত্নীকে আপন২ গৃহে আনয়নপূৰ্ব্বক ঐ২ কন্যার পিতৃদত্ত স্বর্ণাভরণাদি সমস্ত কাড়িয়া লইয়া তাহা বিক্রয় করিয়া আপনাবা মজা মারিয়াছেন এবং উক্ত কন্যারদিগকে নানামতে ক্লেশ দিয়াছেন [।] পরে ঐ অভাগা কন্যারদিগের পিতৃ মাতৃ অথবা ভ্রাতৃ প্রভৃতিরা ঐ কন্যার ধড়ে প্রাণ থাকিতে২ তত্বৎ-সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া উপযুক্ত সময়ে উক্ত কুলীন মহাশয়দিগকে অর্থ দান দ্বারা এবং নানাস্তব বিনয়দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া চিকিৎসাদি দ্বারা উক্ত কন্যারদিগের প্রাণরক্ষা করিয়াছেন কিন্তু যে স্থলে উপযুক্ত সময়ে উক্ত কুলীন পাত্রস্থা কন্যাসন্তান-দিগের তত্বাবধারণ তত্তৎ পিতৃ ব। ভ্রাতৃপ্রভৃতিদ্বারা না হয় সে স্থলে ঐ অভাগা কন্যাসন্তানাদির জীবনাবসানহওনের প্রতি কোন সন্দেহ থাকে না যেহেতুক কুলীন মহাশয়েরা আপন২ স্ত্রী-পুত্রদিগের প্রতিপালন করাকে এমত কুকৰ্ম্ম জানেন যে তাঁহারদিগের পীড়িতাবস্থাতেও তাঁহারদিণের চিকিৎসা বিষয়ে কোন চেষ্টা করেন না এবং এতদ্রূপ চেষ্টাকে আপন২ কৌলীন্যের হানিকারক জানেন · ।

[স. সে. ক. ২ । ২৪৩-৪৫]

মূল রচনার দুটি জায়গা বাদ দিয়ে অংশটি উদ্ধৃত হয়েছে। সেই অনুদ্ধৃত দুটি জায়গার দুটি দাঁড়িকে হিশেবে নিলে দীর্ঘ রচনাটিতে দাঁড়ি ব্যবহৃত হয়েছে মাত্র ৫ বার—তার ভিতর ১ বার রচনার শেষে। উদ্ধৃতিটির আভ্যন্তরীণ দাঁড়ি দেয়ার জায়গা দুটো বিচার করলে দেখা যায় এক-একটি প্রসঙ্গের শেষেই দাঁড়িটি ব্যবহৃত হচ্ছে। অর্থাৎ দাঁড়ি দেওয়ার জায়গা বাছাইয়ের ভিতর একটা পদ্ধতি আছে—সেই প্রসঙ্গান্তর নির্দেশ যতই সংকীর্ণ হোক-না কেন। যে-সে, যে-তাহা, যাহারদিগের-তাহারদিগের, যেহেতুক-সেহেতুক ইত্যাদি সাপেক্ষ সর্বনাম ও সংযোজক অব্যয় ব্যবহার করে একটি বাক্যের সঙ্গে তার পরবর্তী বাক্যকে গ্রথিত রাখা হয়েছে। আধুনিক বিচারে তৎসত্ত্বেও হয়তো ক্রিয়াকে অনুসরণ করে দাঁড়ি-

চিহ্ন দেয়া চলে—কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যাবে সাপেক্ষ সর্বনামগুলি বাদ দিলে বাকি সংযোজক অব্যয় বা পদগুলির পরিবর্তে দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন বা ড্যাশ অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই ব্যবহৃত হতে পরে। সংযোজক পদ নেই, অথচ কোনো যতিচিহ্নও ব্যবহৃত হয় নি, এমন ফাঁকা জায়গা আছে মাত্র ৩টি। এই জায়গাগুলিতে আমরা একটি করে দাঁড়ি হয়তো বসাতে পারি, তাছাড়া কোথাও যতিব্যবহারের কোনো সুযোগই নেই। উদ্ধৃতিটিতে ব্যবহৃত ৩৫টির মতো সংযোজক পদের ভিতর ২৪টি ব্যবহৃত হয়েছে বাক্যের গ্রন্থনে, বাকি মাত্র ১১টি ব্যবহৃত হয়েছে দুটি শব্দের ভিতর।

১২. সমাচার চন্দ্রিকা। ২ মে ১৮৩১

হিন্দু হইয়া ইংরাজী বিদ্যায় বিদ্বান হইলে নাস্তিক হয় ইহা পূর্ব্বে জ্ঞাত ছিলাম না **কেননা** পূর্ব্বে যে সকল দেওয়ান মুৎসদ্দি লোক ছিলেন তাঁহারা ইংরাজী বিদ্যাভ্যাস করিয়া সাহেব লোকের অভিপ্রায় মত কর্ম্ম সুসম্পন্ন পূর্ব্বক বহুধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন [।] ইহাতে ইংরাজেরা তুষ্ট হইয়া তাঁহারদিগকে নানা প্রকারে মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছেন [।] **যদি বল** তখনকার মুৎসদ্দি মহাশয়রা ভাল ইংরাজী জানিতেন না **কেননা** কথিত আছে ঢেঁকি যন্ত্রের বিবরণ কোন মুৎসদ্দি ইংরাজী ভাষায় তরজমা করিয়াছিলেন টু মেন ধাপুড় ধুপুড় ওয়ান মেন সেকে দেয় ইত্যাদি ইহা হইতে পারে [।] ইংরাজেরদিগের প্রথমাধিকার সময়ে তদ্ভাষায় বহুতর লোক সুশিক্ষিত হইতে পারেন নাই **কিন্তু** ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক **যে** তাঁহারা ক্ষমতাপন্ন লোক ছিলেন **এবং** কর্ম্ম উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছেন।...

এক্ষণে যাহারা ভাল ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছে তাহারদিগের বিদ্যার কি এই ফল হইল কেবল নাস্তিকতা করিবেক ভাল **যদি** ঐ নাস্তিকের মধ্যে উক্ত ব্যক্তিদিগের মত কেহ পদপ্রাপ্ত হইতে পারিত **তথাচ** বুঝিতাম যে নাস্তিকতা করাতে সাহেব লোক তুষ্ট আছেন এই নিমিত্ত করে [।] তাহা কোন মতেই নহে **কেননা** কর্ম্মকর্ত্তা সাহেব লোক বেল্লিক নাস্তিককে কখন উচ্চ পদে বা বিশ্বস্ত কর্ম্মে নিযুক্ত করেন না ইহা নিশ্চয় আছে **যেহেতু যে ব্যক্তি** আপন ধর্ম্মত্যাগ করিতে পারে তাহা হইতে কোন কুকর্ম্ম না হয় [।] সে অবশ্যই বিশ্বাসের অপাত্র ইহা কি তাঁহারা জানেন না **তৎ প্রমাণ যে** সকল বালক ভাল ইংরাজী জানে তাহারা কেহ কোন পাঠশালায় টিচর কেহ বা ১৬ টাকার কেরাণি কেহ বা অভিমানী ঘরে বসিয়া আছে কেবল পারিতোষিক

যে পুস্তকগুলিন পাইয়াছিল তাহাই পাঠ করে হিন্দুর দ্বারে অর্থাৎ কোন প্রধান লোকের নিকট যাইতে পারে না গেলেই নাস্তিকতা দোষের সমুচিত ফল পাইবেক সে ভয় আছে ঐ সকল অভাগারা ইহা কি কিছুমাত্র বিবেচনা করে না—

[স. সে. ক. ২ । ৬৭৬-৭৭]

অংশটিতে মাত্র ১টি জায়গায় দাঁড়ি দেয়া হয়েছে—সম্পূর্ণ রচনায় এই দাঁড়িতে প্যারাটি শেষ হয় নি. প্যারার মাঝখানে এই দাঁড়ি পড়েছে। রচনাটিতে মোট ৭টি প্যারা আছে। প্যারাভাগের মধ্যে একটি পদ্ধতি আছে। ১ম প্যারায় ইংরেজি শিক্ষিত অথচ আস্তিক হিন্দুদের তালিকা। ২য় প্যারায় ইংরেজি শিক্ষিত আধুনিক নাস্তিকদের অবস্থা (উদ্ধৃত)। ৩য় প্যারায় ইংরেজি শিক্ষা ও নাস্তিকতার ভিতর কোনো সম্পর্ক নেই এ-বিষয়ে মন্তব্য। ৪র্থ প্যারায় পাঠকদের উদ্দেশ্যে তিন লাইন। দু-লাইনের ৫ম প্যারায় সমাচারদর্পণ-সম্পাদকের মন্তব্য। ৬ষ্ঠ প্যারায় (৫ লাইন) তার উত্তর, ৭ম প্যারায় (৩ লাইন) শাস্ত্রোক্তি দিয়ে রচনা শেষ। কোনো কৃত্রিম ছাঁচে প্যারাভাগ না করে লেখক রচনার প্রসঙ্গান্তরকে যথাযথভাবে নির্দিষ্ট করেছেন।

রচনার সামগ্রিক প্রসঙ্গান্তর বাছাইয়ে লেখক এতটাই নির্দিষ্ট অথচ প্যারায় ভিতরের প্রসঙ্গান্তর তিনি নির্দেশ করেন না। নির্দেশ না করা সত্ত্বেও উদ্ধৃত অংশটিতে প্যারার ভিতরের প্রসঙ্গান্তর পাঠক সহজেই ধরতে পারেন। তার কারণ এই রচনার গদ্যভঙ্গিতে কোথাও কোথাও স্পষ্টভাবে, কোথাও অস্পষ্টভাবে কণ্ঠস্বরের অনুসরণ আছে—

১. যদি বল…তাহা হইতে পারে (১ম প্যারা)

২. তাহারদিগের বিদ্যার কি এই ফল হইল ভাল (২য় প্যারা)

৩. ঐ সকল অভাগারা ইহা কি কিছুমাত্র বিবেচনা করে না (২য় প্যারা)

গদ্যের স্টাইলে কণ্ঠস্বরের এই ভঙ্গি এত সহজেই আসছে, অথচ লেখক যে ১৪টি সংযোজক শব্দ সব মিলিয়ে ব্যবহার করেছেন তার ১৪টাই ব্যবহৃত হয়েছে বাক্যগুলিতে যুক্ত করার জন্য। এই সংযোজক পদগুলির ভিতর কোনো-কোনো শব্দ যদি ব্যবহার না করা যেত, তাহলে সেখানে নিহিতযতি কার্যকর হত। সে অবকাশ না রেখে লেখক সেখানে সংযোজক পদ ব্যবহার করেছেন। এই অংশটিতে সংযোজক পদ ও সাপেক্ষ সর্বনামের ব্যবহার ভিন্ন। তদুপরি কণ্ঠভঙ্গির অনুসরণ আছে। ফলে হয়তো এর আগের উদাহরণটির মতো এই উদাহরণটি

অতটা অনড় নয়, খানিকটা চলমানতা আছে। কিন্তু প্যারাভাগ ও কণ্ঠস্বর-অনুসরণের সাফল্য সত্ত্বেও বাক্যের অন্তর্গত যতিবিন্যাসের বেলায় সংস্কৃত নৈয়ায়িকতার শৃঙ্খলা লেখককে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হতে দেয় না।

১৩. সমাচার দর্পণ। ১৯ নভেম্বর ১৮৩১

প্রভাকরসম্পাদককর্ত্তৃক এতদ্দেশীয় লোকেরদের তাবদ্বিষয়ক সপ্তাহীয় রচনা।...শ্রীযুতবাবু **ও** ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্ত্তি মহাশয়ের চট্টগেঁয়ে **যে** অপহারক মেং বাবু কৃষ্ণা ফ্রিঙ্গি হিন্দুইউথ নামক একখানি ক্ষুদ্র দর্গার পুষ্য পুত্র প্রকাশ করিয়াছে **তাহাতে** পেটকো ফিরিঙ্গি কৃষ্ণা মুচি হিন্দুদিগের কি করিবেন [?] **যেহেতু** তাঁহার দক্ষিণহস্ত হনকোয়েরর পত্রেই বা এ পর্য্যন্ত কি করিলেন **যে** এক্ষণে ঐ বাচ্ছা পত্র আচ্ছা হইয়া হিন্দু ধর্ম্মের হানি করিবেক [।] ভাল২ [,] বন্দা জেনো [যেন] তাহার সাধ্যমতে কসুর করে না [,] কিন্তু আমারদিগের বোধ হইতেছে **যে** ঐ বাচ্ছাপত্র বন্দ বা পার অভিমতে সৃজন হয় নাই [।] এ হায়াহীন ড্রজো ভায়ার কর্ম্ম [।] **কেননা** ড্রজো ভায়া ইষ্টইণ্ডিয়ান **ও** ইনকোয়েরর পত্রদ্বারা কিছু করিতে না পারিয়া এক নেংটে ইঁদুর বাহাদুরকে প্রেরণ করিয়াছেন [,] যেমন মহীরাবণের বেটা অহিরাবণ [।] **কিন্তু** হে ফিরিঙ্গি সাহেব ড্রজো ভায়া [,] তুমি হাজার প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া দর্গার থামে তাল ঠুকিয়া দলবল সঙ্গে করে ধর্ম্মের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে এসো **কিন্তু** কালামেন বাঙ্গালিদিগের ফতে করিতে পারিবে না [।] **অতএব** হে ভায়া [,] সামাল২ [,] তোমার জাঁকজমকরূপ কুরৃতি টুপি কেড়ে নিয়ে ফুরৃতি ভেঙ্গে দিবে [,] যেহেতু এ দলেও প্রধান যোদ্ধা শ্রীযুত ভৈরবচন্দ চক্রবর্ত্তী।

[স. সে. ক. ২। ১৭৬]

দাঁড়ির সংখ্যা — ১ (রচনার শেষে)

সম্ভাব্য দাঁড়ির বা দাঁড়িতুল্য চিহ্নের সংখ্যা — ৬

[এর ভিতর মাত্র ২টি জায়গা সংযোজকহীন ফাঁকা জায়গা]

সংযোজক পদ — ১১

শব্দের মধ্যে সংযোজন — ×

বাক্যের মধ্যে সংযোজন — ৯

রচনারীতির দিক থেকে এই অংশটিতে নানা নতুন উপকরণ আছে। অংশটির ভিতর বহু জায়গায় শব্দের দেশী অপকর্ষণ ঘটানো বা ইচ্ছাকৃত অপকৃষ্ট ব্যবহার

করা হয়েছে—'চট্টগেঁয়ে', 'পেটকো', 'বাচ্ছা পত্র', 'বন্দা', 'স্বর', 'হায়া', 'ব্যাটা', 'নেংটে ইঁদুর', 'তাল ঠুকিয়া', 'ফতেবরা', 'ফুরতিভাঙ্গা'। কয়েকটি জায়গাতে কণ্ঠস্বরের অনুসরণ বাক্‌রীতিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে—'হিন্দুদিগের কি করিবেন', 'ভাল২ বন্দা জেনো [যেন]…', 'ড্রজো ভায়ার কর্ম্ম'। বিষয়ের সঙ্গে লেখক এমনি জড়িয়ে পড়েছেন যে এই কণ্ঠভঙ্গি ও শব্দের অপকর্ষ এসে গেছে, ঘটে গেছে এতটাই যে, শেষ দিকে লেখক চলিত ক্রিয়াপদ পর্যন্ত ব্যবহার করে ফেলেছেন—'এসো', 'কেড়ে নিয়ে'।

যতিচিহ্নহীন টানা গদ্যের সঙ্গে এই বৈশিষ্ট্যগুলি মিশতে পারে না বলে এই অংশটি পড়লে মানে বোঝা খুব কষ্টকর ঠেকে। মানে পরিষ্কার করার জন্য আধুনিক রীতিতে প্যারাটিকে যতিচিহ্নিত করলে দেখা যাবে, যে-৬টি জায়গায় পূর্ণযতির কোনো চিহ্ন ব্যবহার করা সম্ভব তার ভিতর মাত্র ২টি জায়গা (দ্বিতীয় ও তৃতীয় দাঁড়ি) ব্যতীত বাকি ৪টি জায়গাতেই যথাক্রমে 'যেহেতু', 'কেননা', 'কিন্তু', 'অতএব'—এই চারটি হেতুবাচকপদ ও সংযোজক অব্যয় ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ এই ৪টি জায়গাতে লেখক যতিচিহ্নের বিকল্প হিশেবে উপস্থিত-যতি ব্যবহার করেছেন। গদ্যের স্বাভাবিক যতিপ্রবণতাকে রুদ্ধ করার আর-একটি প্রমাণ উদ্ধৃত এই অংশে মোট ৯টি সংযোজক পদই ব্যবহৃত হয়েছে বাক্যের সঙ্গে বাক্যকে গেঁথে দেয়ার কাজে।

ফলে এই অংশটিতে সংস্কৃত রচনারীতির অবিচ্ছিন্ন বাক্য আর দেশী কণ্ঠক্ষেপের ভিতরে এক তীব্র শৈলীগত বিরোধিতা তৈরি হয়।

স্পষ্ট যতি

সংবাদ-সাময়িক পত্রের অনুসরণীয় ফর্ম আর সামাজিক বিষয় ও লেখকের ব্যক্তিত্বের যোগবিয়োগের এই বিরোধিতার বিপরীত মেরুতে আছে আইন-আদালত, সরকারি বিজ্ঞাপন-ইস্তাহার ও শিল্প-বাণিজ্য-অর্থনীতি সংক্রান্ত রচনা। বাংলাগদ্যের বিকাশের ঐতিহাসিক পরিবেশে ফর্ম আর ব্যক্তিত্বের বিরোধিতার সৃষ্টিশীল নিরসনের সম্ভাবনা ছিল না। আর সেই বিরোধিতার ফলে যতিস্থাপনের মত প্রয়োজনীয় উপাদান গদ্যের অপরিহার্য উপকরণ হিশেবে স্বীকৃত হতে পারে না। তেমনি সরকারি আইন-ইস্তাহার আর শিল্প-বাণিজ্য-অর্থনীতি সংক্রান্ত রচনায় গদ্যের সেই জন্মকালেই বাংলা গদ্য এমন নিরপেক্ষতা, পরোক্ষতা ও স্পষ্টতা লাভ করে, যা প্রায় বিস্ময়কর। নতুন ব্যাঙ্কব্যবস্থার শর্ত কণ্টকিত

নিয়মাবলি বা ভূমি ও ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত সরকারি কোনো নতুন আইন ধারা-উপধারাসহ বাংলায় অনূদিত বা লিখিত হয়েছে যতিচিহ্নিত বা যতিনিরপেক্ষ এমন স্পষ্টতায় যা এই বিষয়গুলির আধুনিক সংস্করণেও বিরল। বাংলা গদ্যে বিষয় ও লেখকের বিরোধ বা সংস্কৃতের আদর্শ আর ইংরেজি-ছাঁচের বিরোধ এই বিষয়ক রচনার ক্ষেত্রে প্রায় যেন কোনো প্রতিকূল প্রভাবই ফেলে নি। বরং আইনের শর্তসাপেক্ষতা অথচ প্রত্যক্ষতা আর স্পষ্টতার সঙ্গে বোধহয় সংস্কৃত নৈয়ায়িক আদর্শের কোথাও মিলই ছিল। আর লেখকের সঙ্গে এই সব বিষয়ের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতার ফলে এই সব রচনায় এক ধরনের সাংবাদিক নিরপেক্ষতার অবকাশ ছিল।

এই সমগ্রকাল জুড়েই (১৮১৮-১৮৫৮) আইন ও অর্থনীতি সংক্রান্ত রচনায় যতিচিহ্নের ব্যবহার ও গদ্যশৈলী অনেক বেশি সংহত। তার একটি কারণ যেমন এই বিষয়গুলির বিশেষ ধরনের নির্দিষ্টতা, তেমনি আর-একটি কারণ এই দুটি ব্যাপারের কোনোটিতেই বাঙালি সমাজের কোনো সক্রিয় ভূমিকা ছিল না, দুটি ব্যাপারই বাঙালি সমাজের কাছে এসেছে তথ্য হিশেবে। যে-গদ্যের প্রধান দায় শুধুই তথ্য বিবরণ দেয়া, সেই গদ্যের এক নিরপেক্ষ গড়ন থাকে। শিক্ষা ও সাহিত্যসহ সামাজিক যে-কোনো ব্যাপারে বাঙালি সমাজের ভূমিকা ছিল অনেক বেশি। প্রত্যক্ষ ভূমিকা লেখকের মাধ্যমে রচনায় যখনই প্রবেশ করে তখনই রচনার ভিতরে আবেগ, প্রাণের প্রবহমাণতা, কণ্ঠস্বরের অনুরণন সঞ্চারিত হয়। বাস্তবের সেই আবেগ, প্রবহমাণতা ও বাকৃস্পন্দ গদ্যকে নতুন গড়ন দেয়। বাংলাগদ্যের ক্ষেত্রে সংস্কৃত ও ইংরেজি আদর্শের দ্বন্দ্ব এবং সংস্কৃত পণ্ডিতদের হাতে বাংলা-গদ্যরচনার দায়িত্ব এমন এক কৃত্রিম গড়ন আগে থাকতেই তৈরি রাখে, যার সঙ্গে এই আবেগ, প্রবহমাণতা ও বাকৃস্পন্দনের বিরোধ ঘটে। এই বিরোধের ফলে কিছুতেই সংবাদসাময়িকপত্রের গদ্যে যতিচিহ্নের ব্যবহার নিয়মিত হতে পারে না। যতিচিহ্নের ব্যবহারে দীর্ঘ সময়ব্যাপী অনভ্যাস ও অস্বস্তির পেছনে এই বিরোধ যে কতটা সক্রিয় তার পরোক্ষ সাক্ষ্য—শিল্প-বাণিজ্য অর্থনীতি ও আইন-আদালত সম্পর্কিত রচনায় যতিবিন্যস্ত গদ্যের গড়নের দৃঢ়তায়: সংবাদসাময়িকপত্রের ব্যক্তিনিরপেক্ষ, সমাজনিরপেক্ষ, আবেগনিরপেক্ষ, নিঃস্পন্দ ও অনড় এই সব রচনায় যতিস্থাপন ও বাক্যগঠন ওতপ্রোত। যতি হয়ে ওঠে বাক্যের আবশ্যিক উপাদান, গদ্য স্থির, প্রসঙ্গ সুনির্দিষ্ট, যতিস্থাপনসহ গদ্যের

অন্যান্য উপাদানের ব্যবহার সঙ্গত—সবই একটু বেশি সঙ্গত, জীবনের চাইতেও একটু বেশি সম্পূর্ণ।

১৪. সমাচার দর্পণ। ৩ এপ্রিল ১৮১৯

শ্রীরামপুরের সঞ্চয়ার্থ ব্যাঙ্ক। ১ দফা। ১ মার্চ ১৮১৯ সালে সঞ্চিত টাকা নির্ভাবনাতে ন্যস্ত করিবার নিমিত্ত **যে** ব্যাঙ্ক শ্রীরামপুরে স্থির হইয়াছে তাহাতে কোন ব্যক্তি রবিবার ব্যতিরিক্ত সপ্তাহের কোনদিনে এক টাকা পর্য্যন্ত রাখিতে পারে **কিন্তু** এক টাকার ন্যূন **কিম্বা** ভাঙ্গা টাকা রাখা যাইবে না।

২ দফা। এই ব্যাঙ্কের মধ্যে **যত** টাকা ন্যস্ত হয় তাহার সুদ দেওয়া যাইবে। কোম্পানীর কাগজের ওপরে **যে** সুদ পাওয়া যায় তাহার কম সুদ দেওয়া যাইবে না। **এবং** শতকরা নয় টাকা হিসাবের বাড়া সুদ দেওয়া যাইবেক না **কিন্তু** বাজার ভাওতে সুদের কমি বেশী প্রযুক্ত গত বৎসরের টাকার সুদ **যে** ভাও দেওয়া যাইবেক তাহা প্রতিবৎসর ৩০ এফরেলে প্রকাশ হইবেক।

৩ দফা। টাকা ন্যস্ত করিবার সময়ে কোন ব্যক্তি হইতে পৃমিয়ম কিছু লওয়া যাইবেক না **এবং যে** ব্যক্তি কোন মাসের ১৫ তারিখে কিম্বা তাহার পূর্ব্বে টাকা রাখে তাহার সুদ তাহার পর মাসের প্রথম তারিখ অবধি চলিবেক।

৪ দফা। **যে** টাকা এই ব্যাঙ্কে ন্যস্ত হয় সে টাকা কোম্পানির কাগজে রাখা যাইবেক **কিম্বা** বাঙ্গাল ব্যাঙ্কেতে কিম্বা অন্য২ কুঠীতে রাখা যাইবে। **যে** ব্যক্তিরা এই ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ আছেন তাহারা ব্যাঙ্কে ন্যস্ত প্রত্যেক টাকার দায়িক। **কিন্তু** এই ব্যাঙ্কের এই অলংঘনীয় ব্যবস্থা **যে** এই ব্যাঙ্কের ন্যস্ত টাকার মধ্যে এক টাকাও বাণিজ্যাদিতে নিয়োগ করা যাইবেক না।

৫ দফা। ইংগ্লণ্ড দেশে এই মত ব্যাঙ্কে **যে** বিষয় চেষ্টা এই ব্যাঙ্কেরো সেই বিষয় চেষ্টা **যে** হিসাব এই মত সহজ হয় **যে** অত্যল্প কালে ব্যাঙ্কের হিসাব আদি করা যায় এই নিমিত্ত এই ব্যাঙ্কে পূর্ণমাস ব্যতিরেকে ভাঙ্গা মাসের সুদ দেওয়া যাইবে না **এবং** বৎসরান্তে হিসাবের সময়ে আনা ও পাইর সুদ দেওয়া যাইবে না। **এবং** সুদ কষিলে পাই ধরা যাইবে না।

[স. সে. ক. ১। ১৪৬-৪৭]

দাঁড়ির সংখ্যা—৫-বার দফার ক্রমিক নম্বরে ও ৫-বার এক-একটি দফার শেষে। ৫-বার প্যারার ভিতরে ব্যাক্যের মধ্যে।

সম্ভাব্য দাঁড়ির সংখ্যা— ×

সংযোজক পদ—২০ (প্রায় সবই বাক্যসংযোজক)

১৫. সমাচার দর্পণ। ৩ জানুয়ারি ১৮২৪

সঞ্চয় ভাণ্ডার।—সংপ্রতি শুনা গেল **যে** শহর কলিকাতার বড়বাজার নিবাসি শ্রীযুত গদাধর সেট **ও** রূপনারায়ণ বসাক **ও** বিজয়কৃষ্ণ সেট **ও** ভুবনমোহন বসাক ইহারা ঐক্য হইয়া সঞ্চয় ভাণ্ডার নামক এক কর্ম্মারম্ভ করিয়াছেন [।] তাহার স্থূল বিবরণ এই। এই সঞ্চয় ভাণ্ডারের ৬৪ অংশ হইয়াছে [।] ঐ অংশের টাকার সুদ হইতে কোম্পানির লাটরির টিকিট ক্রয় হইবেক [।] তাহাতে **যে** প্রাইজ পাওয়া যাইবেক তাহা চৌষট্টি অংশে বিভাগ হইয়া তাবৎ অংশিরা পাইবেন [।] ইহার বিশেষ ঐ ভাণ্ডারের নিমিত্ত **যে** আয়িন প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলেই জানা যাইতে পারে।

ঐ আয়িন আমরা পাঠ করিয়াছি [।] তাহাতে ঐ সকল ব্যক্তিরদিগের **যে** প্রকার বুদ্ধির সৃষ্টি প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে কাহার টিকিট ক্রয় বিষয়ে ক্ষতি হইতে পারে না **এবং** ইহাতে ধনের বৃদ্ধি হইতে পারে। **অপর** অত্যল্প **অর্থাৎ** পঞ্চাশ টাকা প্রথম দিয়া তাহাতে অংশী হইতে হয় পরে প্রতিমাসে দশ টাকা এমত চারি বৎসর কালপর্য্যন্ত দিতে হইবেক [।] দেখ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার দশ টাকা দিতে কাহার কোন ক্লেশ বোধ হইবেক না **কিন্তু** লভ্য অধিকতর হওনের সম্ভাবনা আছে। না হইলেও আসলের ক্ষতি নাই **এবং** **যদি** আসল টাকা কেহ ফিরে চাহেন তাহাও তৎক্ষণাৎ পাইবেন **অতএব** এই সঞ্চয় ভাণ্ডার সৃজনকারি ব্যক্তিরদিগকে আমরা ধন্যবাদ করিলাম।

এক্ষণে মনে করি তাঁহারদিগের কৃত ঐ ভাণ্ডারের আয়িন লোকে দৃষ্টি করিলে অনেকে ঐ রীতিক্রমে অনেকপ্রকার নূতন২ কর্ম্ম আরম্ভ করিতে পারিবেন।

[স. সে. ক. ১। ১৫০]

দাঁড়ির সংখ্যা—৬

সম্ভাব্য দাঁড়ির সংখ্যা—৫

সংযোজক পদ—১৪ (শব্দের মধ্যে ৪, বাক্যের মধ্যে ১০)

১৬. সমাচার দর্পণ। ২২ জানুয়ারি ১৮২৫

অত্যাবশ্যক ইশ্‌তেহার।—৮ জানুয়ারি তারিখে শ্রীশ্রীযুত গবর্ণর জেনেরাল বহাদর বোর্ড রিবিনুর দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন **যে** ১৮১৯ শালের ২৮ মে

তারিখে কলিকাতার ভূমির রাজকর বিষয়ে শ্রীশ্রীযুতের **যে** আজ্ঞা প্রকাশ হইয়াছিল তাহা এক্ষণে রহিত হইল **এবং** তাহাব পরীবর্ত্তে তদ্বিষয়ে এক্ষণে এই আজ্ঞা প্রকাশ হইল।

যে কলিকাতানগরস্থ **যে** প্রজারা স্ব২ ভূমির নিরূপিত বার্ষিক রাজস্ব দিয়া থাকেন তাহারা সেই ভূমি এইরূপে কতক দিবসের কারণ নিষ্কর করিতে পারিবেন। **যিনি** সংপ্রতি একেবারে সাড়ে সাত বৎসরের রাজস্ব দিবেন তিনি দশবৎসর পর্য্যন্ত নিষ্করে তদ্ভূমি ভোগদখল করিবেন। **এতদ্রূপে** একেবারে সাড়ে দশ বৎসরের রাজস্ব দিলে পোনর বৎসর **ও** সাড়ে বার বৎসরের কর দিলে বিংশতি বৎসর **ও** চতুর্দ্দশ বৎসরের কর দিলে পঁচিশ বৎসর **ও** সাড়ে পোনর বৎসরের কর দিলে ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত নিষ্করে ভোগদখল করিতে পারিবেন। **যাহারা** পঞ্চাভগ্নাংশরূপে পাট্টা করিয়া জমী ভোগ করিতেছেন তাহারাও এইরূপে আপনারদের ভূমি নিষ্কর করিতে পারিবেক কিন্তু বিংশতি বৎসরের অধিক নয়। **যাহারা** এতদ্রূপে আপনারদের ভূমি নিষ্কর করিতে বাসনা করেন তাহারা বোর্ড-রিবিনুতে কিম্বা কলিকাতার কালেক্তরি দপ্তরে দরখাস্ত করিলে নিয়মানুসারে নূতন পাট্টা পাইতে পারিবেন।

[স. সে. ক. ১। ১৭৫]

দাঁড়ির সংখ্যা — ৬

সংযোজক পদ -- ১২ (বাক্য বা বাক্যাংশের মধ্যে)

১৭. সমাচার দর্পণ। ৪ জুলাই ১৮২৯

করস্থাপন।--কলিকাতা **এবং** তৎউত্তরোত্তরাঞ্চলহইতে জলপথে তমলুক ক্ষীরপাই ঘাটাল রাধানগর এবং মেদিনীপুরপ্রভৃতি স্থানসকলে যাইতে হইলে উলুবেড়িয়ার বাসপাতির খাল **অথবা** তেমোয়ানিপ্রভৃতি দুর্গম স্থান হইয়া যাইতে হইত **কিন্তু** বাসপাতির খালে বর্ষা ভিন্ন অন্য কএক মাস বারির সমূহ অপ্রতুল হইত **সুতরাং** অগ্রহায়ণাবধি প্রায় আষাঢ়পর্য্যন্ত দ্বিতীয় পথ হইয়া যাইবার ঘটনা হইত **কিন্তু** তৎঘটনায় লোকসকলে অত্যন্ত ভীত হইতেন **যেহেতুক** তাহাতে বিষম সাহসাঅপেক্ষা করে **তদ্ভিন্ন** বিলম্বেরও সম্ভাবনা [।] এই সকল অনুসারে নিবারণকরণে শ্রীলশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর উলুবেড়ে-হইতে মহেশডাঙ্গাপর্য্যন্ত এক খাল খনন করিয়াছেন [।] প্রায় বৎসরাবধি নৌকাদি তাহাতে গমনাগমন করিতেছে [।] সংপ্রতি রাজকর্ম্ম সম্পাদককর্ত্তৃক এই নিয়ম স্থাপন হইয়াছে **যে** সেই খাল হইয়া নৌকাদি গমনাগমন করিলে

নৌকাতে দাঁড় থাকিবেক প্রত্যেক দণ্ডে দুই আনা পরিমাণে কর লইবেন [।] এই কর্ম্মনির্ব্বাহ জন্য তথায় কএকজন আমলা নিযুক্ত হইয়াছে এবং পূর্ব্বোক্ত নিয়মে করগ্রহণ করিতেছে। (বাঙ্গালা সমাচারপত্র হইতে নীত।)

[স. সে. ক. ১। ৩০৩]

দাঁড়ির সংখ্যা — ১

সম্ভাব্য দাঁড়ির সংখ্যা — ৪

সংযোজক পদ — ৮ (শব্দের মধ্যে ২, বাক্যের মধ্যে ৬)

১৮১৯, ১৮২৪, ১৮২৫ ও ১৮২৯-এর এই চারটি উদাহরণের ভিতর স্টাইলের যে ঐক্য দেখা যায়, সেই ঐক্য বস্তুত এই বিষয়ক সংবাদ-মন্তব্য ও নিবন্ধে বরাবরই উপস্থিত। ১৮১৯ এর দীর্ঘ বিজ্ঞাপনে ও ১৮২৫ সালের 'ইশ্‌তেহার'-টিতে দাঁড়ি এত যথাযথ ব্যবহার করা হয়েছে যে নতুন কোনো দাঁড়ি দেয়ার জায়গা নেই অথচ যথাক্রমে ১৯ ও ১৬টি সংযোজক পদের সবগুলিই ব্যবহৃত হয়েছে বাক্যের সঙ্গে বাক্যকে গ্রথিত করার কাজে। কিন্তু এই সংযোজক পদগুলি কখনোই উপহিতযতি হিশেবে ব্যবহৃত হয় নি, আইনের শর্তের টানে যে-বাক্যগুলি পরস্পরের সন্নিহিত হয়েছে তারা সেই বাক্যগুলির ভিতর প্রয়োজনীয় সংযোজন ঘটিয়েছে মাত্র। ১৮২৪ ও ১৮২৯ সালের উদাহরণ দুইটিতে আজকের অভ্যাসে যথাক্রমে ৬ ও ৪ জায়গায় নূতন করে দাঁড়ি দেয়া যায় বটে কিন্তু সেই জায়গাগুলিতে যতিচিহ্নের অবকাশ বাক্যগঠনের ভিতরই রয়ে গেছে। এই দুটি উদাহরণেও বাক্যের ভিতরে যথাক্রমে ১০ ও ৭ বার সংযোজক পদ ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও তা বাক্যের প্রবহমাণতাকে ক্ষতিগ্রস্ত ত করেই না, বরং, সরকারি আইনটিকে দৃঢ় নির্দিষ্টতা দেয়।

ত্রিশের দশকের শুরু থেকে হিন্দু কলেজে শিক্ষিত বাঙালি যুবকদের একটি প্রধান অংশ বাঙালি সমাজে সবচেয়ে প্রগতিশীল চিন্তা ও কর্মের প্রতিনিধিগোষ্ঠী হিশেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। ইয়ং বেঙ্গল দল ইংরেজিচর্চা ফেলে আধুনিক ভাষা সম্পর্কে একটা সচেতনতা অর্জন করেছিলেন। তার সঙ্গে ছিল গণতান্ত্রিক ইয়োরোপের সামাজিক জীবন সম্পর্কে সশ্রদ্ধ আগ্রহ। এই দুইয়ের মিলিত প্রয়োগক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল তাঁদের দলের বা মতের সংবাদ-সাময়িকপত্র। ফলে, বাঙালি সমাজের এলিটদের একটি বিশেষ অংশ একটি নির্দিষ্ট জীবনাদর্শের ভিত্তিতে সংঘবদ্ধভাবে সংবাদসাময়িকপত্রকে তাঁদের গোষ্ঠীর মুখপত্র হিশেবে

প্রকাশ করলেন। এই ধারাতেই পরবর্তীকালে রামমোহন অনুগামীরা তাঁদের মতগোষ্ঠীর মুখপত্র হিশেবে সংবাদসাময়িকপত্র প্রকাশ শুরু করেন।

এরই ফলে গদ্যচর্চায় বিষয় ও লেখকের অন্বয় ও লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির নির্দিষ্টতার প্রবণতা দেখা দিল। গদ্য যখন লেখকের আবেগ ও মননের প্রতিফলন হয়ে উঠতে চায় তখন গদ্যের ভিতর লেখকের ব্যক্তিত্বের সংক্রমণ ঘটে। সেই সংক্রমণের ফলে গদ্যের এক-একটা বিশিষ্ট বাচন ও স্টাইল তৈরি হয় যা বক্তব্য ও উপস্থাপনের ভিতর একটা সংগতি সৃষ্টি করে।

তাই, ত্রিশের দশকে যখন সংস্কৃত বাক্যরীতির অনুসরণে উপহিতযতি ব্যবহার করে বাক্যগঠনের প্রবণতা দেখা দিয়েছিল, তার পরই সংযোজক পদ ও যতিচিহ্নের সঙ্গতি সাধনের চেষ্টাও লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। ঠিক কালানুক্রম অনুসরণ করে না হলেও, ত্রিশের দশকের শেষদিক নাগাদ সংবাদসাময়িকপত্রের গদ্যের দাঁড়ি ব্যবহার সম্পর্কে একটা সর্তকতা ও সচেতনতা দেখা যায়। এই সব রচনায় দাঁড়ি ব্যবহারের একটা যুক্তি ও পদ্ধতি আছে—এই যুক্তি ও পদ্ধতি বিষয়ের প্রসঙ্গভাগ, অনুপ্রসঙ্গ নির্দেশ ও প্রসঙ্গান্তরের ওতপ্রোত।

১৮. সমাচার দর্পণ। ২৫ নভেম্বর ১৮৩৭

শ্রীযুত দর্পণ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু। —প্রিয় সম্পাদক মফঃসল সম্পর্কীয় পোলিসের কার্য্য শোধনার্থ সংপ্রতি গবর্ণমেণ্ট লোক নিযুক্ত করিয়াছেন [,] আমি এ বিষয় শ্রবণে পরমাহ্লাদিত হইলাম। বহুকালাবধি আমার প্রার্থনা ছিল মফঃসলের পোলীসের প্রতারণা জালে বদ্ধ হইয়া দীনদরিদ্র প্রজারা যে সমূহ কষ্ট পাইতেছেন গবর্ণমেণ্ট কৃপাবলোকনপূর্ব্বক তাহা নিবারণ করেন [-] সেই আশা এখন সফল হইবে। আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছি মফঃসলের পোলিসের লোকেরা অর্থ লোভে না পারে এমত অপকর্ম্মই নাই [।] বিশেষতঃ বর্দ্ধমানে আসিয়া পোলীসের হস্তে স্বয়ং ঠেকিয়া আরো শিক্ষা পাইলাম। সম্পাদক মহাশয়, [,] বর্দ্ধমানের স্বর্গীয় মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের কনিষ্ঠা স্ত্রী শ্রীমতী মহারাণী বসন্তকুমারী ফৌজদারী সম্পর্কীয় বিচার প্রাপণার্থ আমাকে মুক্তিয়ার করিয়াছেন। অতএব আমি বর্দ্ধমানে থাকিয়া তাঁহার কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছি [।] আপনি বুঝিতে পারেন পরান বাবু ও তাঁহার পরিবারেরা আমার বিপক্ষ সুতরাং তাঁহারদিগের ক্রোড়ের মধ্যে থাকিতে হইল। একারণ আপন সম্ভ্রম রক্ষার্থ বাসাতে কয়েক জন ব্রজবাসী রাখিয়াছি এবং শ্রীমতী মহারাণীও আমাকে তদপযুক্ত সম্ভ্রমেতেই রাখিয়াছেন [।] আমাকে এইরূপ

দেখিয়া বর্দ্ধমানের পোলীসের কোন আমলা লোভেতে উন্মত্ত হইয়া প্রথমত বরকন্দাজ দিয়া পাঠাইল 'আমি এক দিবস বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব' কিন্তু পোলীসের সে আমলার প্রতি আমার চিরকাল ঘৃণা আছে। অতএব আমি তাহাতে সম্মত হইলাম না [।] এইরূপ দুই তিন দিবস বলিয়া শেষে আমার নিকট এক পরাবনা পাঠাইল [।] তাহার অভিপ্রায় এই যে আমি ঐ পরাবনানুরূপ কার্য্য করিব না তবেই সে মিথ্যা এক মোকদ্দমার ভয় দেখাইয়া আমার স্থানে বিলক্ষণ হাত মারিবে।

ঐ আমলার পরবানাতে লেখে কলিকাতা হইতে যে-ব্যক্তি আসিয়া বাসা করিয়া রহিয়াছে এবং আপনাকে বাবু কহলাইতেছে তাহার নাম সাকিম জিলা এবং বাসাতে কত লোক থাকে আর কখন কোন লোক বাসাতে কি কারণে আইসে এবং ঐ বাবু কহলানেওয়ালা কি নিমিত্তে আসিয়াছে এই সকল অবিলম্বে লিখিয়া থানায় পাঠাইতে হইবে [।] (যদি না দেয় তবে তাহার কারণ লিখিবে আর বাসায় যখন যে লোক আসিবে তাহার আসিবার কারণ প্রত্যহ লিখিয়া থানায় পাঠাইতে হইবে) আমি তাহার এইরূপ অসম্ভ্রমের লেখা দেখিয়া একেবারে ক্রোধে পরিপূর্ণ হইলাম এবং প্রতিজ্ঞা করিলাম এই মূর্খ আমলাকে প্রতিফল না দিয়া জল গ্রহণ করিব না। কারণ আমি ইঙ্গলণ্ডীয় শ্রীমতী মহারাণী বিকুটোরিয়ার প্রজা [।] তাঁহার অধিকার মধ্যে যথা ইচ্ছা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বাস করিতে পারি [।] তাহাতে পার্লিমেণ্টের অথবা কোম্পানি বাহাদুরের কোন আইনের মধ্যে নিষেধ নাই। তবে ঐ আমলা আমাকে এপ্রকার অসম্ভ্রমের শব্দ কি কারণ লেখে। পরে তৎক্ষণাৎ এই বিষয় মাজিস্ত্রেট সাহেবের নিকট লিখিয়া পাঠাইলাম কিন্তু বিজ্ঞবর মাজিস্ত্রেট সাহেব এ বিষয়ে আমার প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। পত্র পাঠমাত্র তিনি কহিলেন বাবুর নিকট আমলার এ প্রকার পত্র পাঠাইবার কোন অধিকার নাই [,] তাহাকে আমি বিলক্ষণ প্রতিফল দিব। তাহাতে ঐ আমলার আশায় ছাই পড়িল এবং ভয়েতে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিল কিন্তু আমি তাহাকে উপরে উঠিতে দেই নাই।

…শ্রী গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ।

[স. সে. ক. ২। ৩৬৪-৬৫]

(প্রথম বন্ধনী চিহ্নিত অংশটুকু সম্ভবত ছাপার ভুলে পুনরুক্তি)

গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ উনিশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকের একজন

প্রথিতযশা সাংবাদিক। তাঁর স্বাক্ষরিত এই চিঠিতে তখনকার সাংবাদিক গদ্য-ভাষায় স্টাইলের বিশিষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমান প্রসঙ্গে এই স্টাইলের সঙ্গে যতিব্যবহারের সম্পর্কটাই শুধু আলোচ্য।

স্টাইলের দিক থেকে লক্ষণীয় যে চিঠিটির গড়নের ভিতর একটি অখণ্ডতা আছে। বাংলায় গদ্যচর্চায় বাক্যগঠনের প্রাথমিক পর্বে প্রতিটি বাক্য স্বয়ংসম্পূর্ণ-ভাবে তৈরি হয়েছিল। একটি বাক্য থেকে আর-একটি বাক্য খুব স্বাভাবিকভাবে তৈরি হয় নি। ফলে একটি বাক্যের সঙ্গে তার পরবর্তী বাক্যের একটা কৃত্রিম গ্রন্থন অনেক সময় প্রয়োজন হত। সেই কৃত্রিম গ্রন্থনের দায় কখনো এতটাই বেশি যে যতিব্যবহারের অবকাশটুকুও যেন লেখক পান না।

এই চিঠিটির সূচনাতে খানিকটা আত্মনিরপেক্ষ পরোক্ষতা আছে। তিনটি দাঁড়ির পর 'সম্পাদক মহাশয়' বলে আবার শুরু করে লেখক সেই জায়গাটি চিহ্নিত করেছেন যেখানে ঐ পরোক্ষতা থেকে তিনি প্রত্যক্ষতায় আসছেন। সেই প্রত্যক্ষতায়, আবার কিছুটা নিরসক্তিতেও তিনি ঘটনার বিবরণ দিতে থাকেন ও সেই বিবরণে চারবার দাঁড়ি ব্যবহার করেছেন। 'বর্ধমানের পোলিসের কোন আমলা লোভেতে উন্মত্ত হইয়া', 'আমলার প্রতি আমার চিরকাল ঘৃণা আছে' এই বাক্যাংশগুলিতে সেই নিরাসক্তির ভঙ্গি তিনি আর রাখেন না। তারপর পরোয়ানায় কী লেখা আছে, তাতে তাঁর কী প্রতিক্রিয়া হল ও তিনি কী করলেন এই প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত ভূমিকার বিষয় লিখেছেন। একটি স্বতন্ত্র প্যারায় এই অংশটি চিঠির আগের অংশ থেকে আলাদা। চিঠির গঠনশৈলীর অখণ্ডতার প্রমাণ হিশেবে উল্লেখ করা চলে—আবার তিনি সূচনার আত্মনিরপেক্ষ পরোক্ষতার ভঙ্গিতে ফিরে মফস্বলের পুলিস সম্পর্কিত প্রাথমিক মন্তব্যকে সিদ্ধান্তের মর্যাদা দিয়ে শেষ করতে পারতেন।

স্টাইলের এই অখণ্ডতা চিঠির গদ্যের ভিতরেও একটি অখণ্ডতা এনেছে। আধুনিক অভিজ্ঞতায় হয়তো এই চিঠির ১২টি জায়গায় দাঁড়ি, কমা ও ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহার চলে। কিন্তু দাঁড়ি ছাড়া অন্য কোনো চিহ্ন ব্যবহার না করা ও দাঁড়িও প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার না করা সত্ত্বেও চিঠিটির মানে বুঝতে কোথাও আটকায় না, এমন-কি চিঠিটির গতিও কোথাও শ্লথ হয় না।

এটা সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে গৌরীশঙ্করের যতিব্যবহারের মধ্যে একটা পদ্ধতি আছে। সেই পদ্ধতিটি তিনি গদ্যভঙ্গির অখণ্ডতা রক্ষা করেই প্রয়োগ করেছেন।

গভর্নমেণ্ট পুলিসের কাজ তত্ত্বাবধানের জন্য লোক নিয়োগ করেছেন—এই সংবাদটির পর প্রথম দাঁড়ি। দুটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকলেও আসলে 'লোক'-এর আগে 'যে' এই সাপেক্ষ সর্বনামটি লুপ্ত আছে। দ্বিতীয় দাঁড়ির বেলায় 'যে-সে' এই সাপেক্ষ সর্বনামটি ব্যবহারের ফলে সম্পূর্ণ একটি বাক্য হয়েছে। এর পরে তিনটি সমাপিকা ক্রিয়াকে তিনি একটিও সংযোজক পদ ব্যবহার না করে একটি দাঁড়িতে আটকেছেন। তাতে 'বিশেষতঃ' শব্দটি থাকায় একটি স্বতন্ত্র বাক্যের আভাস আসে বটে কিন্তু গৌরীশঙ্কর বর্ধমানের অভিজ্ঞতাকে একটি অংশে রাখতে চান। এই তিনটি দাঁড়িতে চিহ্নিত ক্রমদীর্ঘ তিনটি বাক্যে সূচনাংশ শেষ।

এর পরের বাক্যটি একটি সরল বাক্য। কিন্তু তার পরের বাক্যটিতে 'আমি' 'আপনি' 'পরাণবাবু…' তিনটি কর্তা তিনটি ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাই সিদ্ধান্তে আসার আগে 'সুতরাং'—এই সংযোজক পদটি ব্যবহার করতে হয়। এইখানে লেখক একটা দাঁড়ি দিয়েছেন। তার কারণ বর্ধমানে তাঁর অবস্থানের বৈশিষ্ট্যটিকেই তিনি এই বাক্যের প্রধান বক্তব্য হিশেবে রাখতে চান।

প্রতিটি প্রসঙ্গকেই তিনি এক দাঁড়ির দ্বারা আলাদা করেছেন—'আমাকে এইরূপ দেখিয়া বর্ধমানের পোলীসের কোন আমলা' কী করল, তাঁর অসম্মতি ও আমলার পরোয়ানা পাঠানো, পরোয়ানায় কী লেখা আছে, 'আমি…ক্রোধে পরিপূর্ণ হইলাম', 'কারণ আমি…বিক্টোরিয়ার প্রজা', ম্যাজিস্ট্রেটকে চিঠি, ম্যাজিস্ট্রেটের উত্তর। অর্থাৎ দাঁড়ি ব্যবহারের ক্ষেত্রে গৌরীশঙ্করের সচেতনতা সক্রিয়—আধুনিক অভ্যাসে ব্যবহার খানিকটা উদার হতে পারত এই সম্ভাবনা সত্ত্বেও। দাঁড়ি ব্যবহারের এই সচেতনতার সঙ্গে 'বিলক্ষণ হাত মারিবে', 'বাবু কহলানেওয়ালা', 'আশায় ছাই পড়িল'—এই বুলি ব্যবহারের ফলে গদ্য হয়ে উঠেছে নিয়মিত অথচ প্রবহমাণ।

বাক্যের গড়ন, বাক্যের সঙ্গে বাক্যের সম্পর্ক, প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গে যাওয়া, যুক্তি কাঠামো, সেই কাঠামোর সঙ্গে বাক্যের সংগতি, আত্মপ্রক্ষেপ বা নিরাসক্তি—গদ্যে স্বতন্ত্র স্টাইলের এই আবশ্যিক উপকরণগুলি সম্পর্কে সচেতনতার সঙ্গে-সঙ্গেই যতিব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা কাজ করছে ও যতিব্যবহারে একটা পদ্ধতি লক্ষ করা যাচ্ছে। গদ্যচর্চায় এগুলি শুধু শাস্ত্রীয় উপকরণ নয় বা ব্যাকরণের বিধান নয়—লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন। এরই টানে যে-বিষয় সম্পর্কে লেখকের আবেগ আছে, সেই বিষয়ক রচনায় যেন লেখকের কণ্ঠস্বরেরই প্রক্ষেপ ঘটে। কণ্ঠস্বরের অনুসরণ যতিবিন্যাসের একটি প্রধান উৎস।

১৯. সমাচার দর্পণ। ১১ জুন ১৮৩৬

টগ সমাজের মুনাফা।—আমারদের ইচ্ছা **যে** শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর উক্ত সমাজের নাম পরিবর্ত্তন করেন। আমরা শুনিতেছি সকলে তাহা ঠ উচ্চারণ করিয়া ঠগের সমাজ কহিয়া থাকে। সে যাহা হউক সংপ্রতি উক্ত সমাজ **যে** ফরবিস বাষ্পীয় জাহাজ ক্রয় করিয়াছেন তাহা কেবল ৭০ দিবস হইল কর্ম্মে চলিছে। ঐ জাহাজ মাকিন্টস কোম্পানির হস্তে থাকনসময়ে কখন তাহার খরচা পোষিয়া উঠে নাই **কিন্তু** ক্রেতারদের হস্তে পতিতহওনঅবধি তাহাতে বিলক্ষণ লাভ হইতেছে। ২১ ফেব্রুআরি তারিখঅবধি ৩০ আপ্রিলপর্য্যন্ত গড়ে ১৮,৮০০ টাকা উৎপন্ন হয় [।] **তাহাতে** ১২,১৮৫ টাকা খরচ হইয়াছে অতএব লাভ মাসে ৩,০০০ টাকার কিঞ্চিৎ ন্যূন। গড়ে ৪,০০০ টাকা লাভ হইত **কিন্তু** ঐ জাহাজে **যে** দৈবঘটনা হয় তাহাতে ১,৯০০ টাকা ও ৯ দিবস হরণ হইয়াছে।

[স. সে. ক. ২। পৃ ৩৪০-৪১]

দাঁড়ির সংখ্যা—৬

সম্ভাব্য দাঁড়ির সংখ্যা—১

সংযোজক পদ—৬

২০. সমাচার দর্পণ। ২৯ জুলাই ১৮৩৭

পয়সা।—বাজারে ১ টাকার পয়সাতে এইক্ষণে ৬ পয়সাপর্য্যন্ত যাইতেছে। পোদ্দারেরা টাকাতে ঘসা পয়সা ১৬ গণ্ডা করিয়া দিতে চাহে **কিন্তু** সেই পয়সা কোন কর্ম্মের নহে। কল্য আমারদের এক জন বেহারাকে ॥০ আনার পয়সা দিতে হইয়াছিল [।] **তাহাতে** ঐ প্রকার ঘসা পয়সা দেওয়াতে সে কহিল **যে** ঘসা পয়সা কেহই লইবে না [।] এই ৮ গণ্ডা পয়সা এবং ৮ গণ্ডা লুড়ি তুল্য মূল্যই। **কিন্তু যখন** তাহার সঙ্গে অনেক বচসা করা গেল তখন কহিল **যে** বরং নূতন পয়সার অর্দ্ধেক আমাকে দেউন।

গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত পোদ্দারেরা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য [।] বাজারের পোদ্দারেরা **যে** প্রকার পয়সা দিতে চাহে তাহারাও তদ্রূপ পয়সাও সেই দরে দিতে চাহে [।] **অতএব** ঐ বেটারদের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট মাসে **যে** ৩০০ টাকা ঘরভাড়া দিতেছেন সে কেবল ভস্মে ঘি ঢালা হইতেছে। [স. সে. ক. ২। ৩৩৫]

দাঁড়ির সংখ্যা—৫

সম্ভাব্য দাঁড়ির সংখ্যা—৪

সংযোজক পদ—৯

দুটি উদাহরণের কোনোটিতেই রচনাদর্শগত কোনো প্রভাব খুব প্রকট নয়। অর্থাৎ ইংরেজি বা সংস্কৃত এই দুই আদর্শের কোনো একটির সচেতন সতর্ক অনুসরণ লক্ষণীয় নয়। বাস্তব বিবরণের টানে লেখক এক কণ্ঠস্বর আবিষ্কার করতে পারেন। সে-কণ্ঠস্বর তাঁকে যথার্থ যতিব্যবহারের দিকেও নিয়ে যেতে পারে। বিশিষ্ট বাচনের আশ্রয়ে সেই যথার্থ যতিব্যবহারের ইঙ্গিতই এখানে স্পষ্ট।

এই দুটি উদাহরণ বাণিজ্য ও অর্থ সংক্রান্ত হলেও রচনার ভিতর যে-মন্তব্য আছে তার ফলে বাণিজ্য ও অর্থসংক্রান্ত রচনার নির্দিষ্টতা এগুলিতে নেই। তৎসত্ত্বেও এই দুটি রচনার কোনোটিতেই যতিব্যবহারে বিভ্রাটের জন্যে রচনার ধারাবাহিকতা বা প্রসাদগুণ নষ্ট হয় নি।

বরং অত্যন্ত ছোট এই রচনা দুটিতে খানিকটা উদারভাবেই দাঁড়ি ব্যবহৃত হয়েছে, যথাক্রমে ৬ ও ৫। প্রথম উদাহরণে ৬টি ও দ্বিতীয় উদাহরণে ৭টি সংযোজক পদ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিটি সংযোজকপদই ব্যবহৃত হয়েছে অংশ দুটির বাচনভঙ্গির ন্যায়ে। প্রথম উদাহরণে 'টগ সমাজ'-কে 'ঠগ' সমাজ বলা হয়ে থাকে এই উল্লেখে লেখকের ব্যক্তিত্বের যে সংক্রমণ ঘটে, তার ফলে পরবর্তী অংশটিতে একটা বিশিষ্ট বাচনের আভাস পাওয়া যায়—হিশেবনিকেশের অঙ্ক সত্ত্বেও। দ্বিতীয় উদাহরণে এই লক্ষণটি আরো পরিষ্কার। উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যতীতই বেহারার উক্তি ব্যবহার করায় বাচনে যে-নাটকীয়তার সঞ্চার হয়, তারই টানে শেষ প্যারাটিতে লেখকের ব্যক্তিত্বের সংক্রমণ ঘটে। সেই সংক্রমণে 'নিতান্ত অকর্ম্মণ্য', 'বেটারদের', 'ভস্মে ঘি ঢালা' এই পদগুলি শৈলী হয়ে ওঠে।

কিন্তু ইয়ংবেঙ্গল বা অন্য কোনো-কোনো মতগোষ্ঠীর সংবাদ-সাময়িকপত্রে রচনার আভ্যন্তরীণ দৃষ্টিভঙ্গিগত ঐক্য সত্ত্বেও রচনার বাস্তব ব্যাপারটি তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় নি। সেখানেও নির্ভর করতে হত পণ্ডিতদের ওপরই। ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা প্রকাশ উপলক্ষে 'সংবাদ তিমির নাশক' কাগজে লেখা হয়েছিল।

> "সন ১২৩৮ সালের ৫ আষাঢ়ে জ্ঞানান্বেষণ কাগজ প্রকাশ হয় তাহার প্রকাশক শ্রীযুত দক্ষিণানন্দন ইনি বাবু স্যর্য্যকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র বাঙ্গালা লেখাপড়া কিছুই জানেন না এবং বাঙ্গালা কথা কহিতে ভাল পারেন না তাহাতে রুচিও নাই তথাচ বাঙ্গালা সমাচার কাগজের এডিটর না হইলে নয় মাতামহদত্ত কিঞ্চিৎ সঞ্চিত আছে তাহা তাবৎকে বঞ্চিত করিয়া ঐ কাগজের জন্য কথঞ্চিৎ কিছু ব্যয় করেন একজন নাটুরে ভাট মদ্যপায়িকে পণ্ডিত জানিয়া চাকর রাখিয়াছেন"

এই ব্যবস্থায় মতাদর্শ বা দৃষ্টিভঙ্গিগত ঐক্যের সঙ্গে গদ্যরীতির সমন্বয় যেমন ঘটেছে তেমনি এই দুইয়ের ভিতর বিরোধিতাও দেখা যায়। তাই এমন উদাহরণ প্রায়ই মেলে যেখানে প্রসঙ্গনির্দেশের সূত্রেই প্যারাভাগ ও যতিবিন্যাস ঘটছে কিন্তু গদ্যে সংস্কৃত রচনারীতির ছাঁচটা থাকছে অপরিবর্তিত।

২১. জ্ঞানান্বেষণ। এপ্রিল ১৮৩৮

…বর্ত্তমান শাসন কর্ত্তারা অতিশয় সভ্য ও ধনাঢ্য প্রায়ই হইয়াছেন [।] সভ্যতা ও ধনাঢ্যতা কোন ২ উপায় দ্বারা হইতে পারে এতদ্দেশীয় জনগণ তাহার কিছুই অন্বেষণ না করিয়া আপনারদিগের যে স্বাভাবিক নীচাবস্থা তাহাতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করিয়া সুখসম্ভোগ করেন। ইউরোপীয়েরদিগের যে উত্তম২ গুণযুক্ত উত্তমাবস্থা তদ্দর্শনে সেইরূপ উত্তমাবস্থা প্রাপ্তির নিমিত্ত সর্ব্বসাধারণেরি লোভ জন্মাইতে পারে। কিন্তু এতদ্দেশীয় মনুষ্যগণ এমত নীচাবস্থায় আছেন যে তদ্দারা উত্তমাবস্থা একবার মানসেও করেন না [।] ইঙ্গলণ্ডীয় বিদ্বান ব্যক্তিরা যে সকল উত্তম কার্য্য করিয়াছেন তাহা এতদ্দেশীয়েরা চিত্তেও স্থান দান করেন না এবং তাহার কিছুই বিবেচনা করেন না আর স্বাভাবিক নীচাবস্থা হেতু তদ্ভাব এতদ্দেশীয়দিগের মনে একবার উদয়ও পায় না। এবং কোন দেশীয় কোন ব্যক্তির সৌভাগ্য কেবল সময় গুণেই হয় এমত নহে শারীরিক পরিশ্রম চেষ্টা ব্যতিরেকে হইতে পারে না। ইউরোপীয়দিগের যে সকল অতিশয় পরিশ্রম উদ্যোগ চেষ্টা সতর্কতা বিদ্যা দ্বারা এমত অনুপম সভ্যতাদিগুণ যুক্তাবস্থা হইয়াছে যে আমরা তন্নিমিত্ত তাঁহারদিগকে প্রশংসা করি। ইঙ্গলণ্ডীয়দিগের মূলধনের উত্তমরূপে ব্যবহার্য্যতা হেতু যে ধনাঢ্যতা ইহা সর্ব্বসাধারণ জনকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে [।] কেবল বিদ্যা দ্বারা যে জনদিগের ধনাঢ্যতা সৌভাগ্য হয় এমত তাঁহারা বলেন না [।] বাণিজ্যাদি সহকারে সৌভাগ্যাদি হয়। তন্নিমিত্ত আমরা বলি যে এতদ্দেশীয় জনগণ স্বাভাবিক অলস ও নিদ্রা প্রভৃতি যে দোষবর্গ তাহা পরিত্যাগ করিয়া উক্ত বাণিজ্যাদিরূপ অস্ত্র শস্ত্র ধারণপূর্ব্বক সৌভাগ্যের বিরোধী যে কুস্বভাব তাহাকে জয় করিয়া সৌভাগ্যকে প্রবল করুন। আর পরমেশ্বর বহুগুণযুক্তা উর্ব্বরা ভূমি প্রদান করিয়াছেন এবং তাহার উপায়ও প্রদান করিয়াছেন ইহা পাইয়া কি উত্তমরূপে ব্যবহাব করা উচিত হয় না [?] এই সময়ে অনেকের উত্তমতা ও সভ্যতা হইতেছে অতএব এতদ্দেশীয়দিগের উচিত যে পশ্চিম প্রদেশীয়দিগের যে সকল সদুপায় দ্বারা সভ্যতা হইতেছে সেই সকল সদুপায় সদা আচরণ করেন। [স. সে. ক. ২। ৩৩১]

রচনাটিতে আরো দুটি প্যারা আছে।

সংস্কৃত ছকের অন্ধ অনুসরণের ফলে রচনাটির ভাষা জড়, কোথাও-কোথাও ব্যাকরণদোষ (ইউরোপীয়দের যে সকল···প্রশংসা করি) আছে। বাক্যগুলির কোনো গঠনগত ঐক্য নেই—একটি বাক্য থেকে আর-একটি বাক্য তৈরি হয় নি। বাক্যের পদবিন্যাসও যথাযথ নয় (প্রথম বাক্যটির 'প্রায়ই' শব্দটিকে ক্রিয়া বিশেষণ হিশেবে ব্যবহার করা হয়েছে, আসলে বিশেষ্যের বিশেষণ)।

গদ্যের ক্রটিতে সর্বত্র ঠিক ভাবে অনুসরণ করা না হলেও রচনাটির যতিবিন্যাসে একটা পদ্ধতি লক্ষ করা যায়। এই প্যারাটিতে মোট ৮ বার দাঁড়ি ব্যবহার করা হয়েছে। 'বর্ত্তমান শানকর্ত্তারা···সভ্য ও ধনাঢ্য' ও 'এতদ্দেশীয় জনগণ' স্বভাবতই উচ্চাকাঙ্ক্ষী নয়, ইয়োরোপীয়দের 'উত্তমাবস্থা'য় 'লোভ জন্মাইতে পারে', ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে এদেশীয়দের পার্থক্য, 'সময়গুণ' ও 'শারীরিক পরিশ্রম চেষ্টা', ইয়োরোপীয়দের যত্ন, 'ইঙ্গলণ্ডীয়দিগের মূলধনের উত্তমরূপে ব্যবহার্যতা'—এ-দেশীয়দের প্রতি আহ্বান, ধিক্কার ও পুনরাহ্বান—এই আটটি প্রসঙ্গকে লেখক ৮টি দাঁড়িদ্বারা চিহ্নিত করেছেন। সেই চিহ্ন ৮টি বাক্যের সীমার ভিতর আটকা থাকে নি বা একটি বাক্যের জন্য একটি দাঁড়ি ব্যবহৃত হয় নি কিন্তু দাঁড়ি দিয়ে-দিয়ে রচনার প্রসঙ্গগুলিকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। সমগ্র রচনাটিকে কয়েকটি প্যারায় ভাগ করা ও একটি প্যারাকে কয়েকটি দাঁড়ির দ্বারা নির্দিষ্ট অংশে ভাগ করার এই পদ্ধতি দাঁড়িচিহ্নসহ সমস্ত যতিচিহ্নের যথাযথ ব্যবহারের দিকে যাওয়ারই একটা প্রধান প্রবণতা।

দাঁড়ি দিয়ে প্রসঙ্গান্তর সংকেতিত করার এই সচেতনতার আর-একটি জরুরি পরোক্ষ সাক্ষ্য—মোট ২৫টি সংযোজক পদের ভিতর ৪টি ব্যবহৃত হয়েছে শব্দের সঙ্গে শব্দের সংযোজনে ; ৮টি দাঁড়ির মধ্যে ৪টি দাঁড়িচিহ্নিত অংশ শুরু হয়েছে—কিন্তু, এবং, তন্নিমিত্ত, আর—এই চারটি সংযোজক পদের দ্বারা ; বাকি সংযোজক-পদগুলি হয় সাপেক্ষ সর্বনাম, নয়তো 'আর' 'এবং' ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রসঙ্গান্তর বোঝাতে দাঁড়ি ব্যবহারের পদ্ধতি সংযোজক পদের দ্বারা, অর্থাৎ বাক্যের ব্যাকরণগত গঠনের দ্বারা, নিয়ন্ত্রিত নয়, নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বক্তব্যের উপস্থাপনভঙ্গির সংগতিতে অর্থাৎ লেখকের স্টাইলের সংগতিতে। যতিব্যবহার এই ভাবে স্টাইলের অংশ হয়ে ওঠার প্রবণতা দেখা যাচ্ছিল।

কিন্তু সংস্কৃত রচনারীতির ছাঁচের ভিতর এই প্রবণতা সম্পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠতে পারে না। বিকাশের গতি আর রচনারীতির আধারের ভিতর বিরোধ

দেখা দেয়। এই পর্বে বা এই বিশেষ প্রবণতার ভিতর যতিবিন্যাস ও রচনারীতির এই অন্তর্বিরোধ রচনার ভিতরে মাঝে-মাঝে এক শৈলীসংকট সৃষ্টি করতে পারে যা যথাযথ শৈলী বিকাশের পথে বাধা হতে পারে। এই শৈলীসংকট আবার অনেক সময় বিষয় সম্পর্কে একটা দ্বিধার সঙ্গেও জড়িত। বিশেষত 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার লেখক ও পৃষ্ঠপোষকরা ভারতীয় হিন্দুসমাজকে বিচার করেছিলেন ইয়োরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে। একটি খাঁটি হিন্দু সামাজিক অনুষ্ঠান সম্পর্কিত রচনা থেকে এই শৈলীসংকটের উদাহরণ দেয়া যায়।

২২. জ্ঞানান্বেষণ। ২৭ এপ্রিল ১৮৩৩

> গত সন্ন্যাসবিষয়ক নীলের উপাখ্যান।—দেশ দেশান্তর ভ্রমণকারিরা কহেন যে পৃথিবীতে যত্ত জাতি আছে তাহার মধ্যে হিন্দু জাতির আচার ব্যবহার অত্যাশ্চর্য্য এবং বহুকালাবধি ইহাঁরা যেরূপ কর্ম্ম করিয়া আসিতেছেন তদ্দারাই এ জাতি বিলক্ষণ পরিচিত আছেন [।] যে সকল ভ্রমণকারিরা পাঠকবর্গের অগোচর আশ্চর্য্য২ বিষয় দর্শন করিয়াছেন তাঁহারা উপরোক্ত কথা সপ্রমাণ করিয়া কহিয়াছেন এবং এতদ্দেশীয় লোকেরাও ঐমত বোধ করিবেন [।] হিন্দুদিগের মধ্যে একটা সামান্য কথা প্রচলিত আছে যে প্রাচীন মদিরিকা ও বন্ধু অত্যন্ত প্রিয়মাত্র [।] এতদ্বিষয়ে যদ্যপি ইঙ্গলণ্ডীয়েরা সুধারাকরণে অনুকূল হন তবে হিন্দুরা বলিবেন যে প্রাচীন ব্যবহার প্রাচী মদিরিকা ও বন্ধু হইতেও অধিক গুরুতর।
>
> উপরে যাহা বর্ণন করা গেল তাহার তাৎপর্য্য এই যে তদ্বিষয়ে কিছু উদাহরণ দর্শান যায় ও অস্মদ্দেশীয় লোকেরা এরূপ উদাহরণাদিকে অতিযথার্থ বোধ করে।
>
> কিন্তু গত সন্ন্যাসবিষয়ক নীলোৎসব দর্শন করিয়া তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ উক্তি করাতে পাঠকগণের সন্তোষ জন্মিতে পারে যেহেতু চরকপূজা বিষয়ে সর্ব্ব-সাধারণের বিশেষ মনোযোগ প্রার্থনা করা গিয়াছিল। অতএব এখনও তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বক্তব্য প্রকাশ করিবার সুসময় বটে। চিৎপুরের রাস্তায় অসংখ্য ঢাকের মহাশব্দ এবং রাস্তার উভয় পার্শ্বের বাটির বারান্দার উপর লোকের মহাকোলাহল হয়। সন্ন্যাসির দল সকল বাণপ্রভৃতি ফুড়িয়া বাদ্য সহিত আসিল [।] এই সকল ব্যাপার বেলা ৯ ঘণ্টা পর্য্যন্ত দেখা যায় [।] পরে তামাসা যাহা দর্শনার্থে অনেক লোক জমা হয় তাহার ক্রমে কম হইয়া আসিতে লাগিল। বাঁশ বাঁকারি ও কাগজমণ্ডিত একটা পাহাড় নির্ম্মিত হইয়া নীল ও রক্তবর্ণের রং করা গিয়াছিল [।] তদুপরি একটা প্রকাণ্ড মন্দির [,] তন্মধ্যস্থিত কাগজে নির্ম্মিত হিন্দুর

দেবতারা [,] ইহাই দেখিয়া প্রথমে দর্শকগণেরা চমৎকার ভাবিলেন [।] ইহাতে তামাসা এই আছে যে কয়েকটা সোলার পুত্তলিকা বানাইয়াছিল [,] তৎপরে একখানা ময়ূরপঙ্খী দেখা গেল [,] তাহা বাঁশ বাঁকারিদ্বারা নির্ম্মাণ হয় [,] মুখটা ময়ূরাকার [,] তাহাতে নানা চিত্র বিচিত্র করা গিয়াছিল [।] তাহার উপরে কয়েকজন লোকেতে গান বাদ্যকরও [করত] দাঁড় ফেলিতেছিল। তাহা একটা পাঠশালার ন্যায় কিন্তু বালকের নহে [,] সেটা প্রকাণ্ড মনুষ্যের বিদ্যালয় [।] ইহা গুরুমহাশয় ছাত্রগণের মুর্খতা দেখিয়া লজ্জিত হইয়া কহিলেন আমি ইহারদিগকে আর মারিয়া সোজা করিতে পারি না। লোকেরা হাসিতে২ ঘণ্টা করতাল ধ্বনি শ্রবণ করিতে পারিলেন। পরে গোদযুক্ত একটা বৃদ্ধ পুষ্প চন্দনাদিদ্বারা শরীর আবৃত করত দেবতাতুল্য হইয়া প্রকাশমান হইবার ন্যায় এক জন তাহার গোদ পূজা করিতেছিল এই সং দেখিয়া বড়ই হাসির ধূম পড়িল কিন্তু দেবপূজা করেন যে হিন্দু তিনি কিরূপে গোদ পূজা করিলেন তাহা আমরা বলিতে পারি না [।] ঐ সংটা প্রকৃত গণেশের ন্যায় সাজাইয়াছিল।...

[সা. বা. স ৪ । ৭৯৫-৯৬]

দাঁড়ির সংখ্যা — ১০

সম্ভাব্য দাঁড়ির সংখ্যা — ১০

সংযোজক পদ — ২২

একটি দীর্ঘ রচনা থেকে এই অংশটি উদ্ধৃত করা হয়েছে। রচনাটির ভিতর প্যারাভাগ করার যথাযথ নির্দিষ্টতা আছে। প্রথম প্যারায় ভারতীয় রীতিনীতি, দ্বিতীয় প্যারায় উদাহরণের প্রয়োজনীয়তা ও তৃতীয় প্যারায় চড়কপূজার সঙের বর্ণণা আছে। শুধু প্যারাভাগই নয়, সমগ্র রচনাটির ভিতরই একটা শৃঙ্খলা আছে। 'পাঠকগণের সন্তোষ জন্মিতে পারে', 'সর্ব্বসাধারণের বিশেষ প্রার্থনা করা গিয়াছিল', 'তামাসা যাহা দর্শনার্থে অনেক লোক জমা হয়' ইংরেজি বাক্যাদর্শের এই অনুকরণের ফলেও সেই শৃঙ্খলা ক্ষুণ্ণ হয় নি। এই শৃঙ্খলার অন্যতম কারণ যতি-চিহ্নের সংগত ব্যবহার।

তৃতীয় প্যারায় সঙের বর্ণনায় ৮টি দাঁড়ি ব্যবহৃত হয়েছে (রচনাংশে মোট দাঁড়ির সংখ্যা ১০)। আরো ৭টি দাঁড়ি এই অংশে দেয়া যেতে পারে। কিন্তু দাঁড়ি না দেয়ার ফলেও বাক্যগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিশে না গিয়ে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারে। তৃতীয় প্যারায় মোট ১০টি জায়গায় বাক্যের সঙ্গে বাক্যকে গ্রথিত করতে—'কিন্তু' ,যেহেতু', 'এবং', 'যাহা', 'অতএব'—এই সংযোজক শব্দগুলি ব্যবহার করা হলেও

বাক্যগুলি স্বাতন্ত্র্য রাখতে পেরেছে আর এই শব্দগুলির হেতুবাচকতা ও সাপেক্ষতাই প্রধান হয়ে উঠেছে—এরা যতিচিহ্ন ব্যবহারের বিকল্প ওঠে নি।

অথচ সমগ্র রচনাটি সম্পর্কে এ-সিদ্ধান্ত চলে না। প্রথম দুইটি প্যারায় দাঁড়ি পড়েছে মাত্র ২বার, দুটি প্যারার শেষে। আর এই দুই প্যারায় সম্ভাব্য দাঁড়ির সংখ্যা দাঁড়ায় অন্তত ৩। অথচ মোট ১০ বার, 'যে', 'যদ্যপি' ব্যবহার করা হয়েছে। আর এই ১০টি জায়গায় দিকে তাকালেও ধরা পড়ে কীভাবে সংযোজক পদ বাক্যের সঙ্গে বাক্যকে গেঁথে চলেছে ও যতিব্যবহারের অবকাশকে রুদ্ধ করে দিচ্ছে। অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ তৃতীয় প্যারায় ৯টি সংযোজক পদ আর প্রথম দুই প্যারায় ১২টি সংযোজক পদের ব্যবহারের তুলনামূলক আলোচনা করলেই এই সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হয়।

রচনার এই অংশের ভিতর লেখকের শৈলীসংকটের প্রকৃতি খুব স্পষ্ট ধরা পড়ে। যতক্ষণ তিনি ভারতীয় হিন্দুসমাজের রীতিনীতি সম্পর্কিত তত্ত্বঘেঁষা ভূমিকাসূচক প্যারা লিখছেন ততক্ষণ সংস্কৃত ছকের ভিতর আছেন। তারপর যখনই চড়কের সঙ বর্ণনা করতে যাচ্ছেন তখনই বাস্তব বর্ণনার টানে দাঁড়ি ব্যবহার করছেন। যেখানে করছেন না সেখানে ফাঁকাই থেকে যাচ্ছে, ইচ্ছে করলে পূরণ করে নেয়া সম্ভব।

এই সমস্ত চেষ্টাই যথার্থ যতিবিন্যস্ত বাংলা গদ্যের পথ প্রস্তুত করছে।

যথার্থ যতি

তিরিশের দশকে মতগোষ্ঠী হিশেবে সংহত হলেও বাংলা রচনায় অক্ষমতার জন্য ইয়ংবেঙ্গলদের নির্ভর করতে হত পণ্ডিতদের ওপর। কিন্তু এর পর থেকেই এই নির্ভরতা যেমন এক দিকে কমে আসতে থাকে, তেমনি পত্রিকা পরিচালনার ত্রিস্তর ব্যবস্থারও বদল ঘটছিল, পত্রিকার প্রযোজক-প্রকাশকই হয়ে উঠছিলেন লেখক ও সম্পাদক। পরন্তু ইয়ংবেঙ্গলদের ইয়োরোপীয় আদর্শও এই পরবর্তীদের কাছে একমাত্র আদর্শ হিশেবে সক্রিয় ছিল না। ফলে চল্লিশের দশকের গোড়ায় বাংলা সাংবাদিকতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর ঘটল। চল্লিশের দশকের গোড়ায় একদল নতুন সাংবাদিকের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির ঐক্য, বিষয়ের ঐক্য ও লেখা আর বিষয়ের ভিতর সাম্য যেমন দেখা গেল, তেমনি আবার বিষয়ের ভারতীয়ত্বের ঐক্যে তাঁদের সঙ্গে সমাজের যোগটা হল আরো দৃঢ়। অপরদিকে—যতিব্যবহার ও গদ্যস্টাইল সম্পর্কিত ত্রিশের দশকের ইয়ংবেঙ্গলি সচেতনতাই চল্লিশের দশকের গোড়া থেকে 'বেঙ্গল স্পেকটেটর', 'বিদ্যাদর্শন' ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র মধ্য দিয়ে যতিচিহ্নের ব্যবহার সম্পর্কিত একটি নীতি প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছিল। কোনো একজন লেখক বা কোনো একটি পত্রিকার

সতর্ক সচেতন ব্যবহারের মধ্য দিয়ে কখনোই এই রীতি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, হয়ও নি। জনসংযোগের দায়ে ও গদ্যশৈলীর স্বতন্ত্রতার সাধনায় সংবাদ-সাময়িক-পত্রের গদ্যচর্চাতেই এই রীতি অভ্যস্ত হয়ে উঠছিল।

এই অভ্যাসের কোনো কালানুক্রমিকতা যেমন নেই, তেমনি আবার দাঁড়িচিহ্ন ব্যবহারের অভিজ্ঞতা ও নিহিত ও উপহিত যতি দ্বারা যতিচিহ্নের কাজ সেরে নেবার প্রয়াস এই সবের মধ্য দিয়েই যতিচিহ্ন ব্যবহারের এই সচেতনতা তৈরি হচ্ছিল। সময়ের দিক থেকে এই প্রবণতাকে ১৮৪২ সাল নাগাদ চিহ্নিত করা যায়—'বেঙ্গল স্পেকটেটর' (এপ্রিল ১৮৪২), 'বিদ্যাদর্শন' (জুন ১৮৪২) ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (আগস্ট ১৮৪৩) পর পর প্রকাশিত হয়েছে।

'বেঙ্গল স্পেকটেটর'-এর প্রধান পরিচালক ছিলেন রামগোপাল ঘোষ ও তাঁর প্রধান সহায়ক ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। 'বিদ্যাদর্শন' ও 'তত্ত্ববোধিনী' এই দুটি পত্রিকারই প্রধান লেখক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। পরে তরুণ বিদ্যাসাগরও তত্ত্ব-বোধিনীর অন্যতম প্রধান লেখক হয়ে ওঠেন। বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ও আধুনিক চিন্তা ও চেষ্টার উদ্‌বুদ্ধ নতুন যুবকদের প্রবেশ ঘটল। ইতিপূর্বে বাংলা সাময়িকপত্র প্রধানত সামাজিক আন্দোলনের বিতর্কে বিশেষ কোনো মত প্রচার করত। এই নতুন সংবাদ-সাময়িকপত্রে বিতর্ককে সেই সংকীর্ণতার বাইরে আনার চেষ্টা হয়। ফলে সাময়িকপত্রের গদ্যভাষার ওপরও তার প্রভাব পড়ে ও সেই প্রভাবের ফলে যতিচিহ্ন ব্যবহারের ক্ষেত্রে রীতিপ্রতিষ্ঠার চেষ্টাও ঘটে।

এই চেষ্টার ভিতরে খানিকটা আকস্মিকতা আছে। কমা ব্যবহার না করে শুধু দাঁড়িচিহ্নকে গদ্যের গড়নের ভিতর গ্রহণ করাটাই ছিল এতদিন একমাত্র চেষ্টা। অন্যান্য যতিচিহ্ন সম্পর্কে কোনো অবহিতি সংবাদ-সাময়িকপত্রে কোথাও লক্ষ করা যায় না। কিন্তু 'বেঙ্গল স্পেকটেটর', 'বিদ্যাদর্শন' ও 'তত্ত্ববোধিনী'তে সমস্তগুলো যতিচিহ্ন একই সঙ্গে ব্যবহারের চেষ্টা শুরু হল। গদ্যের গড়নের সঙ্গে দাঁড়িচিহ্নকে মেলানোর চেষ্টা কখনোই অন্য যতিচিহ্নগুলিকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়—সেদিক থেকে এই পত্রিকা তিনটির চেষ্টা পূর্ববর্তী চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত। আবার, যতিচিহ্ন ব্যবহার করার ফলে গদ্যের গড়নের বদল ঘটে যায়, ফলে এই চেষ্টার ভিতর আকস্মিক নতুনত্বও অনেকখানি। হঠাৎ যেন বাংলার সংবাদ-সাময়িকপত্র দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন, ড্যাশ, উদ্ধৃতি-বিস্ময়-প্রশ্নচিহ্ন আবিষ্কার করে ফেলল।

এই আবিষ্কার ও রীতিপ্রতিষ্ঠার মধ্যে খুব হ্রস্ব, তীব্র নাটকীয়তা আছে। এই পত্রিকাগুলিতে কমা ও সেমিকোলনের ব্যবহার ও তাদের সঙ্গে দাঁড়ির সম্পর্ক নিয়ে

অত্যন্ত কম সময়ের ভিতর নানারকম পরীক্ষা হয়েছে ও সেই কম সময়ের ভিতরই গদ্যের গড়ন ও ন্যায়ের সঙ্গে যতিব্যবহার ওতপ্রোত হয়ে উঠেছে।

এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ১. বাংলা বাক্যের প্রাথমিক একক (Unit) কোথায় তা আবিষ্কার করা ও চিহ্নিত করা, ২. সাপেক্ষ সর্বনাম ও সংযোজক পদ বাক্যকে যে দীর্ঘায়ত করে ফেলতে পারে তার কারণ কী, ৩. এক-একটি প্রসঙ্গ ও এক-একটি বাক্যের সম্পর্ক কী—এই প্রশ্নের উত্তরে কমার ব্যাপক ব্যবহার শুরু হল ও দাঁড়ি ব্যবহার সম্পর্কে অনিশ্চয়তা দেখা দিল। কিন্তু তার ভিতর দিয়েই যতির যথার্থরীতি আবিষ্কৃত হচ্ছিল।

২২. বেঙ্গল স্পেকটেটর। এপ্রিল ১৮৪২

যে সকল বিষয়ের সাধারণে সর্ব্বদা আন্দোলন হয় তন্মধ্যে হিন্দু জাতীয় বিধবার পুনর্বিবাহেরও বাদানুবাদ হইয়া থাকে [।] বোধ হয় যে উক্ত বিবাহের প্রতিবন্ধক যে সকল শাস্ত্র আছে তাহা অত্যন্ত যুক্তিবিরুদ্ধ, কারণ পুরুষ যদি স্ত্রীর মরণানন্তর পুনর্বিবাহ করিতে পারে তবে স্ত্রী কেন স্বীয় স্বামির পরলোক হইলে বিবাহ করণে সক্ষমা না হয় এবং উক্ত প্রতিবন্ধকের সবলতায় কেবল পাপ ও ক্লেশের বৃদ্ধি মাত্র। এতদ্বিষয়ের প্রস্তাব বহু বৎসরাবধি হইতেছে কিন্তু সূচনাবধি এতাবৎকাল পর্য্যন্ত অস্মদ্দেশীয় লোকের দ্বারা তৎপ্রতিবন্ধকের পোষকতায় কিঞ্চিন্মাত্র প্রকাশিত হয় নাই অতএব বোধ হয় যে তৎপ্রতি তাঁহারদিগের দ্বেষের ক্রমশঃ শেষ হইতেছে এবং কিঞ্চিৎ কালাতীতে নিঃশেষ হইতে পারে কিন্তু যে পর্য্যন্ত উক্ত প্রতিবন্ধকে সম্পূর্ণরূপে অনাস্থা হইয়া নূতন রীতির সংস্থাপন না হয় তদবধি আমরা তদাবশ্যকতার নিমিত্তে বারম্বার অনুশীলন করিতে নিবৃত্ত হইব না।

...নারদ, শঙ্খলিখিত, যাজ্ঞবল্ক্য এবং হারীত ইত্যাদি ঋষিরা পুনর্ভূ শব্দ (অর্থাৎ পতি মরণানন্তর কিম্বা তৎ কর্ত্তৃক পরিত্যাগানন্তর পুনঃ সংস্কৃতা এই শব্দ) স্ব২ সংহিতায় উল্লেখ পূর্ব্বক বিশেষ রূপে বিবৃত করিয়াছেন। নারদ পুনর্ভূকে তিন প্রকারে বিভক্ত করেন যথা "যে কন্যা অক্ষতযোনি কেবল পাণিগ্রহণ মাত্র দ্বারা দূষিতা, তাহার পুনঃসংস্কার হইলে তাহাকে প্রথমা পুনর্ভূ কহে"। "ব্যভিচারে প্রবৃত্তা যে বিধবা স্ত্রীকে শ্বশুরাদিরা দেশ ধর্ম্মাবলোকন পূর্ব্বক অন্যকে প্রদান করে তাহার নাম দ্বিতীয়া পুনর্ভূ"। "দেবরাদির অভাবে সবর্ণ সপিণ্ডকে বান্ধবেরা যে বিধবা স্ত্রীকে পুনর্দান করে তাহাকে তৃতীয়া পুনর্ভূ বলা যায়।"

...অনেক মুনিরা দ্বাদশবিধ পুত্র গণনা করিয়াছেন যথা ঔরস, ক্ষেত্রজ,

দত্তক, কৃত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন, অপবিদ্ধ, কানীন, সহোঢ়, ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বয়ংদত্ত, শৌদ্র ; কিন্তু কলিযুগে কেবল ঔরস ও দত্তক পুত্র দায়াদিতে অধিকারী। উক্ত দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে পৌনর্ভব পুত্রের নাম সুস্পষ্টরূপে উল্লেখিত আছে। এবং মনু, দেবল, নারদ, বৌধায়ন প্রভৃতি মুনি ঐ পৌনর্ভব পুত্রকে পিতৃভিন্নের অদায়াদ অথচ বান্ধবরূপে নিরুক্ত করেন ও যাজ্ঞবল্ক্য যম হারীতাদি ঋষিরা তাহাকে দায়াদ এবং বান্ধব বলেন। আর শ্রাদ্ধাদির নিয়মস্থলে পরাশর প্রভৃতি মুনি পিত্রাদির পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ মাত্র নিষেধ পূর্ব্বক একোদ্দিষ্টে তাহার অধিকারিতার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বের অভাবে পরপরের সমুদয় পৈতৃক ধনাধিকার স্থলে পৌনর্ভবের স্থান নৈয়ত্য নাই, যেহেতু মনু, নারদ, বৌধায়ন, দেবল, যম, যাজ্ঞবল্ক্য, ও হারীত, ইহারা ক্রমে একাদশ, সপ্তম, দশম, অষ্টম, চতুর্থ, এবং তৃতীয় স্থানে স্থাপিত করেন।...

বেণরাজার রাজ্যকালে বিধবার বিবাহ ব্যবহৃত ছিল তদ্রাজত্বানন্তর নিষিদ্ধ হইয়াছে কিন্তু শূদ্রের পক্ষে নিষেধ না থাকাতে অন্ত্যজ জাতির মধ্যে অদ্যাপি তদ্ব্যবহার প্রচলিত আছে। ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশীয় লোকের মধ্যে তাহা গান্ধর্ব্ব কিম্বা নেত্র বিবাহরূপে প্রসিদ্ধ ; আর পেশোয়ার রাজ্যে এতদ্রূপ বিবাহের প্রতি রাজকর ছিল এবং এক্ষণেও উক্ত বিবাহ ক্রমশঃ কিঞ্চিৎ প্রবল হইতেছে।...

উক্ত পুনর্ভূ'র বিবরণ ও তৎপুত্রের দায়াধিকার প্রকরণ এবং তৎ পোষক বিবিধ যথার্থ ইতিহাস ও শাস্ত্রাদি যাহা প্রদর্শিত হইল তাহা দ্বারা এতদ্দেশীয় লোকেরদিগের অবশ্য প্রতীতি হইতে পারে যে উক্ত বিষয় শাস্ত্রামূলক নহে কিন্তু বহুকাল পর্য্যন্ত সাধারণে অপ্রচলিত থাকাতে দেষ্য হইয়াছে এবং উক্ত পুনর্ভূ-বিবাহ পুনঃস্থাপিত হইলে তৎপুত্রের দায়াধিকারক্রম অস্মদ্দেশীয় শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত হইতে পারে। আর এক্ষণে বিধবার পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ থাকাতে যে সকল অনিষ্ট ঘটিতেছে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিম্বা তর্ক দ্বারা তাহার বিবরণ অনাবশ্যক যেহেতু এতদ্দেশীয় লোকেরা অবশ্যই স্বীকার করেন যে অস্ত্রীক পুরুষের পুনর্বিবাহ করণে যাদৃশ ক্ষমতা আছে বিধবার প্রতি তাদৃশ শক্তি অর্পণ করিলে অধিক ক্লেশ ও পাপের হ্রাস হইয়া প্রায় অর্দ্ধাংশ হিন্দু জাতীয়দিগের সুখবৃদ্ধির সম্ভাবনা অতএব উক্ত অনিষ্ট নিবারণার্থে সম্ভ্রান্ত বিজ্ঞ মহাশয়দিগের উদ্যোগী হওয়া উচিত এবং এতদ্বিষয়ে সর্ব্বথা সচেষ্ট হইলে নিরুদ্যমতারূপ দুর্নাম হইতে মুক্ত হইবেন।

[সা. বা. স. ৩। ৭৭-৭৯]

রচনাটির প্রথম ও শেষ প্যারার গদ্যরীতির তুলনা করলে দেখা যাবে, ক্রিয়াপদ ব্যবহার না করে বাক্যগঠনের দায়ে লেখককে বাধ্যতই সংযোজক পদের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। তাই দাঁড়ি ব্যবহার সত্ত্বেও বাক্যগঠনের প্রধান প্রবণতা বাঙলা বাচনের দিক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বাক্যগুলিকে একটি বাক্যের আওতার ভিতর আনা। প্রথম প্যারায় ১৩ বার সংযোজক পদ ব্যবহৃত হয়েছে. শেষ প্যারায় ১৪ বার। প্রথম শেষ দুটি প্যারাতেই মাঝখানে ১ বার করে মাত্র দাঁড়ি পড়েছে। 'প্রতিবন্ধকের সবলতায়', 'প্রতিবন্ধকের পোষকতায়', 'প্রতিবন্ধকে অনাস্থা'—এই ধরনের পদ গঠনের ফলে অর্থের বিনিময়ে বাক্যের ভিতরে এমন এক কৃত্রিম সংহতি এসেছে যার ফলে যতিচিহ্ন ব্যবহারের কোনো অবকাশ থাকছে না। অথচ শেষ প্যারায় সাপেক্ষ সর্বনাম ও অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহারের ফলে বাক্য দীর্ঘ হলেও যতিচিহ্ন ব্যবহারের কোনো প্রয়োজনই হচ্ছে না।

কিন্তু রচনাটিতে যতিচিহ্নের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতার প্রমাণ আছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্যারায় প্রসঙ্গের নির্দিষ্টতা ও যুক্তির পারম্পর্যের প্রয়োজনে দাঁড়ি ব্যবহৃত হয়েছে ও লেখক অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বাক্যও ব্যবহার করেছেন। দাঁড়ির দ্বারা প্রসঙ্গের চিহ্নিত নির্দিষ্টতার ভিতর অনুপ্রসঙ্গ বা উদাহরণের স্বাতন্ত্র্য বোঝানোর জন্য লেখক দুটি জায়গায় সেমিকোলন ব্যবহার করেছেন। এই ব্যবহারের ভিতর একটা পদ্ধতি আছে।

পদ্ধতি আছে কমাচিহ্ন ব্যবহারেও। যেখানে অনেকগুলি নামের উল্লেখ আছে, সেখানে একটি নাম থেকে আর-একটি নামকে আলাদা করতে কমা ব্যবহৃত হয়েছে। কমার এটি একটি প্রয়োজনীয় ব্যবহার। কিন্তু কমা ব্যবহারের ফলে বাক্যের ভিতরে পেরেনথিসিস, ক্লজে ও বিশেষণ ব্যবহারের যে নতুন সুযোগ আসে সে-বিষয়ে কোনো সচেতনতা লক্ষ করা যায় না।

২৩. বিদ্যাদর্শন ; শ্রাবণ ১৭৬৪ শক [১৮৪২ খৃ.]

স্ত্রীগণ (সপত্নী) এই শব্দের প্রতি যে প্রকার আশঙ্কা প্রকাশ করে এবং দ্বেষের সহিত নিয়ত তাহার অমঙ্গল চেষ্টা করে, আর পুরুষগণ অপরের সহিত আপন ভার্য্যার কোন অসদ্ব্যবহার দৃষ্টি করিলে যে রূপ ঈর্ষা ও ঘৃণা অনুভব করিয়া থাকে, তাহাতেই স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, যে পরমেশ্বর মনুষ্যের অন্তঃকরণে এই উপদেশক দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন, যে কি স্ত্রী কি পুরুষ উভয়ের পক্ষই এক স্বামী বা এক দারা সত্ত্বে অপর বিবাহ করা কদাপি উচিত এবং সুখজনক নহে।

পৃথিবীস্থ অনেক শাস্ত্রই এক বিষয়ে ঐক্য হয়, এবং যুক্তিও তাহাতে বিলক্ষণ

সহায়তা করে, **অর্থাৎ** ঈশ্বর প্রথমে এক পুরুষ **এবং** এক স্ত্রী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। **যদিস্যাৎ** বহুবিবাহ তাঁহার অভিপ্রেত হইত, তবে তিনি প্রথম মনুষ্যের হস্তে অধিক ভার্য্যাকে অর্পণ করিয়া অবিলম্বে বংশ বৃদ্ধির উপায় প্রদান করিতে পারিতেন। তদ্ব্যতীত চাক্ষুষ প্রমাণ **এবং** অনুমান দ্বারা অবগত হইতেছি, **যে** অবনীমধ্যে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরি তুল্য সঙ্খ্যা, **অতএব যদিস্যাৎ** এক মনুষ্য দশ বা দ্বাদশ রমণীকে অধিকার করে, **তবে** তাহার বিপরীতে দশ বা দ্বাদশ ব্যক্তিকে বিবাহরসে বঞ্চিত হইতে হয়, যাহা অত্যন্ত যুক্তিবিরুদ্ধ।

স্ত্রী গ্রহণকালীন আমরা মস্তক উপরে এক বৃহৎ ভার ধারণ করি, **এবং** অসঙ্খ্য কর্ম্মসূত্রে অন্তঃকরণকে বদ্ধ করিয়া থাকি, বিশেষতঃ এই এক উত্তম ব্রত পালন করিতে স্বীকৃত হই, **যে** আমরা সাধ্যানুসারে আমারদিগের অর্দ্ধাঙ্গী ভার্য্যাকে আনন্দ বিতরণ করিতে ত্রুটি করিব না। এইরূপ স্ত্রীও স্বামীর সুখ জন্য সকল চেষ্টাকে নিযুক্ত করিতে অঙ্গীকার করেন। **অতএব** স্ত্রীর সুখ অন্বেষণ স্বামীর প্রধান কার্য্য, **এবং** পতির সুখ চিন্তা ভার্য্যার শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম হইয়াছে, কি **যে** স্থলে স্ত্রীর সঙ্খ্যা একের অধিক, সেস্থলে স্বামীর প্রেম নানা পাত্রে বিভক্ত হইয়া সামান্যতঃ প্রত্যেকের প্রতি আদরের অল্পতা জন্মায়, **এবং** পতিও সকলের প্রণয়কে তুল্যরূপে গ্রহণ করিতে অপারগ হয়েন।...

[সা. বা. স. ৩। ৫৫২]

অক্ষয়কুমারের 'ভূগোল' বইটি থেকে একটি উদাহরণ দেয়া যাক :

এই পুস্তক প্রস্তুত হইয়া উপায়াভাবে কিয়ৎকাল অপ্রকটিত ছিল **পরে** তত্ত্ববোধিনী সভা বিশেষভাবেই সুপ্রসন্না হইয়া স্বীয় বিত্তব্যয় দ্বারা ইহাকে প্রকাশিত করত **যে** প্রকারে কৃপা বিতরণ করিলেন, তাহাতে সাহসপূর্ব্বক কহিতে পারি, উক্ত সভার এ রূপ না হইলে এ পুস্তক সাধারণ সমীপে কদাচ এরূপে উদিত হইত না, **অতএব** চিত্ত-মধ্যে এই অতুল উপকারকে যাবজ্জীবন জাগরূক রাখিয়া তাহার কৃপামূল্যে বিক্রীত থাকিলাম।

[বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ২০ সংখ্যা ৩ ১৩৭০ মাঘ-চৈত্র]

কিন্তু অক্ষয়কুমার-সম্পাদিত 'বিদ্যাদর্শন'-এর উদ্ধৃতিটি ও 'ভূগোল'-এর এই উদ্ধৃতি একসঙ্গে বিচার করলে অক্ষয়কুমারের যতিব্যবহারের নূতনত্ব স্পষ্ট হয়। এই দুটি উদাহরণেই অক্ষয়কুমার দাঁড়িব্যবহারে কিছুটা অনিশ্চিত। সংযোজক পদের দ্বারা দুই বা ততোধিক বাক্যের সংযোজন, আর দাঁড়ি চিহ্নকে, তিনি যেন পরস্পর-বিরোধী ভাবছেন। তেমন ক্ষেত্রে তিনি দাঁড়ি ব্যবহার করেন নি। যদিও ইতি-

পূর্বেই সংযোজকপদে দাঁড়ি ব্যবহার দেখা যায়। প্রথম উদাহরণের তৃতীয় প্যারায় প্রথম বাক্যে 'থাকি'-র দাঁড়িচিহ্ন স্টাইলের দিক থেকেই কিছুটা প্রয়োজনীয় ঠেকে। দ্বিতীয় উদাহরণে 'অপ্রকটিত ছিল'-র পরে দাঁড়ি তো প্রায় অপরিহার্য। আসলে অক্ষয়কুমারের এই প্রাথমিক চেষ্টায় দাঁড়ির চাইতে অন্যচিহ্নের ব্যবহারই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম উদাহরণে প্রথমে ব্র্যাকেট দিয়ে উদ্ধৃতি বুঝিয়ে তিনি রচনা শুরু করেন। তারপর রচনায় বাক্যের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে যতিচিহ্নকে এক করে দেন। তাই প্রতিটি সমাপিকা ক্রিয়া কোনো-না-কোনো যতিচিহ্নে, প্রধানত কমায়, চিহ্নিত। প্রথম ও দ্বিতীয় দুটি উদাহরণ সম্পর্কেই এই কথা বলা চলে। প্রথম উদাহরণটিতে একটি জায়গায় সমাপিকা ক্রিয়া লুপ্ত আছে ("উভয়েরি তুল্য সঙ্খ্যা [হয়]")।

অক্ষয়কুমারের সম্পাদনায় 'বিদ্যাদর্শন'-এর ছয়টি সংখ্যামাত্র প্রকাশিত হয়। বিদ্যাদর্শনের আরো কিছু উদাহরণ পরীক্ষা করলে পরবর্তী তত্ত্ববোধিনীর নতুনত্বের সঙ্গে তার তুলনা করা সম্ভব। কিন্তু এই প্রাথমিক সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করে একটি সিদ্ধান্ত অন্তত করা যায়। বাংলা গদ্যের উদ্ভবের ইতিহাসই বাংলায় যতিচিহ্ন ব্যবহারের রীতিপ্রতিষ্ঠার পথে সকলের চেয়ে বড় বাধা ছিল। আমাদের ভাষায় সামাজিক প্রয়োজনে জনসংযোগের দায়ে উদ্ভূত গদ্যের যুক্তিশৃঙ্খলা ও গড়নের ভিতর থেকে যতিচিহ্নের ব্যবহার অনিবার্যভাবে বেরিয়ে আসে নি। যতিচিহ্ন গদ্যের ওতপ্রোত উপকরণ হয়ে না উঠে, গদ্যশৈলীর বিপরীতে চলে যায়। যতিচিহ্ন সম্পর্কে রামমোহন রায়ের ব্যাখ্যা বাংলা গদ্যের সংখ্যাগুরু লেখকদের প্রভাবিত করতে পারে নি। তার কারণ, সেখানে বিরতির প্রয়োজন ও কী কী ভাবে বিরতি গ্রহণ করতে হয় ব্যাখ্যাত হয়েছে বটে কিন্তু সেই প্রয়োজন ও স্থাননির্ণয়ের কোনো সূত্র নেই—লেখককে নিজের ব্যক্তিগত বিচারের ওপর নির্ভর করতে হয়। অক্ষয়কুমারই প্রথম বাক্যের গড়নের ভিতর যতিচিহ্নকে নির্দিষ্ট করলেন। এক-একটি ক্রিয়া বাক্যের এক-একটি প্রধান অংশ। এই প্রধান অংশের স্বাতন্ত্র্য এতই প্রকট যে এই অংশ সম্পূর্ণ পৃথক একটি বাক্য হয়ে যেতে পারে বা অন্য এক বা একাধিক বাক্যের সঙ্গে যুক্তও হতে পারে। এই প্রাধান্যকে চিহ্নিত করলে যতিচিহ্নের দ্বারা বাক্যের গড়নটিই স্পষ্ট হবে। গড়নটি স্পষ্ট হলে বাক্যের অর্থও পরিষ্কার হবে। সুতরাং একটি সমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে একটি যতিচিহ্ন থাকবে, প্রধানত কমা।

যতির স্থান নির্ণয়ের এই পদ্ধতি ব্যবহারিক ভিত্তি হিশেবে কার্যকর।

সমাপিকা ক্রিয়া দিয়ে বাক্যকে প্রধান অংশে ভাগ করার এই নীতির ফলে কোন্ সমাপিকা ক্রিয়াকে 'দাঁড়ি' চিহ্ন দেয়ার জায়গা হিশেবে বেছে নেয়া হবে সে-নিয়ে খানিকটা দ্বিধা ও অনিশ্চয়তা এই প্রাথমিক পর্বে থাকতে পারে। বিশেষত দাঁড়ি যেমন ক্রিয়াসম্পাদনের সংকেত দেয়, তেমনি আবার একটি প্রসঙ্গে শেষ হওয়ারও সংকেত দিতে পারে। প্রসঙ্গান্তরের চিহ্ন হিশেবে দাঁড়ির যে-ব্যবহার চলে আসছিল, অক্ষয়কুমার তাঁর রচনার প্রাথমিক পর্বে দাঁড়ি ব্যবহারে প্রধানত তাই অনুসরণ করেছেন।

২৪. বিদ্যাদর্শন। আষাঢ় ১৭৬৪ শক

এদেশীয় পুরুষেরা সম্পূর্ণ বিদ্যাধিকারি, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা যে কি জন্য তাহাতে বঞ্চিত তাহার কোন কারণ প্রত্যক্ষ **হয়** না। ভাল, স্ত্রীগণের বিদ্যায় অধিকার যদি পরমেশ্বরের অভিপ্রায় না **হইত**, তবে তিনি পশুদিগের জড়বুদ্ধির ন্যায় তাহারদিগের বুদ্ধিরও এ প্রকার নির্দ্দিষ্ট সীমা নির্ণয় করিয়া **দিতেন**, যে তাহা উল্লঙ্ঘন করা অসাধ্য **হইত**. এবং পশুরা যে রূপ অল্পকালের মধ্যে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ও আত্ম রক্ষার উপায় চিন্তাদি কতকগুলিন প্রয়োজনীয় ভাবের পরিপক্কতা প্রাপ্ত হইলে আর উন্নতির উপযুক্ত **হয়** না, সেই রূপ স্ত্রীলোকেরাও পশুগণের তুল্য নির্দ্দিষ্ট বুদ্ধিবিশিষ্ট হইলে কিয়দ্দিবসের মধ্যে নিজ স্বভাবের পরিণাম লব্ধ করিয়া যাবৎকাল সমতাবস্থায় **থাকিতেন**, যাহা প্রত্যক্ষের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ।

উক্ত বিষয় বিস্তারিতরূপে, এবং নিঃসন্দেহের সহিত ব্যাখ্যা করণের জন্য এস্থলে এই বক্তব্য, যে দর্শন ও শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়বোধ, স্মরণ, চিন্তন, ও তুলনাদির বুদ্ধি, শক্তি, এবং সুখ, দুঃখ প্রেম ঘৃণা আশা, ক্রোধাদি চিত্তবিকার ইত্যাদি সমুদয় বিদ্যার উপযোগি যে মনের কার্য্য তাহা কি পুরুষ, কি স্ত্রী, উভয় জাতিতেই এ প্রকার সমান রূপে প্রত্যক্ষ **হইতেছে**, যে উভয়ের পক্ষেই সমূহ জ্ঞানশিক্ষা ব্যতীত এই সংসার মধ্যে কালযাপন করা অসাধ্য। পরমেশ্বর এই সকল জ্ঞান জনক রত্নে পৃথিবীস্থ লোকদিগকে ভূষিত করিয়াও কৃপাবিতরণে, এবং স্বাভিপ্রায় প্রকাশে ক্ষান্ত **হয়েন** নাই। তিনি আমাদিগের মনোমধ্যে যে এক জ্ঞানৈষা, অর্থাৎ জ্ঞানের বাঞ্ছা করিয়া **দিয়াছেন**, যাহার দ্বারা আমরা স্বচেষ্টায় নানা প্রকার বিদ্যাভ্যাসে উৎসাহি হই, সেই জ্ঞানৈষা স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিতেই সমান। বালিকাদিগের অন্তঃকরণ উপন্যাসাদি শ্রবণে আশ্চর্য্য ব্যগ্রতার সহিত যেন উড্ডীয়মান হইতে থাকে, এবং বক্তা ইতিহাস কথন কালীন হঠাৎ নিস্তব্ধ হইলে উৎকণ্ঠা, এবং ক্ষোভের সঙ্গে সাক্ষাৎ **করে**। কোন স্ত্রীকে এক প্রহেলিকার

প্রশ্ন করিলে তাহার মীমাংসা জন্য তিনি দিবানিশি উৎকণ্ঠিতা রহেন। যাঁহারা কিঞ্চিমাত্র দেশের অবস্থা জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন, যে ইদানীং অনেকানেক পরিবারস্থ বিশেষ বিশেষ রমণী বিদ্যাশিক্ষার দৃঢ় প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও শুদ্ধ স্বীয় জ্ঞানাভিলাষ প্রযুক্ত স্বয়ং যত্নশীলা হইয়া যথাসাধ্য বিদ্যাভ্যাস করিতেছেন।
[সা. বা. স. ৩ । ৫৭৬]

এই অংশটিতে প্রতিটি সমাপিয়া ক্রিয়া কমা বা দাঁড়িচিহ্নে চিহ্নিত। এমন-কি যেখানে ক্রিয়া উচ্চারিত নয়, সেখানেও যতিচিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে—"যাহা প্রত্যক্ষের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ", "এই সংসার মধ্যে কালযাপন করা অসাধ্য", সেই "জ্ঞানৈষা স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিতেই সমান"। ফলে বাক্যের অন্তর্গত রুজগুলি বাক্যের ভিতর প্রয়োজনীয় স্বাতন্ত্র্য পায়। সেই স্বাতন্ত্র্যের ফলে বাক্যের অর্থ পরিষ্কার হয় আর বাক্যের ভিতর এই বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের রুজ এক বিশেষ ধরনের বাক্যস্পন্দ সঞ্চারিত করে দিতে পারে। দ্বিতীয় প্যারাটিতে "দর্শন ও শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়বোধ", "স্মরণ, চিন্তন, ও তুলনাদির বুদ্ধি শক্তি", "সুখ, দুঃখ, প্রেম ঘৃণা আশা, ক্রোধাদি চিত্তবিকার"—এই তিনটি অংশের 'ইন্দ্রিয়বোধ' 'বুদ্ধিশক্তি' 'চিত্তবিকার' এই তিনটি পদের বিশ্লেষণাত্মক অংশগুলি কমাচিহ্নের দ্বারা লেখক এমনভাবে আলাদা করেছেন যে পড়ার সময় একটা বাক্যস্পন্দ লক্ষ করা যায়। মনে হয় না যে এই বাক্যস্পন্দ কোনো সচেতন চেষ্টার ফল। কিন্তু বাক্যের গড়নের সঙ্গে যতিব্যবহারকে যুক্ত করতে পারলে এই বাক্যস্পন্দ খুব স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়। অক্ষয়কুমারের গদ্যে সচেতন যতি-ব্যবহারের এই ফল ফলতে শুরু করেছিল।

অংশটিতে দ্বিতীয় প্যারায় দাঁড়ি ব্যবহার একই সঙ্গে প্রসঙ্গনির্দেশ করছে আবার প্রসঙ্গের ভিতরের অনুপ্রসঙ্গও নির্দেশ করছে। প্রথম প্যারায় দ্বিতীয় দাঁড়িটি মাঝখানে "এবং" এই সংযোজক অব্যয়ের ফলে বিলম্বিত হয়েছে। কিন্তু প্রথম বাক্যটি অনেক ছোট বলে ও দ্বিতীয় বাক্যটি "ভাল" এই কথা বলার ভঙ্গিতে শুরু হওয়াতে বাক্যের এই দীর্ঘতা গদ্যের প্রবহমাণতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না।

অংশটিতে ক্রিয়াপদ বাদ দিয়েও কতকগুলি জায়গাতে কমা চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। তার প্রধান উদ্দেশ্য, বহুকর্তাবিশিষ্ট বাক্যের কর্তাগুলিকে, বা অন্যত্র প্রসঙ্গত আসা বহু নামপদকে, পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র রাখা।

২৫. বিদ্যাদর্শন। কার্তিক ১৭৬৪ শক

এই পত্র:প্রেরিকা বেশ্যা বা অন্য যে কোন ব্যক্তি হউন, তাহাতে আমারদিগের কোন আপত্তি নাই। আমরা ব্যক্তির:প্রতি লক্ষ্য করি না তাঁহার যুক্তি এবং

অভিপ্রায়ের প্রতিই দৃষ্টি রাখি। মনোযোগের সহিত এই পত্র পাঠ করিলে বিবেচক মনুষ্য দেশের নানা কু-প্রথা এবং তাহার দেদীপ্যমান ঘৃণিত ফল একত্র সন্দর্শন করিতে পারিবেন।

আমরা পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি যে এদেশে কৌলীন্য প্রথার সমাদর থাকাতে অশেষ প্রকার কুকর্ম্মের ঘটনা হইতেছে। এইক্ষণে দেশীয় ব্যক্তিগণ তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করুন, যাঁহারা স্বয়ং দুষ্কর্ম্মের আলোচনা করেন, তাঁহারদিগের চেতনা হইয়াছে তাঁহারাই সাধারণ সমাজের উপদেশ জন্য আপন দোষ পর্য্যন্তও বিজ্ঞাপন করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন, অতএব এরূপ সুযোগের সময়ে আমরা একান্ত অন্তঃকরণে গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, এবং দেশস্থ মনুষ্য-বর্গকে অনুরোধ করিতেছি, যে তাহারা বহুবিবাহের নিবৃত্তি জন্য দৃঢ় চেষ্টা করুন, আমরাও তাঁহারদিগের অগ্র হইতে প্রস্তুত আছি।

অপর পত্র প্রেরিকা যে স্বামীর সহিত মনের অনৈক্য এই শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে কিঞ্চিদ্বিবেচনা করা আবশ্যক। দম্পতি কলহের নানা কারণ মধ্যে এক বিষয় অতি স্পষ্টভাবে আমারদিগের প্রত্যক্ষ হইতেছে। এদেশের এক কুরীতি আছে যে দম্পতি পরস্পর আপন ইচ্ছাক্রমে স্বামি বা স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারেন না। পিতা বা মাতা, বা ভ্রাতা ইত্যাদি ব্যক্তি বিবাহের পাত্র বা পাত্রী নিশ্চয় করেন, এবং সেই নির্ণয়ানুসারে পাণিগ্রহণ সম্পন্ন হয়। কিন্তু ইহার অপেক্ষা আর আশ্চর্য্যতর প্রথা কি আছে? যাহার সহিত চিরকাল এক শরীরের ন্যায় সংযুক্ত রহিতে হয়, যাহার গুণের প্রতি জীবনের অধিক সুখ নির্ভর করে, যাহার চরিত্র কিঞ্চিন্মাত্র দোষান্বিত হইলে সংসারের সমুদয় আনন্দ একেবারে বিষাক্ত হয় যে ব্যক্তি সকল পরামর্শ এবং সকল যুক্তির অধিকারী এবং যাহার নিকটেই প্রত্যেক বিষয় গোপনের অযোগ্য, এবম্প্রকার স্ত্রী বা স্বামি গ্রহণের ভার যে পরের প্রতি অর্পণ হয়, ইহা কি আক্ষেপের বিষয়। আমরা সাহসের সহিত বলিতে পারি যে ইহাতেই দম্পতি কলহের বীজ রোপণ হয়।

[সা. বা. স. ৩। ৫৭২-৭৩]

— এই অংশটিতে দাঁড়ির ব্যবহার অপেক্ষাকৃত বেশি ও সমাপিকা ক্রিয়ামাত্রেই 'কমার'দ্বারা চিহ্নিত নয়, ফলে কমার ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম।

প্রথম ও তৃতীয় প্যারায় লক্ষ করা যায়, 'যে' এই সাপেক্ষ সর্বনামের ওপর নির্ভর-শীল বাক্যকে সব সময় কমা দ্বারা চিহ্নিত করা হয় নি। এর ফলে অবশ্য উপান্ত্য বাক্যটিতে একটি জায়গায় এই কমা ব্যবহার না করাটা বাক্যটির পক্ষে ক্ষতিকারক।

কিন্তু দ্বিতীয় প্যারাটির প্রথম বাক্য জটিল অথচ সংক্ষিপ্ত। তার পর লেখক একটি দীর্ঘ বাক্যের শেষে, একটিমাত্র দাঁড়ি ব্যবহার করেছেন। এই দীর্ঘ বাক্যটিতে 'অতএব-'এর আগে একটি দাঁড়ি প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু লেখক বাক্যটিকে এমন এক সম্বোধনের ভঙ্গিতে শুরু করেন যে একেবারে শেষ পর্যন্ত বলাটা যেন তাঁর পক্ষে আবশ্যিক হয়ে ওঠে। অর্থাৎ এ-ক্ষেত্রে বাক্যের গড়ন ও ন্যায়ের চাইতে সম্বোধনের কণ্ঠভঙ্গিই যতিস্থাপনকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

একজন বেশ্যারমণী সম্পাদককে একটি চিঠি লেখায় সম্পাদক সেই চিঠির সূত্রে তাঁর বক্তব্য প্রতিপাদনে এতটাই ব্যগ্র হয়ে ওঠেন যে তাঁর কাছে বাক্যের শৃঙ্খলার চাইতে আবেগের প্রকাশ প্রাধান্য পায়। সেই কারণেই এই বাক্যটি দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও এবং এর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন গড়নের বাক্যাংশ থাকলেও লেখকের আবেগের সংক্রমণ ঘটায় বাক্যটি গদ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রবহমাণতায় চলিষ্ণু হয়ে ওঠে। অর্থাৎ এ-ক্ষেত্রে লেখকের আবেগসংগতিও যতিস্থাপনকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করছে। তৃতীয় প্যারার উপান্ত্য বাক্যটিও এই আবেগনিয়ন্ত্রিত বাক্যের উদাহরণ। ফলে ঐ দীর্ঘ বাক্যের পর একেবারে শেষে ঐ রকম একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য রচনাটির ভিতর নাটকীয়তা এনে দেয়।

২৬. বিদ্যাদর্শন। ভাদ্র ১৭৬৪ শক

রাজা রামমোহন রায় অতি উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ বংশে উদ্ভব **হইয়াছিলেন,** তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা মঙ্গলরাজার অধীনে অতিশয় মর্য্যাদাবান কর্ম্মে অভিষিক্ত **হইয়াছিলেন,** এবং তাঁহার পিতামহ মুরশীদাবাদের রাজসভায় অনেক সম্ভ্রান্ত পদ ধারণ **করিয়াছিলেন**। তাঁহার শেষাবস্থায় কিঞ্চিৎ মানের ত্রুটি হওয়াতে তৎপুত্র রামকান্ত রায় জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি রাধানগরে আসিয়া বসতি **করিলেন**। এইস্থানে আমারদিগের দেশোজ্জ্বলকারী রামমোহন রায় বাং ১১৮৭ সালে জন্মগ্রহণ **করিয়াছিলেন**।

তিনি সাধারণ রীত্যনুসারে বঙ্গভাষায় উপদেশ প্রাপ্ত হইলে, আপন পিতার অভিলাষ ও পিতৃব্যাদির কৌশল দ্বারা পারস্যভাষা অভ্যাস করণের নিমিত্তে পাটনায় স্থাপিত **হয়েন**; যেহেতু তৎকালে কথিত ভাষার নিপুণতা ব্যতীত এদেশে রাজকীয় কর্ম্ম লব্ধ **হইত** না। তার মাতামহ কুলের রীতিক্রমে তিনি সংস্কৃত শিক্ষা ও হিন্দুদিগের বিজ্ঞান শাস্ত্র অনুশীলন করিতে অভিরত **হইলেন**।

বাল্যকালে তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মে অত্যন্ত আসক্ত **ছিলেন,** এবং তাহাতে তাঁহার এ প্রকার দৃঢ়বিশ্বাস ও অচলাভক্তি **ছিল,** প্রতি দিবস শ্রীমদ্ভাগবতের

এক অধ্যায় পাঠ না করিয়া জল গ্রহণ **করিতেন** না। কিন্তু রামমোহন রায়ের প্রবল, সুতীক্ষ্ণ এবং ধারণাবতীবুদ্ধি অবিলম্বে পূর্ব্বসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া সকল বিষয়ের সদসদ্বিচার আরম্ভ **করিল,** বিশেষতঃ আরব ভাষায় ইউক্লিড ও এরিষ্টটল নাম দুই পণ্ডিতের গ্রন্থ পাঠ দ্বারা অধিকতর পরিষ্কৃত, এবং যেন আলোক প্রাপ্ত **হইল**।

তৎকালে যদিও তাঁহার বয়ঃক্রম অত্যল্প, তথাপি তিনি আপন ধর্ম্মের সত্যাসত্য বিবেচনা করিতে **লাগিলেন,** এবং দৃষ্টি **করিলেন** যে প্রচলিত [প্রকৃত] হিন্দুধর্ম্ম অন্ধকারে আবৃত **হইয়াছে,** এবং ভ্রমের সহিত সংযুক্ত **রহিয়াছে**। তিনি **কহেন** যে 'আমি যখন ষোড়শ বৎসর বয়স্ক, তখন হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্মের বিরোধে এক হস্তলিপি প্রস্তুত **করিয়াছিলাম**। এই লিপি এবং অস্মদভিপ্রায় অনেকের নিকটে প্রকাশ হওয়াতে প্রিয়তম আত্মীয় ব্যক্তির সহিত আমার কিঞ্চৎ ভাবের অন্যথা **হইল**; অতএব আমি ভ্রমণে প্রবৃত্ত **হইলাম**।"

[সা. বা. স. ৩। ৫৬০]

পূর্ববর্তী উদাহরণগুলির ভিতর দিয়ে যতিব্যবহারের ক্ষেত্রে অক্ষয়কুমারের কতকগুলি প্রবণতা স্পষ্ট হয়। তিনি সমাপিকা ক্রিয়াকে বাক্যের এক-একটি ইউনিট ধরে, কমা চিহ্ন দিয়েছেন, প্রথমদিকে দাঁড়িব্যবহারে তাঁর কিছুটা অনিশ্চিয়তা ছিল, আবার সমাপিকা ক্রিয়াঅতিরিক্ত কমাও তিনি যথেষ্ট ব্যবহার করেন ও সমাপিকা ক্রিয়া হলেই যতি ব্যবহার করতে হবে এই রীতিরও নমনীয় পরিবর্তন ঘটান। তাঁর বাক্যগঠনে কণ্ঠস্বরের ভঙ্গি লক্ষ করা যায়। সেই ভঙ্গি যতিবিন্যাসকে প্রভাবিত করেছে। আবার কোথাও তিনি বিষয়ের সঙ্গে আবেগ-সংহতি লাভ করেন—সেখানে সেই আবেগ-সংহতি যতিব্যবহারকে প্রভাবিত করে।

আলোচ্য অংশটিকে এই প্রবণতাগুলির সমন্বয়ের উদাহরণ হিশেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। অংশটিতে মাত্র ৭ বার অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে—'হওয়াতে', 'আসিয়া', 'হইলে', 'করিতে', 'করিয়া', হইয়া', 'হওয়াতে'। এর ভিতর মাত্র প্রথম দুইটি অসমাপিকা একটি বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে। আর-কোনো বাক্যে দুটি অসমাপিকা ক্রিয়া নেই। ফলে বাক্যগুলির গড়ন অপেক্ষাকৃত সরল।

যতিচিহ্নের ব্যবহারে বাক্যের অন্তর্গত ইউনিট চিহ্নিত হয়ে যায় বলে বাক্য এই গড়নের সরলতা পেতে পারে। এই সরল গড়ন আবার বাক্যে দাঁড়িচিহ্নের

ব্যবহারও অনেক সহজ করে ফেলে। মাত্র এইটুকু একটি রচনাংশও ৪টি প্যারায় বিভক্ত। প্রথম প্যারায় দাঁড়ি ব্যবহৃত হয়েছে ৩ বার, দ্বিতীয় প্যারায় ২ বার, তৃতীয় প্যারায় ২ বার, চতুর্থ প্যারায় ৩ বার। রচনাটিতে দ্বিতীয় প্যারায় ১ বার ও চতুর্থ প্যারায় ১ বার সেমিকোলন ব্যবহৃত হয়েছে—উভয়ক্ষেত্রেই হেত্বর্থক ক্লজটি পরে আসায়। কমা প্রায় সর্বত্রই ক্রিয়ানির্ভর—'যে' সর্বনামের পর কমা ব্যবহার করা হয় নি।

মাত্র ছয়-সংখ্যা-স্থায়ী 'বিদ্যাদর্শন'-এর পাতাতেই অক্ষয়কুমার বাংলায় সংবাদ-সাময়িকপত্রের গদ্যের যতিচিহ্নব্যবহারের একটি গ্রহণযোগ্য রীতি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। অসমাপিকা ক্রিয়া, সাপেক্ষ সর্বনাম, ও সংযোজক অব্যয়ের সঙ্গে কমার ব্যবহার অক্ষয়কুমার অংশত পরিহার করেছিলেন। আবার অংশত রক্ষাও করেছিলেন। বস্তুত এই ব্যবহার ও পরিহার গদ্যরচনার ভিতরের ছন্দ ও গড়নের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অক্ষয়কুমার যতিব্যবহারকে গদ্যের গড়নের একটি উপাদানে পরিণত করেন। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র গদ্যে তাই যতিচিহ্ন বাইরের একটি উপকরণের মতো বিশ্লেষণযোগ্য নয়, গদ্যের স্টাইলেরই একটি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ নির্দেশক। প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ফলে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র গদ্যরীতি ও তারই অন্তর্গত যতিব্যবহাররীতি বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। প্রথমে 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকার ও পরে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক হিশেবে অক্ষয়কুমারই সেই প্রভাবের প্রধান উৎস। তাই 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র গদ্য ও যতিস্থাপন রীতি বস্তুত 'বিদ্যাদর্শন'-এ অক্ষয়কুমার যে-চর্চার সূত্রপাত করেন, তারই সম্প্রসারণ। যদিও তত্ত্ববোধিনীতে বিষয়ের বৈচিত্র্য গদ্যশৈলীরও বৈচিত্র্য ঘটিয়েছে। যতিবিন্যাসের বৈচিত্র্য গদ্যশৈলীর বৈচিত্র্যের অঙ্গাঙ্গী।

২৭. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। ১ শ্রাবণ ১৭৬৮ শক (১৮৪৬ খৃ.)

> বালুময় উত্তপ্ত মরু ভূমি ভ্রমণ পূর্ব্বক ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া সম্মুখে কোন নিবিড় কানন দৃষ্টি করিলে মনে অত্যন্ত আহ্লাদ জন্মে; কিন্তু তাহাতে প্রবেশ করিয়া যদি কেবল কতকগুলীন নিষ্ফল কণ্টকি বৃক্ষ এবং শুষ্ক অথবা পঙ্ক পূরিত সরোবর দেখা যায়, তবে কি প্রকার নিরাশ হইতে হয়। তদ্রূপ কোন গ্রামবাসী স্বদেশের হিতৈষী বিজ্ঞ ও সুচরিত্র ব্যক্তি স্বযদ্বয় পল্লীগ্রামের বিষম দুরবস্থা জন্য বিষণ্ণ হইয়া, কলিকাতার বাহ্য শোভা এবং তত্রস্থ লোকের নানা হিতজনক বিষয়ে মৌখিক আন্দোলন অবগতিপূর্ব্বক অতিশয় আনন্দিত হয়েন, কিন্তু তাহারদিগের আচার, ব্যবহার, চরিত্র বিষয়ে যত নিগূঢ় রূপে অনুসন্ধান

করেন, ক্রমশঃ ততই ক্ষুব্ধ হইতে থাকেন। বৃদ্ধ যুবা বালক, ধনী মধ্যবর্ত্তী দরিদ্র, ইহারদিগের মধ্যে কাহারও প্রতি দৃষ্টি করিয়া তিনি পরিতোষ প্রাপ্ত হয়েন না।

[সা. বা. স. ২। ৯৬-৯৭]

অংশটিতে কোথায়-কোথায় যতি চিহ্ন দেয়া হয়নি তার কতকগুলি বিশেষ স্থান আছে। কোনো কোনো অসমাপিকায় কমা দেয়া হয় নি। কিন্তু যেখানে প্রসঙ্গান্তর ঘটেছে, দ্বিতীয় বাক্যে, সেখানে দেয়া হয়েছে। বিশেষণগুলিকে কমাচিহ্নিত করা হয় নি কিন্তু শেষ বাক্যে তাদের এক-একটি গুচ্ছকে করা হয়েছে। অব্যয় কর্তৃক সংযুক্ত দুইটি বাক্যের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দাবি সম্পর্কে অনিশ্চয়তা আছে। তাই প্রথম বাক্যে সেমিকোলন ও 'কিন্তু' একই সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। বিস্ময়চিহ্ন ব্যবহারের ফলে রচনার ভিতর কণ্ঠস্বরের প্রবেশ ঘটে। এর পরের প্যারাটিতে বাক্যের গড়ন পালটায় ও সঙ্গে-সঙ্গে যতিচিহ্নের ব্যবহারও।

এইক্ষণকার প্রাচীন লোক এবং প্রাচীনদিগের সম্পূর্ণ মতানুগামি যাঁহারা,— বিষয়োপযোগী হস্তলিপি এবং কিঞ্চিৎ অঙ্কপাত মাত্র যাঁহারদিগের বিদ্যার সীমা, এবং যাঁহারদিগের এই প্রত্যয় যে কেবল অর্থ উপার্জ্জনই সমুদয় বিদ্যার তাৎপর্য্য ও তাবৎ জীবনের সুখ—স্বদেশের মঙ্গলামঙ্গল তাঁহারা চিন্তাই করেন না—"দেশের উপকার" এ বাক্যের অর্থও তাঁহাদিগের সম্যক হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাঁহারা কেবল স্বার্থের প্রতিই দৃষ্টি রাখেন—এই সীমাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া এক পাদও অগ্রসর হয়েন না—সৎ বা অসৎ যে উপায় দ্বারা হউক ধন সঞ্চয় করিয়া তাহা পুত্র-পৌত্রাদির নিমিত্তে রক্ষা করিতে পারিলেই আপনারদিগকে কৃতকার্য্য বোধ করেন। ইহার জন্যই দিবারাত্রি ব্যতিব্যস্ত ; এ কর্ম্মের সমাধা পরে সে কিঞ্চিৎকাল অবশিষ্ট থাকে, তাহা প্রায় অলীক আমোদেই ক্ষেপণ করেন। ইহাঁরদিগের মধ্যে যাঁহারা আপনারদিগকে ধার্ম্মিক বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা বাল্যক্রীড়ার ন্যায় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। বিষয় সম্পত্তি লাভের আশ্বাসের সহিত আমোদ সম্ভোগ এবং সুখ্যাতির আকাঙ্ক্ষা তাঁহারদিগের ধর্ম্ম প্রবৃত্তির প্রধান সূত্র ; নতুবা প্রতিমা অর্চ্চনাতে নৃত্য, গীত, গৃহসজ্জা প্রভৃতির জন্যেই বিশেষ মনোযোগি হইয়া প্রচুর অর্থ ব্যয় অনেকে কেন করেন ?…

[সা. বা. স. ২। ৯৭]

অংশটিতে ৬টি কমার ভিতর শেষ ২টি ব্যবহৃত হয়েছে একই প্রসঙ্গে উল্লেখিত

শব্দগুলির পার্থক্য বোঝাতে, মাঝখানে ২টি ব্যবহৃত হয়েছে অপেক্ষাকৃত ছোট বাক্যের ক্লজ নির্দেশে। কিন্তু প্রথম ২টি ব্যবহৃত হয়েছে যথাক্রমে ড্যাশ ও 'এবং'-এর সঙ্গে—আধুনিক বিচারে এই দুটি ব্যবহারই অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু এই অংশটির প্রধান বৈশিষ্ট্য, ড্যাশ দিয়ে বাক্যের অন্তর্গত দীর্ঘ ক্লজকে পৃথক করে বাক্যের ভিতর সংহতি আনা। এই সংহতি স্বভাবতই কোনো রীতির অন্ধ অনুসরণে আসে না। তাই প্রসঙ্গনির্দেশের নিরিখে এই প্যারার দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্যেরই অন্তর্গত। কিন্তু বাংলা গদ্যের নিজস্ব ধরতাইয়ে সাপেক্ষ সর্বনামের 'যাঁহারা' একবার উচ্চারিত হলে, তার ওপর নির্ভরশীল 'তাঁহারা' দিয়ে নতুন বাক্যও রচিত হতে পারে। এই অংশটির প্রথম বাক্যে যতিস্থাপন রীতিকে যেমন অত্যন্ত শৃঙ্খলার সঙ্গে অনুসরণ করা হয়েছে, দ্বিতীয় বাক্যটিতে তেমনি আবার খানিকটা স্বাধীনতাও নেয়া হয়েছে। ঠিক তেমনি স্বাধীনতাই নেয়া হয়েছে শেষ বাক্যটিতে, 'তাঁহারদিগের' পদটির উপাধিনির্দেশ আছে তার পূর্ববর্তী বাক্যে। যতিব্যবহারের এই স্বাধীনতা আসলে বাংলা গদ্যেরই সাবালকতার প্রমাণ।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র একটি প্রধান অংশ ছিল তত্ত্ববোধিনী সভায় প্রদত্ত বক্তৃতার অনুলিখন। লিখে বক্তৃতা দেয়া আর বক্তৃতার অনুলিখনের ভিতর স্টাইলের গুরুতর পার্থক্য ঘটে। লিখিত বক্তৃতা স্টাইলগতভাবে লিখিত রচনাই কিন্তু বক্তৃতার অনুলিখন স্টাইলের দিক থেকে মানুষের কথা বলার অনেকটা কাছাকাছি যায়। যদিও ধরেই নেয়া যায় যে সেই সময় বক্তৃতা যখন লেখা হত তখন সেটা লিখিত প্রবন্ধের শৃঙ্খলাতেই বাঁধা হত, কিন্তু বিশেষত বাক্যগঠনে ও যতিবিন্যাসে বাচনের ভঙ্গি কিছু থাকতেও পারে।

২৮. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। ১ বৈশাখ ১৭৬৬ শক (১৮৪৪ খৃ.)

> যথা সাধ্য পরস্পর উপকার কর্ত্তব্য, যেহেতু পরস্পর সাহায্য ব্যতীত কোন কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয় না। এই সামান্য বস্ত্র যাহা আমরা প্রত্যহ পরিধান করি বিবিধ সহকারী বন্ধুগণ কর্ত্তৃক কৃত না হইলে প্রাপ্ত 'হইতাম' না। তন্তুকারকেরা কৃষি কর্ম্ম দ্বারা উৎপন্ন কার্পাস হইতে যন্ত্র দ্বারা তন্তু নির্ম্মাণ 'করে', বস্ত্রনির্ম্মাণ-কারকেরা সেই তন্তু দ্বারা বিবিধ যত্নে বস্ত্র প্রস্তুত 'করে'। এইরূপ সাহায্য দ্বারা ক্রমে ক্রমে সকল আহার্য্য ব্যবহার্য দ্রব্য আমরা প্রাপ্ত হই। এই পরস্পর সাহায্য শক্তি পরমেশ্বর কেবল মনুষ্যদিগকেই দিয়াছেন, এমত নহে; পশু পক্ষি কীট পতঙ্গ প্রভৃতি চেতনাচেতন সকল বস্তুতেই পরস্পর সাহায্য করিবার যোগ্যতা 'দিয়াছেন'। এই পরস্পর সাহায্য শক্তি না থাকিলে পৃথিবীর কোন

কর্ম্মই সম্পন্ন হইত 'না'। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মধুমক্ষিকারা পরস্পর সহকারে যে অত্যাশ্চর্য্য গৃহ নির্ম্মাণ 'করে' তাহা কোন প্রকারে একটি মধুমক্ষিকা দ্বারা সম্পন্ন হইতে 'পারে না'। এই সমুদয় সৃষ্টির প্রত্যেক পরমাণু পরস্পর আকর্ষণ দ্বারা যদ্রূপ পরস্পরকে আশ্রয় দিতেছে তাহা না দিলে কোন প্রকারে সৃষ্টি রক্ষা হইতে 'পারে না'।

[সা. বা. স. ২। ৮৪]

২৯. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। ১ আশ্বিন ১৭৬৬ শক (১৮৪৪ খৃ.)

বাণিজ্য দ্বারা লোকের যাদৃশ উপকার হইতেছে, তাহা এই সভার মধ্যে কে না জ্ঞাত আছেন? বণিকেরা নানা পরিশ্রমে বিবিধ দেশের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব নির্ণয় করিয়া তত্তৎ অভাব মোচনার্থে বিবিধ প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করিতে সাধ্যমতো যত্নযুক্ত হইতেছেন; ইহাতে তাঁহারা স্বদেশের এবং বিদেশের উপকার একেবারেই করিতে সমর্থ হইতেছেন। প্রচুর শস্য ফলাদি এবং বিবিধ বস্ত্র ভূষণাদি জন্য স্বদেশীয় কৃষি এবং শিল্পকারি প্রভৃতিকে সর্ব্বদা প্রতিপালন এবং সেই সকল শস্য ফলাদি এবং বস্ত্র ভূষণাদি দেশদেশান্তরে উপযুক্ত মত বিতরণ করিয়া সর্ব্বসাধারণের সুখ বৃদ্ধি করিতেছেন। এই বণিক-দিগের প্রসাদে মহা মহা সমুদ্র পারে যে সকল উপাদেয় দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে, তাহা আমরা এই এক স্থানে বসিয়া প্রাপ্ত হইতেছি। এই যে সময়ে আমি বক্তৃতা করিতেছি, এই সময়েও কত দেশের কত বণিক্ আমারদিগের সুখ প্রদান নিমিত্ত ব্যস্ত হইতেছেন।

এই বণিকেরা সকলেই কি কেবল আমারদিগের সুখ চেষ্টা করিয়া বাণিজ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে? সমস্ত নাবিকেরাই কি আমারদিগের মঙ্গল ইচ্ছা করিয়া সমুদ্র তরঙ্গকে তুচ্ছ করিতেছে? ইহা কখনো সম্ভব নহে। প্রায় সমস্ত মনুষ্যই আপন আপন ধন, মান, যশঃ প্রভৃতির বৃদ্ধি আশায় পরিশ্রম করিতেছে। অধিকাংশ লোক কেবল ধনাদি সঞ্চয় কর্ম্মে এতাদৃশ ব্যগ্র, যে তাহারদিগের দ্বারা জনসাধারণের উপকার বা অপকার হইতেছে, ইহা তাহারা জানিবারও অবকাশ পায় না। পৃথিবীর মধ্যে অতি অল্প লোক আছেন, যাঁহারা কেবল সাধারণের উপকার ইচ্ছা করিয়া সকল কর্ম্ম সমাধা করেন। এই সাধারণের মঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তিরাই পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসক, এবং ইঁহারাই ধন্য।

যে ব্যক্তির কর্ম্ম দ্বারা এমত প্রকাশ পায় যে আমারদিগের সুখের নিমিত্তে তাঁহার ইচ্ছা আছে, সেই ব্যক্তির সহিতই আমারদিগের প্রীতি হয়,

তদ্ব্যতীত তাহার অন্য মানস থাকিলে তাহার সহিত প্রীতি হওয়া অসম্ভব। এতন্নিমিত্তে কোন আত্মীয় ভুবনে আহূত হইয়া তাঁহার বেতনভোগি গায়ক বাদকদিগের গীত বাদ্য শ্রবণে সেই গায়ক বাদকদিগের সহিত সংপ্রীতি হয় না, তাঁহারদিগের নিকটে বাধ্যও থাকি না, কারণ তাহারা আমারদিগের সুখেচ্ছা না করিয়া কেবল ধনাশ্বাসে গীত বাদ্য করে, কিন্তু প্রীতি সেই বন্ধুর সহিতই হয়, যিনি আমারদিগের সুখেচ্ছা করিয়া পরিশ্রম দ্বারা সেই গায়ক বাদকদিগকে আনয়ন করিয়াছেন, এবং তাঁহার নিকটই বাধ্য থাকি। এই প্রকার (যাঁহারা) কেবল পরোপকার জন্য পরিশ্রম করিতেছেন, তাঁহারা সকলেরই প্রিয় এবং সর্ব্বদা ধন্যবাদের যোগ্য হয়েন। যে ব্যক্তিরা কেবল ধনোপার্জ্জনে তৎপর, পৃথিবীর উপকার নিমিত্ত ক্ষণমাত্রও চিন্তা করে না, তাহারা আমারদিগের প্রিয়পাত্র এবং ধন্যবাদের যোগ্য কি প্রকারে হইতে পারে?

[সা. বা. স. ২। ৮৫]

দুটি বক্তৃতার ভাষাতেই স্টাইলের এমন বৈশিষ্ট্য আছে, যা লিখিত রচনা থেকে এদের আলাদা করে। বাক্যগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট। অধিকাংশ যুক্তিই তুলনার দ্বারা বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু সেই তুলনা বা দৃষ্টান্তকে নির্দিষ্ট প্রসঙ্গের বাইরে সম্প্রসারিত করা হয় নি। বাক্যগুলি এমনভাবে গঠিত যে শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়ার স্বাভাবিক গতিতে এগুলি উচ্চারিত হতে পারে। তাই ঘনঘন দাঁড়ি ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে বাক্যগঠন ও যতিস্থাপন পরস্পর নির্ভরশীল। তুলনামূলক ভাবে অন্য যতিচিহ্নের ব্যবহার কম (প্রথম উদাহরণে ১টি কমা ও ১টি সেমিকোলন, দ্বিতীয় উদাহরণে ১৩টি কমা ও ১টি সেমিকোলন), দাঁড়ির সমতুল্য প্রশ্নচিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয় উদাহরণের শেষ প্যারাটিতে তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ একটি বাক্য আছে। কিন্তু বাক্যটির ভিতর 'কিন্তু' শব্দটির আগে দাঁড়ি দিয়ে বাক্যটিকে ভাগ করার সুযোগ থাকলেও লেখক সেখানে দাঁড়ি দেন নি। না দেয়া সত্ত্বেও প্রতিটি ক্রিয়াকে কমাচিহ্নিত করে দাঁড়িতে পৌঁছলে, বাক্যের জটিলতার চাইতে, ছোট বাক্যের পর ছোটবাক্য উচ্চারণে কণ্ঠস্বরের প্রবাহ ও প্রসঙ্গের ধারাবাহিকতা প্রকাশ পায়।

দুটি উদাহরণেই হেত্বর্থকপদ বা সাপেক্ষ সর্বনামকে আশ্রয় করে বাক্যগুলি নির্মিত হয়েছে। প্রথম উদাহরণে মোট ৮টি বাক্যের ভিতর ৫টি বাক্যই এ-রকম; দ্বিতীয় উদাহরণে এই সংখ্যা ১৪টির ভিতর ১০টি। কিন্তু দ্বিতীয় উদাহরণের শেষ প্যারা বাদ দিলে সর্বত্রই একটি মাত্র হেতুবাচক পদ বা একটিমাত্র সাপেক্ষ পদের

ওপর ক্রিয়া নির্ভরশীল। এটা বাংলাগদ্যের তখনকার নতুন রীতি। এর ফলে শর্ত বা হেতু যাই থাকুক বাক্যটি শেষ হয় গিয়ে দাঁড়িতে। এইভাবে বক্তৃতার বাক্য ইউনিট, লেখারও ইউনিট হয়ে ওঠে। এই ইউনিটকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় দাঁড়ি বা সমতুল্য চিহ্ন দিয়ে।

বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রের সাক্ষ্যে এ-কথা বলা চলে না যে নির্দিষ্টভাবে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাতেই এই ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় যে রচনাগুলি "বক্তৃতা" বলে উল্লেখিত, তার গড়ন অন্য রচনাগুলি থেকে আলাদা। এই পার্থক্য ধরা পড়ে যতিচিহ্নের ব্যবহারে। সুতরাং ভাষণের বাচন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র এক বিশেষ ধরনের রচনার যতিচিহ্নকে নিশ্চয়ই প্রভাবিত করেছিল। এ-বিষয়ে শ্রীশিশিরকুমার দাশ প্রথম আমাদের সচেতন করেন।[৪৪]

সংবাদ-সাময়িকপত্রে বাংলা গদ্যভাষার নিজস্ব রীতি নানা প্রয়াসের ভিতর দিয়ে একটা নির্দিষ্ট আকার পাচ্ছিল। বাংলাগদ্যের এই নিজস্বতা আবিষ্কারের প্রয়াস আর গদ্যে যতিচিহ্ন ব্যবহারের চেষ্টা একদিক থেকে একটিই চেষ্টা, আর-একদিক থেকে দুই স্বতন্ত্র চেষ্টা—অবশেষে একত্রিত।

গদ্যচর্চা আর যতিচিহ্ন ব্যবহার তো গদ্যভাষার নান্দনিক বিবর্তনে স্বতন্ত্র হওয়া সম্ভব নয়, আর যতদিন এই দুই চেষ্টায় স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে ততক্ষণ গদ্য তার সংহতি খুঁজে পায় না।

বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রে চেষ্টার এই স্বাতন্ত্র্যই দীর্ঘদিন ধরে চলে এসেছে। ইংরেজি সংস্কৃত আদর্শের দ্বন্দ্বই চেষ্টার এই স্বাতন্ত্র্যের কারণ। আদর্শের ক্ষেত্রে এই ফাঁক ছিল বলেই সাধুভাষার নামে এক কৃত্রিম অবাস্তব ভাষা সাহিত্যিক গদ্যের চেহারা নিয়েছে। শিল্প-বাণিজ্যের ও সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্র হিশেবে কলকাতা বাংলা ও ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হলেও সেই কলকাতার ভাষা তার শব্দভাণ্ডার ও বাচন নিয়ে আমাদের নতুন গদ্যভাষার পরিপূর্ণ আদর্শ হয়ে উঠতে পারল না। তাই গদ্যের উপকরণ বিন্যাসেই ব্যয়িত হয়ে গেল উনিশ শতকের প্রথম ৫০।৬০ বৎসর।[৪৫]

যতিব্যবহার তো গদ্যের ইতিহাসেরই ওতপ্রোত। তাই গদ্যে সমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার, অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার, সমাপিকার সাহায্যেও বাক্যের ক্লজ তৈরি করা, সাপেক্ষ বাক্য সত্ত্বেও বাক্যগঠনের সরলতা, আবার এককর্তৃক বাক্যেও বাক্যের জটিলতা, হেত্বর্থক ক্লজের সঙ্গে বাক্যের মূল অংশের সংগতি,

সংযোজক অব্যয় ও পদের ব্যবহার, বাক্যের সম্পূর্ণতার সীমা কি ব্যাকরণের দ্বারা নির্ধারিত ও যতিচিহ্নের দ্বারা সংকেতিত, নাকি প্রসঙ্গের সম্পূর্ণতার দ্বারা যতিচিহ্ননিরপেক্ষভাবে নির্ধারিত—এই সব সমস্যা সমাধানের সঙ্গে-সঙ্গেই দাঁড়ির ব্যবহারে পরিবর্তন, দাঁড়ির বিকল্পসন্ধান, কমা-সেমিকোলন-ড্যাশ ব্যবহারের স্থানসন্ধান চলেছে। সেই সন্ধান প্রথম দিকে অধিকাংশ সময়ই ঘটছে স্বতন্ত্রভাবে। আর 'বেঙ্গল স্পেকটেটর', 'বিদ্যাদর্শন', 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র মধ্য দিয়ে সেই সন্ধান গদ্যের স্বরূপসন্ধানের সঙ্গে মিলে গেছে।

কিন্তু অমিলের মূলও অনেক গভীরে ছিল। তাই ১৮৬০ পর্যন্ত, পত্রপত্রিকার গদ্যের অন্যান্য উপকরণবিন্যাস যখন সুশৃঙ্খল, বাংলা গদ্য যখন উপন্যাসের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, তখনো বাংলা যতিবিন্যাসে শৃঙ্খলা আসে নি, তখনো যতিবিন্যাস গদ্যরীতির ওতপ্রোত হয়ে ওঠে নি। প্রথমদিকে যেমন ছিল দাঁড়ির বাহুল্য, এই শেষ পর্বে তেমনি দেখা দিল কমার বাহুল্য। গদ্যের প্রবহমাণতার টানে দাঁড়ি যেন বাধা হয়ে ওঠে, কমার স্বল্পবিরতি যেন গদ্যকে নিয়ত প্রবাহিত রাখে। যতির যথার্থ ব্যবহারের রীতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও আমাদের বাক্যরচনায় অনভ্যস্ত থেকে যায়।

কিন্তু গদ্যের আদর্শ যখন স্থির হয়ে গেছে,—সুতরাং সেইসঙ্গে যতিবিন্যাসের রীতিও—তখন এই কমাবাহুল্য বা গদ্যের গড়নের সঙ্গতিহীন যতিব্যবহার গদ্যের গড়ন আর যতিবিন্যাসের ভিতরের কোনো অন্তর্গত বিরোধের প্রমাণ নয়, বরং যতিবিন্যাস গদ্যের যে বহুবিস্তারী লক্ষ ও চেষ্টারই ওতপ্রোত অংশ, তাকে আয়ত্ত করার সাধনারই প্রমাণ। এই পর্বের কয়েকটি উদাহরণে দেখা যাবে চিহ্নের অপ্রতুলতা বা কমার বাহুল্য গদ্যকে প্রভাবিত করতে পারছে না বরং গদ্যের টানেই যতির নতুন বিন্যাস স্থির হয়ে যাচ্ছে।

৩০. সংবাদ প্রভাকর। ৪ জুন ১৮৫৫

জানবাজার নিবাসিনী পুণ্যশীলা শ্রীমতী রাণী রাসমণি জ্যৈষ্ঠ পৌর্ণমাসী তিথিযোগে দক্ষিণেশ্বরের বিচিত্র নবরত্ন ও মন্দিরাদিতে দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ঐ দিবস তথায় প্রায় লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল, এই পুণ্য-কর্ম্ম উপলক্ষে রাণী রাসমণি অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন, প্রত্যেক শিবস্থানে রজতময় ষোড়শ ও অন্যান্য বিবিধ দ্রব্য পট্টবস্ত্র নগদ টাকা দিয়াছেন; তারামূর্ত্তি স্থাপনোপলক্ষে যে যে অনুষ্ঠানের আবশ্যক তত্তাবৎ বাহুল্যরূপে আয়োজন হইয়াছিল, আহারাদির কথা কি বলিব, কলিকাতার বাজার দূরে

থাকুক, পাণিহাটি, বৈদ্যবাটি, ত্রিবেণী ইত্যাদি স্থানের বাজারেও সন্দেশাদি মিষ্টান্নের বাজার আগুন হইয়া উঠে, এমত জনরব যে ৫০০ মোণ সন্দেশ হয়, নবরত্নের সম্মুখস্থ নাটমন্দির অতি রমণীয়রূপে সজ্জীভূত হইয়াছিল, ঝাড়লণ্ঠন প্রভৃতিতে খচিত হয়, বরাহনগর অবধি নাটমন্দির পর্য্যন্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বে বান্ধা রোসনাই হয়, কোনরূপ অনুষ্ঠানের কোনপ্রকার বৈলক্ষণ হয় নাই, পুণ্যবতীর পুণ্যকার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইয়াছে, গঙ্গার উপর পিনিস, বজরা, বোট, ভাউলিয়া প্রভৃতি জলযান কত গিয়াছিল, রাজপথে গাড়ীই বা কত একত্রিত হইয়াছিল তাহার সংখ্যা করা যায় না, কাঙ্গালি লোক অনেক গিয়াছিল, তাহারা মিষ্টান্ন প্রভৃতি উপাদেয় দ্রব্যাদি আহারে পরিতৃপ্ত হইয়া কেহ টাকা কেহ অর্দ্ধ মুদ্রা কেহ কেহ বা সিকি দক্ষিণা লইয়া বিদায় হইয়াছে, গোস্বামী মহাশয়েরা প্রায় সকলেই গিয়াছিলেন, রাণী রাসমণি তাঁহাদিগের সকলের যথাযোগ্য সম্মান পুরঃসর টাকা দিয়াছেন, এই পুণ্যকার্য্যে রাণী রাসমণির প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হইবেক, অনেক পুণ্যাত্মা ব্যক্তি অনেকানেক স্থানে দেবালয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু এপ্রকার বৃহৎ নবরত্ন ও নাটমন্দির কেহই করেন নাই, জগদীশ্বর পুণ্যবতী রাণী রাসমণিকে যে প্রকার অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী করিয়াছেন, সেইপ্রকার মহৎ অন্তঃকরণও দিয়াছেন, তিনি স্বীয় অতুল ধনের সার্থকতা করিলেন, এই অবনীমণ্ডলে তাঁহার চিরকীর্ত্তি সংস্থাপিত রহিল।

[সা. বা. স. ৪। ৭৭৫-৭৬]

৩১. সংবাদ প্রভাকর। ১২ জুন ১৮৫৫

অধুনা ভুলুয়া প্রদেশে প্রভাকর পত্রিকায় বর্ণিত বিধবা বিবাহের প্রসঙ্গ পরস্পর জনশ্রুতি হওনে এ প্রদেশস্থ আপামর সাধারণ সকলেরি এমত মনোরঞ্জনোৎসাহের সহিত লোলুপ যে অহরহ হাটে ঘাটে গোঠে মাঠে গমনে ভ্রমণে গৃহে প্রাঙ্গণে উত্থানোপবেশনে ভোজনে শয়নে বোধকরি সুপ্তিসম্ভোগীয় স্বপনেও ঐ কথার আন্দোলন হইতেছে।

[সা. বা. স. ৪। ৭৭৬]

৩২. সংবাদ প্রভাকর। ২৩ জুলাই ১৮৫৫

মুরশিদাবাদের মাজিষ্ট্রেট মেং টুগুড সাহেব লেপ্টেনাণ্ট গবরণর সাহেবের নিকট যে পত্র লেখেন তাহা ইংলিসম্যান প্রভৃতি পত্রে প্রকাশ হইয়াছে যদিও ঐ সংবাদ আমরা অরঙ্গাবাদের সংবাদদাতার পত্রদ্বারা প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বেই

প্রকাশ করিয়াছি, তথাচ মেং টুগুড সাহেবের পত্রের মর্ম্ম কিঞ্চিৎ গ্রহণ করা আবশ্যক বোধ করিলাম। "তিনি ১৪ জুলাই তারিখে সৈন্য লইয়া পলসায় উপস্থিত হয়েন, সেখানে রাজবিরোধীদিগকে দেখিতে পান নাই, তাঁহার গমন করিবার পূর্ব্বেই সাঁওতালেরা ঐ গ্রাম লুঠ করিয়া মহেশপুরাভিমুখে যাত্রা করে, সেনারা ধান্যক্ষেত্র দিয়া গমন ও নদী নালা পার হইতে বিস্তর ক্লেশ পায় কিন্তু পলসাতে তাহারা বিশ্রাম করে নাই, একেবারে মহেশপুরে গিয়া ১৫ তারিখে প্রাতঃকালে এক সরোবরের নিকটে প্রায় ৪।৫০০০ সাঁওতালকে আক্রমণ করে, ঐ দলের অধ্যক্ষ সিদু ও কিনু তাহারদিগের আদেশক্রমে সাঁওতালেরা তির ছুঁড়িয়াছিল তাহাতে কেবল ৫জন সেপাই অল্পাঘাতি হইয়াছে। বিপক্ষদিগের একশত হত ও একশত নিহত হওয়াতে তাহারা অতি বেগে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। সেনারা তাহারদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তি হইতে পারে নাই, মহেশপুরে বিখ্যাত জানকীকুমারীর স্বামী গোপাল সিংহের বাটী ঐ অতি উচ্চ প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত, দুরাত্মারা তাহা আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই।

…ভগ্নাডিহী নামক স্থানে সাঁওতালদিগের ঠাকুর বাটী, টুগুড সাহেব সৈন্য লইয়া সেই স্থানে যাইবেন, যেহেতু ঐ ঠাকুরের প্রত্যাদেশ হইয়াছে যে যুদ্ধ সময়ে ইংরাজদিগের বন্দুক হইতে কেবল জল নির্গত হইবেক, ইহাতেই মূর্খ লোকেরা রাজবিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে এইক্ষণে কিছু দিবস অরঙ্গাবাদ অথবা পলসা কিম্বা মহেশপুরে সৈন্য রাখিতে হইবেক, শীত ঋতুর আগমন না হইলে জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করা যাইবে না, কিন্তু যাহাতে উপস্থিত অত্যাচার নিবারণ হয়, এবং দুষ্টেরা প্রজাদিগের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করিতে না পারে এমন উপায় করিতে হইবেক।

[সা. বা. স. ৪। ৭৯০]

৩৩. সম্বাদ ভাস্কর। ২৫ নভেম্বর ১৮৫৬

মহাশয়, নিষ্ঠুরতার বিষয় কি কহিব, আপনি যদি স্বচক্ষে দেখিতেন তবে অশ্রুজলে অবগাহন করিতেন, পোলিস সম্পর্কীয় লোকেরা দামিনীকো নামক স্থান হইতে ৫০ জন সন্তালকে ধৃত করিয়া আনিয়াছে তাহারদিগের অবস্থা দেখিলে পাষাণ হৃদয় ব্যক্তিরাও রোদন করেন, ঐ সকল সন্তালেরা যে দিবস ধৃত হয় সে দিন ও তৎ পর দিবা রাত্রি নিরাহারে বন্ধনাবস্থায় ছিল আহারার্থে জলবিন্দুও পায় নাই; পোলিসের লোকেরা তাহারদিগকে যেমন ধৃত করিয়াছে

অমনি বেড়ী পায়ে দিয়াছে, হাতে কড়ী পায়ে বেড়ী, ঐ কড়ী বেড়ী শৃঙ্খলযুক্ত করিয়াছে তৎপরে পঞ্চাশ জনকে এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া টানিয়া লইয়া আসিয়াছে, বেড়ীর ঘর্ষণে অনেকের হস্তপদে ঘা হইয়া গিয়াছে, সেই ঘা হইতে ঝর্ঝর করিয়া রক্ত পড়িতেছে, পথে চলিতে না পারিয়া অনেকে পড়িয়া গিয়াছিল, তাহারদিগকে টানিয়া লইয়া আসিয়াছে, তাহাতে সর্ব্বাঙ্গের চর্ম্ম ছড়িয়া গিয়াছে ঐরূপ টানাটানিতে এক বৃদ্ধ মরিয়া গিয়াছিল, তাহার মৃতদেহ হস্তিপৃষ্ঠে তুলিয়া বীরভূমে পাঠাইয়া দিয়াছে ; দামিনীকো হইতে বীরভূমে আসিতে আবদ্ধ সন্তালেরা যে কয়েকদিবস পথিমধ্যে ছিল তাহারা অন্ন পায় নাই, বীরভূমের কারাগারের সম্মুখে আনিয়া যখন শৃঙ্খল খুলিয়া দিল তখনও তাহারা হাঁটিয়া কারাগারে প্রবেশ করিতে পারিল না, বেত্রাঘাত করিতে২ পদাতিকেরা হেঁছ্‌ড়ীয়া টানিয়া জেহেলখানায় লইয়া গেল পরে তাহারদিগের কপালে কি হইয়াছে আমি জানিতে পারি নাই।

[সা. বা. স. ৩। ৩৩৯-৪০]

৩৪. সম্বাদ ভাস্কর। ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭

গত শুক্রবারাপরাহ্ণে গবর্ণমেণ্ট বাটীতে মহাসভা হইয়াছিল তাহাতে কলিকাতা নিবাসি প্রবাসি সম্ভ্রমরাশি মহাশয়েরা অনেকে গমন করিয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্টের বাটীর চতুর্দ্দিকে গাড়ি, ঘোড়া, পাল্কী, লোক ইত্যাদির বহু সমারোহ দৃষ্ট হইয়াছে কিন্তু এইক্ষণে ইংরাজেরা বড় প্রজা পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়াছেন কিছুকাল গত হইল গবর্ণমেণ্টের পোলিস পথিকদিগের প্রস্রাব ধরিয়া বেড়াইতেন তাহাতে মান্যগণ রাজপথে প্রস্রাব করিতেও যান নাই, আবার গবর্ণমেণ্ট সভায় নিমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত লোকদিগের পাদুকা ধরাধরি আরম্ভ করিয়াছেন, পাছে সভা প্রবেশ কালীন সেক্রেটারি সাহেবেরা বহির্দ্বারে পাদুকা রাখিয়া যাইতে বলিলেন এই ভয়ে বহু ব্যক্তি গমন করেন নাই, পূর্ব্বে নিয়ম ছিল মান্য লোকেরা কোন সভায় গেলে কর্ত্তাপক্ষ অগ্রে হাস্যবদনে তাঁহারদিগের আস্য দর্শন করিতেন, এইক্ষণে মলিন বদনে অগ্রে পাদদ্বয় দৃষ্টিক্ষেপ করেন ইহার অভিপ্রায় এই যে পাদুকা সহিত যদি কেহ যান তবে পাদুকা পরিত্যাগ করিতে বলিবেন, নিমন্ত্রিতগণ রাজসভায় সুখে প্রবেশ করিবেন আমোদ করিয়া প্রত্যাগত হইবেন ইহার মধ্যে পাদুকা টানাটানী কেন আরম্ভ হইল ? যদি কহেন এতদ্দেশীয় লোকেরা দেবাগার প্রবেশ-কালীন পাদুকা পরিত্যাগ করিয়া যান, রাজসভায় গবর্ণরাদির শ্বেতমূর্ত্তি দর্শনে

নৃপাগারে গমনকালে কেন তাহা করিবেন না? ইহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরা বলিতে পারেন দেবাগারের অন্ন ব্যঞ্জন, তণ্ডুল কদলাদি ভোগবস্তু সকল উপস্থিত থাকে, চর্ম্মপাদুকা সন্নিধানে তাহা অপবিত্র হয়, রাজসভায় তণ্ডুল কদলাদি ব্যবহার নাই, শ্বেতমূর্ত্তিরা যখন দেবতাদিগের ন্যায় আতপতণ্ডুল সহিত রম্ভা চর্ব্ব‍ন করিবেন তখন প্রজারাও চর্ম্মপাদুকা সহিত গমন করিবেন না, অগ্রে দেবদেহ ধারণ পূর্ব্বক দৈবাচার ব্যবহার করুন তৎপরে নিমন্ত্রিতেরাও পাদুকা পরিত্যাগপূর্ব্ব‍ক সভা প্রবেশ করিবেন অমর না হইতেই অমর সম্ভ্রম জন্য মান্য লোকদিগের পাদচর্ম্ম ধরিয়া টানাটানী করিতে আসিলেন ইহাতে নিমন্ত্রিত লোকেরা বিরক্ত হইয়াছেন অতএব শান্ত স্বভাব শ্রীযুত লার্ড কেনিং মহাশয় সেক্রেটরী বাহাদুরদিগকে সাবধান করিবেন তাঁহারা যেন আর প্রজাদিগের জুতা লইয়া বিবাদ করেন না।

[স. সে. ক. ৩। ৩৮৪]

১. বাক্যগঠনের উপাদানবিন্যাস সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হয়ে এসেছে। অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার ক্লজনির্মাণে ও সমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহারের নেহাৎ বাঙালি বৈশিষ্ট্যও, সম্ভবত অচেতন সমর্থন পাচ্ছে।

২. কমা, সেমিকোলন, উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যবহার প্রায় নির্দোষ।

৩. কিন্তু দাঁড়ি ব্যবহারে অনভ্যস্ততা এত যে ২নং উদাহরণ ব্যতীত সর্বত্রই কমা দিয়ে দাঁড়ির কাজ সারার চেষ্টা হচ্ছে। দাঁড়ি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাত্র প্যারার বা রচনার শেষে ব্যবহৃত হয়েছে। ৫নং উদাহরণে যতিব্যবহারে ও বাক্যগঠনে কণ্ঠস্বরের অনুসরণও কোথাও কোথাও ঘটেছে। গদ্যের সঙ্গে লেখকের স্টাইলের অন্বয় সাধনের চেষ্টা থেকেই দাঁড়িচিহ্ন ব্যবহারে এই কুণ্ঠা বা অনভ্যস্ততা এসেছে। সে চেষ্টা সর্বদা ফলপ্রসূ না হলেও সংবাদ-সাময়িকপত্রের শুরু থেকেই আছে যখন দাঁড়িই ছিল একমাত্র যতিচিহ্ন। দাঁড়িকে বাদ দিয়ে বাক্যগঠনের নানা চেষ্টাই নানা সময়ে হয়েছে। কিন্তু বাংলা গদ্যের রূপ যখন স্থির হয়ে গেছে তখন বাংলা গদ্য তার নিজস্ব নিয়মেই সেই যতিবিন্যাসকে আশ্রয় করে ও আশ্রয় দেয়। ১৮৫৮-র পর থেকে সেই ইতিহাস শুরু হল।

এই পাঁচটি উদাহরণ বিষয়অনুযায়ী নির্বাচন করা হয়েছে। তার কারণ এই সময় যতিচিহ্নের ব্যবহার স্বতন্ত্র বিচারের অবকাশ রাখে না। যে-বিষয় নিয়ে লেখক লিখছেন সেই বিষয় সম্পর্কে তাঁর আবেগসংগতি ও যুক্তি-শৃঙ্খলার সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে যেমন বাক্যগুলি তৈরি হচ্ছে, তেমনি যতিচিহ্নও ব্যবহৃত হচ্ছে।

৩০ ও ৩২-সংখ্যক উদাহরণে সাংবাদিক গদ্যের তথ্যনির্ভর নিরপেক্ষতা প্রধান হয়ে উঠতে চায় যেমন, ৩১-সংখ্যক উদাহরণে তেমনি ব্যক্তিস্টাইলের একটি প্রায় চূড়ান্ত নিদর্শন মেলে। ৩৪-সংখ্যক উদাহরণের শ্লেষের বিশিষ্ট ভঙ্গিটি বাংলা বাংলা সাংবাদিকতায় অন্যতম প্রধান ভঙ্গি। ৩৩-সংখ্যক উদাহরণটিতে সাঁওতাল-বিদ্রোহ দমনের সরকারি ব্যবস্থায় ক্লিষ্ট একজন নাগরিকের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে—এইটি যেমন একজন ব্যক্তির গদ্যরচনার উদাহরণ, তেমনি আবার ৩২-সংখ্যক উদাহরণের সঙ্গে তুলনীয়।

৩০ ও ৩২-সংখ্যক উদাহরণে প্রসঙ্গভাগ খুব স্পষ্ট যদিও যতিচিহ্নদ্বারা সর্বদা চিহ্নিত নয়। ৩৫-সংখ্যক উদাহরণে প্রথমে রানী রাসমণির কীর্তিটির বিবরণ, তারপর খাওয়াদাওয়ার বিবরণ, তারপর রাস্তায় ও গঙ্গায় ভিড়ের বিবরণ, তারপর দানের বিবরণ। বিষয়ের এই প্রসঙ্গভাগ কোনো জায়গাতেই চিহ্নিত না হওয়া সত্ত্বেও স্পষ্ট। কিন্তু টুগুড সাহেবের সাঁওতাল বিদ্রোহ দমনের বিবরণের মতো সুবিন্যস্ত নয়। এই বিবরণ (উদাহরণ ৩২) দুটি প্যারায় ভাগ করা, উদ্ধৃতিচিহ্ন-দাঁড়ি যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এমন-কি ভূমিকার বাক্যটি, 'যদিও', 'তথাচ', ব্যবহারসত্ত্বেও স্পষ্ট ও সরল। উদ্ধৃতিভুক্ত অংশের প্রথম দাঁড়িটি পড়েছে সৈন্যদের সঙ্গে সাঁওতালদের সংঘর্ষের বিবরণের পর। অথচ দাঁড়ির আগে কমায়-কমায় ঘটনাপরম্পরায় এমন বর্ণনা—যার সঙ্গে লেখকের যোগ খুব প্রত্যক্ষ নয়। সাঁওতালদের সম্পর্কে 'দুরাত্মা' 'মূর্খ' ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহার সত্ত্বেও এই রচনাটিতে লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রক্ষেপণ রচনারীতির প্রধান অবলম্বন নয়। প্রধান অবলম্বন ৩০-সংখ্যক উদাহরণেও ছিল না, কিন্তু সেখানে বিবরণটি তো লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে এসেছে। সেই প্রত্যক্ষণের উত্তেজনা লেখককে কোনো স্বস্তি দেয় নি। তাই যতিবিন্যাস সুশৃঙ্খল নয়। অথচ তার চাইতে অনেক গুরুতর বিষয় (উদাহরণ ৩২) লেখককে সেই স্বস্তি দিয়েছে—স্বস্তি দিয়েছে বলেই যতি অপেক্ষাকৃত সুবিন্যস্ত।

অথচ এই বিষয়টি নিয়ে যখন একজন ব্যক্তি চিঠি লেখেন, (উদাহরণ ৩৩) তখন প্রত্যক্ষণের উত্তেজনায় তিনি পুরো চিঠিতে একবারও নিশ্বাস ফেলতে পারেন না, বাক্যগুলি ঠিকভাবেই গঠিত, কিন্তু কোথাও দম ফেলার অবকাশ নেই। এর আগে নানা সময়ের নানা উদাহরণে দেখা গেছে যে প্রত্যক্ষণের উত্তেজনায় বাক্যবন্ধের বিশৃঙ্খলা ঘটছে না বটে, কিন্তু যতিবিন্যাসের ভিতর সেই উত্তেজনার প্রকাশ ঘটে যাচ্ছে।

৩১-সংখ্যক উদাহরণটির প্রথমাংশটুকু মাত্র উদ্ধৃত হয়েছে। রচনার বাকি অংশে মুখের কথার ভঙ্গি আরো বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। বিষয়ের তাগিদে যখনই মানুষের মুখের কথার ভঙ্গিকে ফর্ম হিশেবে আশ্রয় করতে হয় তখনই সেখানে মুখের কথার যতিপাতও ঘটে। এই রচনায় লেখক বাক্য প্রয়োজনীয় যতিচিহ্নে চিহ্নিত করতে পারছেন না, কিন্তু তাঁর বাক্যগুলি সেই যতিচিহ্নের বিরতিচিহ্নিত হয়েই ব্যবহৃত হচ্ছে।

মুখের কথার এই ভঙ্গিকে বাংলার সংবাদ-সাময়িকপত্রের গদ্যে প্রথম থেকেই ব্যঙ্গ বা শ্লেষে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে। ৩১-সংখ্যক উদাহরণে তার প্রমাণ আছে। কিন্তু সাংবাদিক নিরপেক্ষতার ভঙ্গির সঙ্গে এই শ্লেষের ভঙ্গি মিশে গিয়েছে ৩৪-সংখ্যক উদাহরণে। এই ভঙ্গিতে উত্তেজনার পরিবর্তে শান্তি ও বিশৃঙ্খলার পরিবর্তে যুক্তিপরম্পরার শৃঙ্খলা অনেক বেশি কার্যকর। প্রত্যক্ষণের উত্তেজনায় যে-আবেগ আসে এই রীতিতে তা অনুপস্থিত। তাই এখানে লেখকের ভঙ্গি অনেক বেশি প্রস্তুত। কমার পর কমায় 'গভর্ণমেণ্ট বাটীতে মহাসভা'-র বিবরণ দিতে দিতে লেখক পুলিশের 'প্রস্রাব ধরিয়া বেড়ান' ও 'পাদুকা ধরাধরি'-র প্রসঙ্গ বলে গেছেন, মাঝখানে একটি 'কিন্তু'-তে এই দুই অংশকে সচেতন পৃথক করে। এরপরে, রচনাটির মাঝ-বরাবর পরপর দুটি প্রশ্নচিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম প্রশ্নচিহ্নেই রচনার প্রধান প্রসঙ্গ শেষ হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্নচিহ্নে লেখক তাঁর শ্লেষের বিষয়টিকে নতুনভাবে সম্প্রসারণের ও ব্যবহারের সুযোগ পান। মূল বক্তব্যকে ব্যহত না করেও অলংকারের এই স্বাধীন সম্প্রসারণে রচনাটির শৈলীতাৎপর্য অনেক বেড়ে যায়। এখনো দাঁড়িচিহ্ন ব্যবহারে অনির্দিষ্টতা থাকলেও এখানে রচনার স্টাইল ও যতিবিন্যাস এমন ওতপ্রোত হয়ে উঠেছে ও বাংলা সাংবাদিক গদ্য এমন শৈলীবৈশিষ্ট্যে পৌঁছে যাচ্ছে, যেখানে যতি আর আলাদা উপকরণ থাকছে না, গদ্যচর্চার অভ্যাসেরই অংশ হয়ে পড়ছে।

১৮৬০ সাল নাগাদ যতির সঙ্গে গদ্যের অন্যোন্য সম্পর্কস্থাপনের নানা প্রচেষ্টার শেষে গদ্যচর্চার সেই অভ্যাস শুরু হল—যতিবিন্যাসের জন্য যখন আর পৃথক মনোযোগের প্রয়োজন থাকে না।

তৃতীয় খণ্ড

তথ্যপঞ্জি

এক

'সমাচার দর্পণ' ও 'সমাচার চন্দ্রিকা'র কয়েকটি সংখ্যার বিষয়প্রাধান্যের অনুপাত

সমাচার দর্পণ

ক্রমিক সংখ্যা	তারিখ	দেশীয় সংবাদ	বিদেশী সংবাদ	কাহিনী
১ ।	৬ জুন ১৮১৮, ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১২২৫	১০	৩	—
২ ।	১৩ জুন ১৮১৮, ৩২ জ্যৈষ্ঠ ১২২৫	১২	২	—
৩ ।	২০ জুন ১৮১৮, ৭ আষাঢ় ১২২৫	১১	৬	—
৪ ।	২৭ জুন ১৮১৮, ১১ আষাঢ় ১২২৫	৭	১	—
৫ ।	৪ জুলাই ১৮১৮, ২১ আষাঢ় ১২২৫	৭	—	—
৬ ।	১১ জুলাই ১৮১৮, ২৮ আষাঢ় ১২২৫	৬	৯	—
৭ ।	১৮ জুলাই ১৮১৮, ৪ শ্রাবণ ১২২৫	৫	১১	—
৮ ।	২৫ জুলাই ১৮১৮, ১১ শ্রাবণ ১২২৫	৫	১	১
৯ ।	১ আগস্ত ১৮১৮, ১৮ শ্রাবণ ১২২৫	৯	৫	—
১০ ।	৮ আগস্ত ১৮১৮, ২৫ শ্রাবণ ১২২৫	৫	৬	১
১১ ।	১৫ আগস্ত ১৮১৮, ৩২ শ্রাবণ ১২২৫	৪	৮	—
১২ ।	২২ আগস্ত ১৮১৮, ৬ ভাদ্র ১২২৫	৬	১	—
১৩ ।	২৯ আগস্ত ১৮১৮, ১৪ ভাদ্র ১২২৫	৭	২	—
১৪ ।	৫ সেপ্টেম্বর ১৮১৮, ২১ ভাদ্র ১২২৫	৪	২	—
১৫ ।	১২ সেপ্টেম্বর ১৮১৮, ২৮ ভাদ্র ১২২৫	৭	৬	—
১৬ ।	১৯ সেপ্টেম্বর ১৮১৮, ৪ আশ্বিন ১২২৫	৭	৬	—
১৭ ।	২৬ সেপ্টেম্বর ১৮১৮, ১১ আশ্বিন ১২২৫	৮	৬	—
১৮ ।	৩ অক্টুবর ১৮১৮, ১৮ আশ্বিন ১২২৫	১২	৩	—
১৯ ।	১০ অক্টুবর ১৮১৮, ২৫ আশ্বিন ১২২৫	১০	৫	—
২০ ।	১৮ অক্টুবর ১৮১৮, ২ কার্ত্তিক ১২২৫	৭	২	১
২১ ।	২৪ অক্টুবর ১৮১৮, ৯ কার্ত্তিক ১২২৫	৫	—	১

ক্রমিক সংখ্যা	তারিখ	দেশীয় সংবাদ	বিদেশী সংবাদ	কাহিনী
২২ ।	৩১ অক্টুবর ১৮১৮, ১৬ কার্ত্তিক ১২২৫	৭	২	—
২৩ ।	৭ নবেম্বর ১৮১৮, ২৩ কার্ত্তিক ১২২৫	১০	—	—
২৪ ।	১৪ নবেম্বর ১৮১৮, ৩০ কার্ত্তিক ১২২৫	১০	৬	—
২৫ ।	২১ নবেম্বর ১৮১৮, ৭ অগ্রহায়ণ ১২২৫	১	১	—
২৬ ।	২৮ নবেম্বর ১৮১৮, ১৪ অগ্রহায়ণ ১২২৫	৬	৫	১
২৭ ।	৫ দিজেম্বর ১৮১৮, ২১ অগ্রহায়ণ ১২২৫	৪	৩	১
২৮ ।	১২ দিজেম্বর ১৮১৮, ২৮ অগ্রহায়ণ ১২২৫	৯	৬	১
২৯ ।	১৯ দিজেম্বর ১৮১৮, ৬ পৌষ ১২২৫	১০	১	২
৩০ ।	২৬ দিজেম্বর ১৮১৮, ১৩ পৌষ ১২২৫	১১	—	২
৩১ ।	২ জানুয়ারি ১৮১৯, ২০ পৌষ ১২২৫	১১	৪	১
৩২ ।	৯ জানুয়ারি ১৮১৯, ২৭ পৌষ ১২২৫	১১	৩	১
৩৩ ।	১৬ জানুয়ারি ১৮১৯, ৪ মাঘ ১২২৫	৮	৮	১
৩৪ ।	২৩ জানুয়ারি ১৮১৯, ১১ মাঘ ১২২৫	৬	১০	—
৩৫ ।	৩০ জানুয়ারি ১৮১৯, ১৮ মাঘ ১২২৫	৮	৩	১
৩৬ ।	৬ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯, ২৫ মাঘ ১২২৫	৯	২	১
৩৭ ।	১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯, ৩ ফাল্গুন ১২২৫	৭	৪	—
৩৮ ।	২০ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯, ১০ ফাল্গুন ১২২৫	১২	১৩	১
৩৯ ।	২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯, ১৭ ফাল্গুন ১২২৫	৯	৫	১
৪০ ।	৬ মার্চ ১৮১৯, ২৪ ফাগুন ১২২৫	৭	২	১
৪১ ।	১৩ মার্চ ১৮১৯, ১ চৈত্র ১২২৫	৭	২	১
৪২ ।	২০ মার্চ ১৮১৯, ৮ চৈত্র ১২২৫	৭	৭	—
৪৩ ।	২৭ মার্চ ১৮১৯, ১৫ চৈত্র ১২২৫	১০	৩	২
৪৪ ।	৩ এপ্রিল ১৮১৯, ২২ চৈত্র ১২২৫	১০	—	—
৪৫ ।	১০ এপ্রিল ১৮১৯, ২৯ চৈত্র ১২২৫	৭	৩	১
৪৬ ।	১৭ এপ্রিল ১৮১৯, ৬ বৈশাখ ১২২৬	৮	৩	১
৪৭ ।	২৪ এপ্রিল ১৮১৯, ১৩ বৈশাখ ১২২৬	৯	৫	৩
৪৮ ।	১ মে ১৮১৯, ২০ বৈশাখ ১২২৬	৯	২	১
৪৯ ।	৮ মে ১৮১৯, ২৭ বৈশাখ ১২২৬	৯	২	—

ক্রমিক সংখ্যা	তারিখ	দেশীয় সংবাদ	বিদেশী সংবাদ	কাহিনী
৫০ ।	১৫ মে ১৮১৯, ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬	৬	১	—
৫১ ।	২২ মে ১৮১৯, ১০ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬	১০	৪	—
৫২ ।	২৯ মে ১৮১৯, ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬	১৩	৩	১
৫৩ ।	৫ জুন ১৮১৯, ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬	১৫	৬	—
৫৪ ।	১২ জুন ১৮১৯, ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬	৭	৯	—
৫৫ ।	১৯ জুন ১৮১৯, ৬ আষাঢ় ১২২৬	৯	৯	—
৫৬ ।	২৬ জুন ১৮১৯, ১৩ আষাঢ় ১২২৬	৮	৬	—
৫৭ ।	৩ জুলাই ১৮১৯, ২০ আষাঢ় ১২২৬	৯	৬	—
৫৮ ।	১০ জুলাই ১৮১৯, ২৭ আষাঢ় ১২২৬	৮	৩	—
৫৯ ।	১৭ জুলাই ১৮১৯, ৩ শ্রাবণ ১২২৬	৫	৭	—
৬০ ।	২৪ জুলাই ১৮১৯, ১০ শ্রাবণ ১২২৬	৭	৭	—
৬১ ।	৩১ জুলাই ১৮১৯, ১৭ শ্রাবণ ১২২৬	৫	৭	—
৬২ ।	৭ আগস্ত ১৮১৯, ২৪ শ্রাবণ ১২২৬	১৪	৪	২
৬৩ ।	১৪ আগস্ত ১৮১৯, ৩১ শ্রাবণ ১২২৬	১১	৪	১
৬৪ ।	২১ আগস্ত ১৮১৯, ৬ ভাদ্র ১২২৬	১৪	৭	১
৬৫ ।	২৮ আগস্ত ১৮১৯, ১৩ ভাদ্র ১২২৬	৯	৯	—
৬৬ ।	৪ সেপ্তম্বর ১৮১৯, ২০ ভাদ্র ১২২৬	৭	৪	১
৬৭ ।	১১ সেপ্তম্বর ১৮১৯, ২৭ ভাদ্র ১২২৬	৭	৫	—
৬৮ ।	১৮ সেপ্তম্বর ১৮১৯, ৩ আশ্বিন ১২২৬	১৪	৩	—
৬৯ ।	২৫ সেপ্তম্বর ১৮১৯, ১০ আশ্বিন ১২২৬	৭	৪	—
৭০ ।	২ অক্তুবর ১৮১৯, ১৭ আশ্বিন ১২২৬	৮	—	—
৭১ ।	৯ অক্তুবর ১৮১৯, ২৪ আশ্বিন ১২২৬	১০	—	২
৭২ ।	১৬ অক্তুবর ১৮১৯, ১ কার্ত্তিক ১২২৬	১০	৬	৩
৭৩ ।	২৩ অক্তুবর ১৮১৯, ৮ কার্ত্তিক ১২২৬	৬	৫	১
৭৪ ।	৩০ অক্তুবর ১৮১৯, ১৫ কার্ত্তিক ১২২৬	৬	১০	১
৭৫ ।	৬ নবেম্বর ১৮১৯, ২২ কার্ত্তিক ১২২৬	১৩	৪	—
৭৬ ।	১৩ নবেম্বর ১৮১৯, ২৯ কার্ত্তিক ১২২৬	৫	৫	১
৭৭ ।	২০ নবেম্বর ১৮১৯, ৬ অগ্রহায়ণ ১২২৬	৯	৭	১

ক্রমিক সংখ্যা	তারিখ	দেশীয় সংবাদ	বিদেশী সংবাদ	কাহিনী
৭৮ ।	২৭ নবেম্বর ১৮১৯, ১৩ অগ্রহায়ণ ১২২৬	১১	৭	—
৭৯ ।	৪ দিসেম্বর ১৮১৯, ২০ অগ্রহায়ণ ১২২৬	১৩	৩	—
৮০ ।	১১ দিসেম্বর ১৮১৯, ২৭ অগ্রহায়ণ ১২২৬	৬	৬	—
৮১ ।	১৮ দিসেম্বর ১৮১৯, ৪ পৌষ ১২২৬	১০	৩	২
৮২ ।	২৫ দিসেম্বর ১৮১৯, ১১ পৌষ ১২২৬	৭	৭	১

সমাচার চন্দ্রিকা

ক্রমিক সংখ্যা	তারিখ	দেশীয় সংবাদ	বিদেশী সংবাদ	কাহিনী
১ ।	৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮, ২২ মে ১৮৩১	৯	—	১
২ ।	১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮, ২৯ মে ১৮৩১	৩		১
৩ ।	২৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮, ৬ জুন ১৮৩১	৪	২	২
৪ ।	২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮, ৯ জুন ১৮৩১	৭		১
৫ ।	৩২ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮, ১৩ জুন ১৮৩১	৯	১	—
৬ ।	৩ আষাঢ় ১২৩৮, ১৬ জুন ১৮৩১	৪	১	১
৭ ।	১০ আষাঢ় ১২৩৮, ২৩ জুন ১৮৩১	১১	১	১
৮ ।	১৪ আষাঢ় ১২৩৮, ২৭ জুন ১৮৩১	৯	—	—
৯ ।	১৭ আষাঢ় ১২৩৮, ৩০ জুন ১৮৩১	১৪	১	—
১০ ।	২১ আষাঢ় ১২৩৮, ৪ জুলাই ১৮৩১	১০	—	১
১১ ।	২৪ আষাঢ় ১২৩৮, ৭ জুলাই ১৮৩১	১৪	—	—
১২ ।	২৮ আষাঢ় ১২৩৮, ১১ জুলাই ১৮৩১	১৭	১	২
১৩ ।	৩১ আষাঢ় ১২৩৮, ১৪ জুলাই ১৮৩১	৮	—	—
১৪ ।	৬ শ্রাবণ ১২৩৮, ১৮ জুলাই ১৮৩১	১৬	—	১
১৫ ।	১৩ শ্রাবণ ১২৩৮, ২৫ জুলাই ১৮৩১	১১	১	—
১৬ ।	১৭ শ্রাবণ ১২৩৮, ২৯ জুলাই ১৮৩১	১৮	—	১
১৭ ।	২০ শ্রাবণ ১২৩৮, ৪ আগস্ট ১৮৩১	১৭	—	—
১৮ ।	২৪ শ্রাবণ ১২৩৮, ৮ আগস্ট ১৮৩১	১১	—	—
১৯ ।	২৭ শ্রাবণ ১২৩৮, ১১ আগস্ট ১৮৩১	১৬	১	—
২০ ।	৩১ শ্রাবণ ১২৩৮, ১৫ আগস্ট ১৮৩১	১৫		
২১ ।	৩ ভাদ্র ১২৩৮, ১৮ আগস্ট ১৮৩১	১৯		

ক্রমিক সংখ্যা	তারিখ	দেশীয় সংবাদ	বিদেশী সংবাদ	কাহিনী
২২ ।	৭ ভাদ্র ১২৩৮, ২২ আগস্ট ১৮৩১	১৩	১	—
২৩ ।	১০ ভাদ্র ১২৩৮, ২৫ আগস্ট ১৮৩১	১২	১	—
২৪ ।	১৪ ভাদ্র ১২৩৮, ২৯ আগস্ট ১৮৩১	১৮	—	১
২৫ ।	১৭ ভাদ্র ১২৩৮, ১ সেপ্টম্বর ১৮৩১	১৩	—	—
২৬ ।	২১ ভাদ্র ১২৩৮, ৫ সেপ্টম্বর ১৮৩১	১৪	—	১
২৭ ।	২৪ ভাদ্র ১২৩৮, ৮ সেপ্টম্বর ১৮৩১	১৬	—	—
২৮ ।	২৮ ভাদ্র ১২৩৮, ১২ সেপ্টম্বর ১৮৩১	১২	২	—
২৯ ।	৩১ ভাদ্র ১২৩৮, ১৫ সেপ্টম্বর ১৮৩১	১৫	১	—
৩০ ।	৪ আশ্বিন ১২৩৮, ১৯ সেপ্টম্বর ১৮৩১	১৫	—	১
৩১ ।	৭ আশ্বিন ১২৩৮, ২২ সেপ্টম্বর ১৮৩১	১৪	—	—
৩২ ।	১১ আশ্বিন ১২৩৮, ২৬ সেপ্টম্বর ১৮৩১	১২	২	১
৩৩ ।	১৮ আশ্বিন ১২৩৮, ৩ অকটোবর ১৮৩১	১০	৩	১
৩৪ ।	২৫ আশ্বিন ১২৩৮, ১০ অকটোবর ১৮৩১	১০	১	—

'সমাচার দর্পণ'-এর ২০৩টি সংখ্যার পৃষ্ঠা-অনুগ সূচিপত্র

যে-অংশ পড়া যায় নি সেগুলি '···' এই চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়েছে।
রোমান সংখ্যা (1,2,3 ইত্যাদি)=সংখ্যাসূচক। শব্দে লেখা সংখ্যা (এক, দুই ইত্যাদি)=পৃষ্ঠাসূচক। বাংলা সংখ্যা (১, ২, ৩ ইত্যাদি)=কলমসূচক।

1 সংখ্যা ২৩ মে ১৮১৮

এক ১ সমাচার দর্পণ; ২ মসলা বিক্রয়ের ইস্তাহার; ৩··· ।

দুই ১··· ; ২ কোম্পানির কাগজের বাজার, ওলাউটা, যুবরাজের কন্যার মরণ; ৩··· ।

তিন ১ বাণিজ্যের সমাচার; ২ মরিচ উপদ্বীপের ঝড়, সান্দারাজ; ৩···, ···, ইংগ্লণ্ডে নূতন কল, সর্পকর্তৃক··· ।

চার ১··· ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই]; ৩ ইস্তাহার।

2 সংখ্যা ৩০ মে ১৮১৮

এক ১ সমাচার দর্পণ, বাদশাহের জন্মদিন; ২ নাগপুরের রাজার বিবরণ ও পেশোয়া; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

দুই ১··· ; ২ চৌড়িগড় অধিকার, হত আকরেল; ৩ বাণিজ্য, মরীচি উপদ্বীপ, উত্তর আমেরিকা।

তিন ১ অশ্রুত সমাচার; ২ বিবাহের নূতন ব্যবস্থা, ইংগ্লণ্ডের রাজকীয় ব্যায়; ৩··· ।

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই]; ২ [কোনো শিরোনাম নেই]; ৩ ইস্তাহার।

3 সংখ্যা ৬ জুন ১৮১৮

এক ১ সমাচার দর্পণ, কোম্পানির শেষ কর্জের ইস্তাহার, গড় মণ্ডল; ২ [কোনো শিরোনাম নেই]; ৩···, ··· ।

দুই ১··· , ২ হস্‌পিতাল ও হিন্দুস্থানের সীমার বিবরণ, ইস্তাহার।

4 সংখ্যা ১৩ জুন ১৮১৮

এক ১ সমাচার দর্পণ, যুদ্ধদপ্তর, রাজকর্ম্মনিয়োগী; ২ কোম্পানীর কাগজ, জাহাজের আমদানী, আমেরিকা; ৩··· ।

দুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ সুনর গড় দিগর দখল ; ৩ রই গড়, মাব্ধ গড়।

তিন ১ নাগপুরের রাজা, পেশোয়া ; ২ ভূপাল রাজ্য, শ্রীশ্রীযুতের আগমন, ইগ্লণ্ডীয় ইস্তাহার, কলিকাতা ; ৩..., ..., ..., ...।

5 সংখ্যা ২০ জুন ১৮১৮

এক ১ সমাচার দর্পণ, কোম্পানীর কাগজ, জাহাজ আমদানী, বাটোরিয়া ও বেকুলেন ; ২ মলক্কা উপদ্বীপ, বাজিরাওর স্ত্রীর বিবরণ ; ..., সৌরাষ্ট্র... ; ৩ রাজপুত্রের বিবরণ।

দুই ১... ; ... ; ২ বোনাপার্টি ; ৩ ইংগ্লণ্ডের মহাসভা, হসি হবাদ।

তিন ১ বোম্বাই ; ২ সিংহলদ্বীপ, বাণিজ্য ; ৩..., ...।

চার ১ ... ; ২ বজ্রাঘাত, ওলাউঠা, লার্ডক্লীবের স্ত্রীর মরণ ; ৩ হিড়িম্ব রাজ্য বিষয়।

6 সংখ্যা ২৯ জুন ১৮১৮

এক ১ সমাচার দর্পণ, রাজকর্ম্মের নিয়োগ, শ্রীযুত দৌলতরাও সিন্ধিয়া ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩... ।

দুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ আজিমের, সুপ্রীম কোর্ট।

তিন ১ জুড়িদ্বারা মকদ্দমা ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ রণজিৎ সিংহবাহাদুর।

চার ১... ; ২ ওলাউঠা ; ৩ বাজিরাও, লবণ বিক্রয়।

7 সংখ্যা ৪ জুলাই ১৮১৮

এক ১ সমাচার দর্পণ, রাজকর্ম্মে নিয়োগ ; ২ কোম্পানির ইস্তাহার, বর্ম্মার দেশ ; ৩ ... ।

দুই ১... ; ২ কানপুরে ঝড়, ওলাউটা ; ৩ নাগপুর।

তিন ১ জবলপুর, সুপ্রীম কোর্ট ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩... ।

চার ১ বাজিরাও, ইতিহাস ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

8 সংখ্যা ১১ জুলাই ১৮১৮

এক ১ সমাচার দর্পণ, সিংহল দ্বীপ, সুপ্রীম কোর্ট ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই]; ৩ নবহলণ্ড উপদ্বীপ, বাটোবিয়া।

দুই ১ সুপ্তকলম, ইউরোপ হইতে সমাচার ; ২ রথ ; ৩ সম্বলপুর, চীন দেশ।

তিন ১ স্পানিয়া ; ২ অষীন জাহাজ, টাকার আমদানী, বাজিরাও, বিবাহ ও সুপ্রীম কোর্ট।

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ সহমরণ, নূতন তালা ; ৩ বর্ম্মা দেশ।

9 সংখ্যা ১৮ জুলাই ১৮১৮

এক ১ সমাচার দর্পণ, ভূমিকম্প ; ২ বজ্রাঘাত, নাগপুরের রাজা, স্বীদেন দেশ ; ৩···, ··· ।

দুই ১ বিবাহ অন্যথা করার কথা ; ২ ধাবক, যুদ্ধ জাহাজের ব্যয়, সৎকর্ম্ম, আশ্চর্য ঝড় ও ফ্রান্সের নূতন ব্যবস্থা, আস্ত্রেয়া, স্পানিয়া আমেরিকার যুদ্ধ।

তিন ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ ···, ··· ।

চার ১ হিড়ম্ব দেশ ; ২ গির্জ্জা ঘর, বাজিরাও ; ৩ সঘণ্ট উন্দুর।

10 সংখ্যা ২৫ জুলাই ১৮১৮

এক ১ ইস্তাহার। শ্রীপীতাম্বর শর্ম্মানঃ, সমাচার দর্পণ ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

দুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ খুন, শ্রীশ্রীযুতের আগমন।

তিন ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ বাটেবিয়া, বক্কুলন ; ৩ ইংগ্লণ্ডের শেষ সমাচার।

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ পৃথিবী ও তাহার সন্তান ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

11 সংখ্যা ১ আগস্ত ১৮১৮

এক ১ সমাচার দর্পণ, শ্রীশ্রী যুত, দরবার, পেশোয়ার দেওয়ান ; ২ মথুরা, সিন্ধিয়া ; ৩···, ··· ।

দুই ১ ···, সিংহল দ্বীপ ; ২ নাগপুর, কণ্‌স্তান্তিনোপল ; ৩ বোম্বাই, শ্রীযুত ফতেহ সিংহ।

তিন ১ শ্রীরামপুর, সমুদ্রে নূতন পথের চেষ্টা ; ২ জাবা উপদ্বীপ ; ৩ কলিকাতার···, ইংগ্লণ্ডের আয়িন।

চার ১ ·· ; ২ জমিবিক্রয়ের ইস্তাহার ; ৩ বানারশের ইস্তাহার।

12 সংখ্যা ৮ আগস্ত ১৮১৮

এক ১ সমাচার দর্পণ. মরণ ; ২ আফ্রিকা দেশের টেক্স, নাগপুর, কলেজের ইস্তাহাস, গোলামের দ্বারা বাণিজ্য ; ৩ সমুদ্রে নূতন।

দুই ১…, … ; ২ শ্রীযুত যুবরাজের জন্মদিন, শ্রীব্রাম্ববাজী দাংলিয়া ; ৩ চিকিৎসকের কথা।

তিন ১ লাহোরের রাজা শ্রীযুত রণজিৎ সিংহ, খোসাল সিংহ নামে এক ব্যক্তি, চীন দেশে ইংগ্লণ্ডের উকীল ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

চার ১…; ২ জমিবিক্রয়ের ইস্তাহার ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]

13 সংখ্যা ১৫ আগস্ত ১৮১৮

এক ১ সমাচার দর্পণ, মরণ ; ২ শ্রীশ্রীযুত বাজিরাও, হপ্তকলমের ব্যবস্থার বিষয় ; ৩ পারসী দেশের উকীল।

দুই ১… ; ২ আমেরিকা, তপিদো কল বিষয় ; ৩ চীন দেশের চুরির বিষয়ে।

তিন ১ তুরুক ও রুষ দেশ, ইংগ্লণ্ডের বাদশাহের পুত্রের বিবাহ, ইংগ্লণ্ডে এক বৃদ্ধের বিবরণ ; ২ রাজকর্ম্মে নিয়োগ, কোম্পানির ইস্তাহার ; ৩ গঙ্গার নির্গমনের…।

চার ১…রাজা দয়ারাম কর্তৃক গ্রন্থ, ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে, …বাকী আদায় কারণ ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

14 সংখ্যা ২২ আগস্ত ১৮১৮

এক ১ সমাচার দর্পণ, সমাচার দেওয়া যাইতেছে, কোম্পানির কাগজ, গত যুদ্ধের বিবরণ ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

দুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ শ্রীশ্রীযুত, খুন ; ৩ কলেজ, রাজকর্ম্মে নিয়োগ, শ্রীশ্রীযুত আপাসাহেব।

তিন ১ কলিকাতাস্থ বাঙ্গালি ভাগ্যবান লোকেরদের শ্রীশ্রীযুতের নিবার্চ প্রশংসা-পত্র, কোম্পানির সুদের কাগজ ; ২ ইংগ্লণ্ডে পুস্তক ছাপাইবার ব্যবস্থা, ভারত-বর্ষের প্রাচীন নগরের বিবরণ ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

চার ১ জমি বিক্রয়ের ইস্তাহার ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

15 সংখ্যা ২৯ আগস্ত ১৮১৮

এক ১ সমাচার দর্পণ, …শ্রীশ্রীযুতের অবশিষ্ট কথা ২ ; [কোনো শিরোনাম নেই] ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

দুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ নিবেদন পত্র ; ৩ শ্রীশ্রীযুতের প্রত্যুত্তর পত্র।

তিন ১ কুষ্ঠিলোকের কারণ চিকিৎসালয় ; ২ শ্রীযুত আপা সাহেব, বোনাপাট, মিসর দেশ ; ৩ মরণ, ওলাউঠা ।

চার ১··· ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

16 সংখ্যা ৫ সেপ্তম্বর ১৮১৮

এক ১ সমাচার দর্পণ, শ্রীশ্রীযুতের অবশিষ্ট কথা ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

দুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ রাজকর্ম্মে নিয়োগ ।

তিন ১ নর্মাদাতীরস্থ দেশের সমাচার ; ২ মধ্যম হিন্দুস্থানের সমাচার, চিঠী আটকান, কুষ্ঠি লোকেরদের কারণ চিকিৎসালয় ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

চার ১ ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার ।

17 সংখ্যা ১২ সেপ্তম্বর ১৮১৮

এক ১ সমাচার দর্পণ, দাক্ষিণামেরিকা, গঙ্গাসাগরের বসতি ; ২ কোম্পানী হইতে কর্জ, পশ্চিম হিন্দুস্থান ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

দুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ ভট্রিরদের সহিত যুদ্ধ, উত্তরামেরিকা ; ৩ মহামৎস্য, চা ।

তিন ১ ওলাউঠা ; ২ শ্রীশ্রীযুতের অবশিষ্ট কথা ; ৩ দেনমার্ক ।

চার ১ গঙ্গাসাগর ; ২ সাহসের ফল, জমি বিক্রয়ের ইস্তাহার ।

18 সংখ্যা ১৯ সেপ্তেম্বর ১৮১৮

এক ১ সমাচার দর্পণ, ইংগ্লণ্ডীয় বাদশাহের পুত্রের বিবাহ, উত্তর আমেরিকা ও স্পানিয়া ; ২ সিটন সাহেবের মৃত্যু, গঙ্গাসাগর ; ৩ ভাট্টি ।

দুই ১ দেনমার্ক, অসভ্য জাতি ; ২ মহাসর্প ; ৩ জাহাজের আমদানী, শ্রীশ্রীযুতের ইস্তাহার ।

তিন ১ বিটুল মোকামে শ্রীযুত আপা সাহেব ; ২ ভাট্টি, সৈন্য, মরণ ; ৩ পারশি দেশের···কথা ।

চার ১ ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে ; ২ জমি বিক্রয়ের ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

19 সংখ্যা ২৬ সেপ্তম্বর ১৮১৮

এক ১ সমাচার দর্পণ, বিবাহের নূতন ব্যবস্থা, কর্নাটক নবাবের কর্জের বিষয় ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ ইংগ্লণ্ডীয় যুবরাজের কন্যা, মিথ্যাচার ।

দুই ১ পশ্চিম দেশের ঝড়, ইংগ্লণ্ডের রানী, শ্রীযুত আপাসাহেব ; ২ শ্রীশ্রীযুত বাজিরাও পেশোয়া, কলিকাতার নূতন খবরের কাগজ ; ৩ গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ, মহাসভা ।

তিন ১ আলজীর্স ; ২ নর্ম্ম দাসদীয় নিকট দেশের সমাচার ; ৩ লণ্ডনের সমাচারের কাগজ, রাজকর্ম্মে নিয়োগ ।

চার ১ গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ ; ২ সীসম্থিস সাজাহ, জমি বিক্রয়ের ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে ।

20 সংখ্যা ৩ অক্টুবার ১৮১৮

এক ১ কোম্পানির কাগজ, নূতন কেতাব, ইস্তাহার ; ২ গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ নাগপুরের রাজা, কলিকাতাতে জাহাজ আমদানী ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

দুই ১ বেঙ্কুলিন, ওলাউঠা ; ২ ইংগ্লণ্ড দেশের রাজবংশ ; ৩ প্রিন্সস চার্লেট অফ ওএল্‌স ।

তিন ১ মাহিনা, বানারস ও ফারাক্কাবাদের টাকা, রাজকর্ম্মে নিয়োগ, শ্রীশ্রীযুত বাজিরাও পেশোয়া ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ নাগপুর ।

চার ১ দিগদর্শন, সপ্তাহ পঞ্জিকা ; ২ হিন্দুস্থানীয় মহাজন ও গোমস্তা, বড়বাজারের মহাজন ও গোমস্তা ; ৩ জমি বিক্রয়ের ইস্তাহার ।

21 সংখ্যা ১০ অক্টুবর ১৮১৮

এক ১ কোম্পানির কাগজ, গ্রীনলণ্ডীয়েদের ধর্ম্ম ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

দুই ১ জাহাজ রপ্তানী ; ২ কলিকাতায় জাহাজ আমদানী, মানুষে মানুষ খাওয়া ; ৩ প্রিন্সস আফ ওএল্‌স, বোনাপার্ট, শ্রীশ্রীযুত বাজিরাও পেশোয়া ।

তিন ১ ইংগ্লণ্ড দেশের রাজ্য শাসন, সেবিং বেঙ্ক অর্থাৎ সঞ্চিত ধনের কুটী ; ২ গঙ্গাসাগর , ৩ মলাকা, ওলাউঠা, পারসীয়েরদের সহিত আফগানীয়েরদের যুদ্ধ ।

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ রাজকর্ম্মে নিয়োগ, আমেরিকান জাহাজের নীসান ; ৩ সপ্তাহের পঞ্জিকা, জমি বিক্রয়ের ইস্তাহার ।

22 সংখ্যা ১৭ অক্তুবার ১৮১৮

এক ১ কোম্পানীর কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, বিশ্বাসঘাতি কর্ম্ম, সিংহল দ্বীপ ; ২ দিল্লীর বাদশাহ দ্বিতীয় আকবর ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

দুই ১ করণের বিচার ; ২ আমেরিকীয় যাত্রা, আপাসাহেব ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

তিন ১ প্রতাপ রাও, দুর্গোৎসব, দিল্লীর লুট ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

চার ১ এলিয়ট সাহেব ; ২ রাজকর্ম্মে নিয়োগ, মহারাজ সিন্ধিয়া, কলিকাতায় জাহাজ আমদানী ; ৩ জমি বিক্রয়ের ইস্তাহার ।

23 সংখ্যা ২৪ অক্তুবর ১৮১৮

এক ১ কোম্পানীর কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, আপাসাহেব ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ ··· ।

দুই ১ ··· ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ ··· ।

তিন ১ এক ফকারের কথা ; ২ গোপী মোহন বাবুর শ্রাদ্ধ, ওলাউঠা ; ৩ ··· ।

চার ১ ··· ; ২ শীক সর্দার ; ৩ মহমুদ আলি, জমি বিক্রয়ের ইস্তাহার ।

24 সংখ্যা ৩১ অক্তুবর ১৮১৮

এক ১ কোম্পানীর কাগজ, সপ্তাহ পঞ্জিকা, সুপ্রীম কোর্ট ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ ··· ।

দুই ১ ··· ; ২ মুরাদাবাদ, সিংহল দ্বীপ ; ৩···, ভারতবর্ষের বাণিজ্য ।

তিন ১ ··· ; ২ সিংহল দ্বীপ, লেডী লৌডন ; ৩ ··· ।

চার ১ ··· ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ জমি বিক্রয়ের ইস্তাহার ।

25 সংখ্যা ৭ নভেম্বর ১৮১৮

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, সুপ্রীম কোর্ট ; ২ মালতা উপদ্বীপ, বালতিক সমুদ্রের বাণিজ্য, নাগপুর ; ৩ কলিকাতা ।

দুই ১ সিন্ধিয়া বংশের উপাখ্যান ; ২ শাহ আলম বাদশাহ ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

তিন ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ শাহ আলম বাদশার পুত্রবধূ··· ।

চার ১ আপাসাহেব, গোন্দ ; ২ এস্তাহার দেওয়া যাইতেছে ; ৩ জমি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

26 সংখ্যা ১৪ নভেম্বর ১৮১৮

এক ১ কোম্পানীর কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, আমেরিকা ও ইংগ্লণ্ড ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ স্পানিয়ার ক্রীত জাহাজ।

দুই ১ কবিয়ার নূতন পথ, নাগপুরের রাজা, ভগন্দর ; ২ দেন্মাক, স্পানিয়া ; ৩ বাণিজ্য, আমেরিকা।

তিন ১ সিংহল দ্বীপ, গঙ্গাসাগর দ্বীপ ; ২ নূতন খাল ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

চার ১ সুপ্রীম কোর্ট, সুমাত্র উপদ্বীপ ; ২ মিথ্যা বিবাহ, রাজকর্ম্মে নিয়োগ ; ৩ জমি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

27 সংখ্যা ২১ নভেম্বর ১৮১৮

এক ১ কোম্পানীর কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, পশ্চিমদেশের সমাচার ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

দুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ মান্দরাজ, সিংহল উপদ্বীপ, শ্রীযুত রঘুমণি বিদ্যাভূষণ, পেশোয়ার উৎপত্তি ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

তিন ১ চান্দনা চকের বাজার, গড় কোটা ; ২ কাবোল, দেশাচার ; ৩ আশ্চর্য মৃত্যু, পারস্য দেশ।

চার ১ বন্যা, ওলাউঠা ; ২ যশোহর, গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ, জমি বিক্রয়ের ইস্তাহার ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

28 সংখ্যা ২৮ নভেম্বর ১৮১৮

এক ১ কোম্পানীর কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, গোঙ্গা ও বধিরের পাঠশালা ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

দুই ১ মলাক্কা, স্পানিয়া ; ২ ওলাউঠা, সিংহল দ্বীপ, পশ্চিম দেশের সমাচার , ৩ গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ।

তিন ১ বহ্নি ও গন্ধর্ব্বিনী ; ২ রাজকর্ম্মে নিয়োগ, তালুক বিক্রয়, জাহাজ আমদানী ; ৩ যোধ সিংহ, ডে সজিনিস নামে খ্রীষ্টেয়দের এক আচার্য্য।

চার [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ জমি বিক্রয়ের ইস্তাহার ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

29 সংখ্যা ৫ দিজেম্বর ১৮১৮

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ফ্রান্স দেশের সমাচার ; ২ পুলপিনাঙ্গ ; ৩ জাহাজ আমদানী, রাজকর্ম্মে নিয়োগ, নূতন বন্য লোকেরদের বিবরণ।

দুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

তিন ১ পশ্চিম দেশের সমাচার ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

চার ১ উআহবিয়দের বিষয়ে ; ২ জমিবিক্রয়ের ইস্তাহার ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

30 সংখ্যা ১২ দিজেম্বর ১৮১৮

এক ১ কোম্পানীর কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ওলাউঠা, যুদ্ধ ; ২ হস্তকলমে ; ৩ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়।

দুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ ছবির বিষয়, রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

তিন ১ আহমদ গড়, সিংহলদ্বীপ, হসিংহাবাদ ; ২ দিনামারের জাহাজ ; ৩ দিনাজ-পুর, পাথরের উপরে খোদা।

চার ১ নবহলাণ্ড ; ২ শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, কাশ্মীর দেশ, আচীন ; ৩ জমি বিক্রয়ের ইস্তাহার।

31 সংখ্যা ১৯ দিজেম্বর ১৮১৮

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইংগ্লণ্ডের রাজকর ; ২ অবিবাহিতা স্ত্রী বিক্রয় ; ৩ চুরি।

দুই ১ মরণ, টীকার আমদানি, মুর্খ চিকিৎসকা ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ কাশ্মীর দেশ।

তিন ১ সুপ্রীম কোর্ট ; ২ পশ্চিম দেশের সমাচার, কাবোল ; ৩ বাঙ্ক আফ বাঙ্গাল।

32 সংখ্যা ২৬ দিজেম্বর ১৮১৮

এক ১ কোম্পানীর কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে ; ২ জাহাজ আমদানী, সিংহলদ্বীপ ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

দুই ১ খুন, মরণ ; ২ প্রাচীন কথা, পশ্চিম দেশের সমাচার ; ৩ [কোনো শিরো-নাম নেই]।

তিন ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ রাজকর্ম্মে নিয়োগ, হেষ্টিংস জাহাজ, যুদ্ধ সমাচার ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

চার ১ কলিকাতার সেরিফ, সহমরণ, যাত্রা ; ২ ইতিহাস, জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

33 সংখ্যা ২ জানুয়ারী ১৮১৯

এক ১ কোম্পানীর কাগজ, সপ্তাহের পত্রিকা, বোনাপার্ত ; ২ ইউরোপ দেশের বাদশাহেরদের একত্র সমাগম, জাহাজ আমদানী ; ৩ জিব্রাল্‌টর, টাকার আমদানী, শ্রীশ্রীযুত বাজিরাও পেশোয়া ।

দুই ১ রাজকর্ম্মে নিয়োগ, মারী বিষয় ; ২ ওলাউঠা, শ্রীযুত বাজিরাও পেশোয়া, শ্রীযুত রণজিৎ সিংহবাহাদুর ; ৩ ব্যাঘ্র, ডোগরা দেশ ।

তিন ১ টাকশাল ; ২ বর্ম্মার দেশ ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

চার ১ প্রাচীন কথা ; ২ ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

34 সংখ্যা ৯ জানুয়ারী ১৮১৯

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পত্রিকা, সিংহলদ্বীপ ; ২ শ্রীযুত রণজিৎ সিংহ ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

দুই ১ দিল্লী, জরমণি দেশ ; ২ সোনার নৌকা, শাহজাঁহা বাদশাহ, বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক ; ৩ যুদ্ধোদ্যোগের জনরব, যুদ্ধের সমাচার, পুলোপিনাঙ্গ ।

তিন ১ শৃগাল, রঘুমণি বিদ্যাভূষণ, তাঁহার বিষয়ে খেদোক্তি ; ২ প্রাচীন কথা ; ৩ পলাশী, কাটোয়া, গঙ্গাসাগর ।

চার ১ কৃষ্ণসর্প, ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে ; ২ ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

35 সংখ্যা ১৬ জানুয়ারী ১৮১৯

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পত্রিকা, তুলা ; ২ শন ; ৩ ইণ্ডোর, আমীর গড়, জরমণি ।

দুই ১ জরমণি দেশের এক ব্যবহার, রুষিয়া [?] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ কাজকর্ম্মে নিয়োগ, বোনাপার্ট ।

তিন ১ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকৃত নানা দেশের বিচার স্থান ; ২ হাসীন দপ্তরখানা ; ৩ গৃহদাহ, বিবাহ, শ্রীশ্রীমতি ইংগ্লণ্ডের রানী ।

চার ১ সুপ্রীম কোর্ট, আশ্চর্য উদ্ধার, প্রাচীন কথা ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে।

36 সংখ্যা ২৩ জানুয়ারী ১৮১৯

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, কলবিন সাহেব ; ২ পশ্চিম দেশ, হেষ্টিংস সাহেবের মরণ ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

দুই ১ জাহাজের আমদানী, লৌহের নৌকা, বাস্পের জাহাজ ; ২ উত্তর কেন্দ্র দর্শনের উদ্যোগ, দীর্ঘায়ু, কনস্তান্তীনোপল ; ৩ তুলার বাণিজ্য, আমেরিকা দেশ।

তিন ১ ইংগ্লণ্ড হইতে আমেরিকা গমনশীল পথিক, জিলা বর্দ্ধমান ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

চার ১ শ্রীযুত রিকেৎস্‌সাহেব ; ২ কলিকাতার জাহাজ, পশ্চিম দেশের সমাচার ; ৩ ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে।

37 সংখ্যা ৩০ জানুয়ারী ১৮১৯

এক ১ কোম্পানীর কাগজ, দক্ষিণ আমেরিকা, সপ্তাহের পঞ্জিকা ; ২ বিবাহ ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

দুই ১ শ্রী শ্রীযুত দিনামারী বাদশাহের জন্মদিন, গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ ; ২ বোনাপার্ট, নর্ম্মদা নদীতীরের সমাচার ; ৩ শ্রীযুত শাহশুজা, শ্রীযুত রণজিৎ সিংহ-বাহাদুর।

তিন ১ রাজকর্ম্মে নিয়োগ, ষ্টাম্প কাগজ, তুলা ; ২ পয়ার, বল্লাল সেন তাহার উত্তর করিলেন ; ৩ লক্ষ্মণ সেন তাহার উত্তর করিলেন, পয়ার, বল্লাল সেনের প্রত্যুত্তর, পয়ার।

চার ১ সহমরণ, শীত ; ২ লণ্ডন নগরের বিবরণ ; ৩ ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে।

38 সংখ্যা ৬ ফেব্রুয়ারী ১৮১৯

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, আশ্চর্য নূতন কল, যুদ্ধ ; ২ সুপ্রীম অর্থাৎ প্রধান কৌসিল, গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ ; ৩ শ্রীযুত রামগোপাল মল্লিকের পুত্রের বিবাহ, ডাকাতি, মরণ।

দুই ১ সহমরণ, নর্ম্মদাতীরে যুদ্ধ ; ২ দিল্লীর উকীল ; ৩ পুরনিয়াতে বন্ধ্যা স্ত্রীর সন্তান হওয়ার উপায়।

তিন ১ শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুর ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ জাহাজ, আমেরিকা, রাজকর্ম্মের নিয়োগ।

চার ১ জাহাজ আমদানী, চোর ধরা, ইস্তাহার ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে।

39 সংখ্যা ১৩ ফেব্রুয়ারী ১৮১৯

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ব্রহ্মা দেশের ব্যবহার ; ২ কাশ্মীরের উকীল, তুরুকী দেশ ও নবাব উজীরানা।

দুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ ইংগ্লণ্ডে আশ্চর্য্য মোকদ্দমা, বালকের বিপদুদ্ধার ।

তিন ১ মাথাভাঙ্গা খাল, নূতন হাসীল দপ্তর খানা ; ২ যুদ্ধ ; ৩ শীত।

চার ১ ইংগ্লণ্ডে খুসকী পথ, নাগপুর ; ২ রাজকর্ম্মে নিয়োগ, লণ্ডন নগরের লোক-সংখ্যা ; ৩ ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে।

40 সংখ্যা ২০ ফেব্রুয়ারী ১৮১৯

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, দান, জলজমাত ; ২ আমেরিকা দেশ ; ৩ পূরনীয়া, শ্রীরামপুর ।

দুই ১ ইংগ্লণ্ডে যুবরাজের কন্যা, ইস্তাহার ; ২ পঞ্চ স্বামির ইতিহাস, আশ্চর্য বালক ; ৩ ব্রহ্মা দেশ ।

তিন ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ পুস্তক ছাপান ; ৩ নূতন সম্প্রদায়, ইতিহাস।

চার ১ শ্রীরামপুরের নূতন গ্রাম, রাজকর্ম্মে নিয়োগ ; ২ ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

41 সংখ্যা ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৮১৯

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, জয়নগরের রাজার বিবরণ ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

দুই ১ সুজাওলমূলক, নয়াগড় ; ২ ব্রহ্মাদেশ ; ৩ ইংলণ্ডীয় লোক, অগ্নিদাহ ।

তিন ১ প্রয়াগ, উড়ে বেহারা, জাহাজ আমদানী, সঞ্চয়ার্থ ব্যাঙ্ক ; ২ যথার্থ বিচার, পঞ্জিকা ; ৩ শীত।

চার ১ মেঘে জলোত্থান বিষয় ; ২ ইস্তাহার, অশীর গড় ইংগ্লণ্ডের বাদশাহের কর্জ ; ৩ ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে।

42 সংখ্যা ৬ মার্চ ১৮১৯

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, পশ্চিমের যুদ্ধ ; ২ রাজপুতানা গোহত্যা নিবারণ ; ৩ নয়াগড়।

দুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ টিপুশাহের পিতা হায়দারআলীর বিবরণ ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

তিন ১ [শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

চার ১ ঢাকা, ইংগ্লণ্ড দেশের সমাচার, রাজকর্ম্মে নিয়োগ ; ২ ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

43 সংখ্যা ১৩ মার্চ ১৮১৯

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, কলিকাতা স্কুল সোসাইটি, মরণ ; ২ শ্রীশ্রীযুত, বাদপুর ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

দুই ১ বোনাপার্ত্ত, উত্তর কেন্দ্র ; ২ শ্রীযুত আপাসাহেব ও হায়দারালী ।

তিন ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ রাজকর্ম্মে নিয়োগ, ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

44 সংখ্যা ২০ মার্চ ১৮১৯

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার ; ২ বাজী ; ৩ বোনাপার্ত্ত, আলবীজ ।

দুই ১ ছয় জন সিফাহীর সাজা ; ২ পূরানিয়ার ডাকাতি ; ৩ ইংগ্লণ্ড দেশের রানী, স্বয়ং মৃত্যু ।

তিন ১ শ্রীরামপুরের চৌল, আশ্চর্য্যচাবী ; ২ জাহাজ আমদানী, মান্দ্রারাজের অন্তঃপাতী নূতন দৃষ্ট দেশ ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

চার ১ বটবৃক্ষ ; ২ খুন, জমীবিক্রয়ের ইস্তাহার ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

45 সংখ্যা ২৭ মার্চ ১৮১৯

এক ১ কোম্পানির কাগজ, ইস্তাহার, সপ্তাহের পঞ্জিকা ; ২ শ্রীযুত কোঙর হরিনাথ রায় বাহাদুরের বিবাহ ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

দুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ সমাচার, কনস্তান্তীনোপল শহর, নূতন পুস্তক, মাথাভাঙ্গা খাল ; ৩ তুলা, বোগ, আমীর গড়, আসিয়ার উপদ্বীপ ।

তিন ১ সহমরণ , ২ জয়পুর ; ৩ কবুতর দ্বারা সমাচার পাঠান, কুকুরের প্রভুভক্তি ।

চার ১ আশীর গড় ; ২ টিপুসুলতান, জমীবিক্রয়ের ইস্তাহার ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

46 সংখ্যা ৩ এপ্রেল ১৮১৯

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে, প্রথম লাট ; ২ দ্বিতীয় লাট, সমাচার দর্পণ, শ্রীরামপুরের সঞ্চয়ার্থ ব্যাঙ্ক ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

দুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ জাহাজ হানি, মরিচ উপদ্বীপ ; ৩ আশীর গড় প্রভৃতি।

তিন ১ হোলকারের সম্পত্তি লুট, বসন্ত রোগ ; ২ বজ্রাঘাত, পুস্তক ছাপান ; ৩ যুদ্ধ।

চার ১ টেক্স ; ২ জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

47 সংখ্যা ১০ এপ্রেল ১৮১৯

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা ; ২ জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার ; ৩ গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ, আশীর গড।

দুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ রাজপুথানাতে যুদ্ধ ; ৩ রঙ্গুন শহর দাহ, বিতুপিণ্ডারি।

তিন ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ জাহাজ আমদানী, বাণিজ্যের দ্রব্যের রপ্তানি বোম্বাই ; ৩ ইংগ্লণ্ড দেশের রানী, বোনাপার্ত, একশেচঞ্জুর ঘর।

চার ১ পিণ্ডারিরদের বিবরণ ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

48 সংখ্যা ১৭ এপ্রিল ১৮১৯

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার ; ২ বাণিজ্য, উত্তর কেন্দ্র ; ৩ হেষ্টিংস জাহাজ, দাসের প্রভুভক্তিগুণ।

দুই ১ গ্রহণ ; ২ আশীর গড় ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

তিন ১ ভাগীরথী ; ২ গঙ্গাসাগর, লক্ষ্মনৌয়ের নবাব, মঙ্গলবাদ্য . ৩ চড়া।

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

49 সংখ্যা ২৪ এপ্রিল ১৮১৯

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার ; ২ আশীর

গড়, দক্ষিণামেরিকা ; ৩ নেপাল দেশ, শ্রীযুত জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুরের পাঠশালা, গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ।

দুই ১ চড়ক, ইংগ্লণ্ডের রানীর মরণ ; ২ বাণিজ্যের ব্যাঙ্ক ; ৩ বৃষ্টি, ডাকাতি।

তিন ১ সৈন্য, শ্রীযুত লর্ড উএলিণ্টনের এক কীর্তি ; ২ লবণের ইস্তাহার দেওয়া গিয়াছে ; ৩ বাণিজ্য, কলিকাতার বিবরণ।

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ ইতিহাস ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

50 সংখ্যা ১ মে ১৮১৯

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

দুই ১ আশীর গড় ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ কচ্ছদেশ।

তিন ১ জয়পুর, ওলাউঠা, চড়ক ; ২ সুদ, জাহাজ আমদানী, গঙ্গাসাগর, নূতন প্রকার লোক ; ৩ বিদনূর নবাবের উকীল।

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ ইতিহাস ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

51 সংখ্যা ৮ মে ১৮১৯

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার, কমরস্যল ব্যাঙ্ক ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার।

দুই ১ হপ্তকলম ; ২ মরণ, বাজে জমী ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

তিন ১ রাজকর্ম্মে নিয়োগ ; ২ পূজা, আশীর গড় ; ৩ শ্রীযুত লক্ষনৌয়ের নবাব, মেদিনীপুর, নূতন টাকা, নদীতে সাঁতার।

চার ১ ইংগ্লণ্ডীয়াধিকারের শেষ কথা ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

52 সংখ্যা ১৫ মে ১৮১৯

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক।

দুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার ; ৩ সমাচার দর্পণোৎপত্তি।

তিন ১ হরিদ্বারের মেলা, ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ আশীর গড়, ত্রাম্বকজী দাংলিয়া, শ্রীশ্রীযুত।

চার ১ ডাকাতি ; ২ ইংগ্লণ্ডীয়াধিকারের শেষ কথা ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

53 সংখ্যা ২২ মে ১৮১৯

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার ।

দুই ১ নতুন সমাচার পত্র ; ২ ধনলাভ, আমেরিকা দেশে শীঘ্রগামী, হীরা হারাণ ; ৩ গৃহদাহ, অপমৃত্যু ।

তিন ১ বেদান্ত মত ; ২ ত্র্যম্বকজীদাংলিয়া, দিল্লী, খুন ; ৩ লমস দেন সাহেবের মৃত্যু, ইংগ্লণ্ডীয় সিপাহী ।

চার ১ ইংগ্লণ্ডীয়াধিকারের কথা ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

54 সংখ্যা ২৯ মে ১৮১৯

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার ।

দুই ১ স্কুল সোসায়িটী ; ২ পশ্চিম দেশের দৌরাত্ম্য ; ৩ হায়দরাবাদ, দিন্দাহ ।

তিন ১ কুম্ভীর, বাদশাহের জন্মদিন ; ২ শ্রীযুত রণজিৎ সিংহ, জয়পুর ; ৩ শ্রীযুত আপাসাহেব, অযোধ্যা, ইংগ্লণ্ডের রাজা ।

চার ১ হাতী ধরা ; ২ নূতন ক্রিয়া ; ৩ আজমের শহর, জয়পুর, দশহরা শাহ আকবর ।

55 সংখ্যা ৫ জুন ১৮১৯

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, স্কুল সোসায়েটী ; ২ ইস্তাহার, জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার ; ৩ দক্ষিণ আমেরিকায় সৎকর্ম্ম ।

দুই ১ ছল ; ২ রোম নগরের নিকটস্থ নদী ; ৩ কাবোল, শ্রীযুত রণজিৎ সিংহ ।

তিন ১ আজমের, রাজকর্ম্মে নিয়োগ ; ২ জাহাজ আমদানী, রাজধনাপহারক, ইংগ্লণ্ডীয় বাদশাহের হীরা হারাণ, স্পানিয়ারবিচার ; ৩ স্নানযাত্রা, ডাকাতি ।

চার ১ সহমরণ, গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ ; ২ ওলাউঠা, শাহসীকের বেতন, নূতন পুস্তক ; ৩ কাটোয়ার ঝড়, জয়পুর, দিল্লী ।

56 সংখ্যা ১২ জুন ১৮১৯

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার ; ২ বোনাপার্ত ; ৩ বোনাপার্তের চিকিৎসক ।

দুই ১ আত্মহত্যা, আমেরিকা দেশে আশ্চর্য্য ; ২ কপালভ্রগ কিল্লা, আশীর গড়, বৈদান্তিক ; ৩ স্নানযাত্রা, কুম্ভীর, ঢাকা শহরে ঝড়, শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র ।

তিন ১ রুষিয়ার [?] বাদশাহ, সূক্ষ্মবিচার ; ২ যশোহরের ব্যাঘ্র মারণ ; ৩ নূতন পুস্তক, কাশীর রাজা চেৎসিংহ ।

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

57 সংখ্যা ১৯ জুন ১৮১৯

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার ; ২ ইস্তাহার ; ৩ অর্থাৎ, সহমরণ ।

দুই ১ রথ যাত্রা, খুন, সঞ্চয়ার্থ বাঙ্ক, [২] শ্রীযুত লার্ড উএলিংতন, বৃদ্ধ লোক, [৩] ইউরোপের সৈন্য ।

তিন ১ আলজীজ দেশ, মরণ, রাজপুতানা ; ২ নদীর পথরোধ, গঙ্গাসাগর ; ৩ ভূমিকম্প, বাঙ্গালার সিংহাসন, জাহাজ আমদানি ।

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ পারসীদেশ, জগন্নাথমঙ্গল, হস্তহীন জাত ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

58 সংখ্যা ২৬ জুন ১৮১৯

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার ১২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ ইস্তাহার ।

দুই ১ শ্রীরামপুরের বাঙ্ক, কালেজ ; ২ মারী ; ৩ ডাকাতি, বজ্রপাত, রাজবংশ বৃদ্ধি ।

তিন ১ মৃতরানী, শ্রীশ্রী যুতের স্ত্রীর আগমন ; ২ খুন ; ৩ চৌর্য্য, মহামৎস্য ।

চার ১ ইংগ্লণ্ড দেশের পুস্তক বিক্রয়, দুর্জয় সর্প ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ শীত নিবারণ ।

59 সংখ্যা ৩ জুলাই ১৮১৯

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে ।

দুই ১ রাজকর্ম্মে নিয়োগ, ভূমিকম্প ; ২ ডক্তর রবিসন সাহেবের মরণ, রথ ; ৩ ওলাউঠা, সুপ্রীমকোর্ট ।

তিন ১ জুয়াচোরি ; ২ দিল্লী, দানাপুর ; ৩ ইংগ্লণ্ডের সমাচারপত্রের বিষয়ে, ঘোড়ার শীঘ্রগতি ।

চার ১ গর্দ্দভের বুদ্ধি, আশ্চর্য্য জীবন, জর্ম্মানি দেশ ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ শিল্পকর্ম্ম ।

60 সংখ্যা ১০ জুলাই ১৮১৯

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার ; ২ ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে ; ৩ লবণ বিক্রয়ের ইস্তাহার ।

দুই ১ ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে, কাপড় বিক্রয়ের ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে ; ২ ইংগ্লণ্ডের মহাবাঙ্ক ; ৩ রাজকর্ম্মে নিয়োগ, বাঙ্গালবাঙ্ক ; সুমাত্রা উপদ্বীপ ।

তিন ১ পাঞ্জাব, সাজাবারণ ; ২ গান ; ৩ বাণিজ্য ।

চার ১ আলীর গড় ও আগরার কেল্লা, নেপাল, প্রয়াগ ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

61 সংখ্যা ১৭ জুলাই ১৮১৯

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ শ্রীশ্রীযুত মহলারাও হোলকারের বিবাহ ।

দুই ১ পশ্চিম দেশের সমাচার ; ২ শ্রীযুত হারিংতন প্রভৃতির সমাচার ; ৩ ইংগ্লণ্ডের সমাচার, ধন সঞ্চয়, আশ্চর্য্য মরণ ।

তিন ১ বিদ্যাদান, দান, নূতন গঞ্জ ; ২ প্রাচীন লোক, মুসলমানেরদের ব্যবহার ; ৩ আশ্চর্য্য বিবরণ ।

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

62 সংখ্যা ২৪ জুলাই ১৮১৯

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার ; ২ কাশী ; ৩ মোকদ্দমা, বোনাপার্ত ।

দুই ১ ইংগ্লণ্ডের মোকদ্দমা, উত্তর কেন্দ্র ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ শ্রীশ্রীযুত আপা সাহেব, ভূমিকম্প ।

তিন ১ স্পানিয়ারদের কুআজ্ঞা ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ আমেরিকা, ফারসী দেশের উকীল, কাশীর প্রাচীন কথা ।

চার ১ দক্ষিণ দেশের সুবা ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ পশ্চিমদেশ, জাহাজ আমদানি ।

63 সংখ্যা ৩১ জুলাই ১৮১৯

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার ; ২ শ্রীশ্রীযুতের প্রশংসাপত্র ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

দুই ১ তলনের নামে কিল্লা ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ অনুদ্দিষ্ট বালকের পুনঃপ্রাপ্তি।

তিন ১ আশ্চর্য্যের বিবরণ ; ২ গাস, নৌকাডুবি ; ৩ চুরি।

চার ১ হিন্দুস্থানের আদালতের খরচ, মহাসাঁকো, দেউলে ; ২ জাহাজ আমদানী, বাজীরাও ; ৩ রাজকর্ম্মে নিয়োগ, গ্রীক কাব্যে কৃপণের কথা।

64 সংখ্যা ৭ আগস্ত ১৮১৯

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার, শ্রীশ্রীযুত ; ২ নাগপুর, কুষ্ঠিদের চিকিৎসালয় ; ৩ কলেজের ইস্তাহাম, নৌকাডুবি।

দুই ১ শ্রীযুত রণজিৎ সিংহবাহাদুর, অনাবৃষ্টি ; ২ রাজকর্ম্মে নিয়োগ, নীল ; ৩ খুন।

তিন ১ শ্রীরামপুরের কলেজ, সিংহগড় ; ২ ইংগ্লণ্ডে টেক্স আদায়ের খরচ, লক্ষনৌ, জাহাজ, বাণিজ্য ; ৩ আলমোরা।

চার ১ ব্রহ্মা দেশের ব্যবহার ; ২ ইতিহাস ; ৩ মস্করা।

65 সংখ্যা ১৪ আগস্ত ১৮১৯

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার, স্কুলবুক সোসাইটির ইস্তাহার ; ২ নোটচুরি ; ৩ ভূমিকম্প।

দুই ১ কুম্ভীর, জৌনপুর ; ২ শ্রীযুত রণজিৎ সিংহ, গয়াধামে ঝড় ; ৩ হপ্তকলমে ধরা, ফাঁসি ক্ষমা।

তিন ১ চিকিৎসক, বিশ্বনাথ নন্দী ; ২ ছবি ; ৩ কাননগোদপুর, সুবৃষ্টি, তণ্ডুলের মূল্য।

চার ১ ব্রহ্মাণীপূজা, দুরবীণ ; ২ কুকুরের স্তণ ; ৩ উপযুক্ত উত্তর।

66 সংখ্যা ২১ আগস্ত ১৮১৯

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, জমী বিক্রয়ের ইস্তাহার, কলেজের ইস্তাহাম ; ২ নদী মিলন, বর্দ্ধমানের কলেজ ; ৩ লাউনিলাম, হীরা বিক্রয়।

দুই ১ রাষ্ট্র বিভ্রাট, ভূমিকম্প ; ২ খুন ; ৩ মরণ।

তিন ১ বসন্ত রোগ, আড়কাটের নবাব, প্রয়াগ, জাহাজ আমদানী ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ নূতন প্রকার নৌকা, নায়কের সাহস।

চার ১ ব্যাঘ্র ; ২ কলিকাতার ছোট আদালত, বাঙ্গাল বাঙ্ক নোট লাভ. কাশীতে নিমকসার ; ৩ ইংগ্লণ্ড দেশে টেক্স, গুণাহগার, উপস্থিত বক্তা ।

67 সংখ্যা ২৮ আগস্ত ১৮১৯

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা. জমী বিক্রয়ের কোম্পানির ইস্তাহার ; ২ শ্রীযুত ত্রাম্বকজীদাংলিয়া ; ৩ তুরুক দেশ. রাজকর্ম্মে নিয়োগ ।

দুই ১ খুন ; ২ লাটরি, ব্রহ্মা দেশের বাদশাহের মরণ, বৃষ্টি ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

তিন ১ আড়কাটের নবাবের মৃত্যু, কাশ্মীর ; ২ আদালত. ফ্রান্স দেশের হাসীল দপ্তর, নূতন প্রকার রাজকর ; ৩ আশ্চর্য্য বৃক্ষ, ব্রহ্মাদেশের শেষ সমাচার ।

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ নূতন দ্বীপ, পাগলের কীর্ত্তি ; ৩ মালাইয়ের দের দুরন্ত ব্যবহার ।

68 সংখ্যা ৪ সেপ্তম্বর ১৮১৯

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে, ভূমি বিক্রয়ের ইস্তাহার ; ২ কোম্পানির ইস্তাহার ; ৩ নিমকের ইস্তাহার ।

দুই ১ সকল বিশিষ্ট লোকেরদিগকে সমাচার দেওয়া যাইতেছে, শ্রীশ্রীযুত ; ২ বাজা, রাজপুত্থানা , ৩ কাশ্মীর ।

তিন ১ হোলকারের কামান, তুলা , ২ কলিকাতার তুলার আমদানী, জাহাজ, গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ ; ৩ বন্যা, খরগোস ও তাহার মিত্রেরা ।

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ ভূত ; ৩ আশ্চর্য্য কবর ।

69 সংখ্যা ১১ সেপ্তম্বর ১৮১৯

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে ; ২ নিমকের ইস্তাহার, ভূমিকম্প ; ৩ রাজকর্ম্মে নিয়োগ. ওলাউঠা ।

দুই ১ অন্ন, অর্থ ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] , ৩ শ্রীযুত বাজিরাও পেশোয়া ।

তিন ১ মোরক্কার সুন্দরবিচার ; ২ নৌকায় ডাকাইতি, গঙ্গার ভাঙ্গন ; ৩ আশ্চর্য্য শিল্প, নূতন সমাচার ।

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ মিথ্যা নোট বারণ, আশ্চর্য্য বালক ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

70 সংখ্যা ১৮ সেপ্তম্বর ১৮১৯

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে; ২ কোম্পানির ইস্তাহার ; ৩ কাশ্মীর দেশ।

দুই ১ কাবোল দেশ, রাজকর্ম্মে নিয়োগ, বসন্ত রোগ, খুন ; ২ ধান্যলুট, ঝড় ; ৩ টাকশালের চুরি, চুরি, তাম্র টাকার ব্যবসায়।

তিন ১ নূতন পুস্তক, হেষ্টিংস সাহেব বাহাদুর ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ সিফাহির দৌরাত্ম্য, নাগপুরের সমাচার।

চার ১ বহরমপুর, খুন, মরণ ; ২ সর্প চিকিৎসক ; ৩ দৃবির ওপরে মূর্ত্তি, বিদূষক অর্থাৎ মস্করা।

71 সংখ্যা ২৫ সেপ্তম্বর ১৮১৯

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, কোম্পানির ইস্তাহার ; ২ রাজকর্ম্মে নিয়োগ ; ৩ কোম্পানির কর্জ, ইংগ্লণ্ডের রাজকর।

দুই ১ ইংগ্লণ্ডের শেষ সমাচার, নৌকাডুবি ; ২ হায়দরাবাদ, মিরট, অযোধ্যা ; ৩ চট্টগ্রাম, দানাপুর।

তিন ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো নেই]।

72 সংখ্যা ২ আক্‌টোবর ১৮১৯

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, কোম্পানির ইস্তাহার; ২ চণ্ডালগড়; ৩ রাজকর্ম্মে নিয়োগ, ভূমিকম্প।

দুই ১ কাশ্মীর ; ২ হিন্দুস্থানের প্রাচীন নগর ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

তিন ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ কলিকাতা ; ৩ চন্দ্রগ্রহণ, আশ্চর্য্যচুরি।

73 সংখ্যা ৯ আক্‌টোবর ১৮১৯

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, নূতন কর্জ ; ২ শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব ; ৩ মাসুল চুরি।

দুই ১ বাণিজ্য, রাজকর্ম্মে নিয়োগ ; ২ নীল ; ৩ মথুরা, নাগপুর, মুরশেদাবাদ।

তিন ১ হিন্দুস্থানের প্রাচীন নগর ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ ইতিহাস ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

74 সংখ্যা ১৬ আক্‌টোবর ১৮১৯

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, বোম্বাই, সুলতানপুর ; ২ নর্ত্তকী, মৌ ; ৩ বাবদ, বিদ্যার চর্চা।

দুই ১ আশ্চর্য্য বস্ত্র, আশ্চর্য্য পদাতিক ; ২ হায়দারাবাদ ; ৩ আত্মহত্যা, সুপ্রীমকোর্ট, আশ্চর্য্য উন্দুর।

তিন ১ শ্রীযুত রণজিৎ সিংহ ; ২ বোম্বাটিয়া ; ৩ বাণিজ্য।

চার ১ ইতিহাস, হিংস্রক ও কৃপণ ; ২ এক ব্যাঘ্র ও এক মনুষ্য ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

75 সংখ্যা ২৩ আক্‌টোবর ১৮১৯

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার ; ২ শ্রীশ্রীযুত, হপ্তকলম, বোম্বাটিয়া ; ৩ কচ্ছ দেশ।

দুই ১ বিদ্যার ফল, বাষ্পের জাহাজ ; ২ নীলগিরিপর্ব্বতীয় লোকেরদের বিবরণ ; ৩ আগরার তাজ অর্থাৎ শাহজাহানের কবর।

তিন ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ ইংগ্লণ্ডীয় সৈন্য ; ৩ গারোআরা।

চার ১ আক্‌টোবর মাসে এ দেশে যে যে আশ্চর্য্য কর্ম্ম হইয়াছে সে ; ২ চণ্ডাল গড় ; ৩ আশ্চর্য্য মরণ, এক শীকারি আর সর্প।

76 সংখ্যা ৩০ আক্‌টোবর ১৮১৯

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, অযোধ্যার রাজা ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ নূতন গ্রন্থ সমাপ্ত।

দুই ১ পশ্চিম হিন্দুস্থান, চুরি ; ২ ভাগ্যোদয়, কনস্তান্তিনোপল, পাগলের দৌরাত্ম্য ; ৩ মিথ্যানোট প্রাপ্তি, নূতন প্রকার তৈল।

তিন ১ গুপ্ত শত্রু, সমুদ্রের স্রোত ; ২ বাষ্পের জাহাজ, ডাক বেহারা, ফারসী রাজার উকীল ; ৩ বড় সাহেব, যুদ্ধের ব্যয়।

চার ১ নূতন গাড়ী, জায়গীর ; ২ ইতিহাস ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

77 সংখ্যা ৬ নভেম্বর ১৮১৯

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার ; ২ ইস্তাহার, খুন ; ৩ ওলাউঠা, ভূমিকম্প, দরবার, বোম্বাই ।

দুই ১ গঙ্গাসাগর, জাহাজ ; ২ মান্দারাজের সৈন্য, শ্রীযুত রণজিৎ সিংহ ; ৩ সাধারণ পাঠশালা, গত বড় সাহেবের বেতন ।

তিন ১ হায়দরাবাদ ; ২ ইংগ্লণ্ডে পাগল, বাজার ভাও ; ৩ বেলুন, মুরশেদাবাদ ।

চার ১ আশ্চর্য্য ডাকাতি ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

78 সংখ্যা ১৩ নভেম্বর ১৮১৯

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার ; ২ ইস্তাহার, পোষ্য-পুত্র ; ৩ মোহনা কাটা ।

দুই ১ মহরম, চান্দনি চকের বাজার ; ২ আত্মহত্যা, নূতন প্রকার তৈল, আশ্চর্য্য আলোক ; ৩ বাণিজ্য, ভূমিকম্প ।

তিন ১ কপোর আকর, শ্রীশ্রীযুতের ব্যবস্থা ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ ইতিহাস ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

79 সংখ্যা ২০ নভেম্বর ১৮১৯

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার ; ২ অস্ত্রাভেদ্য পোশাক, পত্র প্রেরণ ; ৩ নেপাল, শস্য দুর্ম্মূল্য, ত্র্যম্বকজী দাংলিয়া ।

দুই ১ আশ্চর্য্য আত্মহত্যা ; ২ অপমৃত্যু, আশ্চর্য্য আয়ু ; ৩ নস্য ।

তিন ১ বেলুন, গুজরাত ; ২ নূতন বাদ্য ; ৩ জবলপুর, মুরশেদাবাদ ।

চার ১ মহীমনসিংহ, কলিকাতা, এই সপ্তাহের বাজার ভাও ; ২ এক মুসলমান আর ছাগল ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

80 সংখ্যা ২৭ নবেম্বর ১৮১৯

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার ; ২ কলিকাতা ; ৩ শ্রীযুত সইজীরাও মহারাজ, গত পিণ্ডারিরদের যুদ্ধের লুট ।

দুই ১ বোম্বাই, সিংহলদ্বীপ ; ২ নূতন লবণ, ভাগীরথী নদী ; ৩ আত্মহত্যা, অকস্মাৎ মৃত্যু ।

তিন ১ লৌহ নৌকা, আশ্চর্য্য গরু ; ২ বড় বাজার, লৌহ সিন্দুক ; ৩ পর্ব্বতচলন, ব্রহ্মা দেশের আশ্চর্য্য আয়ু।

চার ১ শ্রীযুত রাজা উন্মত্ত সিংহ ; ২ কলিকাতা, গুপ্ত পূজা ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

81 সংখ্যা ৩ দিজেম্বর ১৮১৯

এক ১ কোম্পানীর কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে ; ২ কোনো শিরোনাম নেই ; ৩ রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

দুই ১ বোম্বাই, নূতন পুস্তক, বসন্ত রোগ ; ২ ওলাউঠা, দুই বালকের সাহস ; ৩ আশ্চর্য্য ডাকাইত ধরা।

তিন ১ আশ্চর্য্য শিল্পি ; ২ গঙ্গার উৎপত্তিস্থান ; ৩ এই সপ্তাহের বাজার ভাও।

চার ১ লঙ্কা, দানাপুর, যুদ্ধ ; ২ ধূমকেতু, বঙ্গলুর শহর, আশ্চর্য্য চিকিৎসা ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

82 সংখ্যা ১১ দিজেম্বর ১৮১৯

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ ব্রহ্মা দেশ।

দুই ১ মরণ ; ২ চুরি, আশ্চর্য্য অগ্নি ; ৩ কুক্কুরের জ্ঞান।

তিন ১ নাচ, শ্রীযুত দৌদ্রবেল সাহেব ; ২ নূতন কলেজ, নূতন নৌকা, লোনাবৃষ্টি ; ৩ টেক্স, জাপান দেশে ধর্ম্মাধ্যক্ষ।

চার ১ হুগলী ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

83 সংখ্যা ১৮ দিজেম্বর ১৮১৯

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ ভূপাল কৃষ্ণনগর, সেরীফের পদ।

দুই ১ নূতন বারুদ, শিল্প ; ২ আশ্চর্য্য বৃষ্টি ; ৩ মরণ, গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ, কাশ্মীরের ছাগল।

তিন ১ পুলেপিনাঙ্গ ; ২ শাহসুজা ; ৩ নীল, বর্দ্ধমানের বিবরণ।

চার ১ এক সর্পের ইতিহাস ; ২ বাজার ভাও ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

84 সংখ্যা ২৫ দিজেম্বর ১৮১৯

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার ভৌমিকেরদিগের প্রতি ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ আহমদাবাদ শহর।

দুই ১ খান্দেশ ; ২ ডাকাইতি, হঙ্গাম ; ৩ বোম্বাটিয়া, হিমালয়।

তিন ১ সাগর শহর ; ২ বিদ্যা শিক্ষা, জলের নীচে পথ ; ৩ ইউরোপে ব্যাঘ্রোৎপত্তি, হেষ্টিংস্ সাহেব, বাষ্পের নৌকা।

চার ১ পিনাঙ্গ উপদ্বীপ, শাহসুজা, ইতিহাস ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ বাজার ভাও।

85 সংখ্যা ১ জানুয়ারি ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার ; ২ বাৎসরারম্ভ ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

দুই ১ সঙ্গীন, শ্রীযুত দৌসবেল সাহেব ; ২ রুষিয়া[?], মোকদ্দমা ; ৩ আশ্চর্য্যপক্ষী, সর্প, নৌকাডুবি।

তিন ১ আশ্চর্য্য বিদ্যা, মহাঘণ্টী, রেবাড়ী ; ২ অপমৃত্যু, নাগপুর, পুকুরিয়ার মহাহাট ; ৩ হিন্দুস্থানের নদী।

চার ১ নূতন চিকিৎসা, কৃপণের স্বভাব ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ বাজার ভাও।

86 সংখ্যা ৮ জানুয়ারি ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার ; ২ বাণিজ্য, নীল ; ৩ বাঙ্গাল বাঙ্ক, বিদ্যালয়, শ্রীযুত নাগপুরের রাজা।

দুই ১ বজ্রপাত, সহমরণ ; ২ চণ্ডাল গড়, সিংহপুর ; ৩ স্কুল সোসায়িটীর ইস্তাহাম।

তিন ২ অগ্নিদাহ, আশ্চর্য্য গুদাম ; ২ মিথ্যা জনরব, ঘরের লৌহময় সাজ ; ৩ শন, দিল্লী।

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ এক ধূর্ত্ত হিন্দু ও সরল মুসলমান ; ৩ বাজার ভাও।

87 সংখ্যা ১৫ জানুয়ারি ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, নাগপুর ; ২ গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ, গাড়ীর বেগগমন ; ৩ বাষ্পের নৌকা।

দুই ১ আশ্চর্য্য ঘোটক, বোম্বাটিয়া ; ২ মরণ ; ৩ মহামৎস্য, ফতেহগড় সাঁকো।

তিন ১ ধাতু, গাড়ীর উৎপত্তি ; ২ রাজকর্ম্মে নিয়োগ, সুপ্রীম কৌসিল ; ৩ বাণিজ্য।

চার ১ প্রতারণা ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ বাজার ভাও।

88 সংখ্যা ২২ জানুয়ারি ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, যমুনা নদী ; ২ বাষ্পের নৌকা, বিবাহ সমারোহ, কেপ ; ৩ কারাগার।

দুই ১ বোম্বাটিয়া ; ২ আশ্চর্য্য দূরবীণ ; ৩ দুর্মূল্য, ফাঁসী, শ্রীযুত চিম্নাজীবাপু।

তিন ১ বাঙ্গাল বাঙ্ক, নোট হারাণ, জাহাজ, এলাহাবাদ ; ২ পর্ব্বত দর্শন, ব্রহ্ম্ম দেশ ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

চার ১ কৃপণ কথা ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ বাজার ভাও।

89 সংখ্যা ২৯ জানুয়ারি ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, রাজকর্ম্মে নিয়োগ ; ২ শ্রীযুত রাফল্স সাহেব, জাহাজের সমাচার ; ৩ আত্মঘাতী।

দুই ১ শ্রীযুত লালবাবু ; ২ কাশ্মীর দেশ, দামোদর নদ, বসন্তরোগ ; ৩ বহুকালজীবী, পিণ্ডারি, ডাকাইতি, অগ্নিদাহ।

তিন ১ সুপ্রীমকোর্টে শপথ, কালিঞ্জর গড় ; ২ আলমোড়া, আনন্দধাম, তুলা ; ৩ বাণিজ্য, মূর্তি।

চার ১ অথ হাস্যবিদ্যা ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ বাজার ভাও।

90 সংখ্যা ৫ ফেব্রুআরি ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার, সিংহল দ্বীপ ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

দুই ১ ডাকাইতি ; ২ আত্মহত্যা, কুম্ভীর ; ৩ বাণিজ্য, ভাগলপুর।

তিন ১ ওলাউঠা, হরিদ্বারের যাত্রা ; ২ হস্তকলমে ; ৩ আশ্চর্য্য চলন, চীনদেশ, হয়দরাবাদ।

চার ১ শস্ত্রবিদ্যা ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ বাজার ভাও।

91 সংখ্যা ১২ ফেব্রুআরি ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার, মসলার ইস্তাহার ; ২ বিবাহের ইস্তাহার, সহমরণ ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

দুই ১ জাহাজ দাহ, মাথা ভাঙ্গা খাল ; ২ হস্তকলমে ; ৩ দুর্মূল্য, ভাগলপুর, বিবাহ।

তিন ১ মান্দরাজের নূতন বড় সাহেব, ঘোটকের বেগগমন, আশ্চর্য্য ইন্দ্রধনুক,

কাষ্ঠের সাঁকো ; ২ লোহার সাঁকো, ওলাউঠা, পূর্ব্বদিকের উপদ্বীপ ; ৩ বাণিজ্য ।

চার ১ কলিকাতায় বাণিজ্য, সিংহপুর, খলস্বভাব ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ বাজার ভাও ।

92 সংখ্যা ১৯ ফেব্রুআরি ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার, মসলার ইস্তাহার ; ২ রাজকর্ম্মে নিয়োগ ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

দুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ আচীনের রাজা ; ৩ জাহাজ আমদানী, বোম্বাটিয়ারদের সমাচার।

তিন ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ মুঙ্করদেও পূজা ; ৩ শ্রীযুত সর জেম্স কোলব্রুক সাহেব, নূতন বিদ্যালয় ।

চার ১ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের দেবালয়, মরণ, চুরি ; ২ সংসর্গমুচের কথা ; ৩ বাজার ভাও ।

93 সংখ্যা ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, কোম্পানির ইস্তাহার ; ২ রাজকর্ম্মে নিয়োগ, নূতন রাস্থা ; ৩ প্রয়াগ, জাহাজ প্রস্তুত ।

দুই ১ নূতন প্রকার নৌকা ; ২ ডাকাইতি ; ৩ বিবাদ ভঞ্জন, সাগর শহর, মরীচ উপদ্বীপ ।

তিন ১ বিগ্রহচুরি, বাঙ্গাল বাঙ্ক নোট হারাণ, হীরার অলঙ্কারের মুক্তি ; ২ অগ্নিদাহ, সিংহলদ্বীপ, শ্রীযুত আপাসাহেব ; ৩ দুর্ম্মূল্য ।

চার ১ ধূর্ত্ত শৃগাল ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ বাজার ভাও ।

94 সংখ্যা ৪ মার্চ ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, কোম্পানির ইস্তাহার ; ২ জাহাজ আমদানী, জাহাজ রপ্তানী ; ৩ যুদ্ধের নূতন হায়ই, শ্রীযুত আপাসাহেব ।

দুই ১ নাগপুরান্তঃপাতী জালনা গ্রাম ; ২ ওলাউঠা, মুক্তি, কালিঞ্জর ; ৩ শাহসুজা, কর্ণাটকের নবাব ।

তিন ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ মহাবণিক, মরমেদ অর্থাৎ নরমৎস্য ; ৩ চীনদেশের বাদশাহের পুত্রশাসন, ব্যাঘ্র ।

চার ১ শৃগালের ধূর্ত্ততা ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ বাজার ভাও ।

95 সংখ্যা ১১ মার্চ ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, কোম্পানির ইস্তাহার ; ২ নমকের ইস্তাহার ; ৩ … ।

দুই ১ … ; ২ নূতন পুস্তক ছাপা ; সৈন্যের অধিক খরচ ; ৩ উত্তরামেরিকা, বাজী ।

তিন ১ আশ্চর্য্য চুরি, শ্রীশ্রীযুত বাজিরাও বাজিরাও পেশোয়া ; ২ নিষ্ফল পরিশ্রম, আশ্চর্য্য অগ্নিদাহ, আশ্চর্য্য ডাকাতি ; ৩…, …, … ।

চার ১ … ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ বাজার ভাও ।

96 সংখ্যা ১৮ মার্চ ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, শ্রীশ্রী ঈশ্বর ; ২ লাট বিক্রয়, রাজকর্ম্মে নিয়োগ ; ৩ … ।

দুই ১…, …, মৃত্যু, … ; ২ ওলাউঠা ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

তিন ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ … ।

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ ইতিহাস ; ৩ বাজার ভাও ।

97 সংখ্যা ২৫ মার্চ ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, শ্রীশ্রী ঈশ্বর ; ২ রাজকর্ম্মে নিয়োগ, নূতন পুস্তক ; ৩ আওরঙ্গাবাদ, অগ্নিদাহ ।

দুই ১ ওলাউঠা, মরীচ উপদ্বীপ, …২ ; যেমন কর্ম্ম তেমন ফল, সহগমন বারণ ; ৩ ভিয়ামৌ, চন্দ্রগ্রহণ ।

তিন ১ সহগমন, দস্যুবৃদ্ধি ; ২ বাস্পের কল, ভাঁজেপুর ; ৩ মহাবৃক্ষ, … ।

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ বাজার ভাও ।

98 সংখ্যা ১ এপ্রিল ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, শ্রীশ্রীঈশ্বর ২ ; ইস্তাহার, ইস্তাহার ; ৩ সিংহলদ্বীপ ।

দুই ১ সীতাপুর, সাগর শহর ; ২ সসা, ওলাউঠা ; ৩ দুঃশাসন ।

তিন ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ প্রতিনিধির দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত, হেষ্টিংস সাহেব ; ৩ অগ্নিদাহ ।

চার ১ অন্য বালক পালন, অনাবৃষ্টি ; ২ বাণিজ্য, হিতোপদেশ ; ৩ বাজার ভাও ।

99 সংখ্যা ৮ এপ্রিল ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, গঙ্গাসাগর ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ গুজরাত শহরে হাঙ্গামা।

দুই ১ মুরশেদাবাদ ; ২ আত্মহত্যা ; ৩ গোবৃক্ষ, রুষিয়া দেশ, মিসর দেশের সমাচার, বাদশাহ।

তিন ১ অগ্নিদাহ, বাণিজ্য ; ২ সুবৃষ্টি, দুর্ম্মূল্য, ডাকাইতি, মরণ, মৌ ; ৩ লেঠেরা।

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ বাজার ভাও।

100 সংখ্যা ১৫ এপ্রিল ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, রাজকর্ম্মে নিয়োগ ; ২ শ্রীযুত রণজিৎ সিংহবাহাদুর ; ৩ আত্মহত্যা।

দুই ১ দীর্ঘআয়ু, আশ্চর্য্য মনুষ্য, বিশ্বাসঘাতী ; ৩ ভ্রান্তির কুফল।

তিন ১ ওলাউঠা, যুদ্ধ জাহাজ ; ২ মহাঝড় ; ৩ আশ্চর্য্য জন্ম, পশ্চিম দেশের খাল।

চার ১ সুপ্রীম কোর্ট ; ২ শিলাবৃষ্টি ; ৩ বাজার ভাও।

101 সংখ্যা ২২ এপ্রিল ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, কোম্পানির কাগজ ; ২ গঙ্গাসাগর ; ৩ সালগ্রাম।

দুই ১ খুন ; ২ লেঠেরা ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

তিন ১ ওলাউঠা, কলিকাতা ; ২ রঙ্গন শহর ; ৩ তুলা।

চার ১ বালকের সৌজন্য ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ বাজার ভাও।

102 সংখ্যা ২৯ এপ্রিল ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ নীল।

দুই ১ পূরনীয়া, পিণ্ডারি ; ২ নৌকাডুবি, ইংগ্লণ্ড দেশ ; ৩ ওলাউঠা।

তিন ১ বৈটুল ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ ভূমিকম্প, ইংগ্লণ্ড দেশের বাদশাহ।

চার ১ সুবৃষ্টি, আওরঙ্গাবাদ, আমারোত্তী শহর ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ বাজার ভাও।

103 সংখ্যা ৬ মে ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, নূতন পুস্তক ; ২ রাজপুখানা, চান্দা শহর ; ৩ চুরি, নৌকাডুবি।

দুই ১ লেঠেরা, শেখদুল্লা ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ ওলাউঠা, ইংগ্লণ্ড দেশের বাদশাহ।

তিন ১ হরিদ্বারের মেলা ; ২ হরিদ্বারের মেলাতে সহমরণ ; ৩ হরিদ্বারের মেলাতে ঘণ্টা বাজান, বাণিজ্য।

চার ১ পাগল রাজা ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ বাজার ভাও।

104 সংখ্যা ১৩ মে ১৮২০

এক ১ কোম্পানীর কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, বাঙ্ক নোট হারাণ ; ২ রাজকর্ম্মে নিয়োগ, টাকিট হারাণ, চণ্ডালগড়, তুলা ; ৩ গাড়ী, নূতন সাঁকো।

দুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই], ২ ঝড়, ওলাউঠা, উত্তর হিন্দুস্থান ; ৩ হরিদ্বার।

তিন ১ ভারতবর্ষে প্রথম ইংগ্লণ্ডীয়দের আগমন, সময়ের আশ্চর্য্য নিরূপণ ; ২ নূতন কল, বাণিজ্য ; ৩ সুপ্রীম কোর্ট, লোভের ফল।

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ বাজার ভাও।

105 সংখ্যা ২০ মে ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, বাঙ্ক নোট হারাণ ; ২ ইস্তাহার, বড় আদালত ; ৩ শ্রীশ্রীযুত ময়রা বাহাদুর।

দুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

তিন ১ হাঙ্গোর, উপদ্রব ; ২ মান্দরাজের ঝড় ; ৩ নূতন গাড়ী, বোম্বাই।

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ খুন, ওলাউঠা ; ৩ বাজার ভাও।

106 সংখ্যা ২৭ মে ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, রাজকর্ম্মে নিয়োগ ; ২ সুপ্রীম কৌসিল, গঙ্গাসাগর ; ৩ সিংহল ভূমি।

দুই [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ শ্রীযুত রিকেৎস সাহেব, আকাশীয় বস্ত্র, হঠাৎ মৃত্যু।

তিন ১ মরণ; ২ লেঠেরার মৃত্যু, সেখ দুল্লাপিণ্ডারি; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

চার ১ আওরঙ্গাবাদ, বাণিজ্য; ২ কলিকাতার নরদামা; ৩ বাজার ভাও।

107 সংখ্যা ৩ জুন ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার; ২ ইস্তাহার, ইস্তাহার, রাজকর্ম্মে নিয়োগ ও শ্রীশ্রী যুত রণজিৎ সিংহ বাহাদুর, নৌকা ডুবি।

দুই ১ বজ্রাঘাত; ২ আত্মহত্যা, বাহযুদ্ধ, অকস্মাৎ বিপদ; ৩ ঝড়।

তিন ১ [কোনো শিরোনাম নেই]; ২ প্রত্যক্ষ স্বপ্ন, লণ্ডন নগরের জন্ম মৃত্যুর হিসাব; ৩ কুম্ভীরের হাড়, আয়ুর গণনা,…।

চার ১ সদুত্তর; ২ [কোনো শিরোনাম নেই]; ৩ বাজার ভাও।

108 সংখ্যা ১০ জুন ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, রাজকর্ম্মে নিয়োগ; ২ ইংগ্লণ্ডের বাদশাহ তৃতীয় জর্জের বিষয়, প্রকাশিত কথা; ৩ বাদশাহের মৃত্যু।

দুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই]; ২ আশ্চর্য্য নাবিক; ৩ আশ্চর্য্য বিবাহ।

তিন ১ হায়দরাবাদ; ২ মরণ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

চার ১ ইংগ্লণ্ডের বাদশাহের পুত্রের মৃত্যু; ২ [কোনো শিরোনাম নেই]; ৩ বাজার ভাও।

109 সংখ্যা ১৭ জুন ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার; ২ বাঙ্কনোট হারান, দিল্লী, বামনা স্ত্রী; ৩ গ্লাস ভক্ষণ, কাল্পনিক ভিক্ষুক, মরণ।

দুই ১ ডাকাইতি; ২ আত্মহত্যা, শঠতা; ৩ দুর্ভিক্ষ।

তিন ১ পিণ্ডারির সরদার চিতু, লালবাবুর মৃত্যু; ২ [কোনো শিরোনাম নেই]; ৩ মৃত বাদশাহের উপাখ্যান।

চার ১ বিষ, সূক্ষ্ম বিচার; ২ [কোনো শিরোনাম নেই]; ৩ বাজার ভাও।

110 সংখ্যা ২৪ জুন ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার; ২ সিংহল দ্বীপের উপপ্লব; ৩ সিন্ধিয়, হলণ্ড দেশ, চড়া নানা।

দুই ১ মোকদ্দমা, বিপদুদ্ধার; ২ রক্তবৃষ্টি, ওলাউঠা, ডাকাতি; ৩ লণ্ডন, ইংগ্লণ্ডের মৃত বাদশাহ।

তিন ১ নবদ্বীপের প্রধান চতুষ্পাঠো ; ২ ওকামণ্ডলের যুদ্ধ ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

চার ১ মরণ ; ২ নাগপুর ; ৩ বাজার ভাও।

111 সংখ্যা ১ জুলাই ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার ; ২ বাটী নিলামের ইস্তাহার ; ৩ তালুক বিক্রয়ের ইস্তাহার।

দুই ১ ঠিকানা জিলা কমিল্লা, রাজকর্ম্মে নিয়োগ ; ২ ইংগ্লণ্ডের মহাসভা, তুরকী দেশ, স্কটলণ্ড দেশ, বাজী ; ৩ নাসিকা দংশন, পাগল।

তিন ১ স্নান যাত্রা ; ২ ভো, বড়সাহেব পরীবর্ত্ত, ইংগ্লণ্ডের বাদশাহ ; ৩ শূকরের বহু সন্তান, পারিশনগর, কলিকাতায় কোম্পানির কলেজ।

চার ১ জাহাজ আমদানী, শৃগাল ও সিংহীর কথা, নিত্য কর্ম্মের ফল ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ বাজার ভাও।

112 সংখ্যা ৮ জুলাই ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, বাটী বিক্রয়ের ইস্তাহার ; ২ রাজকর্ম্মে নিয়োগ ; ৩ চালে সিন্দ।

দুই ১ কোমিটা, স্বীদেন দেশ ; ২ ফ্রান্স দেশ, মিসর দেশ ; ৩ সিংহের সহিত মনুষ্যের আনুগত্য।

তিন ১ ডুবিয়া মরা ; ২ কৃষিকর্ম্মাদি বিষয়ে সমাজ নিযুক্ত হওনের সমাচার ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

চার ১ জাহাঙ্গীর বাদশাহ ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ বাজার ভাও।

113 সংখ্যা ১৫ জুলাই ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার ; ২ রাজকর্ম্মে নিয়োগ, রথযাত্রা ; ৩ সিংহলদ্বীপ, বন্যা।

দুই ১ লক্ষ্ণৌয়ের খুন, বাণিজ্য ; ২ সাহসিকা স্ত্রী ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

তিন ১ জাহাজ আমদানি, বিবাহ ; ২ শ্রাদ্ধ ; ৩ নৌকায় ডাকাইতি।

চার ১ ইংগ্লণ্ড দেশের মহাসভা ; ২ ইংগ্লণ্ড বাদশাহের ভ্রাতা, অন্যমনস্ক ; ৩ বাজার ভাও।

114 সংখ্যা ২২ জুলাই ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার ; ২ তপশীল ; ৩ রথযাত্রা।

দুই ১ জাহাজ যাত্রা, বহুকাল রাজ্যশাসন, পতঙ্গ ; ২ দীর্ঘজীবী, আশ্চর্য্য জন্ম ও মৃত্যু, নৌকাডুবি ; ৩ জুয়াচোরী।

তিন ১ রুষিয়া, দেন্মার্ক, পর্ব্বতের চলন, কলিকাতা ; ২ বাণিজ্য, সাহসিকা স্ত্রী ; ৩ কুম্ভীর, সমান মৃত্যু।

চার ১ বধির চিকিৎসা, প্রুষিয়া দেশ ; ২ প্রাপ্তধন, ক্ষুদ্র লোকের স্বভাব ; ৩ বাজার ভাও।

115 সংখ্যা ২৯ জুলাই ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার ; ২ তপসীল ; ৩ লবণ বিক্রয়, কালেজ, পাটনা।

দুই ১ বহুকালীন মোকদ্দমা, মান্দরাজ, ফ্রান্স ; ২ জনশ্রুতি, অতিশীত, জার্ম্মানি দেশ ; ৩ ক্রমে বাদশাহী, নাবিকের সাহস।

তিন ১ বন্যা ; ২ বেহার, আচর্য্য চুরি ; ৩ খুন ও গৃহদাহ।

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ মৃত বাদশাহের সৌজন্য ; ৩ বাজার ভাও।

116 সংখ্যা ৫ আগষ্ট ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, কলিকাতার কালেজ, খুন ; ২ আশ্চর্য্য বিবাহ, মহাগড়, নূতন কল ; ৩ আশ্চর্য্য বালক।

দুই ১ নূতন বন্দর ; ২ সহমরণ, তুলা, বাজী, প্রাচীন টাকা ; ৩ কবর।

তিন ১ বৃহৎ পক্ষী ; ২ কলিকাতার নূতন রাস্থা, বাণিজ্য ; ৩ নেপাল, অপমৃত্যু।

চার ১ উপস্থিত বক্তা, মস্করা ; ২ সদুত্তর ; ৩ বাজার ভাও।

117 সংখ্যা ১২ আগষ্ট ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা. ইস্তাহার, রাজকর্ম্মে নিয়োগ ; ২ কলিকাতার কোম্পানির কালেজ ; ৩ কেপে নূতন বসতি।

দুই ১ বাতাবি উপদ্বীপ, কলিকাতার জাহাজ সংখ্যা ; ২ মরণ, বন্যা, সহমরণ, ব্যাঘ্র ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

তিন ১ নূতন হাসীলের ঘর, চীন দেশের বাণিজ্য ; ২ জুয়াচুরি ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

চার ১ ইতিহাস ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ বাজার ভাও।

118 সংখ্যা ১৯ আগষ্ট ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার, শ্রীশ্রীযুতের আজ্ঞা; ২ [কোনো শিরোনাম নেই]; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

দুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই]; ২ আশ্চর্য্য মৃত্যু, জাহাজ; ৩ অপমৃত্যু, নৌকাডুবি।

তিন ১ বাণিজ্য, জিনিস আমদানি; ২ বিবাহ বিষয়; ৩ ইংগ্লণ্ডের রাজার অভিষেক, চীনের কাগজ।

চার ১ ভেক আর সারস; ২ তাৎপর্য্য; ৩ বাজার ভাও।

119 সংখ্যা ২৬ আগষ্ট ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার, কোম্পানির রসিদ হারাণ; ২ বাঙ্কনোট হারাণ, রাজকর্ম্মে নিয়োগ, মুক্তি, ৩ লুট।

দুই ১ চুরি; ২ খুন; ৩ কুম্ভীর।

তিন ১ [কোনো শিরোনাম নেই]; ২ নৌকাডুবি, পুলিস; ৩ জিনিষ রপ্তানি রূপ্য ও স্বর্ণ আমদানী, ভ্রম।

চার ১ আশ্চর্য্য সাহস, এক বৃদ্ধ সিংহ আর পশ্বাদিগণ; ২ তাৎপর্য্য; ৩ বাজার ভাও।

120 সংখ্যা ২ সেপ্তম্বর ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, কোম্পানির রসিদ হারাণ, বাঙ্কনোট হারাণ; ২ ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে, ইস্তাহার; ৩ নিমকের ইস্তাহার।

দুই ১ বাণিজ্য; ২ ইংগ্লণ্ড দেশের ব্যয়; ৩ গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ।

তিন ১ জলবিষয়, বন্যা; ২ খুন; ৩ নৌকাডুবি, অগ্নিদাহ।

চার ১ দ্বন্দ্ব যুদ্ধ; ২ বন্ধুতার কথা, ইহার তাৎপর্য্য এই; ৩ বাজার ভাও।

121 সংখ্যা ৯ সেপ্তম্বর ১৮২০

এক ১ কোম্পানি কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে, ইংগ্লণ্ডের বাদশাহ; ২ মাস্থল চুরি, সাহসী; ৩ আশ্চর্য্য দুষ্কর্ম্ম।

দুই ১ খুন; ২ ফাঁসি খুন, বজ্রাঘাত; ৩ ইংগ্লণ্ডীয় মৃত বাদশাহের শোক চিহ্ন, জাহাজ দগ্ধ, বিবাহসম্বন্ধ ভঙ্গ।

তিন ১ মরণ, বন্যা, জাহাজ ডুবি, বেলুন; ২ অপমৃত্যু; ৩ চোর ধরা, আরব সমুদ্রে মোখা।

চার ১ বোম্বাই, বাণিজ্য ; ২ ইতিহাস ; ৩ বাজার ভাও ।

122 সংখ্যা ১৬ সেপ্তম্বর ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে ; ২ ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে ; ৩ রাজকর্ম্মে নিয়োগ, শ্রীযুত নবাব দিলাবর-জঙ্গ বাহাদুর ।

দুই ১ ইংগ্লণ্ড, মহাসভা ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ ইংগ্লণ্ডীয় নূতন মহারাজা, ইংগ্লণ্ডীয় চতুষ্পাঠী ।

তিন ১ কলদ্বারা রাস্তা পরিষ্কার, জলভাঙ্গা দেওয়াল, আত্মহত্যা ; ২ ফাঁসী, হসীংহাবাদ ; ৩ মরীচ উপদ্বীপ, বরফ ।

চার ১ মুরশেদাবাদ, নিজামলী খাঁ ; ২ ইংগ্লণ্ডের মরক ; ৩ বাজার ভাও ।

123 সংখ্যা ২৩ সেপ্তম্বর ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে ; ২ ইস্তাহার, ইংগ্লণ্ডীয় বাদশাহ ; ৩ দক্ষিণে মেরিস দেশ, কচ্ছ দেশ, দোয়াব ।

দুই ১ লুট, আশ্চর্য্য হংস, আরব সমুদ্রে মোখা ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ আশ্চর্য্য চুরি ।

তিন ১ অপমৃত্যু, সহমরণ, মূর্ত্তি খেলা ; ২ ফাঁসী ; ৩ আশ্চর্য্য কৃত্রিম, দেবীপূজা ।

চাব ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ কুবাক্যের শাসন ; ৩ বাজার ভাও ।

124 সংখ্যা ৩০ সেপ্তম্বর ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে ; ২ ইস্তাহার ; ৩ সুপ্রীম কোর্ট. ইংগ্লণ্ডীয় বাদশাহের সৈন্যসংখ্যা ।

দুই ১ চিরজীবী, অগতিকের পালনোপায়, বাদশাহ দর্শন ; ২ দ্রুতগামী, ধুম, বৃহৎ হাড়, চোরের চাতুরী ; ৩ রাজদ্রোহ, ডিম্ব বিক্রয়, স্ত্রী বিক্রয় ।

তিন ১ ব্যাঘ্র ; ২ সহগমন, বিবাহ, চুরি ; ৩ ইংগ্লণ্ডীয় নূতন বাদশাহ ।

চার ১ পোর্তুগীজের বাণিজ্য ; ২ ফ্রান্স দেশ ; ৩ বাজার ভাও ।

125 সংখ্যা ৭ আক্টোবর ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে ; ২ বোম্বের নিকটবর্ত্তিদেশে যুদ্ধ ; ৩ সহমরণ নিষেধ, নৌকা ।

দুই ১ বজ্রাঘাত, পারিশ শহর , ২ খেলা খেলাতে দণ্ড, লণ্ডন শহর ; ৩ যুদ্ধ, উন্মত্ত, খুন ।

তিন ১ আত্মহত্যা ; ২ চোরের ধূর্ত্ততা ; ৩ বস্ত্রের নূতন তন্ত্র, চিরজীবী, অপমৃত্যু।
চার ১ শস্য দুর্ম্মূল্য, ব্যাঘ্র ; ২ কলম্বস ; ৩ বাজার ভাও।

126 সংখ্যা ১৪ আক্‌টোবর ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার ; ২ কলিকাতার সুপ্রিম-কোর্ট, নাচবন্দ, লৌহের নৌকা, বোম্বে ; ৩ জাহাজ ভাসান, বাজী, সহমরণ, ইংগ্লণ্ডের নারী।
দুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই] , ২ বেয়া ভাষান, ভূমিকম্প, সাহসিকা স্ত্রী ; ৩ হঠাৎ মৃত্যু, স্ত্রী বিক্রয়।
তিন ১ জুয়াচুরি ; ২ হীরা, সিংহলদ্বীপ ; ৩ বৃহৎ ভেড়ী, নূতন ছুরি, সোনা রূপার আমদানী, বাণিজ্য।
চার ১ নূতন মন্দির, খুন ; ২ কর্জ্জ, আশ্চর্য্য নৌকা ; ৩ বাজার ভাও।

127 সংখ্যা ২১ আক্‌টোবর ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার, রাজকর্ম্মে নিয়োগ ; ২ আশ্চর্য্য রক্ষা ; ৩ দেন্মার্ক, নীলগিরি পর্ব্বত, ওলাউঠা।
দুই ১ সহমরণ, কুক্কুট ও তিত্তিরি পক্ষী ; ২ খুন, আশ্চর্য্য ক্ষত ; ৩ দুর্গোৎসব, জুয়া খেলা, নূতন প্রকার বৃত্তি।
তিন ১ দয়ালু সৈন্যাধ্যক্ষ, সন্ন্যাসী ; ২ সোর , ৩ চুরি, স্কুল বুক সোশাইটি।
চার ১ বাণিজ্য, স্বয়ংস্বীকৃত দণ্ড ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ বাজার ভাও।

128 সংখ্যা ২৮ আক্‌টোবর ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, সরিফ দপ্তরের নিলাম, রাজকর্ম্মে নিয়োগ ; ২ কলিকাতার সুপ্রীমকোর্ট ; ৩ শ্রীযুত ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহেব, হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধ।
দুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ কুপ, খুন।
তিন ১ খর্জ্জুর বৃক্ষের নামাওঠা, পরিমিটের দৌরাত্ম্য ; ২ ইংগ্লণ্ডে ভারতবর্ষের কোম্পানির সভা ; ৩ সুপ্রীম কোর্ট।
চার ১ মেহিন্দীঘাট, ভূমিকম্প, খাল, পূর্ব্বকালীন যুদ্ধ ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই]।

129 সংখ্যা ৪ নভেম্বর ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার, ডাক মারা ; ২ মিথ্যা

হুণ্ডী, নোট হারাণ ; ৩ কলিকাতা, রাজকর্ম্মে নিয়োগ, ইংগ্লণ্ডে ভারতবর্ষে কোম্পানির সভা।

দুই ১ ষড়গৃহ, অষ্টপদ কুক্কর ; ২ দুষ্টু লোক, চুরি ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

তিন ১ মরণ ; ২ ওলাউঠা, খুন, পিনাঙ্গ উপদ্বীপ ; ৩ বন্যা।

চার ১ নীল, চিনী, সোরা, মাতৃভক্তির পারিতোষিক ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ বাজার ভাও।

130 সংখ্যা ১১ নবেম্বর ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার ; ২ ইস্তাহার, শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব, নূতন খাল ; ৩ নূতন পুষ্করিণী, শ্রীযুত মহারাজ প্রতাপচন্দ্র রায় বাহাদুর অকুতোভয়।

দুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ সুপ্রীম কোর্ট ; ৩ মান্দরাজের সুপ্রীমকোর্ট।

তিন ১ দীর্ঘলোক, মৎস্য, গৈফকা, সুপ্রীমকোর্ট ; ২ গ্রান্দজুড়ি ; ৩ নীল, সংস্কৃত ভাষা, কোম্পানির বাণিজ্যের কুঠী।

চার ১ জিনিস আমদানী, জাহাজি জিনিস আমদানী, মোকাম কলিকাতাতে বর্ত্তমান জাহাজ ; ২ পিতৃভক্তি ; ৩ বাজার ভাও।

131 সংখ্যা ১৮ নবেম্বর ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার, গ্রিজা ঘর ; ২ হয়দরাবাদ, অগ্নিদাহ ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

দুই ১ সুপ্রীমকোর্ট, খুন ; ২ দেশ বিনিময়, হঙ্গাম ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

তিন ১ জাহাজ ডুবি, শিল ; ২ শুভদৃষ্টি, স্বপুত্রঘাতিনী, কৃত্রিম ভূত ; ৩ অক্সফোর্দ নগরের চতুষ্পাঠী।

চার ১ বৃষের যুদ্ধ, হস্তকলম, অর্থলাভ ; ২ কপট পুরুষ ; ৩ বাজার ভাও।

132 সংখ্যা ২৫ নবেম্বর ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার, পুনা নদীর পশ্চিমলাট ; ২ পুণা নদীর পূর্ব্ব লাট ; ৩ রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

দুই ১ খোদহাকীমী, চুরি ; ২ ভূত ; ৩ হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধ, পারসী দেশ, ডাকাইতি, জনরব।

তিন ১ স্বেচ্ছা মৃত্যু ; ২ ধূমকেতু, পর্ব্বত, আশ্চর্য্য রক্ষা ; ৩ মহাকচ্ছপ, মহাসর্প।

চার ১ প্রতিবিম্ব, ধুর্ত্ত ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ বাজার ভাও।

133 সংখ্যা ২ দিসেম্বর ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, আফীমের ইস্তাহার ; ২ শ্রীশ্রীযুতের যাত্রা ; ৩ তাঞ্জোরের রাজা।

দুই ১ ডাকাইত ধরা, মহামৎস্য, কাশী যাত্রা ; ২ অলঙ্কার গোপন, হঠাৎ চৌর্য্য ; ৩ কলিকাতা, শ্রীশ্রীযুত আপাসাহেব, ওলাউঠা, জাহাজদাহ।

তিন বিশ্বাসঘাতক, গাড়ীতে চুরি ; ২ কর্ণরোগের ঔষধ, রোমের ধর্ম্মাধ্যক্ষ, প্রহেলিকা ; ৩ স্ত্রীর ধুর্ত্ততা, শঠতার প্রতিফল।

চার ১ মহাবন্যা, ইতিহাস ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ বাজার ভাও।

134 সংখ্যা ৯ দিসেম্বর ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, হস্তী বিষয়, নোট হারাণ ; ২ আওলাৎ ভাড়া ; ৩ কালেজ, নূতন বরকন্দাজ।

দুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ বন্যমহিষ, ডাকাইতি ; ৩ বাঙ্গাল বাঙ্ক, জাহাজ আমদানী।

তিন ১ উপদেশক, জাহাজের অধ্যক্ষ, বাজি ; ২ ঘোড়া হারাণ, ইংগ্লণ্ডের রানী ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

চার ১ বাদশাহের মুকুটধারণ, আওরঙ্গজেব বাদশাহের পূর্ব্বকথা ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ বাজার ভাও।

135 সংখ্যা ১৬ দিসেম্বর ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, সুপ্রীমকোর্টের ইস্তাহার, শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ কাশ্মীর দেশ।

দুই ১ মুরশেদাবাদ, হসিংহাবাদ ; ২ বালকের জুয়াচুরি ; ৩ ডাকাইতি।

তিন ১ যাবা উপদ্বীপ, নবাব জিলাবর্জঙ্গ ; ২ দীর্ঘায়ু, ইংগ্লণ্ড দেশের পাঠশালা, চীন দেশ, খুন ধরা ; ৩ ঘড়ী চুরির সাজা।

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ ইতিহাস ; ৩ বাজার ভাও।

136 সংখ্যা ২৩ দিসেম্বর ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, বাঙ্ক নোট হারাণ, রাজকর্ম্মে নিয়োগ ; ২ বড় আদালত, নূতন কালেজ ; ৩ ভাগীরথী, নৌকাডুবি।

দুই ১ খুন, আশ্চর্য্য অনুসরণ ; ২ সিন্দ চুরি ; ৩ বাণিজ্য, নীল।

তিন ১ শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব ; ২ চীন দেশের বাদশাহ, দণ্ড, ইংগ্লণ্ডের রানী ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

চার ১ মহাধূর্ত্ত ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ বাজার ভাও।

137 সংখ্যা ৩০ দিসেম্বর ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার, রাজকর্ম্মে নিয়োগ ; ২ দ্বারকা ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

দুই ১ শ্রীযুত করণল ড.এল সাহেব ; ২ মানিলা উপদ্বীপে উপপ্লব ; ৩ কাশগর, খুন।

তিন ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ মহাবান সিংহ, ডাকাইতি ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

চার ১ আত্মহত্যা ; ২ সহগমন, বেগমের মৃত্যু ; ৩ বাজার ভাও।

138 সংখ্যা ৬ জানুয়ারি ১৮২১

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার, শ্রীযুত কালীপ্রসাদ দত্ত ; ২ নূতন বাঙ্ক ; ৩ শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব, আফীম।

দুই ১ দিল্লী, ভূমিকম্প, পরীক্ষা ; ২ সহমরণ, ওলাউঠা, মানিলা উপদ্বীপ, ৩ খুন।

তিন ১ নীল, আশ্চর্য্য ধূর্ত্ততা ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ ডাকাইতি।

চার ১ ব্রহ্মদেশ, গুণাগ্রাহক ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ বাজার ভাও।

139 সংখ্যা ১৩ জানুআরি ১৮২১

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার ; ২ তালুক বিক্রয়, স্থপ্রীম কোর্ট ; ৩ শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব, সাজা মরণ।

দুই ১ আত্মহত্যা, গত বৎসর বাণিজ্যের জুমুলা ২ ; [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ অকস্মাৎ মৃত্যু।

তিন ১ আমেরিকা দেশ ; ২ ডাকাইতি ; ৩ খুনের প্রমাণ।

চার ১ চোর, , ২ ইংগ্লণ্ড, শ্রীশ্রীযুত ইংগ্লণ্ডীয় বাদশাহ, নূতন সাঁকো ; ৩ বাজার ভাও।

140 সংখ্যা ২০ জানুআরি ১৮২০

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার ; ২ ইস্তাহার ; ৩ মহারাজ প্রতাপচন্দ্র রায় বাহাদুর।

দুই ১ গঙ্গাসাগরোপদ্বীপের সোসায়িটী, শোক চিহ্ন ধারণ, সহমরণ, ব্যাণ্ডা-

উপদ্বীপ ; ২ শ্রীযুত জেমস স্টুয়ার্ট সাহেব, শ্রীযুত লর্ড বিশপ সাহেব, সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব ; ৩ কানপুর, সৈন্য প্রেরণা, সাঁকো।

তিন ১ অস্ত্রচিকিৎসা, জেমেকা উপদ্বীপ, ঘোড়দৌড় ; ২ জর্ম্মনি দেশ, পর্ব্বতপতন ; ৩ ছবি, বজ্রাঘাত।

চার ১ মৎস্যদ্বারা আশ্চর্য্য প্রমাণ ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ বাজার ভাও।

141 সংখ্যা ২৭ জানুআরি ১৮২১

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পত্রিকা, ইস্তাহার ; ২ রাজকর্ম্মে নিয়োগ ; ৩ ব্যাঘ্র।

দুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ বোম্বাটিয়া. শ্রীযুত আলেক্সান্দ্র সাহেব, তুলা ; ৩ পশ্চিম আমদানি, জাহাজীয় আমদানি, কাল পোশাক।

তিন ১ জাহাজ ডুবি, বিযোনি জন্ম, মান্দরাজ ; ২ নূতন ছাপা প্রকরণ ; ৩ নানা ভাষা, নূতন গ্রন্থ, নিন্দার ফল, হিতোপদেশ।

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ বাজার ভাও।

142 সংখ্যা ৩ ফেব্রুয়ারি ১৮২১

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পত্রিকা, ইস্তাহার ; ২ ইস্তাহার ; ৩ রাজকর্ম্মে নিয়োগ, খুন।

দুই ১ আশ্চর্য্য বিবাহ ; ২ বোম্বাটিয়া ; ৩ মান্দরাজ, পণ্ডিচেরি, হয়দরাবাদ।

তিন ১ স্মৃতি, জৌনপুর, পুলোপিনাঙ্গ ; ২ ওলাউঠা, প্রয়াগ, জাহাজ ডুবি ; ৩ কয়লোবরি।

চার ১ পার্সিদেশ, চীনের রাজা, আয়ুঃ শেষ না হইলে মৃত্যু হয় না তাহার কথা ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ বাজার ভাও।

143 সংখ্যা ১০ ফেব্রুআরি ১৮২১

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পত্রিকা, ইস্তাহার ; ২ ইস্তাহার, রাজকর্ম্মে নিয়োগ ; ৩ নূতন আয়িন।

দুই ১ নূতন গ্রন্থ, পাঠশালা, সিংহলদ্বীপ ; ২ আসাম দেশ, ওলাউঠা ; ৩ অকস্মাৎ মৃত্যু, বাগদাদ।

তিন ১ জাহাজ, মস্কাট ; ২ ইংগ্লণ্ডের রাজা, বাণিজ্য ; ৩ চিত্রকর, নূতন নৌকা।

চার ১ সাঁকো, ধাতু, বারএয়ারি পুজা, পতাকারক্ষক; ২ ধান্যচোর ; ৩ বাজার ভাও।

144 সংখ্যা ১৭ ফেব্রুআরি ১৮২১

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার, বাটী বিক্রয় ; ২ রাজকর্ম্মে নিয়োগ ; ৩ যুদ্ধ।

দুই ১ মোববোম্বে, মুরশেদাবাদ ; ২ নূতন জাহাজ, নূতন ব্যবস্থা, ফ্রান্সীয় রাজধানী পারিশ ; ৩ আশ্চর্য্য চিকিৎসা।

তিন ১ চীন দেশ ; ২ আশ্চর্য্য যমজ সন্তান, শ্রীশ্রীযুত ইংগ্লণ্ডীয় বাদশাহ, আশ্চর্য্য গোধুম, বোলতা ; ৩ শিলাবৃষ্টি, ফ্রান্স দেশ, ড্যাকডি বেরি সাহেব।

চার ১ ইংগ্লণ্ডের শ্রীশ্রীমতী মহারানী, কৌতুকোপাখ্যান, আশ্চর্য্য স্বপ্ন ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ বাজার ভাও।

145 সংখ্যা ২৪ ফেব্রুআরি ১৮২১

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার, অপহৃত, পুনর্লাভ ; ২ রাজকর্ম্মে নিয়োগ ; ৩ বহুমূল্য প্রস্তরের গণেশ মূরতি।

দুই ১ আশ্চর্য্য চুরি ; ২ খুন ; ৩ সিংহলদ্বীপ, জাহাজ।

তিন ১ রাজপুথানা, শিবরাত্রি, সারজ্ঞানী ; ২ শ্রীশ্রীমতী মহারানী, নূতন কল, যথার্থিক লোক ; ৩ বাজার ভাও।

চার ১ বাবুর উপাখ্যান ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই], ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

146 সংখ্যা ৩ মার্চ ১৮২১

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার, ইস্তাহার ; ২ রাজকর্ম্মে নিয়োগ, শ্রীযুত আপাসাহেব ; ৩ বেগম সমরু, নূতন রাস্তা, ডাকাইত ধরা।

দুই ১ ঝড় বৃষ্টি, রাজপুত পেয়াদা ; ২ ডাকাইত ; ৩ গোলাম বৃদ্ধি।

তিন ১ তাঞ্জারর ; ২ ঝড় তুফান ; ৩ বারোএয়ারি পূজা, বাণিজ্য, কোম্পানীর

চার ১ শ্রীশ্রীযুত মানসিংহরাও পাতঞ্জর, শ্রীশ্রীমতী মহারানী ; ২ বহুপত্যা, ইচ্ছা ফাঁসী ; ৩ বাজার ভাও।

147 সংখ্যা ১০ মার্চ ১৮২১

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, রাজকর্ম্মে নিয়োগ ; ২ কোম্পানির কর্ম্মকারিরদের সংখ্যা ; ৩ ইন্দোর।

দুই ১ জাহাজ ; ২ শ্রীশ্রীযুত মহারাজ সরফোজীবাহাদুর ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

তিন ১ দণ্ড, বাণিজ্য ; ২ মানা ; ৩ মুক্তি, রুষিয়ার লোক সংখ্যা।

চার ১ ফ্রান্স দেশ, হিতোপদেশ ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ বাজার ভাও।

148 সংখ্যা ১৭ মার্চ ১৮২১

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, নোট হারাণ ; ২ রাজকর্ম্মে নিয়োগ, মেক্লিণ্টক কোম্পানি ; ৩ কলবিন কোম্পানী, আত্মঘাতী।

দুই ১ দৈব মৃত্যু, ঝড় ; ২ গোধুম, স্বর্ণ রুপ্য, জাহাজ ভগ্ন ; ৩ নির্দয়, জন্ম।

তিন ১ বিবাহ, মৃত্যু, মান্দরাজের মুক্তি, স্মৃত্তি ; ২ তুলা, নীল, শ্রীশ্রীযুত সরফুজী মহারাজ ; ৩ অগ্নিদাহ, পিস্তল, আশ্চর্য্যদর্শন, গিরজাঘর।

চার ১ সাঁকো, অসভ্যতা, আশ্চর্য্যালয় ; ২ আশ্চর্য্য শিশুমার, ইংগ্লণ্ডের মহারানী ; ৩ বাজার ভাও।

149 সংখ্যা ২৪ মার্চ ১৮২১

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, স্বর্ণঘড়ী হারাণ, নোট হারাণ ; ২ শ্রীশ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুর ; ৩ শ্রীযুত মহারাজ সরফুজী, অগ্নিদাহ, খুন।

দুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ অপমৃত্যু ; ৩ লুঠ, বজ্রাঘাত, গিরজা, পারিস নগরের লোকসংখ্যা, আরব দেশ।

তিন ১ মানিলা উপদ্বীপ ; ২ ধুমকেতু, সিংহলদ্বীপ, আশ্চর্য্য ঔষধি, ডাকাইতি ; ৩ উন্মত্ত, ওলাবাঘা।

চার ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার ; ২ রাজদূত ; ৩ বাজার ভাও।

150 সংখ্যা ৩১ মার্চ ১৮২১

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার ; ২ রাজকর্ম্মে নিয়োগ ; ৩ ইংরেজী, বাঙ্গালী অভিধান।

দুই ১ কালেজ ; ২ আশ্চর্য্য খুন, ডাকাইতি ; ৩ অগ্নিদাহ।

তিন ১ মোকদ্দমা, অশ্ব ; ২ আরব দেশ, দস্তা ; ৩ এপ্রিল ফুল, আশ্চর্য্য সন্তান।

চার ১ চুরি, শ্রীশ্রীমতী মহারানী, জাহাজ মারা ; ২ হস্তিদন্ত, পুরাতন মুদ্রা ; ৩ বাজার ভাও।

151 সংখ্যা ৭ এপ্রিল ১৮২১

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার, নোটহারাণ ; ২ শ্রীশ্রীযুত পামর কোম্পানী, শ্রীযুত রিচার্ডসন কোম্পানী ; ৩ কোম্পানীর বাহাদুর, শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেব, ডাকাইতি।

দুই ১ মান্দরাজ, মহামহাবারুনী ; ২ অগ্নিদাহ, খুন, সহমরণ ; ৩ মানিলা উপদ্বীপ, জাহাজডুবি।

তিন ১ জিনিস আমদানী, যুদ্ধ ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ জাহাজ, আশ্চর্য্য সিংহ।

চার ১ হিত করিলে বিপরীত ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ বাজার ভাও।

152 সংখ্যা ১৪ এপ্রিল ১৮২১

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার, নুরানাবি ; ২ রাজকর্ম্মে নিয়োগ, শ্রীশ্রীযুত লর্ড বিশপ, আশ্চর্য্য চুরি ; ৩ আশ্চর্য্য ডাকাইতি।

দুই ১ নূতন রাস্তা ; ২ অগ্নিদাহ ; ৩ চুরি, বামন।

তিন ১ ওলাউঠা, মৃত্যু ; ২ বাণিজ্য, জিনিস রপ্তানী ; ৩ জাহাজ ভাসান, চুঁচুড়ার সং।

চার ১ কাচীকাটা, নিরুপরুদ্ধ বিচার ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ বাজার ভাও।

153 সংখ্যা ২১ এপ্রিল ১৮২১

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, কর্ণাট দেশের নবাব ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

দুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ জুয়াচুরি, অগ্নিদাহ ; ৩ প্রাচীন পদ্মপত্র, জয়ন্তীপুরের নরবলির জবানবন্দী।

তিন ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

চার ১ নূতন গ্রিজাঘর, আশ্চর্য্য মৃত্যু ; ২ আত্মঘাতী, উপস্থিত বক্তা ; ৩ বাজার ভাও।

154 সংখ্যা ২৮ এপ্রিল ১৮২১

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, বিক্রয়ের ইস্তাহার ; ২ ইস্তাহার, রাজকর্ম্মে নিয়োগ ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

দুই ১ শ্রীযুত নূতন বড় সাহেব ; ২ অনাবৃষ্টি, ডাকাইত ; ৩ মুরশেদাবাদ।

তিন ১ সঙ্কট, মহামৎস্য, জাহাজ ভাসান; ২ হঠাৎ মৃত্যু, চান্দা, জন্মদিবস ; ৩ অজ্ঞাত মৃত্যু, ডাকাইতি।

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ বাজার ভাও।

155 সংখ্যা ৫ মে ১৮২১

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার ; ২ রাজকর্ম্মে নিয়োগ, কোম্পানির কাগজ ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

দুই ১ স্মরণার্থ স্তম্ভ ; ২ গাজীপুর, স্ফূর্ত্তি, বৃহৎ হস্তী ; ৩ ওলাউঠা।

তিন ১ চট্টগ্রাম, শ্রীযুত লর্ড সাহেব ; ২ শ্রীভোজদেব, অগ্রদ্বীপ ; ৩ সমাচার বিলম্ব, আশ্চর্য্য দূরদর্শী, ঝড়।

চার ১ জাহাজ ভাসান, ভ্রান্তি, স্বয়ংদোষ প্রকাশ ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ বাজার ভাও।

156 সংখ্যা ১২ মে ১৮২১

এক ১ কোম্পানির কাগজ ; ২ সপ্তাহের পঞ্জিকা, চুরির ইস্তাহার ; ২ পাঠশালা, রাজকর্ম্মে নিয়োগ ; ৩ জনরল ত্রেজুরি, পরমিট, মরণ।

দুই ১ নীল, ডাকাইতি, রাহাজানি ; ২ অগ্নিদাহ, জাহাজ ভাসান, হাঙ্গোর ; ৩ পর্ব্বত, আশীর গড়।

তিন ১ কেন্দুয়া ; ২ বজ্রাঘাত ; ৩ ভূমিকম্প, বামন, দক্ষিণামেরিকা।

চার ১ অশিক্ষিত শিক্ষা ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ বাজার ভাও।

157 সংখ্যা ১৯ মে ১৮২১

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার ; ২ নূতন কর্জ, অবোধমৃত্যু ; ৩ মসাটগ্রাম, আশ্চর্য্য ঝড়।

দুই ১ নূতন হুকুম, কুম্ভীর, পোষা হরিণ ; ২ সহমরণ বাধা, রঙ্গন ; ৩ মৃত্যু।

তিন ১ ইংগ্লণ্ডের রানী ; ২ অতি প্রাচীন ; ৩ মৎস্য শৃঙ্গ, উপযুক্ত শোধ।

চার ১ বাজী, বাজীকর ; ২ আশ্চর্য্য বন্দুক, আশ্চর্য্য অগ্নি ; ৩ বাজার ভাও।

158 সংখ্যা ২৬ মে ১৮২১

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার ; ২ রাজকর্ম্মে নিয়োগ ; ৩ জাহাজ, টর্ণি, বসরা, সহমরণ।

দুই ১ লাহোর, দিল্লী ; ২ ডাকাইতি ; ৩ লাখনৌ, হয়দরাবাদ, হাজোর।

তিন ১ পার্ব্বতীয় অগ্নি, মান্দরাজ, রাজশাহী ; ২ বাদশাহের জন্মদিন, আশ্চর্য্য জন্তু, শ্রীশ্রীমতীরানী ; ৩ চৈতন্য মঙ্গল গান শ্রবণের ফল অতিসুমধুর কথা।

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ বাজার।

159 সংখ্যা ২ জুন ১৮২১

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

দুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ রাজকর্ম্মে নিয়োগ, ডাকাইতি ; ৩ খান দেশ।

তিন ১ কর্ণাট দেশের নবাব, জাহাজ আমদামী, সেগুন কাট, ভূমিকম্প, বহরমপুর ; ২ মান্দরাজ, আশ্চর্য্য চাকু ; ৩ আশ্চর্য্য শাক।

চার ১ বাজী, গুরুদক্ষিণা ; ২ জাহাজ দাহ ; ৩ বাজার ভাও।

160 সংখ্যা ৯ জুন ১৮২১

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, ইস্তাহার ; ২ পোষ্ট আপীস, জনরল ত্রেজুরি, বোম্বে ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

দুই ১ মুরশেদাবাদ ; ২ খুন, স্ফূর্ত্তি, জাহাজ ডুবি ; ৩ দোআব অর্থাৎ গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্ত্তী দেশ।

তিন ১ মৃত্যু, ঘোড়াচুরি ; ২ স্কুল শোসইটী ; ৩ দেশ ভ্রমণ।

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ বাজার ভাও।

161 সংখ্যা পাওয়া যায় নি।

162 সংখ্যা ২৩ জুন ১৮২১

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পঞ্জিকা, রাজকর্ম্মে নিয়োগ ; ২ সুপ্রীমকোর্ট, মাদরাজের সুপ্রীমকোর্ট ; ৩ মুরশেদাবাদ, কানপুর।

দুই ১ খুন, মোং জলনা ; ২ ওলাউঠা ; ৩ ফতেগড়।

তিন ১ মহিস ; ২ নূতন পথ, মান্দরাজ ; ৩ কদর্য, মহাসন্তোষে মরণ।

চার ১ শৌকীন বাবু ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই], ৩ বাজার ভাও।

163 সংখ্যা ৩০ জুন ১৮২১

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পত্রিকা, সমাচার দেওয়া যাইতেছে ; ২ নতুন পুস্তক ; ৩ ডাকচুরি, খুন।

দুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ আত্মহত্যা ; ৩ চট্টগ্রাম।

তিন ১ মান্দরাজ, অনাবৃষ্টি, সমকালীন মৃত্যু ; ২ বিবাহভঙ্গ, দুগ্ধবতী গো, ক্ষুদ্র-রাক্ষস, বরবোন উপদ্বীপ ; ৩ … ।

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ বাজার ভাও।

164 সংখ্যা ৭ জুলাই ১৮২১

এক ১ কোম্পানির কাগজ, সপ্তাহের পত্রিকা, ইস্তাহার, ইস্তাহার ; ২ ইস্তাহার, রাজকর্ম্মে নিয়োগ, বেগম সমরু, লখনৌ।

দুই ১…, … ; ২ খুন, সুপ্রীম কোর্ট।

তিন ১ সহমরণ, প্রেরিত পত্র ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই]।

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ বাজার ভাও ; ৩ … ।

165 সংখ্যা ১৩ জুলাই ১৮২১

এক ১ ইস্তাহার, ইস্তাহার, ইস্তাহার, ইস্তাহার ; ২ শ্রীযুত চিন্তামণিরাও, নৌকাডুবি।

দুই ১…শ্রীরামপুরে ; ২ ওলাউঠা, জিলা সায়ণ, ইউরোপ, বাজীকর।

তিন ১ সোসাইটী, ঘড়ী চুরি, মৃত্যু, ফ্রান্স দেশ ; ২ প্রেরিত পত্র।

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ কোম্পানীর কাগজ, সপ্তাহের পত্রিকা, বাজার ভাও।

তি ন

'সমাচার চন্দ্রিকা'র ৩৬টি সংখ্যার পৃষ্ঠা-অনুগ সূচিপত্র

পত্রিকার সংখ্যাগুলি কালানুক্রমিক নয়। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'-এর সংগ্রহ অনুযায়ী সূচিপত্র সংকলিত হল। ১৮২৯-এর এপ্রিল থেকে চন্দ্রিকা সপ্তাহে দুইবার বেরত। এ তালিকায় এই সময়ের সব সংখ্যা নেই।

শব্দে লেখা সংখ্যা (এক, দুই ইত্যাদি)=পৃষ্ঠাসূচক, বাংলা সংখ্যা (১, ২ ইত্যাদি)=কলম সূচক। যেখানে পৃষ্ঠাসংখ্যা দেয়া নেই সেখানে পৃষ্ঠাসংখ্যাটি চিহ্নিত করা যায় নি। যে-পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ নষ্ট তা উল্লেখ করা হয় নি।

৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮

এক ১… ; ২… ; ৩ রাজকর্ম্মে নিয়োগ পোলিস।

দুই ১ জাহাজ ভাসান, ইষ্ট ইণ্ডিয়া মেকজিন ; ২… ; ৩ দর্পণ প্রকাশকের…।

তিন ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ দিল্লী, জম্বুদ্বীপোপাখ্যান (পুরাণ মর্ম্ম)।

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ প্রেরিত পত্র ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

পাঁচ ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ ধর্ম্মসভা, পোলিসের হুকুম ; ৩ সিঁদ চুরি।

ছয় ১ মালিয়া, নীল ; ২ ফাঁসি, মিডিকেল, ফিজিকেল সোসাইটি, পুরাণ মর্ম্ম ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮

এক ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

দুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

২১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮

… ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ রাজকর্ম্মে নিয়োগ ; ৩ ছোট আদালত, জেনরেল আর্ডর, মৃত্যু।

… ১…, অন্য সমাচার পত্র হইতে নীত ; ২ প্লক্ষ দ্বীপোপাখ্যান (পুরাণ মর্ম্ম) ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

… ১ প্রেরিত পত্র ; ২… ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

… ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ জাহাজ সংবাদ ।

২৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮

এক ১ সরিফসেল ; ২ সরিফসেল ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

দুই ১ কলিকাতার পরিশোধাক্ষম ঋণিদিগের পরিত্রাণের আদালত ; ২ বিজ্ঞাপন ; ৩ ইশতাহার ।

তিন ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ সমাচার চন্দ্রিকা ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ শ্রীযুত…বেথি সাহেব, শ্রীশ্রীযুত ইংলণ্ড-দ্বিপপতি ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

পাঁচ ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ মৃতের পুনর্জীবন ; ৩ বাবু রাঘব রাম গোস্বামির মৃত্যু, অথগ্রীষ্ম বর্ণনং ।

ছয় ১ বর্তমান হিন্দুরাজার উপাখ্যান (আসাম রাজ্য) ; ২ প্রেরিত পত্র ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

সাত ১ প্রেরিত পত্র ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

আট ১ শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় মহোদয়েষু ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ জাহাজের সংবাদ ।

২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮

এক ১ সংস্কৃত গ্রন্থ ; ২ ইশ্‌তেহার, পুস্তক বিক্রয় ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

দুই ১ সমাচার চন্দ্রিকা ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ … ।

তিন ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ রাজকর্ম্মে নিয়োগ ।

পাঁচ ১ ইনসালবেণ্ট কোর্ট ; ২ হরিনাম সংকীর্ত্তন ; ৩ বসন্ত রোগ ।

ছয় ১ আশ্চর্য্য প্রতিমা, পুরাণ মর্ম্ম ; ২ প্রেরিত পত্র ।

সাত ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২…গুণনিকর শ্রীযুত চন্দ্রিকা…ধার্ম্মিকবরেষু ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

আট ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ বারাণসী, শ্রীযুত চন্দ্রিকা প্রকাশক মহাশয়েষু ; ৩ জাহাজ সংবাদ ।

৩২ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮

এক ১ সরিফসেল ; ২ কলিকাতার পরিশোধাক্ষম ঋণিদিগের পরিত্রাণের আদালত ; ৩ কলিকাতার পরিশোধাক্ষম ঋণিদিগের পরিত্রাণের আদালত ।

দুই ১ সংস্কৃত গ্রন্থ ; ২ ইশতেহার, পুস্তক বিক্রয় ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

তিন ১ [কোনো শিরোনাম নেই] , ২ রাজকর্ম্মে নিয়োগ, শ্রীযুত গবরনর জেনরেল বাহাদুর ; ৩ মিডিকেল এণ্ড ফিজিকেল সোসাইটী, মৃজাপুর, জাতিভ্রষ্টের ফল ।

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ পার্লিমেণ্টের সুধারা ।

পাঁচ ১ শ্রীযুত সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু ; ২ ত্রিপুরা রাজ্য ; ৩ প্রেরিতপত্র ।

ছয় ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

সাত ১ কামরুপযাত্রা পদ্ধতি…গ্রন্থের অনুষ্ঠান, ধার্ম্মিকবর শ্রীযুত চন্দ্রিকা প্রকাশক মহাশয়েষু ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

আট ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ কোম্পানির কাগজ ।

৩ আষাঢ় ১২৩৮

এক ১ সংস্কৃত গ্রন্থ ; ২ ইশ্‌তেহার ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

দুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [শিরোনাম নেই] ; ৩ শ্রীযুত গবরণর জেনরল বাহাদুর, বজ্রপাত ।

তিন ১ অতিশয় বরফ, জলমগ্ন ; ২… ; ৩… দংশনে মৃত্যু ।

চার ১ কাশদ্বীপোপাখ্যান ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ প্রেরিতপত্র ।

পাঁচ ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

ছয় ১ শ্রীযুত সমাচার চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

সাত ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

আট ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ জাহাজের আগমন ।

১০ আষাঢ় ১২৩৮

এক ১ সংস্কৃত গ্রন্থ ; ২ ইশ্‌তেহার, পুস্তক বিক্রয় , ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

দুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

তিন ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

চার ১ সুপ্রীম কোর্ট, শ্রীযুত কলোনেল মোরসিয়ন সাহেব. শ্রীযুত লর্ড ডালহৌসী ; ২ বিষয়চৌর্য্য ; ৩ অত্যুৎকটৈঃ পাপপুণ্যৈ রিহেব ফল মশ্নুতে ।

পাঁচ ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ সিকাবতিদেশ ; ৩ লাহোর ।

ছয় ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ ক্রৌঞ্চ-দ্বীপোপাখ্যান ।

সাত ১ প্রেরিত পত্র ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ নিখিলগুণাকর শ্রীযুত চন্দ্রিকা প্রকাশক মহাশয়েষু ।

আট ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [শিরোনাম নেই] , ৩ জাহাজের আগমন, কোম্পানীর কাগজ ।

১৪ আষাঢ় ১২৩৮

এক ১ সরিফ সেল ; ২ সরিফ সেল ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

দুই ১ নোট খোয়া গিয়াছে, বিজ্ঞাপন, সংস্কৃত গ্রন্থ ; ২ ইশতেহার. পুস্তক বিক্রয় ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

তিন ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

পাঁচ ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ সিমাফোরেস, দৈবঘটনা ; ৩ জানরেল আর্ডর, আশ্চর্য্য মৃত্যু ।

ছয় ১ কোচ বিহার রাজ্য ; ২ প্রেরিত পত্র ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

সাত ১… ; ২… ।

আট ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ জাহাজের সংবাদ, কোম্পানির কাগজ।

১৭ আষাঢ় ১২৩৮

এক ১ কলিকাতার পরিশোধাক্ষম ঋণিদিগের পরিত্রাণের আদালত ; ২ কলিকাতার পরিশোধাক্ষম ঋণিদিগের পরিত্রাণের আদালত ; ৩ নোট খোয়া গিয়াছে, সংস্কৃত গ্রন্থ।

দুই ১ ইশতেহার, পুস্তক বিক্রয় ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

তিন ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ রাজকর্ম্মে নিয়োগ, শ্রীযুত ফ্রেং বেথি সাহেব ; ৩ ধর্ম্মসভা।

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ বিপদ, হঠাৎ মৃত্যু ; ৩ আশ্চর্য্য মৃত্যু, সরকারি ইশতেহার।

পাঁচ ১ পোলিস ; ২ বোম্বে, আসাম ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

ছয় ১ প্রেরিত পত্র, ২ অশেষ গুণকৃপার বিজ্ঞভরসায় শ্রীলশ্রীযুক্ত চন্দ্রিকাপত্র প্রকাশকের বরেষু ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

সাত ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ আসাম ও শৌমার দেশ নিবাসিদিগের ধর্ম্মসভায় ধনদান ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

আট ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ পত্রপ্রেরক প্রতি ; ৩ কোম্পানির কাগজ।

২১ আষাঢ় ১২৩৮

এক ১ সরিফসেল ; ২ সরিফসেল ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

দুই ১ শেষ সরিফসেল ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ কলিকাতার নাতয়ান খাতকের পরিত্রাণের আদালত।

তিন ১ কলিকাতার পরিশোধাক্ষম ঋণিদিগের পরিত্রাণের আদালত ; ২ কলিকাতার পরিশোধাক্ষম ঋণিদিগের পরিত্রাণের আদালত ; ৩ বিজ্ঞাপন, সকলের জ্ঞাপনার্থে জানাইতেছি।

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

পাঁচ ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

ছয় ১ সুপ্রীম কোর্ট, এগ্রিকল্‌টুরেল এণ্ড হারটিকল্‌টুরেল সোসাইটী ; ২ দৈবঘটনা, নীল ; ৩ দুরাত্মার দৌরাত্ম্য।

সাত ১ [কোনো শিরোনাম নেই], ২ গোয়ালিয়া; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

আট ১ কাটকাঙ্গরো রাজ্য ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ জাহাজের সংবাদ, কোম্পানির কাগজ।

২৪ আষাঢ় ১২৩৮

এক ১ সরিফসেল ; ২ সকলের জ্ঞাপনার্থে জানাইতেছি ; ৩ নীলামে সুতা বিক্রয়, সংস্কৃত গ্রন্থ।

দুই ১ ইশতেহার, পুস্তক বিক্রয় ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

তিন ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ শিমূলা, জানরল আর্ডর, পোলিস।

পাঁচ ১ শ্রীযুত রণজিৎ সিংহ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই]; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

ছয় ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ পুস্কর দ্বীপোপাখ্যান ; ৩ শ্রীযুক্ত চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয়েষু।

সাত ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ শ্রীযুত চন্দ্রিকা প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।

আট ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ কোম্পানির অফিস বন্ধ, কএদিদিগের প্রার্থনা ; ৩ কোম্পানির কাগজ।

২৮ আষাঢ় ১২৩৮

এক ১ সরিফ দপ্তর ; ২ বিজ্ঞাপন কলিকাতার নাতয়ান নাতকের পরিত্রাণের আদালত ; ৩ সংস্কৃত গ্রন্থ।

দুই ১ ইশতেহার, পুস্তক বিক্রয় ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

তিন ১ ১৮৩১ সালের কলিকাতার দ্বিতীয় লাটরি, চুরি ; ২ ডাক, ত্রিগজেন ; ৩ রথযাত্রা, দিল্লী।

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ বুন্দেল খণ্ড ; ৩ পৃথিবীর বিবরণ।

পাঁচ ১ হিন্দুকালেজ ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

ছয় ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ লর্ড বিসাপ সাহেবের মৃত্যু ; ৩ শ্রীযুত কমণ্ডর ইন চিফ সাহেব, ১৮৩১ সালের কলিকাতার দ্বিতীয় লাটরি।

সাত ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২··· ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

আট ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ ডাক, বিসোহর রাজ্য।

৩১ আষাঢ় ১২৩৮

এক ১ সরিফসেল ; ২ ইশতেহার, সংস্কৃত গ্রন্থ ; ৩ পুস্তক বিক্রয়।

দুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

তিন ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ চরাপুঁজির বিবরণ ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

চার ১ চরাপুঁজিতে ৺কালীপূজা , ২ শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় শ্রীচরণেষু ; ৩ কোম্পানির কাগজ।

৩ শ্রাবণ ১২৩৮

এক ১ সরিফ দপ্তর ; ২ কলিকাতার নাতয়ান খাতকের পরিত্রাণের আদালত ; ৩ ইশতেহার, সংস্কৃত গ্রন্থ।

দুই ১ পুস্তক বিক্রয় ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

তিন ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

চার ১ শ্রীযুত কাম্পটন সাহেব, যুদ্ধ ; ২ চৌরঙ্গী থিয়েটর, নীল, ত্রিহুত, ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

পাঁচ ১ সিঁদচুরি, পৃথিবী হইতে প্রতিমা উত্থান ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ মদেকাত্মীয় শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুজীউ মৎপ্রিয়তম মহাশয়েষু, হঠাৎ মৃত্যু।

ছয় ১ দুর্ভিক্ষ ; ২ ভূমিকম্প, সুপ্রিম কোর্ট ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

সাত ১ সবমুর রাজ্য ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই]; ৩ পূজনীয়বর শ্রীলশ্রীযুত চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণাম্বুজেষু।

আট ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ জাহাজের আগমন, কোম্পানির কাগজ।

৬ শ্রাবণ ১২৩৮

এক ১ সরিফ দপ্তর ; ২ ইশতেহার, সংস্কৃত গ্রন্থ ; ৩ পুস্তক বিক্রয়।

দুই ১ শ্রীযুতবাবু কানাইলাল ঠাকুরের বাটীর চুরিবিষয় ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

তিন ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ রাজকর্ম্মে নিয়োগ, ধর্ম্মসভা ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

চার ১ রঙ্গপুর, শ্রীযুত গবরণর জেনরেল বাহাদুর ; ২ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, চুরি, মহরমের লোপাপত্তি ; ৩ ঔদ্ধত্যের প্রতিফলন, ডবলডিষ্টি ও পিচব্রাণ্ডি।

পাঁচ ১ ১৮৩১ সালের দ্বিতীয় লাটরি ; ২ পৃথিবীর পরিমাণ ; ৩ ব্যবস্থাবিষয় শ্রীযুত চন্দ্রিকা প্রকাশক মহাশয়েষু।

ছয় ১ [কোনো শিরোনাম নেই]; ২ কাকর মহাশয়েষু ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

সাত ১ শ্রীল নিখিল গুণনিলয় নির্ম্মল ধর্ম্মজলধি চন্দ্রিকা সম্পাদক সন্দেহ সন্দোহ-ভঞ্জক মহাশয় মহোদয়েষু ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই]; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

আট ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ জাহাজের সংবাদ আগমন ; ৩ কোম্পানির কাগজ।

১৬ শ্রাবণ ১২৩৮

এক ১ সরিফ দপ্তর, ২৯ জুলাই ১৮৩১ সাল ; ২ সংস্কৃত গ্রন্থ ; ৩ ইশতেহার, পুস্তক বিক্রয়।

দুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

তিন ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

চার ১ চন্দ্রিকার উক্তি ; ২ রাজকর্ম্মে নিয়োগ, শ্রীযুত গবরণর জানেরল বাহাদুর ; ৩ মহারাজ রণজিৎ সিংহ, নীল, সুপ্রীমকোর্ট।

পাঁচ ১ ১৮৩১ সালের দ্বিতীয় লাটরি, অসম সাহস ; ২ নভোমণ্ডল ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

ছয় ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ সতীধর্ম্ম বিদ্বেষি শ্রীযুত কালীনাথ মুন্সীর বরাহনগরের দলবিষয়, শ্রীযুত চন্দ্রিকাকার মহাশয় সদাশয়েষু ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

সাত ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ কলিকাতার পরিশোধাক্ষম ঋণিদিগের পরিত্রাণের আদালত।

১৭ শ্রাবণ ১২৩৮

এক ১ সরিফ দপ্তর ; ২ সরিফ সেল ; ৩ শেষ সরিফসেল।

দুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ পত্রপ্রেরকের প্রতি নিবেদন ৩…, …, কোম্পানির কাগজ।

তিন ১ স্ত্রীবিদ্যাবিষয়ক ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ গুণিগণাগ্রগণ্য শ্রীযুত চন্দ্রিকা প্রকাশক স্বধর্ম্মপ্রতিপালক বরেষু।

চার ১ ইশতেহার, পুস্তক বিক্রয় ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩…চন্দ্রিকার উত্তর।

পাঁচ ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

ছয় ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ এসিয়াটীক সোসাইটী, নীল, চৌরের দণ্ড।

সাত ১ সুপ্রীমকোর্টের রসুম ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ ১৮৩১ ২০ জুলাই বুধবার, শ্রীযুত রণজিৎ সিংহের উপঢৌকন।

আট ১ বৈদ্য সমাজ ; ২ জলমগ্না, বেলাসপুর রাজ্য ; ৩…।

নয় ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ শ্রীযুত চন্দ্রিকা প্রকাশক মহাশয়েষু ; ৩ জাহাজের সংবাদ আগমন, কোম্পানির কাগজ।

২০ শ্রাবণ ১২৩৮

এক ১ কলিকাতার পরিশোধাক্ষম ঋণিদিগের পরিত্রাণের আদালত ; ২ কলিকাতার পরিশোধাক্ষম ঋণিদিগের পরিত্রাণের আদালত ; ৩ সংস্কৃত গ্রন্থ।

দুই ১ পুস্তক বিক্রয় ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ বৈদ্য সমাজ বিষয় ।

তিন ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ রাজকর্ম্মে নিয়োগ ।

চার ১ স্থপ্রিমকোর্ট ; ২ ১৮৩১ সালের কলিকাতার দ্বিতীয় লাটরি ; ৩ ওলাউঠা ও বসন্তরোগ, খুন ।

পাঁচ ১ বর্ষা ; ২ শ্রীযুত রণজিৎ সিংহ বাহাদুর ; ৩ নভোমণ্ডল ।

ছয় ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ শ্রীচরণেষু ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

সাত ১ প্রেরিতপত্র ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ৩ ··· ।

আট ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ জাহাজের সংবাদ আগমন ; ৩ কোম্পানির কাগজ ।

২৪ শ্রাবণ ১৮৩১

এক ১ সরিফ সেল ; ২ সরিফ সেল ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

দুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

তিন ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

পাঁচ ১ [কোনো শিরোনাম নেই] , ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ কলিকাতার পরিশোধাক্ষম ঋণিদিগের আদালত ।

ছয় ১ চন্দ্রিকা গ্রাহক প্রতি ; ২ পুস্তক বিক্রয় ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

সাত ১ স্থপ্রিমকোর্ট , ২ উলাউঠা, দিল্লী, ১৮৩১ সালের দ্বিতীয় লাটরি , ৩ শ্রীযুত চন্দ্রিকা প্রকাশক মহাশয়েষু ।

আট ১ [কোনো শিরোনাম নেই] , ২ জাহাজের সংবাদ আগমন ; ৩ কোম্পানির কাগজ ২১ জুলাই বৃহস্পতিবার ।

২৭ শ্রাবণ ১২৩৮

এক ১ চন্দ্রিকা গ্রাহক প্রতি ; ২ সংস্কৃত গ্রন্থ ; ৩ ইশতেহার, পুস্তক বিক্রয় ।

দুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

তিন ১ চন্দ্রিকাকারের উত্তর ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

চার ১৫ আগষ্ট ১৮৩১ সাল, সুপ্রিম কোর্ট ; ২ কলিকাতার আগমন, মান্দ্রাজ, শ্রীযুত বেথি সাহেব ; ৩ কমণ্ডর হেজ সাহেবের মৃত্যু, অপহৃত ধনপ্রাপ্তি ।

পাঁচ ১ অযোধ্যার রাজা ও সম্বাদ পত্র, পৈতৃক ধন ; ২ সুপ্রিম কোর্ট, আগস্ত ; ৩ সর চার্লস ।

ছয় ১ ব্যবস্থা.... ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ নীল বিষয়ক শেষ সম্বাদ, খাজনা কমান ।

সাত ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ প্রেরিত পত্র ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

আট ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ জাহাজের সংবাদ আগমন ; ৩ কোম্পানির কাগজ ।

৩১ শ্রাবণ ১২৩৮

এক ১ সরিফ সেল ; ২ সরিফ সেল ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

দুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ সরিফ সেল ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

তিন ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

চার ১ বেলোয়ারি ঝাড় ; ২ চন্দ্রিকাগ্রাহক প্রতি ইশতেহার ; ৩ সুপ্রিমকোর্ট, পোলিস ।

পাঁচ ১ চৌর্য্য, ১৮৩১ সালের দ্বিতীয় লাটুরি ; ২ শ্রীশ্রীযুতের শেষ ঘোষণা, হিন্দুর পৈতৃকবিষয়ক ব্যবস্থা ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

ছয় ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ প্রেরিতপত্র ।

সাত ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ শ্রীযুত চন্দ্রিকা-প্রকাশক মহাশয়েষু ।

আট ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ জাহাজের সংবাদ আগমন, কোম্পানির কাগজ ।

৩ ভাদ্র ১২৩৮

এক ১ চোর ধরিবার পারিতোষিক ১০০ একশত টাকা ; ২ সংস্কৃত গ্রন্থ ; ৩ ইশতেহার।

দুই ১ পুস্তক বিক্রয় ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ হিন্দুর পৈতৃক বিষয়ের ব্যবস্থা।

তিন ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

চার ১ পতীপ্রাণসতী ; ২ ধর্ম্মসভা ; ৩ পদেনিযুক্ত, ইনসালবেণ্ট কোর্ট, পোলিস।

পাঁচ ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ প্রেরিত পত্র ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

ছয় ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ প্রতাপাদিত্য বংশ্য, পূজনীয় শ্রীযুত চন্দ্রিকা প্রকাশক মহাশয়েষু ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

সাত ১ চণ্ডালগড়,···নাসিরাবাদ, নভোমণ্ডল ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই], ৩ প্রেরিতপত্র।

আট ১ পর ইতি স্বাক্ষরিত পত্রের প্রত্যুত্তর ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

নয় ১ শ্রীযুচ্চন্দ্রিকা প্রকাশক মহাশয়েষু, ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

দশ ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ জাহাজের সংবাদ আগমন ; ৩ কোম্পানির কাগজ।

৭ ভাদ্র ১২৩৮

এক ১ সরিফসেল ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

দুই ১ সরিফসেল ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

তিন ১ সরিফসেল ; ২ শেষ সরিফসেল, চোর ধরিবার পারিতোষিক ১০০ একশত টাকা ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

চার ১ চন্দ্রিকাগ্রাহক প্রতি ; ২ ইশতেহার ; ৩ বাটীর চুরির বিষয়।

পাঁচ ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ পোলিস ; ৩ দিল্লী।

ছয় ১ চীনদেশ হইতে আগত গুরুতর সম্বাদ ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

সাত ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ চুঁচুড়া বারিক, সিঁদচুরি ; ৩ ডাকাইতি।

আট ১ সেতারা রাজ্য, প্রেরিত পত্র ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ জাহাজের সংবাদ, কোম্পানির কাগজ।

১০ ভাদ্র ১২৩৮

এক ১ সরিফসেল ; ২ আরব্য ইতিহাস সারসংগ্রহ ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

দুই ১ ইশতেহার, সংস্কৃত গ্রন্থ ; ২ চন্দ্রিকাগ্রাহক প্রতি , ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

তিন ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ রাজকর্ম্মে নিয়োগ, পোলিস ; ৩…, …।

পাঁচ ১ … ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] , ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

ছয় ১ শ্রীযুত রামমোহন রায় , ২ চীন দেশের বাণিজ্য ; ৩ …।

সাত ১ … ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ প্রেরিত পত্র।

আট ১…ঋণদান ; ২ পত্রপ্রেরকদিগের প্রতি , ৩ কোম্পানির কাগজ।

১৪ ভাদ্র ১২৩৮

এক ১ সারিফসেল , ২ সরিফসেল ; ৩ সরিফসেল।

দুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] , ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

তিন ১ সরিফসেল ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] , ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

চার ১ ব্যাঙ্কনোট ও স্বর্ণাভরণাদি চুরি , ২ কলিকাতার পরিশোধাক্ষম ঋণিদিগের পরিত্রাণের আদালত ; ৩ আরব্য ইতিহাস সারসংগ্রহ, উত্তম বেলোয়ারি ঝাড়।

পাঁচ ১ চোর ধরিবার পারিতোষিক ১০০ একশত টাকা ; ২ ইশতেহার, এসিয়াটিক সোসাইটী,…ডেবিড স্কাট সাহেব ; ৩ জাহাজ জলমগ্ন, ডাকমারা, পোলিস।

ছয় ১ কুক্কুরের দংশনে মৃত্যু ; ২ জলপ্লাবন ; ৩ নাগপুর রাজ্য।

সাত ১ প্রেরিতপত্র ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ পরম ধার্ম্মিক পক্ষপাত রহিত শ্রীযুত চন্দ্রিকা প্রকাশক মহাশয়েষু।

আট ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ পত্রপ্রেরকের প্রতি ; ৩ জাহাজের সংবাদ আগমন, কোম্পানির কাগজ।

১৭ ভাদ্র ১২৩৮

এক ১ ব্যাঙ্কনোট ও স্বর্ণাভরণাদি চুরি , ২ চোর ধরিবার পারিতোষিক ১০০ একশত টাকা ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

দুই ১ আরব্য ইতিহাস সারসংগ্রহ, সংস্কৃত গ্রন্থ ; ২ চন্দ্রিকাগ্রাহক প্রতি ; ৩ ইশতেহার, পুস্তক বিক্রয়।

তিন ১ [কোনো শিরোনাম নেই] , ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

পাঁচ ১ রাজকর্ম্মে নিয়োগ ; ২ শ্রীযুত গবরণর জেনরেল বাহাদুর,…কলিকাতার দ্বিতীয় লাটরি ; ৩ মান্দ্রাজ, শ্রীরামমোহন রায়, নভোমণ্ডল।

ছয় ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ জলচিচতারোহণ ; ৩ শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় শ্রীচরণেষু।

সাত ১ [কোনো শিরোনাম নেই] , ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ শ্রীযুত চন্দ্রিকা প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।

আট ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ জাহাজের সংবাদ আগমন , ৩ কোম্পানির কাগজ।

২১ ভাদ্র ১২৩৮

এক ১ সরিফসেল ; ২ সরিফ সেল ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

দুই ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

তিন ১ সরিফসেল ; ২ সরিফসেল ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

পাঁচ ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

ছয় ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

সাত ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

আট ১ ব্যাঙ্কনোট ও স্বর্ণাভরণাদি চুরি ; ২ চোর ধরিবার পারিতোষিক ১০০ একশত টাকা ; ৩ পাটনাই কাগজ বিক্রয় ।

নয় ১ চন্দ্রিকাগ্রাহক প্রতি, ইশতেহার ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই], ৩ ডেবিড় স্কাট সাহেব ।

দশ ১ বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক, পোলিস , ২ মহিষাসুর বধ ; ৩ জাহাজের সংবাদ গমন, কোম্পানির কাগজ ।

২৪ ভাদ্র ১২৩৮

এক ১ চোর ধরিবার পারিতোষিক ১০০ একশত টাকা ; ২ পাটনাই কাগজ বিক্রয় ; ৩ চন্দ্রিকাগ্রাহক প্রতি ।

দুই ১ ইশ্‌তেহার, সংস্কৃত গ্রন্থ ; ২ পুস্তক বিক্রয় ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

তিন ১ পাকরাজেশ্বর, ফার্স্টর্স বকেবেলরি ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ রত্নাকর ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

পাঁচ ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ রাজকর্ম্মে নিয়োগ ; ৩ শ্রীযুত মহারাজ রণজিৎ সিংহ বাহাদুর, বসোরা ।

ছয় ১ শ্রীযুত কমণ্ডর ইনচিফ, লাটরি, পোলিস, নভোমণ্ডল ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] , ৩ শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।

সাত ১ [কোনো শিরোনাম নেই] , ২ শ্রীযুত চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয় সদাশয়েষু , ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

আট ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ এক আশ্চর্য্য চিকিৎসা ; ৩ জাহাজের সংবাদ গমন, কোম্পানির কাগজ ।

২৮ ভাদ্র ১২৩৮

এক ১ সরিফসেল , ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

দুই ১ ইশ্‌তেহার, সংস্কৃত গ্রন্থ ; ২ পুস্তক বিক্রয় ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

তিন ১ পাকরাজেশ্বর, ফাস্টস বকেবেলরি ; ২ পাটনাই কাগজ বিক্রয়, চন্দ্রিকা-গ্রাহক প্রতি ; ৩ পোলিস।

চার ১ শ্রীযুত গবরণর জেনারেল বাহাদুর ; ২ মিডিকেল এণ্ড ফিজিকেল সোসাইটী, ঠিকাবেহারার অন্যায় জন্য দণ্ড ; ৩ ইংলণ্ড দেশ হইতে শেষাগত সম্বাদ।

পাঁচ ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

ছয় ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

সাত ১ প্রেরিত পত্র (জলপথে চৌকীদারের উৎপাত) ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ পরম পূজনীয় শ্রীল শ্রীযুত চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণাম্বুজেষু।

আট ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ পত্রপ্রেরকগণের প্রতি ; ৩ জাহাজের সংবাদ।

৩১ ভাদ্র ১২৩৮

এক ১ চন্দ্রিকাগ্রাহক প্রতি ; ২ পাটনাই কাগজ বিক্রয়, ফাস্টর্স বকেবেলরি ; ৩ ইশ্‌তেহার, সংস্কৃত গ্রন্থ।

দুই ১ পুস্তক বিক্রয় ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ সাক্ষ্য প্রদান বিষয়।

তিন ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ রাজকর্ম্মে নিয়োগ।

চার ১ ইদসালবেণ্ট কোর্ট, পোলিস ; ২ ডিউএল, সর জার্জ রিকেটস সাহেব, জলমগ্ন ; ৩ অসম্ভব বৃষ্টি।

পাঁচ ১ … ; ২ ইউরোপী সম্বাদ ; ৩ নভোমণ্ডল।

ছয় ১ প্রেরিতপত্র ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

সাত ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

আট ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ শ্রীযুচ্চন্দ্রিকা প্রকাশক মহাশয় সন্নিধানেষু, জাহাজের সংবাদ ; ৩ কোম্পানির কাগজ।

৪ আশ্বিন ১২৩৮

এক ১ চন্দ্রিকাগ্রাহক প্রতি ; ২ পাটনাই কাগজ বিক্রয়, ফাস্টর্স বকেবেলরি ; ৩ বারাণসের দেবালয়ের নক্সা, সংস্কৃত গ্রন্থ।

দুই ১ পুস্তক বিক্রয় ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ উত্তম বেলোয়ারি ঝাড়, দল বৃত্তান্ত ।

তিন ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ পোলিস, ···ব্যাঙ্ক, দ্বিবিবাহবিষয়ক মোকদ্দমা ; ৩ ব্যাঘ্রের দৌরাত্ম্য ।

পাঁচ ১ মঙ্গল সমাচার ; ২ পশ্চিম দেশের রাজস্বের বন্দোবস্ত ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

ছয় ১ ···অন্যায় ব্যবহার ; ২ ··· ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

সাত ১ [কোনো শিবোনাম নেই] ; ২ গাওয়ালিয়র রাজ্য, প্রেরিতপত্র ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

আট ১ শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ; ২ জাহাজের সংবাদ ; ৩ কোম্পানির কাগজ ।

৭ আশ্বিন ১২৩৮

এক ১ কলিকাতার পরিশোধাক্ষম ঋণিদিগের পরিত্রাণের আদালত ; ২ ফার্স্টর্স বকেবেলরি ; ৩ বারাণসের দেবালয়ের নক্সা ।

দুই ১ পাটনাই কাগজ বিক্রয়, সংস্কৃত গ্রন্থ ; ২ ইশ্‌তেহার ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

তিন ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

চার ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

পাঁচ ১ রাজকর্ম্মে নিয়োগ, গাড়ি আরোহণে বিপদ ; ২ আত্মহত্যার উদযোগ, ভূমিকম্প ; ৩ বজ্রাঘাতে মৃত্যু, ···পাতাল বিবরণং ।

ছয় ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ প্রেরিত পত্র ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

সাত ১ ··· ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই] ।

আট ১ শ্রীলশ্রীযুক্ত ধর্ম্মসভা সম্পাদক মহাশয় জীবন হীন দীন মীন নিজ্জনজীবন শরণেষু ; ২ শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় শ্রীচরণেষু ; ৩ কোম্পানির কাগজ ।

১১ আশ্বিন ১২৩৮

এক ১ টালির খাল ইজারা, …বকেবেলরি ; ২ বারাণসের দেবালয়ের নক্সা, উত্তম বেলোয়ারি ঝাড় ; ৩ মোন্‌তোজ বল্‌ সোগত, সংস্কৃত গ্রন্থ।

দুই ১ চন্দ্রিকাগ্রাহক প্রতি ; ২ পুস্তক বিক্রয় ; ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

তিন ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ পোলিসের জরিমানা।

চার ১ ব্যাঙ্কনোট জাল, …, নূতন গ্রন্থ ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ চীন দেশ।

পাঁচ ১ [কোনো শিরোনাম নেই] , ২ পৈতৃকবিষয়ক হস্তান্তরকরণ ; ৩ নাপোলিয়ন বাদশাহ ও বর্ম্ম।

ছয় ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ ইন্দর রাজ্য, প্রেরিতপত্র , ৩ [কোনো শিরোনাম নেই]।

সাত ১ প্রেরিতপত্র , ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ …।

আট ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ আটা ভূসি বিক্রয়, কোম্পানির কাগজ।

১৮ আশ্বিন ১২৩৮

পাঁচ ১ পদপ্রাপ্তি, পোলিস, লাটরি , ২ শ্রীযুত গবরণর জেনরেল ; ৩ ইউরোপ হইতে শেষাগত সম্বাদ।

ছয় ১ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ২ পোলণ্ড ; ৩ সাগরের তেলিগ্রাপ, পামর কোম্পানি, রামপুর আলিয়ার নিকটস্থ সোগোন বৃক্ষবন।

সাত ১ চীনদেশ ; ২ নাস্তিকের গুরুর শাস্তি ; ৩ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ…।

আট ১ প্রেরিতপত্র ; ২ জাহাজের সংবাদ ; ৩ কোম্পানির কাগজ।

২৫ আশ্বিন ১২৩৮

এক ১ উত্তম বেলোয়ারিঝাড়, আটা ভূসি বিক্রয় ; ২ ফাস্টর্স বকেবেলরি ; ৩ …।

দুই ১ … ; ২ সন্ধি পূজার সময় নিরূপণ ; ৩ …।

তিন ১ … ; ২ … ; ৩ বন্যা, …।

চার ১ শ্রীযুত কমণ্ডর ইন চিফ সাহেব, বর্ম্মা রিসিডেণ্ট ; ২ … ; ৩ …।

পাঁচ ১ ইশ্‌তেহার, পুস্তক বিক্রয় ; ২ [কোনো শিরোনাম নেই] ; ৩ …।

ছয় … ।

সাত ১ প্রেরিতপত্র , ২ · · , ৩ … ।

আট ১ … , ২ … , ৩ …কোম্পানির কাগজ ।